গ্রন্থাবলী সিরিজ

নগেন্দ্র-গ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী সিরিজ

নগেন্দ্রগ্রন্থাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[মূল্য ১॥০ টাকা

লীলা

(উপন্যাস)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

লীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

—*—

বাসর-ঘর।

আমি এ বাসর-ঘরের বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। সে কালের বাসর-ঘর হইত, তাহা হইলে কোন গোল থাকিত না। সে কালে সব সোজাসুজি মোটামুটি ছিল। সে কালে বুদ্ধি স্থূল, ঠাট্টা-বিদ্রূপ স্থূল, সুতরাং সে সব কথা বলা কিছু শক্ত নয়। এখন সে দিন গিয়াছে। বরের দাঁতের সঙ্গে খোন্তার, সাদৃশ্য বরের চুলের সঙ্গে সজারুর কাঁটার সাদৃশ্য দেখাইলে বিশেষ সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না। সে কালে ঠাট্টা-তামাসা এই পর্য্যন্ত। আগে যা স্থূল ছিল, এখন তা সূক্ষ্ম হইয়াছে।

এখনও বাসর-ঘরে তেমনি ঘরজোড়া ধপ্‌ধপে বিছানা পাতা থাকে, তেমনি তাকিয়া থাকে, দেয়ালগিরিতে তেমনি ষোলপুনী মোমবাতি জ্বলে। এখনও দরজার পাশে বাড়ীর দু' একজন পুরুষ দাঁড়াইয়া উঁকি-ঝুঁকি মারে, আবার কাল চোখের তীব্র কটাক্ষে ও রমণীরসনার তীব্র ব্যঙ্গে লজ্জা পাইয়া তেমনি পলায়ন করে। কিন্তু আর কিছুই তেমন নাই। যাহারা বাসর জাগে, তাহারা আর তেমন নাই। বাসর-ঘরে বর আর তেমন চোরের মতন চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। বুঝি বাসরের কনেটিও এখন আর তেমন নাই।

আর কিছু পারি আর না পারি, বরকনে কেমন দেখিতে, কত বয়স, সেটি ত বলিতে হইবে। বরের বয়স বছর কুড়ি বাইশ হইবে। বেশ সুন্দর বর, দেখিতে রাজপুত্রের মত। গোঁপ-দাড়ী এখনও তেমন উঠে নাই। কনেটি গোরা কি কালো, তা আমি এখন কিছুই বলিতে পারিলাম না। মেয়েটি দেখিতে ছোট, বছর দুশেক বয়স হইবে, কিন্তু এখন একখানি বারাণসী সাড়ী দিয়ে আপাদমস্তক মোড়া। মাথার একগাছি চুল কি পায়ের একটি নখ দেখিতে পাইবার যো নাই। বিবাহকালে মাথায় সিঁদুর দিবার সময় যাঁহারা কনের মুখ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, হাঁ, মেয়ে সুন্দরী বটে। তবে নিখুঁত সুন্দরী কেহই বলে নাই।

বাসর-ঘর কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? ডায়মন-কাটা চিকের উপর বাতির আলো, আর সেই কাল কাল চোখের বিদ্যুতে তেমন ভাল ঠাহর হয় না। চারিদিকে কিন্‌খাব, সাটিন মখমলের নানা-বর্ণ ফুলকাটা, কুঞ্চিত করা জামা, রকম রকম কাপড়, কাহারও মাথায় একটুখানি কাপড়, অনেকেরই মাথায় কাপড় নাই, নানাবিধ কবরী, এলো-ফিরিঙ্গী খোঁপা, বেণে খোঁপা, স্কন্ধে ফুল খোঁপা ঝুলিতেছে। আর সেই স্নিগ্ধ আলোকের সহিত, উজ্জ্বল কটাক্ষের সহিত, হাসি-টিটকারীর তরঙ্গ মিশিয়া ঘরের মধ্যে উথলিতেছে। গা টেপাটিপি, গায় গায় ঢলাঢলি, কখন মর্ম্মান্তিক অন্তরটিপ্‌নী, কখন কানে কানে দু' একটি চুপি চুপি কথা, আর সেই সাবানমার্জ্জিত হস্তমুখের গৌরকান্তি, এই সব দেখিয়া, আর সেই আতর, ল্যাবেণ্ডার, ওডিকলন, বোকে, যুঁইফুল, বেলফুল-সুবাসিত নিশ্বাসোষ্ণ বায়ুর আঘ্রাণ লইয়া কাহার মাথা ঠিক থাকিতে পারে?

কন্যার বয়স দশ বছর শুনিয়া অনেকে রাগ করিতে পারেন। অনেকে বলিবেন, বাল্যবিবাহে দেশটা উচ্ছন্ন গেল' আবার সেই বাল্যবিবাহের কথা? সে অপরাধ ত আমার নয়। বাল্যবিবাহ যে ভাল, সে কথা আমি ত বলি নাই। যত দোষ কন্যাকর্ত্তার আর তাঁর গৃহিনীর। আমি যা দেখিয়াছি, তাই বলিলাম। বিবাহের দিন দুপুরবেলা কন্যার মা হলধর বাবুর স্ত্রীকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই কথাটা আবার মনে পড়িতেছে।

হলধর বাবুর স্ত্রী খুব সভ্য-ভব্য। তাঁর স্বামী এম, এ পাশ করিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে তিনিও অনেকটা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। হলধর বাবুর স্ত্রী তাঁহার বাল্যসখীর কন্যার বিবাহ হইবে শুনিয়া ও বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া বিবাহের দিন দুপুর-বেলা আসিয়া হাজির। আসিয়া দেখিলেন, কন্যা-কর্ত্রী যজ্ঞকার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছেন। হলধর বাবুর স্ত্রীকে দেখিয়া কন্যার মা তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন। হলধর বাবুর স্ত্রী অন্য কথা না বলিয়াই একেবারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তোমাদের মেয়েটির এত শীঘ্র বিয়ে দিচ্চো কেন? মেয়েছেলের অল্পবয়সে বিয়ে দিয়েই ত আমাদের এত কষ্ট।"

কন্যাকর্ত্রী। না ভাই, কি করব বল। আমারও ত এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়া ত আর নিজের হাত নয়। জানই ত 'জন্ম মৃত্যু বিয়ে, এ তিন বিধাতারে নিয়ে।' ছেলেটিও দেখতে শুনতে ভাল, দুটো পাশ কোরেচে, এখন তিনটে পাশের পড়া পড়চে। এমন পাত্র কি হাতছাড়া করতে আছে? আর, ভাই, কিরণের এমন অল্পবয়সই বা কি? দু তিন বছরে সেয়ানা হবে এখন! আমাদের কত বয়সে বিয়ে হয়েছিল মনে আছে ত?

এখন, হলধর বাবু তর্ক করিতে খুব পটু। তিনি মিল, বেন্থাম, স্পেন্সরের মত খণ্ডন করেন, সাংখ্য-দর্শন তাঁহার রসনাগ্রে; সুতরাং তাঁহার গৃহিণীও কিছু তর্কপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, "আমাদের ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েচে ব'লে কি আমাদের ছেলেপুলেরও তাই হওয়া উচিত? দেখ, অল্পবয়সে বিয়ে হ'লে কত কষ্ট। অল্পবয়সে ছেলে হয়, ভাবনা-চিন্তা উপস্থিত হয়, আরও কত বিপদ হয়। আমি ওঁর মুখে শুনেছি—"

কিরণের মা একটু হাসিয়া বন্ধুর কথায় বাধা দিয়া কহিলেন, "ছি, বোন্, এখন কি আর ও সব কথা বলতে আছে! ফুল ফুট্‌লে ত আর ধ'রে রাখা যায় না। কিরণের ফুল ফুটেছে বলেই আজ তার বিয়ে। এখন তোমরা দশজনে আশীর্ব্বাদ কর, যেন বাছা শ্বশুরবাড়ী গিয়া সুখে থাকে। জালার জালায় যেন আজ সব সারা হয়। বাছা আমার কিছু জানে না, যেন তার কখন কোন দুঃখ-কষ্ট না হয়।"

বলিতে বলিতে তাঁহার হাসি-হাসি অমায়িক মুখখানিতে হাসি ফুটিয়া উঠিল। আহ্লাদে, হয় ত একটু দুঃখে, চোখের পাতা একটু ভিজে-ভিজে হইয়া উঠিল।

হলধর বাবুর স্ত্রী আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন। শুনিয়াছি না কি, তিনি বাসর-ঘরে বামন দিদি সাজিয়া খুব রঙ্গ করিয়াছিলেন বর বাবাজী বড় বিপদেই পড়িয়াছিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহের সময় বাহিরে সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না, আর সব নিস্তব্ধ দেখিয়া এক সুন্দরী কহিলেন, "রশনচৌকী যে একেবারে থামিয়া গেল। বল, তাহারা এই সময় একবার বাজাক্।"

তাহারা দিব্য লুচি-সন্দেশ আহার করিয়া, নাক ডাকাইয়া নিদ্রা দিতেছে, নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছে যে, তাহাদের আর এক জায়গা হইতে বায়না আসিয়াছে। বাজনা শুনিয়া বাবুরা খুসী হইয়া তাহাদের এক জোড়া শাল পুরস্কার দিয়াছে। এমন সময় দাসী আসিয়া তাহাদের ডাকিল।

অন্দরমহলের হুকুম, না শুনিলেই নয়। এক জন সানাইয়ের ফুঁপী হাতড়াইয়া সানাইয়ের মুখে বসাইল, আর এক জন অভ্যাসবশতঃ তবলায় চাঁটি দিল। তবলা কিছু নরম বলিল। সকলে উত্তম-রূপে জাগরিত হইল, অস্ফুটস্বরে অন্তঃপুরবাসিনী-দিগের উদ্দেশে অনেক অন্যায় কথা বলিতে বলিতে, দু এক ছিলিম তামাক খাইয়া যন্ত্র-তন্ত্র ঠিক করিতে লাগিল। কতক্ষণ তবলা ঠিক বলে না, সানাইয়ে ঠিক সুর বাহির হয় না, অবশেষে অনেক রকম বিশ্রী সুর-তালের পর দুই জনে পোঁ ধরিল, তবলায় মৃদু মৃদু ঘা পড়িতে লাগিল। শেষে অর্দ্ধেক কাঁদিয়া অর্দ্ধেক বিরক্ত হইয়া সানাইয়ে বেহাগ আলাপ আরম্ভ করিল। তবলায় অমনি একতালা বাজিতে লাগিল। সানাইয়ে ধরিল, "নিশি নিশি জাগিনু সে জন না এল।"

—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—•—

বর-কন্যার পরিচয়।

বিবাহের পরদিবস বাসিবিবাহ হইলে বর-বধূ বাটী আসিল। সেখানে দশ পনর জন এয়ো মিলিয়া বরকনেকে বরণ করিয়া শাঁক বাজাইয়া হুলু দিয়া তাহাদের ঘরে বসাইল। সেই সময় যে যেখানে ছিল, কনের ঘোমটা খুলিয়া, ছাতি ধরিয়া মুখ দেখিয়া লইল। এইবার কনের রূপের পরিচয় দিই।

আমি যদি কন্যাকে অলোকসামান্য রূপবতী বলিয়া পরিচয় দিই, তাহা হইলেই সব গোল মিটিয়া যায়। যদি বলি যে, বর্ণ তপ্তকাঞ্চন, প্রস্ফুটিত চম্পকের তুল্য; আগুল্ফলম্বিত, ঘনকুঞ্চিত, ঘোর কৃষ্ণ কেশভার; সুঠাম, সুললিত কুসুমকান্তি; বিশাল বিকসিত লোচনযুগল; কটাক্ষে বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিতেছে: ভ্রূযুগ সাক্ষাৎ কামদেবের শরাসন; ফুল্ল বিম্বাধর; এইরূপ আরও সব বলিয়া যাই, তাহা হইলে আমারও রূপবর্ণনা হইল, তুমিও মনে করিলে যে, হাঁ, উপন্যাসের নায়িকার উপযুক্তই বর্ণনা হইল, কিন্তু আমি সত্যের কঠোর শৃঙ্খলে বদ্ধ, তা পারিলাম না। কন্যার বর্ণ বেশ গৌরবর্ণ বটে, কিন্তু সে বর্ণ দেখিয়া চক্ষু ঝলসিত হয় না। ঘরে বসাইয়া সকলে টাকা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে পর এক জন কন্যার খোঁপা খুলিয়া দেখিলেন যে, চুল বেশ কাল, আর কোঁকড়ানও বটে, কিন্তু গতে যেমন, লম্বে তেমন নয়, কটি-দেশের একটুখানি নীচে পড়ে মাত্র। চোখ বেশ পটলচেরা, আনত চক্ষু বলিয়া তারার রংটা ভাল বলিতে পারিলাম না। বোধ হয়, চোক একটু কটা হইবে, তা নহিলে হরির মা এত করিয়া চোখ তুলিয়া চাহিতে বলিলেন, তবু নব বধূ একবার চোখ তুলিল না, ঘাড়টি হেঁট করিয়া একদৃষ্টে মাটীর দিকেই চাহিয়া রহিল কেন? আর বোসেদের মেয়ে ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিয়াছিল; "হাজার সুন্দরী হোক্ না কেন ভাই, নাকটি একটু মোটা আর পায়ের চেটো থড়মের মত।" এই বলিয়া তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

এইবারে সব কথা খুলিয়া বলি। পাত্রের নাম সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; সুরেশচন্দ্র পিতৃমাতৃহীন, খুল্লতাতের আশ্রয়ে বাস করিয়া অধ্যয়নাদি করেন। খুল্লতাত হরগৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচ শত টাকা বেতনে কর্ম্ম করেন। তাঁহাকে বহু পরিবার পালন করিতে হয়। নিজের সন্তান-সন্ততি, একটি বিধবা ভগিনী ও তাঁহার দুই চারিটি শিশু সন্তান এবং অগ্রজের একমাত্র সন্তান সুরেশচন্দ্র। হরগৌরী বাবুর গুণ অনেক; তিনি যেমন আপনার সন্তানের যত্ন করেন, ভ্রাতা-ভগিনীর সন্তানগুলিকেও ঠিক তেমনি করেন। সুরেশচন্দ্রকে লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য বিস্তর ব্যয় স্বীকার করিয়াছিলেন। হরগৌরী বাবু পঞ্চাশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

পাত্রীর নাম কিরণময়ী। পিতা গোবিন্দপ্রসাদ চৌধুরী এক হৌসে মুৎসুদ্দীর কর্ম্ম করেন, পূর্ব্বে বিলক্ষণ টাকা উপার্জ্জন করিতেন, আবার তেমনি অসদ্ব্যয়ও ছিল। এখন আর তেমন রোজগার নাই, ভার্য্যা বড় গুণবতী, এত দিনে তাঁহার কথা শুনিয়া ব্যয় সঙ্কোচ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গোবিন্দ প্রসাদ বাবুর পুত্র-কন্যায় গুটি তিন চার। কিরণময়ী সকলের বড়। গোবিন্দ বাবুর বয়ঃক্রম বিয়াল্লিশ বৎসর হইবে। সুরেশচন্দ্র ছেলেটি ভাল, সচ্চরিত্র ও বেশ পড়াশুনা করিতেছে জানিয়া, গোবিন্দ বাবু তাহাকে কন্যাটি সমর্পণ করিয়াছিলেন। ছেলেটির বাপ-মা নাই, সেই এক দুঃখ, তবে ছেলেটি ভাল বলিয়া তিনি মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন। হরগৌরী বাবু ভ্রাতুষ্পুত্রের এমন প্রার্থনীয় সম্বন্ধ হইতেছে দেখিয়া, নিজে উদ্যোগী হইয়া সুরেশচন্দ্রের বিবাহ দিলেন। বৈশাখ মাসের ২৫শে তারিখে আঁব-লিচুর সময়ে খুব ঘটা করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—*—

বিয়ের কনে।

বিয়ের কনের বিয়ের পর আট দিন শ্বশুরবাড়ী থাকা ভারি জ্বালা। একে ত ছোট মেয়ে মা'র কাছছাড়া কখন থাকিতে পারে না, ধূলাকাদা মেখে বাপের বাড়ী খেলা করিয়া বেড়ায়, পুতুল-খেলা

করে, পুতুলের বিয়ে দেয়, আবার তাতে ছোট মেয়েছেলে একটু চঞ্চল, একটু দুরন্ত হয়। সেইটুকু মেয়ে হাতে লোহা-শাঁকা প'রে, মাথায় সিন্দুর প'রে, ঘোমটা টেনে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে চুপ-চাপ কোরে থাকিতে হবে। মনে কর, একটা অচেনা জায়গায় গেলে আমাদেরই মন কেমন খুঁৎ খুঁৎ করে। হয় ত শ্বশুরবাড়ী তেমন সমবয়সী মেলে না, সমবয়সী জুটিলে তবু অনেক কম কষ্ট হয়। তাতে আবার পদে পদে নিন্দার ভয়। সেই এক রত্তি মেয়ে, ভাল মন্দ কিছুই জানে না, তাকে সর্ব্বদাই শশব্যস্ত থাকিতে হয়। শ্বাশুড়ী আছেন, ননদ আছেন, দেকেলে দিদশ্বাশুড়ী আছেন, আত্মীয়-কুটুম্ব আছে, পাড়াপড়সী আছে, তার মধ্যে কেহ কোন ত্রুটি দেখিতে পারে না। দোষ দেখিলে ধরিবে, না দেখিলেও ধরিবে। চলিতে দেখিলে বলে চলন বাঁকা, খেলা করিতে দেখিলে বলে বড় চঞ্চল, কথা কহিলে বলে বাচাল, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে বলে কুঁড়ে, ঘোমটা একহাতের একটু কম হইলে বলে বেহায়া, এই-রূপে উঠিতে বসিতে খুঁত ধরে। কথায় কথায় বাপের নিন্দা, মা'র নিন্দা। অমুক গহনাটি তেমন ভারি হয় নাই, কনের বাপ মা ভারি মন্দ লোক, ফাঁকি দিয়াছে।

আমাদের কিরণ এখন সেই অবস্থায় পড়িয়াছে। শ্বশুরবাড়ী যে আদর করিবার লোক নাই, সমবয়সী মেয়েছেলে নাই, তা নয়। খুড়-শ্বাশুড়ী খুব যত্ন, খুব আদর-অপেক্ষা করেন। বিধবা পিসশ্বাশুড়ী; দুই একটি বড় বড় খুড়তাত ননদ কিরণকে যেন হাতের তেলোয় ক'রে বেড়ায়। বাড়ীর ছেলেপুলে তাহাকে লইয়া খেলা করে। তবু সে বাপের বাড়ীর মত কিছুই দেখিতে পায় না। বাপের বাড়ী কেহ তাহার খোঁজ নেয় না, সে আপনার মনে খেলাধুলা করে। এখানে এত লোকের মাঝখানে সেই যেন প্রধান লোক। "কনেবউর খাওয়া হ'ল কি না," "নাওয়া হ'ল কি না," "কনেবউর ভাল ক'রে চুল বেঁধে দাও," "আহা, বউমা এখানে একলা দাঁড়িয়ে কেন? এস মা আমার সঙ্গে এস," "ওরে, বউমাকে নিয়ে ভরসন্ধ্যাব সময় ছাতে উঠেছিস্ কেন? নেমে আয় নেমে আয়," চারিদিকে এই রকম একটা হইচই পড়িয়া গিয়াছে। যে আসে, সেই বলে, "দেখি তোমা-দের কেমন বউ হ'ল দেখি। ও মা, এই যে দিব্য বউ হয়েছে! ঠিক যেন দুর্গা ঠাকুরুণ! আহা, এমন বউ সুরেশের মা দেখতে পেলে না গা! বেঁচে থাক, বেঁচে থাক, স্বামী নিয়ে জন্ম জন্ম সুখে ঘর কর, ছেলে হোক, মেয়ে হোক, আহা, সোনার সংসার হোক্। সুরেশের একটি ভাল চাকরী হোক!" কিরণ ভাবে, আমাকে নিয়ে এত গোল কেন? বিয়ে ত সকলের হয়, তা আমায় নিয়ে সকলে এমন করে কেন? আমার বড় লজ্জা করে। আচ্ছা, শ্বশুরবাড়ী কি বৌকে এমনি করে? দূর, তা কেন? নতুন বেলায় বুঝি এমনি করে।

কিরণ তাই ভাবে। তাহাকে লইয়া ত কেহ কখন এত গোল করে না, এখনই বা করে কেন? আর এত আদরেও কিরণের তেমন মন উঠে না। বাপের বাড়ী মা'র আদর, বাপের আদর—সে আর এক রকম। কিরণের তাই ভাল লাগে। এখানে ভাত খাইবার সময় দশ জনে ঘিরিয়া বসে। চারি-দিক হইতে তাহাকে খাইতে অনুরোধ করে। "খাও না ভাই, এখানে কি তোমার লজ্জা করতে আছে। এই তোমার বাড়ী, এই তোমার ঘর, আমাদের সাক্ষাতে লজ্জা ক'রে ক'দিন চল্‌বে বল। ছি. মা, আর চারটি ভাত মাখ, লজ্জা করো না। বামন ঠাকরুণ! বউমাকে একখানা মাছ দিয়ে যাও ত!" চারিদিকে শ্বাশুড়ী, ননদ প্রভৃতি এইরূপ বলেন। লজ্জায়, ভয়ে কিরণের আর খাওয়া হয় না। মুখের ভাত মুখে চাপা হইয়া যায়। চারিদিকে যদি সকলে এমন হাউকাউ না করে ত সে বেশ কুড়িয়ে বাড়িয়ে খাইতে পারে। সে ভাবে, "এখানে সকলে খাবার জন্য এত পীড়াপীড়ি করে কেন? মা ত আমায় কখন এত কোরে বলতেন না।" তাই সে নিতান্ত জড়সড় হইয়া চুপ করিয়া সমবয়সী দুটি ননদের সঙ্গে থাকে। তাহারা পান সাজিতে গেলে তাহাদের নিকটে বসিয়া থাকে। আর কেহ না দেখিতে পাইলে, তাহাদের সঙ্গে পান সাজে। বাপের বাড়ীর গল্প করে। সন্ধ্যা হইলে দিদিশ্বাশুড়ী ভুতের, ডাকাতের, বর্গীর, দুয়া সুয়া রাণীর গল্প করেন, কিরণ তাহাই শোনে। শুনিতে শুনিতে, ছেলেমানুষ, কোন কোন দিন ঘুমাইয়া পড়ে।

কিরণ ধীরে ধীরে হাঁটে, কিন্তু পায়ে চারিগাছা

মল সর্ব্বদাই ঝম্ ঝম্ করে, সুতরাং সে যেখানে যায়, সেখানে সকলেই আগে টের পায় যে, কনে-বউ আসিতেছে। এক দিন তাহার পায়ে দৈবাৎ হোঁচোট লাগিয়া বড় ব্যথা হওয়াতে মল চারি গাছি খুলিয়া খুড়শ্বাশুড়ীর কাছে রাখিয়া দিয়াছিল, দুপুরবেলা সকলে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কোন ঘরে তাস খেলার ধুম, নক্স খেলা হইতেছে, এক জন সকলের কোল কুড়াইয়াছেন, তাঁহার আর মুখে হাসি ধরে না। কেহ একেলা ঘরে চুপি চুপি আরসীতে মুখ দেখিতেছেন। কার স্বামী কত মাহিয়ানা পান, কার সাহেব কাকে বেশী ভালবাসে, কোন ঘরে সেই কথা হইতেছে। কিরণের যে দুইটি সঙ্গিনী তাহার নিকট থাকে, তাহারা তাহাকে ফেলিয়া আজ কোথায় উঠিয়া গিয়াছে। সে দোতালার বারান্দায় একেলা বসিয়া আছে। অনেকক্ষণ একেলা থাকিয়া তাহার মন একটু চঞ্চল হওয়াতে সে চারুবালা আর সুকুমারীকে খুঁজিতে উঠিল। আস্তে আস্তে গিয়া শুনিল, এক ঘরে মৃদুস্বরে কথোপকথন হইতেছে, কিন্তু সে কথা দশ পনর হাত দূর হইতে বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। এক জন বলিতেছেন, "অমন নেকা নেকা হাবাগোবা নেহাত ভাল মানুষটি আমি ভাল বাসিনে।" আর এক জন বলিতেছেন, "দেখেছিস ভাই, ভাজা মাছটি যেন উল্টে খেতে জানেন না। মিটমিটে ডাইন, ছেলে খাবার রাক্ষস।"

প্রথম সুন্দরী কহিলেন, "দেখিস্, ও এর পরে দাদাকে ভেড়া বানাবে এখন। ঐটুকু মেয়ে, ঠ্যাকারে যেন মাটীতে পা পড়ে না, কেমন পা টিপে টিপে পা গুণে গুণে হাঁটে দেখেছিস্?"

কিরণ বুঝিল, তাহারই কথা হইতেছে। সে আর না শুনিয়া দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, ঘরের মধ্যে দুই ননদিনী; এক জন পঞ্চদশ, আর এক জন সপ্তদশবর্ষীয়া, বসিয়া রহিয়াছেন। এই দুই জন কিরণকে এমনি যত্ন করেন, যেন তাহাকে একবার মাটীতে নামাইতে চান না। তাঁহারা কিরণকে দেখিয়া চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি বউ, মল খুলেছ কেন?"

কিরণ কহিল, "আমার পায়ে বড় ব্যথা হয়েছে, তাই খুলে রেখেছি।"

তাহারা দুই জনে কিরণকে ডাকিয়া ঘরে বসিতে বলিল।

কিরণ এ পর্য্যন্ত তাহাদের সকল কথা তৎক্ষণাৎ শুনিত, কখন উচ্চবাচ্য করিত না। এবার সে কহিল, "না, আমি সেজ ঠাকুরঝির কাছে যাই।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। তখন দুই ভগিনীতে চোখঠারাঠারি হইল।

সে দিন বৈকালে কিরণ, বাপের বাড়ীর ঝির কাছে বাপের বাড়ী যাইবার জন্য ভারি কান্না জুড়িয়া দিল। এ পর্য্যন্ত সে কাঁদে নাই, কিন্তু আজ তাহার কোমল কচি বুকে বড় ব্যথা লাগিয়াছিল। সে ভাবিল, "কেনই বা ইহারা আমাকে এমন যত্ন করে, আবার কেনই বা পিছনে এমন নিন্দা করে? আমি ইহাদের কি দোষ করিয়াছি? আমি আর এ বাড়ীতে থাকব না।" এই ভাবিয়া সে বড় কাঁদিল, ঝিকে বলিল, "মাকে গিয়া বল্, যেন আজই আমাকে নিয়ে যান। আমি এখানে আর থাক্‌তে পারব না।" কত লোক তাহাকে বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু সে কিছুতে বুঝিল না। ঝাড়া দু'ঘণ্টা চক্ষের জলে আঁচল ভাসাইল। শেষে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া চুপ করিল। তখন আবার সে চারু আর সুকুর সহিত খেলা করিতে লাগিল।

শুধু এই জ্বালা নয়। ফুলশয্যার রাত্রে যখন তাহাকে সকলে মিলিয়া ঘরে রাখিয়া আসিল, তখন কিরণ মহা বিপদে পড়িল। যাহাকে শুভদৃষ্টির সময় ছাড়া পূর্ব্বে কখন দেখে নাই, তাহার পাশে শুইতে হইবে। হয় ত স্বামী তাহার সহিত কথা কহিবে, তখন সে কি উত্তর দিবে? ঘরের বাহিরে মেয়েরা আড়ি পাতিবে, দোর-জানালায় ফাটাফুটো থাকিলে সেইখান দিয়া দেখিবে। সে বিছানায় উঠিয়া বিছানার একপাশে মড়ার মত চুপ করিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া রহিল। সুরেশচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। দেখিলেন, কিরণ মাথায় কাপড় জড়াইয়া পা গুটাইয়া আড়ষ্ট হইয়া আছে। তিনি একটু হাসিয়া কহিলেন, "এখন অমন করিয়া রহিলে কেন? ঘরে আর ত কেহ নাই, এখন ঘোমটা খুলে ভাল ক'রে শোও না।"

এই শুনিয়া কিরণ মাথার কাপড় আর খানিকটা টানিয়া দিল। কাপড় টানিতে হাতের চুড়ি-

বাজার শব্দ হইল। সেই সঙ্গে ঘরের বাহিরে ঠন্ করিয়া মোটা মলের শব্দ আর ফিস্ ফিস্ করিয়া চুপি চুপি কথা শোনা গেল। সুরেশচন্দ্র বুঝিলেন যে, স্ত্রীলোকেরা আড়ি পাতিয়াছে। তিনি লজ্জিত হইয়া নীরব হইলেন। দুই জনে বিছানার দুই-ধারে শয়ন করিয়া রহিলেন। সমস্ত রাত্রি এক পাশে শয়ন করিয়া কিরণের পাঁজরায় ব্যথা ধরিল।

ফুলশয্যার রাত্রি এইরূপে কাটিয়া গেল।

পরদিবস কাক না ডাকিতে কিরণ আস্তে আস্তে উঠিয়া দরজা খুলিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। প্রভাত হইলে যুবতীরা তাহাকে ধরিয়া বসিলেন, কাল রাত্রে কি কথা হইয়াছিল, বলিতে হইবে। "তুই ভাই বড় সেয়ানা। যতক্ষণ আমরা আড়ি পাতিয়াছিলাম, ততক্ষণ একটা কথাও কহিস নি। তোমার বর তোমায় কি বল্লে, বল না ভাই।" এক জন ছোট ননদ কহিলেন, "কাল রাত্রে দাদা তোমায় কি বলেছিল, আমায় বল্'বে না ভাই? এই বুঝি তোমার ভাব। আচ্ছা ভাই।"

কিরণ আগে চুপ করিয়া রহিল, শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর বলিল, "না, কোন্ কথা হয় নি।"

তবু নিবৃত্তি হইল না। ছোট ছোট দুষ্ট ননদেরা কিরণকে একটা ঘরের ভিতর পুরিয়া সুরেশকে ডাকিয়া বলিল, "দাদা! একবার এই দিকে শুনিয়া যাও ত।" সুরেশচন্দ্র আসিলে তাহারা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিরণ লজ্জায় লুকাইবার ঠাঁই পায় না। সুরেশচন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন। হয় ত মেয়েরা পান সাজিতেছে, কিরণ সেইখানে বসিয়া আছে, এমন সময় সুরেশ বাড়ীতে আসিয়া বলিলেন, "চারু, আমায় একটা পান দিয়ে যা ত!" চারুবালা কহিল, "আমরা এই পান সাজচি, এই-খান থেকে নিয়ে যাও না।" এই কথা শুনিয়া কিরণ উঠিয়া পলাইতে যায়, সুকুমারী অমনি তাহার কাপড় চাপিয়া ধরিল। সুরেশ আসিলে কহিল, "দেখ, এ কে।" সুরেশচন্দ্র তাহাকে এক ধমক দিয়া পান লইয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রি আসিলে কিরণ ভাবে, কখন্ রাত পোহাইবে। সুরেশ সেই একদিন একটা কথা কহিয়া লজ্জায় আর কথা কহিতে পারিতেন না। ফুলশয্যার রাত্রি দুই জনেরই পক্ষে প্রায় কণ্টকশয্যা হইয়াছিল। কিরণ রোজ রোজ দিন গণে। ভাবে, আট দিন কোন রকমে কাটিলে বাঁচি, তা হ'লে আবার মা'র কাছে যাই। বিবাহের পর আট দিন শ্বশুরবাড়ী থাকা পদ্ধতিটা তাহার বড় মন্দ বোধ হইত। এক একবার ভাবিত, আমাদের বুঝি চিরদিনই এমনই যাইবে। চিরদিনই বুঝি দুই জনে পাশাপাশি শুইয়া থাকিব, কেহ কখন কথা কহিবে না। কিরণ ত কখন কথা কহিতে পারিবে না। এ লজ্জা কেমন করিয়া ভাঙ্গিবে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—*—

রথের সময়।

আষাঢ় মাসে রথের মহা ধুম। ধুমধামই বা কি, তেমন বড় বড় রথও আর দেখা যায় না, তেমন দলে দলে জগন্নাথযাত্রীও আর চলে না। সে স্রোতে ধীরে ধীরে ভাটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। স্নানযাত্রার উপলক্ষে বুড়া বুড়ী, যুবা যুবতী এখন আর তেমন দলে দলে জগন্নাথের প্রসাদের আশা', আর সমুদ্রে ডুব দিবার আশায় ঘরবাড়ী ছাড়িয়া যায় না। সেথোদের আর তেমন হাঁকডাক নাই। এখন কাছি ছিঁড়িয়া রথের চাকায় পড়িয়া তেমন গড়া গড়া লোক মারা পড়ে না। ইংরাজের রাজ্যে সে সব উঠিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী মরিতে চাহে না, মরিতে জানে না, মরণের নাম শুনিলে কাঁদিয়া ফেলে। তবু রথের চাকার তলায় পড়িয়া অনায়াসে মরিত। বাঙ্গালীর সে সাহসটুকু বরাবর আছে। ধূলায় পড়িয়া থাকিতে, চক্রতলে দলিত হইতে বাঙ্গালী ভয় করে না। সে চক্র বিশ্বম্ভরের রথেই হউক, আর মুসলমানেরই হউক, অথবা সাগর-পারপ্রবাসী ইংরাজেরই হউক, বাঙ্গালীর পক্ষে সব সমান।

এখন সে সব কিছু নাই, কিন্তু অন্য রকম উৎসবাদি আছে। মাহেশে আজও বিস্তর যাত্রী সমবেত হয়। ভাগীরথীর পবিত্র বক্ষে নানা বর্ণের নিশান উড়াইয়া অগণিত বজরা, বোট, ক্ষুদ্র ষ্টীমার প্রভৃতি ভাসিয়া বেড়ায়। অধিকাংশ বোটের ভিতরে, বাহিরে, ছাদে, বারাঙ্গনা, ব্রাণ্ডি, আর বাবুর দল। রথের দিনে, এত বড় ধর্ম্মোৎসবের দিনে সহস্র লোকের সমক্ষে গঙ্গাজল প্রতিবৎসর

এইরূপে কলুষিত হয়। হায়, এমন করিয়া আর কত দিন যাইবে?

'ধান ভানিতে শিবের গীত' গাইতেছি বলিয়া তুমি রাগ করিবে। তা থাক্, আমাদের শিবের গীতে কাজ নাই। কলিকাতা সহরে রথের তেমন কিছুই ঘটা হয় না, কেবল রাস্তায় রাস্তায়, চৌমাথায়, তেমাথায়, কচি কচি তালপাতার ভেঁপুর বাজার বসে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সেই ভেঁপু কিনিয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া সহর গুলজার করিয়া তোলে। তাহার পর পনর দিন পর্য্যন্ত কানে তালা ধরিয়া থাকে।

আমাদের কিরণের বয়স দশ বছর। দশ বছরে আজকাল মেয়েরা বেশ গিন্নীবান্নী হয়, এমন আমি অনেক দেখিয়াছি। আমি জানি, সে দিন দশ বছরের একটি মেয়ে, বিবাহ সম্বন্ধ হইতেছে শুনিয়া, আপনার পুতুলের বাক্স হইতে সব পুতুল বাহির করিয়া বিলাইয়া দিল, ছুটাছুটী খেলাধূলা সব ছাড়িয়া দিয়া, দুটি তিনটি চাবি একটি রিংয়ে পরাইয়া, আঁচলে বাঁধিয়া বেশ শান্তশিষ্টের মত ঘর-বাহির করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে আঁচলের মুড়ো কাঁধের উপর ফেলিয়া মাটীর দিকে চোখ নীচু করিয়া বলে, "আমার যে বিয়ে হবে।" কেবল ঘোমটাটি বাকী রহিল। সেটি ত বিবাহ না হইলে দেওয়া যায় না।

কিন্তু আমাদের কিরণ তেমন নয়। সে শ্বশুরবাড়ী আট দিন চুপ করিয়া ছিল বটে, কিন্তু সে একটু ছট্‌ফটে। খেলাধূলা করিতে কিছু ভালবাসে। ছুটাছুটী করিলে কিছু ভাল থাকে। বিয়ের আগে সে বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত। সম্বন্ধ ঠিক হইলে সেখানে যাওয়া বন্ধ হইল। কিরণের মা বেশ লেখাপড়া জানিতেন। কিরণ তাঁহার কাছে পড়িত, অবশিষ্ট সময় খেলা করিয়া বেড়াইত। ঝগড়াঝাটি দেখিলে সে দিকে যাইত না। কিরণ একটু চঞ্চল বলিয়া কিছু অপরিষ্কার। মা চুল বাঁধিয়া দিলে আবার উস্কোখুস্কো হইয়া চুল বাতাসে উড়িত। মা কিছু বলিতেন না, কেবল হাসিতেন। কিরণের ঠাকুরমা বড় বিরক্ত হইয়া সর্ব্বদাই খিট্‌খিট্ করিতেন। কিরণের চুল দেখিলেই তিনি বলিতেন, "মাথায় যেন কাকের বাসা হয়ে রয়েচে তোর বিয়ে-থাওয়া হ'ল, এখনও তুই অমন নোংরা কেন লা? এমন ধারা দেখলে তোর বর তোকে কখন ভালবাসবে না।" কিরণ হাসিয়া পলাইত। কিরণের ঠাকুরমা'র ঐ একটা কেমন রোগ ছিল। সুন্দরীরা আজকাল খোঁপা বাঁধিয়া সম্মুখের চুল আলবার্ট ফ্যাশনে ফুলাইয়া রাখেন। কিরণের পিতামহী সে চুল দেখিয়াও 'কাকের বাসা' বলিতেন। কাজেই যুবতীরা মনে মনে রাগ করিতেন, বলিতেন, বুড়ীকে বাহাত্তুরে ধরেচে।

কিরণের কথা হইতেছিল। সোজা রথের দিন বিকালবেলা কিরণ ভেঁপু হাতে করিয়া সদর দরজায় দাঁড়াইয়া ভোঁ ভোঁ করিয়া বাজাইতেছে। কাপড়খানা ময়লা, গায়ে ময়লা, পায়ে চারগাছা মল। বাড়ীর সম্মুখেই ফুটপাথের উপর বারান্দা বাহির করা। সেই বারান্দায় কিরণের একটি পঞ্চমবর্ষীয় ভ্রাতা ভেঁপুহস্তে দণ্ডায়মান। কিরণ নীচে হইতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। একটা বিমাণী কাঁধে ঝুলিতেছে, সুমুখের চুলগুলা 'কাকের বাসার' মত। বারান্দা হইতে গোপালচন্দ্র বলিতেছেন,--

"বল দিদ, তোল ভেপুটা কেমন বাজে, একবার বাজা ত।"

কিরণের পর আর একটি ভগিনী, এ জন্য কিরণ বড় দিদি। গোপালচন্দ্র সর্ব্বকনিষ্ঠ আর বড় আদুরে, এজন্য তিনি 'ড়' উচ্চারণে সমর্থ হইয়াও 'ল' বলিতেন।

কিরণ উত্তর করিতেছে, "আমার ভেঁপু কেমন বাজে দেখবি?—ভোঁ-ও-ও-ও-ও-ও। এইবার তুই বাজা দেখি।"

গোপালচন্দ্র খুব গাল ফুলাইয়া ধরিলেন, কিন্তু ভেঁপু ভাল বাজিল না, একবার পোঁ করিয়াই থামিয়া গেল। গোপালচন্দ্র কিছু বিষণ্ণ হইলেন। কহিলেন,—

"তোর ভেঁপু আমাকে দিবি ভাই?"

এমন সময় মস্ মস্ করিয়া রাস্তায় জুতার শব্দ হইল। কিরণ ফিরিয়া দেখিল,—ও মা, কি হবে! অমনি মাটীতে ভেঁপু ফেলিয়া দিয়া কিরণ ছুটিল। ছুট্, ছুট্, ঝম্‌ঝম্ করিয়া একেবারে বাড়ীর ভিতরে উপস্থিত। ঠাকুরমা হরিনামের মালা হাতে

দাঁড়াইয়াছিলেন। কিরণকে দেখিয়া কহিলেন, "ঘোড়ার মত ছুট্‌চিস কেন লা? মেয়ের দিন দিন আরও ধিঙ্গীপদ হচ্চে।"

কিরণের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরণ, কি হয়েচে?"

কিরণ বলিল, "না মা, কিছু হয়নি!"

দেখিতে দেখিতে শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র গজেন্দ্র-গমনে সেই দিকে আগমন করিলেন। তিনি কিরণকে দেখিয়া এক চোট খুব হাসিলেন। তাহার পর ডান হাতের ভেঁপু বাম হস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে মাতার অঞ্চল ধরিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "মা, আজ বলদিদির বর বলদিদিকে দেখে ফেলেচে!"

পিতামহী কহিলেন, "সেই জন্যই বুঝি ছুটে এসেছে! হাঁলা, তোর কি এতটুকু আক্কেল নেই? এখন আবার বাহিরে গিয়েছিলি কেন?"

কিরণ আবার ছুটিয়া পলায়ন করিল।

রথের তত্ত্ব করা যেমন নিয়ম আছে, সুরেশ-চন্দ্রকে সেইরূপ তত্ত্ব করা হইয়াছিল। জামাইকে সেই সঙ্গে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। জামাইবাবু দোতালার বৈঠকখানায় বসিলে পর অন্তঃপুরে সংবাদ গেল, জামাইবাবু আসিয়াছেন। নববর্ষীয় এক শ্যালক আসিয়া জামাইবাবুকে বিদ্রূপ আরম্ভ করিলেন। ঠাট্টা-তামাসায় সুরেশচন্দ্র খুব মজবুত, অতএব শ্যালক পরাজয় মানিয়া, তামাসা ছাড়িয়া দিয়া স্কুলের ছাত্রদিগের, মাষ্টারের, মিত্রবাগানের বড় বড় নিচুফলের গল্প করিতে লাগিলেন।

বাড়ীর ভিতরে কিরণকে লইয়া মহা গোল আরম্ভ হইল। খুড়ী, পিসী, পাড়ার দু এক জন যুবতী তাহাকে সাবান মাখাইয়া সাজাইতে গুজা-ইতে আরম্ভ করিলেন। কিরণের মা'র মুখখানি হাসিতে ভরা, হাজার গোলযোগে সে হাসি এক মুহূর্ত্তের জন্য মিলাইত না, একবার সে নির্ম্মল ললাট কুঞ্চিত হইত না। কখন কেহ তাঁহাকে রাগিতে দেখে নাই। তাঁহাকে শান্তির জীবন্ত প্রতিমা বলিয়া বোধ হইত। তিনি যেখানে থাকেন, তাঁহার চারিদিকে যেন সব শান্ত ভাব ধারণ করে। গোলমাল দেখিয়া কিরণের মা সেই-খানে আসিয়া কিরণের চুল বাঁধিয়া দিলেন। গোল থামিয়া গেল। তাহার পর কিরণের মা কিরণকে একখানি ভাল কাপড় পরাইয়া তাহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "আজ আর হুড়াহুড়ি করো না, লক্ষ্মী মা আমার।"

কিরণ এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যা হইলে পাঁচ জন যুবতী মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন, জামাইকে ঠকাইতে হইবে। কেহ বলিলেন, "লুচির মধ্যে ন্যাকড়া দাও।" আর এক জন বলিলেন, "কাঁইবীচির শাঁসের সন্দেশ কর।" কোন সুন্দরী বলিলেন, "পানবাটায় আর-সুলা পুরে দাও।" "জলে নুন গুলে দাও," এই রকম অনেক উপায় আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। কিরণের মা তাহা শুনিয়া বলিলেন, "না, তা হবে না। ও সব ছাই ঠাট্টা এখন উঠে গিয়েচে। আমার জামাই যেমন, ছেলেও তেমন। খাবার-সামগ্রী নিয়ে আবার ঠাট্টা কি? ছি!"

রাত্রিকালে বিচিত্র পালঙ্ক-শয্যায় জামাইবাবু শয়ন করিলেন। কিরণ আগেই শয্যার এক ধারে শয়ন করিয়াছিল।

নবীন দম্পতিতে কিরূপ আলাপ, কেমন কথা-বার্ত্তা হয়, তাহা সকলেরই জানিতে ইচ্ছা হয়। সেই জন্যই স্ত্রীলোকেরা আড়ি পাতে। ছোট বর আর ছোট কনে কেমন করিয়া খেলাঘরের ছেলে-মানুষের মত কথা কয়, পুতুলের মত শুইয়া থাকে, সেইটে দেখিতে যুবতীদের বড় সাধ। সুরেশচন্দ্র তেমন ছেলেমানুষ না হউক, নূতন বর ত বটে। এ দম্পতীর কেমন কথাবার্ত্তা হইল, তাহা শুনিতে হইবে।

সত্য কথা বলিতে কি, বিবাহের পর এ দুই জনের একটাও কথা হয় নাই। সুরেশচন্দ্রের দুই চারিবার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, জামাইষষ্ঠীর সময় পীড়াপীড়ি করিয়া তাঁহাকে শ্বশুরালয়ে দুই দিন ধরিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু কিরণের এ পর্য্যন্ত স্বামীর সাক্ষাতে মুখ ফোটে নাই। এক দিন কিরণ মনে করিয়াছিল, আজ কথা কহিব, কিন্তু সে দিন কোন-মতে মুখ ফুটিতে পারিল না। যতবার মনে করে কথা কহিব, ততবার ঠোঁট জিব কে যেন চাপিয়া ধরে। হতাশ হইয়া কিরণ কথা কহিবার আশা ছাড়িয়া দিল। ভাবিল, আমি কোন কালে কথা কহিতে পারিব না। আমার দিন দিন আরও

লজ্জা করে। সুরেশচন্দ্রও কিছু লাজুক, দুই একবার চেষ্টা করিয়া যখন দেখিলেন, কিরণ কথা কয় না, তখন তিনিও সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। লজ্জার বাঁধ দিন দিন শক্ত হইয়া উঠিল।

এ রাত্রে সুরেশচন্দ্র মনে মনে হাসিয়া শয্যা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া পালঙ্কে উঠিয়া কিরণের মস্তকের নিকট বসিয়া কহিলেন, "দেখ দেখি, এটা কি?"

কিরণ মাথার উপর বিছানার চাদর টানিয়া দিল।

সুরেশচন্দ্র বস্ত্রমধ্য হইতে একটা কি বাহির করিয়া কহিলেন, "তুমি দেখবে না, আচ্ছা, তবে আমি বাজাই। কেউ জিজ্ঞাসা করিলে বলিব যে, তুমি বাজাইয়াছ।"

কিরণ মহা ভয় পাইয়া একবার চাদরখানা একটুখানি সরাইয়া দেখিল,—সর্ব্বনাশ! সুরেশ-চন্দ্রের হাতে সেই ভেপুটা রহিয়াছে! অমনি পলকের মধ্যে সুরেশচন্দ্রের হাত হইতে সেটা ছিনিয়া লইয়া, মোচড়াইয়া ছিঁড়িয়া, পালঙ্কতলে নিক্ষেপ করিল। তাহাতেও মন উঠিল না। তখন শয্যা হইতে উঠিয়া, দলিত তালপত্র তুলিয়া লইয়া, জানালা গলাইয়া নীচে ফেলিয়া দিল। রাগে, লজ্জায় অধীর হইয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া সুরেশচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া কহিল,—

"যাও তুমি। তুমি ভারি দুষ্ট।"

বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল।

সুরেশচন্দ্রও তাহাই চান। এত দিনে লজ্জার কুঁড়ি ফুটিয়া উঠিল।

তার পর কত কথা হইল, তা আমি বলিব না! তোমারও ভাল লাগিবে না। কিরণ ছেলেমানুষ, সেই একরাত্রেই স্বামীর সাক্ষাতে সব কথা বলিয়া ফেলিল। এক একবার কেমন বাধ-বাধ বোধ হইতে লাগিল, আবার কথায় কথায় তাহা ভুলিয়া গেল। সে সব কথা কেবল সেই দুই জনের ভাল লাগে। তোমার আমার ভাল লাগিবে কেন? সে ঠাকুরমার কথা, মা'র কথা, খুকীর কথা, স্কুলের মেয়ের কথা, ঠাকুরমা বলেন,—বাড়ীর কানাচে রাত্রের বেলা কে সাদা কাপড় পরিয়া বেড়ায়,—তাহার কথা, দত্তদের বাড়ী কেমন একটি ময়না আছে, সেটি যাহাকে দেখে, তাহাকেই বলে, দুষ্ট কে?—তাহার কথা, যুঁইফুলের বরের কথা, মুখুয্যেদের কনের কথা, এইরূপ আরও কত শত কথা হইল, সে সব আর কাহারও তেমন ভাল লাগিবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অনেক রকম।

স্বামী স্ত্রীর ভালবাসা বাঙ্গালীর ঘরে যেমন, এমন আর কোথাও হয় কি? বালক আর বালিকা, দুই জনের হৃদয় কেমন একটু একটু করিয়া পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়! হঠাৎ চক্ষু মিলন হইলেই দু'জনেই মহালজ্জায় পড়ে। দুয়ারের আড়ালে, থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া বালিকা স্ত্রী, বালক স্বামীর দিকে চাহিয়া থাকে। জানালার একটি পাখি তুলিয়া একদৃষ্টে সতৃষ্ণনয়নে স্বামীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করে। আবার পশ্চাতে স্বামীর পদশব্দ শুনিলে লজ্জিত হইয়া পলাইয়া যায়। সেইটুকু মেয়ের কোথা হইতে এত লজ্জা আসে, কেন যে এত লজ্জা, তা জানি না। মনে মনে দু'জনে কত কি ভাবে, তাহারাই জানে। একবার করে নিদ্রিতাবস্থায় করে করস্পর্শ হইয়াছিল দু'জনে তাহাই মনে করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আর এক দিন কেশে কেশে মিশিয়াছিল, কপোলে উষ্ণ নিশ্বাস লাগিয়াছিল, কেবল তাহাই মনে পড়ে। আর এক দিন নিদ্রাভঙ্গের পর চারিচক্ষে মিলন হইয়াছিল। সে লজ্জার কথা মনে করিলেই কপোল রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। সখীদিগের সঙ্গে খেলার মধ্যে সেই অনিন্দিত মুখখানি মনে পড়ে। কানের কাছে রাজ্যের লোকে দিবানিশি বলিতেছে, তোর বরের মুখ তেমন ধারাল নয়। চোখ দুটি ছোট ছোট, নাক একটু চাপা, ঠোঁট পুরু। বালিকা ভাবিয়া দেখে, কোথাও দোষ দেখিতে পায় না। সব সুন্দর; যতই সে মুখ আর সে মূর্ত্তি মানসচক্ষে দেখে, ততই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বোধ

হয়। পৃথিবীর যত রূপ, সব যেন স্বামীর শরীরে। আর সে স্বামী বই পড়িতে গিয়া কেবল সেই মুখখানি দেখিতে পায়। পাতায় পাতায় যেন সেই মুখের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পায়। শয়ন করিয়া ভাবে, সে তাহার পাশে শুইয়া আছে। ভাবে, তেমন রূপ ত্রিজগতে আর নাই। সেই রূপের ছবি ভাবিতে সে আর কোথাও রূপ দেখিতে পায় না।

কিরণের দিন দিন কত নূতন নূতন সুখদুঃখ হইতে আরম্ভ হইল, তাহা গণিয়া উঠিতে পারা যায় না। সমবয়সী মেয়েরা কেবল শ্বশুরবাড়ীর নিজের নিজের বরের, আর কিরণের বরের গল্প করে। যে দিন সুরেশচন্দ্র শ্বশুরালয়ে যান, সে দিন কিরণের মহা বিপদ উপস্থিত হয়। সমবয়সীরা মিলিয়া তাহাকে জ্বালাপালা করিয়া তোলে। সুরেশচন্দ্র আসিয়াছেন শুনিলেই তাহার বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া ওঠে। ঠাকুর-দেবতাদের মানায়, না এলেই ভাল। তাহা হইলে কেহ তাহাকে এমন করিয়া বিরক্ত করে না। আবার ভাবে, আজ রাত্রে কি বলিব, কি বলিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিব? এই ভাবিতে সেই মুখখানি, সে মুখের কথাগুলি মনে পড়ে, আর— আর কি মনে পড়ে? আর ত কেহ নাই, কিরণের এত লজ্জা কেন? কেবল মনে করিতেছে,—মনে করিতে মুখ লাল হইয়া উঠিল—মনে করিতেছে, তিনি আগে কথা কহিবেন, না আমার মুখচুম্বন করিবেন? আগে কথা, না আগে চুম্বন? যদি আগে কথা না কন, তাহা হইলে কিরণ যাহা মনে করিয়াছে, তাহা আর কিছুই বলিতে পারিবে না। শেষ কিরণ রাগ করিয়া ভাবিত, "মানুষের বিয়ে হয়, তাই জানি, আবার এ আসাযাওয়া কেন? তিনি কেন সেখানে থাকুন না, আমি মা'র কাছে থাকি।" অমনি সেই মুখ, আর সেই মুখের কথা, আর সেই মধুর দৃষ্টি, এক একটি করিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলিত।

এখন কিরণ দিন দিন ডাগর হইয়া উঠিতেছে। বিয়ের জল পড়িলে মেয়েরা দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠে। যাহাকে এক বৎসর পূর্ব্বে কোলে করিয়াছ, এখন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে লজ্জা করে। কিরণের কাজে কাজেই বাহির-বাড়ীতে যাওয়া হয় না। কালে ভদ্রে কখন পূজার দালানে বাহির হইয়া একবার উঁকি মারিয়াই আবার বাড়ীর ভিতরে ছুটিয়া পলায়। কখন কখন ঝিকে সঙ্গে করিয়া দালানের থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া ফেরিওয়ালার জিনিসপত্র দেখিয়া পছন্দ করে। সাবানটা, চিরুণীটা, হ'ল একটা খোঁপার জাল, এক গজ মাথার ফিতা, কাঁটা, হয় ত দুটি কাচের পুতুল কিনিল। এক দিন ধরিল, বড় বড় বিলাতী মুক্তার এক ছড়া মালা কিনিবে। ফেরিওয়ালা চাচা দেখিলেন, সুবিধা মন্দ নয়। এমন দাঁও কদাচ মেলে। তিনি হাঁকিলেন, এক টাকার এক পয়সাও কম হইবে না।

ঝি বলিল, "মর্ মিন্সে! বাঙ্গাল পেলি না কি? অমন এক ছড়া মালা ছ'গণ্ডা পয়সা ফেল্লে যেখানে সেখানে মেলে।"

চাচা রাগিয়া বলিল, "দাম জান না, দর কর কেন? ছ' গণ্ডায় এমন মালা পাওয়া যায় ত আমি দুশো ছড়া এখনি কিনি।"

ঝি বলিল, "ও কথা সবাই বলে। যা, তোর মালা চাইনে। এক ছড়া বিলিতি মুক্তার মালা বই ত নয়, দিদিমণি, আমায় তুমি পয়সা দিও, আমি আজই তোমায় কিনে এনে দেব এখন।"

এবার চাচা কিরণকে ধরিল। কহিল, "দেখ দিদিমণি, এমন মালা যদি তোমার ঝি আন্‌তে পারে ত আমি যত বলি, সব মিথ্যা। এমন জিনিসের এখন আর আমদানী নেই। আমার কাছে বিশ ছড়া ছিল, তার উনিশ ছড়া বেচেছি, আর এই এক ছড়া আছে। তা না নেও ত আমি যাই। এখনি আর এক বাড়ীতে নেবে এখন।"

কিরণ কহিল, "না, তুমি যেও না। আমি ঐ মালা ছড়াটা নেব। তুমি ঠিক দাম বল।"

ঝি রাগিয়া বলিল, "দরওয়ানকে বলি, মিন্সেরে তাড়াইয়া দিতে! ছেলেমানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নিচ্চে। আ গেল যা দেড়ে মিন্সে!"

চাচা দাসীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, "তা দিদিমণি, তোমার যখন এত ইচ্ছে, তখন আমি কেনা দামেই তোমাকে মালাছড়া ছাড়িয়া দিব। দেখ দশ আনা দিও। আমার এক পয়সাও লাভ হবে না। তা হোক, তুমি ছেলেমানুষ, তুমি নাও। কোন্ পাজি তোমায় ঠকাচ্চে। যে মিথ্যা বলে, সে হারাম খায়।"

কিরণ 'পাজি' কথাটা বুঝিল, 'হারাম' বুঝিতে পারিল না। ভাবিল. একটা ভারি দিব্য হবে।

চাচা হারছড়া কিরণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল। কিরণ হাত বাড়াইয়া মালা লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর ভিতর ছুটিয়া গেল। দাসী বকিতে বকিতে তাহার পিছনে পিছনে চলিল।

কিরণ মাকে মালাছড়া দেখাইয়া কহিল, "মা, আমি এইটে নেব।"

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দাম বলে?"

কিরণ। দশ আনা। তার কম সে দেবে না! সে কত দিব্য কর্‌লে।

মা। দশ আনায় যে ভারি ঠকা হবে, মা।

কিরণ। তা হোক্। আমি ওটা নেব। তুমি মা, তাকে ফিরিয়ে দিও না।

মা ভাবিলেন, আর কদিনই বা বাছা আমার কাছে আছে। আহা ওর যদি নিতে এত ইচ্ছে গিয়েচে, ত কিনিয়া দিই। মুখে বলিলেন,—

"এস মা, আমি দাম দিই গে। কিন্তু এমন ক'রে দাম না জেনে আর কিছু সামগ্রী কিনো না। এখন তুমি বড় হচ্চ, এখন থেকে পয়সা-কড়িতে মায়া না হ'লে কি আর এর পর হবে?"

এই বলিয়া দশ আনা পয়সা ঝির হাতে গণিয়া দিলেন।

কিরণ এখন আর বাহির বাড়ীতে যাইতে পায় না, সেইকথা বলিতেছিলাম। সুতরাং কিরণ সন্ধ্যার সময় অপর মেয়েছেলের সঙ্গে ছাদে বেড়ায়। সেই সময় পাড়ার দু চারিটি সমবয়সী আসিয়া জোটে। হয় ত এক দিন কিরণ এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় সংবাদ আসিল, কিরণের বর এয়েচে। অমনি এক জন কিরণের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল, "কিরণ, আয় তোর বরকে দেখবি আয়।"

কিরণ হাত ছাড়াইয়া কহিল, "পোড়া দশা আর কি! আমি কেন দেখতে গেলাম? তোর এত সাধ হয়ে থাকে, তুই দেখ গে যা।"

আর এক জন ধরিল, "কিরণ, তোর বর তোকে ডাকুচে ভাই।"

কিরণ। দূর, তোকে ডাকৃছে। ওই শুনেচিস্, তোর নাম ধ'রে ডাকুচে। যা, যা, ছুটে যা!

যে কিরণের হাত ধরিয়াছিল, সে বলিল, "ওলো, তোর বর যে তোকে উঁকি মেরে দেখচে।'

কিরণ। আমায় বৈ কি! আমি ত আর তোর মত সুন্দরী নই যে, আমাকে দেখবে। যা, তুই এক-বার তোর রূপ দেখিয়ে আয়।

"অত ঠাট্টা কেন? তুই না হয় সুন্দরী আছিস্। তা, বিধাতা ত সবাইকে সমান গড়ে না। তা বলে অমন ক'রে বল্‌তে নেই।"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "রাগিস্ কেন ভাই! আপনার বেলা বুঝি আটিসুটি। আমায় সকলে মিলে পাগল ক'রে তুল্লেন, আর যাই আমি একটি কথা ব'লেচি, অমনি মেয়ের রাগ হ'ল। তা এমনি কলি বটে।"

তখন আর একজন আসিয়া কিরণের কানে কানে বলিলেন, "হ্যাঁ ভাই কিরণ, তুই না কি সে দিন তোর বরের গলা জড়িয়ে ধ'রেছিলি?"

কিরণ ঘোর রোষে তাহাকে এক মর্ম্মান্তিক চিম্‌টি কাটিল। কহিল, "মর্ তুই। যত সব বিট্‌কেল কথা। মরণ তোমার।"

কিরণকে ছাড়িয়া তাহারা জামাইবাবুকে ধরিল। বৈঠকখানায় থাকিলে তেমন সুবিধা হয় না, এজন্য জামাইবাবু আর এক ঘরে নীত হইলেন। সেখানে চারি পাঁচ জন সুন্দরী মিলিয়া তাঁহার উপর বচনবাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সুরেশচন্দ্র সেই খরতর শরজালে আচ্ছন্ন হইলেন। অভিমন্যু সপ্তরথিমধ্যে পড়িলেন।

প্রথম সুন্দরী কহিলেন, "কি গো সুরেশবাবু, ভাল আছ ত?"

দ্বিতীয় কহিলেন, "এখন যে আর বড় একটা এদিকে দেখতে পাইনে। ডুমুরফুলটি হয়েচ না কি?"

তৃতীয়। তুমি না কি বড় সুন্দর ছড়া বাঁধতে পার? একটি ছড়া বল না, শুনি।

চতুর্থ। বলি, কিরণকে তোমার পছন্দ হয় ত?

সুরেশচন্দ্র নির্ভীক-চিত্ত। এইরূপ বিবিধ প্রহরণেও কাতর হইলেন না, স্থির রহিলেন। কহিলেন, "কার কথায় উত্তর দিই?"

প্রথম সুন্দরী। সকলের কথার উত্তর দাও।

সুরেশচন্দ্র। আমার একটি বই দুটি মুখ নয়। তা, সে মুখটিও তোমাদের রূপে আর তোমাদের কথায় বোবা হয়ে যাবার মত হয়েচে। আমি চার কথার উত্তর একেবারে কেমন করিয়া দিব?

প্রথম সুন্দরী। তা না পার্‌লে ত এত ইংরেজী প'ড়ে পাশ ক'রে কি হ'ল? আমরা মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, আমাদের কথার আর উত্তর দিতে পার্‌বে না?

দ্বিতীয়। বাঃ, তবে নাকি জামাই তামাসা জানে না?

তৃতীয়। কিরণের যে বেশ বর হয়েচে। আচ্ছা, বল দেখি, কিরণ কেমন মেয়ে?

চতুর্থ। হ্যাঁগা সুরেশবাবু, তুমি না কি বড় কুঁদুলে?

সুরেশচন্দ্র এতক্ষণ অস্ত্রপ্রহার সহ্য করিতেছিলেন, এইবার তিনি প্রতিপ্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন,—

"তোমরা অনেক কথা বল্লে। এইবার আমার গোটাকতক কথা শোন। আমি জ্যোতিষ শিখিয়াছি। বল ত তোমাদের মনের কথা বলি।"

সকলে সমস্বরে ব'লিয়া উঠিল, "আচ্ছা, বল দেখি।"

সুরেশচন্দ্র প্রথম সুন্দরীকে কহিলেন, "তুমি কাল রাত্রে তোমার বরের সঙ্গে কোঁদল করিয়াছ। সত্য বল।"

সুন্দরী অমনি বলিলেন, "ও কি কথা! অমন কর্‌লে আমি এখানে থাক্‌ব না, আমি তবে উঠে যাই।"

সুরেশচন্দ্র আর একজনকে বলিলেন, "তোমার বর তোমায় এক শিশি অটো-ডি-রোজ কিনে দেবে।"

তিনি বড় ফাঁপরে প'ড়িয়া কহিলেন, "মিথ্যা কথা! আমায় যে দিব্য কর্‌তে বল, আমি কর্‌চি। সব মিথ্যা।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "তাও কি কখন হয়? আমার গণনায় ভুল হইবার যো নাই। তুমি ঠিক বল।"

বেগতিক দেখিয়া সুন্দরীরা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "তবে আমরা যাই। অমনতর কথা বল্লে আমরা এখনি চ'লে যাব।"

সুরেশচন্দ্রেরই জিত। তিনি সহাস্যে কহিলেন, "না, কাহারও যাইবার আবশ্যক নাই। এস, আমরা এখন তামাসা ছেড়ে অন্য কথা কই!"

তখন শান্তি হইল।

আহারাদির পর সুরেশচন্দ্র শয়নাগারে গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

—•—

মেঘ।

সহরের ভিতর থাকিলে স্বভাবের শোভা তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না। বড় বড় বাড়ী, বড় বড় গাড়ী, বড় বড় রাস্তা, এ সব অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। মাঠ, দীঘি, গাছপালা, বন-জঙ্গল দেখা যায় না। সহরের সম্মুখে হরিপাদপদ্মবাহিনী পুণ্যসলিলা গঙ্গা দেবীর বিচিত্র নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নাই। যে স্রোতের মুখে বলদর্পিত ঐরাবত তৃণতুল্য ভাসিয়া গিয়াছিল, সে স্রোত আজ বাঁধা পড়িয়াছে। গঙ্গার বুকের উপর সেতু ভাসিতেছে, কূল ইটের গাঁথনিতে বাঁধা রহিয়াছে। বর্ষায় সময় দুই কূল উদ্বেলিত করিয়া, পাড় ভাঙ্গিয়া, গ্রাম ডুবাইয়া, ঘোর জল তরঙ্গ-রবে রাজধানীর সম্মুখে ছুটিবার সাধ্য নাই। ইংরাজের দ্বারে অগ্নি, বরুণ বাঁধা, কোন্ দিন চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু লৌহশৃঙ্খলে রাজদ্বারে বদ্ধ হইবেন।

কলিকাতার বড়মানুষমাত্রেই সহরের বাহিরে একটি ক'রিয়া বাগানবাড়ী রাখেন। বাগানের শোভা দেখাই যে উদ্দেশ্য, তা নয়। বাগানবাড়ী কেন করে, তাহা সকলেই জানে।

সুরেশচন্দ্রের একটু একটু লেখা অভ্যাস ছিল। এক দিন এই রকম একটা মেঘের বর্ণনা লিখিয়াছিলেন:—

"প্রভাতসূর্য্যের কিরণে সুবর্ণময় মেঘের ছটা, কোথাও মেঘমালা ভেদ করিয়া কিরণকিরীটী দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে একে একে মেঘখণ্ড ভাসিয়া চলিয়াছে। সে স্বর্ণ-জ্যোতি দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে মধ্যাহ্ন হইলে আবার কত রকম চিত্র অঙ্কিত হয়। কৃষ্ণ মেঘখণ্ড, তাহার চতুষ্পার্শে অতি শুভ্র রজত-রেখা। কখনও আকাশ নির্ম্মল, কোথাও কিছু নাই, কেবল অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ শুভ্র মেঘখণ্ড দিশাহারা তরণীর মত ঘুরিতেছে। আবার প্রকাণ্ড তুষারশুভ্র পর্ব্বতচূড়া, হিমালয়ের নীহারমণ্ডিত শৃঙ্গনিচয়কে ব্যঙ্গ করিতেছে। পাংশুমুক্ত খনিজ রজতরাশির তুল্য স্থানে স্থানে রজতের স্তূপ। স্তূপের উপর স্তূপ। কখনও মেঘমধ্যে অতি

ভয়ানক অরুণ-সঙ্কাশ যোগিমূর্ত্তি। মস্তকে ভীষণ জটাজুট, ললাটে ত্রিবলী অঙ্কিত, রক্তবস্ত্র পরিহিত, হস্তে কমণ্ডলু শোভিতেছে। কোথাও তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, কল্লোলিত সমুদ্রতুল্য তরঙ্গায়িত, তরঙ্গ-মুখে শুভ্র ফেণকুসুম ফুটিতেছে। পশ্চিমে অতি মনোহর সৌধশ্রেণী,—দ্বিতল, ত্রিতল, ষষ্ঠতল প্রাসাদরাজি। নানাবর্ণে রঞ্জিত, পত্রমালায় পরিশোভিত। পূর্ব্বদিকে বিশাল বনস্পতি-ভূষিত নিবিড় অরণ্য। শাখা হইতে শাখান্তরে, বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ভয়ঙ্কর অজগর সর্প কুণ্ডলী পাকাইয়া ফিরিতেছে। উত্তরে রজত-প্রাচীর-পরিবৃত অন্ধকার কূপ। কোথাও মেঘনির্ম্মুক্ত শত শত সূর্য্য ঝলসিতেছে। সধূম সপ্তশিখ বহ্নি জিহ্বা বিস্তারপূর্ব্বক আকাশ গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। আবার দেখ, অতি বিশাল মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। তাহাতে বালুকার তরঙ্গ উঠিয়াছে। ঝটিকাবসানে নদীর বালুকাসৈকতে যেরূপ সোপান-চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, কোথাও বা সেইরূপ রহিয়াছে। তরঙ্গ-সোপানের পর সোপান, এইরূপ দীর্ঘ সোপানাবলী বিস্তৃত রহিয়াছে। এ দিকে শুভ্র কুজ্ঝটিকা, অপরদিকে জল পূর্ণ, ধূম্রময় ধীরগতি জলদরাশি। গোধূলিকালে পশ্চিমাকাশে স্বর্ণস্রোত ছুটিতেছে। আর তাহারি নীচে হইতে অন্ধকার বদন ব্যাদান করিয়া নিঃশব্দ-পদক্ষেপে সেই রূপরাশি গ্রাস করিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। চকিতের মধ্যে সব ফুরাইল। কালমেঘে সব ঢাকিল। স্বর্ণরজতবর্ণ, ইন্দ্রচাপধারী মেঘের হাস্যময় মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। সেই মনোহর, নয়নরঞ্জনকারী ইন্দ্রধনু হইতে শর ছুটিল —বিদ্যুৎ! সে ধনুকের টঙ্কার বজ্রনির্ঘোষে হৃদয় কম্পিত করিয়া শব্দিত, প্রতিশব্দিত, পুনঃশব্দিত হইতে লাগিল।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আড়িপাতা—প্রাচীনা ও নবীনা।

আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে, নবীনা ও প্রাচীনা। এই দুই জনকে লইয়া সর্ব্বদা তুলনায় সমালোচন চলিয়া থাকে। নবীনাদের অখ্যাতি এবং প্রাচীনাদের সুখ্যাতি করাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ বিষয়ে আমার বিস্তর আপত্তি আছে। পুরুষে স্ত্রীচরিত্র মীমাংসা করিবার কে? পুরুষ রমণীর কবে কি বুঝিয়াছে যে, তাহার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করে? আর প্রাচীনার সুখ্যাতি করিলে কি লাভ? ঠাকুরুণদিদির ডালনার, অম্বলের সুখ্যাতি কর, তাঁহার তৈয়ারি করা আমের আচারের সুখ্যাতি কর, তিনি বেশ বুঝিতে পারিবেন। অন্য রকম সুখ্যাতি করিয়া দুই দিস্তা কাগজ পুরাইলে তিনি কি বুঝিবেন? তুমি সাদা কাগজের উপর কালো কালো মাথামুণ্ড কি আঁচড় কাট, তাহা কি তিনি কখন পড়িবেন, না বুঝিবেন? আর এখনকার শিক্ষিতা, নভেলপড়া, নবীনার কোন্ সাহসে নিন্দা কর? সে দিন কোন কাগজে নবীনার নিন্দা করিয়াছিল, অমনি এক জন নবীনা এমনি এক উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন যে, নবীন মহাশয়েরা পড়িয়া ব্যতিব্যস্ত হইলেন। বাহিরের গাল খাইয়া কি পেট পূরে না যে, আবার ঘরের লোককে ঘাঁটাইয়া গালি খাও? আমি প্রাণান্তেও কখন নবীনাদের নিন্দা করি না। হয় ত এইমাত্র বলি যে, ঠাকুরুণদিদি মরিলে, সরিষা ফোড়ন দিয়া এমন সুন্দর অম্বল আর এই উপাদেয় মোচার ঘণ্ট কে রাঁধিবে? কোন কোন নবীনা মাছ মাংস খুব ভাল রাঁধিতে শিখিয়াছেন বটে, কিন্তু, হায়, এমন সুক্ত প্রাচীনা ছাড়া আর কে রাঁধিতে জানে?

অন্য দিকে যতই অসাদৃশ্য হউক, আড়ি পাতিতে দুই জনেই সমান। সুরেশচন্দ্র শ্বশুরবাড়ী গেলে, বুড়া যুবতী সকলেই আড়ি পাতিতেন। নবীনা ও প্রাচীনা উভয়েই আড়ি পাতিতে ভালবাসেন; সত্য বলিলে ধর্ম্ম তুষ্ট হন,—বোধ করি, যুবতীরা আড়ি পাতিতে আরও অধিক ভালবাসেন। আড়িপাতাকে কেহই ভাল বলে না, কিন্তু আড়ি পাতিতে কেহ ছাড়ে না। আড়ি-পাতা পদ্ধতি কেমন করিয়া আরম্ভ হইল?

আড়িপাতা বাল্যবিবাহের একটি ফল। আমার বোধ হয়, আড়িপাতা প্রথমে তেমন দোষের ছিল না। প্রেম যেমন স্বার্থপর, এমন আর কেহ নয়। স্বামীতে স্ত্রীতে প্রেম,—আর

কেহ তাহার কিছুই জানিতে পারে না। দু'জনে যা কথাবার্ত্তা কয়, অপর লোকে তার একটা কথাও শুনিতে পায় না। ভালবাসার একটা গুণ আছে, যে দেখে, তারও মনে একটু আহ্লাদ হয়, কিন্তু যুবক-যুবতীর ভালবাসা আর কাহারও চোখ সহিতে পারে না। দু'জনে আপনাকে লইয়া এমনি মজিয়া থাকে যে, তাহারা আর কাহারও দিকে ফিরিয়া চায় না, আর কাহাকেও কাছে আসিতে দেয় না। কিন্তু বালক-বালিকার তা হয় না। তাহারা প্রণয়ের স্বার্থপরতা জানে না, কোমলতা মাত্র জানে। তাহাদের ভালবাসায় অন্য লোকে ভাগ বসাইলে কিছু ক্ষতি হয় না। যাহারা আড়ি পাতে, তাহারা মনে করে, আমরাও এককালে এমনি সরল ছিলাম। বুড়ীরা কত পুরাতন কথা মনে করে, যুবতীরাও নিশ্বাস ফেলিয়া মনে করে যে, আমাদের আর সে দিন নাই। কিন্তু এখন আর তেমন বাড়াবাড়ি হয় না। আড়িপাতাও যত শীঘ্র উঠিয়া যায়, ততই ভাল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—*—

ছল ধরে।

কিরণ বাড়িতে লাগিল। বার বছর উতরাইয়া তেরোয় পড়িল। সুরেশচন্দ্র খুব ঘন ঘন শ্বশুর-বাড়ী আসেন না বটে, কিন্তু প্রেমের আঁটাআঁটি হইতে কতক্ষণ? প্রেমের কল্পতরু পল্লবিত, মুকুলিত, কুসুমিত হইতে লাগিল। বৃক্ষের মূল দুই জনের হৃদয়মধ্যে।

এ দম্পতির প্রণয় যে খুব নূতন রকম হইল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সে সব অর্থহীন আদরের কোটি কোটি কথা, সে অনেকক্ষণ ধরিয়া চোখাচোখি, সে হাতধরাধরি করিয়া মুখ চাওয়াচাহি, সে অভিমান, সে মধুর লাঞ্ছনা, সে সব ঠিক সেই রকম আর কখনও হয় নাই, ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। কিরণ প্রথম প্রথম ভারি গোলে পড়িয়াছিল। পাড়ার সব যুবতীরা মিলিয়া তাহাকে প্রণয়ের পাঠশালায় অনেক শিক্ষা দিয়াছিলেন। "তোর বরের সঙ্গে এমনি করিয়া কথা কহিবি, এমনি করিয়া বরের মন রাখিবি, এমনি করিয়া মান করিবি, আবার একটু, একটু, একটু করিয়া, এমনি করিয়া, এমনি করিয়া সে মান ভাঙ্গিবে।" যদি কিরণ এই শিক্ষামত কাজ করিত, তাহা হইলে আমি বিনা ওজরে স্বীকার করিতাম যে, নূতনতর কিছুই করে নাই। কিন্তু গোড়াগুড়িই বড় বিভ্রাট হইয়াছিল। কিরণ যাহা শিখিয়াছিল, সব উলটপালট গোলমাল হইয়া গেল। শিক্ষার সঙ্গে কিছুই মেলে না। না তেমন কথা কহা হয়, না তেমন মন রাখা হয়, না তেমন অভিমান করা হয়। সব নূতন। কিরণ পাঠাভ্যাস ছাড়িয়া দিয়া আপনি যেমন পারিল, তেমনি ভালবাসিতে শিখিল। কাজেই তাহাদের ভালবাসা বড় নূতন রকম হইল।

কিরণ আর তত চঞ্চল নাই। সংসারের কাজকর্ম্ম করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রায় কোন কাজ ভাল করিয়া করিতে পারে না, না পারিলে হাসিয়া ফেলে। ঠাকুরমা রাগ করিতেন, কখন কিরণকে কখন কিরণের মাকে বকিতেন। কিরণের মা কিরণের কোন অকর্ম্ম দেখিয়া হাসিলে, ঠাকুরমা বলিতেন, "ও কি বউমা, ছেলেপুলেকে অত আদর দেওয়া ভাল নয়। অকর্ম্ম কোর্‌লে কোথায় তুমি শাসাবে, না তুমি আবও হাস্‌চ? কিরণ যদি ছেলে হ'ত, তা হ'লে অ..ন আদর সাজ্‌ত। মেয়ের কি অমন আদর কোর্‌তে আছে? আদুরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে যখন গৃহস্থের কাজ কোর্‌তে পারবে না, তখন নিন্দা হবে কার, তোমার না আমার?" কিন্তু ঠাকুরমা যাই বলুন, কিরণের উপর আমার কিছুতে রাগ হয় না। এমন হাসি হাসি সোনার মুখখানি দেখিয়া কি তার উপর রাগ করা যায় গা? না, যে মেয়ে দুদিন পরে পরের ঘরে যাবে, তাকে মন্দ কথা বলা যায়?

তোমরা কিরণকে সুন্দরী বল আর নাই বল, আমি তাহাকে সুন্দর দেখি। আর সুরেশচন্দ্র যে তাহাকে কত সুন্দর দেখিতেন, তা বলা যায় না। কিরণ আগের চেয়ে শান্ত হইয়াছে। রূপ যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। বেশ থক্‌থকে গড়ন, রং আগের চেয়েও সুন্দর। চোখের চাহনি স্থির, শান্ত, একটুখানি আলস্যমাখা। সুরেশচন্দ্র দেখিয়াছিলেন, চক্ষের তারা কটা নয়।

আমার মনে মনে বড় ইচ্ছা ছিল যে, কিরণের বিদ্যাশিক্ষার ও সূচী-শিল্পের প্রশংসা করিব। কিন্তু কিরণ, অসেয়ানা মেয়ে, আমার সে সাধে বাদ সাধিয়াছে। কিরণ যে বই পড়িতে একেবারে নারাজ, তা নয়। গল্পের বই পাইলে পড়িতে ভালবাসে, কিন্তু আর কোন কেতাব হাতে করিলেই তাহার হাই ওঠে, চোক যেন বুজিয়া আসে। সূচের কাজ চলনসই এক রকম শিখিয়াছিল; কার্পেট, জুতা, গলাবন্ধ বুনিতে পারিত—বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম কাজে তেমন পাকা হইয়া উঠিতে পারে নাই। একবার একখানা ছাঁটা-ফুলের আসন বুনিতে গিয়া, কাঁচি দিয়া পশম কাটিবার সময় বড় হাসাইয়াছিল। দুটা ফুল সমান কাটিতে পারে নাই। একটা উঁচু, একটা নীচু করিয়া ফেলিল,—দেখিলে বোধ হয়, যেন কাকে ঠোকরাইয়া রাখিয়াছে। সে আসনখানা সেই অবধি কিরণ যে কোথায় একটা কাপড়ের সিন্দুকের কোণে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা কেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই।

এক দিন রাত্রে সুরেশচন্দ্র দুই হাতে কিরণের মুখ ধরিয়া, অনেকক্ষণ তাহার মুখ দেখিয়া কহিলেন, "কিরণ, তুমি যে আরও সুন্দর হচ্চ।"

কিরণ কহিল, "যাও, তামাসা কোর‍্তে হবে না," এই বলিয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইল।

একটু পরে সুরেশচন্দ্র ধীরে ধীরে কহিলেন, "কিরণ, আমি কি ভাবি জান?"

কিরণ মুখ তুলিয়া, স্বামীর মুখে চোখ রাখিয়া কহিল, "কি?"

সুরেশচন্দ্র। আমি ভাবি যে, আমার সঙ্গে বিয়ে না হ'লে তুমি সুখে থাকৃতে পারৃতে। আমি কি কখনো তোমায় তেমন আদর-যত্ন কোর‍্তে পারৃবো?"

কিরণ রাগ করিয়া সরিয়া বসিল। বলিল, "কি কথাই শিখেছেন! রাগ ধরে। আমি তোমার ছাই ছাই কথা শুনৃতে চাইনে।"

সুরেশচন্দ্র একটি ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন. "তুমি যদি রাগ কর, তা হ'লে না হয় আর বলব না, আর আমার কাছে আসৃবে না?"

নিশ্বাসটি পড়িল, কিরণ শুনিতে পাইল। দেখিল, স্বামীর মুখে বিষাদের চিন্তা। আর কি রাগ থাকে? কিরণ আস্তে আস্তে স্বামীর কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া, স্বামীর একটি হাত তুলিয়া লইয়া আপনার গালের উপর রাখিল। মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বড় কোমল স্বরে কহিল, "তুমি কি ভাবছ, আমায় বল না।"

কিরণ ত এইটুকু মেয়ে, কিন্তু সে ইহারই মধ্যে স্বামীর দুঃখের ভাগ চায়। যে দুঃখের ভাগী নয়, সে কেন সুখের ভাগী হইতে চায়?

সুরেশচন্দ্র কিরণকে আরও কাছে টানিয়া লইলেন। কহিলেন, "আমি কোন দুঃখের কথা মনে করি নি। আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার এখানে ভাল লাগে, না পাড়াগাঁয়ে ভাল লাগে?

কিরণ স্বামীর মুখে তাড়াতাড়ি হাত দিয়া কহিল, "রক্ষা কর! পাড়াগাঁয়ের আর নাম কোরো না। এইখানে বেশ। পাড়াগাঁয়ে না কি আবার মানুষ থাকে! মাঠের মাঝখানে একলাটি,—মা গো!"

সুরেশচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "মাঠের মাঝখানে ভয় কিসের? এখানে কেবল গলি-ঘুঁজি, ভাল কোরে নিশ্বাস ফেল্‌বার যো নেই। পাড়াগাঁয়ে বেশ ফাঁকা, কোন বালাই নেই। পাড়াগাঁ মন্দ হ'ল কিসে?"

কিরণ। না, বড় ভাল! কেবল চারিদিকে গাছ, আর অন্ধকার, আর শেয়াল। সন্ধ্যের সময় পুকুরে কাপড় কাচতে যাও, পথে কেবল বাঁশঝাড়। ঘোরঘোরের সময় বাড়ী ফিরে আসতে হয় ত একটা বাঁশ নুয়ে ঘাড়ে পড়ল,—সে কথায় কাজ নেইক—মনে কর্‌লে কেমন গা শিউরে উঠে।

সুরেশচন্দ্র। আমি যদি তোমায় পাড়াগাঁয়ে নিয়ে যাই?

কিরণ। তা হ'লে যাব। আর কোন দিন ভূতে ঘাড় মুচড়ে খোবে। তোমার ত তা হ'লে বেশ হয়, আর একটি সুন্দর দেখে বিয়ে করবে।

সুরেশচন্দ্র। আমি বুঝি রাগ কর্‌তে জানিনে? এখন থেকেই বুঝি মন্দ কথা বল্‌তে শিখ্‌চ?

কিরণ হাসিতে লাগিল।

সুরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরণ, তুমি কি ভূত আছে বিশ্বাস কর?"

কিরণ বলিল, "তা করি আর না করি, লোকে ত বলে।"

তার পর খানিকক্ষণ আর কোন কথা হইল না। কিছু পরে সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "বড় গরম বোধ হচ্ছে, জানালার একটা পথি খুলে দাও ত।"

কিরণ ছল ধরিয়া ভাবি হাসিয়া উঠিল। বলিল, "জানালা জানালা কোন্ দেশী কথা? আমাদের কেউ জানালা বলে না।

সুরেশচন্দ্র। তবে কি বলে?

কিরণ। জান্‌লা বলে।

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "তোমাদের দেশী সব কথা জানে, এমন একটি বর তোমার জুটিলে বেশ হইত। আমি একটি খুঁজব না কি?"

কিরণ কোন কথা না বলিয়া দরজা হইতে বাহির হইয়া যায় দেখিয়া, সুরেশচন্দ্র তাহার হাত ধরিলেন। কহিলেন, "আগে ঠাট্টা কর কেন?"

এ রকম যে কতবার হইত, তা আমি অনেক চেষ্টা করিয়াও গণিয়া উঠিতে পারি নাই। কিরণ কথায় কথায় ছল ধরিত। ছল ধরাধরি, রাগারাগির পালা পড়িয়াছিল। খুব ভালবাসা না হইলে ধাঁ করিয়া ছল ধরা যায় না। ছোট ছোট মেয়েগুলি কিছু ছল ধরে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভালবাসার কিছু বেশী ছড়াছড়ি। একটু বড় হইলে আর তত সহজে ছল ধরে না। যে তোমার কথায় ছল ধরে, সে তোমায় ভালবাসে।

নবম পরিচ্ছেদ

—*—

নূতন মানুষ

এই সময় কিরণের একটি নূতন সঙ্গিনী জুটিল। মেয়েটির নাম লীলাবতী। কিরণের বয়স তের বছর, লীলাবতীর সতের। কিন্তু এমন দু চার বছরের ছোট বড় হইলে কিছু আসে যায় না। এই দুই জনে খুব ভাব হইল।

অলৌকিক রূপের বর্ণনা অনেক পড়িতে পাওয়া যায়। সুন্দরী রমণীর এমন ছবি দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনে হয়, এমন রূপ পৃথিবীতে নাই। কিন্তু কোন সময় জীবন্ত এমন রূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, রূপের কল্পিত আদর্শ অপেক্ষা অধিক সুন্দর বোধ হয়। সে রূপ একবার দেখিলে আর ভোলা যায় না। যখন তখন, চলিতে ফিরিতে, সুখের সময়, দুঃখের সময়, কেবল সেই রূপের ছবি মনে পড়ে।

বোধ করি, লীলাবতীর রূপ সেই রকম।

এমন রূপ ত আমি কোথাও দেখি নাই। কিন্তু এ রূপ না দেখিলে আমি ভাল থাকিতাম। রূপ ত আনন্দের জন্য হইয়াছিল, তবে এ রূপ দেখিয়া চক্ষে জল আসে কেন? এমন চন্দনকাঠের পুত্তলীতে কোথায় ঘুণ ধরিয়াছে? এত রূপে এত বড় খুঁৎ কোথায়? এ রূপ ত পূর্ণ নয়, একটা কিছু গুরুতর অভাব আছে। এমন রূপ পূর্ণ নয় কেন?

লীলাবতী বিধবা।

লীলাবতীর বয়স যখন চৌদ্দ বছর, তখন সে বিধবা হয়। এখন তাহার বয়স সতের বছর। সে এই তিন বছর বিধবা হইয়াছে।

দেখ, তোমরা একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখ। সে দিন সে রূপে আলো করিয়া, অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া কত আহ্লাদে বেড়াইত। যখন এক ঘর বড়মানুষের বাড়ী নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিল, তখন তাহার রূপের প্রশংসা কাহারও মুখে ধরে না। যাহারা কোথাও নির্দ্দোষ সুন্দরী দেখিতে পায় না, তাহারা সে রূপে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিল, "ঢের ঢের সুন্দরী দেখেছি বাপু, এমন রূপ কখনও দেখিনি।" কেহ বলিয়াছিল, "ইটি কাদের বউ গা? এত রূপ ত কোথাও দেখি নি! ঠিক যেন ছবিখানি! যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকুরুণ।" সে কথা এখনও লীলার কানে লাগিয়া আছে। এ সব যেন কালিকার কথা। আহা দেখ, দু হাতে দুগাছি বালা পরিত, মাথায় যেখানে চিরুণী দিয়া সীঁতে কাটিয়া সিন্দূর পরিত, সেখানে দু চারগাছি চুল এখনও উঠে নাই। ছোট পা দুখানিতে এখনও মলের কলঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। তিন বছর আগে সে সুন্দরী ছিল, এখন কি আর তেমন সুন্দরী নাই? হাত দুখানি শুধু, তবু যেন কত গহনা পরাইয়া রাখিয়াছে।

এমন হাতে যদি সোনাদানা না উঠিল, এমন অঙ্গে যদি মণি-মুক্তা না উঠিল ত গহনা কেন হইয়াছিল? আহা, লীলা এমন শান্ত মেয়ে, সে কখন কাহাকে ভুলিয়াও মন্দ বলে নাই, ঝি-চাকরদের কখন 'তুমি' বই 'তুই' বলে নাই। কি অপরাধে, কোন্ পাপে, এই বয়সে তাহার কপাল পুড়িল? তাহার কোন সাধ মিটে নাই, কোন আশা পুরে নাই, কোন দুঃখ ঘুচে নাই, তবে সে কেন এই বয়সে চিরবিধবা হইল? বিধাতা কেন তাহাকে এত রূপ দিয়া গড়িল, কেনই বা তাহার ললাটে অনন্ত যন্ত্রণাময় চিরবৈধব্য লিখিল? লীলা অশান্ত নয়, দেখিয়া শুনিয়া, সব মাটী মাড়াইয়া হাঁটে, সে কেন এমন অন্ধকূপে পতিত হইল? সে দিন হাঁটিবার সময় পায়ে ঝম্ ঝম্ করিয়া মল বাজিত, আজও সে এক এক সময় চমকিয়া উঠিয়া ভাবে, আমার পায় মল নাই কেন? অমনি সব মনে পড়ে। আগে সে যেখানে যাইত, পাড়াশুদ্ধ স্ত্রীলোক তাহাকে দেখিতে আসিত, এখন তাহাকে দেখিয়া তাহারা সরিয়া যায়। কেহ একবার আহা বলে, কেহ একটি নিশ্বাস ত্যাগ করে, তাহার পর অন্যদিকে চলিয়া যায়। দু দিন আগে সে যেন চন্দন মাখিয়া বসিয়াছিল, সেই সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া লোক জড় হইত। এখন যেন সে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়াছে, এ জন্য কেহ তাহার নিকটে আসে না। আগে পাড়ায় কোথাও বিবাহ হইলে তাহাকে এয়ো বলিয়া সকলের আগে ডাকিতে আসিত। এখন সধবাদের সঙ্গে থাকিলে লোকে ভাবে, তাহাদের অমঙ্গল হইবে। যে শাশুড়ী বউমা বলিতে অজ্ঞান, তিনি এখন ডাইনী, পোড়াকপালী, সর্ব্বনাশী, আরও কত কথা তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলেন। বল দেখি, লীলার কি অপরাধ? কপালে যাহা ছিল, তাহা ত হইয়াছে, তাহার উপর আবার এ গঞ্জনা কেন? নূতন নূতন একাদশী করিতে যে কি কষ্ট, তাহা বলিবার নয়। সকালবেলা লীলা মুখ না ধুইতে, শাশুড়ী খাবার হাতে দাঁড়াইয়া থাকিতেন—"বউমা, জল খাবে এস।" আর যখন বৈশাখ মাসের রৌদ্রের সময় অনাহারে, পিপাসায় পাগল হইয়া সেই সোনার পুত্তলি মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, তখন কেহ তাহার গায়ে একবার হাত বুলাইয়া দিল না, কেহ একবার সেই ধূলিধূসরিত অশ্রুবিগলিত করুণ মুখখানি আপনার আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিল না। লীলা যখন মাটী হইতে মুখ তুলিয়া ভাঙ্গা-গলায় বলিল, 'আমার প্রাণ যায়। তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেল। এক ফোঁটা জল খেতে না দাও, আমার হাতে একটু জল দাও। ওগো, তোমাদের সকলের পায়ে পড়ি, আমায় বাঁচাও, সে সময় কেহ একবার তাহার ঘরে উঁকি মারিল না। কেবল একটা দাসী তাহার দুঃখে কাতর হইয়া কাছে বসিয়া দুটা সান্ত্বনাবাক্য বলিয়াছিল। তাহার পর নির্জ্জলা একাদশীর কষ্টও ক্রমে সহিয়া গেল। প্রথম প্রথম লীলা লুকাইয়া লুকাইয়া কত কাঁদিত। রাত্রি হইলে তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিত না, চক্ষের জলে কাপড়, বালিস সব ভাসিয়া যাইত, যুবতীরা যেখানে জড় হইয়া চুপি চুপি গান করিত, লীলা সেখানে যাইত না। সে কখনও কাহারও কাছে দুঃখ করিত না। কাহারও কাছে আপনার অদৃষ্টের নিন্দা করিত না। সে যে বড় বুদ্ধিমতী, সে একেবারেই বুঝিল যে, তাহার দুঃখ আর কেহ বুঝিবে না। আর কেহ বুঝিতে পারিবে না, পরের কাছে কাঁদিলে কি হইবে? তাহার দুঃখ এ জন্মে আর ঘুচিবে না। সংসারে যত সুখ আছে, সব সুখের দুয়ারে কাঁটা পড়িয়াছে।

বিধবা হইয়া লীলা শ্বশুরবাড়ীই রহিল। সে আগে ঘরের লক্ষ্মী ছিল, এখন যেন ঘরের অলক্ষ্মী হইয়া উঠিল। সকলে হত-শ্রদ্ধা করে, খোঁটা দেয়, প্রায় দূর-ছাই করে। লীলা কখন এক দিনের তরেও মুখ তুলিয়া একটি কথা বলে নাই। যার সব ফুরাইয়াছে, তার এটুকু অধিক দুঃখে কি হইবে?

লীলার পিতা নাই। মাতা দুঃখিনী। তিনি লোকের মুখে লীলার যন্ত্রণা শুনিতে পাইলেন; লীলা তাঁহাকে নিজে কখন কিছু লিখিত না, চিঠি লিখিলেই লিখিত, ভাল আছি। কন্যার কষ্ট শুনিয়া মা'র প্রাণ স্থির রহিবে কেন? তিনি লীলাকে একবার দেখিবেন বলিয়া আনাইলেন, কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, তাহাকে আর শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবেন না। লীলা মা'র কাছে রহিল।

এইরূপে দুই আড়াই বছর গেল। তাহার পর লীলার মাতার মৃত্যু হইল। লীলার দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। একবার ভাবিল, শ্বশুরবাড়ী সংবাদ পাঠাই। আবার ভাবিল, আমি সেখানে গেলে তাঁহারা ত সন্তুষ্ট হবেন না। লীলা চক্ষের জল মুছিল। মাতার মৃত্যু হইলে সে বড় কাঁদে নাই। দুঃখে দুঃখে তাহার হৃদয় কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। একবার ভাবিল, আমিও কেন মরি না? আবার ভাবিল, আর কি বাকি আছে? খেতে না পাই, ভিক্ষা করব। তা না পাই উপোস করব।

শ্বশুরবাড়ী হইতে লীলাকে লইতে আসিল না। কিরণের মা গ্রাম-সম্পর্কে লীলার মাসী। তিনি সব শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ পাল্কী, বেহারা, ঝি, দরওয়ান পাঠাইয়া দিলেন। লীলার বাপের বাড়ী কলিকাতা হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ পথ। লীলা কলিকাতায় আসিল। কিরণের মা তাহাকে কন্যার অধিক যত্ন করিতে লাগিলেন। মাতার মৃত্যুর পর লীলা আর কাঁদিত না, পিতৃগৃহ শুষ্ক চক্ষে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কিরণের মা'র যত্ন ও স্নেহ দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, "বিধবাকে যে কেউ এমন যত্ন করে, তা আমি আগে জানতাম না।"

লীলাকে দেখিয়া কিরণও একবার কাঁদিয়াছিল। তার পর লীলাকে 'দিদি' বলিয়া ডাকিল, তাহাকে ভালবাসিল। লীলাকে সকলে এত যত্ন করে দেখিয়া, কিরণও তাহাকে সাধ্যমত যত্ন করিত। লীলার কিসে মন ভাল থাকে, কিরণের সেইটা মস্ত ভাবনা। লীলার মন ভাল থাকিবে বিবেচনা করিয়া, সে তাহার কাছে আপনার সুখের কথা বলিত। স্বামীর ভালবাসা, দুই জনের অনুরাগ, স্বামীর সঙ্গে যে সব কথাবার্ত্তা হইত, সব লীলাকে বলিত। যে সব বড় লুকান কথা, বড় ভালবাসার কথা, তাহাও বলিতে আরম্ভ করিল। কিরণের এত বুদ্ধি ছিল না যে, সে সব তলাইয়া ভাবিবে। তাহার কথায় যে লীলার দুঃখ হইতে পারে, কিরণ তাহা কখন মনে করিত না। যে সব কথায় তাহার এত আহ্লাদ হয়, যে সব কথা সে দিন-রাত মনে করে, তাহাতে যে আর কাহারও কিছু দুঃখ হইতে পারে, কিরণ স্বপ্নেও এরূপ মনে করিতে পারিত না। বাস্তবিক কিরণের সুখের কথা শুনিয়া লীলার মন অনেক ভাল থাকিত। কেবল একটা দোষ ঘটিত। কিরণের স্বামীর কথা শুনিয়া লীলার নিজের স্বামীকে মনে পড়িত। যদি সে স্বামী ভাল হইত, তাহা হইলেও তেমন ক্ষতি ছিল না। কি পোড়া কপাল দেখ। তেমন দেব-বাঞ্ছিত স্ত্রীরত্ন পরিত্যাগ করিয়া লীলার স্বামী বার-বিলাসিনীতে আসক্ত হইয়াছিল। লীলা স্বামীকে মনে পড়িলেই, ঘূর্ণিত-রক্তচক্ষু, মুখে দুর্গন্ধ আর অশ্রাব্য কটু গালি, স্খলিতবসন, অস্থিরগতি যুবককে চক্ষের সম্মুখে দেখিত। অত্যাচারে, অনিয়মে, অতিরিক্ত মদ্যপানে তাহার মৃত্যু হয়। কেবল মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তাহার চৈতন্য হইয়াছিল। তখন লীলার সাক্ষাতে কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "তোমার মত স্ত্রীকে আমি এত দিন ফিরিয়া দেখি নাই। এখন এই বয়সে তোমায় পাথারে ভাসাইয়া চলিলাম। আমার নরকেও স্থান হইবে না।" লীলা সব ভুলিয়া গিয়াছিল। স্বামীর পা বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়াছিল, কত ঠাকুর-দেবতাদের মানিয়াছিল। স্বামী যাহাই হউক, গেলে ত আর আসিবে না। কিন্তু যম লীলার মুখ চাহিল না, যাহাকে লইতে আসিয়াছিল, তাহাকে লইয়া গেল। লীলা আর সব ভুলিয়া স্বামীর সেই শেষ কয়টি কথা মনে করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু মনে পড়িলে সুখের কথা যেমন পড়ে, দুঃখের কথা তার চেয়েও বেশী মনে পড়ে।

কিরণ অবুঝ মেয়ে। এক দিন লীলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "তোমার স্বামী কি তোমায় ভাল-বাসতেন?"

লীলা অনেকক্ষণ কিরণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল, "আগে বাসতেন না।"

কিরণ কহিল, "সে কি! তোমার মত সুন্দরী, শান্ত স্ত্রীকে ভালবাসতেন না?"

লীলার চক্ষে জল পুরিয়া আসিতেছিল। বলিল, তিনি শেষাশেষি আমায় ভালবাসতেন, কিন্তু সে ভালবাসা আমার অদৃষ্টে বেশী দিন ছিল না।"

কিরণ লীলার মুখ দেখিতেছিল। সে লীলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "তুমি চক্ষের জল ফেল না দিদি। আমি আর কখন তোমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করব না।"

লীলা চোখ মুছিয়া একটু হাসিল। কহিল, "আমি ত কিছু মনে করি নি। তোমার যখন যা ইচ্ছা হবে, তাই জিজ্ঞাসা কোরো।"

কিরণ সেই অবধি আর কখন লীলার স্বামীর কথা পাড়িত না।

দশম পরিচ্ছেদ

—*—

লীলা।

লীলার বয়স সবে সতের বছর। জীবনের নিগ্রহ আরও কত দিন আছে, কে জানে? মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেমন করিয়া কাটিবে? কেমন করিয়া জীবনের দীর্ঘ রাত্রি পোহাইবে, এ অন্ধকারে কত কাল মরণের পথ চাহিয়া থাকিবে? কাহার মুখ চাহিয়া সে জীবনের ভার বহন করিবে? সবাই মরে, কেবল পোড়া বিধবার মরণ নাই। তাহার বাঁচিয়া কোন সুখ নাই, মরণের কোলে শয়ন করিতে পারিলে তাহার প্রাণ জুড়ায়, কিন্তু যম তাহাকে ছোঁয় না, তাহার ছায়া মাড়ায় না, যে দিবানিশি মরণের পথ চাহিয়া থাকে, তাহার দ্বারে একবার ঘা মারে না। বাড়ীতে কঠিন পীড়া হইয়াছে, বাপ গেল, কার্ত্তিকের মত ভাই, স্বামি-সোহাগিনী ভগিনী, কচি-কাচা সব গেল, শূন্য ঘরে হাহাকার উঠিল, কেবল সেই হতভাগিনী বিধবা মরিল না। বিধবা হইলেই যেন অমর হয়। তাহার বাঁচিয়া কোন সুখ নাই, জীবনের সব বন্ধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু সে যায় না। যাহারা চিরবৈধব্য-বিধি করিয়াছিল, তাহারা কি মরণের সঙ্গেও কিছু পরামর্শ করিয়াছিল? যাহাকে মানুষে ঠেলিয়া রাখে, তাহাকে কি যমও ডাকিয়া লয় না? যাহাকে মানুষে পরিত্যাগ করে, তাহাকে কি যমও পরিত্যাগ করে? আমোদে-আহ্লাদে, কাজে-কর্ম্মে বিধবার কোন অধিকার নাই, তবু তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। অন্য মানুষে অন্য স্ত্রীলোকে যেমন বাঁচিয়া থাকে, তেমনি থাকিতে হইবে, কিন্তু আর সব পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্যের শরীরে যেমন সুখ-দুঃখ আছে, তাহারও তেমনি আছে। কিন্তু মনুষ্যজন্মের কোনও সুখ তাহার কপালে ঘটে না। দেখ, সে ধর্ম্মকর্ম্ম জানে না, মনের দৃঢ়তা জানে না, তপস্যা-সাধনা জানে না, ইন্দ্রিয় দমন করিতে তাহাকে কেহ কখন শিখায় নাই, সংসারের ভোগাভিলাষেই তাহার মন নিরত, এমন সময় তাহার মাথায় বাজ পড়িল। সংসারে থাকিয়া, সংসারের সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যের মধ্যে থাকিয়া, সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া, তাহাকে সংসারের সব সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। সুশীতল জলে কণ্ঠ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত রাখিয়া মাথায় আগুন জ্বালিয়া পুড়িতে হইবে, জ্বালানিবৃত্তির জন্য এক ফোঁটা জলের তরে হাত বাড়াইতে পারিবে না। কাল সে যে পানটি খাইত, আজ সেটি খাইতে নাই; কাল সে কালাপেড়ে বুলু দেওয়া যে কাপড়খানি পরিত, আজ সেটি পড়িতে নাই; কাল সে যেমন হাসিত, আজ তেমন হাসিতে নাই; কাল যে গানটি গাহিত, আজ সেটি গাহিতে নাই; কাল যাহার সঙ্গে কথা কহিলে কেহ মন্দ মনে করিত না, আজ তাহার সহিত কথা কহিলে লোকে কানাকানি করে! কাল সারাদিন ছাদে বেড়াইয়াছিল, কেহ একবার তাহা লক্ষ্য করিয়াও দেখে নাই, আজ তাহার ছাদে উঠিয়া চুল শুকাইতে নাই! কাল সে যেখানে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল, আজ সেখানে যাইতে নাই! কাল যা ছিল, আজ তা কিছু নাই, কিন্তু মানুষ ত সেই। তার মনে যে দুঃখ হইয়াছে, তার উপর আবার এত দুঃখ কেন?

লীলা বড় দুঃখী, তোমরা একবার তার মুখের দিকে তাকাও। দেখ, সে একলাটি জগৎসংসারের একটি কোণে দাঁড়াইয়া আছে। তোমরা একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার জন্য এক ফোঁটা চক্ষের জল মুছিয়া ফেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

—*—

গণেশচন্দ্র দত্ত

কালেজে গণেশচন্দ্র দত্ত নামে সুরেশচন্দ্রের এক বন্ধু ছিলেন। দুই জনে একসঙ্গে পড়িতেন।

গণেশচন্দ্র দেখিতে বড় সুপুরুষ নন, কিন্তু পড়া-শুনায় বেশ মন ছিল। বিষয়-বুদ্ধিতেও পাকা। দুই জনে বড় ভাব। দুই জনের বাড়ীতে আসা-যাওয়া প্রায়ই ছিল।

এবারে পরীক্ষায় সুরেশচন্দ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। গণেশচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি যখন তাঁহার সেই ক্ষুদ্র মূর্ত্তি গাউনে ঢাকিয়া, শামলা পরিয়া, ডিগ্রী আনিতে গিয়াছিলেন, তখন না কি তাঁহাকে খুব মানাইয়াছিল। ডিগ্রী লইয়া, ধড়া-চূড়া ছাড়িয়া, বাঁকা সীতে কাটিয়া, বুকে চাদর বাঁধিয়া, তিনি সুরেশচন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন।

গণেশচন্দ্রের মনে কি ছিল, জানি না। প্রকাশ্যে সুরেশচন্দ্রের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "দেখ, সকলেই সকল বারে পাশ করিতে পারে না।"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "তা ত দেখিতে পাইতেছি।"

গণেশচন্দ্র কহিলেন, "কিন্তু সে জন্য দুঃখিত হওয়া উচিত নয়।"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "সে কথাটাও ঠিক!"

গণেশচন্দ্র কহিলেন, "আবার চেষ্টা করবে না কি?"

সুরেশচন্দ্র। কাজেই।

"আচ্ছা, তবে আমি এখন যাই। আবার দেখা হবে এখন।"

গণেশচন্দ্রের সঙ্গে আমাদেরও আবার দেখা হবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

—*—

ঠাকুরমা।

কিরণের পিতামহী সেকেলে মানুষ, যাট সত্তর বছর বয়স হবে। সেকেলে লোক হইলেই এ কালের লোকের চক্ষে তেমন ভাল দেখায় না। সেকেলে চকমিলান বাড়ী এখনকার নব্য লোকের ভাল লাগে না। এখন নূতন হইতেছে, পুরাতন কিছুই ভাল নয়, কিছুই থাকিবে না। যত কিছু সেকেলে আছে, তাহার মধ্যে সেকেলে বিধবা, সকলের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছে। সেকেলে বৃদ্ধ আর এখনকার শিক্ষিত যুবায় যত না প্রভেদ, সেকেলে বুড়ী আর এখনকার সভ্য যুবতীতে তত প্রভেদ। কোন যুবতী আর এক জন যুবতীর সঙ্গে দেখা হইলে আপনি বলিয়া সম্বোধন করেন, বেশ দস্তুরমত নমস্কার করেন, লেখাপড়া পুস্তকাদির কথাবার্ত্তা হয়, আরও সব সভ্যতানুমোদিত, সুরুচিসম্পন্ন কথাবার্ত্তা হয়। আর এক জন সেকেলে বুড়ী, চেনা নাই, শুনা নাই, একেবারে 'তুমি' বলিয়া হাত ধরিয়া হড়্ হড়্ করিয়া টানিয়া ঘরে বসাইবে। তাহার পর গায়ের গহনা দেখিবে, স্বামীর কত মাহিয়ানা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবে, শাশুড়ী কি করিতেছেন, বাড়ীতে কে রাঁধে, আজ সকালবেলা কি রান্না হইল, এক নিশ্বাসে সব জিজ্ঞাসা করিবে। ইহাতে নবীনারা রাগ না করিবেন কেন?

কিরণের পিতামহীর এ সব দোষগুলি ছিল। নহিলে লোক নেহাত মন্দ নয়। তিনি ছেলেদের জ্বালায় এক একবার ভারি ত্যক্ত হন। গোবিন্দ-প্রসাদ বাবু দলাদলি করিতে এক জন অগ্রগণ্য দলপতি। তাই বলিয়া অখাদ্য বাদ যায় না। রাত্রিকালে জনৈক সদাড়িক সুপকার, বস্ত্রমধ্যে রোষ্ট, কাটলেট্, চপ, কারি প্রভৃতি দেবদুর্লভ উপাদেয় সামগ্রী আনয়ন করিত, চৌধুরী মহাশয় কাঁটা-চামচে ধরিয়া, সেই মহাপ্রসাদ উপভোগ করিতেন। ছুরী-কাঁটা ধরা তেমন ভাল অভ্যস্ত ছিল না, কাঁটাটা প্রায় উল্টাইয়া ধরিতেন, এক একবার কাঁটা-চাম্চে পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ হস্তের পরিচালনা করিতেন। শুনা যায়, একবার উইল্‌সনের হোটেলে গোমাংস পর্য্যন্ত উদরস্থ করিয়াছিলেন। বাড়ীতে সেই ইংরাজ-জগন্নাথ প্রসাদ আসিলে ছোট ছোট ছেলেরা একটু আধটু প্রসাদ পাইত। কিরণের পিতামহী সেই সময় মহা বিপদে পড়িতেন। বলিলে কেহ কথা শোনে না, সকলেই সেই ছাই-ভস্মগুলা খাইত। ঠাকুরমা একমুখ থুথু লইয়া, অন্দরের দরজা-গোড়ায় দুই হাতে কাপড় গুটাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। কিছুক্ষণ পরেই নবীন, শ্যাম, গোপাল, অক্ষয় সকলে ছুটাছুটী করিয়া বাড়ীর

ভিতরে প্রবেশ করিত। হয় ত গোপাল ঠাকুর-মাকে জড়াইয়া ধরিতে আসিত। ঠাকুরমা চেঁচাইতেন, "ওরে দাঁড়া. দাঁড়া, ছুঁস্‌নে, ছুঁস্‌নে, স'রে যা! ওরে ও দিকে যাস্‌নে। আগে ভাল জল দিয়ে মুখহাত ধো, কাপড় ছাড়, গঙ্গাজল পরশ কর্, তার পর ঘরে দোরে য স্।" এই বলিয়া তিনি গঙ্গাজল আনিতে গেলেন। কে বা তাঁর কথা শোনে? যে যে দিকে পাইল, ছুট মারিয়া বিছানায় শয়ন করিল। ঠাকুরমা পঞ্চপাত্র কি একটি চুম্‌কি ঘটী করিয়া গঙ্গাজল আনিয়া, পৌত্র দৌহিত্রদিগকে দেখিতে না পাইয়া, কেবল বকিতেন. "রাম বল, রাম বল। পৃথিবীতে এত খাবার সামগ্রী রয়েচে, তা খেয়ে কি তোদের মন উঠে না? ওই অমৃত কি না খেলেই নয়? ধর্ম্মকর্ম্ম, বাচবিচার সব গেল। যেন মোছোনমানের ঘর ক'রে তুল্লে গা! ইচ্ছা করে. এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যাই। বলি, আমি আর ক'দিনই বা আছি, তার পর তোদের যা ইচ্ছা হয় করিস্। মোছনমানের ছোঁয়া খাস্, বউ নিয়ে চেরেটে কোরে হাওয়া খেতে যাস্, বিবি বিয়ে করিস্. যা ইচ্ছা তাই করিস্। সে কটা দিনও কারুর দেরি সয় না?" যখন দেখিলেন, কেহ তাঁহার কথা শোনে না, তখন তিনি আর সব ছাড়িয়া দিয়া আপনি সাবধান হইলেন। তাঁহার ঘরে কোন ছেলে গঙ্গাজল না স্পর্শ করিয়া প্রবেশ করিতে পায় না। তাঁহার পাকের সামগ্রী কোনও ছেলে হাত দিলে সে দিন আর তাঁহার খাওয়া হয় না। এক দিন রাত্রে কিরণের একটি পিসতুত ভাই বাহির-বাড়ীতে কুক্কুটমাংস ভোজন করিয়া ভিতরে আসিয়া কিরণের পিতামহীকে ছুঁইয়া ফেলিল। কিরণের পিসীর নাম বিন্দুবাসিনী। পিতামহী ডাকিলেন,"বিন্দু!"

"কে, মা ডাকচ?" একটু চড়া স্বরে এই উত্তর হইল।

মা বলিলেন, "দেখছিস্ তোর ছেলের আক্কেল! আমার মাথা খুঁড়ে মর্‌তে ইচ্ছে করে।"

বিন্দুবাসিনী মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘরের বাহিরে আসিয়া কিছু রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? বিনোদ কি করেছে?"

মা। করবে আবার কি? আমার মাথা খেয়েছে। এই শীতের রাত্রে আবার নেয়ে মরি।

কর্ত্তা। কি হয়েছে ছাই, বল না।

মা। হবে আবার কি? আমার শ্রাদ্ধ হয়েছে। বিনোদ আমায় ছুয়ে ফেলেচে।

কর্ত্তা। ড্যাক্‌রা গেল কোথায়? তাকে আমি দাদার সঙ্গে খেতে বারণ কোরে দিয়েছি না?

মা। তোমার ছেলেরা কথা শোন্‌বার ছেলে সব কি না। যেটি বারণ কর, সেইটি আগে কর্‌বে।

কর্ত্তা রাগে ফুলিতে লাগিলেন। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন,—"বিনোদ, গেলি কোথায়? ড্যাক্‌রা, পোড়ামুখো, হতভাগা, একবার এ দিকে আয় তুই।"

মা তখন নরম হইয়া বলিলেন, "তাই ব'লে গালাগালি দিলে কি হবে? ছেলেমানুষ, ছু য়ে ফেলেচে, তার এখন কি হবে? ওর কি এখনও জ্ঞান হয়েছে?"

বিনোদ সব কথাটা জানে না, বাহিরে গুম্ফশ্মশ্রুধারী পাচকমহাশয়ের সহিত আলাপ-পরিচয়ে ব্যস্ত ছিল। মা'র কাছে আসিয়া কহিল, "কি মা?"

বিন্দুবাসিনী দৃঢ়মুষ্টিতে বিনোদের হাত ধরিয়া কহিলেন, "আজ তোমাকে আস্ত রাখব না। তোমাকে দাদার সঙ্গে খেতে মানা করেচি, তবু তুমি নোলার জ্বালায় কুকুরের মত পাত চাটতে গিয়েছ। তোমার নোলায় ছিঁচকে পুড়িয়ে দেব, জান না?"

বিনোদবিহারী সেখ হুসেন আলির দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণশ্মশ্রুশোভিত মুখমণ্ডল, আর সেই শুভ্রপ্লেটস্থিত অপূর্ব্ব সামগ্রীর সৌরভ ও আস্বাদ স্মরণ করিতেছিলেন। মাতার কঠোর কথায় সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার পৃষ্ঠের সঙ্গে মাতার কোমল হস্তের মধ্যে মধ্যে বড় কঠিন আলাপ হয়, এ জন্য তিনি অতিমাত্র ভীত হইয়া কহিলেন, "মা-মা আমায় ডাক্‌লেন, তাই গিয়েছিলাম।"

"আর আমি যা বল্লুম, তা মনে ছিল না? দিদিমাকে ছুঁয়েচিস্ কেন, পোড়াকপালে?" এই বলিয়াই ঠাস্ ঠাস্ করিয়া দুই চড়।

মাতা আসিয়া বিন্দুবাসিনীর হাত ধরিলেন। কহিলেন, "বিন্দু, যার উপর রাগ কোরে কি ছেলে ঠেঙ্গাতে আছে? ছেড়ে দাও, লক্ষ্মী মা আমার।"

কর্ত্তা মাকে এক ঠেলা দিয়া কহিলেন, "ছেড়ে

দাও বল্‌চি, নইলে ভাল হবে না। আমার ছেলেকে আমি মারব, আর কারুর তাতে কি?"

এই বলিয়া চড় ছাড়িয়া, ছেলের পিঠে দুম্ দুম্ করিয়া কিল মারিতে আরম্ভ করিলেন।

বুড়ী ঠেলা খাইয়া পড়িতে পড়িতে রহিল।

ঘরের ভিতর কিরণ লীলাকে বলিতেছিল, "ভাদ্র-মাসের তাল কার ঘাড়ে পড়্‌চে? সেজপিসীর কান্না শুনেচ ত? বাবা, এমন মেয়ের পায়ে গড় করি।"

এ দিকে ঠাকুরমা স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "ও মারা ত বিনোদকে হ'ল না, ও আমাকেই মারা হল।"

বিন্দুবাসিনী ছেলেকে মনের সাধ মিটাইয়া ঠেঙ্গাইলে পর, পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন।

কিরণের মা আর লীলা, দুই জনকে কত বুঝাইলেন, তাঁহারা কোন মতেই জলস্পর্শ করিতে সম্মত হন না। কিরণের পিতামহী যা ফলমূল খান, কিছুই খাইতে চান না। তাঁহারা না খাইলে আর কেহ খায় না দেখিয়া রাত্রি দুপুরের পর আহার করিলেন।

শ্রীমতী বিন্দুবাসিনীর গরীবের ঘরে বিবাহ হইয়াছে। এ জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে পিত্রালয়ে থাকেন। তাঁহার তিন চারিটি সন্তান। বাপের বাড়ী আসিলে বাড়ী শুদ্ধ লোক তাঁহার ভয়ে ভীত থাকিত।

আবার যখন ঠাকুরমা ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন, নবান্ন মাখিতে বসিতেন, হরির লুট দিতেন, সে সময় ছেলেরা হাত পাতিয়া তীর্থের কাকের মত তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। সে বৎসর যখন তাঁহার অনন্তব্রত সারা হয়, তখন ভারি ঘটা হইয়াছিল। সাত দিন আগে হইতে ব্রতের সামগ্রী সাজান আরম্ভ হইল। ছেলেরা দরজার চৌকাঠে দাঁড়াইয়া চেঁচামেচি করিত। ঠাকুরমা সুবিধা বুঝিয়া নাতিদের বলিলেন, "আমার কাছে ত মোছলমানের ভাত নেই, আমার কাছে তোরা এসেছিস্ কেন?

জন দুই নাকিসুরে ধরিল, "না ঠাকুরমা, আর আমরা সে সব খাব না।"

ঠাকুরমা তখন চাপিয়া ধরিলেন, "আর কখন মোছলমানের এঁটো খাবিনে বল।"

"না ঠাকুরমা, আমরা আর কখন খাব না। না দিদিমা, তিন সত্য কর্‌ছি।"

"খাবিনে?"

"না, খাব না।"

"খাবিনে?"

"না গো, খাব না, খাব না। তোমার পায়ে পড়ি, আমায় ঐ সন্দেশটা দাও না ঠাকুরমা।"

এই বলিয়া তাহারা ঠাকুরমার কাছে উত্তম আহার করিল। রাত্রিকালে আবার যে কে সেই। আবার সেই যবনান্ন পাইবার আশায় ছুটিত। ঠাকুরমা মনে মনে সঙ্কল্প করিতেন, তিনি ছোঁড়াদের আর একটা কথাও বিশ্বাস করিবেন না। আবার সে সঙ্কল্প ছোঁড়াদের কাকুতিমিনতিতে ভাঙ্গিয়া যাইত।

ঠাকুরমার আর একটি অভ্যাস ছিল। তিনি এক জনের কাছে তাঁহার মনরাখা কথা বলিতেন আবার তাহার পশ্চাতে ঠিক বিপরীত কথা বলিতেন। কিরণের মা'র কাছে এক রকম কথা বলিলেন, কিরণের পিসীর সাক্ষাতে আর এক রকম বলিলেন। বাড়ীতে একটি নূতন ব্রাহ্মণের মেয়ে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ঠাকুরমা মনে মনে সন্দেহ করেন, বামণঠাকরুণের একটু আধটু হাৎটান আছে, অথচ সে কথা মুখে ফুটিয়াও বলা যায় না। ব্রাহ্মণী ছাড়িয়া গেলে আর একটি সহজে মেলে না। এক দিন বামণঠাকরুণ আসিয়া বলিল, "মা, এক পলা তেল দাও ত গা।"

ঠাকুরমা কিছু সন্দিগ্ধান্তঃকরণে কহিলেন, "কেন বাছা, রোজ যেমন এক বাটি তেল দি, আজও ত তেমনি দিয়েছি। আবার তেল কেন?"

ব্রাহ্মণী। আজকে মাছ ভাজতে একটু বেশি তেল লেগেছে, আর আলু-পটল ভাজতেও তেল বড় কম লাগে না। তা না দাও ত আমি পুড়িয়ে রাখি গে। আমার তাতে কি? আমার ভাতার-পুতে ত আর খাবে না, তোমারই নাতিপুতি খাবে।

ঠাকুরমা অন্য কথা না কহিয়া এক পলা তেল বাহির করিয়া দিলেন।

গৃহিণীর মধ্যমা কন্যা তখন বাপের বাড়ী। সেই দিন ঠাকুরমা কন্যার সাক্ষাতে গল্প করিলেন, "বামণ-

ঠাক্‌রুণের উপর আমার বড় সন্দ হয়। আজকেই সে তেল চুরী করেছে।"

শৈলবালা কিরণের মাকে ইঙ্গিত করিলেন, "বউ একবার শুনে যাও।" এই বলিয়া একটি নিভৃত ঘরে প্রবেশ করিলেন।

কিরণের মা তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে ঠাকুরঝি?"

ঠাকুরঝি কহিলেন, "তুমি ভাঁড়ার ভাল ক'রে দেখো শুনো। বামণঠাক্‌রণটি লোক ভাল নয়।"

"কেন, সে কি করেচে!"

"তুমি বুঝি তা জান না? মা বলেচেন যে, সে আজ তেল চুরী করেচে।"

"তা নিলেই বা ভাই? আমাদের একটু তেল চুরী কর্‌লে ত আর আমরা গরীব হব না। তুমি ভাই ঠাক্‌রুণকে বুঝিয়ে বল, যেন এ কথা প্রকাশ না হয়। আজকাল লোকের কষ্ট।"

"প্রকাশ হবে কেন? কিন্তু তুমি একটু সাবধান থেক।"

কিরণের মা কহিলেন, 'তোমরা যেন ঢাক বাজিও না ভাই। কতই বা চুরী কর্‌বে? ভাঁড়ার ত আর তার হাতে নয়।"

"তোমার যদি এত বড়মানুষী হয়ে থাকে ত তোমার ধন যাকে ইচ্ছা তুমি বিলিয়ে দাও না কেন? সত্যিই ত, আমি কোথাকার কে যে, তুমি আমার কথা শুন্‌বে? আমি তোমার ভালর জন্যেই বল্‌তে এসেছিলাম!" এই বলিয়া শৈলবালা সুন্দরী ফর্‌কিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিবস ঠাকুরমা স্নান করিয়া পূজা-আহ্নিকে বসিতেছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণী আসিয়া কহিল, "হ্যাঁ গা, মা, তুমি না কি বলেচ যে, আমি রান্নার তেল বোতলে ক'রে বিক্রী করি? তা, এমন কলঙ্ক কি না দিলেই নয়? লোকের নামে মিছে কোরে এমন কথা বল্‌তে নেই। বলেছ, বেশ করেছ বাছা, আমার পাওনা চুকিয়ে দাও, আমি এই বেলা মানে মানে বিদায় হই।"

ঠাকুরমা বাম হস্তের উল্টাপিট মাথার উপর রাখিয়া কহিলেন, "কি সর্ব্বনাশের কথা! তুমি হ'লে ভদ্রলোকের মেয়ে, তোমার নামে আমি এমন কথন্ বল্লাম! কে তোমায় এমন কথা বলেচে, আমায় বল ত?"

ব্রাহ্মণী হাঁড়ির কালিকলঙ্কিত হস্ত দোলাইয়া কহিলেন, "কেন, আমায় আজ কালো-ঝি বল্লে।"

অমনি কালো-ঝির ডাক পড়িল। ঠাকুরমা কহিলেন, 'হ্যাঁলা ময়না, আমি কথন্ তোমার গলা ধ'রে তোমার কানে কানে বল্‌তে গিয়াছিলাম যে, বামনঠাক্‌রুণ তেল চুরী করে, তাই তুমি ঠগ লাগাতে গিয়েচ?"

ঝি বলিল, "আমার কি অপরাধ বাছা? আমায় হরি বল্লে, তাই শুনেছি।"

আবার হরির উপর আক্রমণ হইলে সব শেষ ঠাকুরমা সূর্য্যের দিকে হাত তুলিয়া কহিলেন, "হে দীননাথ! আমি যদি এমন কথা ব'লে থাকি ত যেন আমার দুটি চক্ষ অন্ধ হয়।"

বামনঠাক্‌রুণ ত কোনমতে থাকিবে না। কিরণের মা কত করিয়া তাহাকে চার আনা পয়সা দিয়া সান্ত্বনা করেন। তার পর শাশুড়ীকে থামাইতে এক বেলা লাগিল।

অনেকেই বলিত, কিরণের ঠাকুরমা দোঠকা, এক মুখে দুই কথা বলেন। তুমিও হয় ত তাই বলিতেছ। কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিতেছি, তাঁহার বেশী কিছু দোষ নাই। বিবেচনা কর, স্ত্রীলোক চিরকালই পরাধীন। ছেলেবেলা বাপের, বয়সকালে স্বামীর, বুড়া বয়সে ছেলে কি মেয়ের বশে থাকিতে হয়। সকলেরই মন রাখিতে হয়। আগে বাপ-মার, তার পর শ্বশুর শাশুড়ীর, তার পর পুত্র-কন্যার মন রাখিয়া চলিতে হয়। যাহাকে অনেকের মন রাখিতে হয়, সে এক রকম কথা কিরূপে কহিবে? অতএব তোমরা যাহাই বল, কিরণের পিতামহীকে আমার বড় মন্দ লোক বোধ হয় না।

লীলাকে দেখিয়া তিনি বড় সন্তুষ্ট হইলেন। লীলার আচার-ব্যবহারেও বড় আনন্দিত হইলেন। লীলা তাঁহার পূজার সময় গঙ্গাজল আনিয়া জল ছড়াইয়া দেয়, আগে যাহা কিরণের মা করিতেন, এখন সব লীলা করে, তাঁহাকে কিছু করিতে দেয় না। লীলার পবিত্র স্বভাব দেখিয়া তিনি বলিতেন, "লীলার হাতের রান্না খেতে আমার রুচি হয়। লীলার এমন বয়সে বৈধব্যদশা হইল" এই বলিয়া কতবার কাঁদিতেন। স্ত্রীলোকে পরের জন্য নিজের চক্ষে এত জলও রাখিতে পারে!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

-*-

বিচ্ছেদ।

বিবাহের পর কিরণকে একবার শ্বশুরবাড়ী লইয়া গিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। তার পর আর কিরণকে পাঠান হয় নাই। কিরণের মা ভাবিতেন, জামাই মানুষ হইলে আপনার বাড়ীতে লইয়া যাইবে, সে কয় দিন মেয়ে ঘরেই থাক। হরগৌরী বাবু আপন গৃহিণীকে বলিয়াছিলেন, "তাও কি হয়? সুরেশের এই বাড়ী। বউমাকে আর অধিক দিন বাপের বাড়ী রাখা হবে না।"

বাড়ীর সকলে জানে, সুরেশচন্দ্র কিছু দিনে নিজে উপার্জ্জন করিতে শিখিবেন, এ জন্য পৃথক না হইয়াও সকলে সুখে থাকিবে, সুরেশচন্দ্রকে আর স্বতন্ত্র সকলের ভার বহন করিতে হইবে না। বিশেষ, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা সংসারের খরচপত্রের কোন ধার ধারে না। পুরুষেরা টাকা আনিবে, সংসার চালাইবে, স্ত্রীলোকেরা গৃহ-কর্ম্ম করিবে, সন্তান পালন করিবে, বিবাহের সময় সকলে একত্র হইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিবে। বড় জোর বাজার খরচের পয়সা হাতে রাখিবে। ঘরে আর একটি বউ আসিলে মেয়েছেলেরা তাহাকে লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিবে, এই কথা মনে করিয়া, সকলেই চারিদিকে বউ কবে আসিবে বলিয়া কর্ত্তা-গিন্নীকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। মেয়েরা সব সুরেশচন্দ্রের শয়নগৃহ কোন্‌টা হইবে, তাহাই স্থির করিতে বসিয়া গেল। অন্দরমহলে উপরের ঘর খালি নাই, সকল ঘরেই কেহ না কেহ শয়ন করে। এ কথা যাই উঠিল, তৎক্ষণাৎ হরগৌরী বাবুর দুই কন্যা ও এক পুত্র পিসীমাকে কহিল, "পিসীমা, আমরা তোমার ঘরে শোব। দাদা আমাদের ঘরে শোবে।" বউ আসিলে কে তাহাকে অধিক যত্ন করিবে, কে তাহাকে আপনার কাছে লইয়া তাস খেলিবে, কে তাহার সহিত ভাব করিবে, সদা-সর্ব্বদা এই কথার আন্দোলন চলে, এমন কি, এক একবার ঝগড়া হইবার উপক্রম হইয়া উঠে। সুরেশচন্দ্র খুড়ীমাকে বলিতেন, "খুড়ীমা, আর কিছু দিন যাক্ না, তার পর না হয় নিয়ে এস। এত তাড়াতাড়ি কেন? সত্যি ত আর জলে পড়ে নেই।" এই রকম আজ নয় কাল, এ মাস নয় ও মাস, আর কিরণের মাতার অনুরোধে এ পর্য্যন্ত কিরণের শ্বশুরবাড়ী আসা হয় নাই। কিন্তু আর বড় বেশী দিন নয়। দু'মাস ছ'মাসের মধ্যে কিরণ আপনার ঘর চিনিতে আসিবে।

যখন সুরেশচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না, তখন তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতে দুই চার কথা উঠিল। সকলে যদি শুনিল ত কিরণই বা না শুনিবে কেন? কিরণের মা একটু দুঃখ করিলেন, তাহাতে কিরণ মনে মনে স্বামীর উপর রাগিল, ভাবিল,—তাহার স্বামী বড় মূর্খ। আবার যখন কিরণের মা কহিলেন, "তা সকলেই কি আর একবারে পাশ দিতে পারে? জামাই বাবু আর এক বছর পড়লেই পাশ হবেন" তখন কিরণের দুঃখ হইল, ভাবিল, সকলেই ত আর সমান হয় না, তা নয় আবার পড়বেন। কিরণের সে দুঃখ কমিল না। সুরেশচন্দ্র পূর্ব্বে যেমন মধ্যে মধ্যে আসিতেন, এখন আর তেমন আসেন না। নিমন্ত্রণ করিলে আসেন না, লোক আনিতে গেলেও আসেন না। আচ্ছা, কিরণের কাছে আসিতে লজ্জা কি? পাশ করিলেও যেমন কিরণের স্বামী, না করিলেও তেমনি স্বামী। স্ত্রীর কাছে আসিতে স্বামীর আবার লজ্জা কি? তবে বুঝি শ্বশুরবাড়ী আসিতে লজ্জা করে? হবে। কিরণ এত শত বুঝিতে পারিল না। সে রোজ রোজ সন্ধ্যাবেলা সুরেশের আশায় বসিয়া থাকে। কখন্ কে আসিয়া সংবাদ দিবে—জামাই বাবু এয়েচে, অমনি কিরণের বুক ধড়াস্ করিয়া উঠিবে। একবার ভাবিয়াছিল, দেখা হইলে সুরেশকে খুব বকিবে, কিন্তু সে পণ ভাঙ্গিয়া গেল, তার পর ঠিক করিয়াছিল, দেখা হইলে কেবল ভালবাসার কথা বলিবে, রাগ-দুঃখের কথা মুখে আনিবে না। দিন কতক পরে দিব্য করিল, অভিমান করিয়া বসিয়া থাকিবে, একটি কথাও কহিবে না; কৈ, সে সব যে কিছুই হইল না। নিত্য সন্ধ্যাবেলা সে ছাদে বসিয়া থাকে, কিন্তু কেহ কোন দিন বলে না, কিরণের বর এয়েচে। তুমি দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিবে না যে, কিরণের মনে উদ্বেগ আছে। বৈকালে সে ছাদে বসিয়া থাকে, বেশ হাসিয়া খেলিয়া

বেড়ায়, যেন কোন ভাবনাই নাই, যেন সে স্বামীর কোন ভাবনা ভাবে না। যদি কেহ স্বামীর নাম করে ত হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরে, নহিলে সেখান হইতে পলাইয়া যায়। কিরণের মনের কথা কে জানে? একবার যখন সন্ধ্যার সময় পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহার মনে কি ছিল, কে জানে? কেহ কোন কথা জোরে বলিলে সে কান পাতিয়া শুনিত, সন্ধ্যার সময় বসিয়া এক একবার যে ঈষৎ কটাক্ষে চারিদিকে চাহিয়া দেখিত, তাহা কেহ দেখিত না, প্রতিদিন তাহার কতখানি আশা ঘুচিয়া যাইত, তাহা কেহ জানিত না।

এক জন কেবল জানিত। তাহার কাছে কিরণ কিছু লুকাইত না, কিছু লুকাইতে পারিত না। এক মাস, দুই মাস, তিন মাস গেল, তবু সুরেশ-চন্দ্রের দেখা নাই; কিরণ এক দিন লীলাকে বলিল, "আচ্ছা ভাই! এত দিন গেল, তাঁর কি এক-বারও আমার মনে পড়ে না?"

লীলা। মনে পড়্‌বে না কেন? এখানে আস্‌তে বুঝি তাঁর লজ্জা করে।

কিরণ। এ পোড়া লজ্জা কি এত দিনে যায় না? মানুষের কি লজ্জা চিরকালই থাকে না কি? আর কি এমন লজ্জার কথা হয়েছে যে, তিনি আমায় একেবারে ভুলে গেছেন?

আশা-ভরসা সব ঘুচিয়া গেলে, জন্মের মত সব সুখ বিসর্জ্জিত হইলে, যদি কেহ জগতের উপর বিষদৃষ্টি না করে, আপনার দুঃখের জন্য যে অপরকে দোষ দেয় না, তাহার মুখে কি একরকম হাসি লাগিয়া থাকে। লীলা যখন তখন সেই হাসি হাসিত। কিরণের কথায় সেই হাসি হাসিয়া উত্তর করিল,—

"তা কি জানি ভাই, তোমার বরের যে কিসের এত লজ্জা, তা আমি কি কোরে জান্‌ব বল?"

তখন কিরণ চুপ করিয়া লীলার একটি চম্পক-আঙ্গুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

লীলার নিজের জন্য কিছু ভাবিবার নাই, এই জন্য সে পরের জন্য ভাবিতে পারে। যাহাকে আত্মসুখের ভাবনা ভাবিতে হয় না, সে পরের দুঃখে সমধিক দুঃখী হইতে পারে। কিরণকে নীরব দেখিয়া লীলা কহিল, "ছি! তুমি এত ভাব কেন ভাই? আজ না হয় কাল তিনি আসবেন; আর দু'দিন পরে তোমায় শ্বশুরবাড়ী নিয়ে যাবে, তখন ত দেখা হবেই।"

কিরণ লীলার আঙ্গুল ছাড়িয়া দিয়া মাথা তুলিয়া কহিল, "আমার ত তেমন কিছু দুঃখ হয় নি।"

লীলা। আমার কাছে মিছে কথা, ছি! মানুষের ত কত দুঃখ আছে, তোমার কোন দুঃখ হয় নি, তবু তুমি আগে হ'তে ভাবতে বসলে। কত লোকের স্বামী বিদেশে যায়, কত কাল দেখা হয় না। আবার কারুর কারুর এক-বারেই—

লীলা আর কিছু বলিল না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

কিরণ বুঝিতে পারিয়া অন্য কথা পাড়িল।

এ দিকে লোকে বলে যে, সুরেশচন্দ্র বিবাহ করিয়া উচ্ছন্ন গেল! পাঠ্যাবস্থায় যে বিবাহ করে, তার একটা কিছু হয় না। লোকে যা বলে, তা নিতান্ত অমূলক নাও হইতে পারে। হয় ত সুরেশচন্দ্র দিবানিশি কিরণের কথা মনে করিতেন, কবে সাক্ষাৎ হইবে, তাহাই ভাবিতেন। ইহাতে পাঠাভ্যাসের ক্ষতি হইত। হয় ত কিরণের সেই ছোট মুখখানি তাঁহার বুকের ভিতর হইতে উঁকি মারিত, তাহাতে পড়াশুনা সব ঘুরিয়া যাইত। হয় ত সে মুখের হাসিটুকু তাঁহার চোখের কাছে ভাসিয়া বেড়াইত, তিনি আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না। যাই হউক, এ বিষয়ে আমি কোন কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারিলাম না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গণেশচন্দ্র দত্ত।

গণেশচন্দ্র দত্ত গরীবের সন্তান। অল্পবয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, ঘরে তাঁহার মাতা ও বৃদ্ধা মাতামহী ছিলেন। মাতুলের যত্নে ও ব্যয়ে, বাল্যকালে গণেশচন্দ্র লেখাপড়া অভ্যাস করেন

প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া পাঠের ব্যয় নিজেই করিতেন, মাতুলের আর সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। গণেশচন্দ্র মাতুলের নিতান্ত অনুগত, সর্ব্বদাই বলিতেন যে, মাতুল তাঁহার যে উপকার করিতেন, তাহার শতাংশের এক অংশও কখন শুধিতে পারিবেন না। মাতুল ধনী ছিলেন না, তাঁহার মনে আশা ছিল, গণেশচন্দ্র মানুষ হইয়া তাঁহার প্রত্যুপকার করিবেন।

মানুষ পরিবর্ত্তনশীল। গণেশচন্দ্র যেমন যেমন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন, তেমনি তেমনি তাঁহার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। অবশেষে যখন এম্, এ, পাশ করিলেন, তখন তাঁহার মূর্ত্তি একেবারে ফিরিল। কালেজ ছাড়িয়া মুরুব্বীর জোরে অথবা বিদ্যার জোরে তাঁহার এক শত টাকা বেতনের কর্ম্ম হইল। তাঁহার মাতুল আশী টাকার কর্ম্ম করিতেন, পেন্সনের পর চল্লিশ টাকা বই আর পাইতেন না। গণেশচন্দ্রের মাতুল ভাগিনেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন। গণেশচন্দ্রের কর্ম্ম হইলে কিছুদিন পরে তাঁহার মাতামহীর মৃত্যু হইল। তাঁহার মাতুল পিণ্ডদানের, শ্রাদ্ধের অধিকারী। তিনি গণেশচন্দ্রকে বলিলেন, "বাবা, মা'র ক্রিয়ায় কিছু সাহায্য কর।"

গণেশচন্দ্র বাড়ীর ভিতর গিয়া অনেকক্ষণ পরে দশ টাকার তিনখানি নোট হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। সেই তিনখানি নোট মাতুলের হাতে দিলেন। মাতুল কিছু বিস্মিত, কিছু বিষণ্ন হইয়া কহিলেন,—

"গণেশ, তুমি এক শ' টাকার চাকরী করিতেছ। পরিবারও বড় নয়। দিদিমার শ্রাদ্ধে ত্রিশটে টাকা দেওয়া কি তোমার ভাল দেখায়?"

গণেশচন্দ্র ক্ষুদ্র চক্ষু ঈষৎ জ্বলিল। তিনি মাতুলের দিকে না চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমি সাধ্যমত দিয়াছি। শ্রাদ্ধে ঘটা করিবার কোন আবশ্যক নাই। আর আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহাই মনে করিয়া যে এখনও আমায় শিক্ষা দেন, ইহা ভাল নয়। আমার জন্য আপনার কত ব্যয় হইয়াছে, তাহার একটা হিসাব করিবেন, আমি মাসে মাসে শোধ দিব।"

মাতুল কোন কথা না কহিয়া, নোটগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন।

সেই দিন আপিসের বড় সাহেব গণেশচন্দ্রের তোষামোদে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বেতনবৃদ্ধির জন্য লিখিয়াছিলেন।

সেই দিন রাত্রে এক সভায় গণেশচন্দ্র স্বদেশানুরাগের জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইলেন।

গণেশচন্দ্র বিদ্যার গৌরব করিতেন। ইহাতে দোষের কোন কথা নাই। যে এম্, এ, পাশ করিয়াছে, সে যদি বিদ্যার গৌরব না করিবে ত আর কাহার সে গৌরব করিবার অধিকার আছে? একদা কোন কথার সহজ মীমাংসা অথবা সহজ অর্থ করিতে হইলে তিনি বলিতেন, যে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছে, সেও বলিতে পারে। এক দিন তিনি একটা বাঙ্গালা শব্দের অর্থ করিতে পারেন নাই, এক জন এণ্ট্রান্স পাশ করা ব্যক্তি সে শব্দের অর্থ করিয়া দিয়াছিল। গণেশচন্দ্র কিছু লজ্জিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মনে মনে বলিলেন, ইংরাজী ত নয়। ইংরাজী শব্দের অর্থ করিতে না পারিলে লজ্জার কথা বটে। কে অত খোঁজ রাখে, কেই বা বাঙ্গালা পড়ে?

একবার তিনি একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। সম্পাদক সে পত্র প্রকাশিত করেন নাই, পত্রপ্রেরককে এইটুকু বলিয়াছিলেন,—"এই পত্রের লেখক এক জন এম্-এ। পরীক্ষকেরা রচনা প্রাপ্ত হইলে লেখককে অনেক নম্বর দিতেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা তাঁহার পত্র মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। তাঁহার ডিক্রীকে আমরা অবজ্ঞা করি না। তবে যাহা বিদ্যালয়ের উপযোগী, তাহা সংবাদপত্রের উপযুক্ত নহে।"

গণেশচন্দ্র কিছু ক্ষুণ্ন হইলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের বিদ্যা বা রচনার প্রতি এক মুহূর্ত্তের তরেও কোন সন্দেহ হইল না। তিনি স্থির করিলেন, সম্পাদকটা মুখ।

তাঁহার স্ত্রী মনোমোহিনী বড় ঘরের মেয়ে। পাশ করা ছেলের দর বরাবর বেশী, তাহাতে গণেশচন্দ্র খুব ভাল পাশ করিয়াছিলেন। অনেক ধনীর বাড়ী হইতে সম্বন্ধ আসিয়াছিল। গণেশচন্দ্রের মাতুল দেখিয়া বড়মানুষের ঘরে বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পর এ পর্য্যন্ত শ্বশুরবাড়ী হইতে গণেশচন্দ্র বিশেষ কিছু আদায় করিতে পারেন নাই।

বড়মানুষের মেয়ে গরীবের ঘরে আনা সোজা কথা নয়। মনোমোহিনী বাপের বাড়ী হইতে এক বাক্স গহনা, এক সিন্দুক কাপড়, বাসন, ঝি, আর খুব বড় নজর লইয়া আসিলেন, কিন্তু বাপের বাড়ীটি ত আর সঙ্গে করিয়া আনিতে পারেন না। কাজেই তাঁহার বড় কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। ভাল, তুমি বল দেখি, যার বড় বড় দোতালা ঘরে থাকা অভ্যাস, বেশ ফাঁকা বারান্দায় বেড়ান অভ্যাস, ছোট একটি একতালা ঘরে থাকিতে হইলে বেড়াবার জায়গা দুই হাত রোয়াক না হইলে তার কত কষ্ট হয়? ভাল বাড়ীতে যাহারা থাকে, তাহারা একটা মন্দ বাড়ীতে গিয়া পা ফেলিতেই ভয়ে সারা হয়। এখানটা শ্যাওলা, ওখানটা জল, আর এক দিকে অন্ধকার, বোধ হয় যেন পদে পদে একটা করিয়া গর্ত্ত রহিয়াছে। ছোট ঘরে ঢুকিলে হাঁপ লাগে। এক জন দীর্ঘকায় মানুষ বড় বড় জানালা-দরজা-ওয়ালা বাড়ীতে বেশ স্বচ্ছন্দে থাকে, কোন ঘরে প্রবেশ করিতে কখন তাহাকে হেঁট হইতে হয় না। হঠাৎ তাহাকে সে বাড়ী ছাড়িয়া যদি একটি ছোট বাড়ীতে থাকিতে হয়, তবে তাহার আর কষ্টের সীমা থাকে না। নীচু দরজায় হেঁট হইয়া ঢুকিতে হয়, এটুকু শিখিতে শিখিতে তাহার মাথা দশ বিশবার ফুলিয়া ঢিবি হয়। মনোমোহিনীরও অনেকবার সেইরূপ যন্ত্রণা হইয়াছিল। শ্বশুরবাড়ী যেমন করিয়া হউক থাকিতে হইবে, দুঃখ-কষ্ট সব অল্পে অল্পে সহিয়া যায়; তাঁহারও কষ্ট সেইরূপ সহ্য হইয়া গেল, কিন্তু মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী হইতে তত্ত্ব আসিলে, দুঃখের নিভন্ত আগুন আবার জ্বলিয়া উঠিত। বাপের বাড়ীর ঐশ্বর্য্য, বাপের বাড়ীর সুখ আবার মনে পড়িত, গণেশচন্দ্রের কর্ম্ম হইলে ও মাতুলের সহিত মনান্তর হইলে, স্বতন্ত্র হইয়া তিনি একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ ভাড়া করিলেন। বাড়ীটি ছোট, কিন্তু বেশ পরিষ্কার। মনোমোহিনীর দুঃখ কতক নিবারণ হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

—*—

শ্বশুরবাড়ী।

কিরণ শ্বশুরবাড়ী আসিল। শ্বশুরবাড়ী দিনকতক খুব আদর, ননদেরা এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, কত রকম ঠাট্টা তামাসা করে, কত যত্ন করে। এই সময় আমার কর্ত্তব্য যে, ননদদিগের বউয়ের সঙ্গে কথোপকথনের একটা নমুনা দিই। বেশ গোচাল গোচাল ধারাল ধারাল কথা হবে, কথার বাঁধুনি, সাজানো পরিষ্কার হবে, আর কথাগুলি রসে ভরা হওয়া চাই। তা যদি না পারি ত এ পরিচ্ছেদটাই মাটী। কিন্তু দেখ, আমার সে কাজ নয়। যাহারা বেশ ধারাল কথা কয় না, তাহাদের মুখে আমি চাঁচা-ছোলা সাজান গুছান কথা কেমন করিয়া গুঁজিয়া দিই? যাহারা সারাদিনের মধ্যে কদাচ একটা হাসির কথা কয়, তাহাদিগকে আমি মিনিটে মিনিটে হাস্যোদ্দীপক কথা কেমন করিয়া কহিতে বলি?

আর কিরণের হাসি তামাসার কথা তেমন ভালও লাগে না। শ্বশুরবাড়ীতে যে তাহাকে বেশী আদর করে, তাহারই উপর কিরণের সন্দেহ হয়। সে এক রকম স্থির করিয়াছে যে, যে বেশী যত্ন করে, সেই বুঝি অধিক নিন্দাও করে। বাপের বাড়ী ছাড়িয়া আসিলেই একটা দুঃখ হয়, কিরণের সেই দুঃখের উপর আর এক দুঃখ। লীলাবতীর বিচ্ছেদে তাহার অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইল। সে লীলাকে পাইয়া অবধি আর কাহারও কাছে চুল বাঁধিত না, আর কাহারও চুল বাঁধা মনস্থ হয় না। লীলা সিন্দুর পরাইয়া দিলেই বেশ দেখায়, আর কেহ চিরুণীর আগা দিয়া মাথায় সিন্দুর দিয়া দিলে কিরণ মনে করে, সিন্দুর বড় বেশী হইয়াছে, না হয় ত সমান সীঁতের উপর সিন্দুর পড়ে নাই, একটু বাঁকা হইয়াছে, কিংবা সিন্দুর একটু অধিক উচুতে পরান হইয়াছে। লীলা নহিলে আর কাহারও কাছে সব মনের কথা বলা হয় না। শ্বশুরবাড়ী আসিয়া কত কথা কিরণের মনে উঠিত, কিন্তু বলিবার লোক খুঁজিয়া পায় না। মনের কথায় বোঝা দিন দিন ভারি হইতে লাগিল,

যাহার কাছে সে বোঝা নামাইলে কিরণের তৃপ্তি হয়, তাহার সহিত শীঘ্র দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই।

কোন্ সুখে কিরণ হাসিবে? সুরেশচন্দ্র দ্বিতীয়বারও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। যে যেখনে ছিল, তাঁহার নিন্দা করিতে লাগিল। বাড়ীর সকলেই বলিল, "সুরেশের কপালে সুখ নাই, নহিলে এত সুবিধা থাকিতেও পাশ করিতে পারিল না?" হরগৌরীবাবু বড় বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার রাগ অধিক দিন রহিল না। কিরণ ভাবিল, যত দোষ সুরেশচন্দ্রের; আমারও তাহাই দৃঢ় বিশ্বাস। কিরণ স্বামীকে রাত্রে একেলা পাইয়া বিলক্ষণ দু'চার কথা শুনাইয়া দিল। লোকের মুখে নানা কথা শুনিয়া কিরণের ভারি রাগ হইয়াছিল, কাজেই সে স্বামীর উপর ঝাল ঝাড়িল। সুরেশচন্দ্র চুপ করিয়া সব শুনিলেন, শেষে যখন কিরণ চাপা গলায় খানিকক্ষণ বকিয়া হাঁপাইয়া পড়িল, তখন সুরেশচন্দ্রের কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তিনি কিরণকে কহিলেন, "বেশ বক্তৃতা হয়েচে। তার পর?"

এই কথায় কিরণ তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিল, রাগের মুখে স্বামীকে নানা কথা বলিল। সুরেশচন্দ্র আবার খানিকক্ষণ পরে কহিলেন, "তুমি যে এরি মধ্যে বেশ ঘুম-পাড়ানি সুর শিখেচ।"

কিরণ রাগে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। সে সময় কাঁদা ভাল দেখায় না বলিয়া, রোদন সাম্লাইয়া, আবার অনেক কথা বলিল। সুরেশচন্দ্র হাঁ না কিছুই বলেন না দেখিয়া, অবশেষে থামিল। থামিয়া দেখে, সুরেশচন্দ্রের দিব্য তন্দ্রাকর্ষণ হইয়াছে। তখন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িল।

হরগৌরীবাবু যখন দেখিলেন, সুরেশের আর লেখাপড়া হইবার রকম নয়, তখন চেষ্টাচরিত্র করিয়া, পঞ্চাশ টাকা বেতনের একটি কর্ম্ম করিয়া দিলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহাকে কহিলেন, "সুরেশের বিবাহ হওয়াতে, তাহার আর কিছু হইল না।"

আমার আশা ছিল, সুরেশচন্দ্র এবং কিরণের বিবাহ বেশ সুখের হইবে। এখন তাহাতে বড় সন্দেহ হয়। এই দেখ, কিরণ শ্বশুরবাড়ী আসিয়াই স্বামীর উপর রাগ করিল। সুরেশচন্দ্রের যখন কর্ম্ম হইল, তখন কিরণ তাঁহাকে পরামর্শ দিল, "ভাল কোরে কাজকর্ম্ম কর, সাহেবের মন রাখ, তা হ'লে মাহিয়ানা বাড়বে।"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "কেন? আমি পঞ্চাশ টাকায় বেশ সন্তুষ্ট আছি। আমি আর চাইনে।"

কিরণ ভাবিল, তাহার স্বামী পাগল হইয়াছে। বলিল, "তোমার কি এমন ধন-ঐশ্বর্য্য আছে যে,তুমি টাকা চাও না?"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, 'সে জন্য নয়। সকলেই যে টাকা চায়, তা ত নয়। টাকাই ত কেবল সার নয়।"

এমন নূতনতর কথা কিরণ কখন শুনে নাই। তাহার মনে মনে রাগ হইল। সে স্বামীর উপর কথায় কথায় রাগ করে। বলিল, "টাকা চাই না ত কি চাই?"

সুরেশ। জ্ঞান চাই, ধর্ম্ম চাই, আরও কত কি চাই। কেবল টাকা টাকা করিয়া বেড়াইলে কি কিছু সুখ আছে? পঞ্চাশ টাকা এমন অল্পই বা কি?

কিরণ। কত লোকে পাঁচ শ টাকা, হাজার টাকা রোজগার করে, আর তোমার পঞ্চাশ টাকাই বুঝি ঢের হ'ল?

সুরেশ। আবার কত লোক যে কুড়ি টাকা পঁচিশ টাকার বেশী পায় না। কত লোক যে পাঁচ টাকায় মাস চালায়। সকলেই কি পাঁচ শ টাকা আন্তে পারে?

কিরণ। এত লোকে আনে, আর তুমিই বা আন্তে পারবে না কেন? টাকা না হ'লে সুখ নেই, টাকা না হ'লে কেউ জিজ্ঞাসা করে না।

সুরেশচন্দ্র এক এক সময় বড় অদ্ভুত রকম তর্ক করিতেন। তিনি কিরণকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "আচ্ছা, টাকাই কি সব চেয়ে বড়?"

কিরণ কহিল, "তা নয় ত কি?"

সুরেশ। যার টাকা আছে, সেই তবে খুব বড়?

কিরণ। তাই ত।

সুরেশ। বল দেখি, শিব ঠাকুর বড় না বর্দ্ধমানের রাজা বড়?

কিরণ। দেবতায় আর মানুষে ?

সুরেশ। কেন ? ভিখারী দেবতা আর মস্ত বড়-মানুষও বুঝি সমান নয় ?

কিরণ। তাও কি হয় ?

সুরেশ। আচ্ছা, শিব ত যেন দেবতা হলেন। সেকালে মুনি-ঋষিরা ত আর দেবতা ছিলেন না। তাঁরা বড়, না হরিনারায়ণ দত্ত বড় ?

কিরণ কিছু মুস্কিলে পড়িল। এমন সব জটিল তর্কের মধ্যে, সে ছেলেমানুষ, প্রবেশ করিতে পারিবে কেন ? কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে একটা উত্তর খুঁজিয়া পাইল। কহিল, "তবে তুমি বুঝি মুনি-ঋষি হয়েচ ?"

সুরেশ হাসিলেন, কহিলেন, "আমি কি এমন পুণ্য করিয়াছি যে, মুনি-ঋষি হব ? আর তোমাকে ছেড়ে মুনি-ঋষি হতেও আমার ইচ্ছা হয় না। আমি ত সংসার ছাড়িতে চাইনে। আমি অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে চাই। টাকায় যে সুখ নাই, তাহাও ত চারিদিকে দেখিতে পাইতেছি। তুমি ছেলেমানুষ, যা সকলের মুখে শুনেছ, তাই বল্‌চ। তোমার দোষ কি ? এর পর যখন সব কথা খুলে বল্‌ব, তখন তুমি আমার মতন বুঝতে পার্‌বে।

ছেলেমানুষ বলিলে কিরণের যেমন রাগ হয়, এমন আর কিছুতে নয়। সে রাগে চুপ করিয়া রহিল। তার সাড়ে তের বছর বয়স,আর তাকে ছেলেমানুষ বলে !

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

—*—

একা ! একা !

তুমি পুরুষ, বিধবার দুঃখ বুঝিতে পারিবে না। পরদুঃখে দুঃখী হওয়া অপেক্ষা আর কিছুই নাই, কিন্তু এই যে হিন্দুবিধবার দুঃখ, ইহা আমরা কোন-মতেই কল্পনা করিয়া উঠিতে পারি না। যদি পারিতাম ত এ দেশে এমন বিধি শাস্ত্রে স্থান পাইত না। স্বামীর মৃত্যু, চিরজীবনের তরে অনাথিনী হওয়াই যে বিধবার প্রধান দুঃখ, তা নয়। এই জগৎ-সংসারে সে সম্পূর্ণ একাকিনী। এমন দুঃখ আর আছে ? একাকিনী অর্থে কেবল সঙ্গিহীন বুঝিও না। একা থাকিতে অনেক ভালবাসে, একা থাকিতে বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। যোগীরা ত স্বেচ্ছামতে অরণ্যে বাস করেন। কিন্তু বুঝিয়া দেখ, তাঁরা কি একা ? তাঁরা কেবল একজন নিত্য-সঙ্গীকে লইয়া, পথের পরিচিত ব্যক্তিকে ত্যাগ করেন বই ত নয়। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, কেহ একা থাকিবে না। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, গ্রহ, উপগ্রহ, কেহ একা থাকে না। কোথায় সূর্য্য আর কোথায় পৃথিবী, অথচ এক দিন সূর্য্যকে না দেখিতে পাইলে পৃথিবী আর বাঁচে না। এ উভয়ে কি কোন সম্বন্ধ নাই ? যাহা কিছু আছে, সব অপর কিছুর সঙ্গে বাঁধা। সব পূর্ণ, সব এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সব এক সত্তার জীবন্ত দেহ, অবিশ্রাম ঘুরিতেছে, সে দেহ ছিন্ন করে, এমন চক্রের বিশ্বকর্ম্মা এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করে নাই। সকলে সকলের মুখ চাহিয়া আছে, সকলে সকলকে সাহায্য করিতেছে, ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক, অথবা অনিচ্ছা-প্রযুক্তই হউক, জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে হউক, একে অপরের হাত ধরিতেছে। দেশ, কাল পাত্র, কোন বিবেচনা নাই, নক্ষত্র হইতে, পৃথিবী হইতে, অন্ধকার হইতে, আলোক হইতে কেবল হস্ত প্রসারিত হইতেছে, আর নিরন্তর শব্দ হইতেছে, ধর ! ধর ! হাত ধর !

অভাগিনী বিধবার হয় ত সব আছে, হয় ত তার রূপ আছে, যৌবন আছে, সুখের আশা আছে, অথচ তাহার কিছু নাই, তাহার কেহ নাই, সংসারের, জীবনের কোন বন্ধন নাই। কেবল যে তাহার স্বামী তাহাকে ত্যাগ করে, এমন নয়, সমুদয় জগৎ, বুঝি স্বর্গের দেবতাও তাহাকে পরিত্যাগ করে। মানুষের মধ্যে থাকে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মিশিতে পারে না, কোন হৃদয় তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করে না। সে এক অশরীরিণী ছায়ার মত লোকালয়ে বিচরণ করিতে থাকে।

এমন অবস্থায় জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া উঠে। এমন হইলে কোন বিধবা জীবনের ভার বহন করিতে পারিত না। এই জন্য আর একটা কিছু তাহার শূন্যহৃদয়ে প্রবেশ করে। যাহার নিজের কিছু নাই, সে পরের জন্য ভাবে। যখন স্বার্থপরতা একেবারে দূর হইয়া যায়, তখন

পরার্থ-পরতা সহজেই আসে। পরের সুখে সুখ হয়, পরের রোগের সেবা করিলে নিজেকে সুস্থ বোধ হয়, পরে হাসিলে মুখে হাসি আসে।

লীলার তাহাই হইল। বিধবা হইয়া পর্য্যন্ত লীলার কিছুতেই সুখ ছিল না, এখন সে পরের সুখে সুখী হইতে শিখিল। কিরণ শ্বশুরবাড়ী গেলে, পর দিনকতক লীলার কিছু কষ্টবোধ হইয়াছিল। ঝিকে দিয়া চিঠি লিখিয়া কিরণের খবর লইত। কিরণ কেমন থাকে, তাহার কোন কষ্ট হয় কি না, শ্বশুরবাড়ী তার মন টেঁকে কি না, লীলার কেবল সেই ভাবনা। কিরণকে কাছে না পাইয়া, সে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সর্ব্বদাই যত্ন করে, সর্ব্বদাই কাজে ব্যস্ত, সর্ব্বদাই পরের উপকারে ব্যস্ত, এক দণ্ড স্থির হইয়া বসিতে চায় না। যেন একটা বিষাদের ছায়া অনবরত তাহার সঙ্গে ফিরিতেছে, যেন সে কেবল লীলার বুকের কাছে ঘেঁসিয়া আসিতেছে, সেইটাকে দূরে রাখিবার জন্য লীলা এ কাজে সে কাজে সর্ব্বদাই ব্যস্ত।

তবু ত ভুলিয়া থাকা যায় না। তবু কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে হয়,—একা! একা! রাত্রি-কালে গোপাল লীলার বিছানায় শয়ন করে, ঘুম ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে না দেখিতে পাইলে, দিদিমণি বলিয়া কাঁদিয়া উঠে। লীলা শয্যায় শয়ন করিয়া কেবল ভাবে, ভাবিতে ভাবিতে কতবার উঠিয়া বসে। কত রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় না, কত রাত্রে সুখের স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইলে চক্ষের জলে বালিস ভাসিয়া যায়। সকলের সব আছে, লীলার কিছু নাই! লীলা কাহারও সুখ দেখিয়া হিংসা করে না। সে কেবল নিজের অদৃষ্ট ভাবে। সবাই যেমন মানুষ, লীলা ত তেমনি মানুষ, তবে সে মানুষের সকল সুখে বঞ্চিত কেন? তার হৃদয়ের মধ্যে এতখানি ভালবাসা, এত সুখের তৃষ্ণা, এ সব কোথায় রাখিবে? আর কেবল মনে হয়—একা! একা! কেহ তাহার মুখ দেখিয়া হাসে না, কেহ তাহার জন্য দরজার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে না, কেহ ভাবে না—লীলার কি দুঃখ। লীলার গলার আওয়াজের জন্য কেহ কান পাতিয়া থাকে না, অসুখ হইলে কেহ তাহাকে স্নেহস্বরে নাম ধরিয়া ডাকে না। সমস্ত দিনের পর কেহ জিজ্ঞাসা করে না,—লীলা কোথায়? কেহ দেখে না,—তাহার পা দুখানি কেমন সুন্দর, তাহার চক্ষু কত কোমল। নারীজন্ম লইয়া প্রণয় কেমন, তাহা জানিতে পাইল না।

গ্রীষ্মকালে জ্যোৎস্নারাত্রে গোপালচন্দ্রের ঘুমন্ত মুখের উপর মুক্ত জানালা দিয়া জ্যোৎস্নালোক পড়িয়াছে। বালকের জ্যোৎস্নাশোভিত নিদ্রিত মুখ দেখিয়া লীলার চক্ষে জল আসিল। ভাবিল, যদি আমার একটি সন্তান থাকিত, তা হ'লে তাহার মুখ দেখিয়া সুখে থাকিতাম। লীলার মনে কত সুখের স্বপ্ন, কত কি উঠিতে লাগিল। গৃহপ্রবিষ্ট জ্যোৎস্নায় বসিয়া করতলে মস্তক রাখিয়া সে ভাবিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে গোপালচন্দ্র স্বপ্নে ভয় পাইয়া অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল। লীলার জাগ্রতস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

—*—

ঘর ভাঙ্গিল।

সুরেশচন্দ্র যে পঞ্চাশটি টাকা বেতন পাইতেন, সেগুলি পিতৃব্যের হাতে দিতেন। হরগৌরী বাবু সে টাকাগুলি সুরেশচন্দ্রের নামে জমা করিতেন। সংসারের ব্যয় যেমন আগে তিনি নির্ব্বাহ করিতেন, এখনও করেন, সুরেশের টাকা সুরেশেরই থাকিত। সুরেশের কর্ম্ম হইলে ছয় মাস পরে হরগৌরীবাবু পেন্সন লইলেন।

লোকে বলে, স্ত্রীলোকেই ঘর ভাঙ্গে, ঘরে ঘরে ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, পিতা-পুত্রে যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, গৃহের সুন্দরীরাই তাহার কারণ। তাঁহাদের নামে এমনতর অনুযোগ শুনিয়াও যে তাঁহারা কিছু বলেন না, আমি তাহাতে কিছু বিস্মিত হই। এই দেখ, সুরেশচন্দ্র তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া পিতৃব্যালয়ে বাস করেন। যা হউক, দশ টাকা নিজেও আনিতেছেন। হরগৌরী বাবুর বয়স হইয়াছে, তিনি পেন্সন লইয়াছেন। এমন অবস্থায়, এই এত বড় সংসারের ভার কি তিনি একেলা বহন করিতে পারেন? মানুষে যদি এই সব কথা একবার বলে,

অমনি বাড়ীর বাবুরা বলিয়া বসেন যে, স্ত্রীলোকেরা ঘর ভাঙ্গে।

হরগৌরী বাবুর স্ত্রী যে মানুষ মন্দ, তাঁহার যে মন কুচুটে, এ কথা আমি কখনই বলিতে পারিব না। তবে আমি শুনিয়াছি যে, তাঁর কান কিছু পাতলা। তাঁর এক মাসী বাড়ীতে থাকেন, তিনি লোক বড় ভাল নয়। তিনি দিবারাত্রি গিন্নীর কানে কানে ফিস্ ফিস্ করিয়া কত কি বলেন। সে সব শুনে শুনে কাজেই গিন্নীর মন ভারি হইয়া উঠিল। সুরেশচন্দ্রের বিবাহের পর হইতেই গিন্নীর মুখ একটু ভার ভার। সুরেশের বিবাহ হইল, আর তাঁর ছেলের বিবাহ হইল না, এই তাঁর দুঃখ। সুরেশচন্দ্রের যখন বিবাহ হয়, তখন হরগৌরী বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স পনর বৎসর বই নয়। তাহার বিবাহের কথা বলিলে কর্ত্তা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। তার পর কিরণ যখন ঘরবসতি করিতে আসিল, তখন মাসী গিন্নীকে বলিলেন, "সুরেশের ত কর্ম্ম হয়েছে, ও এখন দুধ জলখাবার নিজে করুক না কেন? কেন গো? ওঁদের কি চিরকাল খরচ জোগাতে হবে না কি? সত্যিই ত তুমি আর তার ধার ক'রে খাওনি!" গৃহিণী ভাবিলেন, "তাও ত বটে, চিরকাল আমি কেন সব খরচ ক'রে মরি? আমারও ত সময় অসময় আছে, ছেলেমেয়ের বিয়েথাওয়া আছে, আমি কত খরচ করিয়া উঠিব?" শেষ যখন কর্ত্তা পেন্সন লইলেন, তখন এক প্রলয়কাণ্ড বাধিবার উদ্যোগ হইল। হরগৌরী বাবু পেন্সন লইয়াও সুরেশের টাকা খরচ করিতেন না; ব্যাঙ্কে জমা করিতেন।

এক কথা উঠিলেই দশ কথা উঠে। সুরেশচন্দ্রকে এক দিন গৃহিণী বলিলেন, "বাধা, তুমি মাইনের টাকা ওঁকে না দিয়ে আমায় দেও না কেন?

সুরেশ উত্তর করিলেন, "বেশ ত, এই মাস থেকে দেব এখন।"

পেটের কথা একবার মুখে আনিলেই সে কথা আর ছাপা থাকে না। হরগৌরী বাবুও এই সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিতে পাইলেন; পরে যখন সুরেশচন্দ্র তাঁহাকে জানাইতে আসিলেন যে, এই মাস হইতে বেতনের টাকা খুড়ীমাকে দেওয়া হইবে, তখন কর্ত্তা রাগিয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "খুড়ীমা চাহিয়াছেন।"

কর্ত্তা পূর্ব্বের মত রাগিয়াই বলিলেন, "যদি তুমি টাকা আনিয়া আগের মত আমায় না দেও, তাহা হইলে আমি মনে করিব যে, তুমি আমায় অবিশ্বাস কর।"

সুরেশচন্দ্র মহাবিপদে পড়িলেন; আস্তে আস্তে গিয়া বাড়ীর গৃহিণীকে সব বলিলেন। শেষে কহিলেন, "খুড়ীমা, আমি ত কাকার কথা ঠেল্‌তে পারিনে।"

গিন্নী তাঁর মাসীর কাছে গিয়া মনের ঝালটা ঝাড়িলেন, বলিতে লাগিলেন, "উনি সুরেশ আর তার বউকে নিয়ে ঘর করুন, আমি বাপের বাড়ী চ'লে যাই। আমি বাড়ীতে আছি মাত্র, কোন কথায় একটি কথা কহিবার যো নেই। আমি এমন পাকা থাকৃতে চাইনে"

তুমি যেন মনে করিও না যে, তিনি যথার্থই বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন। আমাকে যদি সত্য কথা বলিতে হয় ত আমি বলিব যে, গিন্নীর বাপের বাড়ী বড় কেহ ছিল না। কিন্তু স্ত্রীলোকের রাগ হইলেই কেমন বাপের বাড়ী চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে, অভিমান হইলেই বাপের বাড়ী মনে পড়ে। সেই কারণে হরগৌরী বাবুর স্ত্রী বুড় বয়সে রাগ করিয়া বাপের বাড়ী যাইতে চাহিয়াছিলেন।

এই রকম নানা কথার মধ্যে কিরণ বাস করে। সে ত আর কানে তুলা গুঁজিয়া বেড়ায় না যে, কোন কথা তাহার কানে উঠিবে না? সে সব কথা শুনিল। গিন্নী ইদানীন্তন অনেক কথা তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতেন। শুনিয়া শুনিয়া কিরণ জ্বালাতন হইয়া উঠিল। স্বামীকে সব বলিল, তাহার পর কহিল, "এ বাড়ীতে আর কিছু দিন থাকিলে আমি বিষ খাইয়া মরিব।"

সুরেশচন্দ্র বুঝিলেন; বুঝিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পিতৃব্যের প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ছিল, পিতৃব্যকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে স্মরণ করিয়া তিনি কাতর হইলেন। কিন্তু না গেলেও নয়; যে বাড়ী আগে তাঁহার পক্ষে অমৃতালয় তুল্য ছিল, সেই বাড়ীতে আর তাঁহার থাকা হয় না, আর একটা দাঁড়াইবার জায়গা দেখিতে হইবে।

সুরেশচন্দ্র কতবার আগুপিছু করিলেন, কতবার ইতস্ততঃ করিলেন, মুখে সে পোড়া কথা আর কোনমতেই আসে না। এ দিকে পিতৃব্যগৃহ দিন দিন কণ্টকময় হইয়া উঠিল। অবশেষে সুরেশচন্দ্র পিতৃব্যকে বলিলেন।

হরগৌরী বাবু দাঁড়াইয়াছিলেন, সুরেশের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া পড়িলেন, তার পর সুরেশের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, আমার উপর রাগ কর নি ত?"

সুরেশচন্দ্র, সেই চতুর্বিংশতিবর্ষ-বয়স্ক পুরুষ, বালকের ন্যায় রোদন করিয়া, পিতৃব্যের পা জড়াইয়া ধরিলেন, ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, "আপনি আমার পিতার অধিক করিয়াছেন, আপনি অমন কথা বলিবেন না। আপনি কি সব জানেন না?"

হরগৌরী বাবুর চক্ষে এক ফোঁটা জল পড়িল, সে অশ্রুবিন্দু তিনি কোঁচার মুড়ো দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "বাবা, আমি সব জানি। তোমাকে যদি আমি বাড়ীতে থাকিতে বলি ত তোমার কষ্ট বাড়িবে। এই বৃদ্ধবয়সে আমাকে এই গৃহবিচ্ছেদ দেখিতে হইল। স্ত্রী হইতে এত কষ্ট হইবে কে জানিত?"

সুরেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিলেন, "থাক্, ও কথা থাক্, আপনি ও সব কিছু মনে করিবেন না। আমাকে পূর্ব্বে যেমন স্নেহচক্ষে দেখিতেন, তেমনি দেখিবেন। আমি আপনার সন্তান, আপনাকেই পিতা বলিয়া জানি। চিরকাল আমি আপনাকে সমান ভক্তি করিব।"

কর্ত্তা মহাশয় ঘরের ভিতরে গিয়া বাক্স খুলিয়া, একখানি ছোট খাতা বাহির করিয়া আনিলেন। সেখানি সুরেশচন্দ্রের হাতে দিয়া কহিলেন, "তোমার এক বৎসরের বেতন ব্যাঙ্কে জমা আছে। এই খাতা নাও। টাকা তোমার নামেই আছে। দেখ, বাবা, আমার সঙ্গে যেন কখন অম্বরস না হয়। বুড় খুড়াকে এক একবার দেখিতে আসিও। আর ক'দিনই বা আছি!"

সুরেশচন্দ্র সাশ্রুনয়নে পিতৃব্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

—*—

বেতন বৃদ্ধির নিমন্ত্রণ।

আজ রাত্রে বেতন-বৃদ্ধি উপলক্ষে গণেশচন্দ্র বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বৈঠকখানার ঘর একতালা। সেই ঘরে একখানা তক্তাপোষের উপর বিছানা পড়িয়াছে, আশে-পাশে খান চার পাঁচ চেয়ারও আছে। ঘরে হুঁকা, গুড়গুড়ি, দুই চলিতেছে। গণেশচন্দ্র পূর্ব্বে তামাকু খাইতেন না, কিন্তু এখন না খাওয়া ভাল দেখায় না বলিয়া, সম্প্রতি তামাকু ধরিয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে একটা সটকার নল চাদরের উপর পড়িয়া আছে, গণেশচন্দ্র নিজে ধূমপান করিয়া তাঁহার পার্শ্বস্থ বন্ধুকে মুখনলটি বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহাদের যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাহার অধিকাংশই ইংরাজী, আমি তাহার অনুবাদ করিব।

গণেশচন্দ্র ধূমপানান্তর বলিতেছেন, "কলিকাতায় উচ্ছন্ন যাইবার অনেক উপায় আছে। সব প্রথম, ব্রাহ্ম হওয়া, তাহার পর লেক্‌চার দেওয়া, স্পীচ ঝাড়া, দেশ উদ্ধার করা, আর খবরের কাগজ লেখা। আর একটা পথ আছে, কিন্তু তাহাতে যত নিজের অপকার হয়, তত আর কাহারও ক্ষতি হয় না।—কি হে! কবিকঙ্কণ যে! এস, এস!"

সুরেশচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলে, গণেশচন্দ্র সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমি বলিতেছিলাম, কবি হওয়া আর একটি মন্দ লক্ষণ। বলি, সুরেশ, সরস্বতীর সঙ্গে এখন তোমার বনিবনাও কেমন? আর কত দিন থাকিবে?"

ভোলানাথ মিত্র পাঠ্যাবস্থায় সুরেশের বন্ধু ছিলেন। তিনি এখন দুই শত টাকা বেতনের অধ্যাপনা কর্ম্ম করেন। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, সুরেশ, তুমি কেন একটা মহাকাব্য লেখ না? তুমি বকাসুর-বধ লেখ।"

সুরেশচন্দ্র ফিরিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি আগে শিশুপালবধের পরিচয় দাও।"

ভোলানাথ হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু হাসিটা চড়ুকে রকম।

রামকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় গণেশচন্দ্রের আফিসে কর্ম্ম করেন। তাঁহার সহিত সুরেশচন্দ্রের সামান্য আলাপ ছিল। রামকান্তকে লোকে বড় হিসাবী বলিয়া জানত। তিনি সুরেশের দিকে মাথা বাড়াইয়া, দক্ষিণ হস্তের উপর চিবুক রক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরেশ বাবু, আপনি না কি একখানা বই লিখিয়াছেন?"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "আজ্ঞা না, আমি কোন বই ছাপাই নাই।"

রামকান্ত বাবু অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, সুরেশ বাবু, তোমায় একটা পরামর্শ দি, শুন। তুমি একখানা মানের বই কি আর কোন স্কুল বই লিখিতে পার? দেখ, গঙ্গারাম বাগ্‌চি একখানা মানের কেতাব লিখিয়াছে, সেখানা কটক পর্য্যন্ত বিক্রী হয়। আমি জানি, সেই বই বিক্রী করিয়া সে দুই তিন হাজার টাকা লাভ করিয়াছে।"

সুরেশচন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া এ কথায় সায় দিলেন।

ভোলানাথ বাবু কথাটা শেষ করিলেন, "স্কুলের পাঠ্য কি অর্থের পুস্তক লেখা সকলের সাধ্য নয়। যে সে এ সকল বই লিখিতে পারে না। গঙ্গারাম নিজে কিছুই লেখে না। পরকে দিয়া লেখাইয়া লয়। নাম আর লাভ নিজের। গঙ্গারাম ত গঙ্গারাম।"

তাহার পর সুরেশচন্দ্রকে ছাড়িয়া অন্য কথা উঠিল। গণেশচন্দ্র বিদ্রূপ করিতে খুব দক্ষ। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বিদ্যা, যশ, যাহা কিছু আছে, তাঁহার বিদ্রূপের মুখে কিছুই টিকিতে পারে না। গণেশচন্দ্র যে স্বয়ং যথার্থ বিদ্বান, ইহাই তাহার প্রধান পরিচয়। লোকে যাহাকে বিদ্বান্ বলিয়া জানে, গণেশচন্দ্র জানেন, সে হস্তিমূর্খ। যাহাকে সকলে ধার্ম্মিক বলিয়া পূজা করে, গণেশচন্দ্র তাহাকে ভণ্ড প্রমাণ করেন। তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির সমক্ষে কিছুই লুক্কায়িত থাকে না। আর সকলে যাহাতে সৌন্দর্য্য দেখে, গণেশচন্দ্র তাহাতে কলঙ্ক দেখেন। বিদ্যাশিক্ষার ফলই এই। সাধারণ লোকে যেমন অন্ধ, উপাধিধারী বিদ্বান্ আর তেমন থাকে না।

পাঠ্যাবস্থায় গণেশচন্দ্র মদ্যপানের বিরোধী ছিলেন। এখনও তিনি পানাসক্তির বিরুদ্ধে আবশ্যকমতে বক্তৃতাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু নেশার ভয়ে সুরা স্পর্শ না করিয়া দুর্ব্বল চিত্তের পরিচয় বিবেচনা করিয়া, কখন কদাচ দু'এক গ্লাস পান করিতেন। আজ বহুদিনের অনুরোধে তিনি এক গ্লাস পান করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে চক্ষুর্দ্বয় গোলাপি রাগে রঞ্জিত হইল। গণেশচন্দ্র সুরেশচন্দ্রকে কহিলেন, "সুরেশ! এক গ্লাস খাও।"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "আমি ত খাই না, তুমি জান। আমি আর অধিক বিলম্ব করিব না, বাড়ী যাই।"

গণেশচন্দ্র হাসিলেন, "হা! হা! কেন হে? বাড়ীতে কি বুড় বকিবে না কি?"

সুরেশচন্দ্র কিছু দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "না, তা নয়। আমি এখন আলাদা বাড়ী ভাড়া করিয়াছি। বাড়ীতে আর কেহ নাই, তাই আর অধিক রাত করিব না।"

গণেশচন্দ্রের রঞ্জিত চক্ষু বিকসিত হইল। কহিলেন, "বটে? বুড়ার হাত এড়িয়েচ? ভাল মোর ভাই! এস, সেক্‌হ্যাণ্ড করি। বুড়দের দড়া-দ'ড় না ছিঁড়িলে কোন সুখ নাই।"

সুরেশচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, "দেখ, গণেশচন্দ্র! আমি আমার পিতৃব্যকে পিতার অধিক ভক্তি করি, তাহা তুমি জান। তাঁহার জন্য আমি তাঁহার গৃহ পরিত্যাগ করি নাই। দোষ থাকে ত আমার, তাঁর নয়; তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া আর কখন বিদ্রূপ করিও না।"

এ কথায় গণেশচন্দ্রের চমক হইল। তিনি সুরেশচন্দ্রের হাত ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া বসাইলেন। কহিলেন, "রাগ করিও না, ভাই! তামাসার মুখে একটা কথা বলিয়াছি, তাহাতে কি আমার উপর রাগ করিতে আছে? আহারের উদ্যোগ হইয়াছে, আহার করিয়া বাড়ী যাও।"

সুরেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি আহার করিয়া বাড়ী গেলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

-*-

নূতন গৃহিণী !

সুরেশচন্দ্র পৃথক্ হইয়া একটি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন। সহরের মধ্যে পঞ্চাশ টাকা বেতনের কর্ম্মচারী, ভাল বাড়ীতে কেমন করিয়া থাকিবে? তবু সুরেশচন্দ্র যে বাড়ীখানি ভাড়া করিলেন, সেটি নিতান্ত মন্দ নয়। সংসার নূতন পাতিয়াছেন কি না। সুরেশচন্দ্র তেমন হিসাব করিয়া উঠিতে পারিতেন না। বাড়ীখানি একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইলে, সেইমত ভাড়া কিছু বেশী হয়; বাড়ীভাড়া মাসিক বার টাকা পড়িল। আবার একটি ঝি নহিলে খুব গরীব গৃহস্থেরও কোন মতে চলে না, তাহাকে খাওয়া পরা, আর মাসে মাসে দেড় টাকা হিসাবে দিতে হইবে। অনেকে আমার উপর রাগ করিতে পারেন। সামান্ত টাকার জমাখরচের হিসাব দিবার আবশ্যক কি? এরূপ টাকাকড়ির হিসাব দেওয়া কোন ক্রমেই সুরুচিসঙ্গত নয়। আজকাল কাহাকেও বেতনসম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা আর অভদ্রতা নাই। তাহা হইলে সংসার-খরচের তালিকা বাহির করা কিসে ভাল হইল? তবে যদি দু' এক লক্ষ টাকার হিসাব হয়, সে কথা আলাদা। যে মাসে বিশ টাকা বেতন পায়, তাহাকে বেতনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে আপনাকে অপমানিত মনে করে, কিন্তু যে হাজার টাকার কর্ম্ম করে, সে সেই পরিচয় দিবার জন্য ব্যাকুল হয়। সেইরূপ দশ বিশ টাকার হিসাব দেওয়া নিঃসন্দেহ কুরুচির পরিচয়, কিন্তু লক্ষ টাকা যেখানে, সেখানে কুরুচি তিষ্ঠিতে পারে না। দুঃখের বিষয়, যাহাদের কথা বলিতে বসিয়াছি, তাহারা গরীবমানুষ। আর যখন আমি সত্য কথা বলিতে বসিয়াছি, তখন কিছুই গোপন করিতে পারিব না।

কিরণ পৃথক হইবে শুনিয়া, কিরণের মা এক জন পাচিকা ব্রাহ্মণী স্থির করিয়া দিলেন, আর কিরণকে বলিয়া পাঠাইলেন, "তুমি টাকার জন্য ভাবিও না। আমি ব্রাহ্মণীর মাহিয়ানা দিব।" সুরেশচন্দ্র শাশুড়ীর কাছে সে টাকা লইতে সম্মত হইবেন কেন? এইরূপে খরচের কোন দিকে কিছুই সাশ্রয় হইল না।

যেমন করিয়াই হউক, ঘর ত ভাঙ্গিয়াছে। দোষ কার? কিরণের, না বাড়ীর গৃহিণীর? বিষম সমস্যা। আলাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি মাটীতে আঁচড় দিয়া বলিতে পারি যে, এ বিচার করা আমার কাজ নয়। তোমরা এখন বুঝিয়া দেখ। আমি হয়ত কিরণের দোষ ঢাকিয়া গৃহিণীর নিন্দা করিব। তাহা তোমরা বিশ্বাস করিবে কেন? অনেকের মতে এই যে, এক হাতে তালি পড়ে না, একটা কাঠিতে কিছু বাজে না। অতএব, দোষ কিরণের আর গৃহিণীর, দু'জনেরই। কিন্তু এই কথায় আর এক কথা উঠিতে পারে। দু'টা হাত আর দু'টা কাঠির সঙ্গে দুই জন মানুষের তুলনা করা ত ভাল নয়। মনে কর, দু'টা কাঠি এক জায়গায় থাকিলেও বাজিতে পারে না। দু'টা হাত একত্রে থাকিলেও তালির শব্দ হয় না। দু'টা লোক এক স্থানে থাকিলে ঝগড়া হয়। যদি মানুষের সঙ্গে আর কাঠির সঙ্গে তুলনাই চলে, তাহা হইলে বুঝা উচিত যে, যে দু'টা কাঠিতে বাজে, যে দুই জন লোক ঝগড়া করে, তাহাদের কোন দোষ নাই। যে বাজায়, তাহার দোষ। তোমরা যদি এই সিদ্ধান্ত যথার্থ বিবেচনা কর, তাহা হইলে দোষ, না কিরণের, না গৃহিণীর। দোষ যত সেই লাগানে ভাঙ্গানে মাসী ঠাকুরাণীর।

তা, সে যাই হউক, কিরণ নূতন বাড়ীতে আসিয়া আর আহ্লাদ সামলাইতে পারে না। সে জন্য তোমরা কিরণের উপর রাগ করিও না। কিরণের আনন্দ আর কোন কারণে নয়, তার আনন্দ, সে এখন ঘরের ঘরণী গৃহিণী হইয়াছে বলিয়া। অজাতশ্মশ্রু বালক যেমন মনে করে যে, গুম্ফশ্মশ্রুতে অধিকার হইলেই জগতে আর কিছুই তাহার বাঞ্ছনীয় থাকিবে না, সেইরূপ আমাদের এই ছোট ছোট মেয়েগুলি মনে করে যে, সংসারের গৃহিণী হইতে পারিলেই, ঝিকে বাজারের পয়সা বুঝাইয়া দিতে পারিলেই, ভাণ্ডার আপনার হাতে হইলেই, নারীজন্মের কোন সুখ বাকী থাকিবে না। কিরণ বরাবর জানিত যে, তাহাকে চিরকাল একটা সংসারের মধ্যে বউয়ের

রত থাকিতে হইবে, গৃহিণীপনা শিখিবার কখন কোন সুবিধা হইবে না। এখন দেখ, চৌদ্দ বছর বয়সে সে একেলা আপন সংসারের কর্ত্রী হইল।

কিরণ দেখিল, বাড়ীখানি মন্দ নয়। বাহির-বাড়ীতে একখানি একতালা ঘর, ভিতরে দোতালায় দু'টি ঘর, নীচে তিনটি। পাড়াতে তেমন গোলমাল নাই। সে দিকে গাড়ীঘোড়া তত অধিক চলে না, সেই জন্য ঘর ভাড়া কিছু কম। উপরের একটি ঘর শয়নের, আর এক ঘরে সুরেশচন্দ্র লেখাপড়া করেন। ঘরের সুমুখে একটুখানি বারান্দা আছে। ছাদে উঠিবার এক ভাঙ্গা সিঁড়ি, কিন্তু ন্যাড়া ছাদ বলিয়া সিঁড়ির দরজায় কুলুপ দেওয়া থাকে, কেহ ছাদে উঠিতে পায় না। কেবল গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার সময় কিরণ ছাদে উঠিত। নীচের একটি ঘরে রান্নাবান্না হয়, এক ঘরে ভাঁড়ার আর একটি ঘর লইয়া ঝি এবং ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণী বিবাদ করেন।

ভাঁড়ার বাজার হাতে পাইয়া কিরণ ঠাহরাইল, খরচের খুব ধরা-বাঁধা করিবে। লক্ষ্মী স্বয়ং যদি কাহারও বাড়ীর দাসী হন ত বাজারের পয়সা হইতে তিনি কিছু চুরী না করিয়া থাকিতে পারেন না। দাসীর দোষ কি গৃহস্থের দোষ, তা আমি জানি না; তবে এ কথা জানি যে, এ ভারতে এমন একটি দাসী নাই, যাহার হাতে বাজারের পয়সা দিয়া বিশ্বাস করা যায়। কেহ যদি আমাদের বোকা বলে ত আমরা তাহার মাথা হাতে কাটিতে উদ্যত হই। অথচ যে ঠকে, সে বোকা নয়। আমরা পদে পদে ঠকিতেছি, কাহাকেও ঠকাইতে পারি না, তবু বোকা বলিলে আমাদের ভারি রাগ হয়। বাড়ীতে ঝি, চাকর একটা সামান্য ফেরিওয়ালা হইতে আরম্ভ করিয়া বড় দোকানদার পর্য্যন্ত, স্যাকরা, দর্জ্জি, সকলেই আমাদিগকে ঠকাইতেছে, কিন্তু আপিসের সাহেব ছাড়া আর কাহাকেও ঠকাইবার আমাদের সাধ্য নাই।

সে কথা এখন থাক। কিরণ রাজকোষের মন্ত্রিত্ব পদ পাইয়া, বড় কঠোর শাসন আরম্ভ করিল। ঝি বাজার করিয়া আসিলে তাহার সম্মুখে পা ছড়াইয়া বসিয়া, কিংবা মাথা নীচে করিয়া দাঁড়াইয়া, ধামা লইয়া, ওলট-পালট করিয়া এক এক কড়ি করিয়া, হিসাব বুঝিয়া লইতে লাগিল। হিসাবে যে কিরণ তেমন পাকা, তা আমার বোধ হয় না, সেই জন্যই সে হিসাব লইয়া এত টানাটানি করিত। মাছ, আলু, পটল, বেগুন, আম, কলার হিসাব দিতে বেচারী দাসী গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিত। এমন অনল-পরীক্ষায় পড়িয়া হাড় ভাজা ভাজা হইবার উপক্রম দেখিয়া, দাসী এক দিন রাগিল। বলিল, "দিদিঠাকরুণ," একটুকু মেয়েকে কিছু মা-ঠাকরুণ বলা যায় না, "তুমি আমার হাতে কি এমন জমীদারী সঁপে দিয়েচ যে, এত কোরে নাজেহাল কর? দু আনা চার আনার বাজার কোরে আমি কত টাকা খাব? তা না হয় আমি কাল থেকে আর বাজারে যাব না। বাবু যেন নিজে বাজার করেন।"

দাসী রাগিল ত কিরণ অমনি নরম হইল। দাসী, কিরণ কিছু ভাল বুঝিতে পারে না দেখিয়া, পূর্ব্বেই বিলক্ষণ এক আধ পয়সা চুরী করিত, এখন সুবিধা বুঝিয়া আরও কিছু লাভ করিতে লাগিল।

যত গর্জ্জায়, তত বর্ষায় না। কিরণ যতখানি হিসাবী হইবার ভাণ করিয়াছিল, তাহার কিছুই হইল না। সে কাজকর্ম্মে তেমন পটু নয়। ভাঁড়ার হইতে চাল ডাল বাহির করিবার সময়, রোজ একটা একটা কাণ্ড বাধে। কোন দিন তেল ফেলিয়া দেয়, কোন দিন ঘি ফেলিয়া দেয়, কোন দিন ডালের সহিত সরিষা মিশাইয়া ফেলে। তার পর নিজে মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিয়া কাটিয়া রসাতল করে। এ দিকে ঘর ঝাঁট দেওয়া, বিছানা পাতা, তাও কিরণের সাধ্য নয়। ঘর ঝাঁট দিতে গেলে এক দিকের ধুলা আর এক দিকে জমা করে, আর নিজের নাকে মুখে চোখে চুলে ধুলা মাথামাখি করে। বালিসে ওয়াড় কোনমতেই সোজা পরাইতে পারে না। ঝি যতক্ষণ ভাল করিয়া কাজকর্ম্ম করে, ঘর-দোর পরিষ্কার করে, ততক্ষণ এ সব হয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, ঝির সঙ্গে এমন আদা কাঁচকলা সম্বন্ধ পাতাইয়া তার ক'দিন চলে? যদি নিজের তেমন গতর থাকে, নিজের সব কাজকর্ম্ম করিবার যোগ্যতা থাকে, তা হ'লেও বা দু'দিন ঝির সঙ্গে ঝগড়া-কোন্দল করিলে তেমন কিছু ক্ষতি হয় না।

সুরেশচন্দ্রের নিষেধ ছিল, তাঁহার ঘরে নথে

কখন ঝাঁটপাটের উপদ্রব না হয়। তাঁহার ঘরে দেখ, কতকগুলা বই, খাতাপত্র, কাগজের টুক্‌রা, একটা দোয়াত ভাঙ্গা আর একটা দোয়াত আস্ত, একখানা মাদুর, একটা ভাঙ্গা চেয়ার, কলম চারিদিকে ছত্রাকার হইয়া রহিয়াছে। চেয়ারের উপরে মানুষ বসিবার জায়গা নাই, খানকতক ছেঁড়া বই সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখিয়া বসিয়া রহিয়াছে। যে দিকে দেখ, কেবল ধূলা। পুস্তকে, খাতায়, মাদুরে, কাগজপত্রে চার আঙ্গুল পুরু ধূলা। যেন বাড়ীর সমস্ত ধুলা ঝির ঝাঁটার চোটে অন্য সকল গৃহ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, এই ঝঞ্ঝাটশূন্য গৃহের আশ্রয় লইয়াছে। সুরেশচন্দ্রের সেই রাশীকৃত ধূলার সঙ্গে কোন বিবাদ ছিল না।

শ্বশুরবাড়ী আসিয়া অবধি কিরণের ভারি ইচ্ছা যে, লীলার সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। কিরণ অনেক দিন শ্বশুরবাড়ী আসে নাই, তাহাতে মাস ছয়েক শ্বশুরবাড়ী থাকিয়াই পৃথক হইল, এই জন্য বাপের বাড়ী যাওয়া হয় নাই। নূতন ঘরের গৃহিণী হইয়া, দিনকতক গৃহিণীপনা না করিয়া আর কোথাও যাইতে তাহার তেমন মন সরিল না। এ দিকে সুরেশচন্দ্রও একেলা, তাঁহাকে এমন সময় ছাড়িয়া যাওয়া ভাল দেখায় না। এইরূপ নানা কারণে, কিরণের বাপের বাড়া যাওয়া এ পর্য্যন্ত স্থগিত ছিল। শ্বশুরবাড়ী থাকিতে কিরণ দুই তিনবার ঝিকে দিয়া লীলাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিল, কিন্তু লীলা আসে নাই। একে ত কিরণের শ্বশুরবাড়া অনেক লোক, বাপের বাড়ীর কেহ আসিলে দশ রকম কথা উঠিতে পারে, তাহাতে লীলা আর কোনখানে যাইতে রাজী নয়। দশ জনের বাড়াতে লীলা কি বলিয়া যাইবে? কিন্তু যখন কিরণ আলাদা বাড়ীতে উঠিয়া গেল, তখন ত আর কোন আপত্তি রহিল না। নূতন বাড়ীতে আসিতেই, কিরণ লীলাকে মাথার দিব্য দিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল। লীলা কি করে, বাড়ীতে আহারাদি করিয়া, কিরণের ঝির সঙ্গে পাল্কী করিয়া কিরণের সঙ্গে দেখা করিতে গেল। লীলা আহার করিয়া আসিয়াছে দেখিয়া, কিরণের কিছু রাগ হইল। তাহার পর যখন বুঝিল যে, আবার উনুন পাতিয়া পাক করিয়া খাইতে অনেক কষ্ট, তখন সে রাগ থামিল।

কিরণ লীলার হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া উপরে লইয়া গেল। লীলা হাসিয়া কিরণের সঙ্গে উপরে উঠিল। দোতালায় লইয়া গিয়া, কিরণ মহা বিপদে পড়িল। বাড়ীতে কেহ আসিলে, তাহাকে ঘর-দোর জিনিসপত্র দেখাইবার একটা নিয়ম আছে। বৈঠকখানায় ছবি, ঝাড়, ঘড়ি, বিছানা দেখাইয়া স্ত্রীলোকেরা নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকদিগকে আপ্যায়িত করে। বাপের বাড়ী থাকিতে কিরণ কত লোককে বাহিরবাড়ীর ঘর দেখাইত। এখন সে ঘরের কি দেখাইবে? তা লীলার কাছে আবার লজ্জা কি? কিরণ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। কহিল, "দেখ, দিদি, আমার ঘর দেখ।"

বোধ করি, কিরণ মনে করিয়াছিল, লীলা তাহার ঘর দেখিয়া হাসিবে। তাহার ঘরে দেখিবার মত কোন সামগ্রী নাই, আল্‌না-সাজান ভাল ভাল কাপড় নাই, দেয়ালে ছবি নাই, কাচের আলমারী করা খেলনা নাই, বিছানার উপর ধোপ চাদর পর্য্যন্ত নাই। কিরণ যদি মনে করিয়া থাকে যে, লীলা তাহার ঘর দেখিয়া তামাসা করিবে, তবে, সেটা কিরণের ভারি ভুল। ঝাড় ঝুলান, ছবি টাঙ্গান ঘর লীলা যতক্ষণ ধরিয়া না দেখে, ততক্ষণ কিরণের সেই সামান্য ঘর ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। কি দেখিল, বলি শুন। ঘরের এক কোণে কতকগুলা ময়লা কাপড়, এক দিকে কতকগুলা জঞ্জাল, বিছানার উপর একখানা ভাঙ্গা চিরুণী, এইরূপে ঘর সজ্জিত রহিয়াছে। ঘরের এই অবস্থা দেখিয়া, লীলা একটুখানি হাসিল। তাহার পর কিরণের দিকে চাহিয়া দেখিল, গৃহিণীও ঘরের উপযুক্ত বটে। মাথার চুলগুলা রুক্ষ রুক্ষ, দেখিতে ঠিক টোকার মত। আর খোঁপার শ্রী কি আর বলিব। লীলা বলিল, "কিরণ, তুমি এমন অগোছাল কেন? ঘর-দোর কি এমন কোরে রাখতে হয়?"

কিরণ আঙ্গুল মট্‌কাইয়া, আলস্য ভাঙ্গিয়া বলিল, "আমি পারিনে ভাই। ঘর আমি যত পরিষ্কার কর্‌তে যাই, তত আরও নোংরা হয়।"

লীলা আর কিছু না বলিয়া, কাপড় চোপড় গোচগাচ করিয়া রাখিল, এক দণ্ডের মধ্যে ঘরখানি দিব্য পরিষ্কার হইল। কিরণ হাসিয়া বলিল, "তুমি ভাই যদি মাঝে মাঝে এসে আমার ঘর দোর দেখে

যাও, তা হ'লে কেউ আর আমায় নোংরা বল্‌তে পারবে না। তুমি ঘরে এলে ঘরের যেন লক্ষ্মীশ্রী হয়।"

লীলা বলিল, "পাশের ঘরে কি হয়?"

এই ত কিরণ আর হাসি রাখিতে পাবে না। বলিল, "ওটা ওঁর পড়্‌বার ঘর। এস, এস, একবার ঘরের মুর্ত্তি দেখসে।"

সুরেশচন্দ্রের ঘরে শিকল দেওয়া থাকিত। কিরণ শিকল খুলিয়া লীলাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, "তুমি আমার ঘরের নিন্দা করছিলে? একবার এ ঘরখানি দেখ।"

লীলা অনেকক্ষণ ঠাহরাইয়া ঘরের সব সাজসজ্জা দেখিল। দেখিয়া বলিল, "এ ঘরও তোমার দোষেই ময়লা হয়েচে। ঘর ঝাঁট দেওয়া ত আর পুরুষের কর্ম্ম নয়। তুমি এ ঘর এমন করিয়া রেখেচ কেন? এই ঘর তোমার আরও পরিষ্কার রাখা উচিত।"

কিরণ ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "এ ঘরে ঢুকতে পাইনে, ঝাঁট দেওয়া ত চুলায় যাক। এ ঘরে ঝাঁটপাট বারণ, এ ঘরে কারুর আসা পর্য্যন্ত বারণ। এ ঘরে আবার ঝাঁট দেবে কে?"

লীলা বলিল, "আমি দেব!"

কিরণ কহিল, "সর্ব্বনাশ! তা হ'লে আজ আর কি আমার মাথা থাক্‌বে? এ ঘর ঝাঁট দেওয়ার হুকুম নেই। আর যদি শুনতে পান যে, তুমি ঝাঁট দিয়েচ, তা হ'লে কি আর রক্ষা থাক্‌বে? বল্‌বেন যে, "ঘরঝাঁট দেবার জন্য বুঝি নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল?"

লীলা হাসিল। কহিল, "দেখ ত, আমি আগে ঘরটা পরিষ্কারই করি। তার পর তিনি এলে পরে তুমি আমার নাম কোরো। আমিও ত তখন থাক্‌ব। তোমার কোন ভয় নেই।"

কিরণ। তা তুমি যা জান, তাই কর ভাই! তোমার সঙ্গে ঝগড়া বেধে গেলে আমি বেশ দেখব এখন। আমি বল্‌ব—আমি কি জানি, দিদি জোর করে ঘরঝাঁট দিলে।"

লীলা। তা তুমি বল।

লীলা ঘরঝাঁট দিবার আগে একটি বুদ্ধির কাজ করিল। কোথায় কি থাকে, সব খুব ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তার পর কাগজ পত্র, বই, খাতা যেটি যেমন ছড়ান রহিয়াছে, সেটি ঝাড়িয়া সেইখানে রাখিল। শেষে সেই ধুলার রাশি ঝাঁট দিয়া দিয়া বাহির করিয়া ফেলিল। ঝাঁট দেওয়া হইলে কিরণ দেখে, লীলার চুলে ধুলা লাগিয়াছে। তখন কিরণ তাড়াতাড়ি চিরুণী আনিয়া লীলার চুল আঁচড়াইয়া দিতে উদ্যত হইল। লীলা কিছুতেই চুলে চিরুণী দিতে দিবে না, কিরণও কোনমতেই ছাড়িবে না। কিরণের জিদ বেশী, একটা কথা চেপে ধরা তার বিলক্ষণ অভ্যাস আছে, কাজেই তাহার জিত হইল। কিরণ জোর করিয়া লীলাকে বিছানায় বসাইয়া, তাহার চুল খুলিয়া ফেলিল। লীলার মাথায় খোঁপা ছিল না, চুলগুলা কেবল জড়ান ছিল। তার পর যখন লীলার মাথায় সেই রাশি রাশি কাল কাল কোঁকড়ান চুল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, তখন কিরণ বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। লীলা কিরণের চেয়ে মাথায় কিছু বড়, আর তাহার চুল হাঁটুর নীচে পড়ে। গোচে চুল এত বেশী যে, কিরণ দুই হাতে ধরিতে পারে না। চুল এমনি ঘন যে, চিরুণীতে ভাল গেলে না। কিরণ আর কোনমতেই সে চুলের ভার সামলাইয়া উঠিতে পারে না। দু'চারবার চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া কিরণ ঘামিতে লাগিল। লীলা ফিরিয়া তাহার মুখ দেখিয়া বলিল, "থাক্‌, বেশ হয়েচে।" কিরণ তা শুনিবে কেন? সে যেমন করিয়া পারিল, জোট পাকাইয়া, কতক চুল ছিঁড়িয়া, চিরুণীর দু'টা দাঁত ভাঙ্গিয়া, লীলার চুল আঁচড়াইয়া দিল। অবশেষে লীলা একটু হাসিয়া কহিল, "তুমি আমার চুল ছিঁড়ে দাও, তাতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু মাথায় বড় লাগে যে।"

তখন কিরণ একটু অপ্রতিভ হইয়া লীলার চুল ছাড়িয়া দিল। লীলা সেই কেশরাশি এক হাতে তুলিয়া লইয়া জড়াইয়া একটা গেরো দিয়া বাঁধিল।

কিরণ কহিল, "দিদি, কি সুন্দর চুল তোমার! আহা! আমার যদি এমন চুল থাক্‌ত। তোমার চুল আমায় দেবে ভাই?"

লীলা কিরণের মুখ চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "এখনি। আমার এ এক রাশি চুলে কাজ কি ভাই? তোমার মা কোনমতে কাটতে দেন না, নইলে এ চুল কবে ফেলে দিতাম।

কিরণ আর কিছু না বলিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। চোখ দু'টি জলে পুরিয়া উঠিল।

লীলা তাড়াতাড়ি বলিল, "এস কিরণ, তোমার চুল বেঁধে দিই, কত দিন তোমার চুল বেঁধে দিই নি।"

কিরণের চোখে জল ভরিয়া আসিয়াছিল। চোখের জল সামলাইয়া হাসিয়া কহিল, "হাঁ দিদি, চুল বেঁধে দাও না। আর কারুর কাছে চুল বেঁধে আমার মন উঠে না।"

এই বলিয়া কিরণ মাথার ফিতা, কাঁটা, আরশী সব সংগ্রহ করিল।

লীলা অনেকক্ষণ ধরিয়া কিরণের চুল আঁচড়াইয়া, জোট ছাড়াইয়া, একটি সোজাসুজি এলো খোঁপা বাঁধিয়া দিল। কিন্তু সেই খোঁপায় কিরণকে এমনি সুন্দর দেখাইতে লাগিল যে, সে বলিবার নয়। খোঁপা বাঁধিয়া, গামছা দিয়া মুখ মুছাইয়া দিয়া, লীলা কিরণের থুঁতি ধরিয়া বলিল, "এইবার বেশ দেখাচ্ছে।" কিরণ লীলার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া চুপ করিয়া রহিল। লীলাও কিরণকে দুই হাতে জড়াইয়া, বুকের ভিতর টানিয়া লইল। দুই জনে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

বৈকালে সুরেশচন্দ্র বাড়ী আসিলেন। কিরণ সিঁড়ির নীচে মাথার কাপড় খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুরেশচন্দ্র কিরণকে দেখিয়া কহিল, "এমন সুন্দর খোঁপা বাঁধিয়া দিল কে? এ ত তোমার সাধ্য নয়।"

সুন্দর খোঁপাটি কিরণের ঘাড়ের উপর পড়িয়াছে। কিরণ সেই খোঁপা দোলাইয়া কহিল, "কেন, আমি কি আর খোঁপা বাঁধতে জানিনে না কি? তুমি কেবল বল যে, আমি কিছু করতে পারিনে। দেখ, আজ কেমন খোঁপা বেঁধেছি।"

সুরেশচন্দ্র হাসিয়া কহিলেন, "তাই ত। তোমার যে এত রকম আসে, তা ত আমি জানতাম না।" এই বলিয়া, সুরেশচন্দ্র কিরণের খোঁপা ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন।

"কি কর! এখনি ঝি আসিবে," বলিয়া কিরণ সিঁড়িতে উঠিয়া গেল। সিঁড়িতে উঠিতে আগে সুরেশচন্দ্রের ঘর; সে ঘরে প্রত্যহ শিকল দেওয়া থাকে, আজ দোর হাট করা রহিয়াছে। সুরেশচন্দ্র সিঁড়িতে উঠিয়া দোর খোলা দেখিয়া গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোর খোলা কেন?"

কিরণ আপনার ঘরের দরোজাগোড়ায় দাঁড়াইয়াছিল। কহিল, "আমি কি জানি?" সুরেশচন্দ্র আরও গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দোর খুলিবার কি আবশ্যক ছিল?"

কিরণ কহিল, "তা আমি কি জানি?"

সুরেশচন্দ্র তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঘরে ঝাঁট পড়িয়াছে। অমনি গম্ভীর স্বর সপ্তমে উঠিল। সুরেশচন্দ্র ঘর হইতে বলিলেন, "আমার ঘর কে ঝাঁট দিল?"

কিরণ তার সেই খোঁপা দোলাইয়া বাহির হইতে বলিল, "তা আমি কি জানি?"

হাসিতে হাসিতে কপালব্যথা। সুরেশচন্দ্র সবে আপিস হইতে আসিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত তাঁহার ধড়াচূড়া ছাড়া হয় নাই। যে ঘর ঝাঁট দিতে তিনি বার বার বারণ করিয়াছেন, সেই ঘরে ঝাঁট পড়িয়াছে। কিরণ কোন কথার উত্তর দেয় না, কেবল রঙ্গ দেখিতেছে। কাজেই সুরেশচন্দ্রের ভারি রাগ হইল। তিনি ঘরের বাহিরে আসিয়া রাগিয়া বলিলেন, "এমন কোরে বিরক্ত করলে আমি বাড়ী থাকব না। আমার ঘরে ঝাঁট দেবার আবশ্যক কি? কাগজপত্র সব ফেলে দেওয়া হয়েচে। এমন কোরে বিরক্ত করলে আমি বাড়ী থাকতে পারব না। কি বল, আমি বাড়ী ছেড়ে যাই?"

এত দূর হবে, সেটা কিরণ বুঝিতে পারে নাই। আমি ত বলিয়াছি, হাসিতে হাসিতে কপালব্যথা ধরিল। কিরণ যে সদা সর্ব্বদা এত হাসে, সেটা তার বয়সের দোষ। এমন বয়সে মেয়েরা কেবল কথায় কথায় হাসে। শুধু হাসির কথায় যে হাসে, এমন নয়; সব কথায় হাসিয়া একেবারে গড়াগড়ি। এত হাসি পায় কোথা হইতে, আমি তাই আশ্চর্য্য হই। আজ আবার তাহাতে সত্য সত্যই হাসিবার কারণ রহিয়াছে। এতক্ষণ কিরণ মুখে কাপড় দিয়া খুব হাসিতেছিল। সুরেশচন্দ্রের এমনতর রাগ দেখিয়া, থতমত খাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

সুরেশচন্দ্র আরও দু'চার কথা শুনাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় লীলা কিরণের ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল, "আমি তোমার ঘর ঝাঁট দিয়েচি। কিরণের কোন দোষ নেই।"

তথন সুরেশচন্দ্র আর লুকাইবার পথ পান না। লীলাকে ঢিপ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া কহিলেন, "দিদি এসেচ, তা আমার মনে ছিল না।"

লজ্জায় পড়িলে মানুষ যেমন করিয়া হউক, সে লজ্জা ঢাকিবার চেষ্টা করে। সুরেশচন্দ্র আর কোন উপায় না দেখিতে পাইয়া, কিরণের উপর আর একবার একটু রাগিয়া কহিলেন, "দিদিকে দিয়ে কি ঘর ঝাঁট দেওয়াতে হয়? এই জন্য বুঝি নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল?"

কিরণ আগে থাকিতে সুরেশচন্দ্রের এই কথাটি বলিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু এখন আর স্বামীর সঙ্গে কথা না কহিয়া, ঘোমটা টানিয়া আপনার ঘরে লুকাইল।

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "কিরণের খোঁপা কার হাতের, এইবার বুঝিলাম। আর যখন তুমি আমার ঘর পরিষ্কার করেছ, তখন সব ঠিক আছে।"

লীলা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তুমি ঘরে গিয়া দেখ না, কিছু ওলট-পালট হয়েচে কি না।"

সুরেশচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সব যেমন ছিল, তেমনই আছে। বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "সব ঠিক আছে বটে, কিন্তু একটি জিনিস যে নেই।"

লীলা কিছু চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি নেই?"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "আমার সে ধুলাগুলি কোথায় গেল? তাদের যে আর দেখতে পাই না।"

তখন ভারি হাসি পড়িয়া গেল। লীলা হাসি রাখিতে পারে না। কিরণ ঘরের ভিতরে খুব হাসিতে লাগিল। লীলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা সত্য বটে। তবে কি ধুলাগুলা আবার এনে দিব না কি?"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "না, আনতে হবে না। দু'চার দিনের মধ্যে তারা আপনি আসবে এখন।"

এই বলিয়া সুরেশচন্দ্র কাপড় ছাড়িতে গেলেন। মুখ হাত ধোওয়া হইলে লীলা তাঁহার ঘরে জলখাবার লইয়া গেল। কিরণ দরজার বাহিরে নাক পর্য্যন্ত ঘোমটা টানিয়া দাঁড়াইয়াছিল। লীলার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা করিবার সম্পর্ক, কিন্তু সুরেশচন্দ্র কখন তাহার সহিত তামাসা করিতেন না, লীলাও কখন তাঁহাকে তামাসা করে না। কিরণ ঘরে আসে না দেখিয়া সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "দিদির সাক্ষাতে আবার লজ্জা কি? ওঁকে মাঝে মাঝে নিয়ে আসবে, কিন্তু ওঁর সাক্ষাতে লজ্জা করলে উনি আসবেন কেন? ঘোমটা খুলে তুমি ঘরে এস!"

কিরণের মনে মনে কতক ইচ্ছা ছিল যে, লীলার সাক্ষাতে স্বামীর সঙ্গে কথা কয়, তার পর সুরেশচন্দ্রের পীড়াপীড়িতে যেটুকু লজ্জা বাকি ছিল, সেটুকুও গেল। কিরণ ঘরে আসিয়া মাথায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইল। সুরেশচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "দেখ দিদি, কিরণ কিছু গোচগাচ করিতে পারে না, সেই জন্য আমার ঘরে ঝাঁট দিতে বারণ করি। কোথায় কোন্ কাগজখানা ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিবে, তার পরে আমি হাত-পা আছড়াইয়া মরিব। আর আমার ঘর অপরিষ্কার থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই। আমার তাতে কোন কষ্টবোধ হয় না।"

লীলা কহিল, "এখন কিরণ ছেলেমানুষ, তাই সব দিকে পেরে ওঠে না। এর পর আপনি সব দেখিবে শুনিবে, তখন আর কিছু ব'লে দিতে হবে না।"

কিরণ বরাবর লীলার দিকে চাহিয়াছিল, একবারও স্বামীর দিকে তাকায় নাই। সে লীলার আঁচল ধরিয়া কহিল, "দিদি, তুমি যদি এ বাড়ীর গিন্নী হ'তে ত ঘর-দোর বেশ পরিষ্কার থাকৃত। আমার মত কথাও শুনতে হ'ত না।"

লীলার মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কহিল, "ছি! অমন কথা কি বলতে আছে!"

সুরেশচন্দ্রও বড় লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "কিরণ তুমি বুঝি দিদির সঙ্গে তামাসা আরম্ভ করলে? তামাসার সম্পর্কটা হয়েছে ভাল। আর আমি কখন্ একবার একটু রেগেছিলাম, তা বুঝি চিরকাল মনে ক'রে রাখতে হয়?"

নূতন নূতন লজ্জা দূর হইলে, মানুষে প্রথম প্রথম বড় অধিক কথা কয়। বিয়ের কনে স্বামীর সঙ্গে যখন প্রথম কথা কহিতে আরম্ভ করে, তখন আর তাহার কথা ফুরায় না। কিরণের এখন অনেকটা সেই অবস্থা উপস্থিত। আগে ত লীলার সাক্ষাতে কথা কহিতে লজ্জা হইত, যদি কথা

ফুটিল ত মুখে হাত চাপা দিলেও আর কথা থামে না। এখন কিরণের মুখে খই ফুটিতে লাগিল। স্বামীর কথার উত্তর করিল, "বালাই! তুমি আবার আমার উপর রাগ করতে গেলে কেন? আজ আফিস থেকে এসে ত তুমি আমার উপর রাগ করনি, তুমি আমার পুজা কর্‌ছিলে। এই যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে বল্‌ছিলে, সে ত রেগে নয়।"

সুরেশচন্দ্র হাসিলেন, কহিলেন, "আজকে রাগের মুখে একটা কথা বলেচি ব'লে কি এতই রাগ কর্‌তে হয়? আর কখন কি তোমার উপর রাগ করেছি?"

কিরণ কহিল, "রাগ কর্‌বে কেন? সে দিন তোমার ঠাকুরঘরে বুঝি একবার এড়াকাপড়ে গিয়েছিলাম, তাই ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলে। আর এক দিন বাড়া ভাত আট্‌কে হয়ে যায় ব'লে দু'বার ভাত খেতে ডেকে'ছলাম ব'লে একেবারে চোখ পাকিয়ে ধম্‌কে এলে। তোমার শরীরে রাগ নেই ত। তোমায় আবার রাগী কে বলে? আবার এক দিন—"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "থাম, হয়েছে। আমার হার, তোমার জিত। এই সব সামান্য কথা তোমার যেমন মনে থাকে, অন্য কথা যদি তেমন মনে থাকৃত, তা হ'লে বাঁচতাম।"

লেখাপড়ার কথা হইলেই কিরণ আর বড় এগোয় না। ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, "সকলের ত আর সমান বুদ্ধি-শুদ্ধি হয় না। তা না হয় আমি বোকা আছি। তার এখন কি হবে?"

সুরেশচন্দ্র লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, তোমার পড়াশুনা অভ্যাস আছে?"

পড়াশুনার কথা, খাওয়ার কথা, আর স্বামীর অথবা শ্বশুরবাড়ীর কথা উঠিলেই স্ত্রীলোকদের মহা লজ্জা উপস্থিত হয়। অভ্যাস ত সহজে ছাড়া যায় না। কাজেই লীলা একটু লজ্জা পাইয়া কহিল, "আমায় ত কেউ পড়তে শেখায় নি। নিজে নিজে একটু শিখেছিলাম, কিন্তু এখন আর কিছু পড়া হয় না।"

সুরেশচন্দ্র। কেন?

লীলা। কি পড়্‌ব? পড়বার আর ত ভাল বই পাই না।

সুরেশচন্দ্র। পাইলে পড়?

লীলা। পড়ি।

সুরেশচন্দ্র। আমি তোমাকে বই দিব, তুমি খুব যত্ন করিয়া পড়িবে। বই পড়ায় যে কত উপকার, তা পড়িতে পড়িতে আপনি জানিতে পারিবে। পৃথিবীতে এমন কষ্ট নেই, যা পড়াশুনার অভ্যাসে না কমে।

লীলা তখন অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কহিল, "তুমি আমাকে বই দিও, আমি পড়িব।"

বোধ করি, লীলার মনে আশা হইল যে, তাহার সঙ্গে প্রতিনিয়ত দুঃখের যে ছায়া ভ্রমণ করে, এইবার তাহাকে দূর করিবার উপায় হইল।

অন্ধকার হয় দেখিয়া লীলা কিরণকে কহিল, "রাত হয় ভাই, আজ আমি বাড়ী যাই।"

সিঁড়িতে নামিয়া আসিতে লীলা কিরণের কানে কানে কহিল, আমার সঙ্গে ঝগড়া হবে বলেছিলে না? কেমন, আমি ত তোমাদের দু'জনের কোন্দল দেখে নিয়েচি।"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে কার সাধ্য যে ঝগড়া করে? তোমার মুখখানি দেখে ঝগড়া কর্‌তে মন সর্‌বে কেন?

পাল্কীতে উঠিয়া লীলা কহিল, "এ পোড়া মুখ পুড়িলেই বাঁচি।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

মনোমোহিনী নিমন্ত্রণে।

গণেশচন্দ্রের বাটীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া সুরেশচন্দ্র বিবেচনা করিলেন, একবার তাঁহারও নিমন্ত্রণ করা উচিত। কিরণ ছেলেমানুষ, একলাটি থাকে, কোথাও যাওয়া আসা নাই, এ জন্য সুরেশচন্দ্র তাহাকে কহিলেন, "এক দিন গণেশচন্দ্রের স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ কর।"

শ্রীমতী মনোমোহিনী গাড়ী করিয়া নিমন্ত্রণে আসিলেন; সঙ্গে চার বছরের একটি ছেলে। কিরণ একটু সলজ্জভাবে একটু হাসিয়া, তাঁহার

হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল। মনোমোহিনী ঘরে বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। ঘরে কিছু দেখিবার মত নাই বলা লজ্জার কথা, কিন্তু তোমরা সকলেই জান যে, কিরণের ঘর সাজান নয়, আর সে তেমন পরিষ্কারও নয়। সুতরাং শ্রীমতী মনোমোহিনী সে ঘর দেখিয়া যে বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এমন আশা করা যায় না। ঘর দেখা হইলে মনোমোহিনী কহিলেন, "এখানে তোমার বড় একলা একলা বোধ হয় না ?"

কিরণ কহিল, "আগে আগে যেমন বোধ হ'ত, এখন আর তত একলা বোধ হয় না।"

মনোমোহিনী আপনার শরীরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার গায়ে বড় অধিক গহনা ছিল না, কিন্তু যে কয়খানি ছিল, সেগুলি বেশ ভারি ভারি। আপনার শরীর দেখিয়া কহিলেন, "আমি আর এক গা গহনা পরিতে পারি না ; বড় গরম বোধ হয়। গহনা বাক্সের মধ্যেই তোলা থাকে। বল দেখি, গহনা পরিতে তোমার কেমন বোধ হয় ?"

কিরণ কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আমার খুব বেশী গহনা নেই ত, আর যা আছে, তাও তেমন ভারি নয়। গহনা প'রে আমি তেমন কিছু কষ্ট বুঝতে পারিনে।"

মনোমোহিনী ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "তা ভাই, সকলের ত সমান সুখ হয় না! কিন্তু আমরা তাতে কিছু মনে করিনে। এই দেখ, আমার বাপের বাড়ীর পাশে এক ঘর বামন আছে, তারা বড় গরীব, কিন্তু আমরা তাদের সঙ্গে ঠিক আপনার লোকের মত ব্যবহার করি।"

কিরণ। সে ত সুখ্যাতির কথা।

মনোমোহিনী। তুমি আমার বাপের নাম শুনেচ ?

কিরণ ভারি লজ্জায় পড়িল। কহিল, "না।"

মনোমোহিনী। রাজবল্লভ সরকার, মস্ত মুচ্ছুদ্দী, নাম শোন নি ? সহরশুদ্ধ লোকে তাঁর নাম জানে যে! তা তুমি ছেলেমানুষ, কখন বাড়ীর বার হও নি, তুমি কি করেই বা শুনবে।

কিরণ। হাঁ, নাম শুনেছি।

মনোমোহিনী। শোন্‌বারই ত কথা। কে তাঁর নাম না জানে ? আমাদের বাড়ী তুমি দেখনি বুঝি ? আর দমদমায় আমাদের যে বাগান-বাড়ী আছে, সেটা কত বড় বাড়ী! ঘর দোর চমৎকার সাজান, ঘরে ঘরে বড় বড় আরশী, মস্ত বাগান দু'টা পুকুর। বাগানের আমই বা কি মিষ্ট! একবার তোমাকে আমাদের বাগানে নিয়ে যাব।

কিরণ যে বড় কম কথা কয়, তা নয়, কিন্তু আজ সে বড় বড় আরশী, আর খুব মিষ্ট আমের কথা শুনিয়া কিছু গম্ভীর হইল। কহিল, "বেশ ত।"

আমি নিঃসংশয় বলিতে পারি, তুমি আমি বড় বড় বাড়ী, বড় বড় আরশী, বড় বড় বাগান যেমন হাঁ করিয়া দেখি, এ সকলের কথা তেমনি হাঁ করিয়া শুনি। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, শ্রীমতী মনোমোহিনীর খোকা বাবুর এমন কথাবার্ত্তার দিকে মূলেই কান ছিল না। হয় খোকা বাবু বড় বড় বাগান-বাড়ী অনেক দেখিয়া থাকিবেন, এজন্য তিনি পুরানো কথায় আর তেমন মন দিলেন না, না হয় খোকা বাবু এই সব গুরুতর বিষয়ের মর্ম্ম এ পর্য্যন্ত বুঝিতে সক্ষম হন নাই। সে যাই হউক, তিনি একটা অতি তুচ্ছ সামগ্রীতে নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন। কিরণের অধিবাসের ডালায় একটা কাচের পুতুল, ঘরের একটা কুলুঙ্গীতে পড়িয়াছিল। খোকা বাবু একমনে সেইটা দেখিতেছেন, চক্ষের পলক পড়ে না। অবশেষে তিনি মাতার অঞ্চল ধরিয়া সজোরে টানিয়া কহিলেন, "মা, আমি ঐ কুকুরটা নেব।"

একবার তোমরা মনে করিয়া দেখ, মনোমোহিনীর কতখানি মাথা হেঁট হইল। গরীবের ছেলে বড়মানুষ হইয়া বাপকে দেখিয়া আরও অধিক লজ্জিত হয় কি না সন্দেহ। যাহার বাপের এমন বাগানবাড়ী, এত টাকার বিষয়, তাহার ছেলে মাতুলালয়ের ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া গিয়া, পরের বাড়ীতে আসিয়া, একটা সামান্য কাচের পুতুল চাহিয়া বসিল, যেন তাহা কখন দেখে নাই! বল দেখি, তোমরা এমন হতভাগা ছেলে কোথাও দেখিয়াছ ? মনোমোহিনী কত চোখ টিপিলেন, কত হাত নাড়িলেন, কতবার চোখ রাঙ্গাইলেন, কিন্তু সেই লক্ষ্মীছাড়া ছেলে কিছুতেই বুঝিল না। চোখরাঙ্গানি দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু আগের সুর ছাড়িল না। আনুনাসিক সুরে আবার ধরিল, "আমি ঐ কুকুরটা নেব।"

কিরণ হাসিয়া সে কুকুরটা তাহার হাতে আনিয়া দিল। তখন খোকা বাবু সেটাকে কোলে করিয়া, হাতের উল্টা পিট ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চোখ মুছিয়া চুপ করিলেন।

মনোমোহিনী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। তার পর বাপের বাড়ীর কথা রাখিয়া শ্বশুরবাড়ীর কথা পাড়িলেন। কহিলেন, "উনি যখন পাশ কোরে আপিসে বেরোন, তখন কত লোকে ওঁকে ডেকে নিয়ে যেতে এসেছিল। উনি যেতে চাইলেন না। আগে একশ টাকার কর্ম্ম হয়েছিল, এখন কুড়ি টাকা বেড়েচে। আর সাহেব যে ভালবাসে, দেড়শ টাকা খুব শীঘ্রই হ'বে। সাহেব বলেচে, বাঙ্গালী লোকে এত বিদ্যা শিখতে পারে না।"

একটু পরে মনোমোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্বামী কোন্ ঘরে বসেন?"

কিরণ কহিল, "পাশের ঘরে?"

মনোমোহিনী। কেমন ঘর দেখি?

কিরণ কি করে, সুরেশচন্দ্রের ঘর দেখাইল। লীলার ঝাঁট দেওয়ার পর, সে ধুলাগুলি আবার আসিয়া জমা হইয়াছিল। মনোমোহিনী সে ঘর দেখিয়া বুঝিলেন, গণেশচন্দ্রের বিদ্যা কত বেশী। গণেশচন্দ্রের ঘর খট্ খট্ করিতেছে, কোথাও একটি কুটা নাই, ঘরে টেবিল পাতা, চেয়ার সাজান। সুরেশচন্দ্রের ঘর অত্যন্ত অপরিষ্কার, টেবিল নাই, যাও একখানি চেয়ার আছে, সেটি মানুষ বসিবার জন্য নয়।

গমনকালে মনোমোহিনী কিরণকে পরামর্শ দিয়া গেলেন, "তুমি ঘরে একটি টেবিল আর চেয়ার রেখ। ঘর বেশ কোরে ঝাঁট দেবে, আর যত সব কুচো কাগজ ফেলে দেবে। বাঁধান খাতা পত্র, বই, এই সব ছাড়া আর কিছু থাক্‌তে দেবে না। তা, হ'লে ঘর বেশ হ'বে।"

পরদিবস প্রভাতকালে সুরেশচন্দ্র তাঁহার ঘরে বসিয়া পড়া-শুনা করিতেছেন, এমন সময় কিরণ সম্মার্জ্জনী হস্তে সেই ঘরে প্রবেশ করিল। সুরেশচন্দ্র দেখিয়া অবাক্।

কিরণ কহিল, "তুমি ওঠ, আমি ঘর ঝাঁট দেব।"

সুরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"ঘর দেখলে গা কেমন করে। আজ থেকে আমি ঘর ঝাঁট দেব।"

"ভারি যে মাথাব্যথা দেখতে পাই। আমার ত ঘর কখনও ঝাঁট দেওয়া হয় না জানই, তবু ঝাঁটা নিয়ে এসেছ কেন?"

"কাল গণেশ বাবুর বউ ঘর দেখে যে কোরে বল্লেন। এমন ঘরে আবার মানুষ থাকে! একটা টেবিল, আর খানকতক চেয়ার কিন্‌তেই হ'বে।"

"তাই বল। আমি ভাবছিলাম, বুঝি দিদির কথাটা আজ মনে পড়ল। গণেশ বাবুর স্ত্রী বলেচেন! তিনি কি বলেচেন?"

"বলেচেন আমার মুণ্ড আর আমার মাথা! এমন ঘর দেখে মানুষের হবিভক্তি উড়ে যায়। ঘরে চারিদিকে কাগজের টুক্‌রা ছড়ান রয়েচে। এগুলা সব ফেলে দেব।"

এই বলিয়া কিরণ কাগজগুলা কুড়াইতে লাগিল।

সুরেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি তাহার হাত হইতে সেগুলা কাড়িয়া লইয়া রাগিয়া কহিলেন, এগুলা ফেলে দেবে বই কি! আমাকে ফেলে দেও না কেন? আর টেবিল, চেয়ার আনা না আনা আমার ইচ্ছা। তুমি আমার ঘরে কিছু কোরো না। নিজের ঘর যত ইচ্ছা হয় সাজিও। আমার ঘর হাটকাতে এস কেন? আমি কখন তোমার ঘরের কিছু ঘাঁটি?"

কিরণ নাকের নোলক নাড়িয়া কহিল, "তুমি ভারি জান! গণেশ বাবুর বউ কত বড় মানুষের মেয়ে, তা জান? তার বাপের কত বড় বাগানবাড়ীর আছে, দু'টা পুকুর, কত জায়গা। তাদের যেটা পছন্দ, সেটা ওঁর পছন্দ হ'লো না। তুমি অমন কেন?"

সুরেশচন্দ্র আরও রাগিলেন, কহিলেন, "যাদের আছে, তাদের আছে, তোমার ত নেই। আমাদের যেমন আছে, আমরা তেমন করব, যাদের বেশী টাকা আছে, তারা তেমনি করবে। এ সব পরিচয় তোমায় কে দিল? গণেশবাবুর স্ত্রী নিজে বল্লেন বুঝি?"

কিরণ। বল্‌বে না কেন? তাদের আছে, তারা বল্‌বে না কেন?

সুরেশচন্দ্র তখন হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন,

"দু'জনে মিলেচে ভাল। কর্ত্তাগিন্নী দু'-জনেই সমান। কেমন ক'রে বল্‌লেন, একবার বল না। 'আমার বাপের মস্ত বাড়ী, মস্ত পুকুর, কত ছবি।' আর কি বল্‌লেন?"

সুরেশচন্দ্র হাত নাড়িয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া এই সব কথা বলিতে লাগিলেন। কিরণের তখন আর সহ্য হইল না। ঘরের বাহিরে ঝাঁটাগাছটা ফেলিয়া দিয়া, রাগে গস্‌ গস্‌ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সুখ-দুঃখ।

যেটি আমরা মনে করি, সেটি কিন্তু হয় না। দেখ, কিরণের যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন সকলেই মনে করিয়াছিল, কিরণ সুখে থাকিবে। কিরণ যে এখন অসুখে আছে, তা নয়, কিন্তু আমরা যেমন সুখের কথা বলি, তা কিরণের কপালে ঘটিল কৈ? ঘরে ঘরে স্বামি-স্ত্রী যেমন করিয়া থাকে, তাহাতে প্রণয়ের আদর্শ কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বই লিখিতে হইলে সেই আদর্শটিই দেখান চাই। বোধ করি, কেতাবের মধ্যে ফুলের গন্ধটুকু দেওয়ার নিয়ম আছে, কাঁটাটি দেওয়া বারণ। অতএব যদি আমি বলি যে, সুরেশ ও কিরণের ক্রমে মনান্তর হইবার উপক্রম হইল, তাহা হইলে সেটা আইনবিরুদ্ধ কাজ হয়। বাস্তবিক, কিরণের তেমন কিছু অসুখ হয় নাই, কিন্তু তাহাদের মনের মিলন তেমনতর ত হইল না। কেমন করিয়া মিলিবে? মনের মানুষ মিলা ত সোজা কথা নয়। তুমি কি ভাব, দু'দিন একত্রে থাকিলেই, প্রণয়ের দুট মিষ্ট কথা কহিলেই মনের মিলন হয়, হৃদয়ের সহিত হৃদয় বাঁধা পড়ে? দেখ না, এই বিশ্ব একতাপূর্ণ অথচ বৈষম্যময়। যে জগৎ জগদন্তরকে অনন্ত কাল ধরিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছে, সে উভয়ের মধ্যে কত লক্ষ যোজন ব্যবধান! অসীম স্থানে জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া অন্ত পিণ্ড ঘুরিতেছে, নক্ষত্র হইতে আলোকতরঙ্গ শত সহস্র বৎসর অচিন্ত্য-বেগে প্রধাবিত হইয়া মানব-লোকে নিপতিত হইতেছে। কেহই কাহার সহিত মেলে না, মেশে না। এই ভবসমুদ্রে আমরা পাশাপাশি সাঁতারিয়া চলিয়াছি, কেহ ডুবিতেছে, কেহ উঠিতেছে, কেহ পার হইতেছে। সকলে কাছাকাছি আসিতেছে, কিন্তু মিশিতেছে কয় জন? হৃদয়, মন বাঁধিলে বাঁধা যায় না। দুইটি মানুষ একত্র হওয়া সহজ, দুইটি হৃদয় মেশা কঠিন!

তবু দিন যায়। যেমন করিয়াই হউক, দিন কাটিয়া যায়। যাহারা মনে করিয়াছিল, তাহাদের সুখ ফুরাইবার নয়, তাহারা সে সুখের আশা ছাড়িয়া দিয়া দিন যাপন করে। যখন সংসার পাতা যায়, তখন আমরা কত সুখ-শান্তির আশা করি, তার পর সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু সংসার এক রকম করিয়া চলিয়া যায়। আমাদের কিরণেরও তাই হইল। সে যে তেমন কিছু অধিক সুখের আশা করিয়াছিল, তা আমি বলিতে পারি না, তবে সে যেটা মনে করিয়াছিল, সেটা হইল না। সুরেশচন্দ্র যে কখন তাহাকে আদর করেন না, কখন তাহাকে দুটা মিষ্ট কথা বলেন না, এমন নয়, কিন্তু কিরণ দেখিল যে, আগেবার মত ভালবাসা আর নাই, দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। কিরণ কিছু কর্ম্ম, কিছু অকর্ম্ম করিয়া, একটু সোহাগ পাইবার জন্য স্বামীর কাছে যায়। মনের মানুষ না পাইলে কত অসুখ! সুরেশচন্দ্র কি লেখেন, কি পড়েন, কি ভাবেন, কিরণ তা কিছু বুঝিতে পারে না। কাজেই যতই দেখিত যে, তাহার স্বামী অন্য দিকে ব্যস্ত, কিরণের দিকে বড় নজর নাই, তখন তার মনে আপনা-আপনিই একটু রাগ, একটু দুঃখ হইত। কোন কোন দিন ঝগড়া হইলে সে বলিত, "আমার চেয়ে একটুখানি কাগজ পর্য্যন্ত ভাল। আমায় মনে পড়বে কেন? আমি কোথাকার কে?" এটা হ'ল রাগের মুখের কথা, কেন না, সুরেশচন্দ্র এক এক সময় কেতাবপত্র ফেলিয়া কিরণের সঙ্গে গল্প করিতেন, তাহাকে কত আদর করিতেন। তখন মেয়ের অভিমান দেখে কে! কিছুতেই আর কাছে যাওয়া হয় না, কোন মতেই আর ভাল করিয়া কথা কওয়া হয় না। সুরেশচন্দ্র যত ডাকেন,

তত বলে, "আমার কাজ কি? আমাকে আবার ডাকচ কেন? তুমি যা ভালবাস, তাই নিয়ে থাক।" এক এক সময় আবার যেন আগেকার সেই ভালবাসা ফিরিয়া আসে। সুরেশচন্দ্র তখন দুঃখ করিয়া বলেন, "আমি তোমার মত কিছুই করতে পারি না কিরণ, তোমার ভালবাসার কিছুই শুধিতে পারি না। আর কাহারও হাতে পড়িলে অনেক সুখে থাকিতে।"

কিরণ অমনি হাত দিয়া সুরেশচন্দ্রের মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "অমন কথা বললে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।"

এক এক দিন কিরণের খেয়াল চাপিত, ঘর মুক্ত করিবে। পাশের ঘরে সুরেশচন্দ্র ঘোর ভাবনায় মগ্ন, কিংবা একমনে লিখিতেছেন, এমন সময় কিরণ বিছানা বালিস দুম্ দাম করিয়া বারান্দায় ফেলিয়া, ঝাঁটা হাতে ঘর ঝাড়িতে আরম্ভ করিল। সুরেশচন্দ্র ঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "এই সময় না হলে বুঝি আর কোন কর্ম্ম হয় না? আমার সঙ্গে তোমার যে কেন এমন শত্রুতা, তা জানি না।"

কিরণ কহিল, "তা থাক্ না, ঘরে পোকা পড়ুক, আমি আর কিছু করব না।" এই বলিয়া তড়্ তড় করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আর এক দিন সকালবেলা ঝি বাজার করিয়া আসিয়া বামণ ঠাকুরুণের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কথা কহিতেছে, আর বামণঠাকরুণ মাঝে মাঝে বলিতেছে, "হ্যাঁ ঝি, সত্যি! কি সর্ব্বনাশের কথা! আস্পর্দ্ধাটা দেখ!" কিরণ উপর হইতে গলা বাড়াইয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঝি?"

ঝি তখন কিরণের দিকে মাথা তুলিয়া সেই সঙ্গে একটু গলা বাড়াইয়া কহিল, "দেখ, দিদি ঠাকরুণ, আজকে বাজারে সব বলচে কি না, এক ঘর বড় মানুষের বাড়ীর চাকর, দিনের বেলা বাড়ীর ভিতর ঢুকে সিন্দুক ভেঙ্গে টাকা চুরি করচে। বাড়ীর গিন্নী বুড়মানুষ, ঘুমিয়েছিল, তার গলার হার কেটে নিয়েছে। নিয়ে কাপড়ের ভিতর পূরে বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় এক জন ঝি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'কাপড়ের ভিতর কোরে কি নিয়ে যাচ্ছিস্ রে?' মিন্সে বললে 'ইস্কুলে জলখাবার নিয়ে যাচ্ছি।' এই ব'লে যে গেল, সে আজও গেল কালও গেল। পুলিসের লোক এখন তাকে খুঁজচে। এখনো ধরতে পারে নি।"

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?"

ঝি বলিল, "এই যে গো, বিস্তর দূর নয়।"

সুরেশচন্দ্র যে ঘরে লিখিতেছেন, সেটা আর কিরণের মনে রহিল না। কিছু জোরে বলিল, "মাগী কি মরেছিল না কি? গলা থেকে হার কেটে নিয়ে গেল, তাতে মাগীর সাড় হ'ল না? কি ঘেন্নার কথা!"

এই কথা সুরেশচন্দ্রের কানে গেল। তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, "ওগো, ক্ষমা দাও গো! চীৎকার করবার এত ইচ্ছা থাকে, নীচে গিয়ে চেঁচাও না। আমাকে কি বাড়ীতে টেঁকতে দেবে না?"

এ সব ত গেল রাগারাগির কথা। এইবার দুট ভাল কথা বলি। এক দিন বামণঠাকরুণের জ্বর হইয়াছে, সে দিন সে আর রাঁধিতে পারে না, কোথায় তার মাসীর না পিসীর বাড়ী চলিয়া গেল। বলিয়া গেল, "কাল আসিব।" এ দিকে বাড়ীতে এমন কেহ নাই যে, রাঁধিতে জানে। কিরণ কখন হাতে বেড়ী ধরে নাই, রাঁধার ত কথাই নাই। আজ সে অম্লানবদনে বলিল, "কেন, আমি রাঁধিব।" সুরেশচন্দ্র ভয়ে সারা, বলেন, না, কাজ নাই, শেষে হাত-পা পুড়াইয়া বসিবে। আর এক বিপদ ডাকিয়া কাজ নাই। এক দিন না হয় রান্না নাই হইল, বাজার হইতে লুচি কিনিয়া আনাও।"

কিরণ কহিল, "আমি ত আর খুকী নই যে, হাত পুড়িয়ে ফেলব। আর, এক দিন বামণ-ঠাকরুণ নেই ব'লে যে হাঁড়ি চড়বে না, সেই বা কেমন কথা? আমার কি এমন সঙ্গতি আছে যে, আমি চিরকাল রাঁধুনী রাখবো?

সুরেশচন্দ্র দেখিলেন, এ তর্কে কিরণেরই জিত, অতএব তিনি অনিচ্ছাপূর্ব্বক চুপ করিয়া রহিলেন।

তার পর রান্নার বড় ধূম পড়িয়া গেল। অন্য দিন যেমন সাদা-সিধা মাছের ঝোল ভাত আর

কিছু ভাজা-পোড়া হয়, আজ আর সে রকম হবে না। সুরেশচন্দ্রের আফিসের তাড়া, সকাল সকাল যা জুটিয়া উঠে, আহার করিয়া যান, কিন্তু আজ কিরণ পঞ্চব্যঞ্জন ভাত রাঁধিতে বসিল। অম্বল, চড়চড়ি, ডাল্না, ঘণ্ট, কিছু ছাড়িল না। সুরেশচন্দ্র উপরে ছিলেন, কিন্তু সে দিন আর তাঁর তেমন পড়াশুনা হইল না। থাকিয়া থাকিয়া এক একবার ঘরের বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কতদূর?" লঙ্কার ফোড়নের ধোঁয়া লাগিয়া খানিকক্ষণ কাসি আর থামে না। উপরে সুরেশচন্দ্র কাসেন, রান্নাঘরে কিরণ কাসে। তার পর তেলের চড়চড়ানি, ঘিয়ের কলকলানি, মাছ"াঁতলানি প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ক্ষান্ত হইলে, সুরেশচন্দ্র কতক স্থির হইয়া ঘরে বসিলেন। খানিক পরে কোথাও কিছু নাই, কিরণ ছুটাছুটী উপরে আসিয়া সুরেশচন্দ্রকে ডাকিতে লাগিল। দেখ, একবার কিরণের মুখখানি দেখ! কপালে চুলগুলি ঘামে জড়াইয়া গিয়াছে, মুখখানি আগুনের তাতে লাল হইয়া উঠিয়াছে, কপাল দিয়া দর দর করিয়া ঘাম পড়িতেছে, হাতে খুন্তী। কিরণ আসিয়া ডাকিল, "ওগো, একবার শুনে যাও না।"

সুরেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "হাত পোড়াও নি ত?"

কিরণের হাত যে একেবারে পোড়ে নাই, এমন নয়। হাতে তপ্ত তেলের ছিটা লাগিয়া দুটা ফোস্কা পড়িয়াছিল। সে কিরণের মনেও নাই। সে কহিল, "হাত পুড়বে কেন? আমি কেমন রেঁধেছি, একবার দেখে যাও।" সুরেশচন্দ্র কিরণের সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে গেলেন। সেখানে গিয়া কিরণ বলে, "কেমন রেঁধেছি, একটু মুখে দিয়ে দেখ্‌তে হবে।"

সুরেশচন্দ্র হাস্যমুখে কহিলেন, "হ্যা, তা হবে বৈ কি। তুমি রেঁধেছ, আমি খাব, তার আবার কথা?"

আগে কিরণ চিংড়ীমাছের ডাল্না বাহির করিল। ডাল্না তপ্ত আগুনের মত, তখন পর্য্যন্ত ধোঁয়া উঠিতেছে। ফুঁ দিয়া জুড়াইলে পরে, সুরেশচন্দ্র আস্বাদ গ্রহণ করিলেন। মুখে দিয়া কহিলেন, "বাঃ! চমৎকার!"

কিরণের মুখময় হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিল, "যাও, ঠাট্টা করতে হবে না। ছাই হয়েচে বুঝি? নুণে পুড়ে গিয়েচে না কি?"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "না, নুণ সমান হয়েচে।"

এইরূপে একে একে সব মুখে দিয়া দেখা হইল। সুরেশচন্দ্রের মুখে আর সুখ্যাতি ধরে না।

তুমি হয় ত মনে করিতেছ, কিরণ বুঝি সত্য সত্যই বড় রাঁধিয়াছিল। সেটা কিন্তু ভুল। কিরণ যেমন রাঁধিয়াছিল, তোমার বাড়ীর ব্রাহ্মণী তেমন রাঁধিলে, তুমি তার পরদিন তাহাকে তাড়াইয়া দিতে, আর যদি সে দিন সুরেশচন্দ্রের বাড়ী তোমার নিমন্ত্রণ থাকিত, তাহা হইলে সাত বাড়ী নিন্দা করিয়া বেড়াইতে। আমি বেশ জানি, যদি ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণী সেই অপূর্ব্ব ডালনা রাঁধিতেন ত সুরেশচন্দ্র বকিয়া বাড়ী ফাটাইয়া দিতেন। ঝি মাগী সে দিন কিছুই খাইতে পারে নাই, ডাল্না মুখে দিয়া বলিয়াছিল, "এ কি সুকৃতুনি হয়েচে না কি? মানুষে কি এমন রান্না খেতে পারে?" তার পর মাগী ভাত ফেলিয়া দিয়া, বাজার হইতে জলপান কিনিয়া খায়। কিন্তু সুরেশচন্দ্র আর কিরণ দু'জনে সোনা হেনমুখ করিয়া দিব্য ভাত খাইয়াছিলেন।

আর এক দিন সন্ধ্যার সময় কিরণ ছাদে বসিয়া ছিল। সন্ধ্যার সময় কখন তারা দেখে নাই, এমন মানুষ কোথাও আছে? আমরা আমাদের কাজে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, আকাশ দেখিবার অবকাশ থাকে না। তবু এক একবার একেলা বসিয়া সন্ধ্যার আকাশে তারা দেখিলে, কতকগুলা অদ্ভুত কথা মনে আসে। হয় ত ভাবি, এমন এক দিন আসিবে, যখন এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে আর আশ্রয় পাইব না, যখন এই নরদেহ পরিত্যাগ করিয়া ঐ নীল আকাশে অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিব, যা কিছু ভালবাসিতাম, সব পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে, অনন্তের মধ্যে অনন্ত বাসনা ভাসিয়া বেড়াইবে। হয় ত তখন এই পরিশ্রান্ত আত্মা আর কোথাও বিশ্রাম করিবে, নক্ষত্রের চরণে উপবেশন করিবে। হয় ত মনে করি, ইহজগতে কেহ আমার মন বুঝিল না, কেহ আমার মুখ চাহিয়া দেখিল না।

ওই নক্ষত্রে এমন কেহ আছে, যাহাকে পাইলে আমার সুখ হইত। কিরণ এমনতর কোন কথা ভাবিতে জানে না। সে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিল, এক জায়গায় অনেকক্ষণ চাহিয়া দেখিলে আরও তারা দেখা যায় কি না। তার পর ভাবিল তারাগুলি কত দূর, কত বড়? মানুষ মরিয়া কি তারা হয়? আজকাল আবার বলে, তারাগুলা সূর্য্যের মত, তবে কি এতগুলা সূর্য্য আছে? এই রকম খানিক ভাবিয়া, কিরণ সে ভাবনা ছাড়িয়া দিল। তখন বাপের বাড়ীর কথা, লীলার কথা, মনোমোহিনীর কথা ভাবিতে লাগিল। এমন সময় সুরেশচন্দ্র আসিয়া তাহার পাশে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাব্‌ছিলে?"

কিরণ কহিল, "ভাব্‌ব আবার কি? আমি তোমার মত দিন রাত ভাব্‌তে পারিনে। তা হ'লে পাগল হয়ে যাব যে।"

সুরেশচন্দ্র কিরণের হাত ধরিয়া কহিলেন, "দেখ, কিরণ, কেমন সুন্দর তারা উঠেছে!"

কিরণ কহিল, "তা ত রোজ দেখ্‌চি। আজ এমন কি বড় সুন্দর?"

সুরেশচন্দ্র। আচ্ছা, কিরণ, তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দাও ত। দেখ, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, এ তিনই আমরা আকাশে দেখতে পাই। বল দেখি, এ তিনটির মধ্যে তোমার কি হ'তে ইচ্ছা যায়?

কিরণ। কি বল, ভাল লাগে না। অমন অনাছিষ্টি কথা বল কেন?

সুরেশচন্দ্র। তা হোক্, তুমি আমার কথার উত্তর দাও না। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌চি, উত্তর দিলে ক্ষতি কি?

কিরণ। আমার তারা হ'তে ইচ্ছা করে। তারা হওয়া বেশ।

সুরেশচন্দ্র। কেন বল দেখি? সূর্য্য এত বড় দেখ্‌তে, যা নহিলে দিন হয় না, যাকে সকলে পূজা করে, যার এমন আলো, সে সূর্য্য হ'তে তোমার ইচ্ছা করে না? আচ্ছা, সূর্য্য যেন আগুনের মত দেখ্‌তে, কিন্তু চাঁদ হতে তোমার ইচ্ছা করে না, সে কি কথা? চাঁদ এমন সুন্দর যে, চাঁদের সঙ্গে সুন্দর মুখের তুলনা করে। চাঁদের মতন মুখ হ'লে বত্তাও, অথচ চাঁদ হ'তে চাও না? জ্যোৎস্না কেমন সুন্দর বল দেখি? এমন চাঁদ থাক্‌তে তারা হ'তে তোমার কেমন ইচ্ছা যায়, বল না?

কিরণ। তা আমি জানি না। তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌লে, আমি উত্তর দিলাম। কেন, কি বৃত্তান্ত, অত শত আমি জানি না।

সুরেশচন্দ্র উর্দ্ধমুখে নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, কিরণ! তোমার তেমন বই পড়া অভ্যাস নাই, বইয়ের কথা বলাও অভ্যাস নাই, তবু তুমি মানুষের মনের ইচ্ছা ঠিক বলিয়াছ। কত কথা আমাদের মনে আসে, আমরা কিছুই বলিতে পারি না। সে সব কথা কেন মনে আসে, বুঝাইবার যো নাই। তারা হইতে আমাদের কেন ইচ্ছা হয়, জান? মানুষ যেমন অনেক, তারাও তেমনি গণা যায় না। মানুষের জীবন যেমন চঞ্চল, তারার জ্যোতি তেমনি চঞ্চল। তাই আমরা ভাবি যে, সংসারের খেলাধূলা ফুরাইলে, আমরা তারা হইয়া আকাশের এক কোণে লুকাইয়া থাকিব। চন্দ্র-সূর্য্য হইয়া আমাদের কি সুখ? চিরকাল একেলা থাকিতে হইবে, যাহাদের ভালবাসি, কখন তাহাদের মুখ দেখিতে পাইব না! যখন আমাদের দিন ফুরাইবে, যখন আর আমরা এমন হাত ধরিয়া নক্ষত্রের নীচে বসিয়া থাকিব না, তখন আমরা দুই জনে দুটি তারা হইব। দুই জনে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আকাশে উঠিয়া পরস্পরের মুখ চাহিয়া দেখিব। কেমন, কিরণ, তাহা হইলে সুখ হয় না?"

উত্তরে কিরণ স্বামীকে বুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া, মুখের উপর মুখ, চোখের উপর চোখ রাখিয়া ফোঁপাইয়া কহিল, "আমি যেন আগে যাই। আমি সেখানে তোমার পথ চেয়ে থাকব।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

নবজীবন

লীলার জীবনের অন্ধকার রজনীতে কোথাও যেন অতি মৃদু প্রভাত পবন বহিল। সে দেখিল যে,

হই পড়িলে আপনার চিরদুঃখের কথা কতকটা ভুলিয়া থাকা যায়। লীলা বুদ্ধিমতী, প্রখরা স্মৃতিশালিনী, পাঠাভ্যাসে স্মরণশক্তি আরও মার্জ্জিত হইতে লাগিল। লীলা কল্পনার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, সেই বিস্তৃত রাজ্যের অতুল সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইল। রাত্রিকালে সকলে নিদ্রিত হইলে সে প্রদীপ জ্বালিয়া পড়ে। হাসে, কাঁদে, ভাবে, নিশ্বাস ত্যাগ করে। আপনিই ভাঙ্গে, আপনিই গড়ে। যে এত দিন অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া বেড়াইতেছিল, যে দিকে যায়, সেই দিকেই অন্ধকার, আজ সে এক দিকে আলোক দেখিতে পাইল। যে শয়নে স্বপনে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিত, সে এখন সুখের স্বপ্ন কল্পনা করে। একটা মানুষ নিজের দুঃখে অভিভূত হইবে, আর কাহারও জন্য ভাবিবে না? আর কি কোন ভাবনা নাই? লীলা এখন ভাবে, আমার এইটুকু দুঃখ লইয়া আমি জগৎ পুরিয়া রাখিয়াছিলাম? আমার এই দুঃখ, পৃথিবীর কত কোণে এমন কত দুঃখরাশি পড়িয়া রহিয়াছে। আমার কোন সুখ নাই, এই আমার দুঃখ, নহিলে আর আমার দুঃখ কি? কত লোক দুঃখের বোঝা বহিতে পারে না, তাহারা জীবন বহন করে কিরূপে? অনেক সময় লীলা আপনার দুঃখের কথা কিছুই ভাবে না। কল্পনানগরে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে, সুখশান্তির নিকেতন বিরচিত করে। কোথায় কোন্ চন্দ্রলোকে তরল কৌমুদী-তটিনী বাহিয়া যাইতেছে, তীরে বসিয়া লীলা। কত লোকে যায় আসে, কত বালক হাসে গায়, কত আনন্দের ধ্বনি, কত লোকের মেলা। লোকে লীলার মুখ দেখিতে আসে, কত বালক তাহার আঁচল ধরিয়া টানে। এখানে দেবতা, সেখানে দেবী, লীলা ফুল তুলিয়া দেবদেবীর পূজা করিতেছে। পাখী আসিয়া তাহার সম্মুখে গান করে, তাহার কাঁধে বসে। মাথার উপরে উড়িয়া ডাকে, "লীলা! লীলা!" ফুল মাথায় ঝরিয়া পড়ে, বাতাস আসিয়া গায়ে লাগে। লীলা কল্পনারাজ্যের প্রজা হইল। এক দিন লীলা একখানি গ্রন্থে পড়িল :—

"আমাদের দেশের একটি আচার দেখ। এই তোমার স্ত্রী,—তুমি হিন্দু, তোমার স্ত্রী, তুমি মরিলে যাঁহার অদৃষ্টে চিরবৈধব্য রহিয়াছে, যিনি তোমাকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন, তুমি যাঁহার কণ্ঠরত্ন, তিনি তোমার মৃত্যুর সময় কি করেন? তুমি কালশয্যায় শুইয়া আছে, যম দুয়ারে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে, তোমার যাত্রার আর বিলম্ব নাই। স্ত্রী পাশে বসিয়া আছেন, স্বামীর শ্বাস হইয়াছে। ক্রমে হাত পা হিম হইয়া গেল, অবশেষে প্রাণবায়ু বাহির হইল। অমনি স্ত্রী সরিয়া দাঁড়াইলেন। মরিলে ভূত হয়, ছুঁইতে নাই। এই শরীর, এই এক জনের সর্ব্বস্ব, আর এই শব, সেই জনেরই অস্পৃশ্য।"

লীলা ভাবিল, শরীর সর্ব্বস্ব নয়, সর্ব্বস্ব ত চিরকালই সর্ব্বস্ব থাকে। স্ত্রীলোকের আর কি আছে যে, সে স্বামীকে ভুলিয়া থাকিবে? মরণের পর কে সহজে ভোলে, স্ত্রী না স্বামী?

আর এক স্থানে পড়িল, "এক বিন্দু অশ্রু-জল হাসির, আর এক বিন্দু রোদনের, এ দুইয়ে কিছু প্রভেদ আছে? দুই সমান লবণাক্ত, দুই সমান স্বচ্ছ। আনন্দের অশ্রু আর বিষাদের অশ্রু একত্রে রাখিলে কে বুঝিবে—কোন্‌টি কিসের? আনন্দ আর নিরানন্দ, দুইয়ের ত একই ফল, দুই ত এক।"

লীলা একটি ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "হবেও বা! বুঝি সুখ দুঃখ কিছুই নাই, দুই বুঝি মনের ভুল। যেমন দুঃখ ভুলিয়া থাকা যায়, বুঝি সুখ ভুলিয়াও তেমনি থাকা যায়। হয় ত ভুলিতে পারাই সুখ, মনে রাখাই দুঃখ।"

এক একবার কোথাও কিছু নাই, লীলা আপনার মনে পড়িতেছে, সহসা তাহার প্রাণ চমকিয়া ওঠে, সহসা তাহার মনে হয়, একা! একা! কল্পনার সমুদ্রে কত লোকের সঙ্গে ভাসিয়া গিয়া, মাঝখানে গিয়া দেখ, আর কেহ তাহার সঙ্গে নাই, সকলে তাহাকে একেলা ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে। আমার বোধ হয়, লীলার প্রাণের এক অংশ শূন্য ছিল, তাহা কখন পূরে নাই। সেই স্থানের নিকট দিয়া আর কেহ গমন করিলে, সেই বিজন শূন্য স্থানে পদধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইত, তাহাতেই লীলা চমকিয়া উঠিত। সে অন্ধকারে আর কোথাও হইতে আলোকরশ্মি পতিত হইলে, সে অন্ধকার সঙ্কুচিত হইয়া লুক্কায়িত হইত।

প্রাণের একটা তৃষ্ণা লীলা কখন মিটাইতে পারে নাই, মনুষ্যজীবনের একটা সুখ সে ভয়ে কল্পনা করিত না, ভাবিত, সে সুখ স্বপ্নেও মনে করিলে, তাহাকে পাপ স্পর্শ করিবে। তথাপি লীলার নবজীবন আরম্ভ হইল।

লেখা-পড়ার কথায় আমার আর একটা মনে পড়িতেছে। সুরেশচন্দ্রের রচনার আর একটা নমুনা দেখাইব। গণেশচন্দ্র এক দিন সুরেশচন্দ্রের বাড়ী আসিয়া একখানা জীর্ণ খাতা টানিয়া বাহির করিলেন। যাহা যাহা পড়িলেন ও তাহার পর যে কথাবার্ত্তা হইল, পরে বলিতেছি।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

আজি।

"অন্ধকার! আর কোথাও কিছু নাই। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে, ঊর্দ্ধে, অধোমুখে অবিচ্ছিন্ন, অনন্ত অন্ধকার! ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, কল্পনাব্যাপী প্রগাঢ় অন্ধকার! যুগলমূর্ত্তি সেই অনন্তমেয় আয়তন জুড়িয়া আছে,—বিশাল, ভীষণ, ছায়াময় মূর্ত্তি। পুরুষ আর রমণী, ভয়ময় কালদম্পতি! ভবিষ্যৎ আর অতীত, দুই তমোময়, বিভীষিকাময়, মরণময় মূর্ত্তি চরাচর ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। শ্বাসরোধকারী অন্ধকার গলদেশে হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতেছে,—অতি ভয়ানক! মুক্তকেশী যামিনী চক্ষুঃশূন্য কোটরে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সেই ভীষণ দম্পতি-যুগলের মধ্যে প্রফুল্ল শিশুমূর্ত্তি! চক্ষে তারা জ্বলিতেছে, মুখে মধুর হাসি; কুঞ্চিত কেশ, কোমল গঠন, সুঠাম, সুললিত। দুই পার্শ্বে সেই ভয়ানক জনক-জননী! অন্ধকারের কোলে আলো, মরণের কোলে জীবন! অতীত পিতা, ভবিষ্যৎ মাতা, সন্তান আজি।

তারা নাই, চাঁদ নাই, নদী বহিতেছে,—নীরবে, নিঃশব্দে, অন্ধকারে, সুধীরে। কূল নাই, কিনারা নাই, তরী নাই, তুফান নাই, তরঙ্গ নাই! কালো জল, কালো আকাশ, জলে তারার হার নাই, কেবল অন্ধকার তটিনী বহিতেছে, মুখে কল কল কথা নাই, শরীরের মন্দ মন্দ আন্দোলন নাই, সোহাগ নাই, যৌবন নাই, মন্থর গতি নাই। অজস্র, অবিরাম, ধীর প্রবাহ।

বিদ্যুৎবিলসন, মেঘগর্জ্জন, বজ্রপতন! কর্ণ বধির হইয়া গেল। কড়্ কড়্—পৃথিবী থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। স্রোতস্বিনী অতি প্রবলবেগে ছুটিয়াছে। তোলপাড় করিয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, লহরের উপর লহর দুলিতেছে! প্রলয়ের নিশ্বাস প্রশ্বাস! গেল, গেল, সব গেল! পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। নগর-নগরী ভাসিয়া গেল! অন্ধকার, অন্ধকার! ভীম কোলাহল, আলোড়ন, ভৈরব উচ্ছ্বাস, সর্ব্বগ্রাসিনী বন্যা! সৃজনের চিহ্ন লোপ করিয়া ধাবিত হইয়াছে।

এই মিলন! নদীতে অন্ধকার মিলন। এই কোলাহলে আর নিস্তব্ধতায় মিলন, বেগে আর শান্তিতে মিলন। আঘাত প্রতিঘাত, জলে জলে সঙ্ঘর্ষণ, এই শুভ্র ফেন উঠিল, এই আলোক ফুটিল। এই ফেনের নাম, এই আলোকের নাম,—আজি!

বিস্তৃত মরুভূমি, বালুকারণ্য! উপরে আকাশ নাই, সীমাচক্র নাই, শুধু অন্ধকার। অতি বিশাল আয়তন, তরঙ্গায়িত সমুদ্রবৎ; অন্ধকারময় মরীচিকা, ছায়াময় দেহীর ভীষণ নৃত্য! ধূঃ ধূঃ ধূঃ ধূঃ অসীম স্থানব্যাপ্ত প্রসার। আশার অস্থিকঙ্কাল পড়িয়া রহিয়াছে, এখানে সে বাঁচিবে কিরূপে?

আবার মরু! উভয় মরুভূমির সংযোগস্থানে এক খণ্ড মৃত্তিকার উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িয়াছে। সেই স্থলে একটি কুসুম ফুটিয়াছে। কাল-মরুমধ্যে এই একমাত্র ফুল্ল কুসুম,—আজি!"

* * * * *

পড়িয়া গণেশচন্দ্র কহিলেন, "কবিকঙ্কণ, তুমি লিখিয়াছ ভাল। তুমি এমন লিখিতে পার, আমি তা জানিতাম না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—তুমি বর্ত্তমান সময়কে ভূত-ভবিষ্যতের অপেক্ষা ভাল বল কেন?"

সুরেশচন্দ্র। বর্ত্তমানের সহিতই আমাদের সম্বন্ধ। অতীতে আমাদিগের কোন অধিকার নাই, ভবিষ্যৎ আমাদিগের আয়ত্ত নয়।

গণেশচন্দ্র। তা নাই হউক, ভূত এবং ভবিষ্যৎে

মন্দ বল কেন ? বর্ত্তমান ভাল হইল ; মানিলাম, আর দুই কাল মন্দ কেন ?

সুরেশচন্দ্র। আমার ঘাট হইয়াছে, আর কখন এমন লিখিব না। আমি যখন লিখিয়াছিলাম, তখন আমি অত তর্ক-বিতর্ক করি নাই। তর্কের কাছে আমি নাচার।

গণেশচন্দ্র পাত উল্টাইতে লাগিলেন। আব এক স্থানে পড়িলেন,—

"রাস্তায় যেমন ময়লা-গাড়ী চলে, সেইরূপ এই সংসার পথে অনেক ময়লা-গাড়ী আছে। তাহারা আর কেহ নহে,—নিন্দুকের দল। ময়লার গাড়ী দরজাগোড়ায় দাঁড়াইয়া বাড়ীর সম্মুখে যে আবর্জ্জনা পড়িয়া থাকে, তাহাই তুলিয়া লইয়া যায়। নিন্দুক গৃহে প্রবেশ করিয়া চরিত্রের, মনের জঞ্জাল লইয়া যায়। গুণ দেখিবার তাহাদের ক্ষমতা নাই, দোষ বহন করাই ইহাদের কাজ। ময়লা-গাড়া এবং নিন্দুক, উভয়ে প্রভেদ এই যে, ময়লা-গাড়া নিত্য পরিষ্কৃত হয়, নিন্দুক তাহার নিন্দার বোঝা কখন নামাইতে পারে না। তাহাকে চিরকাল সে ভার বহন করিতে হয়।"

গণেশচন্দ্র আর পড়িলেন না। কথাটা তাঁহার ভাল লাগিল না। একবার একটি ঘোর কুৎসিত রমণী দর্পণে মুখ দেখিয়া, সে দর্পণ আছাড়িয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল। বোধ করি, গণেশচন্দ্রের সেই দশা হইল। তিনি একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "এ কথাটা কি আমাকে লক্ষ্য ক'রে লেখা হয়েছে না কি ?"

সুরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ কথাটা ?"

গণেশচন্দ্র উক্ত স্থান দেখাইয়া কহিলেন, "এই তুলনাটা।"

সুরেশচন্দ্র পড়িয়া বলিলেন, "তোমাকে লক্ষ্য কোথায় ?"

গণেশচন্দ্র বলিলেন, "কেন, এই যে নিন্দুকের কথা রহিয়াছে ?"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "আমি কাহাকেও লক্ষ্য করি নাই। নিন্দুকমাত্রকেই বলিয়াছি। যদি আমি নিন্দা করিয়া বেড়াই, তাহা হইলে ও কথা আমার প্রতিও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তুমি আপনি ঘাড় পাতিয়া লও কেন ? তুমি কি নিন্দুক ?"

গণেশচন্দ্র বলিলেন, "না, সে জন্য নয়। তবে আমি তোমাকে ঠাট্টা-তামাসা করি, আর তোমার লেখার তেমন সুখ্যাতি করি না, যদি সে জন্য লিখিয়া থাক।"

সুরেশচন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, কহিলেন, "নিন্দা করা স্বতন্ত্র, ভাল মন্দ বলা স্বতন্ত্র। যে মন্দ অভিপ্রায়ে নিন্দা করে, সেই নিন্দুক। আমার লেখা তোমার ভাল লাগে না, তুমি ভাল বল না। ইহাতে নিন্দার কথা কি ?"

গণেশচন্দ্র আর বড় কথাবার্ত্তা না কহিয়া বিদায় হইলেন। সুরেশচন্দ্রেব বাড়ী তাঁহার আসিবার কথা নয়, কেন না, তিনি এখন এক জন গণ্য-মান্য লোক হইয়া উঠিতেছেন, আর সুরেশচন্দ্র এক জন সামান্য কেরাণী মাত্র। গণেশচন্দ্র আসিতেন পূর্ব্ব বন্ধুতার অনুরোধে,—আর সুরেশচন্দ্রকে এক আধটু বিদ্রূপ করিবাব জন্য। যে আমাদেব কথাব সমান উত্তর কবিতে পারে না, তাহাকে দুই চাবিটা কথা শুনাইতে আমরা বড় ভালবাসি। যে আমাদেব অপেক্ষা হীনবল, তাহাকে ব্যঙ্গ করিলে ও রাগাইলে আমাদেব বড় আহ্লাদ হয়।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

কর্ত্তা-গৃহিণী।

গণেশচন্দ্রের গৃহিণীকে আজ বিকালে নাপিতানী আল্‌তা পরাইয়া দিয়া গিয়াছে। এখন আর আগেকার মত চার আঙ্গুল চওড়া আল্‌তা পরার রেওয়াজ নাই। শ্রীমতী মনোমোহিনী বেশ সরু করিয়া আল্‌তা পরিলেন। নাপিতানী মাগী তাঁহার বাপের বাড়ী আল্‌তা পরায়। বড় বাড়ীর নাপিতানীও আপনাকে বড় লোক মনে করে। ছোট-খাট বাড়ীতে সে বড় একটা কামায় না, তবে দিদি-ঠাকরুণের মায়া কাটাইতে না পারিয়া, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। নাপিতানী বিধবা, বয়স বছর পঁইত্রিশ হইবে,

দেখিতে নিতান্ত কুশ্রী নয়। পরণে দিব্য পরিষ্কার থান কাপড়, দুহাতে দু'গাছা মোটা মোটা তাগা, গলায় মোটা মোটা দানা। নাপিতানী মনোমোহিনীকে সরু করিয়া আল্‌তা পরাইয়া, পায়ের নখ, আঙ্গুলের গলি সব আল্‌তায় রাঙ্গা করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। মনোমোহিনী নখের উপর কোন মতেই আলতা দিতে দিবেন না, বলেন, "এখন ত আর নিতান্ত ছেলেমানুষটি নই, ও আবার কি আলতা পরাবার শ্রী!" নাপিতানী তত চাপিয়া ধরে, বলে, "নখে আল্‌তা পরবে না, সে আবার কোন্ দেশী কথা! তোমায় সে দিন কোলে কোরে আল্‌তা পরিয়ে দিয়েচি, এরি মধ্যে বুঝি তুমি একেবারে মস্ত গিন্নি হয়ে উঠলে? ন্যাও, দিদি ঠাকুরুণ, তুমি আর জ্বালিও না।" নাপতানী চলিয়া গেলে, মনোমোহিনী উঠিয়া কাপড় ছাড়িতে গেলেন। আল্‌তা পরিয়া তিনি আর সোজা চলেন না, পা টিপিয়া টিপিয়া, পায়ের আঙ্গুলগুলি উঁচু করিয়া, অতি সাবধানে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন, পায়ে যেন কাঁটা ফুটিয়াছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "অমন করিয়া না হাঁটিলে মেঝেতে আল্‌তার দাগ লাগিবে।" কিন্তু আমার সন্দেহ, পাছে তাঁহার পায়ের আল্‌তা মুছিয়া যায়, এই ভয়ে তিনি অত সাবধানে পা ফেলিতেছিলেন। কাপড় ছাড়া হইলে খুব সাবধানে পা মুছিয়া উপরে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার পুত্র চন্দ্রনাথ ছুটাছুটি আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল। কহিল, "মা, আমায় কোলে নে।"

মনোমোহিনী বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এখন ছেড়ে দে। এই বুঝি কোলে নেবার সময়! যা, এখন খেলা কর্ গে, না হয় ঝির কাছে যা।"

চন্দ্রনাথের বয়স চার বছর, তিনি কিছু আব্‌দারে। মাকে ছাড়িয়া দেওয়া দূরে থাকুক, তিনি জোঁকের মত দুই হাতে মাতার হাঁটু জড়াইয়া ধরিয়া, ধুলামাখা মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "আমি কোলে উঠব। কোলে না নিলে আমি ছেড়ে দেব না।"

মাতা কহিলেন, "কি আমার আদুরে ছেলে এলেন রে! ছেড়ে দে বলচি, নইলে মার খাবি।"

চন্দ্রনাথ সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। মাতা যত তাহার হাত ছাড়াইতে যান, সে তত প্রাণপণে ধরে। এইরূপে জড়াজড়ি করিতে করিতে চন্দ্রনাথ একবার মাতার পা মাড়াইয়া ফেলিল। মনোমোহিনী সবে সেইমাত্র আল্‌তা পরিয়াছেন, তার পর জল লাগিয়া পা ভিজিয়া আছে। তাঁহার পায়ের এক দিকের আল্‌তা চন্দ্রনাথের পায়ের ধূলা লাগিয়া মুছিয়া গেল, মনোমহিনীর পায়ে খানিকটা কাদা লাগিয়া রহিল। তিনি পায়ের দিকে চাহিয়া, "পোড়াকপালে! চোখখেগো! চোখের মাথা খেয়েচ!" বলিয়াই ছেলেকে এক প্রচণ্ড চড়। চন্দ্রনাথ আবদার ভুলিয়া, মাতাকে ছাড়িয়া দিয়া, করুণ-রসোদ্দীপক নানা প্রকার রাগিণী আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

আমি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, ছোট ছোট বালক-বালিকারা জগতের যত অনিষ্ট করে, এত আর কেহ করে না। স্ত্রীজাতিই জগতের সারভাগ, তাঁহাদিগকে লইয়াই জগৎ। অতএব, যে তাঁহাদিগের অনিষ্ট করে, সে নিঃসন্দেহ সমস্ত জগতের অনিষ্ট করে। হয় ত কোন সুন্দরী নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য দুই প্রহর কাল ধরিয়া সাজগোজ করিয়াছেন, ইবার গাড়ী কিংবা পাল্কীতে উঠিলেই হয়, এমন সময় পঞ্চমবর্ষীয় এক গুণধর পুত্র আসিয়া চুলে টান দিল—এতক্ষণের যত্ন একবারে মাটী হইয়া গেল। হয় ত আর এক জন ছেলে কোলে করিয়া যাত্রা শুনিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—মানভঞ্জনের পালা, শ্রীরাধিকা সবে সহস্রছিদ্র পূর্ণকুম্ভ লইয়া জল আনিতে যাইতেছেন,—"এমন সময় ছেলে কাঁদিয়া আবদার ধরিল, "আমি বাড়ী যাব।" যাহারা বলে, ছেলে হওয়া পাপ, তাহারা অল্প দুঃখে বলে না।

চন্দ্রনাথ হাঁ করিয়া কাঁদিতেছেন, চক্ষের জল গণ্ড বাহিয়া মুখে প্রবেশ করিতেছে, চন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে রোদনে ক্ষান্ত দিয়া সৃক্কণী লেহন করিয়া ও ঢোক গিলিয়া, সেই জল উদরস্থ করিতেছেন, তাহার পর আর এক পর্দ্দা গলা চড়াইয়া স্থগিত রাগিণী আবার আরম্ভ করিতেছেন। শ্রীমতী মনোমোহিনী গামছা লইয়া পা মুছিতেছেন এবং বৈচিত্র্যসাধনের নিমিত্ত থাকিয়া থাকিয়া কুলকলঙ্ক চন্দ্রনাথকে দুই চারিটা গালি দিতেছেন। এমন সময় গণেশচন্দ্র আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলেন। রোরুদ্যমান বংশতিলক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চন্দুরে, কাঁদ্‌চিস কেন রে?"

এই মধুর নামে অভিহিত হইয়া চন্দ্রনাথ আর একটু জোরে কাঁদিয়া কহিলেন, "মা মেরেচে।"

গণেশচন্দ্র গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন গা, ওকে মেরেছ কেন? ও কি করেছে?"

মনোমোহিনী রাগিয়া কহিলেন, "মেরেচি আমার খুসী। বেশ কোরেচি, মেরেচি।"

আমি সুন্দরীকুলকে একটা পরামর্শ দিতে চাই। আপিস থেকে তাতিয়া পুড়িয়া স্বামী যখন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিয়া আসে, তখন তাহাকে ঘাঁটান ভাল নয়। আমি কখন এমন কথা বলি না যে, গৃহিণী কর্ত্তাকে ধমক-চমক দিবেন না। টাকা দিতে, গহনা দিতে, রেশমের সাড়ী দিতে এক মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইলে, স্বামীকে মনের সাধ মিটাইয়া মুখনাড়া দাও, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সময় অসময় আছে। ভাড়াটে গাড়ীর আধমরা ঘোড়াটাও সারাদিন খাটিয়া আস্তাবলে আসিলে আর নড়িতে চায় না; কেহ বিরক্ত করিলে লাথি ছুঁড়ে। আপিসে সারাদিন খাটিয়া, হয় ত সাহেবের গালি খাইয়া যখন বাবু ভালমানুষের মত বাড়ী ফিরিয়া আসেন, তখন বড় একটা পীড়াপীড়ি করিও না,—রাগ মানিবে না।

গণেশচন্দ্র ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন, "ওইটুকু ছেলে, না ঠেঙ্গালে বুঝি দিন যায় না? কোথায় আরও দুঃখ হবে, লজ্জা হবে, না খুসী। মেরেছ, বেশ কোরেছ?"

"তার কি হবে? আমি মেরেচি, বেশ কোরেচি।"

"তুমি ওকে মার্‌বার কে?"

"আমি ওকে মার্‌বার কে? তোমার ছেলে, আর আমার কেউ নয়? তোমার ছেলে তুমি নিয়ে থাক, আমায় এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও। আমি বাপের বাড়ী চ'লে যাই।"

মনোমোহিনী শেষ কথা বলিতে বলিতে, তাঁহার গলা কাঁপিতে লাগিল। চোখের পাতায় দু' ফোঁটা জল আসিয়া দাঁড়াইল, তার পর আঁচলে একবার নাকঝাড়া দিলেন। তার পর আস্তে আস্তে সুর উঠিল; "ও মা, তুমি কি এই সব অপমানের কথা শোনাবার জন্যে আমার বিয়ে দিয়েছিলে? ও মা, আঁতুড়ে আমায় একটু নুণ খাইয়ে মার্‌লে না কেন?"

গণেশচন্দ্র ধীরে ধীরে কাপড় ছাড়িতে চলিয়া গেলেন।

অনেকে হয় ত মনোমোহিনীর উপর, হয় ত গণেশচন্দ্রের উপর, হয় ত দুই জনেরই উপর রাগ করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, সন্ধ্যার সময় আফিস-ফের্‌তা স্বামীর সঙ্গে কখন বচসা হয় নাই, এমন সুন্দরী কয় জন আছেন?

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

—•—

কল্পনানগরে

নীচে নদী বহিতেছে। উপরে চাঁদ উঠিয়াছে। নদী ক্রুরগামিনী, অনন্ত বীচিমালিনী। চন্দ্রলোকে রজততরঙ্গ, রজতচূর্ণ জলকণা বিক্ষিপ্ত হইতেছে। কূলে কুসুম ফুটিয়াছে, গুচ্ছ গুচ্ছ, রাশি রাশি, নানাবর্ণ ফুল সৌগন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। জলে ফুল হেলিয়া পড়িয়াছে, শ্যামল পল্লব, নবীন মুকুল, বায়ুভরে ঈষৎ দুলিতেছে। তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত বারি-বিন্দু কুসুমে কুসুমে, পত্রে পত্রে হীরকবৎ জলিতেছে। স্বচ্ছ, গভীর, নীল জল, জলতলে মীনদল অলসভাবে পুচ্ছ সঞ্চালন করিয়া ধীরে ধীরে বিচরণ করিতেছে। কোথাও নদী অন্তঃসলিলা, উপরে শৈবাল, নীচে স্রোত নিতান্ত মন্দ। নদীসৈকতে চক্রবাক্ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। বকুল, চম্পক, কামিনী, গন্ধরাজ, চন্দ্রমল্লিকা,—সংখ্যা করা যায় না। ফুল ফুটিতেছে, গন্ধে দিক্ আমোদ করিতেছে, ঝরিয়া পড়িতেছে। দূরে দৃষ্টি হয় না, উপবনে চারিদিক্ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। লম্বিত শাখায় প্রস্ফুটিত কুসুম কখন জলে ডুবিতেছে, কখন জলসিক্ত মুখ তুলিয়া হাসিতেছে। সকলের উপর জ্যোৎস্নালোক। ফুলে, জলে, বৃক্ষপত্রে, নদীপুলিনে, বৃক্ষপত্র ভেদ করিয়া তরুশাখায়, তরুমূলে, শাখাস্থিত পক্ষীর নীড়ে, নীড়স্থিত ক্ষুদ্র শাবকের অঙ্গে, বৃক্ষতলে, শুষ্কপত্রে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। অন্তর্য্যামীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তুল্য সর্ব্বব্যাপী রন্ধ্রে রন্ধ্রে চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করিয়াছে। সেই

চন্দ্রকরসলিলে সেই শান্ত, মধুর, রম্য স্থান প্রভাসিত হইয়াছে।

নদীর বাঁক ফিরিলে আর এক শোভা। সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দিগন্তে সমুদ্র দেখা যায়। আকাশে গভীর, স্থির নীলিমা, এবং সমুদ্রের গভীর, তরঙ্গসঙ্কুল, ক্ষুব্ধ নীলিমার মিলন দেখা যায়। দূর হইতে সমুদ্রকল্লোল শ্রবণে প্রবেশ করিতেছে। দিগন্তরে পাপিয়ার পূর্ণো-চ্ছ্বাস আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে। স্বর-লহরী জ্যোৎস্নারঞ্জিত বায়ুস্তর ভিন্ন করিয়া, তরঙ্গ হইতে উত্থিত হইয়া, চন্দ্রকরসাগর মথিত করিয়া আকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছে,—যেন চক্ষে দেখা যায়। নবীন দূর্ব্বাশোভিত ক্ষেত্রে পশুকুল ভ্রমণ করিতেছে, কেহ স্থিরবিস্ফারিত চক্ষে মুখ চাহিয়া আছে। সুবর্ণমণ্ডিত নদীতটে মৃগকুল শয়ন করিয়া আছে, কেহ উঠিয়া আসিয়া কাছে দাঁড়ায়, কেহ অতি ধীরে গাত্রকণ্ডুয়ন করে। উপবন-মধ্যে কোথাও কুসুমরাশির মধ্যে কুসুমসদৃশ রমণীকুল হাত ধরা-ধরি করিয়া বসিয়া আছে। কাহারও মুখে কথা শুনা যায় না, কেবল অস্ফুট ভ্রমরগুঞ্জন তুল্য অতি মৃদু শব্দ শ্রুত হইতেছে। কোথাও জ্যোৎস্নাসুসুপ্ত শিশু সুখস্বপ্ন দেখিয়া হাসিতেছে। নদীর উভয় কূলে সৌধশ্রেণী, শ্বেত প্রস্তরনির্ম্মিত, জ্যোৎস্নাবিধৌত। গৃহদ্বার, বাতা-য়ন, গবাক্ষ সমুদয় মুক্ত, তন্মধ্যে জ্যোৎস্না পতিত হইয়াছে। গৃহাভ্যন্তরবর্ত্তিনী সুখসুপ্ত রমণীর স্থির মুখমণ্ডলের উপরে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে। গৃহদ্বার মুক্ত, দ্বারে প্রহরী নাই। যাহার ইচ্ছা প্রবেশ করে, যাহার ইচ্ছা চলিয়া যায়। কেহ কাহাকেও পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না। প্রাসাদমূলে নদী, প্রাসাদের সম্মুখে বিস্তৃত রাজপথ, জ্যোৎস্নায় আলোকিত। নদীবক্ষে একটি তরণী ভাসিতেছে, তাহার ভিতর কেহ নাই। নদীতরঙ্গ তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে, নদীস্রোত তাহাকে ভাসা-ইয়া লইয়া যাইতেছে। এক জন জলে নামিয়া নৌকা ধরিয়া, নৌকার উপরে উঠিয়া বাহিয়া চলিয়া গেল। আবার সে নৌকা ফিরিয়া আসিল, কয়েক জন যুবতী তীর হইতে সেই নৌকায় উঠিল। তাহারা পুষ্পবৃক্ষের কুসুমিত শাখাসমূহ ক্ষেপণীরূপে নিক্ষেপ করিয়া, তরঙ্গ ভেদ করিয়া অদৃশ্য হইল।

এ কোথায় আসিলাম? এ স্বপ্নময় সুখের চিত্র কে চক্ষের সমক্ষে ধরিল? কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব?

দেখ, তরঙ্গিণীতীরে, জ্যোৎস্নালোকে, উন্নমিতাননে, শুভ্রবসনা রমণী দাঁড়াইয়া আছে। উর্দ্ধমুখী বলিয়া মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। নিকটে আসিয়া দেখ,—কে?

লীলা!

চলিয়া আইস, আর দাঁড়াইও না। লীলা স্বপ্নগর রচনা করিয়া সেই মহানগরে ভ্রমণ করিতেছে, আমরা আর দাঁড়াইব না। কি জানি, পাছে আমাদের স্পর্শে সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, পাছে আমাদের নিশ্বাসে সেই সূক্ষ্ম লতাতন্তু ছিন্ন হইয়া যায়!

লীলার অনন্তদুঃখপূর্ণ জীবনে এই এক সুখ আসিয়াছে। সে সুখ প্রকৃত নয়, কল্পিত মাত্র। তুমি বলিবে, এমন সুখে কাজ কি? আমার উত্তর, আর কোন সুখ আছে কি? সুখের কল্পনা ব্যতীত আর সুখ কোথায়? কিসে সুখ? যেখানে সুখ চাও, যাহাতে সুখ চাও, তাহাতে ত সুখ পাওয়া যায় না। যে যাহা করে, তাহা সুখের আশায়। সুখের আশা না থাকিলে, কৃপণে কেন অর্থ সঞ্চয় করে? সঞ্চয় করিয়াই তাহার সুখ। কিন্তু সে সুখ সে পায় কই? কে কবে সুখ পায়? তবে সুখ নাই? নহিলে এ বিশ্বব্যাপী সুখের কামনা কেন? সুখের আশা না থাকিলে, কে এ যন্ত্রণাময় মনুষ্যজীবন বহন করিত? কে প্রত্যহ দুঃখের মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া থাকিত? কে না ভাবে যে, দুঃখ ফুরাইবে, সুখ আসিবে? সুখ—সুখ—সুখ, ব্রহ্মাণ্ডময় খুঁজিয়া বেড়াই, সুখ কোথায়? সুখ কোথায় থাকে, কিসে পাওয়া যায়, কেহ ত কখন বলিল না। তবে যে কল্প-নায় সুখ পায়, তাহাকে ভ্রান্ত বল কেন?

দেখ, লীলা মুখ ফিরাইতেছে। সে শূন্যময় দৃষ্টি প্রশান্ত, স্থির, জ্যোতির্ম্ময়। পূর্ব্বের সে চক্ষু আর নাই। আইস, এখানে আর বিলম্ব করিও না।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

-*—

সুসংবাদ।

ছেলে হইবে না হইবে না করিয়া, কিরণের ছেলে হইবার কথা হইল। এই সংবাদ শুনিয়া একটা ভাল দিন দেখিয়া, কিরণকে বাপের বাড়ী লইয়া গেল। প্রথম সন্তান বাপের বাড়ী হওয়া চাই। নীলা কেতাবপত্র রাখিয়া দিয়া দিনরাত কিরণকে লইয়া ব্যস্ত। বাড়ীতে একটা ভারি ধুম পড়িয়া গেল। ছেলে হইব কি মেয়ে হইবে, এই তর্ক লইয়াই একটা ভারি গণ্ডগোল উপস্থিত। বাড়ীর দাসীগুলা একবাক্যে বলিল, "খোকা হবে।" খোকা হইলে তাহারা কিছু পাইবার আশা রাখে, খুকী হইলে সে আশাটুকু থাকে না। কিরণের ঠাকুরমা বলিলেন, "ওর নিশ্চয় মেয়ে হবে, তোরা দেখিস্। আমি ওর চোখ দেখেই বুঝতে পেরেচি।" বাড়ীর মেয়েছেলে, সকলে একটা না একটা স্থির করে, ছেলে হবে কি মেয়ে হবে। কেহ বাজী রাখে, কেহ দু'ট আঙ্গুলের মধ্যে একটা আঙ্গুল ধরায়, অমনি এক জন বলে, "না ভাই, আঙ্গুল ধর্‌লে ঠিক হয় না। আঙ্গুল ধর্‌লে উল্টা হয়।" এক দিন দুটা ঝিয়ে হুলুস্থুল বাধাইয়া দিল, মারামারি হয় আর কি! হরি ঝি বলিল, "ছেলে হয় কি মেয়ে হয়, তা ত বলা যায় না। সে ত মানুষের হাত নয়।" অমনি কাল ঝি বলিল, "মেয়ে কেন হতে গেল? মর মাগী!" হরি বলিল, "আমায় মর্ বল্লি? তুই মর্, আপন-খাগী! আমি কেন মর্‌তে গেলাম? তুই এখনি মর!" তার পর চুলোচুলি হইবার উপক্রম। মাঝখানে লোক পড়িয়া তাহাদের ছাড়াইয়া দেয়।

এ দিকে কিরণও কিছু বিপদে পড়িল। কিরণের ঠাকুরমা বড় দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। এ কালের মেয়েরা আর কিছু বাচবিচার করে না, ঠাকুরমা সেকেলে মানুষ, তিনি তাহাতে বড় রাগ করেন। কিরণের অনেক দিন হইতে সাধ ছিল, সে একখানি আস্তি রংয়ের কাপড় পরিবে। একখানি কাপড় রং করাইয়া সঙ্গে আনিয়াছিল, ঠাকুরমার ভয়ে আর পরিতে পারে না। আবার সাধটাও না মিটাইলে নয়। এক দিন বৈকালবেলা কিরণ সেই কাপড়খানি পরিয়া তাড়াতাড়ি ছাদে গেল। ঠাকুরমা ছাদে বড় একটা উঠেন না, কিন্তু আজ তিনিও সন্ধ্যার সময় ছাদে উঠিলেন। তিনি কেবল কিরণ কোথায় কি অনিয়ম, কি অকর্ম্ম করে, সেই সন্ধানে থাকেন। কিরণের পরণে রং-করা কাপড় দেখিয়া তিনি যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিলেন। কিরণ ঠাকুরমার বকুনিতে বড় ভয় করিত, কিন্তু নিত্য বকুনি শুনিলে অবশেষে সহিয়া যায়। কিরণ সেই দিন হইতে আর ঠাকুরমার বকুনিতে বড় ভয় করিত না। কোন দিন ইচ্ছা হইল, বড় বড় মল্লিকা ফুল খোঁপার চারিদিকে গুঁজিয়া দিল। ঠাকুরমা দেখিয়া বলিলেন, "তোদের ত এখন আর বিচার নাই, ম্লেচ্ছ হয়েছিস্। এই ক'টা মাস কি ফুল মাথায় না দিলেই নয়? ক'টা মাস গন্ধসামগ্রী নহিলে কি চলে না?"

কিরণ কহিল, "কি হবে ঠাকুরমা? ফুল মাথায় দিলে কি হয়?"

ঠাকুরমা। নেকি আর কি! ভাল মন্দ আছে, কুবাতাস আছে, জানিস্ নি?

কিরণ হাসিয়া কহিল, "ভূতে পাবে? হ্যাঁ ঠাকুরমা, ভূত কি আছে?"

ঠাকুরমা। এখনকার লোকে কি আর কিছু মানে? তোরা ভূত মানবি কেন?

আর এক দিন কিরণ বড় বাড়াবাড়ি করিল। সে দিন সন্ধ্যার সময় চুল এলো করিয়া ছাদের আলিসার গোড়ায় দাঁড়াইয়াছিল। ঠাকুরমা আসিয়া দেখিলেন —সর্ব্বনাশ! কহিলেন, "কিরণ, তুই হলি কি?"

"হলাম আবার কি?"

"হ্যাঁ লা, তুই কি একটা কাণ্ড না করিয়া থাম্‌বি না?"

"কাণ্ড আবার কি? ঠাকুরমা যেন আমায় পাগল পেয়েছেন।"

"পাগল নইলে কি সহজ মানুষে এমন কাজ করে?" এই বলিয়া ঠাকুরমা কিরণের মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন। তার পর হাত ধরিয়া টানিয়া

আনিয়া কহিলেন, "যা, নীচে যা! ভর সন্ধ্যাবেলা কি তোর ছাদে বেড়াতে আছে? এমন মেয়ে ত কোথাও দেখিনি।"

কিরণ ঠোঁট ফুলাইয়া টিপি টিপি হাসিয়া নীচে নামিয়া গেল। অন্য দিন হইলে ঠাকুরমা খুব খানিক বকিতেন, আজ যে চুপ করিয়া রহিলেন, এমন নয়, কিন্তু বকুনিটা যেমন প্রকাণ্ড হইত, আজ আর তেমন হইল না। আপনা-আপনি গজ গজ করিয়া চুপ করিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, চেঁচাইলে কোন উপকার হয় না।

যথাসময়ে কিরণের একটি পুত্রসন্তান হইল। এই ত, ঝি-চাকরেরা কাপড়ের জন্য, টাকার জন্য, মহা ধুমধাম লাগাইয়া দিল। নাতি হইয়াছে বলিয়া কিরণের মা'র বড় আহ্লাদ হইল। নাতির আটকৌড়ে, ষষ্ঠীপুজায় বেশ ঘটা করিলেন।

ছেলে দু'মাসের হইলে, কিরণ আবার আপনার বাড়ী যাইবে। লীলা সেইটুকু ছেলেকে একরকম দখল করিয়া বসিল। দিবানিশি কোলে করিয়া থাকে, কাঁদিলে ঘুম পাড়ায়, কাজল পরাইয়া দেয়। ছেলের নাম রাখিল,—প্রফুল্ল। কিরণও সেই নাম মঞ্জুর করিল।

কিরণ যখন যায়, তখন লীলা খোকাকে কোলে করিয়া চুমো খাইয়া, কিরণের মা'র কোলে দিল। কিরণ দেখিল, লীলা চক্ষের জল রাখিতে পারিতেছে না। তখন সে তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "দিদি, তুমি খোকাকে মাঝে মাঝে দেখতে এস।"

লীলা কহিল, "যাব বই কি।"

তার পর কিরণ চলিয়া গেল। কয়েক দিন লীলার বড় একেলা একেলা, বড় শূন্য শূন্য বোধ হইতে লাগিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

ছেলের মা।

ছেলে মানুষ করার ভার সমস্তটাই কিরণের উপর পড়িল। সুরেশচন্দ্রের যে আয়, তাহাতে সব মাসে সংসার-খরচই কুলায় না, ছোট ছেলের জন্য একটা দাসী রাখিবেন কোথা হইতে? বাড়ীর দাসী কতকটা খোসামোদ, কতকটা দুই চার পয়সার লোভে, কতকটা অনুগ্রহ করিয়া যেটুকু উপকার করে, সেইটুকু কিরণের সুবিধা, নহিলে কিরণ দিবারাত্র ছেলে কোলে করিয়াই থাকে, কিংবা ঘুম পাড়াইয়া কাছে বসিয়া থাকে। সময়ে নাওয়া হয় না, খাওয়া হয় না, পাছে ছেলের অসুখ করে, এই ভয়ে পৃথিবীর অর্দ্ধেক সামগ্রী খাওয়া হয় না।

ছেলে দুই মাস উত্তীর্ণ হইয়া তিন মাসে পড়িতে না পড়িতেই কিরণ মা হইবার সাধ মিটাইতে আরম্ভ করিল। ছেলের উপর রাগ, ছেলেকে তিরস্কার, তাহার উপর রাগ করিয়া উপবাস, কিছুই বাকি রহিল না। একদিন রাগ করিয়া ছেলের গালে একটি চড় মারিয়াছিল, তার খানিক পরে ছেলে দুধ তুলিয়া ফেলিল দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির হয়। যে হাতে মারিয়াছিল, সেই হাত মাটীতে আছাড়িয়া হাতে কালশিরা পড়াইয়াছিল। আমি নিঃসংশয়ে জানি, কিরণ মনে করিত যে, এত ছোট বেলায় কোন ছেলে কখনও এমন সেয়ানা হয় না। মনে কর, যতক্ষণ কিরণ কাছে বসিয়া আছে, ততক্ষণ স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছে, যেই কিরণ উঠিয়া গেল, অমনি উঠিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিরণ উঠিয়া গিয়াছে, সে কিরূপে বুঝিল? ছেলে কোলে করিয়া কিরণ সুর করিয়া কত কি বলিত, তাহাকে বুঝাইত, তাহাকে ধমক দিত। "খোকা বড় হইলে স্কুলে পাঠিয়ে দেব, আর খোকা বছর বছর গাদা গাদা প্রাইজ নিয়ে আস্‌বে, কেমন খোকা? তার পর পাস করবে, জলপানি পাবে। তখন বিয়ে দেব, রাঙ্গা বউ আনব—আ দুষ্ট, বউয়ের নাম শুনে বুঝি হাসছ! তা বউ এমনি জিনিষটি বটে। বউ পেলে কি আর আমায় মনে থাকবে! তার পর খোকার খুব কাজ হবে, কত টাকা আন্‌বে। কেমন খোকা, টাকা এনে আমায় দিবি ত? তখন আবার টাকা দেবে! বলবে, বুড় মা, টাকা নিয়ে আবার কি করবে? খেতে দি, এই ঢের। হ্যাঁ খোকা, তুমি দুষ্ট হবে, না শান্ত হবে? ছি! দুষ্ট কি হ'তে আছে, তুমি লক্ষ্মী ছেলে হবে, কেমন?"

কিরণ শুনিয়াছিল, এইরূপ অনেক অনেক

কথা ছোট ছেলেদের বলা মাতাদিগের একটা কর্ত্তব্য। কিরণ জানিত যে, এইটুকু চার পাঁচ মাসের ছেলেকে সে সব কথা বলিলে কোন ফল দর্শিবে না, কেন না, সে একটা কথাও বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু কিরণের আর বিলম্ব সহিল না।

খোকা বাবুর সঙ্গে কিরণের কথোপকথন সর্ব্বদাই চলিত, আবার দুই জনে নির্জ্জনে থাকিলে, কখন কখন আর এক রকম কথাবার্ত্তা হইত, সে বড় চমৎকার! সে কোন্ দেশের ভাষা, তা আমি জানি না, কোন অভিধানে তার একটাও কথা পাইলাম না। তার অর্থ করা কি টীকা করা, আমার কাজ নয়। সে ভাষা বুঝি স্বর্গে দেবতারা বলেন। খোকা যে সে ভাষা বুঝিত, তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ, সেই ভাষার কথোপকথনকালে সে মাতার মুখ চাহিয়া হাসিত ও মাঝে মাঝে কথার উত্তর দিত। একদিন এই রূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল :—

কিরণ। সো-নানা, মো-নানা, ধো-নানা।

খোকা বাবু বলিলেন, "ও-আ।"

কিরণ খোকার খুঁতি নাড়া দিয়া কহিল, "কো-লা-লা, পো-লা-লা, ধো-লা-লা।"

খোকা বাবু বলিলেন, "ই-আ।"

কিরণ আবার এই অপূর্ব্ব ভাষার কথা কহিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় দরজার নিকটে অতি মৃদু হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইল। মুখ ফিরাইয়া দেখিল,—সুরেশচন্দ্র! সুরেশচন্দ্র প্রীতিপূর্ণ মুখে দাঁড়াইয়া উভয়কে দেখিতেছেন ও হাস্য সংবরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। হাস্যের বেগ একেবারে চাপিতে পারিলেন না। যেটুকু হাসির শব্দ নির্গত হইল, কিরণ সেইটুকু শুনিতে পাইল। কিরণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে জানিয়া, সুরেশচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

সুরেশচন্দ্র তাহার পর কিরণকে কত সাধিলেন, বলিলেন, "তোমরা কি বলাবলি করিতেছিলে, একবার বল না, শুনি। আমি তোমাদের ঐ কথা শিখিব। এমন সুন্দর কথা কোথায় শিখিলে?" কিন্তু আর সে কথা কোথা হইতে আসিবে? সুরেশচন্দ্র এমন সুখের সময় ব্যাঘাত দিয়াছিলেন, আবার কি তাঁহার সাক্ষাতে সে কথা বলা হয়?

এ বিষয়ে আমার সঙ্গে খোকা বাবুর সম্পূর্ণ একমত। তিনি সুরেশচন্দ্রের কর্কশ হাস্যে অসন্তুষ্ট হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কিরণ তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিল। "ও বাবা! ও বাবা! কে মেরেচে? কে মেরেচে?" —"যাও তুমি, তুমি কেবল কাঁদিবার বেলায় আছ। এস ত খোকা, আমরা এখান থেকে চ'লে যাই। আর এক জায়গায় গিয়ে আমরা গল্প কোর্‌ব এখন! সেখানে আর কেউ যেতে পাবে না।" এই বলিয়া স্বামীর প্রতি কুটিল প্রেমকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কিরণ খোকাকে কোলে করিয়া চলিয়া গেল।

কিরণ যে ছেলেকে কত রকম আদর করিত, কত রকম করিয়া সাজাইত, তাহা আমি বলিয়া উঠিতে পারি না। ছেলের মুখে সর মাখাইয়া দিয়া যখন তাহাকে কাজল পরাইতে বসিত, সে সময়কার শোভা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। প্রথম প্রথম কিরণ কোনমতেই কাজল পরাইতে পারিত না, ছেলের গালে, নাকে কালি মাখামাখি করিত। ক্রমে কাজল সরু করিয়া পরাইতে শিখিল। এক এক দিন প্রফুল্লচন্দ্র ঘুম ভাঙ্গিয়া দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া ভূত সাজিয়া থাকিত, কিরণ তাহার সে মূর্ত্তি দেখিয়া, এক চোখে হাসিয়া, এক চোখে কাঁদিয়া, বকিতে বকিতে ভিজা গামছা দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিত। এক এক দিন ছেলেকে সাবান মাখাইয়া, একখানি চিরুণী হাতে করিয়া, ছেলেকে কোলে করিয়া বসিত। তার পর তার কোমল মাথায় কচি কচি কালো কালো চুলগুলি যে কত যত্নে কত রকম করিয়া আঁচড়াইয়া দিত, তাহা বলা যায় না। কখন সোজা সীঁতে, কখন বাঁকা সীঁতে, কখন দুই দিকে সীঁতে, শেষে সে সব কিছু মনস্থ হইত না। তখন চুলগুলি আঁচড়াইয়া, ছোট কপালখানি ঢাকিয়া নাক পর্য্যন্ত ফেলিত, কখন একগাছি ছোট বিমুণী বিনাইয়া দিত, সব চুলগুলি কাঁধে ফেলিত। প্রফুল্ল বড় একটা কিছু বলিত না, প্রায় চুপ করিয়াই থাকিত, দৈবাৎ চিরুণীর দাঁত মাথায় ফুটিয়া গেলে কাঁদিয়া উঠিত।

এইরূপে প্রফুল্ল বসিতে শিখিল। তখন কিরণের আহ্লাদ দেখে কে? যখন প্রফুল্ল একটু একটু বসিতে শিখিল, তখন কিরণ তাহাকে আস্তে আস্তে

বাটীতে বসাইয়া দিয়া, সম্মুখে বসিয়া হাত ছাড়িয়া দিত। খোকা খানিক টলমল করিয়া, লাল ফেলিয়া হাসিয়া উঠিত; কিরণও হাততালি দিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিত। তার পর খোকা বাবু শালগ্রাম ঠাকুরের মত গড়াইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া, কিরণ তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া ধরিত। এই সময়—আশ্চর্য্য কথা! প্রফুল্লর দুটি খুদে খুদে দাঁত উঠিল। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "খোকা, তোমার দাঁত দেখি," অমনি খোকা বাবু দাঁত, জিব, মাড়ি সব বাহির করিয়া ফেলিতেন। কিরণ তাহাকে নবভাষা শিখাইতে আরম্ভ করিল, প্রফুল্ল ক্রমে ক্রমে তাহার সে অমৃতময় বাল্যভাষা ভুলিয়া গেল। কিরণ জিজ্ঞাসা করিত, "খোকা, তোর পেট কোথায়?" খোকা তৎক্ষণাৎ সেই সুপরিচিত অঙ্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিত এবং মুখে বলিত, "এ।"

কিরণ। মুখ কৈ?

খোকা হাঁ করিল। কাজেই এবার মুখ হইতে শব্দ নির্গত হইল না। বোধ করি, কিরণের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, প্রফুল্লর মুখবিবরে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড নিহিত আছে। কারণ, বার বার সে প্রফুল্লের মুখ দেখিতে চাহিত।

এক দিন একটা রবিবারে কিরণ স্নানাহার করিয়া, বারান্দায় দাঁড়াইয়া চুল শুকাইতেছিল। প্রফুল্ল বারান্দায় হামাগুড়ি দিয়া একটা ছোট রকম কাঁসার বাটী দখল করিয়া, সেইটাকে উদরস্থ করিবার চেষ্টায় ছিল এবং গ্রাসের অসুবিধা দেখিয়া, ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বাটীর চারিদিক আক্রমণ করিতেছিল। কিন্তু তাহার মুখরাহু এ পর্য্যন্ত বাটী-চন্দ্রকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় নাই। সুরেশচন্দ্র তাঁহার ঘরে বসিয়াছিলেন। কিরণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রৌদ্রের দিকে চাহিয়া ছিল। একটা বিড়াল পাঁচীলে বসিয়া মাছের কাঁটা চিবাইতেছিল, কিরণ তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল।

এমন সময় প্রফুল্লের হস্তস্থিত বাটী, তাহার মুখনিঃসৃত লালায় মসৃণ হইয়া, তাহার হস্তচ্যুত হইয়া সশব্দে ভূতলে পতিত হইল। কিরণ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখিল, প্রফুল্ল মুখে ধূলা-কাদা মাখিয়া বসিয়া আছে, বাটীটা তাহার সম্মুখে গড়াইয়া পড়িয়াছে। কিরণ কহিল, "এমন ছেলে ত কোথাও দেখিনি। যেখানে যা দেখবে, তাই নেবে। এখনি এই, এর পর পা হ'লে না জানি কি করবে।" এই বলিয়া বাটীটা তুলিয়া রাখিয়া গামছা আনিতে গেল।

বাটী বেদখল হয় দেখিয়া, প্রফুল্ল কিছু নারাজ হইল। তাহার ইচ্ছা কাঁদে। সেই অভিপ্রায়ে ঠোঁট, নাক ফুলাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কাঁদা হইল না। একে ত বাটীটা পড়িয়া যাওয়ায় কিছু বিস্মিত হইয়াছিল, তাহার পর এতক্ষণ বাটীটা লেহন করিয়াও কোন রস পায় নাই, সুতরাং সেটা তেমন বিশেষ লোকসান বোধ হইল না। এই জন্য বারকতক ঠোঁট-নাক ফুলাইয়া, আবার স্থির হইয়া বসিল।

কিরণ গামছা হাতে ফিরিয়া আসিয়া, প্রফুল্লের মুখ হাত মুছাইয়া দিল। তাহার মাথা দেখিয়া বলিল, "মাথা যে বড় নোংরা হয়েছে। আয়, মাথা আঁচড়ে দিই" এই বলিয়া কিরণ চিরুণী আনিয়া, প্রফুল্লকে কোলে লইয়া, তাহার মাথা আঁচড়াইতে বসিল।

এখন, কিরণ চুল এলো করিয়া মাথা শুকাইতেছিল। প্রফুল্লের মাথা আঁচড়াইতে সে চুল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, কতক প্রফুল্লের মাথার দিকে, কতক তাহার পায়ের দিকে পড়িল। প্রফুল্ল বাটীর শোধ তুলিবার জন্যই হউক, আর অন্য কোন কারণেই হউক, মায়ের চুল দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া টানিতে লাগিল।

কিরণ চেঁচাইল, "ওরে, চুল ছেড়ে দে! চুল যে ছিঁড়ে ফেল্লে!"

এতক্ষণ প্রফুল্লের চুল টানার প্রতি তেমন মন ছিল না, মাতার চীৎকার শুনিয়া মনে করিল, একটা ভারি কাজ করিতেছি। এই ভাবিয়া সে প্রাণপণে চুল টানিতে লাগিল।

কিরণ আরও জোরে বলিল, "বাবা রে! মেরে ফেল্লে! চুল যে ছিঁড়ে যায়! দস্যু ছেলে।"

আপনার ঘরের দরজা-গোড়ায় দাঁড়াইয়া সুরেশচন্দ্র হাসিতেছিলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া কিরণ কহিল, "আহা, কি রঙ্গই দেখচেন! আমার মাথাশুদ্ধ ঝন্ ঝন্ কোরচে, আর উনি দাঁড়িয়ে হাস্‌চেন।"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "তোমাদের ঝগড়া, তোমরা আপোসে মিটমাট্ কর। আমি কিছু জানি না।

আমি কি করব? আমি ত আর ওকে তোমার চুল টান্‌তে শিখিয়ে দিইনি।"

কিন্তু প্রফুল্ল মিটামিটিতে মোটেই রাজি নয়। সে তার খাট-খাট, টেপা-টেপা, ফুলো-ফুলো আঙ্গুলগুলি দিয়া, কিরণের চুলের গোছা প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া আনন্দে হাসিতেছে, আর একটা করিয়া টান দিতেছে। এ দিকে কিরণের প্রাণ যায়। সে সাধ্যমত টানাটানি করিতেছে, কিন্তু প্রফুল্ল কোনমতেই ছাড়িতে চাহে না।

কিরণ কহিল, "দাঁড়িয়ে রঙ্গ দেখচ কি? খোকার হাত ছাড়িয়ে দাও না; চুলগুলা যে ছিঁড়ে ফেল্লে।"

সুরেশচন্দ্র নিশ্চিন্তভাবে কহিলেন, "কি কোরে ছাড়াব?"

কিরণ। যেমন ক'রে পার ছাড়াও না। আমি যে যাই।

তখন সুরেশচন্দ্র ঘরের ভিতর হইতে এক জীর্ণ ছবি আনিয়া, প্রফুল্লর সাক্ষাতে ধরিলেন। কহিলেন, "দেখ খোকা, এটা কি?"

প্রফুল্ল সেই ছবি দেখিয়া, কিরণের চুল ছাড়িয়া দিয়া, ছবি হস্তগত করিল। কিরণের চক্ষে হাসি কান্না দুই আসিয়াছিল। সে মাথায় কাপড় দিয়া, চুল গুছাইয়া বলিল, "ছেলে ত নয়, যেন দস্যু। চুলের গোড়ায় দশ দিন ব্যথা থাকবে। আর উনি, বুড় মিন্সে রঙ্গ দেখছিলেন।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "তাই ত! রঙ্গ দেখছিলুম বই কি! আমি না থাকলে কে তোমার চুল ছাড়িয়ে দিত?"

ক্রমে প্রফুল্ল হাঁটিতে শিখিল। দিন কয়েক "হাঁটি হাঁটি পা-পা" শিক্ষানবিশীর পর, বিনা সাহায্যে উঠিয়া, পড়িয়া, টলিতে টলিতে হাঁটিতে আরম্ভ করিল। দিনের মধ্যে একশবার আছাড় খায়। কখন মুখটা কাটিয়া যায়, কোন দিন কপাল ফুলিয়া ওঠে। আর কিরণ কেবল বকে। পা হইয়া প্রফুল্ল নানাবিধ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। এক দিন কিরণ রুটীর জন্য হাঁড়ি হইতে ময়দা বাহির করিয়া লইয়া, তাড়াতাড়িতে ঘরে শিকল দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, খানিক পরে ভাঁড়ার ঘরে খুট-খাট করিয়া শব্দ শুনিতে পাইল। বিরক্তভাবে কহিল, "আঃ, ইঁদুরগুলার জ্বালায় কিছু রাখবার যো নাই।" আবার ভাবিল, "ইঁদুর নাও হবে বুঝি। দিনের বেলা ইঁদুর ত এত শব্দ করে না। খোকা নয় ত, একবার দেখে আসি।"

হরিবোল হরি! কিরণ যা ভাবিয়াছিল, তাই। আসিয়া দেখিল, প্রফুল্ল হাঁড়ি হইতে দুই চার মুঠা ময়দা লইয়া বদনে দিয়াছে, আরও দুই চার মুঠা গায়ে মাখিয়াছে। দেখিয়া কিরণ কহিল, "ও দশা! আমি তাই ভাবছিলাম, ভাঁড়ার ঘরে কে খুট-খাট করে। বলি, এ কি হয়েছে?"

প্রফুল্ল কোন কথা কহিল না। ময়দামাখা ডান হাতখানি পেটের উপর রাখিয়া, বামহাতখানি ঝুলাইয়া দিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বুঝি ভাবিতেছিল, বোবার শত্রু নাই।

কিরণ রাগিল। বলিল, "ও গোচোর! ভিজে বেরালটির মত চুপ ক'রে রইলি যে? এ আমার মুণ্ড কি কোরেচ?"

প্রফুল্ল আগের মত নিস্পন্দ রহিল। কেবল নাক ও ঠোঁটের কোণ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। তখন কিরণ "হতভাগা ছেলে" বলিয়া, তাহার গাত্র ধৌত করিবার জন্য, তাহাকে তুলিয়া লইয়া গেল।

সেই অবধি কিরণ বলিত যে, প্রফুল্ল আগে যেমন শান্ত ছিল, এখন তেমনই দুরন্ত হইয়াছে। কিরণ আর অনেক ছেলে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন ভয়ানক দুরন্ত ছেলে কখনও কোথাও দেখে নাই। আরও বলিত যে, এমন দুরন্ত ছেলে কাহারও বাড়ীতে নাই। অতএব আমি নিবেদন করি, যে বাড়ীর গৃহিণী অথবা বধূ বলিবেন যে, তাঁহার ছেলেপুলের মত দুরন্ত ছেলে কোন বাড়ীতে নাই, তিনি অনুগ্রহ করিয়া মনে রাখিবেন যে, কিরণ নামে একটি মেয়ের প্রফুল্ল বলিয়া একটি ছেলে, তাঁহার ছেলের চেয়েও দুরন্ত। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয় ত কিরণকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

সুখের সময় বাজ পড়িল।

প্রফুল্ল দেড় বৎসরের হইল। এই সময় কিরণের নির্ম্মল অদৃষ্টাকাশ অন্ধকার হইল। বুঝি তার এত সুখ দেবতার সহিল না।

আমার সুখ হইলে দেবতার কেন চোখ ফাটিবে, তা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। কিরণের সুখেও দেবতার তেমন কিছু ক্ষতি ছিল না। কিন্তু দুঃখ উপস্থিত হইলেও দেবতার ঘাড়ে সে দোষ চাপাইবার পদ্ধতি আছে। আমাদের সুখদুঃখের জন্য কেহ দায়ী নহে বলিলে, কেমন গোলযোগ বোধ হয়। যদি কেহ বলে যে, আমরা যাহাকে দুঃখ-সুখ বলি, বিধাতার নিকটে তাহা অলঙ্ঘ্য নিয়মের ফলাফল মাত্র, সুখদুঃখ মানুষের মনোবিকার, তাহাতে বিধাতা কখন হস্তক্ষেপ করেন না, তাহা হইলে আমরা হতাশ হইয়া পড়ি। যে নিয়মে এই বিশ্বচরাচর নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা চিরকাল সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে, কদাপি পরিবর্ত্তনীয় নহে। নিয়তির যে চক্র ঘুরিতেছে, তাহা কেহ রোধ করিতে পারে না, বিধাতারও সে ক্ষমতা নাই। তোমরা যে অর্থে দয়াময়, করুণাময় প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ কর, তাহা ভ্রমাত্মক। এ শব্দ সমুদয় নিরর্থ। তুমি দুঃখে পতিত হইয়া কাতরস্বরে ডাকিতেছ, "কৃপাময়, আমার কৃপা কর, এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর।" এ কথার শ্রোতা কেহ নাই। তুমি যে দেবতার উদ্দেশে ধরালুণ্ঠিত হইতেছ, সে দেবতা বধির, সে দেবতা অন্ধ। তোমার কাতর প্রার্থনা তাঁহার শ্রবণে প্রবেশ করে না, তোমার দুর্দ্দশা তিনি চক্ষে দেখিতে পান না। তোমার প্রদত্ত পুষ্পচন্দন, ধূপধুনার সৌগন্ধ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হয় না। তোমায় দয়া করে, মায়া করে, এমন দেবতা কেহ নাই। যে নিয়মের ফল সুখ, সেই নিয়মের অন্যতর ফল দুঃখ। বিপদের সময় প্রার্থনা করিয়া যদি সম্পদ প্রাপ্ত হও, সেও সেই অনুত্তীর্য্য নিয়মের ফল, দেবতার কৃপা নহে। তোমার সুখদুঃখ-বিধায়ক কোন দেবতা নাই। তুমি সুখের সময় দেবতাকে ভুলিয়া থাক, বিপদের সময় তাঁহাকে ডাক, তাহাতে কাহারও কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সুখের সময় সুখ আসিবে, দুঃখের সময় দুঃখ আসিবে, কিছুমাত্র বৈপরীত্য ঘটিবে না। তুমি দেবতাকে ডাক, কোন লাভ নাই, না ডাক, কোন ক্ষতি নাই। নিয়তির চক্র বিশ্বব্যাপী, ঘোর ঘর্ঘররবে ঘুরিতেছে। সুখ, দুঃখ, দুঃখ, সুখ, অথবা অনন্ত সুখ, অনন্ত দুঃখ চারিদিকে বিকীর্ণ করিতেছে। তোমার আর্ত্তস্বর, অথবা আনন্দলহরী সেই অবিশ্রান্ত ঘোর রবে ডুবিয়া যাইবে।

এ সব বড় ভয়ানক কথা। সকলে এ মন্ত্র গ্রহণ করিলে, এই কথার বশবর্ত্তী হইলে, জগতে ঘোরতর অমঙ্গল ঘটিত সন্দেহ নাই। যিনি এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা, তিনি এই জগতের পালক নহেন, এ কেমন কথা? যিনি এই বিশ্বের অধিপতি তিনি দয়াময় না হইলে, ত্রিভুবন রক্ষা করিত কে? অতএব আমরা স্বর্গ নামক অতি বিচিত্র সপ্ততল অট্টালিকা কল্পিত করিব। সেই স্থলে রাজরাজেশ্বরের স্বতোদীপ্ত অপূর্ব্ব সিংহাসন বিরচিত করিব। সেই সিংহাসনে সম্রাটের সম্রাট, দেবতার দেবতা, দীনপালন, পাষণ্ডদলন, দয়াময় বিরাজ করিবেন। তিনি স্নিগ্ধগম্ভীর-স্বরে জগতে জগতে আদেশ প্রচার করিতেছেন। তিনি কোন সময় প্রশান্তদর্শন, কখন অতি ভীম রুদ্রমূর্ত্তি। তিনি অগতির গতি, তিনি অনাথশরণ, বিপদভঞ্জন, তিনি সকল ঘটে বিরাজ করেন। তিনি তোমার আমার সকলের দুঃখ মোচন করেন, বিপদে পড়িলে তাঁহাকে ডাকিব। আইস, সকলে বিল্বচন্দন লইয়া, মনে প্রীতি লইয়া তাঁহার পূজা করি। তিনি আমাদের মনোরথ পূর্ণ করিবেন। আর যখন সুখসম্পদ যথেষ্ট থাকিবে, তখন তাঁহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবার আবশ্যক নাই। দুঃখের সময় তাঁহাকে ডাকিলে, তিনি যদি দুঃখ দূর না করেন ত তাঁহাকে পোড়া দেবতা বলিয়া গালি দিব, তাহাতে তিনি রাগ করিতে পারিবেন না।

ইহাতে অনেক সুখ আছে। নিজের জন্য কোন ভাবনা ভাবিতে হয় না, সমস্তটাই বিধাতার স্কন্ধে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকি। স্বদেশের রাজ্যভার আর এক জাতির হাতে, পরলোক দেবতার হাতে, ইহলোক অদৃষ্টের হাতে, ইহাতে নিশ্চিন্ত সুখ

আছে। কোন ভাবনা নাই, কেবল এক অন্নের ভাবনা, তাহাও এক বেলা জুটিলে দুই বেলার জন্য বড় ভাবনা হয় না।

এক দিন আহারাদির পর, কিরণ প্রফুল্লকে কোন অকর্ম্মের জন্য তিরস্কার করিতেছে, এমন সময় কিরণের পিত্রালয় হইতে গাড়ী আসিল। পিত্রালয়ের দাসী আসিয়া কহিল, "দিদিমণি, শীঘ্র এস।"

কিরণ দেখিল, দাসী কাঁদিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়াছে। কিরণের পা কাঁপিতে লাগিল, সভয়ে কহিল, "কি হয়েছে, ঝি? কাহার কোন ব্যারাম হয় নি ত?"

দাসী বহিল, "আমি কিছু বলতে পার্‌চি নে। তুমি শীঘ্র এস।"

কিরণ গিয়া গাড়ীতে উঠিল। মাতা চলিয়া যায় দেখিয়া, প্রফুল্ল কাঁদিতে লাগিল। দাসী তাহাকে কোলে করিয়া গাড়ীতে উঠিল। কিরণ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। নীরবে চক্ষের জল মুছিতে লাগিল।

বাড়ীর সম্মুখে ডাক্তারের গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অন্য দিন ছেলেরা গোলমাল করিয়া খেলা করিয়া বেড়ায়, আজ বাড়ীতে সাড়াশব্দ নাই। দ্বারের সম্মুখে ভৃত্যেরা বসিয়া তামাকু খায়, হাস্য-পরিহাস করে, আজ তাহারা সেখানে বসিয়া নাই। কিরণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। পথে আর এক জন দাসী দাঁড়াইয়াছিল। কিরণ তাহাকে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ঝি?"

দাসী কোন উত্তর দিল না, মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

দরজার চৌকাঠে কিরণের পিতামহী দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিরণ তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায়, তাঁকে দেখতে পাচ্চিনে কেন?"

ঠাকুরমা কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কিরণের মাথা ঘুরিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, চক্ষে অন্ধকার দেখিল। "মা কি তবে নাই?" এই কথা বলিয়া কিরণের মুখে আর কথা সরিল না। সে সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

এমন সময় লীলা আসিয়া কিরণের মুখে হাত দিল, কহিল, "কাঁদিও না। তোমার মা'র ব্যারাম হইয়াছে। চল, তাঁহাকে দেখিতে যাইবে।"

প্রফুল্ল দাসীর কোল হইতে নামিয়া, মাতার রোদন দেখিয়া মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

লীলা প্রফুল্লকে কোলে করিয়া, কিরণের হাত ধরিয়া উঠাইল। কিরণ কলের পুতুলের মত লীলার সঙ্গে গেল। দ্বারদেশে লীলা কহিল, "চোখ মুছ। রোগীর কাছে কাঁদিতে নাই।"

অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিয়া কিরণ ঘরে প্রবেশ করিল। কিরণের মাতা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শয়ন করিয়াছিলেন। কিরণ ডাকিল, "মা!"

মাতা মুখ ফিরাইলেন। অতি ক্ষীণ স্বরে কহিলেন, "কিরণ মা, এসেচ। কাছে ব'স।"

কিরণ খাটে বসিয়া, মাতার মস্তক কোলে করিয়া বসিল। লীলা প্রফুল্লকে কোলে লইয়া এক পাশে বসিল। সকলে চুপ করিয়াছে দেখিয়া, সেও চুপ করিয়াছিল। ঘরের চারিদিকে যে সকল ঔষধের শিশি সজ্জিত ছিল, সে তাহাই দেখিতে লাগিল।

কিছু পরে কিরণের মাতা কহিলেন, "কিরণ, খোকা—প্রফুল্ল কোথায়?"

লীলা প্রফুল্লকে তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "এই যে আমার কাছে আছে।"

প্রফুল্লকে দেখিয়া কিরণের মাতা হাত তুলিবার চেষ্টা করিলেন, হাত উঠিল না। ক্ষীণতর স্বরে কহিলেন, "ভাই, তোমায় দুদিন আদর করতে পেলেম না। দিদিমা যে চল্‌ল।"

কিরণের তপ্ত চক্ষু হইতে দুই বিন্দু উষ্ণ বারি মাতার কপোলে গড়াইয়া পড়িল। মাতা কহিলেন, "কিরণ, কেঁদো না মা!"

লীলা দেখিল, কিরণের চক্ষু হইতে জল উথলিয়া পড়িতেছে, আর রাখিতে পারে না। তখন সে কিরণকে গৃহের বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিল। কিরণ মাতার মস্তক ধীরে ধীরে বালিসে নামাইয়া ঘরের বাহিরে গেল। লীলা প্রফুল্লকে তাহার কোলে দিল। কিরণ বাহিরে গেলে লীলা কিরণের মাতার শিয়রের নিকট বসিয়া রহিল।

কিরণ দেখিয়াছিল, তাহার মাতার সুন্দর, শান্ত মুখের উপর মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে, চক্ষের জ্যোতিঃ মলিন হইয়া গিয়াছে, মুখের বর্ণ নীল হইয়া গিয়াছে। কিরণ প্রফুল্লকে ছাড়িয়া দিয়া

লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। চীৎকার করিতে পারিল না, পাছে সে শব্দ মাতার কানে যায়।

ডাক্তার আসিল, বৈদ্য আসিল, কেহ কিছু করিতে পারিল না। উৎকট রোগ, চিকিৎসকে কিছু নির্ণয় করিতে পারে নাই। কেহ বলিল, মাথার ব্যারাম, কেহ বলিল, বুকের ব্যারাম! সকলে বলিল, "ব্যারাম চিকিৎসার অসাধ্য, রক্ষা নাই।" ব্যারাম এক দিনেই বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

পীড়ার প্রথম অবস্থা হইতে কিরণের মাতা কোনরূপ অস্থিরতা প্রকাশ করেন নাই। লীলা তাঁহার কাছে একাদিক্রমে সমস্ত দিন-রাত বসিয়াছিল। কিরণের মাতা তাহাকে কতবার শয়ন করিতে বলিতেন, লীলা কিছুতে উঠিত না। ঔষধ সেবন করান, পাখার বাতাস দেওয়া, গায় হাত বুলাইয়া দেওয়া, সমস্তই লীলা করিতে লাগিল। আর যে কেহ রোগের সেবা করিতে অসম্মত, এমন নহে। কিরণের পিতামহী, পিসী, বাড়ীর দাসী, সকলে গৃহিণীর শুশ্রূষা করিতে চায়, কিন্তু লীলা কাহাকেও কিছু করিতে দিল না। কিরণের পিতামহী এমন পুত্রবধূ কোথায় পাইবেন? দাসীরা এমন কর্ত্রী কোথায় পাইবে? প্রথম দিন পীড়া তত কঠিন নয় বিবেচনা করিয়া, কিরণের আসিবার কথা উঠে নাই, দ্বিতীয় দিবস কিরণকে লইয়া আসিল।

কিরণের মাতা বরাবর সজ্ঞানে ছিলেন। অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া অধিক কথা কহিতে ডাক্তারেরও নিষেধ ছিল। ক্রমে পীড়ার যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল। অবশেষে মৃত্যুযন্ত্রণা আরম্ভ হইল। কিরণের মাতা সকলকে ডাকাইলেন, সকলে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। শাশুড়ী নিকটে আসিলে, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তৎপরে স্বামীর জন্য চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। স্বামী আসিয়া পাশে দাঁড়াইলেন। কিরণের মাতা অনেক কষ্টে বলিতে লাগিলেন, "কিরণ, মা, অমন করিয়া কাঁদিও না। আমার মত কয় জন মরিতে পারে? এত বড় সংসার রাখিয়া, তোমাদের সকলের মুখ দেখিয়া মরিতেছি, এ কি অল্প পুণ্যের কথা? গোপাল, অত কেঁদ না। লীলা আমার সন্তানের চেয়ে অধিক।" স্বামীকে বলিলেন, "আরও কাছে আসিয়া দাঁড়াও, আমার মাথায় হাত দাও, আমি তোমার মুখ দেখিতে দেখিতে মরি। দেখো, লীলার যেন কখন কোন কষ্ট না হয়। আমার অর্দ্ধেক গহনা কিরণকে দিও। লীলাকে সর্ব্বস্ব দিলেও তাহার উপকারের শোধ হয় না।" আর বড় কথা কহিতে পারিলেন না। বার দুই বলিলেন, "মা গো! যাই যে আমি!" তার পর আর কোন কথা কহিলেন না।

ক্রমে ক্রমে সব ফুরাইয়া গেল। গৃহলক্ষ্মী গৃহ ছাড়িয়া গেলেন।

কিরণ মাটীতে পড়িয়া, ধূলায় লুটালুটি করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "আমাদের ফেলে কোথায় গেলে মা গো! মা বোলে এখন আর কারে ডাকব গো!" গৃহমধ্যে হাহাকারধ্বনি উঠিল, কিরণের পিতামহী বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, দাসীরা কাঁদিতে লাগিল। লীলা কিরণকে মাটী হইতে তুলিয়া দুই জনে গলা ধরাধরি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রফুল্ল মাটীতে শুইয়া, মাতার কাপড় ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুখ-দুঃখের সে কি জানে? হাসি দেখিলে হাসে, কান্না দেখিলে কাঁদে। লীলা কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "আমারই কপালের দোষ। যার কাছে আমি যাই, তারই একটা না একটা বিপদ ঘটে। আমায় ত যম নেয় না।"

কতক্ষণ গেল। যাহারা দাহ করিতে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিল। লীলা ও কিরণ ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। প্রফুল্ল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কিরণ হৃদয়বিদারক স্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "বাবা, মা কোথায়?"

গোবিন্দপ্রসাদ বাবু কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন।

কিরণ, আর কত কাঁদিবে তুমি! যখন তুমি মনের সুখে নিশ্চিন্ত ছিলে, তখন কি সে সুখ দেখিবার কেহ ছিল না? না থাকিলে তোমার এ বিপদ কেন? জান না কি, সুখ কাহারও চক্ষে সহে না, মানুষেরও না, দেবতারও না? মানুষে মানুষের সুখ দেখিতে পারে না। সুখ! সুখের কখন নাম করিও না, অমনি দুঃখ আসিয়া সুখের

আসন গ্রহণ করিবে। তোমার অর্থ নাই, মান-মর্য্যাদা নাই, তবু তুমি মনে করিতেছিলে, তুমি সুখে আছ। সে সুখ তোমার ক'দিন রহিল, কিরণ? তোমার যে কোমল মুখখানি, ও মুখের হাসি কাহারও সহিবে কেন? সুন্দর মুখ কাঁদিলে আরও সুন্দর দেখায়। তাই তোমায় কাঁদিতে হইবে। দেবতা বল, কাল বল, প্রকৃতি বল, সকলে কাঁদাইতে ভালবাসে। তুমি সুন্দরী, তুমি কাঁদ, চন্দ্র তোমার মুখ দেখিয়া হাসিবে। সৌন্দর্য্য যেখানে, কাতরতা সেইখানে, নহিলে তেমন সুন্দর দেখায় না। সুন্দরীর গণ্ডস্থলে অশ্রুবিন্দু কেমন সুন্দর! মৃত শিশুর মুখমণ্ডলে চন্দ্রকিরণ কেমন সুন্দর! দয়া, মায়া, মমতা কে করিবে? মর্ম্মভেদী কাতর বাণীর প্রতিধ্বনি কেমন সুন্দর! কে কিরণের দুঃখ নিবারণ করিবে?

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

স্বামীর সান্ত্বনা।

সংসারের মায়াজাল না থাকিলে দুর্ব্বিষহ জীবন-যাত্রা আমরা কেমন করিয়া সহিতাম? ভুলিতে না পারিলে শোকতাপ সহিয়া আবার কোন্ সুখে হাসিতে পারিতাম? দুশ্ছেদ্য মায়াবন্ধন না থাকিলে কেমন করিয়া দিন যাইত? যে সন্তানকে বুকে করিয়া মানুষ করিলাম, তাহাকে কয় দিন দেখিতে পাই? যাহাকে তিলার্দ্ধ না দেখিলে সমুদয় অন্ধকার দেখি, সে ত চিরদিনের মত চলিয়া যায়, এমন কে আছে যে বলিতে পারে, যম তাহাকে কখন কাঁদায় নাই? দুঃখ যদি ভুলিবার না হইত, তাহা হইলে কি কখন দুঃখ ফুরাইত? কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু অন্ধ হইলেও ত মানুষের দুঃখ কিছু উপশম হইত না। হৃদয়ের অন্ধকার ত কখন ঘুচিত না, জীবনের দীর্ঘ দিন-রাত্রি ত কখন কাটিত না। যে মাতার মুখ দেখিয়া মানবহৃদয়ের অপরিমিত স্নেহ জানিয়াছি, যাঁহার উৎফুল্ল আনন দেখিয়া হাসিতেছি, সেই মাতার বিচ্ছেদে এখনও ত তেমনি হাসিতেছি। যে পিতার জানু ধরিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছি, এই বিষম সংসারপথে আর ত তাঁহাকে দেখিতে পাই না। সে ভ্রাতা, সে ভগিনী, সে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, সকলে কোথায় গেল! আমি কেন বাঁচিয়া আছি? আশা? কিসের আশা? আশার পথ চাহিয়া, আশা আশা করিয়া ত সব গেল, সর্ব্বস্বান্ত হইলাম। আবার আশা? আমিও এক দিন মরিব, সেই আশা? সে দিন ত আসিবেই, আশাও ত সে সময় আমায় প্রতারিত করিতে পারিবে না। যাহারা গিয়াছে, তাহারা ত আর ফিরিবে না। আর কি তাহাদের দেখিতে পাইব? বুঝি সেই আশা আছে, সেই জন্য এখনও বাঁচিয়া আছি।

কিরণ কিছু দিন বাপের বাড়ী রহিল। ছোট ভাই-ভগিনীগুলিকে দেখিত শুনিত। অধিক দিন থাকিলে চলে না, কারণ, কিরণের আপনার সংসার হইয়াছে। কিরণ যাইবার সময় লীলাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিল, লীলা কিছুতে রাজি হইল না। লীলা শুধু আপনার সুখ চাহিলে হয় ত কিরণের সঙ্গে যাইত; কিন্তু লীলার সে স্বভাব নয়। যাহাদের কাছে থাকিয়া সে এত মনের সুখ পাইয়াছে, তাহাদের বিপদের সময় সে তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে? লীলার তেমন প্রকৃতি নয়। লীলা আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিল। কিরণের সঙ্গে গেল না।

যাবার দিন কিরণ আবার কাঁদিল। লীলা কাঁদিল, পিতামহী কাঁদিলেন, ছেলেরা কাঁদিল, দাসীরা কাঁদিল। কিরণের শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় সকলের সেই অনন্তযাত্রা মনে পড়িল। যে গিয়াছে, সে ত আর ফিরিল না। এত বড় সংসারের এমন লক্ষ্মী গিয়াছে, তিনি ত আর ফিরিলেন না। দাসীরা কিরণের মাতার গুণ গাহিয়া কাঁদিতে লাগিল, পিতামহী পুত্রবধূর গুণ স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, ছেলেরা কেবল কাঁদিতে লাগিল, কিরণ লীলার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নীরবে বুকের ব্যথা মুখে না ফুটিতে পারিয়া, চক্ষের জলে লীলার বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিল। প্রফুল্ল কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার অঞ্চল টানিতেছিল।

গাড়ীতে উঠিয়া কিরণ চক্ষের জল মুছিল। গাড়ীতে একেলা আসিতে কত রকম ভাবনা মনে আসিতে লাগিল। যে গৃহ ছাড়িয়া এত দিনের জন্য দুঃখপূর্ণ পিত্রালয়ে বাস করিল, সেই গৃহের ভাবনা মনে উঠিতে লাগিল। স্বামী একা, এত দিন কিরণকে দেখা দেন নাই,—তাহাকে দেখিলে তাঁহার শোক উথলিয়া উঠিত। তিনি একা, কে তাঁহার যত্ন করে, তাঁহার খাবার দাবার কে গোচগাচ করিয়া দেয়? সংসার কে দেখে? ঝি, বামনী না জানি কতই চাল-ডাল চুরি করে! প্রফুল্ল মায়ের কোল হইতে নামিয়া, পা রাখিবার জায়গায় দাঁড়াইয়া দরজা টানিয়া খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া মাতাকে কহিল, "মা, কুলে।"

কিরণ কহিল, "ছি! গাড়ীর দরজা কি খুল্‌তে আছে। রাস্তার লোক দেখ্‌তে পাবে।"

প্রফুল্ল আরও চাপিয়া ধরিল, 'কুলে।"

কিরণ সোজা কথায় না পারিয়া বলিল, "গাড়ী খুললে তোকে বুড় ধ'রে নিয়ে যাবে। বাপ রে, পালিয়ে আয়! আয়, আমি কোলে লুকিয়ে রাখি।" এই বলিয়া কিরণ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

প্রফুল্ল ছেলেটি বড় সোজা নয়, এ কথা আগেই বলিয়াছি। বুড়র নামে ভয় পাওয়া দূরে থাকুক, সে মাতার কোলে না উঠিয়া হাত পা ছুড়িয়া কহিল, "আমি বুল দেখি। কুলে, ও মা, কু—লে।"

কিরণ তখন প্রফুল্লকে থামাইতে না পারিয়া, গাড়ীর দরজার একটুখানি খুলিয়া দিল। প্রফুল্ল সেইখানে দুটি হাত রাখিয়া, হাতের উপর থুঁতি রাখিয়া, রাস্তার গাড়ী, ঘোড়া, মানুষ, রাস্তার ধারের বাড়ী দেখিতে লাগিল। গাড়ীর দোলনে তাহার মাথা কাঁপিতে লাগিল।

বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া সুরেশচন্দ্র নিজে। তিনি দরজা খুলিয়া, প্রফুল্লকে কোলে করিয়া নামাইলেন। প্রফুল্ল তাঁহাকে দুই মাসের অধিক দেখে নাই। সে তাঁহাকে চিনিতে পারিল না, ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল, কিন্তু কাঁদিল না। প্রফুল্লকে কোলে করিতে সুরেশচন্দ্র একবার কিরণের দিকে চাহিলেন। কিরণ তাঁহার মুখের প্রতি অনিমেষ চক্ষে চাহিয়া ছিল। চক্ষু মিলিতেই সুরেশচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন, কিরণও চক্ষু নত করিল। প্রফুল্লকে কোলে করিয়া সুরেশচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলে, কিরণ তাঁহার পিছনে আসিল। সুরেশচন্দ্র সিঁড়িতে উঠিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রফুল্ল কিছু অস্বচ্ছন্দ বোধ করিয়া, চারিদিকে চাহিতেছিল। মাতাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "মা, কোলে।" সুরেশচন্দ্রও সেই সময় ফিরিয়া চাহিলেন। আবার দুই জনের চক্ষু মিলিল। এবার সুরেশচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন না, কিরণ চক্ষু অবনত করিল না। স্বামীর মুখ দেখিতে দেখিতে কিরণের চোখ ফাটিয়া জল আসিল। দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। চক্ষু মুছিবার জন্য কিরণ আঁচল তুলিল না।

মাতার চক্ষে জল দেখিয়া, প্রফুল্ল কাঁদিয়া অস্থির হইল। বাড়ীর দাসী শ্যামা, সে আগে হইতে একটা উপায় ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। প্রফুল্লের কান্না শুনিয়া, তাড়াতাড়ি সেই ঘরে আসিয়া, তাহার এক হাতে একটা সন্দেশ, আর এক হাতে একটা পুতুল দিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গেল। প্রফুল্লের চক্ষুভরা জল, ভাল দেখিতে পায় না। একবার এ হাতের দিকে চাহিয়া দেখে, আবার ও হাতের দিকে চাহিয়া দেখে। এ দিকে কান্নাও একবার ধরিলে তখনি বন্ধ করা যায় না। প্রফুল্ল একবার দুই হাতের দুই সামগ্রী দেখিয়া আবার কাঁদিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে ডানহাতের সন্দেশটির এক গ্রাস মুখে পুরিয়া দিল, অমনি কান্না থামিয়া গেল। তার পর বাম হাতে পুঁতুলটি ধরিয়া, হাতের উল্টা পিঠ দিয়া চক্ষের জল মুছিয়া, বাকী সন্দেশটুকুর প্রতি চাহিয়া দেখিল। তার পর বাম হাতের পুঁতুলটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। তার পর সন্দেশের আর এক গ্রাস। এইরূপে চুপ করিল।

কিরণ স্বামীর মুখপানে চাহিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র কোন কথা কহিলেন না, ধীরে কিরণের হাত ধরিয়া বসাইলেন এবং আপনি পাশে বসিলেন। কিরণ স্বামীর স্কন্ধে মাথা রাখিয়া নিঃশব্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র কিরণের হাত ধরিয়া বসিয়া রহিলেন, কোন কথা কহিলেন না।

কি মধুর সান্ত্বনা! এমন সান্ত্বনা করিতে কয় জন জানে? শোকের সময় বাক্য দ্বারা সান্ত্বনায় কি উপকার? যে শোকার্ত্ত, যদি তাহাকে সান্ত্বনা করিতে চাও ত তাহাকে অনর্থক প্রবোধবাক্য শুনাইও না। তাহার নিকটে বিনাবাক্যে বসিয়া রহিবে। সে অশ্রুমোচন করিবে, তুমি নীরব রহিবে। এইরূপে দীর্ঘকাল রহিবে। তাহা হইলে তাহার হৃদয়ে সান্ত্বনা প্রবেশ করিবে। যে কাঁদে, সে পূর্ণ হৃদয় অপূর্ণ দেখিয়া কাঁদে; আমার হৃদয়ে আমার প্রিয়জনের অংশ আছে। প্রিয়জনের মৃত্যু হইলে আমার হৃদয়ের সেই অংশ শূন্য হয়। সেই জন্য আমি কাঁদি। তোমার সান্ত্বনাবাক্যে সে শূন্য পূরিবে না। যদি তুমি আপন হৃদয় আমার হৃদয়ের মধ্যে ঢালিয়া দিতে পার, তবেই সেই শূন্য পূরিবে, আর পূরিতে পারে কালের জলসিঞ্চনে। আমি ত কথার কাঙ্গাল নই, কথা শুনিলে আমার শোক অপনীত হইবে কেন? আমার ক্ষত হৃদয় অক্ষত করিয়া দাও, আমার নিমীলিত হৃদয়কুসুম প্রস্ফুটিত করিয়া দাও, তবেই শোক ভুলিতে পারিব।

সুরেশচন্দ্র তাহাই করিলেন। কিরণ দেখিল, লীলা ব্যতীত এমন সান্ত্বনা কেহ করিতে জানে না। লীলাও এমন সান্ত্বনা করিতে পারে নাই। লীলার অপরাধ কি? তাহার হৃদয়ের কতটুকু অবশিষ্ট ছিল যে, সে অপরের হৃৎশূন্য পূর্ণ করিবে? কিরণের সেই দুঃখের সময় কেমন একটু সুখ হইল। সে মনে করিত যে, স্বামীর হৃদয়ে তাহার জন্য অধিক স্থান নাই, দেখিল, স্বামীর স্নেহ সমুদ্রতুল্য। স্বামীর স্নেহময় মুখ দেখিয়া, কিরণের তপ্ত হৃদয় শীতল হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

দ্বিতীয় সংসার।

পত্নীবিয়োগে গোবিন্দপ্রসাদ বাবু অত্যন্ত কাতর হইলেন। হইবারই কথা, কেন না, এমন গুণবতী ভার্য্যা অনেকের কপালে মেলে না, তাহাতে কালে পরস্পরের স্নেহ বদ্ধমূল হইয়াছিল। শোকোপশমের উপায়স্বরূপ বন্ধুবান্ধবেরা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতে পরামর্শ দিলেন। সংসার লইয়াই বিষয়। এক সংসার গত হইলে আর এক সংসার পাতিয়া পুনর্ব্বার সাংসারিক হইলে ক্ষতি কি? স্ত্রী-বিয়োগের তুল্য যন্ত্রণা আর নাই, সে যন্ত্রণা দূর করিবার উপায়ের তুল্য সহজ উপায়ও আর নাই। এক স্ত্রীর অবর্ত্তমানে আর এক স্ত্রী ঘরে লইয়া আইস। দেখিবে, অন্ধকার ঘর কেমন আলো হয়, যেখানে মিটমিটে প্রদীপ জ্বলিত সেখানে গ্যাসের আলো জ্বলিবে। গোবিন্দপ্রসাদ বাবুকে কয়েক জন লোক বিবাহ করিতে নিষেধও করিলেন। সন্তানাদি বর্ত্তমান, একটি কন্যা বড় হইয়াছে, দ্বিতীয় সংসার করিলে অসুখ বাড়িবে মাত্র। কোন্ পরামর্শ যুক্তিযুক্ত, সে মীমাংসা আমি করিব না। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু কিছুদিন বিবাহের কথা কানে তুলিলেন না, তাহার পর বিস্তর আপত্তি করিলেন। কিছু দিন বড় উদাসীনের মত বোধ হইল, বিষয়কর্ম্মে ভাল মন দিতে পারেন না, সংসারে বড় অনাস্থা হইল। তার পর ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মনে করিলেন, বিবাহ না করিলে ছেলেগুলার আরও কষ্ট হইবে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তাহাদিগকে মাতার মত যত্ন করিতে পারিবে। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু এই রকম অনেক কথা ভাবিলেন। নিজের জন্য একবারও ভাবিলেন না। দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় তাঁহার কিছুমাত্র রুচি নাই, তবে ছেলেপুলের জন্য একবার ভাবিতে হয়। এ দিকে বন্ধুবান্ধবেরাও বড় পীড়াপীড়ি করিতেছে। অগত্যা গোবিন্দপ্রসাদ বাবু হাল ছাড়িয়া দিলেন, কহিলেন, "দূর হোক, আর ভাবিতে পারি না। এত দুঃখের উপর না হয় আর একটু দুঃখ হইবে।" বিবাহের সম্বন্ধ হইতে লাগিল।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার সময় কেহ বলে না যে, স্বেচ্ছামত অথবা নিজের সুখভোগের জন্য বিবাহ করিতেছি। হয় উপরোধে পড়িয়া, কিংবা সন্তানাদির অযত্নের ভয়ে সকলে বিবাহ করে, কিন্তু বিবাহ না করিয়া থাকে কয় জন? দ্বিতীয় সংসার পরিগ্রহের সময় কোনরূপ উৎসবাদিও হয় না, বরঞ্চ অনেকটা শোকের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ করি, সেই

কারণে এত লোক প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর মাস না ফিরিতেই বিবাহ করিয়া ফেলেন,—শোকের আনুসঙ্গিক সকল ব্যাপার এক সময়েই সমাধা হওয়া বিধি।

এমন দেশে এমন আচার কেন না থাকিবে? যেখানে স্ত্রীজাতি সব সুখে বঞ্চিত, সেইখানেই পুরুষ সব সুখ ভোগ করে। যেখানে পঞ্চবর্ষীয়া বিধবা বালিকার বিবাহ মহাপাপ, সেখানে অশীতি-বর্ষীয়, গলিতদশন, কম্পিতমস্তক বৃদ্ধের স্ত্রীবিয়োগ হইলে আবার প্রপৌত্রীতুল্যা বালিকার সহিত বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত না হইবে কেন? যে দেশে স্ত্রী-জাতির মধ্যে এরূপ ঘোরতর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সে দেশে পুরুষেরা এরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণ কেন না হইবে?

গোবিন্দপ্রসাদ বাবু তেমন কিছু বুড়াও হন নাই। সম্মুখের গুটিকতক চুল পাকিয়াছিল বটে, কিন্তু কলপ দিলে কিছুই বুঝা যায় না। বিশেষ চুলপাকা বয়সের কোন প্রমাণ নয়। আর নীচে পাটীর গুটি দুই দাঁত পড়িয়াছিল। ডাক্তারী শাস্ত্র অক্ষয় হউক! গোবিন্দপ্রসাদ বাবু যে দাঁত বাঁধাইয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও এমন সাধ্য ছিল না যে, আসলে ও নকলে কোন প্রভেদ বুঝিতে পারে। সুতরাং পাত্রী খুঁজিতে কোন কষ্ট হইল না। সম্বন্ধও যেমন স্থির হইল, অমনি বিবাহও হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ যেমন সংক্ষিপ্তসার, বিবাহের ফলগুলি তেমন সংক্ষেপে গণিয়া উঠিবার যো নাই। মনে কর, বিবাহের বর্ণনা করিবার ত কিছুই নাই। না বাজে বাদ্য, না হয় লোক-জন খাওয়াবার ঘটা। বর পাল্কী করিয়া চুপি চুপি আসে, চুপি চুপি বিবাহ হইয়া যায়। যে গাছ যত বড়, তার বীজ বুঝি তত ছোট।

কিছু না বলিলে তোমরা রাগ করিবে। অন্ততঃ কন্যাটি কেমন, সেটি বলা উচিত। কন্যাটি বড়-মানুষের ঘরের নয়, বলা বাহুল্য। যাহার কিছু টাকা আছে, সে সহজে দোজবরে বরের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতে চাহে না। কিন্তু তোমরা শুনিলে বিশ্বাস করিবে না, আমি জানি, একজন সমৃদ্ধ লোক, নিজে শিক্ষিত, এবং কন্যাকে শিক্ষা দান করিয়া অবশেষে তাহাকে চল্লিশ বৎসরের এক দোজবরের হাতে সঁপিয়া দিলেন। সে যাহা হউক, এ কন্যাটি গরীবের ঘরের মেয়ে বটে। কন্যার মাতা বিধবা, একমাত্র কন্যাকে লইয়া দেবরের গৃহে বাস করেন। কন্যাটি বেশ ডাগর, তাহার কারণ এ পর্য্যন্ত একটাও ভাল সম্বন্ধ হয় নাই। কন্যাটির নাম আনন্দময়ী। মাতা কন্যার বিবাহের জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু সৎপাত্র পাওয়া যায় না। এমন সময় গোবিন্দ-প্রসাদ বাবুর আফিসের এক জন কর্ম্মচারী সম্বন্ধ করিতে আসিল। এত বড় প্রলোভন কি ছাড়া যায়? তাহাতে আনন্দের খুড়া মহাশয় কহিলেন, "এই বিবাহ দিতে হইবে। আনন্দের পূর্ব্ব-জন্মে অনেক পুণ্য ছিল, তাই এমন পাত্র জুটিয়াছে। আমার কন্যা বিবাহের উপযুক্ত হইলে এই দণ্ডে বিবাহ দিতাম।" তাঁহার কন্যা ছোট, সে কথাও সত্য। এ কন্যাটি ভ্রাতুষ্পুত্রী, আপনার কন্যা নয়। এমন কুটুম্বিতাও প্রার্থনীয় বটে। অতএব পিতৃব্য মহাশয় সম্বন্ধ স্থির করিলেন। বর দোজবরে, বিবাহের খরচপত্রও অধিক নাই। পিতৃব্য মহাশয় আর ক্ষণবিলম্ব করিতে চান না। বিধবা একটু কাঁদিয়া, মেয়ে সুখে থাকিবে, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। সেই সঙ্গে আপনার সুখের কিছু আশা ছিল কি না, সেটা আমি বলিতে পারিলাম না।

আনন্দময়ীর বয়স প্রায় তের বছর হইবে। রং পরিষ্কার, গৌরবর্ণ বলিতেও আমার বিশেষ আপত্তি নাই। মুখ বেশ ধারাল, চোখ দুটি বেশ পটলচেরা। গড়ন কিছু বাড়ন্ত, দেখিতে শুনিতে বেশ ডাগর-ডোগর। চোখের কোণে মাঝে মাঝে আগতপ্রায় যৌবনের বিদ্যুৎ দেখিতে পাওয়া যায়। আনন্দময়ীকে দেখিতে বেশ, উঠিয়া দাঁড়া-ইলে সুন্দরীই বলিতে হয়। আর একটি কথা বলিলেই রূপবর্ণনা শেষ হয়। হাসিলে আনন্দ-ময়ীর গালে টোল খায়। তিনি জানিতেন, তাহাতে তাঁহাকে বড় ভাল দেখায় না। এজন্য বড় একটা হাসিতেন না।

এক দিন প্রাতঃকালে স্নানাদি সমাপন করিয়া গোবিন্দপ্রসাদ বাবু কন্যা দেখিতে আসিলেন। বাবুর পরণে চুলপেড়ে সিমলার ধুতি, গিলা দেওয়া পিরাণ, গলায় কোঁচান চাদর, মাথায় কুলল

তেলের মিঠা গন্ধ। গোবিন্দপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে ঘটক কর্ম্মচারী ছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু বৈঠকখানায় বসিলে পর কন্যার পিতৃব্য মহাশয় শশব্যস্ত হইয়া কন্যা আনিতে গেলেন। কিছু পরে লজ্জাবনতমুখী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু হেঁট বসিয়াছিলেন, মলের শব্দ শুনিয়া মাথা তুলিলেন। কন্যা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিল। পাত্রীকে যেরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করিবার নিয়ম আছে, সেরূপ জিজ্ঞাসা করা হইল। কন্যা উঠিয়া যায়, ঘটক পাত্রকে কহিলেন, "মহাশয়, এইবার একবার দেখুন।" এ কথা পাত্র ও কন্যা দুই জনেই শুনিতে পাইলেন। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কন্যাও হঠাৎ একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া ফেলিল। একবার চারি চক্ষে মিলিল। শুভদৃষ্টি সেই সময় হইয়া গেল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

বিন্দুবাসিনী।

প্রথম স্ত্রীবিয়োগের মাস কয়েক পরে গোবিন্দপ্রসাদ বাবু দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন। বিবাহে কাহারও নিমন্ত্রণ হয় নাই, আত্মীয়েরা কেহ আসেও নাই। সংবাদ সকলেই পাইয়াছিল, কিরণও শুনিয়াছিল। সে বিবাহের সময় আসিল না। তাহাকে আনিতেই বা যাইবে কে? আর কেহ না আসুক, শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী বিনা নিমন্ত্রণে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দেখিতে আসিলেন। বিন্দুবাসিনী ভাইয়ের নিকটে অনেক আশা রাখেন, এ জন্য ভ্রাতৃবধূকে হাতে রাখা চাই। কিরণের মাতাকে সকলে জানিত। তিনি কখন কাহারও অপকার করিতেন না। বিন্দুবাসিনী সেই সাহসে ভ্রাতার বাড়ীতে আসিয়া এত উৎপাত করিতেন। এখন নূতন গৃহিণী আসিবে, আর সে দিন থাকিবে না। বিন্দুবাসিনী সেই ভাবিয়া তাড়াতাড়ি বাপের বাড়ী আসিলেন। আসিয়া একবার কাঁদিলেন,—কাঁদিতে হয় বলিয়া। তার পরদিন নূতন বউ আসিল, সে দিন আবার হাসিলেন, না হাসিলে দাদা আর বউ দু'জনেই দুঃখ করিতে পারে। নববধূকে তুলিয়া আনিবার জন্য সকলে যখন দরজা-গোড়ায় দাঁড়ায়, তখন বিন্দুবাসিনী লীলাকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া, তাহাকে খুঁজিতে লাগিলেন। আর কোথাও তাহাকে না পাইয়া তাহার ঘরে দেখিতে গেলেন। দোর ভেজান রহিয়াছে। খুলিয়া দেখিলেন, লীলা বিছানায় পড়িয়া বালিসে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছে। বিন্দুবাসিনী তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, "ছি! এখন কি কাঁদিতে আছে? এখন উঠে বাহিরে এস। নইলে সবাই মনে করবে কি?"

লীলা মুখ তুলিল না। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "এখন আমি যেতে পারব না। তুমি যাও। আমি একটু পরে যাব এখন।"

বিন্দুবাসিনী আর কিছু না বলিয়া, দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া এক জনকে কহিলেন, "দেখ দেখি অন্যায়টা। ওঁর যেন মা মাসী মরেচে, আমাদের যেন কেউ যায় নি। আবার এই সময় চক্ষের জল। ইচ্ছা ক'রে অমঙ্গল ডেকে আনা বই ত নয়।" এই সময় মাতাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, "মা, শাঁখটা কোথায়? এনে দাও ত।"

বিন্দুবাসিনীর আর সে মূর্ত্তি নাই। দাসীরা আর তাঁহার গালি ও মুখনাড়া খায় না, বুড় মাকে আর ভয়ে তত কাঁপিতে হয় না, কিন্তু এখনও দুই চারিটা ধমক-চমক সহিতে হয়। ভ্রাতৃবধূ ঘরে আসিলে, বিন্দুবাসিনী তাহাকে প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন। বউকে নাইয়ে দেওয়া, খাইয়ে দেওয়া, তাহার খোঁপা বাঁধিয়া দেওয়া, সব বিন্দুবাসিনী স্বহস্তে করিতে লাগিলেন। যাহারা বউ দেখিতে আসে, তাহাদিগকে বউ দেখান। কিরণের ছোট ভাই-ভগিনীগুলিকে জড় করিয়া, নববধূকে দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, "দেখ, এই তোদের মা।"

এই কথা শুনিয়া তাহারা ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। যেটি ছোট, সেটি কহিল, "মা নেই।"

বিন্দুবাসিনী কহিলেন, "সে কি রে? মা নেই কি? এই যে মা!" এই বলিয়া তাহাকে ধরিয়া আনন্দময়ীর কোলে বসাইয়া দিলেন। বালক একবার

আনন্দের মুখের দিকে চাহিয়া, একবার পিসীমার মুখের দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে কোল ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বিন্দুবাসিনী কিছু অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

লীলা সমস্ত দিন ঘরের বাহির হইল না। বৈকালে বাহির হইয়া একবার নববধূর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া আনন্দময়ী নমস্কার করিতে উদ্যত হইল। বিন্দুবাসিনী নিষেধ করিলেন, কহিলেন, "তুমি কেন নমস্কার করিবে? ও যে সম্পর্কে মেয়ে।"

লীলা সেখান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

তখন আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিল, "কে উনি?"

বিন্দুবাসিনী কহিলেন, "কে আর উনি! কেউ নয়, এখানে থাকে, বাপ মা কেউ নেই। এতক্ষণ ঘরে দোর দিয়া কাঁদিতেছিল, তোমাকে দেখিতে আসে নাই। এসে নমস্কারও করিল না।"

এ কথাগুলি আনন্দময়ী মনে গাঁথিয়া রাখিল।

বিবাহের পর প্রথমবার শ্বশুরবাড়ী আসিয়া আনন্দময়ী যে আট দিন সেখানে ছিল, সে কয় দিন কেবল কাঁদিত। এত বড় মেয়ে, কাঁদিবার কোন কথা নয়। ছোট মেয়ে হইলে কাঁদা সম্ভব বটে। আনন্দ কেন কাঁদিত, তা আমি জানি না। যেরূপ বিবাহ হইয়াছিল, তাহাতে আহ্লাদ হইবার কথা। বিবাহের সময় আনন্দ এক গা গহনা পাইয়াছিল, কাপড়-চোপড়ও যথেষ্ট পাইয়াছিল। ঘর-দোর দেখিয়াও সুখ বই দুঃখ হয় না। তবু সে কেবল কাঁদিত। আট দিন স্বামীর সঙ্গে একটাও কথা কয় নাই। প্রায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রহিল।

আট দিন পরে আনন্দময়ী পিতৃবালয়ে ফিরিয়া আসিল। দুই মাস পরে আসিয়া ঘর করিবে। বিন্দুবাসিনী নিজগৃহে ফিরিয়া গেলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

ঘরবসতি।

আনন্দময়ী পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলে তাহার মাতা কহিলেন, "আনন্দ, তুই সেখানে অত কাঁদ্‌তিস কেন? তোর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কাঁদবার বয়স?"

আনন্দ বলিল, "কে জানে মা, বড় মন কেমন করিত, কেবল তোমার কাছে আসিতে ইচ্ছা হইত। বিয়ে না হ'লে আমি বরাবর তোমার কাছে থাক্‌তাম।"

মা। অলক্ষণে কথা বলিস্ নি। মেয়েমানুষের বুঝি চিরকাল আইবুড় থাক্‌তে আছে? সেখানে কি কেউ তোকে অযত্ন কর্‌ত?

কন্যা। না না, সে জন্যে নয়। আমি মা, সেখানে একলা থাক্‌তে পার্‌ব না। এইবার যখন যাব, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

মা। দূর, অনাছিষ্টি কথা বলিস্ কেন? আমার কি সেখানে যেতে আছে? জামাইবাড়ী গিয়ে থাক্‌লে লোকে নিন্দে করে। আর তোর সতীনের ঘর, ছেলেপুলে আছে, সেখানে কি আমি যেতে পারি? ঠাকুরপোই বা আমায় যেতে দেবেন কেন?

সে দিন এই পর্য্যন্তই কথা রহিল। আনন্দের মা সেই দিন হইতে কেবলই ভাবিতেন, আনন্দের শ্বশুরবাড়ী তাঁহার গিয়া থাকা উচিত কি না। দেবরের ঘরে যে অবস্থায় থাকিতেন, জামাইবাড়ী কি তাহার অধিক আদর হইবে না? কিন্তু দেবর তাহাতে কিছুতেই সম্মতি দিবেন না। তিনি যে ভাইজকে বড় একটা যত্ন করেন, তা নয়, কিন্তু ভাইজ জামাতার ঘরে থাকিলে তাঁহার বড় অপমানের কথা। আনন্দের মা ভাবিলেন যে, মেয়ের কাছে থাকা যদি পাকা রকম স্থির হয়, তাহা হইলে দেবর রাগিলেই বা! এখন তিনি ভাইজকে টাকার তোড়া আনিয়া দেন না, তখন ও কিছু ফাঁসি দিতে পারিবেন না। একমুঠা ভাত,—তা মেয়ের কাছে স্থান হইলে সে জন্যও দেবরের আশ্রয় লইতে হইবে না। শেষ কথা রহিল, মেয়ে তাঁহাকে বরাবর কি চক্ষে দেখিবে। সে বিষয়ে তাঁহার কোন

ভাবনা হইল না। মেয়ের যে মা'র উপর কখন অন্য মন হইবে, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তিনি কেবলি এই রকম সাত পাঁচ ভাবিতে লাগিলেন।

আনন্দময়ীর শ্বশুরবাড়ী যাইবার দিন নিকট আসিতে লাগিল। মাতা দিবানিশি কিসে আনন্দ ভাল থাকে, কিসে সুখে থাকে, সেই চেষ্টা করিতেন। শ্বশুরবাড়ী যাবার আগের দিন কন্যাকে একেলা পাইয়া কহিলেন, "আনন্দ, শ্বশুরবাড়ী গিয়ে দু'দিন পরে আমায় ভুলে যাবি ত? বুড় মাকে কি আর তখন মনে থাকবে?"

আনন্দ মা'র হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। কহিল, "মা, আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারব না। তুমি আমাকে পাঠিয়ে দিও না।"

মা। ছি মা, ও কথা কি বলতে আছে? তোমার যদি এত কষ্ট হয় ত আমি তোমাকে দেখতে যাব এখন।

কন্যা। হাঁ মা, যেও। তোমাকে দেখলে তবু আমার সোয়াস্তি হবে।

মা। কিন্তু তুই যদি সেখানে গিয়ে কান্নাকাটি করিস্, তা হ'লে আমি যাব না। সেখানে গিয়ে আপনার সংসার যখন আপনি বুঝবি, তখন আমি যাব।

কন্যা। আচ্ছা মা, আমি কাঁদব না, তুমি আমাকে দেখতে যেও।

মা। তুই যেন এ কথা এখন কাউকে বলিস্ নে। এখানেও কাউকে বলিস্ নে, সেখানেও কাউকে বলিস্ নে। তোর কাকা এ কথার বাষ্পগন্ধ টের পেলে আমার আর যাওয়া হবে না। আমি যখন যাব, তোকে ব'লে পাঠাব এখন। ঝি ত মাঝে মাঝে তোকে দেখতে যাবে। তুইও এক দিন এক দিন ঝি পাঠিয়ে দিস্।

আনন্দ চোখ মুছিয়া বলিল, "আচ্ছা।"

সেই দিন বৈকালে শ্বশুরবাড়ী টিপ পরিবার জন্য আনন্দময়ী একটি কৌটায় গুটিকতক কাঁচপোকা ও সোনা-পোকা ধরিয়া সেগুলির পাখা সংগ্রহ করিল। পোকাগুলির আর কোন অপরাধ নাই, কেবল তাহাদের পাখার ও গায়ের রঙের বড় জাঁকজমক। প্রতিদিন কেবল এই অপরাধে যে কত পোকা, কত প্রজাপতি প্রাণ হারায়, কে তাহা সংখ্যা করিয়া উঠিবে? ইহা দেখিয়াও যে ধনকুবেরদিগের চৈতন্য হয় না, সেটা বড় বিস্ময়ের কথা। যে সুন্দরী প্রাণান্তেও একটি মাছি মারিতে চান না, যিনি একটা পিঁপড়া মাড়াইয়া ফেলিলে অনুতাপে সারা হন, তিনিও বিকালবেলা কাপড় কাচিয়া, একটি কাঁচ-পোকার টিপ পরিতে কোন আপত্তি করেন না। ইহাতে তাঁহাদের কোন দোষ নাই। ইহা তাঁহাদের জাতিধর্ম্ম মাত্র। যেমন মাকড়সার জালে অসাবধানে মাছি পড়িলে তাহার আর রক্ষা নাই, বালকের চোখের সুমুখে একটি ফড়িং পড়িলে সেটি যেমন সহজে পলাইতে পারে না, চকচকে পোকাগুলিরও সেই দশা হয়,—আর আমাদের এই জরিমোড়া আংটিপরা, চেন ঝুলান বড়মানুষেরাও সেই দশা প্রাপ্ত হন। যে জাতি কাঁচপোকার পাখা কাটে, সেই জাতি মানুষ-প্রজাপতিরও পাখা কাটে। আমরা চারিদিকে এই যে সোনা-রূপা-মোড়া মানুষ-পোকা দেখিতে পাই, তাহাদের জন্য বড়ই ভাবনা হয়। কোন্ দিন দেখিব, তাহারা মাকড়সার জালে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে, কিংবা কোন রমণীর টিপের কৌটার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে।

এবার আনন্দময়ী শ্বশুরবাড়ী আসিতেই সকলে বুঝিতে পারিল যে, আর সে প্যান-পেনে ঘ্যানঘেনে বিয়ের কনেটি নাই। সে বেশী দিনের কথা নয়। এরি মধ্যে এত পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া ঘটিল? আমার বোধ হয়, সেই আনন্দের মা কন্যাকে অনেক করিয়া শিখাইয়াছিলেন এবং কন্যা নিজেও নিতান্ত ছোটটি নয়, সেই জন্য এমন ঘটিয়াছিল। এবার আসিয়া আনন্দময়ী কান্নাকাটি কিছুই করিল না, বেশ স্থির হইয়া রহিল। বিকালবেলা খোঁপা বাঁধা হইলে আপনি একটি টিপ কাটিয়া পরিল। সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিল। লীলা এবার তাহাকে প্রণাম করিল, লীলার সঙ্গেও দু' একটি কথা কহিল, কিন্তু মনের ভিতর শ্রীমতী বিন্দুবাসিনীর সে কয়টি কথা গাঁথা ছিল।

রাত্রে যখন ঘরে শুইতে গেল, তখন আনন্দের ভারি লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। ইচ্ছা, স্বামীর সঙ্গে কথা কয়, কিন্তু বিয়ের পর আট দিন যেরূপ করিয়াছিল, তাহা মনে করিয়া ভারি লজ্জা হইতে

লাগিল। যখন সে ঘরে গেল, তখন ঘরে আর কেহ নাই। আনন্দ মনে করিল, বিছানার এক পাশে শুইয়া থাকি, কিন্তু ঘর বেশ সাজান গোজান দেখিয়া শোওয়া হইল না। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। নূতন গৃহিণীর জন্য ঘরের নূতন সাজ হইয়াছে। দেয়ালে নক্সা কাটা, চারি ধারে ছবি ঝুলান, আলমারির উপর রূপার গোলাবপাশ, আতরদান, ঘরের মেজেতে মাদুরের উপর গালিচা পাতা, শোবার জোড়া খাট, তার দুই পাশে দুই-খানি স্প্রিং কাউচ। ঘরে ঢুকিতে দেরাজের উপর একখানি মাঝারি রকম আরশী। কাচের একটি ছোট আলমারিতে নানা রকমের পুতুল সাজান। কতকগুলা কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত পুতুল। এ সব আগে ছিল না, নূতন হইয়াছে। আনন্দময়ীর এই সব দেখা শেষ না হইতেই গোবিন্দ-প্রসাদ বাবু আসিয়া উপস্থিত। আনন্দ চুপ করিয়া বিছানার এক কোণে বসিয়া পড়িল, কিন্তু শুইল না। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু আজ মাথায় বেণী করিয়া কলপ দিয়াছেন, বৈকালে চুপি চুপি বাঁধান দাঁত খুলিয়া স্বহস্তে মাজিয়া লইয়াছেন, কাপড়ে চোপড়ে ভুর্ ভুর্ করিয়া গন্ধ বাহির হইতেছে। তিনি আনন্দের নিকটে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে কখনও কথা কবে না—না কি? আমি কি এতই বুড়ো?"

আনন্দ ঘোমটা টানিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াছিল। এ কথায় আরও হেঁট হইয়া রহিল।

গোবিন্দ বাবু কহিলেন, "আচ্ছা, আমার সঙ্গে কথাই যেন না কইলে। আমি যা দেব, তাও কি নেবে না?" এই বলিয়া পকেট হইতে রূপার শিকলী শুদ্ধ চাবি বাহির করিয়া দেরাজ খুলিতে গেলেন। আনন্দ সেই সময় মাথা তুলিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে দেখিতে লাগিল,—বুড়া আবার কোন্‌খানটা! গোবিন্দ বাবু দেরাজ খুলিয়া একটি বাক্স বাহির করিয়া, আর এক হাতে একটি মোমবাতি জ্বালিয়া লইয়া আনন্দের কাছে আসিলেন, কহিলেন, "দেখ।"

আনন্দ দেখিতে লাগিল। সে বাক্সের ভিতরে দেশী, বিলাতী গহনা ভরা। জড়োয়া গহনার হীরাগুলা বাতির আলোকে জ্বলিতে লাগিল। বিলাতী গহনাগুলা ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। আনন্দ এ সব গহনার নাম পর্য্যন্ত শোনে নাই। গহনা দেখিতে ঘোমটা সরিয়া পড়িল,. গোবিন্দ বাবু একদৃষ্টে তাহার মুখ দেখিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে বলিলেন, "এ সব গহনা আমি আর কাহাকেও দেখাই নাই। তোমার জন্য অনেক টাকা দিয়া কিনিয়াছি। আমার সঙ্গে একটি কথা কও, তাহা হইলে তোমাকে সবগুলি দিব।"

আনন্দ এক হাতে ঘোমটার এক কোণ একটু-খানি টানিয়া দিয়া কহিল, "আমি কি গহনার লোভে কথা কইব না কি?

গোবিন্দপ্রসাদ বাবু এরূপ উত্তর পাইবার আশা করেন নাই। তিনি কিছু অপ্রতিভের ন্যায় কহিলেন, "না, না, তা কেন? আমি তামাসা কোরে বল্‌ছিলেম। এখন ত তামাসাও ঠিক হইল। এ গহনার বাক্স তোমারই রহিল।"

আনন্দ বলিল, "আমি এত গহনা নিয়ে কি কোর্‌ব? যে গহনা আছে, তাই পর্‌তে পারিনে। তুমি আর কাউকে দাও গে।"

গোবিন্দ বাবু। তোমার জিনিষ তোমার যাকে ইচ্ছা হয় দিও। আমায় কি বড় বুড় বোধ হয়? আমায় মনে ধর্‌বে ত?

আনন্দ। ও সব কথা বল্‌লে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাব। বুড় বই কি? আমি কি কচি খুকী না কি?

গোবিন্দ বাবু। "ইস্, খুব যে কথা জ্ঞান দেখতে পাই।" বলিয়া আনন্দের খুঁতি ধরিলেন। আনন্দ অমনি মুখ ফিরাইয়া লইয়া, খাটের উপর উঠিয়া, আর এক দিকে গিয়া বসিল। গোবিন্দ বাবু গহনার বাক্স রাখিতে গেলেন। এ দুই জনের খুব শীঘ্র মনের মিলন হইল, তাহা পাঠকগণ সহজে বুঝিতে পারিতেছ।

এক দিন গোবিন্দপ্রসাদ বাবু আপিস হইতে কিছু সকাল সকাল ফিরিয়া আসিয়া, ঘরে কাপড় ছাড়িতে গিয়া আনন্দময়ীকে দেখিতে পাইলেন। আনন্দময়ী তাঁহাকে দেখিয়া, একটু হাসিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন। গোবিন্দ বাবু কহিলেন, "তোমার মুখে যে আর বড় একটা হাসি দেখতে পাইনে। যখন তোমায় দেখতে গিয়াছিলাম, তখন তোমার মুখে হাসি বড় ভাল

লাগিয়াছিল। এখন বুঝি বুড় বরের সাক্ষাতে আর হাস্‌তে ইচ্ছা করে না?

আনন্দময়ী বলিলেন, "নেও, রঙ্গ রাখ। আমি আবার তখন হেসেছিলাম কখন্? হাসলে আমায় ছাই দেখায়, তা' বুঝি আমি জানিনে?"

গোবিন্দ বাবু কহিলেন, তোমার বুড় বরের দিব্য, যদি আমি মিথ্যা বলিয়া থাকি। হাসিলে তোমায় সত্যই বড় ভাল দেখায়। কে বলিল, হাসিলে তোমায় ভাল দেখায় না?"

আনন্দময়ী হাসিয়া কহিলেন, "তোমার যেমন কথা।" এই বলিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু কথাটা তাঁহার মনে লাগিয়া রহিল। হাসিলে কি সত্যই তাঁহাকে ভাল দেখায়? এত দিন তিনি যাহা মনে করিতেন, সে কি ভুল? মেয়েমানুষকে কিসে ভাল দেখায়, তাহা ত পুরুষদেরই জানিবারই কথা। পুরুষদের নাকি আবার সুন্দর কালো জ্ঞান আছে! ভাল চোখে দেখিলেই সুন্দর, মন্দ চোখে দেখিলেই কালো। কিন্তু আরশীতে একবার ভাল করিয়া না দেখিলে ঠিক জানা যায় না। আনন্দময়ী একখানি ছোট আরশীতে কতবার মুখ দেখিলেন, তাহাতে মন উঠিল না। বৈঠকখানার ঘরে একটি প্রমাণ আরশী ছিল, তাঁহার ইচ্ছা, সেইটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, চুল এলো করিয়া, একবার ঘাড় বাঁকাইয়া, একটু হাসিয়া দেখেন,—তাঁহাকে সুন্দর দেখায় কি না। কিন্তু কর্ত্তা আপিসে না গেলে কেমন করিয়া দেখা হয়?

তাহার পরদিন দুপুর বেলা বৈঠকখানার ঘর খালি পাইয়া, আনন্দময়ী মাথার কাপড় খুলিয়া, চুল এলাইয়া, একটু ঘাড় ফিরাইয়া আরশীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনার রূপ দেখিতে লাগিলেন। পাঠক, তুমি যদি সে সময় তাঁহাকে দেখিতে পাইতে, তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্য সুন্দরী বলিতে। গড়ন পুরন্ত, কিন্তু এখনও খুব পুরা নয়; চোখ কালো, তীব্র, চঞ্চল, চুল পিঠে, বুকে, কাঁধে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; আর সে হাসি হাসি মুখ, কুঞ্চিত-কপোল দেখিয়া, আনন্দময়ীকে সুন্দরী না বলিয়া কে থাকিতে পারিত? তেমন করিয়া আপনাকে আপনি দেখিয়া কে না মোহিত হইত? গালের যেখানটি টোল হইয়াছে, সেখানটি গোলাপের কুঁড়ির মাঝখানের পাপড়ির মত,—আ মরি! মরি! আনন্দময়ী এত দিন তাহা দেখেন নাই কেন? বুড় গোবিন্দপ্রসাদ কি মিথ্যা বলিয়াছিল?

সেই অবধি আনন্দময়ী সদা-সর্ব্বদা, সময়ে অসময়ে অল্প অল্প হাসিতেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মায়ে ঝিয়ে একঠাঁই।

যেমন বউ গিয়াছে, তেমটি আর হইবে না, কিন্তু সেও যে ছেলের বউ, এও ত তাহারই বউ। এই মনে করিয়া কিরণের পিতামহী আনন্দময়ীকে যত্ন-অপেক্ষা করিতেন। পাছে সে বউর কথা ভাবিতে ভাবিতে এ বউর কিছু মাত্র অনাদর হয়, এই ভয়ে আরও বেশী করিয়া যত্ন করিতেন। সে বউ ঘরের গৃহিণী ছিল, একটি ছেলেমানুষ, এখনও নিজের সংসার নিজে চিনিতে পারে নাই। ঠাকুরমা ছেলে, মেয়ে, জামাই, বউ-সকলকে সমান দেখিতেন। একটু কমবেশী হউক, পাঁচটি আঙ্গুলের মত ছোট বড়, কিন্তু পাঁচটি আঙ্গুলের মত সব কয়টিতে ব্যথা সমান। আনন্দময়ী খাওয়ার কাছে দাঁড়ান, আপনার সমুখে গহনা গাঁথিয়ে দেওয়া, এ সব তিনি করিতে লাগিলেন, এবং আনন্দময়ীর অসাক্ষাতে কিরণের ছোট ভাই-ভগিনীগুলিকে ডাকিয়া ভাল করিয়া খাওয়াইতেন। আনন্দময়ী যাহাতে সংসারের কাজকর্ম্মে মন দেন, ঠাকুরমার সে ইচ্ছাও ছিল। এজন্য বউকে এক এক দিন ভাঁড়ার হইতে চাল-ডাল বাহির করিয়া দিতে বলিতেন ও আপনি সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, পাছে ছেলেমানুষ, বেশী চাল বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু আনন্দময়ীর সে দিকে মূলেই ছেলেমানুষী ছিল না। এক দিন ভাঁড়ার বাহির করিয়া পরদিন হইতে প্রত্যহ শাশুড়ীর কাছে চাবি চাহিয়া লইয়া সব ঠিকঠাক করিয়া বাহির করিয়া দিতেন, বরং ঠাকুরমার চেয়ে আধ কুন্‌কে চাল কম ত বেশী নয়। পান সাজিতে, জায়গা করিতে,

জলের গেলাস দিতে, দুধের বাটী চিনিয়া সকলকে দিতে আনন্দময়ী খুব চট্‌পটে, কিন্তু সে সকল কর্ম্মে বড় গা করিতেন না। সে সকলের ভার পূর্ব্বের মত লীলার উপরেই রহিল। গৃহিণীপনা, সংসারের খরচপত্র, এই সকলের দিকেই আনন্দময়ীর বেশী টান। যে বাসনগুলা সরা হয়, তাহার হিসাব রাখা, অধিক বাসন বাহিরে থাকে ত বাসনের সিন্দুকে তুলিয়া ফেলা, ঝিরা কেমন বাজার করে, সেটা দেখা, এই সকল কাজে আনন্দময়ীর বেশী মন। বাড়ীর ঝি চাকরে চোখ টিপাটিপি হইল, পাচিকা ঠাকুরাণীর সহিত আর এক বাড়ীর ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণীর কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত হইয়া গেল যে, এবারে বড় শক্ত বউ হইয়াছে। ইঁহার আমলে চৌধুরী বাড়াতে লোক টেঁকা ভার হইবে। বাড়ীর লোকে এতখানা মনে করিয়াছে, ঠাকুরমা তার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। তিনি মনে করিলেন, এ বউটি বেশ সেয়ানা হইয়াছে। ইহারই মধ্যে সংসারে বেশ মন হইয়াছে।

ঝি-চাকরদের স্বভাব, তাহারা মুনিবের নিন্দা করে; এ কথা সত্য, আমি স্বীকার করি। কিন্তু তাহারা কিছু বাড়াইয়া বলুক, কিছু সত্যও বলে। যাহার যে কোন দোষ থাকে, সেগুলা চাকর-বাকরের চোখে আগে পড়ে। ঠাকুরমার যে বুঝিবার ভুল, তাহা শীঘ্র জানা গেল। এক দিন আনন্দময়ী ভাঁড়ার বাহির করিয়া, যেন অন্যমনস্কভাবে চাবিটা আপনার আচলে বাঁধিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরমাও চাবিটা চাহিতে পারিলেন না, মনে করিলেন, কাল ভাঁড়ার বাহির করিবার সময় বউর মনে পড়িবে, সেই সময় আবার আমায় চাবি আপনি দিবে। পরদিন গেল, আনন্দময়ী ভাঁড়ার বাহির করিলেন, ঠাকুরমার চাল-ডাল তাঁহার হেঁসেলের দিকে রাখিয়া আসিলেন, কিন্তু চাবিটা তাঁহাকে দিলেন না। বৃদ্ধা একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন, কিন্তু সেটা ক্ষণিক মাত্র। পরে মনে করিলেন, তা বেশ ত, ওরই ত সংসার, নিজে ভাঁড়ার রাখিতে চায়, সেত ভাল। কিন্তু কিরণের মা কোন কালে আপনি ভাঁড়ার বাহির করিতেন না, যখন যাহা আবশ্যক হইত, শাশুড়ীর কাছে চাহিয়া লইতেন। ক্রমে আনন্দময়ী সংসারে পুরা গিন্নী হইয়া উঠিলেন। ভাঁড়ার বাহির করিবার সময় শাশুড়ীকে প্রায় কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতেন না। ঝিকে অথবা ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণীকে সঙ্গে ডাকিয়া আনিয়া জিনিসপত্র বাহির করিয়া দিতেন, তাহার পর ভাঁড়ারে চাবি পড়িত। পূর্ব্বে গোবিন্দপ্রসাদ বাবু ছেলেপুলের জলখাবারের টাকা মাসে মাসে মাতার হস্তে দিতেন। আনন্দময়ী সে নিয়ম তুলিয়া দিয়া আপনার হাতে জলখাবারের পয়সা লইলেন ও ঠাকুরমাকে নিত্য হিসাব করিয়া গণিয়া দিতেন। ছয় মাসের মধ্যেই এ সব পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। সংসারে ঠাকুরমার আর কোন হাত নাই, যেমন সকলে খায় দায়, তিনিও সেই রকম দুটি খান দান থাকেন। কেহ কেহ বলিত যে, ঠাকুরমার পক্ষে এ এক প্রকার ভালই হইল। এ বয়সে তাঁহার কাজ কর্ম্ম না করাই ভাল। এ কথা বলিয়া বুঝান কেবল মনকে চোখ-ঠারা মাত্র। সকলেই জানিত যে, ঠাকুরমা পূর্ব্বের মত সংসারের ভার পাইলেই আরও ভাল থাকেন। ঠাকুরমা মুখে ভাল মন্দ কিছুই বলিতেন না; না রাম না গঙ্গা কিছু না। কিন্তু তাঁহার মনে একটু ব্যথা লাগিয়াছিল। ছেলেপুলেগুলা যখন কোন খাবার সামগ্রীর জন্য তাঁহাকে ধরিত, তখন তিনি নিজের যা দু'পয়সা ছিল, তাহাই দিয়া আনাইয়া দিতেন। ভাঁড়ারও তাঁহার হাতে নাই, খাবারের পয়সাও গণা-গাঁথা, সুতরাং বাজে এক পয়সা খরচ হইলেই নিজে হইতে দিতে হইত। অথচ তাঁহার নিজেরও বেশী কিছু ছিল না, কারণ তিনি বুড়ীদের মত কৃপণ ছিলেন না এবং এ পর্য্যন্ত কোন অভাব জানিতে হয় নাই। যখন যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই সেইরূপ হইয়াছে।

লীলার সম্বন্ধে শ্রীমতী বিন্দুবাসিনীর কথা কয়টি আনন্দময়ীর মনে গাঁথা ছিল। সুতরাং লীলার উপর বেশী আক্রোশ। প্রথম প্রথম লীলার হাতে সাজা পান খাইয়া আনন্দময়ী বলিতেন, 'পানে এমনি চুণ, আমার মুখ হেজে যায়।' লীলা যতই চুণ, কম করিয়া দেয়, তিনি ততই বলেন, আমার মুখ চুণে পুড়ে যায়। তার পর, হয় ত এক দিন লীলা তাঁহাকে এক গ্লাস খাবার জল দিয়াছিলেন। আনন্দময়ী অলক্ষ্যে তাহাতে একটু ধুলা ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'এমন নোংরা জলও কি মানুষকে খেতে দেয়?' লীলা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া

জল-গ্লাস হাতে করিয়া বলিত, 'কেন, আমি ত জল দেখে দিয়েচি। জলে এ কি পড়েচে?' তারপর আনন্দের মুখ চাহিয়া চুপ করিত। কিন্তু এ সব আর কাহারও কাছে বড় একটা প্রকাশ পাইত না। আনন্দও কাহাকে দেখাইয়া শুনাইয়া এরূপ করিতেন না। এগুলা অস্তর-টিপনী, অতএব যাহাকে সেগুলা দেওয়া যায়, শুধু তাহারই টের পাওয়া ভাল। দিনকতক পরে এ রকম ঢিল পাটকেল ছুড়িয়া আনন্দময়ীর আর মন উঠিল না, থান ইটের সন্ধান দেখিতে লাগিলেন। তিনি এক দিন কিরণের অষ্টমবর্ষীয়া একটি ছোট ভগিনীকে নির্জ্জনে পাইয়া তাহাকে চুপি চুপি আপনার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে তাহার সহিত একটা পরামর্শ হইল, অবশেষে তাহার হাতে একটা সিকি দিয়া তাহাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। খানিক পরে আনন্দময়ী শ্বশুড়ীর কাছে বসিয়া আছেন, সেখানে জন দুই ঝিও গল্প করিতেছে, এমন সময় কিরণের ভগিনীটি আসিয়া আনন্দময়ীর পিঠে ঠাস করিয়া একটা চড় মারিল। এক জন ঝি তাড়াতাড়ি তাহার হাতখানা ধরিল; ঠাকুরমা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই বউকে মারলি কেন লা?"

মেয়েটির নাম ভুবনমোহিনী। সে হাসিয়া বলিল, "আমায় যে রাঙা দিদি শিখিয়ে দিলে।"

রাঙা দিদি, লীলা।

ঠাকুরমা চীৎকার করিয়া তাহার হাত ধরিলেন, কহিলেন, "কি বল্লি, আবার বল্ ত? এখন থেকেই মিথ্যা কথা! লীলা তোমায় শিখিয়ে দিয়েছে? রসো, গোপালকে ডেকে তোমায় মার খাওয়াই।"

আনন্দময়ী এতক্ষণ কাঁদিতেছিলেন। এই কথায় মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তা ওর দোষ কি ঠাকরুণ। ওকে মার খাওয়ালে কি হবে? ও ছেলেমানুষ, ওকে যা শিখিয়ে দেবে, তাই করবে। আমি যেন এ বাড়ীর শত্রু এসেছি। আমায় তাড়িয়ে দিলেই ত পাপ যায়।" এই কথা বলিতে তাঁহার চক্ষে আরও বেগে জল বহিতে লাগিল।

যতক্ষণ এই সব হইতেছিল, সেই সময়ের মধ্যে লীলা সেইখানে আসিল। সে দেখিয়া শুনিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরমা আসিয়া কহিলেন, "আমি ভুবনের কথা বিশ্বাস করি নি। ওর মিথ্যা কথা।"

আনন্দময়ী সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। ভুবন আর এক দিকে পলাইয়া গেল।

সেই রাত্রে ঠাকুরমা ভুবনকে ডাকিয়া অনেক প্রকারে ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে কিছু শক্ত মেয়ে, সহজে ভুলিল না। ঠাকুরমা বলিলেন, "তোকে চারটে পয়সা দেব, সত্য ক'রে বল, তোকে কে শিখিয়ে দিয়েছিল।"

ভুবন ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, 'আমি বুঝি মিথ্যা বলেচি? আমি তোমার চারটে পয়সা চাইনে।"

ঠাকুরমা উঠিলেন, "আটটা?"

ভুবন ঘাড় নাড়িল।

ঠাকুরমা আবার উঠিলেন, "একটা সিকি?"

ভুবন এবারে ঘাড় নাড়িতে পারিল না, কিন্তু লোভ সংবরণ করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ ঠাকুরমার একটা নূতন বুদ্ধি হইল। বলিলেন, "দেখ, ভুবন, আমার সিন্দুকের ভিতর সেই যে বৃন্দাবনের ছোট পিতলের হাতা দেখেছিস, সত্য কথা বললে সেইটা তোকে দেব।"

ঠাকুরমা বড় ভারি টোপ ফেলিয়াছিলেন। ভুবনের বরাবর সাধ, সেই হাতাটা খেলা-ঘরে লইয়া যায়, কিন্তু ঠাকুরমা কিছুতেই দিতেন না, তীর্থস্থান হইতে আনাইয়াছিলেন বলিয়া ছেলেপুলেকে দিতে চাহিতেন না। ভুবন আর থাকিতে পারিল না। বলিয়া উঠিল, "হাতটা দেবে ঠাকুরমা?"

ঠাকুরমা। সত্য সত্য দেব।

তখন ভুবন চুপি চুপি বলিল, "ঐ যে নূতন মা এসেছে, সেই শিখিয়ে দিয়েছিল।"

পরদিবস হাতাটা ভুবনের খেলাঘরে ঘট্ ঘট্ করিতে লাগিল। আসল কথাটা ঠাকুরমা জানিলেন বটে, কিন্তু ঝি-চাকরে জানিল না, জানিতে চাহিলও না। আনন্দময়ীর ইচ্ছা পূরিল। ইটখানা এগার ইঞ্চি না হউক, নয় ইঞ্চি হইবেই। আর যাহাকে লক্ষ্য করিয়া আনন্দময়ী সে ইট ছুড়িয়াছিলেন, সেই আঘাতে তাহার বুকের পাঁজর ভাঙিয়া গেল।

কেন? লীলার কি পূর্ব্বে আর কোন দুঃখ হয় নাই যে, এইটুকুতে তাহার হৃদয়ে আঘাত লাগিল? সে জন্ম নয়। বিধবা হইবার পর লীলা স্থির করিয়াছিল যে, ইহজন্মে তাহার অদৃষ্টে আর সুখশান্তি হইবে না। এখানে আসিয়া সুখ না হউক, শান্তিলাভের অনেকটা উপায় হইয়াছিল। সে শান্তিস্বপ্ন যে এমন করিয়া ভাঙ্গিবে, লীলা তাহা কখন মনে করে নাই। আর এ যন্ত্রণা,—ইহার চেয়ে শ্বশুরবাড়ীর সে লাঞ্ছনা ছিল ভাল। এক দিন আনন্দময়ীকে একেলা পাইয়া লীলা অতি বিনীতভাবে কহিল, "আমি থাকিলে যদি তোমার বিরক্তি বোধ হয়, তা' হইলে পরিষ্কার ক'রে কেন বল না, আমি আর কোথাও যাই।" আনন্দময়ী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি? তুমি আমার কি কোরেচ যে, আমি তোমার শত্রু হইলাম? তোমরা আমায় দেখিতে পার না, তা আমি ত এ বাটীতে সাধ কোরে আসিনি। আমায় নিয়ে এসেচে, তাই এসেচি।" এই বলিয়া তিনি চোখে আঁচল রগড়াতে রগড়াতে চলিয়া গেলেন।

বাস্তবিক তাঁহার একটুও ইচ্ছা ছিল না যে, লীলা আর কোথাও যায়। তাহা হইলে ত সে হাতছাড়া হয়। লীলার মুখখানি বড় সুন্দর, আনন্দময়ীর অত সুন্দর মুখ ভাল লাগে নাই। তার উপর বিন্দুবাসিনীর সেই কয়টি কথা। অত সুন্দর মুখ! সে মুখ আনন্দময়ীর হইল না কেন? বিধবা লীলা সে মুখ কি করিবে? আনন্দময়ী মনে মনে বলিতেন, পোড়ারমুখীর মুখ কি কখন পুড়িবে না?

এই রকম একটা কথা লীলাও এক দিন কিরণের সাক্ষাতে বলিয়াছিল, 'এ পোড়া মুখ পুড়্লে বাঁচি।' সে কথাটা বুঝি দেবতার মনে ছিল। লীলা কাহাকেও কিছু বলিল না, আর কোথাও যাইতে চাহিল না, সে সঙ্কল্প করিয়াছিল, সে বাড়ী হইতে তাহাকে কেহ তাড়াইয়া না দিলে সে স্বেচ্ছামতে কখন যাইবে না। লীলা রহিল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাঁদিত। দুঃখের ভারে তাহার জীবন যেন অবসন্ন হইয়া পড়িল। চোখের কোল ভাঙ্গিয়া গেল। রগে, গালে নীল নীল সরু সরু শিরা উঠিল, গালে রং পাঙ্গাশবর্ণ হইতে লাগিল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দময়ীর আহ্লাদ হইল। সময় সময় লীলার বুকে কেমন একটা ব্যথা ধরিত, কিন্তু সে কথা কেহ জানিল না। ঠাকুরমা লীলাকে কত জিজ্ঞাসা করিতেন, কতবার ডাক্তার-কবিরাজ ডাকিতে চাহিতেন, লীলা কেবল হাসিয়া উড়াইয়া দিত, বলিত,—'আমার ত কোন অসুখ হয় নি, একটু কাহিল হয়েচি, সে আবার দু'দিন পরে সেরে যাবে এখন।'

আনন্দময়ী আট মাস শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। বাপের বাড়ীর, সত্য বলিলে কাকার বাড়ীর ঝি মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে আসে। বাপের বাড়ী লইয়া যাইবার বড় একটা কথা উঠে নাই। এক দিন বৈকালে বাপের বাড়ীর ঝি আনন্দময়ীকে চুপি চুপি গোটাকত কি কথা বলিয়া গেল। সে রাত্রে আনন্দময়ী শয়নঘরে কিছু আগে হইতে গিয়া শুইয়া রহিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু যথাসময়ে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, আনন্দময়ী উপুড় হইয়া মুখ লুকাইয়া শুইয়া আছেন। কর্ত্তা তাঁহার নিকটে গিয়া, গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘুমায়েচ না কি?"

কোন উত্তর নাই। কিন্তু একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, আর নাক মোছার যেন একটা শব্দ হইল।

এবারে কর্ত্তা গা নাড়া দিলেন, "কি হয়েছে? স্বপ্ন দেখছ না কি?"

কোন কথা নাই। এবারে আর এক রকম একটা শব্দ হইল। ফোঁপানি? কান্না? তাই ত!

গোবিন্দপ্রসাদ বাবু আকুল হইলেন। তাড়াতাড়ি স্ত্রীর মুখ তুলিয়া ধরিলেন।

আনন্দময়ী সেখানে কেন শুইয়াছিলেন, তা আমি জানি না, কিন্তু সেটা তাঁর শুইবার জায়গা নয়। বোধ হয়, দুঃখে অস্থির হইয়া যেখানটা পাইয়াছিলেন, সেইখানেই শয়ন করিয়াছিলেন। গোবিন্দ বাবু মুখ তুলিয়া ধরিতে সেজের আলো ঠিক আনন্দময়ীর মুখের উপর পড়িল। সে মুখখানি চক্ষের জলে ভাসিয়া গিয়াছে।

সে চক্ষে জল? গোবিন্দপ্রসাদ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

কোন কথা নাই, কেবল আনন্দময়ী চোখ

আস্তে আস্তে উঠিয়া গোবিন্দপ্রসাদ বাবুর মুখে পড়িল। সে দৃষ্টিতে তিনি আরও আকুল হইলেন। সরোষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেহ কিছু বলিয়াছে?"

এবারে উত্তর আসিল। "কেউ না।"

"তবে কি হয়েছে?"

"আমার মা'র জন্য মন কেমন করচে।"

তখন বাবু হাঁপ ছাড়েন। "আঃ, এই জন্য এত?"

আনন্দময়ীর চক্ষে ঢেউ উঠিল। "এই জন্য? তবে বুঝি মা আমার কেউ নয়?"

"না, না, তা কেন? আমি কি সে কথা বলচি? মা'র জন্য মন কেমন করচে, সে জন্য কান্না কেন? তিনি ত দূরদেশে নাই।"

আনন্দময়ী চোখ মুছিয়া ফেলিলেন, কিছু বেগের সহিত বলিলেন, "তাই তাঁকে আট মাস দেখিনি।"

কর্ত্তা কিছু লজ্জিত হইলেন; কহিলেন, "তা আমি ত তোমার যেতে বারণ করি নি। ইচ্ছা হয়, মাঝে মাঝে দু' এক দিন গিয়ে থাক্‌লেই হয়।"

আনন্দময়ী একেবারে উঠিয়া বসিলেন। "কি বল্‌লে? দু' দিন? তা হ'লে কাকা কি মনে করবেন? আমি কাল গিয়ে দু' মাস থাকব। দু' মাস কেন, তিন মাস থাকব।"

গোবিন্দপ্রসাদ বাবু স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া কিছু কাতরভাবে কহিলেন, "তিন মাস? তাই ত! আর আমি একলাটি কি কোরে থাকব?"

আনন্দময়ী স্বামীর কাছে সরিয়া গিয়া, তাঁহার আমার হাত ধরিয়া, অত্যন্ত কোমল স্বরে কহিলেন, "দেখ, আর একটা উপায় আছে।"

কর্ত্তা গলিয়া গিয়া কহিলেন, "কি?"

আনন্দময়ী অতি কোমল কটাক্ষ হানিয়া কহিলেন, "যদি মাকে মাঝে মাঝে এখানে আনা যায়, তা হ'লে আর আমায় যেতে হয় না।"

কর্ত্তা আহ্লাদে বলিলেন, "সেই ত বেশ। তিনি মাঝে মাঝে এলেই ত হয়।"

গৃহিণী বলিলেন, "এলে ত! মা যে আসেন, এমন ত আমার বোধ হয় না।"

"তাতে দোষ কি? তিনি ত এখানে এসে বরাবর থাকবেন না।"

পরদিবস আনন্দময়ী অনেক করিয়া মাকে বলিয়া পাঠাইলেন। মা আসিলেন, কিন্তু সেই দিনই ফিরিয়া যাইতে চান। আনন্দময়ী কান্না জুড়িলেন, হয় মা থাকুন, না হয় তিনি মা'র সঙ্গে যাইবেন। কাজেই মা থাকিলেন। পরদিবসও সেইরূপ গেল। তাহার পর দিবস কান্নাকাটি কিছু হইল না, আনন্দময়ীর মাও যাবার কথা তুলিলেন না।

ঝি-চাকরেরা প্রথম দিনই বলিয়াছিল যে, বউ ঠাকুরুণের মা এখানে বেড়াতে আসেন নি, থাকবার জন্যই আসিয়াছেন। কথাটা তাহারা আপনা আপনির মধ্যে বলিয়াছিল, কিন্তু ঠাকুরমারও সেইরূপ সন্দেহ হইয়াছিল।

এক দিন গোবিন্দপ্রসাদ বাবু আনন্দময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মা কি এখানে কিছু দিন থাকবেন?"

আনন্দময়ী কহিলেন, "থাকতে দেই? তা না হয় কাল যাবেন।"

"তুমি সব কথা উল্টা বুঝ। আমি কথার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। তিনি থাকেন, সে ত আমাদের সৌভাগ্যের কথা।"

আনন্দময়ী নরম হইয়া বলিলেন, "তিনি থাক্‌লে আমি ভাল থাকি, তাই দু'দিন রয়েছেন।"

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

প্রফুল্ল নিমন্ত্রণে।

কিরণ প্রফুল্লের মাথা চাপ্‌ড়াইয়া তারাকে ঘুম পাড়াইতেছিল ও অতি মৃদু স্বরে সেই অতি প্রাচীন ঘুম পাড়াইবার গান গাহিতেছিল :—

'খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ুল বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েচে খাজনা দিব কিসে।"

ঘুম পাড়াইবার যে একটি নূতন গান বাঁধিব, আমার সেটুকুও অধিকার নাই, কারণ, আমাকে সব সত্য কথা বলিতে হইতেছে। মান্ধাতার আমলের এ

রকম একটা পচা পুরোন গানকে বোধ হয় কেতাবের মধ্যে স্থান দেওয়াই উচিত নয়, কিন্তু এই গানে যা মনে পড়ে, তা আর কিছুতে না। সেই পদ্মফুলের মত মা'র ঘুমমাখান হাতখানি, আর সেই স্বর্গ হইতে এ জগতে প্রবাহিত গীতের ন্যায় অস্ফুট, অমৃতময় কণ্ঠ, আর সেই অর্দ্ধ-মুদ্রিত-চক্ষু শিশুর মুখ, আর কিছুতেই মনে পড়ে না। মাথার উপরে সেই সুকোমল হাতখানি, আর মুখের উপর জননীর সেই নত চক্ষু, আর নিদ্রা-সমুদ্রের তরঙ্গতুল্য সেই মধুর গান মনে পড়িল, এখনও ঘুমে চোখ ভরিয়া আসে। এ চোখে কি আর তেমন ঘুম আসিবে?

দুপুরবেলা প্রফুল্লকে এ রকম করিয়া ঘুম পাড়াইবার একটা কারণ ছিল। মনোমোহিনী কিরণকে অনেকবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিরণ মাতৃবিয়োগের পর কোথাও যাইতে স্বীকৃত হইত না। অনেক দিনের পর মনোমোহিনী নিজের বাপের বাড়ী গিয়া কিরণকে ভারি পীড়াপীড়ি করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার বরাবর ইচ্ছা ছিল, তিনি একবার কিরণকে তাঁহার বাপের বাড়ী দেখান। কিরণ এবারে আর এড়াইতে পারিল না। এবারে না গেলে ভাল দেখায় না। এই জন্য কিরণ প্রফুল্লকে ঘুম পাড়াইতেছিল। তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া নিমন্ত্রণে যাইবার উদ্যোগ করিবে। প্রফুল্ল ঘুমাইলে কিরণ কাপড়-চোপড় বাহির ক'রল, হাতে মুখে সাবান মাখিল। এত বড় ধনীর বাড়ী একটু সাজিয়া গুজিয়া না গেলে তাহারা মনে করিবে কি! একখানা যে ভাল বারাণসী কাপড় ছিল, সেই-খানা বাহির করিয়া রাখিল, আর গহনাপত্রও গোচগাচ করিয়া রাখিল। এই সব করিতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক গেল। তার পর প্রফুল্লের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া, তাহার অঙ্গ সংস্কার করিতে লাগিল। গামছা দেখিলেই প্রফুল্ল রাস্তায় পলায়, সুতরাং কিছু কান্নাকাটি করিল। গা মুছাইয়া দিয়া, তাহাকে একটা খুব রংচঙে পোষাক পরাইয়া দিয়া, কিরণ প্রফুল্লের এক জোড়া চক্‌চকে, রাঙ্গা রেশমের ফিতা দেওয়া জুতা বাহির করিল। জুতা জোড়া নূতন। প্রফুল্ল সেটাকে পায় না দিয়া বুকে করিতে চায়। অনেকক্ষণ ঝোলাঝুলির পর কিরণ তাহাকে জুতা পরাইয়া দিলে প্রফুল্ল তাহাতেই নিবিষ্ট চিত্ত হইল। এমন সময় গড় গড় করিয়া একখানা গাড়ী আসিয়া দরজা-গোড়ায় থামিল। একটু পরেই বড়মানুষের বাড়ীর ঝি ফর্সা কাপড় পরিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিল। কিরণকে দেখিয়া কহিল, "এখনও হয় নি! সে কি গো? এখনও আমাকে কত বাড়ী যেতে হবে।"

কিরণ একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "একটু ব'স, ঝি, আমার এই হ'ল ব'লে। খোকার হয়েচে।"

ঝি পাথরের মত ভারি হইয়া কহিল, "আমাদের কি বস্‌বার সময় আছে? বড়মানুষের বাড়ী চাকরী করা সোজা নয়।"

কিরণ কহিল, "আমি এই কাপড় প'রে আস্‌চি, তুমি এইখানে একটু ব'স।"

ঝি মুকখানা বাঁকাইয়া বলিল, "আমি আর বস্‌ব না যাই, গাড়ী দাঁড়াতে বলি। তুমি একটু শীগ্‌গির নাও।"

কিরণ কাপড় পরিতে গেল। ঝি মাগী একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "ওগো, গাড়ী দাঁড়ায় না, নতুন ঘোড়া। তোমার হয়েচে?"

তখন কিরণ একটু বিরক্ত হইয়া, ঘরের দোর হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "গাড়ী না দাঁড়ায় ত আর এক জায়গায় যাও। আমাকে এর পরে নিতে এস।"

সাপটা যেন অমনি কেঁচো হইয়া গেল। মনোমোহিনী ঝিকে বলিয়া দিয়াছিলেন, যেন কিরণকে সকলের আগে আনা হয়। কিরণের কথায় ঝি নরম হইয়া কহিল, "ঘোড়াটা নতুন, সহিস বলছিল যে, সেটা অনেকক্ষণ দাঁড়ালে ক্ষেপে, তাই বলছিলাম। তা নইলে আমাদের দাঁড়াতে কি দিদি ঠাকুরুণ? আমরা হলাম তোমাদের দাসী।"

এই বলিয়া সে বসিল। মাগী এতক্ষণ কিরণকে একবারও 'দিদি ঠাকুরুণ' বলে নাই।

প্রফুল্ল আগে হইতে গিয়া গাড়ীর ভিতরে বসিয়াছিল ও মাঝে মাঝে চেঁচাইতেছিল, "হাট্ ঘোড়া হাট! হাইও!" কিরণ আসিয়া যখন গাড়ীতে উঠিল, তখন সে কোনমতেই দরজা বন্ধ

করিতে দিবে না, অবশেষে কিরণ দরজা একটু-খানি খুলিয়া দিল, প্রফুল্ল সেইখান দিয়া মুখ বাড়াইয়া রহিল। পথে একটা দোকানে অনেক রকম খেলনা বিক্রী হইতেছিল, তাহার মধ্যে ঠিক সম্মুখে একটা মাটীর গাড়ী ছিল। প্রফুল্ল সেই-টাকে দেখিয়া একেবারে কাঁদিয়া অস্থির হইল,—"আমি ওই গাড়ী নেব।" কিরণ কি করে, ঝিকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া সেই গাড়ীটা কিনিয়া আনাইল। প্রফুল্ল সেটাকে পাইয়া মহা আহ্লাদে গাড়ীর ভিতরে গড়াইতে আরম্ভ করিল

গাড়ী সদর দরজায় থামিল। দরজার সম্মুখে দরওয়ানেরা দাঁড়াইয়া আছে। দরজার ভিতর লোক জন গিস্ গিস্ করিতেছে। কিরণ এক গলা ঘোমটা টানিয়া গাড়ী হইতে নামিল। কিরণের ঝি প্রফুল্লকে কোলে করিয়া পিছনে চলিল, বড় বাড়ীর ঝি সকলের আগে ছিল। কিরণকে একেবারে দোতালায় লইয়া গেল। সিঁড়ির উপর মনোমোহিনী দাঁড়াইয়াছিলেন; কিরণকে দেখিয়া, একটু হাসিয়া তাহার হাত ধরিলেন। কিরণ একবার একটুখানি ঈষৎ হাসিয়া আপনার পায়ের নখ দেখিতে লাগিল; তাহার চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। মনোমোহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছ, ভাই?"

কিরণ মুখ তুলিয়া বলিল, "ভাল আছি।"

মনোমোহিনী সে মুখ দেখিলেন। সে গোলগোল হাসি-হাসি মুখখানি আর তত গোলগোল নাই। সে হাসি আর তত হাল্কা নাই। মনো-মোহিনীর হাজার কেন দোষ থাকুক না, স্ত্রীলোক ত বটে। তিনি আবার কিরণের হাত ধরিলেন. বলি-লেন, "ছি! শোক-দুঃখ কি চিরকাল মনে ক'রে রাখ্‌তে হয়?"

এবার কিরণের চক্ষু জলে পুরিয়া গেল। অতি মৃদু, জড়িত স্বরে বলিল, "এমন শোক কি সহজে ভোলা যায়?"

মনোমোহিনী আর কিছু না বলিয়া, কিরণের হাত ধরিয়া তাহাকে ঘর-দোর দেখাইতে লাগিলেন। বৈঠকখানায় একটা মস্ত ঘড়ী, সেটার উপর একটা ধাতুনির্ম্মিত মানুষের আকৃতি আছে। সেটা প্রতি মিনিটে মুখ বন্ধ করে ও অপর মিনিটে খোলে। কিরণ সেইটার কাছে দাঁড়াইয়া খানিকক্ষণ দেখিতে লাগিল। পাশে দাঁড়াইয়া মনোমোহিনী বলিতেছিলেন, "এ ঘড়ীটা যেমন চমৎকার দেখ্‌তে, তেমনি এটার দামও খুব বেশী। বাবা এটাকে দেড় হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলেন—ওদিক-কার দেওয়ালে ওই যে ছবিখানা দেখ্‌চ, ওই যে বিবি একটা গোলাপফুল হাতে করে রয়েচে, ওটার দাম পঞ্চাশ টাকা, আর এই তোমার সুমুখে যেখানা, একটি ছোট মেয়ে পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখ্‌চে, সেটার দাম একশ টাকা এই রকম কিছু দেখা-শুনার পর আহারাদি হইল।

প্রফুল্ল কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন হাতে করিয়া ঝির সঙ্গে বাহিরে ছিল। বাহিরে উঠানে সেই মাটীর গাড়ীটা লইয়া টানাটানি করিতেছিল। ঝি-জাতের যে অভ্যাস, এ ঝিরও সে অভ্যাস। সে আর এক জন ঝির সঙ্গে গল্প করিতে করিতে একটু অন্য দিকে গেল। প্রফুল্ল একেলা খেলা করিতে লাগিল।

একটু পরে মনোমোহিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ চন্দ্রনাথ এবং তাঁহার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী সেই-খানে আসিয়া উপস্থিত। চন্দ্রনাথ এখন ছয় বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার ভগিনীর বয়স চার বছর, নাম কাদম্বিনী। প্রফুল্ল তাহাদিগকে দেখিয়া গাড়ী টানা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়া-ইল। চন্দ্রনাথ ও তাহার ভগিনী প্রফুল্লের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। দুইজনের নজর সেই গাড়ী-খানার উপর। চন্দ্রনাথ তখনি বলিল, "তুই কে রে?"

প্রফুল্ল চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোনখানে ঝির দেখা নাই। লোকজন অনেক দূরে দাঁড়া-ইয়া আছে, কিন্তু তাহাদের এ দিকে লক্ষ্য নাই, প্রফুল্লও কাহাকেও চেনে না। সে অবশেষে বলিল, "আমি পফুল্ল।"

চন্দ্রনাথ আর একটু কাছে গিয়া বলিল, "পফুল্ল কি রে! তুই গালফুলো।"

প্রফুল্লের চক্ষু উঠানময় ঘুরিতেছিল। ঝি কোথায়? প্রফুল্ল বলিল, "আমি খোকা।"

চন্দ্রনাথ। কার খোকা?

প্রফুল্ল। মা'র খোকা।

এমন সময় কাদম্বিনী গিয়া গাড়ীখানা ছুঁইল, বলিল, "আমি এইটা নেব।"

চন্দ্রনাথ মহা তম্বী করিয়া প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ গাড়ী তুই কোথায় পেয়েছিস্?"

প্রফুল্ল অত্যন্ত বিনীতভাবে কহিল, "মা কিনে দিয়েচে।"

চন্দ্রনাথ। মা কিনে দিয়েচে বই কি! এ আমার গাড়ী, তুই চুরী কোরেছিস্!

এই বলিয়া চন্দ্রনাথ গাড়ী ধরিয়া টানিতে লাগিল। কাদম্বিনী তৎক্ষণাৎ ভাইয়ের সঙ্গে যোগ দিল। প্রফুল্ল কাঁদিল না, কেবল বলিল, "আমি বাবাকে ব'লে দেব কিন্তু!

চন্দ্রনাথ বলিল, "আমি তোর বাবাকে মারব।" এই বলিয়া গাড়ী লইয়া প্রস্থান করিল।

এমন সময় ঝি ফিরিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া প্রফুল্লের ঠোঁট ফুলিল, তার পর সে আস্তে আস্তে পা ছড়াইয়া মাটীতে চিৎপাত হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "আমার গাড়ী।"

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নূতন বেহান।

আনন্দময়ীর মা যদি ছয় মাস আগে মেয়ের শ্বশুরবাড়ী আসিতেন ত ঠাকুরমা তাঁহাকে মাটীর মানুষ স্থির করিতেন, এবং সেই কারণে তাঁহার বিস্তর সুখ্যাতিও করিতেন। কিন্তু ছয় মাস আগে ঠাকুরমার মন যেমন ছিল, এখন তার তেমন নাই। আনন্দময়ীর মাকে যে ভাল চক্ষে দেখিত, সেই বলিত, মাটীর মানুষ, যে মন্দ চক্ষে দেখিত, সে বলিত; যেন ভিজে বেরালটি। মানুষটি দেখিতে শুনিতে বেশ, খাট খাট, বয়সও এমন বেশী নয়, গায় মাথায় সদা-সর্ব্বদা কাপড়-চোপড় থাকে। মানুষটি খুব নরম, কথাবার্ত্তা খুব ধীরে কওয়া অভ্যাস, মুখ বড় মিষ্ট। তিনি কন্যার নিকটে বড় একটা থাকিতেন না। প্রায়ই ঠাকুরমার কাছে বসিয়া থাকিতেন, এবং বেহান বয়সে বড় বলিয়া, তাঁহার সেবা করিতে চাহিতেন, কিন্তু ঠাকুরমা কুটুম্বের সমাদর জানিতেন—হয় ত নূতন বেহানের প্রতি মনে মনে কিছু সন্দেহও ছিল। এ সন্দেহের যে কারণ ছিল, তাহা শীঘ্রই জানা গেল।

মায়ে ঝিয়ে কখন্ কি পরামর্শ হইত, কখন্ কি কথাবার্ত্তা হইত, তাহা আর কেহ জানিত না। কিন্তু সে সকল পরামর্শের ফল সকলেই দেখিতে পাইল। আনন্দময়ী খরচপত্রের আরও আঁটা-আঁটি করিতে লাগিলেন, এমন কি, ছেলেপুলের জলখাবারের পয়সা কমাইবারও কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দ্বাদশীর দিন ঠাকুরমার আর লীলার পারণার জন্য দু' আনা করিয়া বরাদ্দ ছিল, দশমীর দিনও তাহাই ছিল। আনন্দময়ীর মা আসিয়া অবধি সে পয়সা আনন্দ মা'র হাতে দিতেন, তিনি সেই পয়সাটা আস্তে আস্তে ঠাকুরমার হাতে দিতেন। তিন জনের ছয় আনা পয়সা। একাদশীর রাত্রে দ্বাদশীর পারণার পয়সা দেওয়া নিয়ম ছিল। এক দিন একাদশীর রাত্রে আনন্দের মা ঠাকুরমার হাতে তিন আনা পয়সা আনিয়া দিলেন।

হাতে পয়সা কম ঠেকিল বলিয়া, ঠাকুরমা পয়সা গণিয়া দেখিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিসের পয়সা?"

আনন্দের মা একটু অপ্রতিভের ন্যায় বলিলেন, "দ্বাদশীর পয়সা।"

"তিন আনা কেন?"

"আনন্দ দিলে।"

ঠাকুরমা বেহানের মুখ চাহিয়া কহিলেন, "সে কি? দ্বাদশীর দু' আনা—তিনি কি জানেন না?"

বেহান বলিলেন, "জানে বই কি। তবে আমার আনন্দ এই বল্লে যে, দ্বাদশীর দু' আনায় দরকার কি, এক আনা হল্লেই হবে। তা, আমাদের শ্বশুরবাড়ীও বিধবাদের দশমী একাদশীতে চার পয়সা কোরে বরাদ্দ।"

তখন ঠাকুরমার রাগ হইল। বলিলেন, "তোমার শ্বশুরবাড়ী যা হয়, তাই কি সকল বাড়ী হবে। আমার গোবিন্দ বেঁচে থাক, আমাদের বাড়ী যেন বিধবাদের কোন কষ্ট না হয়!"

বেহান একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "আনন্দ বল্লে যে জামাই নিজে তাকে এ কথা বলেছেন।"

ঠাকুরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া পয়সা ক' আনা

বেহানের হাতে দিলেন, কিছু রুক্ষস্বরে বলিলেন, "বটে! আচ্ছা, আমি গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নিজের জন্য ঠাকুরমা একবারও ভাবেন নাই, কেবল লীলার পারণার পয়সা কাটা গেল মনে করিয়া বড় ব্যথিত হইলেন। একটু পরেই গোবিন্দপ্রসাদ আহার করিতে আসিলেন। ঠাকুরমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোবিন্দ, তুমি কি একাদশীর আটটা পয়সা আর দিতে পার না, তাই চারটা কোরে কেটে নিতে চেয়েছ?"

গোবিন্দপ্রসাদ আকাশ হইতে পড়িলেন। সাশ্চর্য্যে কহিলেন, "সে কি কথা।"

ঠাকুরমা কহিলেন, "কেন, এই যে বেহান বল্লেন, তুমি চার পয়সা কোরে বরাদ্দ কোরেচ। আমায় যদি তুমি দু' পয়সা কোরে দাও, তা হ'লেও আমি তাতে কিছু মনে কবব না, কিন্তু পরের মেয়ে লীলা বাড়ীতে আছে, সেটা ত মনে রাখা উচিত। আমি কোন্ মুখে লীলার সুমুখে দ্বাদশীর দিন সকালবেলা চারটি পয়সা খাবার দেব?"

একটু দূরে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া লীলা শুনিতেছিল। সে আগে কিছু শুনে নাই, ঠাকুরমাতে এবং আনন্দের মাতাতে কি কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহা কিছু জানিত না। ঠাকুরমা ছেলের সঙ্গে কিছু রাগিয়া কথা কহিতেছেন শুনিয়া, লীলা ঘরের বাহিরে আসিয়া অন্ধকারে দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া আপনার নাম শুনিতে পাইল। শুনিয়া মনে মনে লজ্জায় মরিয়া গেল। ইচ্ছা হইল, অন্ধকারে কোথাও ডুব দিয়া থাকে, আর যেন লোকে তাহার মুখ না দেখিতে পায়।

গোবিন্দপ্রসাদ কহিলেন, "মা, তুমি সে জন্য আর ভেব না, আমি নিজে তোমার জলখাবারের জন্য একেবারে মাসে মাসে কিছু দেব।"

তিনি আহার করিয়া বাহিরে গেলে লীলা ঠাকুরমাকে ডাকিয়া আপনার ঘরে লইয়া গেল; ঠাকুরমা দেখিলেন, লীলা কাঁদিতেছে। রোদনের আর কোন বাড়াবাড়ি নাই, কেবল পাতলা ঠোঁট দু'খানি কাঁপিতেছে, আর দু'টি চক্ষে ধীরে জল বহিতেছে। লীলা আস্তে আস্তে বলিল, "ঠাকুরমা, তুমি আমার জন্য কিছু বল্লে আমার বড় কষ্ট হয়। আমি ত কখন বড়মানুষ ছিলুম না, আমি বড়মানুষের মেয়ে নই, বড়মানুষের বাড়ী বিয়ে হয় নি। যা পাব, তাই খাব। তুমি আমার জন্য কখন কিছু বলো না, আমার মাথা খাও।"

ঠাকুরমা বড় বিপদে পড়িলেন, বলিলেন, "তাতে কি কাঁদতে আছে? ছি! চোখের জল ফেল না, অমঙ্গল হবে। আমি কি তোমার নাম ইচ্ছা কোরে কোরেছিলুম? রাগ হয়েছিল, তাই কথায় কথায় বলেছিলুম। আর কেঁদ না, এ বাড়ীতে আমি থাকতে যেন তোমাকে না কখন কাঁদতে হয়।"

লীলা চক্ষু মুছিয়া চুপ করিল। অমঙ্গলের নাম শুনিলেই তাহার প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিত। সে ত যেখানে গিয়াছে, সেইখানেই একটা না একটা অমঙ্গল ঘটিয়াছে। এ বাড়ীতে সে আসিয়া কি সর্ব্বনাশ না হইয়া গিয়াছে!

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। প্রতিদিন একটা না একটা কিছু মন-কসাকসির কারণ উপস্থিত হইত। বৃদ্ধবয়সে ঠাকুরমার অদৃষ্টে অনেক দুঃখ ছিল। বুঝি পূর্ব্বজন্মের ভোগ বাকি ছিল।

লীলা দিন দিন অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িল, কিন্তু অসুখ হইয়াছে, এ কথা কেহ বলিলে কখন স্বীকার করিত না। চোখের কোলের নীল রেখা কালো হইয়া উঠিল, গালে, কপালে শিরগুলি আরও উঁচু হইয়া উঠিল। বুকের সে ব্যথা আরও ঘন ঘন হইতে লাগিল এবং ব্যথার সময় হাঁপটা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে লাগিল। কিন্তু এ সব আর কেহ জানিল না। ব্যথাটার আগে লীলার বুকের ভিতর একটু ধড়ফড় করিত, সেই সময় সে আপনার ঘরে গিয়া দোর দিত। তার পর বিছানায় মুখ গুঁজিয়া, বালিসে বুক চাপিয়া, বেদনা ও যন্ত্রণা সহ্য করিত। আর সেই সময় তাহার মনে একটা আশা হইত, মনে হইত, তাহার দুঃখযন্ত্রণাময় জীবন শীঘ্র ফুরাইবে।

আনন্দ ও তাঁহার মা বিশেষ কোন অসুবিধা অনুভব করিতেন না। তাঁহাদের কেবল একটা বড় দুঃখের কারণ ছিল। আনন্দের এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি হইবার সম্ভাবনা হয় নাই।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

-*—

দুর্গোৎসব

এ বৎসর চৌধুরীবাড়ীতে বড় জাঁক হইল। কিরণের মা পূজার সময় মরেন, সেই জন্য সে বৎসর আর পূজা হয় নাই। গোবিন্দপ্রসাদ বাবুর ইচ্ছা, এ বৎসরও পূজা না হয়; কিন্তু নূতন গৃহিণীর আবদার,—এ বৎসব পূজা আবও ধুমধাম করিয়া হইবে। আনন্দের মা মেয়ের ছেলে হয় না ভাবিয়া অস্থির, মনে করিয়াছিলেন, এই বৎসর হইতে কার্ত্তিক-পূজা আরম্ভ করিবেন, কিন্তু আগে দুর্গোৎসবটা হওয়া উচিত। পূজার সময় কিরণকে আনিতে গেল। কিরণ আসিবে না, কাঁদিতে লাগিল। গাড়ী, পাল্কী, ঝি, দরওয়ান সব ফিরাইয়া দিল। অবশেষে গোবিন্দপ্রসাদ বাবু নিজে গিয়া, অনেক করিয়া বুঝাইয়া, কিরণকে লইয়া আসিলেন।

কিরণ লীলাকে সেই যাবার সময় দেখিয়া গিয়াছিল। সেই তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া গিয়াছিল, আর তাহাকে দেখে নাই! সেই অবধি কিরণ আর বাপের বাড়ী আসে নাই। ঠাকুরমা কয়বার আনিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কিরণ আসে নাই। কিরণকে যখন কোন ঝি দেখিতে যাইত, তখনি কিরণ জিজ্ঞাসা করিত, "দিদি কেমন আছে?" ঝি বলিত, "ভাল আছে।" সেটা কেবল লীলার গুণে। কিরণের কাছে যখন কোন ঝি যাইত, তখনি তাহাকে লীলা শিখাইয়া দিত, "আমার কথা জিজ্ঞাসা করলে ব'লো, ভাল আছে।" ঝিরাও তাই বলিত। কিরণ নিশ্চিন্ত থাকিত। এখন কিরণ আসিয়া লীলার সেই শীর্ণ মূর্ত্তি দেখিল। জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, তোমার ব্যাবাম হয়েছে, কই, আমায় ত ঝি বলে নি।"

লীলা প্রফুল্লের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "আমার ত কোন অসুখ করে নি।"

লীলা এখন আর প্রফুল্লকে কোলে তুলিতে পারে না। প্রফুল্ল লীলার গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল।

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "অসুখ করে নি ত এমন কেন?"

লীলা কহিল, "আমি ত বরাবরই এমনি আছি।"

কিরণ। এমনি রোগ? আমি কি তোমায় কখন দেখি নি? এখন তোমায় দেখলে ভয় করে।

লীলা একটু হাসিল, কহিল, "আমি ত আর বাঘ-ভালুক নই যে, দেখে ভয় হবে। আমায় কত দিন দেখনি, তাই রোগা রোগা দেখাচ্চে।"

এমন সময় প্রফুল্ল লীলার হাত ছাড়াইয়া কিরণের হাঁটু ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, ও কে?

কিরণ বলিল, "ও মাসীমা।"

প্রফুল্ল বলিল, "মাসীমা খাবা দেয়?"

কিরণ হাসিয়া কহিল, "খুব দেয়, মা'র চেয়েও বেশী খাবার দেয়।"

প্রফুল্ল বিনা বাক্যব্যয়ে মাসীমার কাছে গিয়া, হাত পাতিয়া বলিল, "মাসীমা, খাবা।" কাজেই লীলা ও কিরণের কথা স্থগিত হইল।

প্রফুল্লকে খাবার দিয়া লীলা কিরণকে আপনার ঘরে লইয়া গেল। সেখানে দুই জন গলা ধরাধরি করিয়া কাঁদিতে বসিল। বাহিরে দু'জনের মধ্যে এক জনেও কাঁদে নাই,—আনন্দময়ীর মা একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিরণ তাঁহাকে ও বিমাতাকে প্রণাম করিয়া সরিয়া আসিয়াছিল। যে দু'একটা কথা না কহিলে ভাল দেখায় না, কেবল তাহাই কহিয়াছিল। তাহাও লোকলজ্জার ভয়ে। যাহা দেখিয়া বুক ফাটিয়া যায়, যাহা দেখিয়া মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে, তাহাই দেখিয়া কি আবার হাসিমুখে কথা কহা যায়?

লীলা ও কিরণ দুই জনে মিলিয়া অনেকক্ষণ কাঁদিল। কেহ কোন কথা কহিল না, কেবল কাঁদিল। প্রফুল্ল বাহিরে ছিল। বেগ একটু শমিত হইলে, কিরণ লীলাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিল, জানিতে চাহিল, তাহার কি অসুখ। কিন্তু লীলা কিছুতেই বলিল না। তখন কিরণ তাহাকে আর কিছু না বলিয়া আস্তে আস্তে ঠাকুরমার ঘরে গেল। ঠাকুরমা সন্ধ্যা করিতেছিলেন। কিরণ দরজাগোড়ায় দাঁড়াইল। ঠাকুরমা তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

সন্ধ্যা সমাপন হইলে, কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরমা, সন্ধ্যা হয়েচে?"

"হয়েছে ভাই। প্রফুল্ল কোথায় ?"

কিরণ কহিল, "সে ঝির কাছে আছে। ঠাকুর-মা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।"

ঠাকুরমা কিরণকে কাছে ডাকিলেন, তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা কিরণ ?"

কিরণ কহিল, "দিদির কি অসুখ হয়েছে, বুঝতে পারছি নে। আমায় ত কিছু বলে না। কিন্তু তাকে দেখলে ভয় করে।"

ঠাকুরমার চক্ষু জলের ভারে নত হইয়া পড়িল। দু' ফোঁটা জল কিছুতে আর রাখিতে পারিলেন না। কিরণ সেই দুইটি অশ্রুবিন্দু দেখিয়া ভয় পাইল। কোন কথা কহিল না, চুপ করিয়া রহিল।

দু' ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়া ঠাকুরমা চোখ মুছিলেন। তার পর বলিতে লাগিলেন, "কি যে অসুখ, তা ত আমিও জানি নে, কিন্তু মেয়ে ত দেখতে দেখতে চারখানা হাড়-সার হ'ল। আমি যদি পীড়া-পীড়ি কোরে ডাক্তার-কবিরাজ ডাকতে চাই, তা হ'লে কাঁদে, বলে—কোন অসুখ নেই। সব সওয়া যায়, কিন্তু লীলার কান্না সওয়া যায় না। ওর চোখে যে, আবার জল পড়বে, সে আমি দেখতে পারব না। আমার কেবল এই কামনা যে, আমি থাকতে যেন ওর চক্ষের জল না পড়ে। তাই ডাক্তার ডাকতে পারি নে। অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে ?"

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরমা, তুমি কিছু বুঝতে পার না ? দিদির কি শরীরেই অসুখ, না মনেরও কোন অসুখ আছে ?"

ঠাকুরমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন, মনের অসুখ কার নেই ? লীলার কিসেই বা মনের সুখ থাকবে ? এখানে একটিও সমবয়সী নেই। যাও বা তোমার কাছে ব'সে কথাবার্ত্তা কইত, তুমি শ্বশুরবাড়ী গিয়ে অবধি তাও হয় না। কিসেই বা ওর মনে সুখ হবে ?"

কিরণ বুঝিল, ঠাকুরমা কিছু কথা চাপা দিতে-ছেন। তখন স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিল, "যিনি সংসা-রের নূতন গিন্নী হয়েছেন, তাঁর সঙ্গে দিদির কেমন বনে ?"

ঠাকুরমা একবার দুয়ারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কেউ শুনলেই বা আমার ক্ষতি কি ! বুড় বয়সে ছেলে ত আর বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না, আর যদি তাড়িয়েই দেয় ত যে ক'দিন বাঁচব, সে ক'দিন কি আর কেউ এক মুঠা ভাত দেবে না ? লীলা যে মনের দুঃখে আছে, তা সেই জানে। এক লক্ষ্মী থাকতে, লীলার মুখে হাসিটুকু সর্ব্বদা লেগে থাকত, আর এক লক্ষ্মী এসে তার চক্ষের জল শুকোতে পায় না। তাকে মায়ে ঝিয়ে মিলে যে রকম করেন, তা ভগবানই জানেন।

তারপর ঠাকুরমা কিরণকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। লীলার যে সকল শাস্তি হইত, তাহার অাঁতে যে সব ঘা লাগিত, সমুদয় একটি একটি করিয়া বলিলেন। শুনিতে শুনিতে কিরণের দু'টি চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। অবশেষে কিরণ কহিল, "ঠাকুরমা, এ সব কথা এত দিন আমাকে ব'লে পাঠাও নি কেন ?"

ঠাকুরমা কহিলেন, "লীলা যে আমায় কোন মতেই বলিতে দিত না। তার মুখখানি দেখে কি তার কথা এড়ান যায় ?"

তখন কিরণ কহিল, "যা হয়েচে ঠাকুরমা, তা হয়েচে। কিন্তু আর আমি দিদিকে এখানে থাকতে দেব না। একাদশীর দিন যেতে নাই, দ্বাদ-শীর দিন যখন যাব, তখন তাঁকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যাব।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "তা নিয়ে যেও ভাই। এখান থেকে বেরুলে ওর হাড় বাতাস লাগবে। তুমি ত লীলার বোন্, তোমার কাছে থাকলে দোষই বা কি ?"

ঠাকুরমার সঙ্গে কথা শেষ হইলে কিরণ লীলার ঘরে গিয়া তাহাকে কহিল, "দিদি, আমি ঠাকুরমার কাছে সব শুনেছি, এখন তুমি সব কথা খুলে বল। বিজয়ার পর দ্বাদশীর দিন তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। এ বাড়াতে আর তোমার থাকা নয়।"

লীলার মনে বিশ্বাস ছিল যে, এখনও তাহার এই বাড়ীতেই থাকা কর্ত্তব্য। যে বাড়ীতে শান্তি-লাভ করিয়াছিল, সে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া না দিলে স্বেচ্ছামতে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু লীলার আর তেমন মনের বল ছিল না। কিরণের পীড়াপীড়িতে তাহার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া গেল।

উৎপীড়নে তাহার শরীর, মন, বিকল হইয়া পড়িয়াছিল। কিরণের সঙ্গে যাইলে আর এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। এক দিকে দারুণ যন্ত্রণা, অন্য দিকে নিষ্কৃতি; এক দিকে কর্ত্তব্যের আদেশ, আর এক দিকে প্রলোভন। এমন অবস্থায় যাহার বল থাকে; সে কর্ত্তব্যই পালন করে। লীলার কল্পিত যে কর্ত্তব্য, তাহা পালন করা অনেক বলের কাজ, কিন্তু লীলার মনে আর একটুও বল ছিল না। সুতরাং সে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিল না। কিরণের সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইল—কিন্তু একটা আপত্তি—বলাটাও ভাল দেখায় না, অথচ না বলিয়াও থাকা যায় না। লীলা বলিল, "তুমি যেন আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেলে, কিন্তু তোমাদের যে অল্প টাকা, তাতে আর একটা মানুষের ভার নেওয়া উচিত নয়। প্রফুল্ল বড় হচ্চে, সে স্কুলে গেলে তোমাদের অনেক খরচ বাড়বে। আমি এখানেই বেশ আছি।"

কিরণ রাগিয়া গেল। বলিল, "তুমি যদি কথা কাটাইবার জন্য এ কথা না বল্‌তে, তা হ'লে আমি বড় রাগ কর্‌তাম। তুমি আমার কাছে থাক্‌লে আমার ভার বোধ হবে? এই বুঝি তুমি আমার দিদি! আমার যা শাক-ভাত জুটবে, তাই তোমায় দেব; তার আবার ভার-বোঝা কি?"

লীলা আর পারিল না। তাহার সেই শীর্ণ মুখখানি কিরণের কাঁধে রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল, "আমি তোমাদের কবে কি উপকার কোরেচি যে, তোমরা সবাই আমায় এত যত্ন কর!"

ছোট মেয়েটিকে মা যেমন বুকে টানিয়া লয়, কিরণ সেই রকম করিয়া, লীলাকে আপনার বুকে টানিয়া লইল। লীলার এমনি শরীর হইয়াছিল যে, শুইয়া থাকিলে তাহাকে ছোট মেয়েটির চেয়ে বেশী বড় দেখাইত না। সে নীরবে কিরণের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

লীলার বুকের সেই ব্যথাটা একটু বোধ হইতেছিল, সেই জন্য সে শুইয়া পড়িল। কিরণ তাহা কিছু বুঝিতে পারিল না। প্রফুল্ল লীলার পাশে শুইয়াছিল। লীলা প্রফুল্লের ঘুমন্ত মুখখানি দেখিতে লাগিল। এক দিন কি লীলাও প্রফুল্লের মত ছিল না।

পূজার কয় দিন কিরণের পক্ষে বড় দুঃখে কাটিল। যখন ঠাকুর দেখিতে যাইত, তখন তাহার চক্ষে জল আসিত; যখন ঢুলীরা বড় আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া চোখ দু'টা পাকাইয়া ঢোল-কাঁসী বাজাইত, তখন তাহার চক্ষে জল আসিত; যখন আরতির সময় ধূপ-ধূনা জ্বলিত, শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের শব্দে বাড়ী ফাটিয়া যাইত, তখন তাহার চক্ষে জল আসিত। যে বাড়ী এক বৎসর আগে লক্ষ্মীশূন্য হইয়াছে, সেই বাড়ীতে আজ এত উৎসব!

সপ্তমী-পূজার রাত্রে যাত্রা হইবার কথা ছিল, এ জন্য অনেকে সকাল সকাল আহারাদি করিয়া শুইতে গেল—যাত্রার সময় উঠিবে। যে সুন্দরীদের শুনিবার বড় সাধ, তাঁহারা না শুইয়া সকলের আগে জায়গা দখল করিয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি দুপুরের সময় যাত্রা আরম্ভ হইবার কথা, রাত্রি এগারটার সময় খবর আসিল, যাত্রার দলের বাবুরা রাত্রি চারিটার এ দিকে আসবে নামিতে পারিবেন না। সখের দল, কিছু বলিবার যো নাই। অত রাত্রে যাত্রা আরম্ভ হইবে শুনিয়া, অনেকের উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া গেল। যাঁহারা পাড়া হইতে জড় হইয়াছিলেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে যাত্রার দলের পোড়ারমুখো মিন্সেদের রন্ধনশালার একটা বিশেষ উত্তপ্ত স্থানে পাঠাইয়া দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। যাহারা আগে হইতে সম্মুখের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, তাহারাও অনেকে উঠিয়া গেল, কেহ কেহ সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বাড়ীতে সাড়াশব্দ নাই। দরোয়ানেরা দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়াছিল—রাত্রি দুইটার সময় দরজা খুলিবার হুকুম। বাড়ীর উঠানে দু' একটা ঝাড়ে গোটা দুই বাতি জ্বলিতেছিল। দরজার কাছে ও বাড়ীর ভিতর যাইবার গলিতে দুইটা সরায় সরিষার পুঁটলির আলো কাঁপিতেছিল, সেই কম্পিত আলোকে দেয়ালে ও উঠানে নানা রকম ছায়া নৃত্য করিতেছিল। কেবল পূজার দালানে সমুদায় দেয়ালগিরি ও ঝাড় জ্বলিতেছিল। সেই স্তব্ধতার মধ্যে দশভুজার সর্ব্বাঙ্গে উজ্জ্বল আলোক প্রতিফলিত হইতেছিল। অসুরের নীল মুখে, সিংহের শুভ্র কেশরে আলোক জ্বলিতেছিল। প্রতিমার মুখে যেন একটু স্থিরহাসি।

সেই উজ্জ্বল আলোকে, লোকালয়ের নিদ্রিত নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই দেবীমূর্ত্তি দেখিলে, যে হিন্দুকে পৌত্তলিক বলিয়া ঘৃণা করে, সেও স্তব্ধ হইয়া একবার দাঁড়াইত।

পূজার দালানে কেহ ছিল না। অকস্মাৎ পাশের দরজা খুলিয়া একটি শুভ্রবসনা স্ত্রীলোক নীরবে প্রতিমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া স্থিরনেত্রে দেবীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। অনিমেষ, কাতর দৃষ্টি। ক্রমে আত্মবিস্মৃতি হওয়াতে মাথার কাপড় খসিয়া পড়িল। দীর্ঘ, কৃষ্ণ কেশরাশি, শুভ্র বসন, তাহার উপর সেই উজ্জ্বল আলোক! সম্মুখে দীর্ঘাকৃতি, মুকুটধারিণী দেবীমূর্ত্তি। আর কোথাও কেহ নাই। এ দিকে ও দিকে যাহারাও বা ছিল, তাহারা নিদ্রামগ্ন। যদি কেহ সে সময় রমণীর মুখ দেখিতে পাইত ত দেখিত,—সে মুখ অত্যন্ত শীর্ণ, অথচ বড় সুন্দর। দেখিত যে, সে চক্ষের স্থিরকটাক্ষে বড় কোমল জ্যোতি, তাহার ঠোঁট দু'খানি ঈষৎ কাঁপিতেছে। অনেকক্ষণ চাহিয়া রমণী চক্ষু বুজিল; আবার চাহিল, আবার সেই মৃন্ময়ী প্রতিমার মুখ দেখিতে লাগিল। দেবীর মুখে সেই একটু স্থির হাসি—রাত্রে একা সেই রমণীর মত ব্যথিত প্রাণে দাঁড়াইয়া দেখিলে সে হাসি কেমন যেন নিষ্ঠুর বোধ হয়। রমণীর বিনিদ্র, ব্যথিত, কাতর নয়নে সে হাসি ক্রমে নিতান্ত মমতাশূন্য বোধ হইতে লাগিল।

তখন তাহার চক্ষে জল আসিল। দু' ফোঁটা জল শুষ্ক কপোল বহিয়া আঁচলে পড়িল। ক্রমে সেই উজ্জ্বল নয়নযুগল হইতে গণ্ড বহিয়া মুক্তাধারা বহিতে লাগিল।

মা! সম্মুখে দাঁড়াইয়া লীলা কাঁদিতেছে কেন, একবার জিজ্ঞাসা করিবি না? দিগ্‌ভুজে! দশ হাত তোর, লীলার দুঃখ-নিবারণের জন্য একটি অঙ্গুলিও হেলাইবি না?

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

নিষ্কৃতি।

একাদশীর রাত্রি প্রভাত হইল। দ্বাদশীর দিন ভোরবেলা কিরণ যাইতে চায়। ঠাকুরমা গোপনে তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "সকালবেলা না খাইয়া যাওয়াটা ভাল দেখায় না, লোকে কত কি মনে করিতে পারে। লীলা একাদশীর উপবাস করিয়া আছে, তাহাকেই বা কিছু না খাওয়াইয়া কেমন করিয়া যাইতে দেওয়া হয়?

ঠাকুরমার কথায় কিরণ বুঝিল। বৈকালে যাওয়াই স্থির হইল।

বৈকালে কিরণ সকলের নিকট বিদায় লইল। আনন্দময়ী বাহিরে যাইবার পথেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার মা, কিরণ শ্বশুরবাড়ী যাইবে বলিয়া, অত্যন্ত বিষণ্ণ-মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। কিরণ তাঁহাদের নমস্কার করিয়া, প্রফুল্লকে ঝির কোলে দিয়া, লালাকে ডাকিতে গেল। লীলা আপনার ঘরে ছিল, কিরণের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া ঠাকুরমাকে নমস্কার করিল।

লীলা কিরণের সঙ্গে যাইবে, আনন্দময়ী তাহার কিছু কিছু জানিতেন। তবু লীলা ঠাকুরমাকে নমস্কার করিল ও তাঁহাকে নমস্কার করিতে আসিতেছে দেখিয়া, একটু বিস্ময়ের ভাণ করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিও কি এই সঙ্গে যাবে না কি?"

লীলা বলিল, "কিরণ বড় পীড়াপীড়ি কর্‌চে, তাই যাচ্চি।"

ও দিকে কিরণ ঠাকুরমাকে কিছু চেঁচাইয়া বলিতেছিল, "আমি ত আর দিদিকে চিরকালের জন্য নিয়ে যাচ্চি নে। আমি যে একলাটি থাকি, সেটাও ত তোমাদের একবার মনে করা উচিত। দু' দিন দিদি আমার কাছে থাক্‌লেনই বা!"

আনন্দময়ী একটুখানি মধুর হাসি হাসিয়া লীলাকে কহিলেন, "তবে তুমি বেড়াতে যাচ্চ? আমি ভেবেছিলাম, বুঝি তোমার আর এখানে ভাল লাগে না। আমি যদি ইচ্ছা কর্‌লে যেতে

পারতাম ত এত দিনে কতবার বাপের বাড়ী যেতাম।"

লীলা। তোমার এখানে সংসার দেখতে হয়।

আনন্দময়ী। আমি যেখানে সেখানে যেতেও চাই নে। যেখানে সেখানে যাওয়া বড় সুখ্যাতির কথা নয়।

লীলা মৃদু মৃদু জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি যেখানে সেখানে যাচ্চি?"

আনন্দময়ী। আমি কি তাই বল্‌চি? কিরণের বাড়ী কি যেখানে সেখানে? কিরণের বাড়ী আর এ বাড়ী কি আলাদা?

লীলা একটু চুপ করিল। একটু চুপ করিয়া, আনন্দময়ীর মুখের দিকে তাকাইয়া, অতি মৃদু স্বরে কহিল, "আমার যাওয়ায় যদি তোমার মত না হয়, তা হ'লে আমি যাব না। তুমি যদি বল ত আমি থাকি।"

আনন্দময়ী অতি বিস্মিতের মত কহিলেন, "আমি তোমায় কেন বারণ করতে গেলাম? আমি কোথাকার কে? তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় যাবে, যেখানে ইচ্ছা হয় থাক্‌বে, আমি বারণ করব কেন?"

লীলা বড় ব্যথা পাইল। একটা যেন কি দুঃখের কথা মুখে আসিল, কিন্তু তাহা চাপিয়া রাখিল। চোখ না তুলিয়া কেবল বলিল, "তবে আসি।" লীলা আনন্দময়ীর পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিতে উদ্যত হইল। আনন্দময়ী হস্ত দ্বারা নিবারণ করিয়া কহিলেন, "থাক্, থাক্! হাজার হোক্, তুমি বয়সে আমার চেয়ে বড়।"

কিরণ ও লীলা একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। ঠাকুরমা একধারে দাঁড়াইয়া চক্ষের জল মুছিতেছিলেন; সেই দেখাদেখি তাঁহার নূতন বেহানের চোখের কোলে কোলে জল পুরিয়া আসিয়াছিল।

কিরণ লীলার হাত ধরিয়া চৌকাটের বাহিরে গেল।

প্রফুল্লচন্দ্র আগে হইতে গিয়া, গাড়ীতে বসিয়াছিলেন। কিরণ ও লীলা চলিয়া যায় দেখিয়া ঠাকুরমা চক্ষের জল সংবরণ করিলেন।

খিড়কীর দরজায় গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। ঠাকুরমা দরজাগোড়ায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। গাড়ী চলিয়া গেল। গাড়ীর সঙ্গে যেন ঠাকুরমার প্রাণের খানিকটা চলিয়া গেল।

ঘরে আসিয়া ঠাকুরমা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মেয়েটা রক্ষা পেলে!"

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

আবার অমঙ্গল।

কিরণের সঙ্গে লীলাকে দেখিয়া সুরেশচন্দ্র ব্যথিত হইলেন। তিনি লীলাকে অনেক দিন দেখেন নাই। কিরণের মাতার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে লীলা কিরণের বাড়ী যায় নাই। অনেক দিনের পর দেখা, তার পর আবার এইরূপ দেখা! লীলার সেই তখনকার জ্যোৎস্নময়ী মূর্ত্তি আর এখনকার এই কালিমাময়ী, শীর্ণ, ম্লান মূর্ত্তি, দুই যেন সুরেশচন্দ্রের চক্ষে একত্রে পড়িল। তিনি লীলাকে প্রণাম করিয়া, আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। কিরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদির এমন শরীর কেন?" কিরণ উত্তর করিল, "অসুখে।" তখন কিরণ আর কিছু বলিল না। লীলা বড় একটা কথা কহিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল না। অনেক দিনের পর আজ যে শান্তি লাভ করিয়াছে, একটু চুপ করিয়া যেন সেই শান্তি ভোগ করিতে চায়।

নির্জ্জনে কিরণ স্বামীর নিকট সব কথা খুলিয়া বলিল। আমার সন্দেহ হয়, কথাটা খুলিয়া বলিতে দু'চার কথা বেশী বলিয়া থাকিবে; একে ত একটা কথা শুনিয়া সেটা ঠিক সেই রকম বলা বড় কঠিন, তাহাতে স্ত্রীলোকদের বাড়াইয়া বলা কেমন অভ্যাস। ঠাকুরমা কিরণের কাছে সকল কথাই যে ঠিক বলিয়াছিলেন, এমন অনুমান হয় না। কিরণও সুরেশচন্দ্রকে বলিবার সময় ঠাকুরমার কাছে যেমন শুনিয়াছিল, ঠিক সেই রকম বলিতে পারিল না—কিছু বাড়াইয়া বলিল। সব শুনিয়া সুরেশচন্দ্রের বুক ফাটিয়া গেল; খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি এখানে ক' দিন থাক্‌বেন?"

কিরণ কহিল, "সেই বাড়ীতে আবার ওঁকে

পাঠাব? দিদি এখন আমাদের কাছেই থাকুবেন। তোমার কি মত?"

সুরেশচন্দ্র কিরণকে চুম্বন করিয়া কহিলেন, "আমার আবার অন্য মত?"

কিরণ মুখ ফিরাইয়া লইল, কহিল, "কথা কইতে কইতে ও আবার কি!"

লীলাকে আনিয়া কিরণের একটা কাজ বাড়িল। লীলাকে ভাল খাওয়াইবার, তাহাকে ভাল রাখিবার মহা ভাবনা পড়িল। কিন্তু লীলা সমাদরে থাকিবার লোক নয়। কিরণ তাহার জন্য যা কিছু উদ্যোগ করিত, লীলার কৌশলে সে সকল পাল্টাইয়া কিরণের ভাগেই পড়িত। সকলের চেয়ে প্রফুল্লেরই জিত। মাসীমা আসিয়া তাহার খাবার ও আদর দুই বাড়িল।

এক দিন বৈকালে আপিস হইতে বাড়ী আসিবার সময় সুরেশচন্দ্র গড়ের মাঠ দিয়া আসিতেছিলেন। আকাশে অল্প মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টি হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। হঠাৎ অন্ধকার হইয়া আসিল। উত্তর-পশ্চিম কোণে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। সুরেশচন্দ্র জোরে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু অধিক দূর না যাইতেই মুষলধারে বৃষ্টি আসিল। মাথার উপর বৃষ্টি লইয়া সুরেশচন্দ্র রাজপথে আসিলেন। খানকতক গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সুবিধা পাইয়া তাহারা আট আনার জায়গায় দেড় টাকা হাঁকিল। সুরেশচন্দ্র দেখিলেন, এখন গাড়ী চড়িলেও বড় লাভ নাই, যাহা ভিজিবার, তাহা ভিজিয়াছেন। হাঁটিয়া বাড়ী গেলে না হয় আর একটু ভিজিবেন। সুরেশচন্দ্র হাঁটিয়াই বাড়ী গেলেন।

সেই রাত্রে তাঁহার জ্বর হইল। দেখিতে দেখিতে জ্বর বড় বাড়িয়া উঠিল। দুই তিন দিন পরে বিকার হইল, সুরেশচন্দ্র প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। ডাক্তারে বলিল, "পীড়া বড় কঠিন, কি হয়, বলা যায় না।" গোবিন্দপ্রসাদ বাবু সংবাদ পাইয়া এক জন বড় ডাক্তার সঙ্গে লইয়া আসিলেন। সুরেশচন্দ্র তখনও চৈতন্য লাভ করেন নাই। ডাক্তার বড় বিচক্ষণ, অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিলেন। শেষে কহিলেন, "বিশেষ কোন ভয় নাই। কিন্তু আরোগ্য হইতে বিলম্ব হইবে। অনেক দিন সাবধানে থাকিতে হইবে।" কিরণ ও লীলা আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল। ডাক্তার কি বলিল, তাহারা বুঝিতে পারিল না। বুঝিতে পারিল না। বলিয়াই তাহাদের বড় ভয় হইল।

দিন কয়েকের মধ্যে বিকার ছাড়িল; কিন্তু জ্বরের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় না। গোবিন্দপ্রসাদ বাবু নিজে কিছু অসুস্থ ছিলেন, এ জন্য জামাতাকে আর দেখিতে আসিতে পারেন নাই। লীলা নিজের রুগ্ন শরীর লইয়া সুরেশচন্দ্রের শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল। কিরণ কাঁদিবে কি স্বামীর কাছে বসিবে কি প্রফুল্লকে সামলাইবে, ভাবিয়া পায় না।

এক মাস কিরণের বাড়ীতে লীলা না আসিতে এই কাণ্ডটি ঘটিল। যেখানে লীলা যায়, সেইখানে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অমঙ্গল আসে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? কিরণের নাকি বুদ্ধি বড় কম, সেই জন্য সে কিছু মনে করিত না।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

বিপদে বন্ধু।

গণেশচন্দ্রকে অনেক দিন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এখন তিনি একটু বিরলদর্শন হইয়াছেন। যখন তখন দেখা পাওয়া যায় না, যে সে দেখা পায় না। আগেকার হুজুগগুলা এখন অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে, বক্তৃতার স্রোতে কতক ভাঁটা ধরিয়াছে, সভা সমিতিতে নিয়মিত উপস্থিত হওয়া কিছু কমিয়াছে। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "অবসর নাই, নানা কর্ম্মে ব্যস্ত।" অন্য দিকেও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তামাকটা আর সখের জিনিষ নাই, নিয়মিত সময়ে না জুটিলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। মদ্যপানটাও বাহাদুরীর জিনিষ নাই, প্রায় সাথের সাথী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু সুরেশচন্দ্রের প্রতি গণেশচন্দ্রের একটু অনুগ্রহ-দৃষ্টি ছিল। সুরেশচন্দ্রের ব্যারামের কথা গণেশচন্দ্র শুনিতে পাইলেন। দুই বাড়ীর ঝি আসা-যাওয়া করে, সুতরাং খবর পাইতে বড় দেরী হইল না। গণেশচন্দ্র পীড়ার কথা শুনিয়া

সুরেশচন্দ্রকে একবার দেখিতে আসিলেন। সুরেশচন্দ্র শয্যা হইতে উঠিতে পারেন না, গণেশচন্দ্র শয্যার পাশে বসিয়া খানিক কথাবার্ত্তা কহিলেন। উঠিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দেখিতেছে ?"

সুরেশচন্দ্র পাড়ার এক জন ডাক্তারের নাম করিলেন।

গণেশচন্দ্র কহিলেন, "সে কি? এত দিন জ্বর রহিয়াছে, এক জন ভাল ডাক্তার দেখান হয় না কেন ?"

সুরেশচন্দ্র কহিলেন, "একবার শ্বশুর মহাশয় দেখাইয়াছিলেন। আমার তখন বিকার।"

গণেশচন্দ্র কহিলেন, "তোমার শ্বশুর ত ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আবার আসিতে পারেন ?"

"তিনি নিজে পীড়িত।"

গণেশচন্দ্র দাঁড়াইয়া বলিয়া গেলেন, "আচ্ছা, কাল আমি নিজে সঙ্গে করিয়া আসিব। তোমার এক জন ভাল ডাক্তার দেখান উচিত।"

গণেশচন্দ্র খামখা এতটা পরোপকারে প্রবৃত্ত হইলেন, সেটা কিছু আশ্চর্য্য কথা, কিন্তু এ রকম পরোপকার উদ্দেশ্যশূন্য নয়। গণেশচন্দ্র ডাক্তার আনিয়া সুরেশচন্দ্রকে দেখাইবেন, এ কথা কখন চাপা থাকিবে না। প্রকাশ হইলেই গণেশচন্দ্রের যশ বাড়িবে। যথার্থ উদ্দেশ্যশূন্য পরোপকার কয় জন করে ?

এ সব গোলমালের কথা। গণেশচন্দ্র যাহা করিলেন, সেটা বিপৎকালে যথার্থ বন্ধুব কাজ বটে—তা উদ্দেশ্য যাহাই হউক, পরদিবস ডাক্তার লইয়া আসিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "ভয়ের কোন কারণ নাই, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক। অন্ততঃ কিছু দিন কলিকাতার বাহিরে একটা বাগান বাড়ীতে থাকিতে হইবে।"

ডাক্তারের পরামর্শমতে রুগ্ন সুরেশচন্দ্রের বাগানে যাওয়াই স্থির হইল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

বাগানে যাওয়া ত স্থির হইল, কিন্তু সেটা ত ব্যয়-সাধ্য। টাকা আসিবে কোথা হইতে ?

সুরেশচন্দ্রের পিতৃব্য পেন্সন লইয়া অধিক দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। মাসকয়েক পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর সুরেশচন্দ্রের পিতৃব্যালয়ে যাওয়া এক প্রকার রহিত হইয়াছিল। তাঁহার পীড়ার সময় সে বাড়ী হইতে কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও আসে নাই।

হরগৌরী বাবু সুরেশচন্দ্রের যে কয়টি টাকা জমা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই প্রায় তাঁহার পীড়ায় খরচ হইয়া গিয়াছিল। পীড়িত হইয়া পর্য্যন্ত পূরা বেতনও পাইতেন না।

শ্বশুরের নিকট টাকা চাহিবেন ? সে কথা সুরেশচন্দ্র কানে তুলিলেন না। কিরণের মনও কেমন খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। শেষ উপায় কিরণ নিজেই উদ্ভাবিত করিল। কিরণ ও লীলা মিলিয়া পরামর্শ করিল। সুরেশচন্দ্র শয্যাগত, তিনি প্রথমে কিছু জানিতে পারিলেন না।

কিরণ গহনা বন্ধক রাখিবে। এমন সময় যদি তাহার গহনা কাজে না আসিল ত আর কখন্ কাজ দেখিবে ?

লীলার সাক্ষাতে কিরণ গহনার বাক্স বাহির করিল। মাতার মৃত্যুর পর মাতার গহনা প্রায় সমুদয়ই সে পাইয়াছিল। বাক্সের এক দিকে তাহার নিজের গহনা ছিল, আর এক দিকে তাহার মা'র গহনা ছিল। বাক্স খুলিয়া কিরণ সেই গহনাগুলি দেখিতে লাগিল। কোন গহনাখানি একটু ময়লা—কিরণের মা'র অঙ্গে লাগিয়াছিল। কোনখানে একটু ঘষিয়া গিয়াছে—মা পরিতেন। চিকের ফিতায় একটু যেন গন্ধ, মা'র অঙ্গের পদ্মগন্ধ। সর্ব্বাঙ্গে গহনা পরিলে মা'র সে কোমল মুখশ্রী আর অঙ্গলাবণ্য যেমন দেখাইত, কিরণের তাহাই মনে হইল। তার জলভরা চক্ষের সম্মুখে স্নেহময়ী অলঙ্কৃতা জননীর মূর্ত্তি উদয় হইল। তার হাত কাঁপিতে লাগিল, তার চক্ষের জল সেই অলঙ্কারগুলির উপর পড়িল। অতি কাতর চক্ষে লীলার দিকে

চাহিয়া কহিল, "দিদি, এগুলি কি দিতে হবে? এগুলি ত আমি দিতে পারব না।"

লীলার মর্ম্ম হইতে সে ব্যথার প্রতিধ্বনি উঠিল। তাহার ম্লানচক্ষে জল বহিতে লাগিল। বলিল, "না দিদি, ও গহনা বার কোরতে হবে না। তোমার নিজের সব গহনাও বার্ কোরতে হবে না। গণেশ বাবু বলেছেন, দু'শো টাকা হইলেই হবে। তোমার দু'হাজার টাকার গহনা আছে।"

গহনা বন্ধক রাখিয়া, লীলা ও কিরণ সুরেশ-চন্দ্রকে বাগানে লইয়া গেল। কিরণ যাইবার সময় পিত্রালয়ে সংবাদ দিয়া গেল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

দুই জনের মন।

লীলা গোবিন্দপ্রসাদ বাবুর বাড়ী হইতে চলিয়া যাইলে পর অনেকে প্রায় সর্ব্বদাই তাহার নাম করিত, কিন্তু দুই জন তাহার বিষয় বেশী ভাবিত। সেই দুই জন,—ঠাকুরমা ও আনন্দময়ী।

ঠাকুরমা নিজে ইচ্ছা করিয়া, কতক নিজে উদ্যোগী হইয়া, লীলাকে কিরণের সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া প্রথম কয় দিন তিনি নিশ্চিন্তও হইয়াছিলেন। নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন—লীলার জন্য, নিজের জন্য তখন ভাবেন নাই। যখন লীলা চলিয়া গেল, দুই চারি দিন আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তাঁহার মন কেমন করিতে লাগিল। তাহার জন্য মনে একটা অভাব বোধ হইতে লাগিল। কিরণের জন্য তত মন কেমন করিত না। তাঁহার এই প্রাচীন, জীর্ণ জীবনের সঙ্গে কিরণ তেমন জড়ায় নাই। কিরণ পরের বাড়ী যাইবে বরাবরই জানিতেন। কিরণের অল্পবয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। অল্পবয়স হইতে সে শ্বশুরবাড়ী ছিল, ঠাকুরমার সেবা কখন করে নাই। বাড়ীর অন্য ছেলে-মেয়ে যে রকম, ঠাকুরমার কাছে কিরণও সেই রকম। লীলার প্রতি আর এক রকম মনের ভাব। কিরণ পৌত্রী হইলে কি হয়, লীলার দিকে ঠাকুরমার টান বেশী। লীলা আসিয়া তাঁহার একটা নূতন বন্ধন হইয়াছিল, একটা নূতন মায়া বাড়িয়াছিল। সেই জন্য লীলার বিচ্ছেদ তাঁহার বড় লাগিল। শুধু মনে নয়; বাহিরে নড়িতে চড়িতে লীলাকে মনে পড়িত। তাঁহার কাজকর্ম্ম লীলার মত কে করিবে? লীলার মত শুদ্ধাচারিণী বাড়ীতে আর কে আছে? ঠাকুরমার জল খাবার ঘটীটি সে দুই বেলা নিজে মাজিত; ফুল-কাঁসা মাজিতে মাজিতে রূপার মত হইয়া উঠিয়াছিল। লীলা গিয়া অবধি ঘটীটি যেন একটু ময়লা ময়লা দেখাইতেছে, আর যেন তত ঝক্ ঝক্ করে না। ঠাকুরমার দাঁত বড় বেশী ছিল না, যাহা ছিল, তাহাও তেমন শক্ত ছিল না। লীলা তাঁহার জন্য পান সাজিয়া খলে ছেঁচিয়া দিত। এমন মিষ্ট পান আর কে সাজিবে? ঠাকুরমার আহ্নিকের জল দেওয়া, তাঁর কোশাকুশি মাজা, তাঁর কাপড় কাচা, তাঁর বিছানা পাতিয়া দেওয়া, তাঁর উনান নিকান, তাঁর মাথা হইতে ধান দিয়া পাকা চুল বাহির করা, এ সব তেমন আর কে করিবে? কত বুদ্ধিই লীলার ছিল! ঠাকুরমা বুড় মানুষ, সহজেই রাগিয়া উঠিতেন। লীলা তাঁহাকে একেলা পাইলে কেমন নম্রভাবে ধীরে ধীরে কত করিয়া বুঝাইত; ঠাকুরমা বলিতেন, "যেন কত কালের ঠাকুরণদিদি!" আর লীলাকে দেখিয়াই তাঁর মন কত কোমল হইত! তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কাছে থাকিয়া, তিনি যত দিন বাঁচিবেন, লীলার আর কোন কষ্ট হইবে না। বিধাতা তাহার কপালে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা ত কেহ খণ্ডন করিতে পারে না, তাহাও ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ঠাকুরমা মনে করিতেন যে, লীলা আর সব ছোট ছোট দুঃখ-যন্ত্রণার হাত এড়াইয়াছে, তাহার কপালে সুখ না থাকুক, শান্তি লাভ করিতে পারিবে। ঠাকুরমার সেই আশাই বা পুরিল কৈ? একটু একটু করিয়া লীলার হৃদয় দলিত হইতেছিল, তিনি দাঁড়াইয়া কেবল দেখিতেন, কিছুই করিতে পারিতেন না। লীলার মুখখানি কেমন করিয়া শুকাইয়া আসিতেছিল, তিনি ত রোজ দেখিতে পাইতেন। তাহার হাড় এখন জুড়াইয়াছে, কিন্তু ঠাকুরমা ত স্থির হইতে পারিতেন না। কেবল মনে করিতেন, কত দিনে আবার লীলাকে দেখিবেন।

আনন্দময়ীও লীলাকে অনেকবার স্মরণ করিতেন। তাঁহার মনের ভাব আর এক রকম। লীলা কেন চলিয়া গেল? তাহার উপর আনন্দময়ীর রাগ ছিল বটে, কিন্তু তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবার ইচ্ছা ছিল না। লীলা থাকে, কষ্ট পায়, চুপ করিয়া সে কষ্ট সহ্য করে, আনন্দময়ীর সেই ইচ্ছা। আনন্দময়ী যে ভারি দুষ্ট, আমার সে রকম মনে হয় না। আনন্দময়ীর স্বভাব এখনও ভালরূপে গঠিত হয় নাই। তিনি যে লীলাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, সেটা বিন্দুবাসিনীর দোষে। বিন্দুবাসিনী অমন করিয়া না লাগাইলে কি হইত বলা যায় না। আনন্দময়ীর মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার আসাতে লীলা অসন্তুষ্ট, আর লীলার মত নেহাত ভালমানুষী তাঁহার ভাল লাগিত না। লীলা যদি তাঁহাকে ভাল না বাসে ত তাহাকে একটু জ্বালাতন করিলে দোষ কি? তাঁহার মনের ভাব এইরূপ। আনন্দময়ীর বয়স অধিক নয়, অল্পবয়সে সকলেই একটু চঞ্চল, একটু দুষ্ট হয়। আমার বিবেচনায় ভাল লোকের হাতে পড়িলে আনন্দময়ী আর এক রকম মানুষ হইতেন। যে তাঁহার মা জুটিয়াছিলেন ও যে ননদ মিলিয়াছিল, তাহাতে কাহারও মন ভাল থাকা দায়। দিনরাত ফিস্ ফিস্, ফুস্ ফুস্। অত মন্ত্র কানে ঢুকিলে কি আর রক্ষা আছে? ছোট ছেলেরা প্রজাপতি ধরিয়া, তাহার পাখা কাটিয়া দেয়, তাহাকে কাঠী বিঁধিয়া মারে। প্রজাপতিটা মরিয়া যায়, কিন্তু ছেলেদের পক্ষে সেটা খেলা মাত্র। লীলাকে একটু করিয়া খোঁচা দেওয়া, আনন্দময়ীর পক্ষেও সেই প্রকার ছেলেখেলা। পাখা ছিঁড়িবার আগে প্রজাপতিটা যদি হাত হইতে উড়িয়া যায়, তাহা হইলে ছেলেরা যেমন নিরাশ হয়, লীলা কিরণের সহিত চলিয়া গেলে পর আনন্দময়ীর মনের অবস্থা কতকটা সেইরূপ হইল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—•—

বাগানবাড়ী।

হুগলীর নিকটে গঙ্গার ধারে একটি ছোট বাগানবাড়ীতে সুরেশচন্দ্র বাস করিতে লাগিলেন। বাড়ীখানি একতালা, কিন্তু বেশ খট্‌খটে। চারিটি ঘর, ঘরগুলিতে বেশ হাওয়া খেলে। ইংরাজি ধরণের বাড়ী—অন্দরমহল নাই। অন্দরমহলের কোন আবশ্যকও ছিল না। কিরণ ও সুরেশচন্দ্র এক ঘরে শয়ন করেন, লীলা আর এক কামরায় শোয়। সঙ্গে এক জন চাকর আসিয়াছিল, সে বাহিরে থাকিত। বাগানের মালী বাগানে থাকে। আশেপাশে, বাগানের বাহিরে দু' চা'র ঘর বেহারা থাকে।

ডাক্তার ঠিক কথা বলিয়াছিল। বাগানে আসিয়া সুরেশচন্দ্র অনেক সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। রান্নাবান্না লীলা ও কিরণ মিলিয়া করিতে লাগিল। মালী বেহারাদের এক জন স্ত্রীলোক ডাকিয়া আনিয়াছিল, সে রান্নাঘরের সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া, বাসন মাজিয়া, ঘর নিকাইয়া, রাত্রে নিজের ঘরে শুইতে যাইত।

কিরণের কলিকাতার বাহিরে যাওয়া এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। পল্লীগ্রামের গল্প অনেক শুনিয়াছিল, বনবাদাড়ের কথা, ভূত-প্রেতের কথা অনেক শুনিয়াছিল, কিন্তু পাড়াগাঁ চক্ষে কখন দেখে নাই। বাগানবাড়ীতে তাহার বড় নূতন নূতন বোধ হইতে লাগিল। প্রফুল্ল মাতামাতি, ছুটাছুটীর বিলক্ষণ সুবিধা পাইয়া কিরণকে ও লীলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহাকে ধর্ ধর্ করিতে করিতেই তাহাদের অর্দ্ধেক দিন যাইত।

বাড়ীটি ছোট বটে, কিন্তু বাগান বেশ বড়। ফুলবাগান তেমন বাহারে নয়, কারণ, মালী তেমন সেয়ানা নয়। বাগানে পুষ্করিণী। জল বেশ পরিষ্কার, কিন্তু ব্যবহৃত হয় না। বাঁধান ঘাট আছে। ঘাটের এক দিকে একটা চাঁপা-ফুলের গাছ, আর এক দিকে একটা বকুল-ফুলের গাছ। পুকুরের ধারে বেশ ধোওয়া ধোওয়া শামুক-গুগ্‌লি

পড়িয়া রহিয়াছে। ছোট ছোট মাছের ঝাঁক মধ্যে মধ্যে সিঁড়ির কাছে আসে। বাসন মাজা সেইখানে হয়, এঁটোকাঁটা পড়িয়া থাকে, মাছগুলি টুপ্‌ টুপ্‌ করিয়া খায়। পুকুরের পাড়ে একটা গাবগাছ, ঝড়ে একটু হেলিয়া পড়িয়াছে। বাতাস হইলেই কতকগুলা ডাল-পাতা জলে নিমজ্জিত হয়, আর কুচ্‌কুচে কালো পাতাগুলি দেখিতে আরও কালো হয়। নিকটে গোটাকতক আকন্দ-ফুলের গাছ। আকন্দ-ফল ফাটিয়া চারিদিকে তুলা উড়িতেছে, কতকগুলা পুকুরের জলে পড়িয়াছে ও বাতাসে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। পুকুরের এক কোণে একটা বাঁশঝাড়। বাঁশের পাতা গাছ হইতে খসিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া জলে পড়িতেছে। বাতাসের বেগ বাড়িলে বাঁশপাতাগুলা ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া উঠে, কখন বাঁশে বাঁশে লাগিয়া ঘর্ষণের শব্দ হয়। কিরণ প্রাণান্তেও সে দিকে যায় না—বাঁশগাছে ভূত থাকে। ফুলের মধ্যে চাঁপা, গন্ধরাজ, কামিনী বেশী। এক দিকে এক সারি সর্ব্বজয়া ফুল—বড় বড় পাতা, রাঙা রাঙা ফুল। আর এক দিকে কেয়া-গাছের বন, দক্ষিণে বাতাসে ভর্‌ ভর্‌ করিয়া ফুলের গন্ধ আসে, কিন্তু লীলা ও কিরণ নিকটে যাইতে সাহস করে না—কেয়া-বনে কেউটে থাকে। এক দিকে কতকগুলা আনারসের গাছ। বাড়ীতে উঠিবার সিঁড়ির সম্মুখে দুই দিকে দুইটা প্রকাণ্ড ঝাউগাছ, গাছের মধ্যে বাতাস কেবল সোঁ-সোঁ হু-হু করিয়া ডাকে। কিরণ কিছু দিন পর্য্যন্ত সেই শব্দ শুনিয়া মাঝে মাঝে চমকিয়া উঠিত। ফলের গাছ অনেক রকম। আম, লিচু, কাঁঠাল, জাম, জামরুল, আরও নানা রকম ফল আছে। পুকুরের কাছে নারিকেলগাছ, বাগানের পাঁচীলের পাশে চারি ধারে সুপারি-গাছের সারি। আর এক দিকে কেবল কলাগাছ, চাঁপাকলাই বিস্তর, কতকগুলা চাটিমকলারও গাছ আছে। কতকগুলা গাছে মোচা পড়িয়াছে, কোন গাছে কলার কাঁদি ঝুলিতেছে। বাগানের এক কোণে একটা বৃদ্ধ খেজুরগাছ, সেটায় আর ফল ধরে না। অনেকগুলা বাবুইয়ের বাসা সেই খেজুরগাছে ঝুলিতেছে।

কলিকাতায় থাকিতে কিরণ গঙ্গা ভাল করিয়া দেখে নাই। দু' চারবার গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিল, কিন্তু বড় একটা শোভা দেখিতে পায় নাই। আট-ঘাটে বাঁধা গঙ্গা, মাঝখানে পুল, চারিদিকে জাহাজ, বোট, পান্‌সী। এখানে দেখিল, গঙ্গা আর এক রকম। দুই ধারে গাছপালা, কোথাও বা জলের মাঝে চড়া পড়িয়াছে, সেই চড়ায় নানা রকম পাখী খেলা করিতেছে। দিনের মধ্যে দু' চারখানা ষ্টীমার যায়, ডিঙ্গীও চলে, কিন্তু কলিকাতার মত বাঁধা গঙ্গা নয়। এখানে যেন মুক্ত নদী, কল কল করিয়া জল ছুটিয়াছে। অবসর পাইলে, কিরণ ও লীলা গঙ্গার ধারে যাইত। সেখানে একটা বৃহৎ অশ্বত্থগাছ, চারিদিকে মোটা মোটা শিকড় বাহির হইয়া রহিয়াছে, দুই জনে সেই গাছতলায় বসিত। হয় ত ভর দুপুরবেলা চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, অশ্বত্থগাছের পাতার মধ্যে পাখীগুলা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। গঙ্গার জলে কোথাও কিছু দেখা যায় না, কেবল একখানি নৌকা ভাঁটায় ভাসিয়া যাইতেছে। নৌকার উপরে কেহ নাই, কেবল হালের গোড়ায় বসিয়া মাঝি ঝিমাইতেছে, এক দিন দুপুরবেলা দুই জনে এই রকম বসিয়া আছে, এমন সময় কিরণ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "হ্যাঁ ভাই, ওটা কি?" লীলা কিরণের অঙ্গুলিনির্দ্দেশ অনুসারে দেখিল, অনেক দূরে গঙ্গার মাঝখানে ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার উপর ফেনা দেখা যাইতেছে। লীলা একটু মুখ টিপিয়া কহিল, "ও কি, তুমি জান না?" কিরণ বলিল, "না।" লীলা বলিল, "ও যে জোয়ার আস্‌চে। এখনি বান ডাক্‌বে এখন। ওই চড়ায় দেখ, কেমন বান খেলায়।"

দুই জনে বসিয়া দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে জোয়ার আসিল। ঢেউগুলা ফুলিয়া ফেনা তুলিয়া ছুটিয়া আসিল। গঙ্গার মাঝখানে চড়ার উপর ঢেউয়ের আছড়ানি, তার পর চড়া ডুবিয়া গেল। কিরণ একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। ঢেউয়ের আস্ফালন বড় বেশীক্ষণ রহিল না। ভরা জোয়ার আসিল। জল স্থির অথচ কেমন চঞ্চল, কূলে কূলে পূরিয়া উঠিল। যেমন বেলা পড়িতে লাগিল, অমনি তীরবর্ত্তী গাছের ছায়া দীর্ঘ হইয়া জলে পড়িল, পাতার মধ্য দিয়া সূর্য্যকিরণ জলে পড়িয়া চিক্‌ চিক্‌ করিতে লাগিল।

দিন কয়েকের মধ্যে সুরেশচন্দ্রের জ্বর বিচ্ছেদ হইল। রাত্রে নিদ্রা হইতে লাগিল, ক্রমে ক্ষুধা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিছু দিনে উঠিয়া একটু আধটু হাঁটিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইলেন। সকালে বৈকালে বারান্দায় বসিয়া বা শুইয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া থাকিতেন।

প্রফুল্লের আনন্দের সীমা নাই। জল দেখিয়া, গাছ দেখিয়া, পাখী দেখিয়া, সে আহ্লাদে আট্‌খানা। মালী তাহাকে মাঝে মাঝে বাগানের ফল পাড়িয়া দেয়। মালীর উপর প্রফুল্লের ভক্তি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। বাগানের ফটকের পাশে একখানা খড়ো ঘরে মালী থাকে। মালীর মালিনীর পিঠে কাঁকে, কোলে, গুটি চার পাঁচ ছেলে-মেয়ে। তাহাদিগকে লইয়া সে কিছু ব্যস্ত থাকিত। প্রফুল্ল সেখানেও কিছু লাভের আশায় যাইত কিন্তু সেখানে লাভ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার হাতে কিছু থাকিলে মালীর ছেলেপুলে কাড়িয়া খাইত। প্রফুল্ল সে দিকে যাওয়া ভয়ে বন্ধ করিল। দূর হইতে দাঁড়াইয়া তাহাদের সহিত ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি করিত। কোথাও কিছু পাইলে, একটা ভারি অদ্ভুত জিনিষ পাইয়াছে মনে করিয়া, বাবা, মা, অথবা মাসীমাকে দেখাইত, তাঁহারাও সে জিনিষটা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন। কোন দিন ফুলটা, কোন দিন পাতাটা, কোন দিন হয় ত একটা নুড়ি, প্রফুল্ল রোজ রোজ একটা না একটা কিছু দেখাইবার সামগ্রী পাইত।

কিরণও বাগানে আসিয়া অনেকটা সারিল। মুখখানি আবার বেশ পুরন্ত, বেশ গোলাল হইল। মুখের হাসি আবার ফিরিয়া আসিল।

লীলাই কেবল সারিল না। সে মুখে যতই কেন হাসুক না, যতই কেন শরীরের অবস্থা গোপন করুক না, তাহার শরীর যেন দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সাবধানে থাকিত বলিয়া, কিরণ কিছু বুঝিতে পারিত না। কিরণ মনে করিত, দিদি আর কিছু দিন আমার কাছে থাকিলে সারিয়া উঠিবে। হয় ত লীলাও তাহাই মনে করিত।

এইরূপে দুই মাস গেল। সুরেশচন্দ্রের শরীর পুনরায় সবল ও সুস্থ হইল। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

শব্দশেল।

তাঁহারা ফিরিয়া আসিতেই ঠাকুরমা, কিরণ ও লীলাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। কত দিন তাহাদের দেখেন নাই। লীলাকে দেখিবার জন্য তাঁহার মন বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিল। ঠাকুরমা নিজে মনের অসুখে ছিলেন। অসুখ কিছু বুঝিতে পারিতেন, কিছু বুঝিতে পারিতেন না। যে বাড়ীতে এত কাল কাটাইয়াছিলেন, সে বাড়ী তাঁহার চক্ষে কেমন নূতন ঠেকিল। সেই স্নেহসিক্ত গৃহ যেন শুষ্ক ও স্নেহশূন্য হইয়া উঠিতেছিল। যেন সে বাড়ী নূতন হইয়া উঠিতেছিল, তিনি একমাত্র পুরাতন অবশিষ্ট ছিলেন। আর সকলে এক দিকে, তিনি যেন একা আর এক দিকে। কি ফুস্‌ফুস্ করিয়া কথা হইত, কি চোখ টিপাটিপি হইত, ঠাকুরমা তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। এই সুখের দুঃখের সংসার, পরিবার-পরিজনপূর্ণ গৃহ, ইহার ভিতর এত প্রহেলিকা, তিনি বুঝিতে পারিতেন না। পথ চলিতে যেন সিঁড়িতে পা ঠেকিত, কবাটে যেন মাথা ঠেকিয়া যাইত। আগেও ত বাড়ী এই ছিল, তবে এত পরিবর্ত্তন কোথা হইতে হইল? তখন ত কিছুই এমন রহস্যময় ছিল না। তখন কেবল হাসিখুসী, কলকোলাহল, স্নেহ, প্রেম, মমতা, বাৎসল্য গৃহের চারিদিকে বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিত। তখন সেই নিত্য কলহও যেন সেই স্নেহের অঙ্গ ছিল। কেবল এক জনের অভাবে এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ঠাকুরমার মন ঘেঁসিয়া কেবল সেই পূর্ব্বকালের দিকে যাইত। সেই জন্য লীলা ও কিরণকে দেখিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

কিরণ কিছু অনিচ্ছার সহিত আসিল। তাহার সে বাড়ীতে আসিতে আর ভাল লাগিত না। কি করে,—ঠাকুরমার কথা এড়াইতে না পারিয়া আসিল। তাহারা দুই জনে আসিয়া যখন ঠাকুরমাকে নমস্কার করিল, তখন তাঁহার চক্ষে জল আসিল। লীলার কি হইয়াছে? সে যেন আগের চেয়েও রোগা হইয়া গিয়াছে। লীলা হাসিল। ঠাকুরমার

যেমন কথা! লীলা বেশ আছে, তাহার ত কোন অসুখ করে নাই। কিরণের কাছে এত দিন ছিল, তাহাকেই কেন জিজ্ঞাসা কর না। কিরণ কহিল, "দিদি একটু রোগা, কিন্তু অসুখ ত কিছু নাই।" ঠাকুরমা তাহাদের কথায় কতক আশ্বস্ত হইলেন।

একটু পরে আনন্দময়ীর মা সেই দিকে আসিলেন। তাঁর মুখের কথাগুলি আগের চেয়েও মিষ্ট, আগের চেয়েও কাপড় বেশ গায় মাথায় ঢাকা, আগের চেয়েও হাসিটুকু মধুর। তাঁহাকে দেখিলে কে বলিবে যে, তাঁহার মনে ফেরপ্যাঁচ আছে? কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুরমা চুপ করিলেন। আনন্দময়ীর মাকে সম্মুখে দেখিয়া লীলা ও কিরণ তাঁহাকে নমস্কার করিল। তিনি হাসিমুখে তাহাদের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রফুল্ল কেমন আছে? সে বুঝি বাহিরে খেলা করিতেছে? নাতিজামাই বেশ সারিয়া উঠিয়াছেন ত? এত দিন বাড়ী যেন অন্ধকার হইয়াছিল, লীলা ও কিরণ আসিয়া আবার আলো হইল। তিনি কথা কহিতেছেন, এমন সময় প্রফুল্ল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া, বেহানের মুখে হাসি ফুটিল, তাঁহাকে আদর করিয়া কোলে করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। প্রফুল্ল বড় ভয়তরাসে বা লাজুক ছেলে নয়, কিন্তু তাঁহার কাছে গেল না। নিকটে আসিয়া কোলে করিতে উদ্যত হওয়াতে লীলার কাপড় চাপিয়া ধরিল, কিছুতে ছাড়িল না। তখন অন্য কাজ আছে বলিয়া, আনন্দময়ীর মা হাসিমুখে আর এক দিকে চলিয়া গেলেন।

আনন্দময়ীকে নমস্কার করিতে গিয়া, লীলা ও কিরণ আর এক জনকে দেখিতে পাইল। বিন্দুবাসিনী কয়েক দিন হইল ভাইয়ের বাড়ী আসিয়াছেন। নূতন গৃহিণীর কাছে তাঁহার নিতান্ত অনাদর নয়। তিনি সর্ব্বদাই আনন্দময়ীর মন রক্ষা করিতে ব্যস্ত, প্রতি পদে তাঁহার মন যোগাইয়া চলেন। যখন যেমন, তখন তেমন,—বিন্দুবাসিনীর স্বভাব এই। কিরণের মা'র আমলে তিনি যে অত তম্বী করিতেন, কারণ, তাঁহার কথায় কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারিত না। আনন্দময়ীর বেলা সেটি চলিবে না, তিনি গোড়া হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নূতন সংসারে নূতন গৃহিণীর শিকড় যেমন শক্ত হইতে লাগিল, বিন্দুবাসিনীও তেমনি নরম হইতে লাগিলেন। আনন্দময়ীর খোসামোদ তাঁহার প্রধান কর্ম্ম হইয়া উঠিল। লীলাকে বিন্দুবাসিনী সংক্ষেপে সম্ভাষণ করিলেন। কিরণের সঙ্গে গোটাকতক কথা কহিলেন।

তাহারা দুই জনে ফিরিয়া গিয়া ঠাকুরমার কাছে বসিল। ঠাকুরমার হেঁসেলের কাছে ও তাঁহার ঘরের মধ্যে যেন কতকটা স্নেহ অবশিষ্ট ছিল। মস্ত বাড়ীখানা যেন আর সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য। কথাবার্ত্তায় দিনমান গেল। সন্ধ্যার সময় লীলা একবার উঠিল। সেই সময় তাহার শরীর ও মন বড় খারাপ হইত। নিজের অবস্থা গোপন করিবার জন্য সেই সময় লীলা একান্তে নির্জ্জনে থাকিত। দুঃখের স্মৃতি লইয়া লীলা এ ঘর ও ঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিরণের মা কোথায় থাকিতেন, কোন্ ঘরে বেশী যাওয়া আসা করিতেন, কোন্ সময় কোথায় বসিতেন, সেই সব কথা লীলার মনে পড়িতে লাগিল।

প্রায় অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় লীলা একটা ঘরে প্রবেশ করিল। সে দিকে বড় একটা কেহ যাইত না। ঘরটা আনন্দময়ীর মহলে। প্রবেশ করিয়া লীলা দেখিল, ভিতরে আর একটা ঘরের দরজা ভেজান রহিয়াছে। সেই ভিতরের ঘর হইতে গলার আওয়াজ আসিতেছে। লীলা সহজেই বুঝিল, আনন্দময়ী ও বিন্দুবাসিনী কথা কহিতেছেন। লীলা অমনি বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল, কিন্তু একটা কথা তাহার কানে গেল; আর তাহার পা উঠিল না, স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিন্দুবাসিনী কথা কহিতেছিলেন। গোপনীয় কথা বলিয়াই গলা চাপা, নহিলে সেখানে আর কেহ ছিল না। লীলা যে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, সে সন্দেহ কাহারও মনে হয় নাই।

বিন্দুবাসিনী বলিতেছিলেন, "বাগানে যাবার তরে ওঁর অত মাথাব্যথা কেন? কিরণের বরের অসুখ ত ও ছুঁড়ী তাড়াতাড়ি ওদের সঙ্গে বাগানে গেল কেন?"

আনন্দময়ী। সত্যিই ত! ওর যাবার কি আবশ্যকটা ছিল?

বিন্দুবাসিনী। উনি আবার বড় ভাল! মরণ আর কি নরুণমুখীর! কিরণ যে আপনার মাথা আপনি খেয়েচে! এখন অবধি সে কিছু জানে না। কিন্তু অমন কথা কি ঢাকে? পোড়া-কপাল ওঁর!"

আনন্দময়ী। কি ঘেন্নার কথা! আমি ত কই কিছু শুনি নি। কিরণ চিরকাল অমনি বোকা, দেখেও কিছু দেখে না।

সেই সময়—পবিত্র সন্ধ্যাকালে, যখন সেই পাপ কলঙ্কের কথা হইতেছিল—সেই নির্ম্মল বিরলনক্ষত্র সন্ধ্যাকাশ হইতে লীলার মাথায়—বিন্দুবাসিনীর মাথায়—বজ্রপাত হইল না কেন?

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

শেল বিঁধিল—ফুরাইল।

সন্ধ্যার সেই অস্পষ্ট অন্ধকার যেন সহসা চন্দ্র-তারকা-শূন্য ঘোর রাত্রির মত হইয়া গেল। লীলার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চারিদিকে বিকট শব্দে যেন তাহার কর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। পৃথিবী যেন লীলার পায়ের নীচে হইতে সরিয়া গেল। ব্রহ্মাণ্ড যেন তাহার মাথার উপর চাপিতে লাগিল। সেই ভার মাথায় করিয়া লীলা যেন অন্ধকার অতলে ডুবিতে লাগিল।

লীলা কাহাকেও কিছু বলিল না। রাত্রে একা শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। তাহার চক্ষে জল আসিল না। অশ্রুর উৎস যেন শুকাইয়া গিয়াছিল। শয্যায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল। কিছু ভাবিতে পারে না—হৃদয়ে কেবল অন্ধকার, যেন তাহার বুকে কে পাষাণ চাপাইয়া রাখিয়াছিল। ক্রমে সকল কথা মনে পড়িল। সুখের নিশ্চিন্ত বাল্যকাল মনে পড়িল। সেই সব সঙ্গিনী, সেই খেলা-ধূলা সব মনে পড়িল। জগৎসংসার তখন কেবল কলকাকলিপূর্ণ, আলোক-আনন্দময় ছিল। স্বর্ণকুজ্ঝটিকাবৃত সেই শৈশবকাল স্মৃতিপথে উদিত হইল। তাহার পর বিবাহের উৎসব, নববধূর সমাদর, সংসারের প্রবেশদ্বারে নবীন কৌতুহল। সে স্বপ্ন কেমন করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল! সংসারের সে মূর্ত্তি ফিরিয়া গেল। কোথা হইতে তক্ষক আসিয়া সংসারবৃক্ষে দংশন করিল—নবপল্লবিত বৃক্ষ শুষ্ক দগ্ধ দারুকাষ্ঠের মত হইয়া গেল। এই সংসার, সুখের আশার ফল এই, এই জন্য জন্মযন্ত্রণা। বৈধব্যের সর্ব্বশূন্যতা তাহার কপালে ছিল! তখন কেন সে মরিল না? এখন মরিবার এত ইচ্ছা হইতেছে, তখন মরিলে ত অনেক যন্ত্রণা এড়াইত। কিসের আশায় সে জীবন বহন করিয়াছিল? তখন মরিলে সে জানিতে পারিত না যে, সংসারে কোথাও শান্তি আছে। এই যে আশাতিরিক্ত শান্তি পাইয়াছিল, তাহা কি ভুলিয়া যাইবে? বিধবা হইয়াই যদি সে মরিত, তাহা হইলে জানিতে পারিত না যে, সংসারে নিজের সুখ-দুঃখ ছাড়া আর কিছু আছে। পরের সুখ দেখিয়া সে নিজের দুঃখ ভুলিতে শিখিয়াছিল। এই গৃহে আসিয়া সে স্নেহের মায়া বুঝিতে পারিয়াছিল। চারিদিক হইতে যেন অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তিবলে তাহার নিজের দুঃখ তাহার হৃদয় হইতে আকৃষ্ট হইয়া বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাহার পরিবর্ত্তে যেন পরের সুখ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। সে স্বপ্ন কত শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল! অল্পে অল্পে তাহার হৃদয়ে সূচি বিদ্ধ হইতে লাগিল, তাহার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। আজ যেন তাহার হৃদয় খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছিল। সে কাহার কি ক্ষতি করিয়াছিল যে, তাহার নামে এমন ভয়ানক অপবাদ রটিল? স্বপ্নেও লীলা এমন কথা মনে করে নাই। কিরণ ও সুরেশ-চন্দ্রের প্রণয় দেখিয়া তাহার আহ্লাদ হইত, আর কিছু কখনও তাহার মনে হয় নাই। তাহার মন নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র ছিল বলিয়াই সে এমন শান্তি লাভ করিয়াছিল। তবু এমন কলঙ্ক! এমন কথা শুনিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে? আত্ম-হত্যা কি মহাপাপ? আত্মহত্যা না করিলে আর নিষ্কৃতির উপায় কি? এই অন্ধকারে—কেহ দেখিতে পাইবে না—অতি সহজ উপায়ে সকল যন্ত্রণা—

বুকে দারুণ বেদনা অনুভব করিয়া, লীলা শুইয়া পড়িল। বালিস বুকে চাপিয়া বেদনা উপশম করিবার চেষ্টা করিল। যন্ত্রণায় অস্ফুট

কাতরোক্তি করিতে লাগিল, "হে হরি! এখন যদি আমার মরণ হয়—"

ঠাকুরমা সকালে উঠিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া, লীলার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। লীলা তাঁহার আগে উঠিয়া তাঁহার সব উদ্যোগ করিয়া রাখে। আজ কেন সে এখনও উঠিল না? বোধ হয়, পথের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। সূর্য্যোদয় হইল দেখিয়া ঠাকুরমা লীলাকে ডাকিতে গেলেন। দরজা ভেজান ছিল। দরজা খুলিতে প্রভাতের কোমল সূর্য্যালোকে গৃহ আলোকিত হইল। ঠাকুরমা ডাকিলেন, "লীলা!"

লীলা উত্তর দিল না। ঠাকুরমা কাছে গিয়া, তাহাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন। সেই কোমল প্রভাত-আলোকে তরুশাখাচ্যুত কোমল পল্লবের ন্যায় লীলা শয়ন করিয়াছিল। তাহার দগ্ধপ্রায় হৃদয় কঠোর আঘাতে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। অজ্ঞাত হৃদয়মধ্যস্থিত সকল যন্ত্রণা ফুরাইল।

প্রভাত-সূর্য্যের সুবর্ণ-আলোকে সংসার হাসিতেছিল। জগতের রথচক্র যেমন ঘূরিতেছিল, তেমনি ঘর্ঘর রবে ঘূরিতে লাগিল, অনন্ত পথিমধ্যে লীলা রথচ্যুত হইয়া কোথায় পতিত হইল, কে জানিল?

সম্পূর্ণ

ব্রাহ্মণাবাদ

ও

অন্যান্য গল্প

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

ব্রাহ্মণাবাদ

বহুকাল পূর্ব্বে কচ্ছপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিমস্থিত মরুভূমির অপর পার্শ্বে ব্রাহ্মণাবাদ নামে একটি নগর ছিল। চারিদিকে মরুভূমি, নিকটে পল্লীগ্রাম কোথাও ছিল না। ব্রাহ্মণাবাদ সেই প্রদেশের রাজধানী। সে স্থলে নগর স্থাপিত হইবার কারণ এই যে, নগর-সীমার মধ্যে কয়েকটি বৃহৎ কূপ ছিল। কূপের জল তেমন মিষ্ট নয়—মিষ্ট জল সে বালুকারণ্যে জন্মায় না, কিন্তু স্বাস্থ্যকারক ও পরিমাণে প্রচুর। বহু সহস্র লোকের পানীয় সেই গভীর কূপ-সমূহে পাওয়া যাইত এবং সেই জলে উদ্যানাদিও রক্ষিত হইত। প্রথমে গ্রাম, তৎপরে নগর, তৎপরে রাজধানী হইল। আর্য্যাবর্ত্তাগত ক্ষত্রিয় রাজা।

অকূল সমুদ্রপাথারমধ্যে তাল-নারিকেল-সুপারি-বৃক্ষশোভিত প্রবালদ্বীপ যেমন জাগিয়া থাকে, অতি বিশাল মরুমধ্যে ব্রাহ্মণাবাদ সেইরূপ জাগিয়াছিল। দূরদেশাগত পথিকের বালুকা-ব্যথিত চক্ষু সেই সৌধকিরীটশালী পাদপশ্যামচ্ছায়া-শীতল নগর দেখিয়া বিস্মিত ও পরিতৃপ্ত হইত। নগরের চারি পার্শ্বে ধনীদিগের উদ্যানবাটিকা। এক প্রান্তে বৃহৎ উদ্যান-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদ, সিংহদ্বারে বর্ম্মধারী প্রহরী। রাজপথে নানা দেশের বণিক ও নাগরিকসমূহ। মধ্যে মধ্যে কূপ; সেই সকল কূপ হইতে বহুসংখ্যক নরনারী সর্ব্বদা জল তুলিতেছে। দিবাভাগে গো, মেষ মহিষাদিও রাজপথে বিচরণ করিত। রাজার নিযুক্ত শীকারিগণ সময়ে সময়ে শৃঙ্খলবদ্ধ আবৃতচক্ষু ব্যাঘ্র ও অঙ্গুষ্ঠোপবিষ্ট বাজপক্ষী লইয়া যাইত, বালকগণ কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া দূর হইতে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিত।

নগরের সীমা অতিক্রম করিলেই মরুভূমি, দিক্‌দিগন্তবিস্তৃত সাগরোর্ম্মির ন্যায় তরঙ্গায়িত বালুকারাশি। কয়েক যোজন মরুর পর হয় ত একটি কূপ; তাহার নিকটে কয়েকটি বৃক্ষ ও পান্থনিবাস। সার্থবাহ ও পথিকগণ উষ্ট্রপৃষ্ঠে যাতায়াত করিত। সে প্রদেশে একজাতীয় ক্ষুদ্র অথচ বেগবান্ অশ্ব জন্মিত, কিন্তু তাহারা বহুদূরগমনে সমর্থ নহে। মৃগয়া ও যুদ্ধকার্য্যে তাহারা ব্যবহৃত হইত।

মরুমধ্যে 'মারা' নামক একজাতি লোকের বাস। তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিত, কিন্তু নগরবাসী ক্ষত্রিয়দিগের সহিত তাহাদের আদানপ্রদান ছিল না। মৃগয়া ও গো-মহিষাদি পালন করিয়া তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তাহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। যে স্থানে অল্প বৃষ্টি হইয়াছে অথবা পশুচারণের উপযোগী কিছু তৃণ জন্মিয়াছে, সেই স্থানে তাহারা মরুজাত এক প্রকার কঠিন তৃণের কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কিছু দিন বাস করিত। মৃগয়ার জন্য সেই ক্ষুদ্রকায় অশ্ব রাখিত। সময়ে সময়ে তাহারা ঘৃত, নবনীত বা মৃগয়ালব্ধ বরাহ বা মৃগমাংস নগরে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। রমণীগণ কখন নগরে প্রবেশ করিত না। পুরুষেরা বলিষ্ঠ ও রমণীগণ পরমা সুন্দরী।

২

রাজা পিঙ্গল বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত। রাজকার্য্য হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহাতে একটা বিশেষ প্রতিবন্ধক ছিল। সেই কারণে তাঁহার শরীর ও মন আরও ভগ্ন হইয়া পড়িতেছিল। তাঁহার একমাত্র পুত্র চিত্রসেন অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ও পিতার অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। চিত্রসেনের মাতার কাল হইলে বৃদ্ধ রাজা আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই।

তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাহার কোনরূপ সংযম হয় নাই। চিত্রসেনের অত্যাচারে নগরবাসীরা উত্তক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বৃদ্ধ রাজার নিকট সর্ব্বদা নানাপ্রকার অনুযোগ উপস্থিত হইত, রাজা কখন পুত্রকে শাসন করিতেন, কখন অর্থ দিয়া অভিযোগকারীদিগকে সান্ত্বনা করিতেন। একবার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি পুত্রকে কারাগারে বদ্ধ করেন। তাহার পরই সংবাদ আসিল, রাজপুত্র অন্নজল ত্যাগ করিয়াছেন। রাজা ভয় পাইয়া তাঁহার মুক্তির আদেশ দিলেন। একমাত্র পুত্র, তাহার কিছু অনিষ্ট হইলে সিংহাসন শূন্য হয়। চিত্রসেনের সঙ্গদোষ ঘটিয়াছিল বলা বাহুল্য, নগরের কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত অত্যাচারপরায়ণ যুবক সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত। রাজা বিবেচনা করিলেন যে, যদি এক জন বিজ্ঞ পরামর্শদাতা রাজপুত্রের নিকট থাকে, তাহা হইলে সৎপরামর্শে তাহার মতি ফিরিবে; এই বিবেচনায় সেইরূপ একটি বিজ্ঞ ব্যক্তি নিযুক্ত হইলেন।

একদা সেই বিজ্ঞ ব্যক্তি রাজপুত্র ও তাঁহার বন্ধুদিগের সহিত সদালাপ করিয়া মধ্যাহ্নভোজনের পর নিদ্রিত হইলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিলেন, তাঁহার এক দিকের গুম্ফশ্মশ্রু মুণ্ডিত, শিখায় বায়সপক্ষ ঝুলিতেছে। রাজপুত্র ও তাঁহার বন্ধুগণ বৃদ্ধকে ব্যঙ্গ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ রোদন করিতে করিতে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। শুভ্রকেশ পিঙ্গল এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া প্রায় শয্যাগত হইয়াছিলেন। কয়েকমাস হইতে প্রাসাদের বাহিরে যাইতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রাসাদের ভিতরে রাজপুত্রের স্বতন্ত্র মহল ছিল, কিন্তু সে মহলে তিনি বড় একটা থাকিতেন না, কারণ, তাহাতে আমোদ-প্রমোদের ব্যাঘাত হইত। নগরপ্রান্তে তাঁহার বৃহৎ বিচিত্র প্রমোদভবন ছিল, সেইখানে বন্ধু ও পারিষদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া অধিকাংশ কাল কাটাইতেন। পিতা বৃদ্ধ ও পীড়িত বলিয়া দুই চারি দিবস অন্তর তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন; অন্তঃপুরে প্রায় যাইতেন না। চিত্রসেনের এ পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই, কিন্তু প্রথম সন্তানের সম্ভাবনা হইয়াছে জানিয়া রাজান্তঃপুরে হর্ষ ও আনন্দ উপস্থিত হইয়াছিল। বৃদ্ধ রাজা জরাগ্রস্ত হইয়াও সর্ব্বদা পুত্রবধূর সংবাদ লইতেন এবং কিসে তিনি সুখে থাকেন, সেই চেষ্টা করিতেন। চিত্রসেন মনে করিতেন, বৃদ্ধ রাজা পৌত্রের মুখদর্শন আশায় আনন্দিত হইয়াছেন। বৃদ্ধ রাজার মনে যে আর একটা গভীর কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল, প্রমোদোন্মত্ত রাজপুত্র তাহার কোন সংবাদ রাখিতেন না।

৩

যুবরাজ চিত্রসেন এক দিন প্রভাতে মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন। সঙ্গে প্রায় বিংশতি জন বন্ধু, সকলের হস্তে বাজপক্ষী। রাজপুত্র মৃগয়ায় গমন করিলে তাঁহার নিকট বধ্য অবধ্য কিছু বিচার ছিল না, অনেক সময় তাঁহার হস্তে পালিত পশুপক্ষীও নিহত হইত। তদ্ব্যতীত অপর প্রকার অত্যাচার হইতেও তিনি বিরত হইতেন না। নগর হইতে প্রায় দশ ক্রোশ দূরে একটি ক্ষুদ্র পান্থনিবাস। সেই স্থানে কয়েকটি পারাবত উড়িতেছিল। পারাবতগুলি পালিত, কিন্তু রাজপুত্র তাহা জানিয়াও হস্তস্থিত বাজপক্ষীকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার দেখাদেখি আরও কয়েক জন মুখে এক প্রকার শব্দ করিয়া বাজ ছাড়িয়া দিল। শ্যেনগণ আকাশে উঠিয়া একবার ঘুরিয়া কপোতদিগকে লক্ষ্য করিয়া তীরবেগে সেই দিকে ধাবমান হইল। রাজপুত্র ও তাঁহার সঙ্গিগণও সেই অভিমুখে বেগে অশ্বচালনা করিলেন। শত্রু দেখিয়াই পারাবতগুলির মধ্যে কতকগুলি বৃক্ষের ও কতকগুলি গৃহের আশ্রয় হইল; কেবল একটি পক্ষী দলভ্রষ্ট হইয়া আকাশে উঠিল। রাজপুত্রের বাজ তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল, অপরগুলি স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া আসিল। পারাবত মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আকাশে উঠিতে লাগিল, চক্রের পরিধি ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। চক্রের উপর চক্র, ক্ষুদ্র চক্র, বৃহৎ চক্র, তৎপরে বৃহত্তর চক্র। নীচে হইতে বাজ সেইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পক্ষসঞ্চালনের অপূর্ব্ব কৌশলে উপরে উঠিতে লাগিল। রাজপুত্র ও তাঁহার সঙ্গিগণ তাহাই দেখিতে দেখিতে হস্ত-সঙ্কেতে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের এরূপ

জন্মিয়াছিল যে, বাজ ও পারাবত কোথায় পতিত হইবে, বুঝিতে পারিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইতেন।

রাজপুত্র ও তাঁহার সঙ্গিগণের অজ্ঞাতে আর এক জন সেই দৃশ্য দেখিতেছিল। পান্থনিবাসের অনতিদূরে এক দল মারা-জাতি সম্প্রতি বাস করিতেছিল। পান্থনিবাসের কূপ হইতে একটি মারা-রমণী জল আনিতে গিয়াছিল। জল তুলিয়া সে ফিরিতেছে, এমন সময় আকাশে বাজ ও পারাবত দেখিতে পাইল। বাল্যাবধি সকল প্রকার মৃগয়া দেখা তাহার অভ্যাস, এ জন্য সেই মারাকন্যা জলপাত্র রাখিয়া পক্ষি-দ্বয়কে দেখিতে লাগিল। ক্রমশঃ পারাবতকে নীচে রাখিয়া বাজ পক্ষী আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল; ঊর্দ্ধে উঠিয়া, বিস্তারিত পক্ষদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া উল্কাবেগে পারাবতের উপর পতিত হইল। পারাবতও প্রাণভয়ে বেগে ধরণী অভিমুখে পতিত হইল। শ্যেনের আক্রমণের নিমেষার্দ্ধ অথবা তদপেক্ষা স্বল্পকালমধ্যেই তাহার নখ পারাবতের পক্ষে লাগিল, চারিদিকে পক্ষলোম বিকীর্ণ হইল, কিন্তু শরীরে নখ বিদ্ধ হইল না। পারাবতটি ঊর্দ্ধনয়না মারা-কন্যার চরণতলে পতিত হইল। রমণী তাহাকে আপনার হস্তে উঠাইয়া লইল।

সচরাচর বাজপক্ষী একবার ব্যতীত দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে না, কিন্তু চিত্রসেনের শিক্ষা অন্যরূপ; একবার শীকার পাইলে তিনি তাহাকে ছাড়িতেন না। মারা-কন্যা যখন মস্তক অবনত করিয়া পারাবতকে উঠাইতেছিল, সেই সময় বাজ দ্বিতীয়বার আক্রমণ করিল। এবার তাহার নখ রমণীর মস্তকাবরণ অঞ্চলে জড়িত হইয়া গেল। তাহার পর রমণীর তাড়নায় বাজ উড়িয়া গেল, কিন্তু মস্তকের অঞ্চল স্রস্ত হইল। সুতরাং যখন পারাবত-হস্তে রমণী মস্তক উত্তোলন করিল, তখন আর তাহার মুখচন্দ্রমায় কোন আবরণ রহিল না। রমণী দেখিল, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি অশ্বারোহী তাহাকে বিস্মিত আকাঙ্ক্ষা-লোলুপ নয়নে দেখিতেছে।

বাজ উড়িয়া গিয়া সেই অশ্বারোহীর হস্তে উপবেশন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অশ্বারোহী তাহাকে তাড়াইয়া দিয়া পশ্চাতে কাহাকে সঙ্কেত করিল, সে ব্যক্তি বাজকে ডাকিয়া লইল।

রমণী মুখে অবগুণ্ঠন দিল না; সে কালে অবগুণ্ঠনের প্রথা ছিল না; কিন্তু মস্তকে অঞ্চল টানিয়া দিল এবং এরূপ ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল—যাহাতে অশ্বারোহী তাহার মুখ দেখিতে না পায়। অশ্বারোহীর দৃষ্টিতে তাহার নারী-জনোচিত লজ্জায় অত্যন্ত আঘাত লাগিতেছিল।

অশ্বারোহী রাজপুত্র। তিনি হাসিয়া কহিলেন, "পারাবতকে ছাড়িয়া দাও, যখন তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তখন উহার আর কোনও ভয় নাই।"

মারা-কন্যা কিঞ্চিৎ পরুষকণ্ঠে কহিল, "পালিত পক্ষীকে বধ করা কি শীকারীর কর্ত্তব্য?"

রাজপুত্র আবার হাসিয়া কহিলেন, "আমি অপরাধ স্বীকার করিতেছি। আমার ভ্রম হইয়াছিল। ভবিষ্যতে আমি বন্য জীব শীকার করিব।"

মারা-কন্যা পারাবতকে উড়াইয়া দিয়া, আর কোন কথা না কহিয়া জল লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইবামাত্র রাজপুত্রের অশ্ব যেন আপনি ফিরিয়া তাহার পথরোধ করিল। রাজপুত্র কহিলেন, "আমি তৃষ্ণার কাতর, আমাকে জল দাও।"

রমণী কহিল, "আপনার অনুচরদিগকে আজ্ঞা করুন।" অশ্বারোহী যে ধনবান্ ব্যক্তি, রমণী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল।

রাজপুত্র কহিলেন, "তোমার নিকট তৃষিতের পানীয় ভিক্ষা করিতেছি। তোমার হস্তে পূর্ণ কুম্ভ; জাতিতে আমি ক্ষত্রিয়, আমাকে পানীয় জল প্রদান কর।"

রমণী পূর্ণকুম্ভ মাটীতে নামাইয়া রাখিল, কহিল, "পান করুন।"

রাজপুত্র মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "অশ্ব চঞ্চল, অশ্বপৃষ্ঠ ত্যাগ করিতে পারিব না। অঞ্জলিতে জল ঢালিয়া দাও, পান করি।" এই বলিয়া জলের জন্য তিনি পুটাঞ্জলি প্রসারিত করিলেন। রমণী জলাধার হইতে জল ঢালিয়া দিতে উদ্যত হইল।

চিত্রসেন বামহস্তের দ্বারা যুবতীর কটিদেশ ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে জলপাত্র লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে দুই হস্তে তাহাকে ধরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে

তুলিয়া লইলেন। বাজপক্ষী যেরূপ পারাবতকে আক্রমণ করিয়াছিল, ইহাও সেইরূপ আক্রমণ; কিন্তু বাজপক্ষী অপেক্ষা এই শীকারী অভ্রান্ত। শ্যেন-পক্ষী শূন্য-নখরে ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া গেল, চিত্রসেন পূর্ণকাম হইয়া অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। বিংশতি অশ্বারোহী হর্ষকোলাহল করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল।

মারা-কন্যা প্রথমে চীৎকার করিল না, রাজপুত্রের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে বল প্রকাশ করিতে লাগিল। চিত্রসেন তাহার শারীরিক বল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ব্রাহ্মণাবাদে রাজ-পুত্রের তুল্য বলবান্ পুরুষ ছিল না, কিন্তু তিনিও রমণীকে সহজে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। দুই একবার তাঁহার অশ্বচ্যুত হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে অশ্বল্গা ত্যাগ করিয়া তিনি রমণীকে এরূপ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিলেন যে, তাহার হস্ত-সঞ্চালনের ক্ষমতা রহিল না। সেই অবস্থায় সকলের সম্মুখে বলপূর্ব্বক তিনি তাহার মুখচুম্বন করিলেন। তখন রমণী আর্ত্তস্বরে বার বার চীৎকার করিয়া উঠিল।

মারা-যুবকেরা কতক মৃগয়ায়, কতক বা নগরে মৃগ বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। কয়েক জন বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকেরা কুটীর হইতে দৌড়িয়া আসিল। যে দুই চারি জন যুবক গৃহে ছিল, তাহারা অশ্ব-পৃষ্ঠস্থ রাজপুত্রকে আক্রমণ করিল। বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকেরা কিছু দূর ধাবিত হইয়া পিছাইয়া পড়িল, যুবকেরা রাজপুত্রের অনুচরবর্গের নিকট আহত ও পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া গেল। মারা-কন্যা পলায়নের জন্য বল প্রকাশ করিতেছিল, কিন্তু রাজপুত্রের কঠিন বাহুবন্ধনে সে ক্রমশঃ হীনবল ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল।

অনুচরবর্গ হাস্য-বিদ্রূপ করিতে করিতে রাজ-পুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল। এক জন বলিল, "বাজ শীকার করিতে পারিল না, কিন্তু রাজ-পুত্র উত্তম শীকার করিয়াছেন। অনেক দিন এমন শীকার হয় নাই।"

রাজপুত্র হাসিয়া মারা-কন্যাকে বলিতেছিলেন, "তোমারই কথামত পালিত পশুকে শীকার করি নাই। তুমি বন্যমৃগী, তোমাকে ধরা শীকারীর কর্ত্তব্য কাজ।"

মারা-কন্যা নিরুত্তর রহিল। পরিশেষে লজ্জা-ক্রোধ-রুদ্ধ স্বরে কহিল, "বন্যপশুই আবার ব্যাধের মৃত্যুর কারণ হয়।"

রাজপুত্র হাস্য করিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "তুমি দয়া না করিলে মরিব বটে, কিন্তু তোমার অস্ত্রে মরিব না।"

রাজপুত্র মারা-কন্যার মুখ আবার ফিরাই-বার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে বস্ত্রমধ্যে মুখ লুকাইল। রাজপুত্র তখন আর বলপ্রকাশ করিলেন না।

নগর অনতিদূরবর্ত্তী হইলে চিত্রসেন প্রমোদ-ভবনের অভিমুখে অশ্বচালনা করিলেন, পথে রাজ-পুরোহিত পুষ্পমাল্যহস্তে গমন করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মারা-কন্যা চীৎকার করিয়া কহিল, "এই দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করুন। আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজপুত্রের পথরোধ করিয়া কহিলেন, "আবার কাহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ? স্ত্রীলোকের প্রতি বলপ্রয়োগ করিলে নরকেও তোমার স্থান হইবে না!"

চিত্রসেন ক্রোধে আরক্তচক্ষু হইয়া কশা উত্তোলন করিলেন, উদ্ধতস্বরে কহিলেন, "তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, না হইলে তোমাকে কশাঘাতে শিক্ষা দিতাম। আমার যাহা ইচ্ছা হয় করিব, তুমি বাধা দিবার কে?" রাজপুত্র অপর দিকে অশ্বচালনা করিলেন।

সেই শ্বেত-শ্মশ্রু সংযমকৃশ ব্রাহ্মণ হস্ত উত্তোলন করিয়া মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "আমি না পারি, দুষ্টের শাসনকর্ত্তা আর এক জন আছেন। তোমার পাপে তোমার বংশ ধ্বংস হইবে, ব্রাহ্মণাবাদ আবার মরু-ভূমি হইবে।"

সেই অভিশাপ শ্রবণ করিয়া মারা-কন্যা উন্মা-দিনীর ন্যায় বিকটস্বরে কহিল, "এই পাপি-ষ্ঠের ধ্বংস হইবে, ব্রাহ্মণাবাদ আবার মরুভূমি হইবে!"

চিত্রসেন পাপিষ্ঠের কঠোর হাসি হাসিলেন; কহিলেন, "হউক, আজ রাত্রে ত নহে।"

৪

অপরাহ্ণে পঞ্চবিংশতি অশ্বারোহী মারা-যুবক রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে সমবেত হইল। সকলেই সশস্ত্র, সকলের মুখে দুর্জ্জয় ক্রোধ ও দারুণ যন্ত্রণার চিহ্ন।

কয়েক জন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া রাজ-দর্শন প্রার্থনা করিল। প্রহরীরা বর্শায় বর্শা সংযুক্ত করিয়া তাহাদের পথরোধ করিল। কহিল, "মহারাজ পীড়িত, তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে না। তোমাদের কি অভিযোগ?"

প্রবীণ বয়স্ক এক ব্যক্তি মারাদিগের নেতা। সে কহিল, "আমাদিগের অভিযোগ শুনিয়া তোমাদের কি হইবে? অন্য প্রান্তে এক ব্যক্তি অনুচরবর্গ লইয়া তস্করের মত আমাদের যুবতী কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে। আমরা কেহ সে সময়ে উপস্থিত ছিলাম না। নগরে আসিয়া শুনিলাম, তস্কর স্বয়ং যুবরাজ। রাজদ্বারে প্রতীকারের জন্য আমরা আসিয়াছি। কন্যাকে রাজপুত্র প্রত্যর্পণ করুন। আর রাজার মুখে আমরা শুনিতে চাই যে, রাজপুত্র এমন অপরাধ করিলে তাঁহার কোন শাস্তি আছে কি না?"

প্রহরীরা পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া স্মিতাস্য হইল। রাজপুত্রের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ কি আজ নূতন? যে প্রহরী পূর্ব্বে কথা কহিয়াছিল, সে বলিল, "রাজপুত্রের বিচার কে করিবে? বৃদ্ধ রাজার কঠিন পীড়া, কখন্ কি হয়, বলা যায় না। রাজ্য সম্বন্ধে কোন কথা তাঁহার নিকট নিবেদন করিবার উপায় নাই।"

"তাহা হইলে কি রাজ্য অরাজক হইল?" মারা-দলপতি ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

"যুবরাজ থাকিতে কি রাজ্য অরাজক হয়? রাজা অক্ষম হইলে বা তাঁহার অবর্ত্তমানে রাজপুত্রই রাজা।"

"তবে আমরা কাহার নিকট যাইব?"

প্রহরী বলিল, "এখন সকল অভিযোগ যুবরাজ শ্রবণ করিবেন।"

মারা আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কহিল, "আমাদিগকে কি বিদ্রূপ করিতেছ? যে অপরাধী, সেই নিজের বিচার করিবে? যে তস্কর, তাহার নিকট অপহৃত সামগ্রী চাহিব?"

অপর কয়েক জন মারা-যুবক বলিল, "তাহাই স্বীকার, আমরা যুবরাজকেই সকল কথা বলিব। কোথায় তিনি?"

তখন প্রহরী সাবধানে কথা কহিতে লাগিল। বলিল, "তাহা জানি না।"

"সে কেমন কথা? রাজা পীড়িত, যুবরাজ কোথায়, কেহ জানে না। তবে অভিযোগ শুনিবে কে?"

প্রহরী কহিল, "আমরা সৈনিক, রাজমন্ত্রী নাই। আমাদের প্রতি আদেশ—প্রাসাদে কেহ প্রবেশ করিতে পাইবে না। অন্য সংবাদ আমরা রাখি না।"

এমন সময় প্রাসাদের অন্তঃপুরে বহুতর শঙ্খ একত্র বাজিয়া উঠিল। এক জন ভৃত্য দ্রুতবেগে আসিয়া সংবাদ দিল, শুভক্ষণে যুবরাজের পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। প্রহরীরা অত্যন্ত আনন্দ-প্রকাশ করিতে লাগিল।

এক জন মারা-যুবক বলিল, "তাহা হইলে পাপিষ্ঠ এই স্থানেই আছে।" এই বলিয়া সে সম্মুখের প্রহরীর বক্ষে অসি বিদ্ধ করিল। আর কোন কথা বা চিন্তার বিলম্ব সহিল না। মারাগণ অশ্ব ত্যাগ করিয়া সিংহদ্বারে প্রবেশ করিল। প্রহরীরা অল্পসংখ্যক; মারাগণ সিংহবিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। প্রহরীরা সিংহদ্বার ছাড়িয়া প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে হটিতে লাগিল। ভৃত্য ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া সংবাদ দিল, দস্যু প্রাসাদ লুঠ করিতে আসিয়াছে। সিংহদ্বারে প্রহরীরা নিহত হইয়াছে। তখন প্রাসাদ হইতে অপরাপর প্রহরী ও সৈনিক অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বাহির হইতে লাগিল।

মারাগণ প্রাঙ্গণে উপনীত হইতেই বহিঃপ্রাসাদ হইতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। মারা ও প্রহরী যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে শব্দ উঠিল যে, বৃদ্ধ রাজা পিঙ্গল মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে অপর প্রহরী ও সৈনিকগণ আসিয়া পৌঁছিল। অতঃপর মারাগণ বিনাযুদ্ধে বন্দী হইল।

৫

প্রমোদভবনে একটি উৎকৃষ্ট সজ্জিত প্রকোষ্ঠে চিত্রসেন ও মারা-কন্যা। তৃতীয় ব্যক্তি নাই। মারা-কন্যা এখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। মুখে আত্মরক্ষার দৃঢ় ভাব। রাজপুত্র কথা কহিবার পূর্ব্বেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

হাসিলেও রাজপুত্রের মুখে নৃশংসতার ভাব বিলুপ্ত হইল না। তিনি হাসিয়া কহিলেন, "আমি চিত্রসেন!"

সন্দিগ্ধার ন্যায় মায়া-কন্যা জিজ্ঞাসা করিল, "যুবরাজ?"

"লোকে তাহাই বলে।" যুবরাজের কণ্ঠস্বরে শ্লেষভাব।

সহসা মায়া-কন্যার চক্ষুতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র ঘৃণার স্বরে সে কহিল, "তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাই আমার ভ্রম। ব্রাহ্মণাবাদের যুবরাজ না হইলে রমণীর প্রতি আর কে এরূপ অত্যাচার করিবে?"

যুবরাজ যুক্তকরে ব্যঙ্গ করিয়া বহিলেন, "আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা কর। এখন দাসের প্রতি প্রসন্ন হও। ব্রাহ্মণাবাদের যুবরাজের প্রতি সকল রমণী কঠিন হয় না।"

মায়াকন্যা কহিল, "আমি মরুবাসিনী দরিদ্রা রমণী, রাজপুত্রের উপপত্নী হইবার ইচ্ছা নাই। আর তুমি"—রমণীর চক্ষু আবার জ্বলিয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর ক্রোধে ও ঘৃণায় পূর্ণ হইল—"রাজকুল-কলঙ্ক, ক্ষত্রিয়কলঙ্ক, পশুর অধম! তোমার মুখ দেখিলে পাপ হয়! যদি মঙ্গল চাও ত আমাকে এখনই মুক্ত করিয়া দাও!"

চিত্রসেন আনন্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "প্রেয়সী, তোমার মত রূপ আমি কখনও দেখি নাই। নগরে এ তেজোদর্প কোথা হইতে আসিবে? তোমার মত বন্য-হরিণীকে বদ্ধ করিতে পারিলেই যথার্থ সুখ।" তিনি মায়া-কন্যার হস্ত ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন।

হস্ত স্পৃষ্ট হইবামাত্র মায়া-কন্যা হস্ত মুক্ত করিয়া হস্তবলম্বিত কঙ্কণ দ্বারা সবলে যুবরাজের ললাটে আঘাত করিল। চিত্রসেনের ললাটে রক্তপাত হইল। রক্ত দেখিয়া যুবরাজের প্রেম অন্তর্হিত হইল, ক্রোধে ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল। কটিতে অসি ছিল না, ছুরী ছিল। ছুরী বাহির করিয়া কহিলেন, "তুমি ইতরজাতি কাঙ্গালকন্যা, তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা!" মায়া-কন্যার বক্ষে ছুরী বিদ্ধ করিবার অভিলাষে যুবরাজ এক পদ অগ্রসর হইলেন।

এবার মায়া-কন্যা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিল না, উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। কহিল, "তোমার শোণিতের কাঙ্গাল, তোমার প্রেমের কাঙ্গাল নহি!"

চিত্রসেন ছুরী নামাইলেন। কহিলেন, "তোমাকে হত্যা করিলে তোমার কি শাস্তি হইবে? সে ত মূর্খের কাজ! প্রেয়সী! হাঃ হাঃ হাঃ! রাক্ষসি! তোমার এমন দশা করিব যে, তোমার কথা শুনিয়া দেশশুদ্ধ লোক শিহরিয়া উঠিবে।" চিত্রসেন হস্তস্থিত ছুরী দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

দ্বারে আঘাত হইল। প্রথমে মৃদু মৃদু, তাহার পর সবলে দ্বারে করাঘাত হইল। এ কক্ষে কেহ কখন যুবরাজকে ডাকিতে আসিত না—নিষেধ ছিল। তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, কাহার এত সাহস? ক্রোধে চিত্রসেন কাঁপিতেছিলেন; হস্ত দ্বারা ললাট-শোণিত মোচন পূর্ব্বক দ্বার মুক্ত করিয়া বাহিরে গমন করিলেন। গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "কে আমার আজ্ঞা বিস্মৃত হইয়াছে?"

রাজপ্রাসাদের এক জন প্রাচীন অনুচর ও তাহার পার্শ্বে প্রমোদ-ভবনের এক জন প্রতিহারী। অনুচর কহিল, "জয় যুবরাজ! শুভক্ষণে যুবরাজের পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।"

যুবরাজ মুখ বিকৃতি করিলেন। কহিলেন, "এই সংবাদ দিবার জন্য কি আমাকে বিশ্রাম-গৃহেও বিরক্ত করিতে হইবে?"

প্রমোদ-গৃহের অপেক্ষা বিশ্রাম-গৃহ শ্রুতি-মধুর!

অনুচর ও প্রতিহারী মলিনমুখে ফিরিল। যুবরাজ পুনবায় গৃহে প্রবেশ করিতেছেন, সেই সময় রাজপ্রসাদ হইতে দ্বিতীয় অনুচর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে যুবরাজের প্রিয় বন্ধু অশোক। অনুচর সাশ্রু-নয়ন, অশোক অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি?"

অনুচর রোদন করিয়া কহিল, "মহারাজ—বৃদ্ধ মহারাজ"—তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

চিত্রসেন বুঝিলেন; তথাপি স্পষ্ট সংবাদ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অশোকের প্রতি প্রশ্নকটাক্ষ করিলেন। অশোক কহিলেন, "মহারাজ—এইমাত্র মহারাজ পিঙ্গল ব[illegible]রোহণ করিয়াছেন।" চিত্রসেন

মস্তক অবনত করিয়া মৌন হইলেন। অশোক অনুচরকে বিদায় হইতে ইঙ্গিত করিলে সে চলিয়া গেল।

অশোক কহিলেন, "মহারাজ, এ শোকের সময় নহে। নব রাজকুমারের জন্ম ও বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু, এই যুগ্ম সংবাদ আপনার পক্ষে সাতিশয় বিপজ্জনক। বিপত্তিকে বিনাশ করিয়া পুরুষকারের পরিচয় দিউন।"

অশোক চিত্রসেনের বিলাসিতার বন্ধুমাত্র নহেন; তিনি রাজধর্ম্মে ব্যুৎপন্ন এবং বহু দূরদর্শী। চিত্রসেন তাহা জানিতেন। কহিলেন, "তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি বিশ্রামাগার হইতে আসিতেছি।"

অশোক কহিলেন, "মহারাজ, এই বিশ্রামাগার তাহা হইলে আপনার কারাগার কিংবা বধাগার হইবে। আমার বক্তব্য শুনিয়া পরে ইচ্ছা হয় বিশ্রামাগারে গমন করিবেন।"

চিত্রসেন কহিলেন, "তবে আমার সঙ্গে আইস।" বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অশোকের সহিত চিত্রসেন কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ হইল দেখিয়া মায়াকন্যা অল্প হাসিয়া চিত্রসেনের পরিত্যক্ত ছুরী স্বীয় বস্ত্রমধ্যে গোপন করিল।

৬

কক্ষান্তরে যাইয়া চিত্রসেন অশোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতার দেহান্ত হইয়াছে, আমাকে রাজপ্রাসাদে যাইতে হইবে। তুমি বিপদের কথা কি বলিতেছ?"

অশোক কহিলেন, "মহারাজ, স্বর্গত মহারাজ আপনার প্রতি বিরক্ত ছিলেন, আপনি জানেন। তিনি মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রভৃতির সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে যদি আপনার পুত্রসন্তান হয়, তাহা হইলে তাঁহার অবর্ত্তমানে আপনার পুত্র রাজা হইবেন এবং যত কাল তিনি যৌবনপ্রাপ্ত না হন, তত দিন মন্ত্রী রাজ্যশাসন করিবেন। বৃদ্ধ মহারাজ স্থির করিয়াছিলেন যে, আপনি রাজ্যপালনে অক্ষম। আপনার প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ। আপনার প্রতি মন্ত্রী ও আর সকলের যেরূপ বিদ্বেষ, তাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে আপনাকে হত্যা করিতে পারে।"

চিত্রসেন কহিলেন, "কাহার সাধ্য আমাকে স্পর্শ করে?"

অশোক কহিলেন, "বৃদ্ধ মহারাজের আদেশমত আপনি ধৃত হইবেন। আদেশ তাম্রফলকে ক্ষোদিত আছে।"

"তবে উপায়? আপনার রাজ্য আপনি ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব?"

"কাপুরুষের ন্যায় পরামর্শ আমি দিব না। নবকুমারের জন্ম ও বৃদ্ধ মহারাজের মৃত্যু একত্র ঘটাতে আমার বিবেচনায় মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি সকলে কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারে নাই। বৃদ্ধ মহারাজের অনুশাসনপত্র কাহারও বিদিত নাই। এখনও সকলের চক্ষুতে আপনি রাজা। শত্রুকে মন্ত্রণা করিবার অবসর না দিয়া আপনি সিংহাসন গ্রহণ করুন।"

"কি করিব?"

"মন্ত্রী ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করুন, আমরা আপনার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত। কিন্তু কালবিলম্ব করিলে রক্ষা নাই।"

চিত্রসেন কহিলেন, "আইস!" এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া মায়া-কন্যাকে সাবধানে রাখিতে আদেশ করিলেন।

অশোক একাকী আসেন নাই, তাঁহার কয়েক জন বন্ধু যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। প্রমোদভবনে কয়েক জন প্রহরী ছিল। পথে অপর বন্ধুগণ আসিয়া জুটিল। রাজপ্রাসাদে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে পঞ্চাশ জন যুদ্ধবিশারদ অশ্বারোহী আসিয়া চিত্রসেনকে বেষ্টন করিয়া চলিল। সিংহদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অশোক চিত্রসেনকে জনান্তিকে কহিলেন, "আমি অগ্রে যাইতেছি। যদি আমাকে সিংহদ্বারে প্রবেশ করিতে দেখেন, তাহা হইলে আপনিও প্রবেশ করিবেন।"

চিত্রসেন কটাক্ষে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তিনি দুর্ব্বৃত্ত, কিন্তু ভীত কাপুরুষ নহেন। উপস্থিত বিপদের উত্তেজনায় তাঁহার ধমনীতে শোণিত রণোল্লাসে নৃত্য করিতেছিল।

অশোক একাকী অগ্রসর হইয়া প্রহরীদিগকে জানাইলেন, "মহারাজ চিত্রসেন!"

শ্রবণমাত্র প্রহরীরা বর্শাফলক ভূতলে স্পর্শ করিয়া একবাক্যে অভিবাদন করিল, "জয় মহারাজ!"

অশোক সিংহদ্বারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ চিত্রসেন-প্রমুখ পঞ্চাশ অশ্বারোহী অসি-বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক অশ্বসজ্জার ঝঞ্ঝনা-রবে দিক মুখরিত করিয়া প্রবেশ করিল। চিত্রসেন প্রহরী-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রী কোথায়?"

"মহারাজ, মন্ত্রী প্রাসাদেই আছেন!"

"কোন্ প্রকোষ্ঠে?"

"মন্ত্রণা-গৃহে।"

"সেনাপতি?"

"মহারাজ, তিনি মন্ত্রীর সঙ্গে আছেন।"

"আর কে কে আছেন?"

"কোষাধ্যক্ষ, নগররক্ষক প্রভৃতি সকলেই আছেন।"

"সর্ব্বশুদ্ধ কয় জন?"

"মহারাজ, ত্রিশ চল্লিশ জন হইবে।"

মন্ত্রণাগৃহ প্রাসাদের সংলগ্ন, কিন্তু প্রাসাদ হইতে স্বতন্ত্র। অশ্বারোহীদিগকে লইয়া চিত্রসেন সেই দিকে চলিলেন।

৭

মন্ত্রণাগৃহে মন্ত্রীর আহ্বানে চল্লিশ জন প্রধান কর্ম্ম-চারী সমবেত হইয়াছিলেন। গৃহের দ্বার রুদ্ধ ছিল।

মন্ত্রী কহিলেন, "স্বর্গগত মহারাজের ইচ্ছা আপনারা সকলে অবগত আছেন।

সকলে অবগত ছিলেন না। মন্ত্রী সকল কথা বলিলেন; তাম্রলিপি বাহির করিয়া দেখাই-লেন; কহিলেন, "যুবরাজ চিত্রসেনের প্রতি মহারাজের অপ্রসন্নতার কারণ আপনারা বিদিত আছেন, অতএব সে বিষয়ে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।"

চিত্রসেনের চরিত্র সকলেই জানিত, তথাপি নানারূপ তর্ক উঠিতে লাগিল। যাঁহারা বিজ্ঞ, তাঁহারা নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

যুবরাজকে অতিক্রম করিয়া কি তাঁহার সদ্যো-জাত পুত্রকে রাজা করা যায়? ইহা কি শাস্ত্রসঙ্গত? চিত্রসেনকে কারারুদ্ধ করিলে রাজ্যের মঙ্গল, কিন্তু প্রজারা কোনরূপ বিভ্রাট উপস্থিত করিবে না ত? এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডায় সময় নষ্ট হইতে লাগিল।

অবশেষে জনৈক অল্পবয়স্ক কর্ম্মচারী বেগের সহিত কহিলেন, "এ সকল কথা গোপন করা যায় না। যুবরাজের বন্ধুগণ গুপ্তচর। তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেও তাঁহার হস্ত হইতে আমাদের নিস্তার নাই। এক্ষণে আত্মরক্ষার্থ তাঁহাকে বন্দী করিতে হইবে। তাহার পর বিবেচনার অবকাশ হইবে। বৃথা বিচারে কালক্ষেপ করা উচিত নহে।"

মন্ত্রী স্থবির। মন্ত্রণায় যেরূপ দক্ষ, কর্ম্মে তিনি সেরূপ তৎপর নহেন। কহিলেন, "যথার্থ কথা! নব রাজকুমারের জন্ম ও মহারাজের লোকান্তর-গমন যুগপৎ দুই ঘটনা হওয়াতে আমরা বিচলিত হইয়াছি। সেনাপতি! তুমি সৈন্যবল লইয়া শীঘ্র যুবরাজকে বন্দী করিয়া তাঁহাকে দুর্গপ্রাসাদে অবরুদ্ধ কর।"

সেনাপতি একমনে শ্রবণ করিতেছিলেন। সস্মিতমুখে তিনি কহিলেন, "যুবরাজকে বন্দী করিবার আদেশ পূর্ব্বে দেন নাই কেন? আর কি তাহাকে বন্দী করিবার সময় আছে?"

গৃহের বাহিরে অশ্বের পদশব্দ ও কোষমুক্ত অসির ঝনৎকার! এক জন কর্ম্মচারী একটা গবাক্ষ মুক্ত করিয়া পুনরায় সত্বর রুদ্ধ করিলেন। তাঁহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। শুষ্ককণ্ঠে তিনি কহিলেন, "যুবরাজ শত শত সৈন্য লইয়া মন্ত্রণাগৃহ বেষ্টন করিতেছেন!"

অনেকে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কয়েকজন বিজ্ঞ ব্যক্তি কহিলেন, "আমরা যুবরাজের শরণাপন্ন হই। তাঁহার বিরুদ্ধে আমরা মন্ত্রণা করি নাই।"

সেনাপতি হাসিয়া কহিলেন, "অসাধুর সঙ্গে আপনারা কিরূপে সাধু প্রতিপন্ন হইবেন?"

ততক্ষণ চিত্রসেন অসিমুষ্টি দ্বারা বারংবার দ্বারে আঘাত করিতেছিলেন; মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছিলেন, "অবিলম্বে দ্বার মুক্ত কর।" বিলম্ব দেখিয়া পদাঘাতে দ্বার মুক্ত করিলেন।

মন্ত্রী গাত্রোত্থান করিয়া চিত্রসেনকে তাম্রলিপি দেখাইলেন। অবিচলিত ধীরস্বরে কহিলেন, "যুবরাজ, আমাদের অপরাধ নাই। আমরা মহারাজের আজ্ঞা পালন করিতেছি। এই দেখুন।"

'মহারাজ কে? আমি মহারাজ! এক খণ্ড তাম্রপত্র লইয়া তোমরা—শৃগালের দল—সিংহকে তাহার সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিবে?" চিত্রসেন তাম্রফলক লইয়া পদতলে দলিত করিলেন; তৎপরে অসি দ্বারা মন্ত্রীর শিরশ্ছেদন করিলেন।

কর্ম্মচারিগণ তখন বুঝিতে পারিলেন যে, মৃত্যু ব্যতীত তাঁহাদের গত্যন্তর নাই। কয়েক জন মিলিত হইয়া একত্রে চিত্রসেনকে আক্রমণ করিলেন। অশোক ও আর কয়েক জন চিত্রসেনের সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সেনাপতিকে চিত্রসেন স্বহস্তে বধ করিলেন। চিত্রসেনের কয়েক জন অনুচর আহত ও নিহত হইল, কিন্তু মন্ত্রণাকারীদিগের এক ব্যক্তি জীবিত রহিল না।

৮

তথাপি চিত্রসেন সে রাত্রে প্রমোদভবনে ফিরিতে পারিলেন না। মহারাজ পিঙ্গলের চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে অনেক রাত্রি হইল। তৎপরে চিত্রসেন প্রমোদভবনে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া অশোক করপুটে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আজ রাত্রে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যাইবেন না।"

চিত্রসেন কহিলেন, "কেন, এখানে আমার আর কি প্রয়োজন?"

অশোক কহিলেন, "মহারাজ, সিংহাসন শূন্য নাই সত্য, কিন্তু সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্ব শূন্য। কে মন্ত্রী, কে সেনাপতি, কে কোষাধ্যক্ষ, কে নগররক্ষক? এক রাত্রে কত উপদ্রব হইতে পারে। আরও ষড়যন্ত্র আছে কি না, কে বলিতে পারে? বয়টাচক্রের ন্যায় আপনি শত্রুনাশ করিয়াছেন, কিন্তু আপনার মিত্রবর্গ এখন কি করিবে?"

চিত্রসেন কহিলেন, "তোমাকে প্রধান মন্ত্রীপদে যুক্ত করিলাম। তোমার যাহাকে ইচ্ছা যে পদে নিযুক্ত করিতে পার। নিয়োগপত্রে তুমি স্বাক্ষর করিবে।"

অশোক কহিলেন, "মহারাজ, তাহা হইবে না। আমাকে সম্মানিত করিয়া আপনার কর্ত্তব্যে অবহেলা করিবেন না। এ রাজ্য আপনার। রাজ্যপ্রাপ্তিমাত্রেই যদি অপরকে রাজ্যভার দিয়া আপনি নিশ্চিন্ত হন, তাহা হইলে রাজ্যরক্ষা করিবেন কিরূপে? আপনি কিয়ৎকাল অপেক্ষা করুন, আপনার আদেশমত আমি সকল ব্যবস্থা করিতেছি।"

অনিচ্ছাপূর্ব্বক চিত্রসেন সম্মত হইলেন। অশোক অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সহিত সকল ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অধস্তন কর্ম্মচারীদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের হস্তে সমস্ত ভার দিলেন। তাহাদের কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, এই প্রকার ভরসাও প্রদত্ত হইল। রাজকোষের প্রহরী দ্বিগুণিত হইল। সৈন্যগণ সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। কেবল চিত্রসেনের প্রমোদাগারের বন্ধুদিগের হস্তে কোন ভার ন্যস্ত হইল না। তাহাতে চিত্রসেনও কোন আপত্তি করিলেন না।

এইরূপে রাত্রি অবসান হইল।

৯

সূর্য্যোদয় হইলে চিত্রসেন অশোককে কহিলেন, "আর চিন্তার কোন কারণ নাই। কয়েক দণ্ডকাল বিশ্রাম করিব।

অশোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রমোদভবনে?"

"হাঁ।"

"মহারাজ, নগরবাসীরা রাজদর্শনে আসিবে। তাহাদিগকে কি বলিব?"

"বলিও, প্রহরান্তে দর্শন হইবে। তাহার পূর্ব্বে আমি ফিরিয়া আসিব। তুমি চিন্তা করিও না, আমি পূর্ব্বের আচরণ ত্যাগ করিব। বিশেষ প্রয়োজনে যাইতেছি।"

অশোক আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। বস্ত্রাবৃত রথে আরোহণ করিয়া চিত্রসেন প্রমোদভবনে উপনীত হইলেন।

মায়া-কন্যা রাত্রে নিদ্রা যায় নাই। চিত্রসেনকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

চিত্রসেন কহিলেন, "কন্যা আমাকে যে অপমান করিয়াছিলে, তাহা আমি বিস্মৃত হইয়াছি।"

মারা-কন্যা কহিল, "যুবরাজ কি উদারচরিত্র!"

চিত্রসেন কহিলেন, "কাল ছিলাম যুবরাজ, আজ আমি মহারাজ!

"ব্রাহ্মণাবাদের দগ্ধ ভাগ্য!"

"আমি তোমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।"

"গান্ধর্ব্ব না রাক্ষসমতে?" মারা-কন্যার স্বরে অত্যন্ত ঘৃণা।

চিত্রসেন কহিলেন, "আমার অপরাধ ক্ষমা কর।" মারা-কন্যার হস্তধারণ করিবার জন্য তিনি হস্তপ্রসারণ করিলেন।

চকিত হরিণীর ন্যায় লম্ফ দিয়া মারা-কন্যা পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "সাবধান, আমাকে স্পর্শ করিও না।"

চিত্রসেনের চক্ষুর দৃষ্টি কঠোর হইল। কহিলেন, "কেন? কে আমাকে নিষেধ করিবে?"

"আমি।" দক্ষিণ হস্তে মারা-কন্যা তীক্ষ্ণ ছুরিকা তুলিল।

করতালি-ধ্বনি করিয়া চিত্রসেন হাস্য করিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "আমার ভ্রম হইয়াছিল। রাজমহিষীর পদ যথার্থই তোমার উপযুক্ত নহে। নাটকে তুমি উত্তম নটী হইবে।"

অকস্মাৎ বহির্দ্দেশে ঘোর ভীতি-কোলাহল উঠিল। বহুসংখ্যক লোক চীৎকার করিতে লাগিল, "এ কি হইল! এ কি হইল! মহারাজ, এ কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল!"

চিত্রসেন দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিলেন। এ দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ হইত না। ভয়ের কারণ প্রথমে নির্ণয় করিতে পারিলেন না। দেখিলেন, আকাশ অন্ধকার, অতি গাঢ় তাম্রবর্ণ, সূর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু ঝঞ্ঝাবায়ুর চিহ্ন নাই। বায়ুর লেশমাত্র নাই। বৃক্ষপত্র স্থির।

চিত্রসেন অপ্রসন্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

অমাত্য, অনুচর, প্রহরী সকলে নীরবে আকাশের দিকে নির্দ্দেশ করিল।

চিত্রসেন কহিলেন, "ঝঞ্ঝা আসিতেছে, তাহাতে ভয়ের কারণ কি?"

"মহারাজ ঝঞ্ঝা নহে। প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিয়া অবলোকন করুন। বুঝি বা ব্রাহ্মণাবাদ ধ্বংস হয়।" চারিদিক হইতে ক্রন্দন-কোলাহলের রোল উঠিল।

চিত্রসেনের কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত তড়িত্তরঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় রাজপুরোহিত ও মারাকন্যার অভিশাপ-বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে প্রভাসিত হইল। আর কোন কথা না কহিয়া তিনি প্রমোদভবন-শিখরে আরোহণ করিলেন। দেখিলেন, মেঘাচ্ছন্ন হইলে আকাশ যেরূপ অন্ধকার হয়, সেরূপ অন্ধকার নহে। বালুকা অথবা ধূলি উড়িলেও এরূপ অন্ধকার হয় না। বায়ু স্থির, পশুপক্ষীর কোলাহলও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। দূরে চাহিয়া দেখিলেন, নগরবেষ্টনকারী বালুকা-সমুদ্র চঞ্চল হইয়াছে। ঝঞ্ঝাবাতে অথবা প্রভঞ্জনে যেরূপ বালুকা উড়িয়া থাকে, সেরূপ নহে। সাগরতুল্য চতুর্দ্দিকে দিগন্তবিস্তৃত বালুকারাশি মথিত হইতেছে। পর্ব্বতপ্রমাণ শত শত বালুকাস্তম্ভ উত্থিত হইতেছে, ঘূর্ণামান হইতেছে, স্তূপাকারে বালুকায় পতিত হইতেছে। আবার উঠিতেছে, ঘুরিতেছে, পড়িতেছে। মরীচিকা কিংবা প্রহেলিকা নহে, কারণ, সেই স্তম্ভসমূহ দ্রুতবেগে নগরের অভিমুখে আগমন করিতেছে। অন্ধকার বাড়িতে লাগিল, আকাশ তাম্রবর্ণ ত্যাগ করিয়া লৌহবর্ণ ধারণ করিল, ক্রমে মসীবর্ণ হইতে লাগিল। বালুকা-স্তম্ভের অবিশ্রাম উত্থান, ঘূর্ণন, পতন, পুনরায় উত্থান! প্রলয়ের রুদ্রতালে তাণ্ডব-নৃত্য! বালুকাসমুদ্র আলোড়িত, প্রমথিত হইতেছে। ক্রমশঃ বৃক্ষপত্র স্পন্দিত হইল, ঝটিকার গর্জ্জনশব্দ শ্রবণে প্রবেশ করিল। সেই সঙ্গে সহস্র সহস্র নগরবাসীর আর্ত্তনাদ গগন ভেদ করিয়া উঠিল। বিকলচিত্ত হইয়া প্রাসাদশিখর হইতে চিত্রসেন অবতরণ করিলেন।

যে গৃহে মারা-কন্যা রুদ্ধ ছিল, সেই গৃহের অভিমুখে ধাবিত হইলেন, তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনীর মত তাহাকে ত্যাগ করা হইবে না। দেখিলেন, গৃহের দ্বার মুক্ত, দ্বারদেশে এক ব্যক্তি মুক্ত অসিহস্তে তাঁহার পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান।

প্রাসাদপ্রাঙ্গণে সকল মারা বন্দী হয় নাই। এক ব্যক্তি পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইয়াছিল। এই সেই ব্যক্তি। মারা-কন্যার সহিত ইহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত মারা-যুবক প্রমোদ-ভবনে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় নাই। কোলাহলের মধ্যে এই সময় সুযোগমতে প্রবেশ করিয়াছিল।

চিত্রসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

"তোমার শত্রু। তোমাকে বধ করিয়া আজ আমি ব্রাহ্মণাবাদের কলঙ্ক মোচন করিব।" যুবক অসিহস্তে চিত্রসেনকে আক্রমণ করিল।

সম্মুখে শত্রু দেখিয়া চিত্রসেনের চিত্ত-বৈকল্য দূর হইল। সস্মিতমুখে কোষ হইতে তিনি অসি গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধ অধিকক্ষণ হইল না। অসিযুদ্ধে চিত্রসেন সবিশেষ পারদর্শী; ক্ষণকালের মধ্যে মারা-যুবকের কণ্ঠদেশে অসিবিদ্ধ করিলেন। যুবক ভূতলে পতিত হইল।

তন্মুহূর্ত্তে মারাকন্যা গৃহ হইতে বেগে নিক্রান্ত হইয়া চিত্রসেনের পঞ্জরে আমূল ছুরিকা বিদ্ধ করিল। চিত্রসেন অসি ত্যাগ করিয়া, আহত স্থানে হস্ত রক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে ভূতলে উপবেশন করিলেন।

মারা-কন্যার চক্ষু হীরকখণ্ডের ন্যায় জ্বলিতেছিল। কহিল, "বন্যমৃগীও কখন ব্যাধকে বধ করে।"

চিত্রসেন যন্ত্রণার অপেক্ষা অধিক বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, কহিলেন, "তুমি?" মৃত যুবকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "এ তোমার কে?"

মারা-কন্যা কহিল, "আমরা উভয়ে জীবিত থাকিলে উনি আমার পতি হইতেন। কিন্তু উঁহার এ অবস্থা না হইলেও আমি তোমাকে হত্যা করিতাম। নহিলে এতক্ষণ আত্মঘাতিনী হইতাম।"

মৃত্যুরূপিণী মারা-কন্যার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দেখিতে দেখিতে চিত্রসেন কহিলেন, "রমণীর হস্তে মৃত্যু! চিত্রসেনের ললাটে কি এই লিখিত ছিল? বলদর্পিতের কি এই শাস্তি?"

ছুরিকা চিত্রসেনের পঞ্জরে বিদ্ধ ছিল। তিনি মারা-কন্যার রূপ দেখিতে দেখিতে ছুরিকার মুষ্টি ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন। ছুরী বাহির হইতেই ক্ষতমুখে বেগে রক্তপ্রবাহ ছুটিল। চিত্রসেনের চক্ষু হীনপ্রভ হইল, মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়িল, ক্রমশঃ চক্ষু মুদ্রিত হইল।

রমণীর হস্ত দ্বারা ব্রাহ্মণাবাদের সিংহাসন শূন্য হইল।

বায়ু গর্জ্জিল, আকাশে আলোক নির্ব্বাপিত হইল, ঝঞ্ঝা বজ্রবেগে নগরে আহত হইল। পর্ব্বতচূড়ার ন্যায় অসংখ্য বালুকাস্তম্ভসমূহ উঠিতে, পড়িতে, ঘুরিতে ঘুরিতে নগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃক্ষচূড়ায় অথবা সৌধশিখরে স্পর্শমাত্র বালুকা-স্তম্ভ ভগ্ন হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় পতিত হইল। যাহারা গৃহে ছিল, তাহারা গৃহে মরিল, যাহারা পলায়ন করিবার চেষ্টা করিল, তাহারা পথে কিংবা নগরের বাহিরে মরিল। একটি প্রাণীও রক্ষা পাইল না। প্রাসাদ, অট্টালিকা, কুটীর, রাজপথ, উদ্যান সমুদায় বালুকায় প্রোথিত হইল। ছিল ব্রাহ্মণাবাদ জনসমাকীর্ণ সমৃদ্ধ মহানগর, রহিল বালুকার পর্ব্বতাকার স্তূপ। বালুকা-সমুদ্রে দ্বীপতুল্য জনপদ পুনরায় বালুকাসমুদ্রে মগ্ন হইল। তরুনীড়-পরিপূর্ণ প্রবালদ্বীপ আবার মহাসমুদ্রের গর্ভে ডুবিল।

ব্রাহ্মণাবাদ ধ্বংস হইল।

জাল কুজেনোল

প্রথম পরিচ্ছেদ

ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পাঁচ বৎসর ডাক্তারি করিতেছি। রোগী পাইলে যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত নামও হইল না, পসারও জমিল না। অতি কষ্টে সংসার চালাই। অন্য কোন কর্ম্মও শিখি নাই যে, ডাক্তারি ছাড়িয়া দিয়া আর কিছু করিব। সাত পাঁচ ভাবিয়া চিত্ত সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিত।

এক দিন সন্ধ্যার সময় বাড়ীর ভিতরে বসিয়া আছি। প্রায় অন্ধকার হইয়াছে। ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "বাহিরে একটি বাবু আপনাকে ডাকছেন।"

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, একটি ভদ্রলোক। বয়স পঁচিশ বৎসর হইবে। গোঁফ-দাড়ী কিছু বেশী। আমায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ডাক্তার বাবু?"

"আজ্ঞা হাঁ। বসুন।"

বসিয়া কহিল, "আপনার নিকট আসিয়াছি, তাহার কারণ বুঝিতেই পারিতেছেন। আমার শরীর কিছু অসুস্থ।"

আমি কহিলাম, "কি হইয়াছে?"

"কিছু দিন হইতে মাঝে মাঝে বুকে ব্যথা ধরে। কোন কোন সময় নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়।"

আমি বলিলাম, "জামা খুলিয়া ফেলুন, ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি।"

ঘরে বাতি জ্বলিতেছিল। রোগীর শরীরে পাছে বাতাস লাগে, এই জন্য আমি দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। তাহার অনাবৃত শরীর দেখিয়া তাহাকে বলিষ্ঠ ও সুস্থ বোধ হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কোনরূপ রোগ অথবা রোগের সূত্রপাতের লক্ষণ কিছু দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে কহিলাম, "আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই। শরীরে কোন রোগ নাই।"

জামা পরিতে পরিতে যুবক কহিল, "তবে ব্যথা ধরে কেন?"

আমি কহিলাম, "সামান্য কারণে মাঝে মাঝে মাংসপেশীতে বেদনা হয়, তাহাতে মনে হয় যে, বুকের ভিতর ব্যথা করিতেছে। আপনারও সেইরূপ ভ্রম ঘটিয়া থাকিবে। আশঙ্কার কোন কারণ নাই।"

পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া যুবক আমার হাতে দিল। এত দিন কেহ কখন একেবারে দশ টাকা আমায় দেয় নাই। আমি নোট ফিরাইয়া দিতে চাহিলাম, কহিলাম, "বাড়ীতে রোগী দেখিবার জন্য আমি কিছু গ্রহণ করি না।"

যুবক কহিল, "গরীবের কাছে। যাহার দিবার সঙ্গতি আছে, সে আপনার বাড়ীতে আসিলেও দিবে, নিজের বাড়ীতে আপনাকে লইয়া গেলেও দিবে।"

আমি কিছু কুণ্ঠিত হইয়া কহিলাম, "তাহা হইলেও দশ টাকা আমার প্রাপ্য নয়। দুই টাকা লইয়া আমি রোগী দেখিয়া থাকি।"

যুবক অল্প হাসিল, কহিল, "মহাশয়, আমি ইচ্ছা করিয়া দিয়াছি, আপনার লইতে কুণ্ঠিত হইবার ত কোন কারণ নাই। আপনি আমার একটা দুর্ভাবনা দূর করিয়াছেন। সে হিসাবে আমি আপনাকে কিছুই দিই নাই।"

বলিয়া যুবক চলিয়া গেল। নাম জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছিলাম কিন্তু পারিলাম না। দশটা টাকা দিয়াছে বলিয়া রোগীর নাম জিজ্ঞাসা করা প্রথাবিরুদ্ধ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কয়েক মাস গেল। উক্ত যুবককে আর দেখি নাই। দিন যেমন কাটিতেছিল, তেমনি কাটিতে লাগিল

এক দিন সন্ধ্যার পর আমি আহার করিতে বসিয়াছি, এমন সময় কে ডাকিতে আসিল। তাড়াতাড়ি আহার করিয়া বাহিরে আসিলাম। এক জন চাকর ভাড়াটিয়া গাড়ী লইয়া আসিয়াছে। আমাকে কহিল, "আসুন। বাবু আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

বাবু কে, আমি আর জিজ্ঞাসা করিলাম না। অনেক দূর গিয়া একটা পুরাতন দ্বিতল গৃহের সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল। আমি নামিয়া চাকরের পশ্চাৎ গৃহে প্রবেশ করিলাম। লোকজনের কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না। দোতালায় উঠিয়া আমায় একটা ঘর দেখাইয়া দিল। গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। একটি টেবিলের নিকট এক ব্যক্তি বসিয়া ছিল। আমাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমাকে বসিতে সঙ্কেত করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল। কহিল, "বোধ হয় চিনিতে পারিতেছেন না?"

চিনিতে পারিলাম, সেই যুবক। গোঁফ-দাড়ী কামাইয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া চিনিতে পারিলাম। বলিলাম, "চিনিতে পারিতেছি বই কি! আবার কোন সন্দেহ মনে উপস্থিত হয় নাই ত।"

যুবক কহিল, "না। আপনার সহিত একটা বিশেষ পরামর্শ আছে।"

ডাক্তারের সহিত অনেক রকম পরামর্শ থাকিতে পারে। আমি কেবল কহিলাম, "বলুন।"

যুবক আমার কাছে আর একটু সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আমাদের এখন যে কথাবার্ত্তা হইতেছে, গোপনীয় মনে করিবেন।"

"চিকিৎসকের ও রোগীর কথোপকথন সর্ব্বদাই গোপনীয়।"

"রোগের চিকিৎসা ব্যতীত কি আর কিছু করিতে আপনার আপত্তি আছে?"

"আর কি?"

"কোন অঙ্গচ্ছেদন করিতে?"

"কোন কোন পীড়ায় কোন কোন অঙ্গচ্ছেদন করিতে হয়।"

"পীড়া যদি না থাকে?"

"তাহা হইলে সুস্থ অঙ্গ ছেদন করিব কেন?"

"যদি কোন ব্যক্তি স্বয়ং ছেদন করাইতে চায়?"

"সে ব্যক্তি বাতুল কিংবা তাহার কোন দুরভিসন্ধি আছে। সুস্থ অঙ্গ ছেদন করা কি ডাক্তারের কর্ম্ম?"

যুবক কহিল, "কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন। আমার একটি অঙ্গুলী আপনি কাটিয়া দিন। আপনাকে দুই হাজার টাকা দিব।"

দুই হাজার টাকা! একত্রে বোধ হয় কখন চক্ষেও দেখি নাই। কথাটা শুনিতে বিদ্রূপের মত, কিন্তু সেই যে দশ টাকা পাইয়াছিলাম, সেটা আমার স্মরণ ছিল। কিন্তু কেন অঙ্গুলী কাটাইতে চাহিতেছে, কেন এত টাকা দিতে চাহিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একটু চিন্তা করিয়া কহিলাম, "আপনার অঙ্গুলীতে কোন পীড়া আছে?"

"কিছু না।"

"অঙ্গুলী দেখিতে বিরূপ?"

যুবক কহিল, "দেখুন।" দুই হস্তের দশ অঙ্গুলী আমায় দেখাইল। হস্ত কিংবা অঙ্গুলীতে কিংবা কোন অঙ্গুলীগঠনে কোন দোষ নাই। আমি কহিলাম, "তবে অঙ্গুলী কাটিতে চাহিতেছেন কেন?"

যুবক হাসিয়া কহিল, "সে কথা আপনাকে বলিব না।"

আমি কহিলাম, "আপনার অঙ্গুলীতে কোন পীড়া নাই, কোন কঠিন রোগ নাই, কাটিয়া সুস্থ সুন্দর হস্ত কুরূপ ও বিকল করিতে বলিতেছেন। চিকিৎসকের সে কর্ম্ম নয়। আমি পারিব না।"

যুবক কহিল, "তবে আর অধিক কথাবার্ত্তার প্রয়োজন নাই। এইমাত্র অনুরোধ যে, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।"

আমি কহিলাম, "সে সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই।"

আমি উঠিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলাম। যুবক কহিল, "একটু দাঁড়ান।" বলিয়া একটি বাক্স খুলিয়া একখানি নোট বাহির করিয়া আমার হস্তে দিল।

দেখি, পাঁচ শো টাকার নোট! আমি কহিলাম, "কি দিয়াছেন, দেখুন। আপনার ভুল হইয়াছে।"

যুবক কহিল, "কি ভুল হইয়াছে, আপনি কেন বলুন না।"

আমি কহিলাম, "আপনি ভুলিয়া আমায় পাঁচ শো টাকার নোট দিয়াছেন। আমার কিছুই প্রাপ্য নয়; কারণ, আমি আপনার চিকিৎসাও করি নাই, সে সম্বন্ধে কোন পরামর্শও দিই নাই। রোগীর নিকট আমার কিছু পাইবার কথা, সুস্থকায় ব্যক্তির নিকট কিছু পাইবার কথা নয়।"

যুবক বলিল, "না. এ টাকা আপনারই প্রাপ্য। আমি আপনাকে যে কথা বলিলাম, একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমি আপন ইচ্ছায় অঙ্গুলীচ্ছেদন করিতে চাহিতেছি, ইহাতে আপনার আপত্তির কোন কারণ দেখিতে পাই না। আপনি যদি এ কর্ম্মে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে কাল এই সময় আসিবেন, বাকি টাকাও সেই সময় লইয়া যাইবেন।"

যুবক কিছুতেই নোট ফেরত লইতে সম্মত হইল না। আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিবস সমস্ত দিন সেই কথা ভাবিতে লাগিলাম। এত টাকার লোভ সহজে ছাড়া যায় না, বিশেষ আমার টাকার নিতান্ত অভাব। নিজে ইচ্ছা করিয়া অঙ্গুলীচ্ছেদন করাইতেছে, আমার আপত্তি করিলে কি হইবে? আমি না কাটি, আর এক জন কাটিবে। এইরূপ অনেক রকম চিন্তা করিয়া, সন্ধ্যার পর অস্ত্র ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সামগ্রী লইয়া আমি যুবকের আলয়ে উপস্থিত হইলাম।

আমাকে দেখিয়া যুবক একটু হাসিল। কহিল, "দেখিতেছি, আপনি আমার কথায় সম্মত হইয়াছেন।"

আমি কহিলাম, "আপনি যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গুলীচ্ছেদন করাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন আমার কোনরূপ আপত্তি করা বিড়ম্বনা।"

যুবক কহিল, "সেই কথাই আমি আপনাকে বলিতেছিলাম।" গৃহে আর কেহ ছিল না। জল, বস্ত্রখণ্ড ও অন্যান্য সামগ্রী আনয়ন করিয়া যুবক দ্বার রুদ্ধ করিল। পরে কহিল, "শুধু অঙ্গুলীচ্ছেদন করিলে হইবে না, একটু কৌশলের আবশ্যক। সেই জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি।"

একটা বাক্সের ভিতর হইতে যুবক মৃত্তিকানির্ম্মিত হস্ত বাহির করিল। নির্ম্মাণকৌশল দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। বাম হস্তের অঙ্গুলীগুলির মধ্যে তর্জ্জনী নাই। অঙ্গুলীর মূলে একটা দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন রহিয়াছে। যুবক কহিল, "এই চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া দেখুন। অঙ্গুলীচ্ছেদন করিয়া এইরূপ ক্ষতচিহ্ন রাখিতে হইবে। আপনাকে দুই হাজার টাকা দিব বলিয়াছি। যদি অবিকল এইরূপ ক্ষতচিহ্ন থাকে, তাহা হইলে আরও পাঁচ শো টাকা দিব।" ভিতরে কিছু রহস্য আছে বুঝিতে পারিলাম। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না, কহিলাম, "তাহাই হইবে।"

যুবক বাম হস্ত বাড়াইয়া দিল, কহিল, "এখন কাটুন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "অত্যন্ত যন্ত্রণা হইবে, সহ্য করিতে পারিবেন?"

যুবক কহিল, "পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"

মৃন্ময় হস্ত সম্মুখে রাখিয়া আমি ছুরী বাহির করিলাম। মাংস কাটিয়া অন্য অস্ত্র দ্বারা অস্থিচ্ছেদন করিলাম।

যুবক একবার মুখ বিকৃত করিল না, যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিল না, হাত নাড়িল না। যেন অঙ্গুলী তাহার শরীর হইতে পৃথক। যাহার এরূপ চিত্তদৃঢ়তা, তাহার অসাধ্য কোন কর্ম্ম পৃথিবীতে নাই। অঙ্গুলী ছেদন করিয়া, ক্রমে রক্তস্রাব বন্ধ করিয়া ক্ষতস্থান বন্ধ করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়াছে?"

যুবক, কহিল "অসহ্য যন্ত্রণার লক্ষণ কিছু দেখিলেন?"

আমি কহিলাম, "ধন্য আপনার চিত্তবল! আপনার মত রোগী সর্ব্বদা পাইলে ডাক্তারের কোন চিন্তা থাকিত না।"

যুবক কহিল, "আপনার টাকা টেবিলের উপর আছে, লইয়া যাইবেন।"

আমি বলিলাম, "আপনার ক্ষত যত দিন না আরোগ্য হয়. প্রত্যহ আপনাকে দেখিয়া যাইব।"

"আসিবেন।"

দেড় হাজার টাকার নোট টেবিলের উপর ছিল, লইয়া আমি বিদায় হইলাম।

ক্ষত আরোগ্য হইতে এক মাসের উপর লাগিল। মধ্যে মধ্যে আবার কাটিয়া সেইরূপ ক্ষতচিহ্ন করিয়া দিতে হইত। আরোগ্য হইলে অবিকল সেইরূপ চিহ্ন রহিল। যুবক আমায় আর পাঁচ শত টাকা দিল। বলিয়া দিল, "আমাকে যে কখন দেখিয়াছেন, বিস্মৃত হইবেন। গোপন রাখিবার কথা আর বলিব

না, কেন না, এখন প্রকাশ হইলে আপনারই অধিক বিপদ।"

পরদিবস সে গৃহে যুবককে আর দেখিতে পাইলাম না। আমায় কিছুই বলিয়া যায় নাই। নামধাম কিছুই জানিলাম না। টাকাটা কাছে না থাকিলে সমস্ত কথাই অলীক বোধ হইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রোগীকে সুস্থ করিয়া কখন অধিক অর্থ উপার্জ্জন করি নাই। সুস্থ শরীরে ক্ষত করিয়া, সম্পূর্ণাঙ্গকে অসম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া, প্রথমে অর্থ-লাভ হইল। কিন্তু সেই অবধি আমার লক্ষ্মীশ্রী হইল, পসার বাড়িল, অর্থাগম বাড়িতে লাগিল।

দুই বৎসর পরে শুনিলাম, একটা মোকদ্দমা লইয়া লোকে নানারূপ তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক জন অত্যন্ত ধনীর একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ হয়। সকলেরই বিশ্বাস যে, সে জলে ডুবিয়া মরে, কিন্তু মৃতদেহ আর পাওয়া যায় নাই। যখন তাহার মৃত্যু হয়, তখন তাহার বয়স বারো বৎসর। ধনীর পুত্র বলিয়া সেই বয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। বিধবা বালিকা শ্বশুরালয়েই থাকে। বালকের নাম কুঞ্জলাল। সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে প্রায় পনর বৎসরের কথা। ইতোমধ্যে পিতার মৃত্যু হইয়াছে। পিতামহী বর্ত্তমান, বিষয়ের ভার তাঁহার হস্তে। তাঁহার অবর্ত্তমানে কুঞ্জলালের বিধবা স্ত্রী উত্তরাধিকারিণী। মৃতদেহ পাওয়া যায় নাই বলিয়া দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত বালিকা সধবার চিহ্ন ধারণ করিয়াছিল। দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, বালিকা যুবতী হইয়াছে, পোষ্যপুত্র লইবার কথা হইতেছে। এমন সময় এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া কহিল, তাহারই নাম কুঞ্জলাল, বহুদিন নিরুদ্দেশ থাকিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাকে এক দল সন্ন্যাসী ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। কাশ্মীর, তিব্বত প্রভৃতি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাকে গৃহে আসিতে দিতে সকলে আপত্তি করিতেছে, এ জন্য সে পিতৃসম্পত্তিপ্রাপ্তির জন্য নালিশ করিয়াছে।

এরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত হইলেই লোকের মনে অত্যন্ত আগ্রহ ও কৌতূহলের উদ্রেক হয়। সংবাদপত্রে নানা কথা প্রকাশিত হইতে লাগিল। নিরুদ্দিষ্ট অথবা মৃত কুঞ্জলাল এবং এ ব্যক্তি একই কি না, চারিদিকে ক্রমাগত সেই বিচার হইতে লাগিল। জাল কুঞ্জলাল, না সত্য কুঞ্জলাল, চারিদিকে কেবল এই এক কথা। শরীরগত সাদৃশ্যের মধ্যে একটা লক্ষণ দেখিয়া ও শুনিয়া অনেকেরই মনে বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই ব্যক্তি সত্য কুঞ্জলাল, জাল নহে। বালক কুঞ্জলালের বাম হস্তের তর্জ্জনী কোন কারণে ছিন্ন হইয়া যায় ও ছিন্ন স্থানে একটা ক্ষতচিহ্ন থাকিয়া যায়। এ ব্যক্তিরও তর্জ্জনী নাই ও সেইরূপ ক্ষতচিহ্ন আছে। অতএব এ ব্যক্তি কোন মতেই জাল কুঞ্জলাল হইতে পারে না।

তখন সকল কথা আমার মনে পড়িল, যুবকের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম। তাহার সন্ধান লইয়া এক দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। যুবক আমাকে দেখিয়া অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিল। আমি কহিলাম, "আপনার সহিত গোপনে কিছু কথা আছে।"

যে দুই চারি জন অপর লোক বসিয়াছিল, তাহারা উঠিয়া গেল। যুবককে একলা পাইয়া কহিলাম, "আমি যেমন আপনাকে চিনিতে পারিতেছি, আপনিও আমায় সেইরূপ চিনিতে পারিতেছেন। কি কারণে আমাকে অপরিচিতের ন্যায় দেখিতেছেন, তাহা এখন জানিয়াছি।"

যুবক কহিল, "আপনাকে আমি কখন দেখি নাই, আপনার সহিত পরিচয়ও নাই। কি অভিপ্রায়ে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তাহাও জানি না।"

আমি কহিলাম, "আমি আপনার তর্জ্জনীচ্ছেদন করি ও সে জন্য আপনি আমাকে আড়াই হাজার টাকা দেন, তাহাও বোধ হয় আপনার স্মরণ নাই।"

যুবক কহিল, "কিছুমাত্র না। এই পর্য্যন্ত বুঝিতেছি যে, আপনি আমাকে ভয় দেখাইয়া কিছু টাকা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইবে।"

আমি কহিলাম, "টাকা চাহিবার জন্য আপনার কাছে আসি নাই। আপনাকে কেবল এই কথা বলিতে

আসিয়াছি যে, আপনি এই মিথ্যা মোকদ্দমা করিবেন না। আপনি জাল কুঞ্জলাল, আমি তাহা প্রমাণ করিতে পারি।"

জাল কুঞ্জলাল বলিল, "উকীলের পরামর্শ টাকা দিয়া লইতে হয়, আপনি বিনামূল্যে পরামর্শ দিতে আসিয়াছেন। আপনি যদি আমায় জানেন, তাহা হইলে হয় ত আমার স্বভাবও কিঞ্চিৎ অবগত আছেন। অতএব সাবধান থাকিবেন।"

আমি কহিলাম, "আপনি চতুর ও অত্যন্ত দৃঢ়-সঙ্কল্প জানি। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া এরূপ দুষ্কর্ম্মে আপনার সহায়তা করিতে পারিব না।" আর কিছু না বলিয়া আমি উঠিয়া আসিলাম।

সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিলাম যে, জাল কুঞ্জলালের মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য কোন বিশেষ স্থানে সন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে। নাম ও ঠিকানা গোপন রাখিয়া সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে ঠিকানা দিলাম। পরদিবস উত্তর আসিল। প্রতিবাদীর উকীল আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন।

দেখা হইতেই উকীল বলিলেন, "অনেকেই অর্থ-লোভে সাক্ষী সাজিয়া আসিতেছে। আপনিও কি সেই দলের লোক?"

আমি আত্মপরিচয় দিয়া কহিলাম, "অর্থের লোভ থাকিলে আপনাদের বিপক্ষেই সাক্ষ্য দিতাম। কোন সূত্রে আমি যে বৃত্তান্ত অবগত আছি, তাহা প্রকাশ করিলে আপনাদের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।"

উকীল কহিলেন, "কি জানেন,—বলুন।"

আমি কহিলাম, "আমি স্বয়ং সাক্ষ্য দিতে পারিব না। যাহা জানি, আপনাকে প্রথমে বলিতে আমার কিছু আপত্তি আছে। প্রতিবাদীর আত্মীয় যদি কেহ থাকে, তাহাকে বলিতে পারি।"

একটু হাসিয়া, একটু সন্দেহ করিয়া উকীল বলিলেন, "আপনি এই না বলিলেন, আপনার অর্থলোভ নাই?"

"এখনও তাহাই বলিতেছি।"

"তবে আত্মীয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন কেন?"

"যাহা জানি, তাঁহাকে বলিব।"

উকীল কহিলেন, "সম্পত্তি এখন স্ত্রীলোকদিগের হস্তে। গৃহে পুরুষ কেহ নাই আপনি কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন?"

"জ্ঞাতি, কর্ম্মচারী, যে কেহ হউক।"

উকীল কহিলেন, "তাহার উপায় আপনি নিজে করিতে পারেন। কিন্তু আপনি যাহা বলিলেন, আমি বলিয়া পাঠাইব।"

আর আমি উকীলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম না। দিন দুই চারি পরে প্রতিবাদীদিগের এক জন কর্ম্মচারী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। কহিল, "উকীলের সঙ্গে আপনি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন?"

আমি কহিলাম, "হাঁ।"

"কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

কর্ত্রী ঠাকুরাণী প্রকৃত কুঞ্জলালের পিতামহী। আমি কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া, কর্ম্মচারীর সঙ্গে গমন করিলাম। ধনীর গৃহ যেরূপ হইবার কথা, সেইরূপ গৃহ। বৈঠকখানায় আমায় বসাইয়া কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ডাক্তার?"

"আমি ডাক্তার।"

সে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া আমায় ডাকিল। অন্দরমহলে প্রবেশ করিতেই একটি ঘর। ঘরে কোনরূপ সজ্জা নাই। ঘরের মধ্যে গৃহ-কর্ত্রী কুশাসনে বসিয়া আছেন। প্রাচীনা, সামান্য বিধবার বেশ, হস্তে হরিনামের মালা। দ্বারের নিকট স্বতন্ত্র আসন পাতা ছিল। বৃদ্ধা কহিলেন, "বসুন"

আমি উপবেশন করিলাম। বৃদ্ধার কেশ পলিত, শরীর কৃশ, কিন্তু চক্ষু অত্যন্ত উজ্জ্বল। তাঁহাকে দেখিয়া বুদ্ধিমতী রমণী বোধ হইল।

"আপনি ব্রাহ্মণ?"

আমি কহিলাম, "না, কায়স্থ।"

"আপনি ডাক্তারি করেন?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"শুনিলাম, আপনি মোকদ্দমার কিছু জানেন। আপনি ভদ্রলোক, এই জন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস করিয়াছি। বিশেষ, আপনি ডাক্তার, আপনার নিকট কোন লজ্জা নাই।"

এ কথার উত্তর দিবার আবশ্যক নাই জানিয়া আমি নিরুত্তর রহিলাম।

গৃহকর্ত্রী কহিলেন, "আপনি কি জানেন, শুনিতে পাই?"

আমি যাহা জানিতাম, আদ্যোপান্ত বলিলাম। বর্ষীয়সী মনোযোগ পূর্ব্বক সকল কথা শুনিলেন। আমার কথা সমাপ্ত হইলে কহিলেন, "আপনি টাকার জন্যই অঙ্গুলী কাটিয়াছিলেন ?"

আমি কহিলাম, "এখন হইলে কাটিতাম না। তখন আমার টাকার অভাব, আর দেখিলাম, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গুলী কাটাইতেছে। আমি না কাটিলে আর কেহ কাটিত।"

বর্ষীয়সী কহিলেন, "বুঝিলাম। আপনার যে কোন অসদভিপ্রায় ছিল না, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। আপনি আসিয়া এই কথা জানাইয়া আমাকে উপকৃত করিলেন। আর কেহ হইলে এ কথার বিন্দুবাষ্পও প্রকাশ করিত না।"

আমি কহিলাম, "আপনাকে সত্য কথা বলিয়াছি। এখন কি করিব, আজ্ঞা করুন।"

"আপনি সে ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন ?"

"গিয়াছিলাম। সে সকল কথা অস্বীকার করে, আমার সঙ্গে যে কখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে কথা পর্য্যন্ত স্বীকার করে না।"

বর্ষীয়সী কহিলেন, "শুধু যদি টাকার কথা হইত, তাহা হইলে কোন ক্ষতি ছিল না। না হয় কিছু টাকা দিয়া মিটিয়া যাইত; কিন্তু ঘরে বিধবা বধূ আছে। জাতি-ভয় বড় ভয়ানক।"

আমি কহিলাম, "তাহার সহিত আর একবার দেখা করিব। টাকা লইয়া যদি মোকদ্দমা মিটাইতে স্বীকৃত হয়, সে চেষ্টা দেখিব।"

গৃহকর্ত্রী কহিলেন, "সেই চেষ্টা দেখিবেন। কি বলে, আমি যেন জানিতে পাই।"

সেই কথামত আমি জাল কুঞ্জলালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। সে প্রথমে আমার সহিত দেখা করিতে সম্মত হয় না, অবশেষে বিশেষ কথা আছে শুনিয়া স্বীকৃত হইল। সে সময় তাহার নিকটে আর কেহ ছিল না। আমাকে দেখিয়া কহিল, "আপনি আবার কেন আসিয়াছেন ?"

আমি বলিলাম, "আপনাকে একটা কথা বলিতে আসিয়াছি। আপনি বিষয় পাইবার লোভেই এ মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন। টাকা লইয়াই আপনার কথা। কুঞ্জলালের বিধবা স্ত্রী আছে, তাহাকে কেন বিপদগ্রস্ত করেন ? কিছু টাকা লইয়া মোকদ্দমার কেন নিষ্পত্তি করুন না।"

জাল কুঞ্জলাল কহিল, "আপনাকে স্পষ্ট কথা বলিতে দোষ নাই। বিষয়ের প্রতি আমার বিশেষ লক্ষ্য নাই। স্ত্রীলাভই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বিধবার পুনরায় স্বামীপ্রাপ্তি হইবে, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের কি কথা আছে !"

ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। কহিলাম, "আপনার মনে যদি এমন পাপ-সঙ্কল্প থাকে, তাহা হইলে আমাকে আপনার পরম শত্রু বলিয়া জানিবেন। আমি যাহা জানি, সে বিষয়ে প্রকাশ্য সাক্ষ্য দিব।"

যুবক কহিল, "আমার শত্রুসংখ্যা এত অধিক যে, এক জন বাড়িলে কি কমিলে বিশেষ ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, সাক্ষ্য দিবেন। আমি দশ জন সাক্ষীকে দিয়া বলাইব যে, আপনি প্রতিবাদীদিগের গৃহে যাতায়াত করিয়া থাকেন এবং বহু পুরস্কারের লোভে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন।"

আমি আর বসিলাম না। "কে মিথ্যা বলিতেছে, দেখা যাইবে" বলিয়া রাগিয়া চলিয়া আসিলাম।

কুঞ্জলালের পিতামহীকে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিলাম না। জাল কুঞ্জলাল টাকা লইয়া মোকদ্দমা তুলিয়া লইতে স্বীকার করিতেছে না, এই কথা বলিলাম। বৃদ্ধা কহিলেন, "স্ত্রীলোকের ধর্ম্মরক্ষার উপায় নিজের হাতে। এ ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিতে বসিয়াছে, তাহার যে স্ত্রীহত্যাপাতকের ভয় আছে, এমন বোধ হয় না। ভগবানের মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে।"

আমি কহিলাম, "যাহাতে এ ব্যক্তির চক্রান্ত প্রকাশ হয়, সে চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

জাল কুঞ্জলাল কে, কোথায় নিবাস, তাহার আত্মীয় কে আছে, আমি গোপনে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। জাল কুঞ্জলালের পক্ষে অনেক সাক্ষী। মোকদ্দমা এমন সাজান যে, সকলেই বলিতে লাগিল, তাহার জিত হইবে।

প্রতিবাদীর পক্ষ হইতে আমি সাক্ষ্য দিলাম যে, কিছু দিন পূর্ব্বে বাদীর অঙ্গুলী আমি ছেদন করিয়াছিলাম। সকল কথা সত্য বলিতে পারিলাম না। বলিলাম, বাদীর অঙ্গুলীতে ঘা হইয়াছিল। সেই জন্য তাহার অঙ্গুলী ছেদন করা হয়। জাল কুঞ্জলালের পক্ষে অন্য লোকে পূর্ব্বেই সাক্ষ্য দিয়াছিল যে, আমি পুরস্কারের লোভে মিথ্যা কথা বলিতে স্বীকৃত হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত মোকদ্দমা জাল কুঞ্জলালেরই জিতিবার কথা।

মোকদ্দমার শেষ দিন এক জন নূতন সাক্ষী উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া জাল কুঞ্জলালের মুখ শুকাইয়া গেল। সাক্ষী বৃদ্ধা, বিধবা, বাদীকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। কহিল, "ইহার নাম বেণী, আমার একমাত্র সন্তান। তিন বৎসর হইল, গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সেই শোকে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার চক্ষু অন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।" বুড়ীর সঙ্গে অবগুণ্ঠনবতী যুবতী ছিল। সে সলজ্জভাবে সাক্ষ্য দিল যে, বাদী তাহার স্বামী, তাহাকে কিছু না বলিয়া তিন বৎসর নিরুদ্দেশ হইয়াছে।

চারিদিকে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। দুই পক্ষে উকীল অনেক বাদ-বিতণ্ডা করিল, অবশেষে জাল কুঞ্জলালের হার হইল। প্রবঞ্চনার ... করেন। তাহার পুনর্ব্বিচার হইল এবং দোষী ... য়া তাঁহাকে সাত বৎসর কারাগার হইল। ... তিনি সর্ব্ব-

কুঞ্জলাল বিধবার যেমন পোষ্যপুত্র ল... তন বৎ- ছিল, সেইরূপ লওয়া হইল। কুঞ্জলালের ... সহিত পৌত্রবধূকে বিষয়ভার দিয়া কাশীবাসিনী হইলে কিন্তু

কাঠুরিয়া

(অনূদিত)

কোন সময়ে সালর্ণো নামক নগরে জরূবীন নামে পারিতেছি। রিয়া যুবক বাস করিত। তাহার পিতা আমাকে উপর, বন্ধু কেহ ছিল না। সে স্বভাবতঃ এ কথার বিন্দ্যাটিতে ভালবাসিত, তাহাতে আবার আমি ত বলিয়া কাহারও সহিত বড় একটা য়াছি। এ না। লোকে তাহাকে মুর্খ বিবেচনা "আপ তাহার নাম বর্ব্বর রাখিয়াছিল। নামটি বেশ গিয়াছিলেন ছিল।

"গিয়াতঃকালে, আর কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইবার করে, আসে কুঠার স্কন্ধে করিয়া পর্ব্বতের অভিমুখে সে কথা করিত। সারাদিন বনে কাটাইয়া সন্ধ্যার বর্ষ কাষ্ঠভার লইয়া নগরে ফিরিয়া আসিত। তাহার কাষ্ঠভার বিক্রয় করিয়া রাত্রির আহারের সংস্থান করিত।

এক দিবস একটা প্রাচীন বৃক্ষের শাখাচ্ছেদন করিয়া অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ হওয়াতে জরূবীন মনোহর বৃক্ষশ্রেণীপরিবৃত ছায়াস্নিগ্ধ পল্বলের তীরে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিল। বিস্মৃত হইয়া দেখিল, অনতিদূরে তৃণশয্যোপরে, মরালপক্ষনির্ম্মিত-উৎকৃষ্টবেশপরিহিতা এক অপূর্ব্বসুন্দরী কিশোরী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। মুখে দুর্ভাবনার চিহ্ন, নিদ্রাবস্থায় যেন কোন দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ইতস্ততঃ হস্ত সঞ্চালন করিতেছে।

"স্ত্রীলোকমাত্রেই মূর্খ! দেখ দেখি, দু'পুর বেলা এমন জায়গায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে, সূর্য্যের কিরণ মুখে পড়িতেছে!"

এই বলিয়া জরূবীন বৃক্ষের কয়েকটা শাখা হেলাইয়া নিদ্রিতা রমণীর মস্তকের উপর ছায়া করিল এবং সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে না পায়, এই অভিপ্রায়ে শাখার উপর আপনার উত্তরীয় বস্ত্র রক্ষা করিল।

ফিরিয়া দেখে, একটি ক্ষুদ্র বিষাক্ত লোলজিহ্বা সর্প নিদ্রিতা রমণীর দিকে আগমন করিতেছে। "দেখিতে এইটুকু, ইহারই মধ্যে এত দুরভিসন্ধি," বলিয়াই জরূবীন কুঠারের দুই আঘাতে সর্পকে তিন খণ্ড করিয়া ফেলিল।

নিদ্রিতা কিশোরী পরী, জলদেবী। কুঠারের আঘাতের শব্দে তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। উঠিয়া মৃত সর্পকে দেখিয়া আনন্দোৎফুল্ল লোচনে কহিল, "জরূবীন, তুমি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর সামগ্রী রক্ষা করিয়াছ।"

অসভ্য জরূবীন উত্তর করিল, "আমি কিছুই করি নাই। তোমাকে একটা পরামর্শ দিই, ঘাসের উপর শয়ন করিলে সর্পভয় থাকেই। না শয়ন করাই ভাল। এখন তুমি বিদায় হও, আমি একটু নিদ্রা যাইব।" বলিয়া ঘাসের উপর শয়ন করিয়া নয়ন মুদিত করিল।

পরী কহিল, "জরূবীন, আমার নিকট প্রার্থনা করিবার কি কিছু নাই?"

জরূবীন কহিল, "আমায় একাকী নিশ্চিন্ত হইতে দাও, এই মাত্র প্রার্থনা, অন্য প্রার্থনা নাই। লোকে যখন কোন সামগ্রীর কামনা করে না, তখন যাহা আবশ্যক প্রাপ্ত হয়। আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে সুখী হয়।" কথা সমাপ্ত হইতেই বর্ব্বরের নাসিকাগর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল।

তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া পরী কহিল, "তোমার আত্মা এখনও নিদ্রিত রহিয়াছে। কিন্তু তুমি যাহাই হও, আমি অকৃতজ্ঞ হইব না। তুমি না থাকিলে আমার পরম শত্রু নিষ্ঠুর দৈত্যের হস্তে পতিত হইতাম। তুমি না থাকিলে আমায় শত বর্ষ সর্প হইয়া বাস করিতে হইত। তোমার জন্য আমার আরও শত বর্ষ রূপ ও যৌবন থাকিবে। জরূবীন, ভবিষ্যতে তোমার সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে; কোন দিন তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ করিবে।"

অনন্তর হস্তস্থিত যষ্টি আকাশে তিনবার মণ্ডলাকারে

ঘুরাইয়া জলদেবী জলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। চরণস্পর্শ এমন মৃদু যে, পল্বলের জল কিছুমাত্র চঞ্চল হইল না। রাজ্ঞীর আগমনে বেতসী-লতা মস্তক অবনত করিল, পদ্মমুকুল প্রস্ফুটিত হইয়া ফুটিয়া উঠিল। জলদেবীর আনন্দে যেন তরুগণ ও সমীরণ আনন্দিত হইল। শেষবার যষ্টি সঞ্চালন করিতে উজ্জ্বল জলরাশি রাজ্ঞীর পথ মুক্ত করিবার জন্য দ্বিধা হইল, কনকরশ্মিরেখার ন্যায় গভীর জলরাশি আলোকিত করিয়া, জলদেবী ধীরে ধীরে জলে প্রবেশ করিল, তখন আবার জলরাশি অস্পষ্ট ছায়াবৃত হইল, চারিদিকে আবার নিস্তব্ধ হইল।

দ্বিপ্রহরের সময় কাষ্ঠচ্ছেদকের নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে পূর্ব্বের ন্যায় কাষ্ঠচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইল। সবলে কুঠারাঘাত করিতে করিতে তাহার ললাট বহিয়া ঘর্ম্ম পড়িতে লাগিল, কিন্তু তাহার পরিশ্রম নিষ্ফল হইল।

অবশেষে কুঠারের শাণিতাগ্রভাগ বক্র হইয়াছে দেখিয়া জর্বীন কিছু বিষণ্ণভাবে কহিল, "এমন যদি কোন অস্ত্র থাকিত, যাহা দ্বারা কাষ্ঠ মাখমের মত কাটা যাইত! আমার ইচ্ছা করে, আমি সেই রকম একটা অস্ত্র পাই।"

এই বলিয়া দুই পদ পশ্চাতে সরিয়া কুঠার ঘুরাইয়া এমন জোরে আঘাত করিল যে, স্বয়ং পড়িয়া গেল। বলিয়া উঠিল, "আঃ, লক্ষ্যটা বাঁকা হইয়াছে।" বলিতে বলিতে বৃক্ষটা তাহার পার্শ্বে পড়িয়া গেল। জর্বীন চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিল।

আহ্লাদে জর্বীন কহিল, "কেমন ঘা মারিয়াছি। কাঠ কেমন সুন্দর কাটিয়াছি! আমার সমান কাঠুরিয়া আর কেহ নাই।"

কাষ্ঠখণ্ডসমূহ সংগ্রহ করিয়া, স্বীয় কটিস্থিত রজ্জু দ্বারা কাষ্ঠভার বন্ধন করিল। বন্ধন কঠিন করিবার নিমিত্ত কাষ্ঠভারের উপর দুই পার্শ্বে দুই পা দিয়া বসিল। আপনা আপনি কহিতে লাগিল, "কাঠের বোঝার ঘোড়ার মত চারিটা পা নাই, বড়ই দুঃখের কথা! থাকিলে সুন্দর অশ্বারোহীর মত সালর্ণো নগরে প্রবেশ করিতাম। তাহা হইলে কেমন মজা হইত!"

বলিবামাত্র কাষ্ঠভার উঠিয়া অশ্বের ন্যায় বেগে গমন করিতে লাগিল। জর্বীন কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া এই অদ্ভুত অশ্বারোহণে চলিল এবং মনে মনে কাষ্ঠভারের অভাবে যাহাদিগকে পদব্রজে চলিতে হয়, তাহাদিগের জন্য দুঃখ করিতে লাগিল।

২

সালর্ণো নগরের মধ্যস্থলে বৃহৎ চতুষ্কোণ ভূমিখণ্ডে রাজপ্রাসাদ। সকলেই অবগত আছেন, প্রথিতযশা হনিবী এই সময়ে এই দেশের রাজা ছিলেন।

প্রতিদিন বৈকালে রাজকন্যা আলেলী বিষণ্ণবদনে প্রাসাদের বারান্দায় বসিয়া থাকিতেন। দাসীগণ গান, গল্প ও তোষামোদ দ্বারা তাঁহাকে আমোদিত করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই আপনার চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। তিন বৎসর হইতে রাজা প্রতিবেশী জমীদারপুত্রগণের সহিত রাজকন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ করিতেছিলেন। কিন্তু আলেলী বিবাহে সম্মত হইতেন না। এই দিবস আলেলী স্বপ্নাকুলচিত্তে বারান্দায় বসিয়াছিলেন, এমন সময় বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, সম্রাটের ন্যায় গর্ব্বভরে কাষ্ঠভারারোহণে জর্বীন প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া রাজকন্যার দুই জন সহচরী উচ্চ হাস্য করিয়া হস্তস্থিত কমলা-লেবু তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিল। দুইটা লেবু জর্বীনের মুখে লাগিল।

জর্বীন কহিল, "হাস তোমরা—আমার ইচ্ছা হয়, তোমরা কেবল হাসিতেই থাক।"

রাজকন্যার সহচরীদ্বয় ক্রমাগত হাসিতে লাগিল। রাজকন্যা কাষ্ঠচ্ছেদককে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া সহচরীদিগকে হাসিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাহারা কোনমতে হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না।

রাজকন্যাকে দেখিয়া জর্বীন কহিল, "রাজকন্যা এমন সুন্দরী, তথাপি এত বিষণ্ণ। তোমার মঙ্গল হউক, যে তোমায় প্রথমে হাসাইতে পারিবে, তুমি যেন তাহাকে ভালবাস ও সেই যেন তোমার স্বামী হয়।" বলিয়া মস্তক অবনত করিয়া রাজকন্যাকে অভিবাদন করিল।

কাষ্ঠভারে আরোহণ করিয়া রাজ্ঞীকেও অভিবাদন না করাই পরামর্শ, কিন্তু জর্বীনের ইহা স্মরণ ছিল না। মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করিবার জন্য কাষ্ঠভারের বন্ধনরজ্জু মুক্ত করিয়াছিল। বন্ধনমুক্ত

হইবামাত্র কাষ্ঠখণ্ডসমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। জর্‌বীন ঊর্দ্ধপদ নিম্নশির হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল, আবার উঠিয়া দাঁড়াইল।

কেহ পড়িয়া গেলে অন্য লোকে কেন হাসে, এ তত্ত্ব এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। জর্‌বীনকে পতিত হইতে দেখিয়া আলেলী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে জর্‌বীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, হৃদয়ে হস্ত রক্ষা করিয়া, অত্যন্ত চঞ্চলচিত্তে প্রাসাদে প্রবেশ করিল।

জর্‌বীন পুনর্ব্বার কাষ্ঠভার সংগ্রহ করিয়া, অপর কাষ্ঠচ্ছেদকের ন্যায় কাষ্ঠভার মস্তকে বহন করিয়া, পদব্রজে গৃহে গমন করিল। সৌভাগ্যে সে বিস্মিত হয় নাই, দুর্ভাগ্যেও তাহার চিত্তে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় নাই।

যে সময় এই সকল ব্যাপার ঘটিতেছিল, সেই সময় চারি ঘটিকা বাজিল। অত্যন্ত গ্রীষ্ম, পথ একেবারে নিস্তব্ধ। রাজা হনিবী শীতল মহলে নিদ্রিত ছিলেন। নিদ্রাবস্থায় প্রজার মঙ্গলের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। সহসা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল—দেখিলেন, আলেলী তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়াছে, তাহার অশ্রু তাঁহার মুখে পড়িতেছে।

অনভ্যস্ত স্নেহাতিশয্য দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "একি? এত অশ্রুপাতের ও আদরের অর্থ কি? তোমার বুঝি কিছু চাই, তোমার জন্য আমায় বোধ হয় কিছু করিতে হইবে?"

আলেলী কহিল, "না পিতঃ, তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। এতদিন যে জামাতাকে অন্বেষণ করিতেছিলে, সে পাওয়া গিয়াছে এবং আমি তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছি।"

রাজা কহিলেন, "বটে, এতদিন না না করিয়া শেষে বুঝি এই হইল! লোকটা কে? কাহার রাজপুত্র না কি?

না?

তবে কি কাপ্রীর জমীদার, না সোরেন্টোর তালুকদার?

তাহাদের মধ্যেও কেহ নয়?

তবে কে, শুনি।"

আলেলী কহিল, "কে আমি জানি না।"

রাজা কহিলেন, "তুমি তাঁহাকে জান না, সে কেমন কথা! তুমি তাহাকে নিশ্চয় দেখিয়াছ।"

"হাঁ, তাহাকে দেখিয়াছি—এই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে।"

"সে তোমার সঙ্গে কথা কহিয়াছিল?"

"না। যখন পরস্পরের হৃদয় পরস্পরকে বুঝিয়াছে, তখন কথা কহিবার আবশ্যক কি?"

রাজা হনিবী মুখভঙ্গী করিলেন। মাথা চুল্‌কাইয়া কন্যার দিকে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া কহিলেন, "যেই হউক, রাজপুত্র বটে ত?"

আলেলী কহিল, "আমি জানি না। রাজপুত্র হউক না হউক, তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"

"ক্ষতিবৃদ্ধি বিলক্ষণ আছে—তুমি রাজনীতি কিছু বুঝিতে পার না। এই ব্যক্তি কোথায় লুকায়িত আছে, জিজ্ঞাসা করি।"

আলেলী কহিল, "আমি জানি না।"

রাজা রাগিয়া কহিলেন, "আমার এত অবকাশ নাই যে, আমি এই সকল নিরর্থ কথা শুনি। বাহিরে কে আছে, রাজকন্যার দাসীদিগকে ডাকিয়া বল, তাহারা অন্দরমহলে রাজকন্যাকে লইয়া যাক্।"

এই কথা শুনিয়া আলেলী কাঁদিয়া পিতার পদতলে পতিত হইল। ক্ষণেক পরে রাজকন্যার সহচরীদ্বয় হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এইরূপে অসম্মানিত হইয়া রাজা ক্রোধভরে চীৎকার করিয়া কহিলেন, "চুপ কর্! চুপ কর্!" কিন্তু রাজা যত চীৎকার করেন—"চুপ কর্", রাজকন্যার সহচরীদ্বয় আদব-কায়দা বিস্মৃত হইয়া ততই হাসে।

রাজা ক্রোধে অস্থির হইয়া কহিলেন, "প্রহরিগণ! এই নির্লজ্জ রমণীদ্বয়কে ধৃত করিয়া ইহাদের মস্তকচ্ছেদন কর।"

আলেলী যুক্তকরে কহিল, "মহারাজ! প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা রহিত করিয়া আপনার রাজ্য চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, স্মরণ রাখিবেন।"

রাজা কহিলেন, "এ কথা সত্য বটে। আমরা শিক্ষিত জাতি। ইহারা নিষ্কৃতি পাইবে। নির্জ্জন কারাগারে ইহারা রুদ্ধ রহিবে, সেখানে আর কাহারও কথা শুনিতে না পাইয়া, আপনাদের কথা শুনিয়া শুনিয়া ক্লান্ত হইয়া আপনা আপনি মরিয়া যাইবে।"

আলেলী কাঁদিতে লাগিল।

সহচরীদ্বয় ভূতলে জানু পাতিয়া কহিল, "মহারাজ! ক্ষমা করুন, আমরা চুপ করিতেছি। যাদুকরের মায়ায়

আমাদের এই অবস্থা হইয়াছে, অতএব আমাদিগকে মার্জ্জনা করুন।"

"আমার রাজ্যে যাদুকর! এ কথা কোনমতেই সম্ভব নহে। আমার যখন যাদুকরে বিশ্বাস নাই, তখন এখানে তাহারা কেমন করিয়া থাকিবে?"

সঙ্গচৌদ্দয়ের মধ্যে এক জন কহিল, "মহারাজ, এক জন কাঠুরিয়া কাষ্ঠভারের উপর চড়িয়াছে, কাষ্ঠভার ঘোড়ার নাচের—ঘোড়ার মত নাচিয়া নাচিয়া যাইতেছে, ইহাও কি কখন সম্ভব? এইমাত্র প্রাসাদের সম্মুখে আমরা দেখিয়াছি।"

রাজা কহিলেন, "কাঠের বোঝা? যাদু বলিয়াই সন্দেহ হইতেছে। প্রহরিগণ! সেই ব্যক্তিকে তাহার বোঝা সমেত ধৃত করিয়া পুড়াইয়া ফেল। তাহার পর বোধ হয় একটু নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।"

রাজকন্যা রোদন করিয়া কহিল, "আমার প্রিয়তমকে পুড়াইবে? মহারাজ, সেই সুন্দর পুরুষ আমার স্বামী হইবেন। তাঁহার একটি কেশ স্পর্শ করিলে আমি মরিব।"

রাজা হনিবী ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "আমার বাড়ীতে সকলকেই ভূতে পাইয়াছে। যদি নিশ্চিন্তই না থাকিতে পারিলাম, তাহা হইলে রাজা হইয়া ফল কি? কিন্তু আমিই বা ভাবিয়া মরি কেন? মিষ্টিগ্রিস্‌কে ডাক। যখন আমার মন্ত্রী হইয়াছে, সে যদি আর কিছু না পারে, অন্ততঃ আমি কি ভাবি এবং আমি কি ইচ্ছা করি, তাহার বলিতে পারা আবশ্যক।"

মিষ্টিগ্রিস্ শীঘ্রই উপস্থিত হইল। মানুষটি ক্ষুদ্র, স্থূল, গোল; গোলার মত গড়াইয়া যায়, হাটিতে বড় পারে না। চক্ষু দুইটি অতি ক্ষুদ্র, কপাল ক্ষুদ্র ও নিম্ন, নাসিকা চঞ্চুর ন্যায়, গণ্ডদ্বয় স্থূল এবং চিবুকটি ত্রিতল। রাজা হনিবীর বিখ্যাত মন্ত্রীর রূপবর্ণনা এই। মন্ত্রী হাসিতে হাসিতে, হাপাইতে হাঁপাইতে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদবিক্ষেপে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজা কহিলেন, "এতক্ষণে তোমার আসা হইল! আমার রাজ্যে অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিতেছে, আর আমি তাহার সংবাদ সকলের শেষে পাই। এ কেমন কথা?"

মন্ত্রী কহিল, "কোনরূপ বিভ্রাট কোথাও উপস্থিত হয় নাই। আমার কাছে পুলিসের রিপোর্ট রহিয়াছে। রাজ্যে শান্তি ও স্বচ্ছলতা যেমন থাকে, সেইরূপ রহিয়াছে।" এক খণ্ড বৃহৎ কাগজ বাহির করিয়া মন্ত্রী পড়িতে আরম্ভ করিল—"সালর্ণো নগরী—বিত্ত এবং সচ্চরিত্রতা বর্দ্ধিত হইতেছে। দুইটা স্ত্রীলোক অনাহারে মরিয়াছে; দশটি শিশু পিতা-মাতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে; তিন জন স্বামী স্ত্রীদিগকে প্রহার করিয়াছে; দশ জন স্ত্রী স্বামীদিগকে প্রহার করিয়াছে; চুরি-ডাকাইতির সংখ্যা ত্রিশ; দুইটা খুন হইয়াছে; তিনটা বিষ দিয়া হত্যা করিয়াছে। নূতন কিছুই নাই।"

রাজা বিরক্তভাবে কহিলেন, "এই পর্য্যন্ত বুঝি। আমি রাজকর্ম্মের কিছু না জানি, তোমার অপেক্ষা অনেক সংবাদ রাখি। এক ব্যক্তি কাঠের বোঝায় চড়িয়া প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া গিয়াছে। সে মন্ত্র দ্বারা আমার কন্যাকে বশীকৃত করিয়াছে। আমার কন্যা তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে।"

উত্তরে মন্ত্রী কহিল, "মহারাজ, এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি আমি অবগত ছিলাম—রাজমন্ত্রী সব কথাই জানে; কিন্তু মহারাজকে এই সকল তুচ্ছ কথা বলিয়া বিরক্ত করা কেন? তাহাকে ধরিয়া ফাঁস দেওয়া যাইবে, গোল চুকিয়া যাইবে।"

"সে বদমায়েস কোথায় আছে, আমায় বলিতে পার?"

মিষ্টিগ্রিস্ কহিল, "তাহা আর পারি না? রাজমন্ত্রী সকল দেখে, সকল শুনে, সর্ব্বত্র উপস্থিত থাকে।"

"আচ্ছা, সেই ব্যক্তিকে যদি অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে আমার সম্মুখে আনয়ন না কর, তাহা হইলে তোমার পদ এমন আর এক ব্যক্তিকে দিব, যে শুধু দেখে না, কর্ম্মও করিতে পারে। এখন বিদায় হও।"

মিষ্টিগ্রিস্ স্মিতমুখে গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইল, কিন্তু বাহির আসিয়া তাহার মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। প্রথমেই যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহার হস্ত ধারণ করিল। সে ব্যক্তি সহর-কোতোয়াল। মিষ্টিগ্রিস্ তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া কহিল, "এই নগরে কোন দুষ্ট লোক কাঠের বোঝায় চড়িয়া বেড়ায়। দশ মিনিটের মধ্যে যদি তাহাকে আমার সম্মুখে আনয়ন না কর, তাহা হইলে তোমার শাস্তি হইবে, মনে রাখিও। এখন যাও।"

কোতোয়ালকে এইরূপ আজ্ঞা দিয়া মিষ্টিগ্রিস্ পূর্ব্ববৎ হাস্যমুখে রাজার নিকটে ফিরিয়া গেল।

৩

যশ উৎকৃষ্ট সামগ্রী হইলেও তাহাতে কতক অসুবিধা আছে। অজানিত থাকিবার সুখ আর থাকে না। জর্‌বীন্ যেরূপে নগরে প্রবেশ করিয়াছিল, বালকগণের মধ্যে তাহা তৎক্ষণাৎ রাষ্ট্র হইয়া গেল, অতএব তাহাকে অনুসন্ধান করা রাজকর্ম্মচারীদিগের পক্ষে বিশেষ আয়াসসাধ্য হইল না। জর্‌বীন্ গৃহের প্রাঙ্গণে হাঁটু পাতিয়া, কুঠারে ধার করিতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কোন বলিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে উঠাইল।

জর্‌বীন নিশ্চিন্তভাবে রাজকর্ম্মচারীদিগের সমভিব্যাহারে রাজবাটীর অভিমুখে গমন করিল। দ্বারের সম্মুখে অনেকগুলি লোক জরির পোষাক পরিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহারা রাজার ভৃত্য, রাজকন্যার পাত্রের প্রত্যুদ্গমনের জন্য দণ্ডায়মান ছিল। তাহাদের প্রতি আদেশ ছিল যে, জরবীনকে সম্মান প্রদর্শন করিবে। সেই আদেশমত তাহারা টুপি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জরবীনকে দেখিয়া সকলে ঝুঁকিয়া সেলাম করিল। যাহাতে ভদ্রতার অভাব না হয়, এই অভিপ্রায়ে জর্‌বীনও সেইরূপ সেলাম করিল, ভৃত্যেরা পুনর্ব্বার সেইরূপ সেলাম করিল, জর্‌বীনও তদ্রূপ। এইরূপ আট দশ বার হইল। জর্‌বীনের রাজবাটীতে জন্ম হয় নাই, সুতরাং তাহারই প্রথমে শ্রান্তি বোধ হইতে লাগিল।

অবশেষে কহিল, "সেলাম যথেষ্ট হইয়াছে, এখন আমার ইচ্ছা, তোমরা নৃত্য কর, আমি দেখি।" ভৃত্যগণ অমনি নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। নৃত্য করিতে করিতে তাহারা রাজবাটীতে প্রবেশ করিল।

রাজোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, রাজা ঢনিবী নাসিকাগ্রে দৃষ্টি স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন। আলেলী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। কেমন করিয়া মুখে রাজনৈতিক ভাব আনিবে, মিষ্টিগ্রিস্ সেই চিন্তা করিতেছিল। এমন সময় বৃহৎ দ্বার মুক্ত হইল, সকলে বিস্মিত হইয়া দেখিল, ভৃত্যগণ নৃত্য করিতে করিতে রাজদরবারে প্রবেশ করিতেছে।

তাহাদের পশ্চাৎ জর্‌বীন আসিল। রাজপ্রাসাদের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সে কিছুমাত্র বিস্মিত হয় নাই, যেন জন্মাবধি রাজবাটীতেই বাস করিয়াছে। রাজার সম্মুখে আসিয়া, টুপি খুলিয়া তিনবার তাঁহাকে সেলাম করিল। তৎপরে টুপি পরিয়া, একটা চেয়ারে উপবেশন করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে পা দোলাইতে লাগিল।

রাজকন্যা রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, "পিতঃ! এই আমার স্বামী। কেমন সুপুরুষ, কেমন উদারপ্রকৃতি! আপনি ইহাকে ভালবাসিবেন ত?"

রাজা মন্ত্রীকে মৃদুস্বরে কহিলেন, "মিষ্টিগ্রিস্, এই ব্যক্তিকে অতিশয় সাবধানে প্রশ্ন কর। আমার ও আমার কন্যার উভয়েরই সম্ভ্রম যাহাতে বজায় থাকে, এমন করিবে। ভাল বিপদ হইয়াছে! সন্তানাদি না থাকিলে পিতারা কতই সুখী হইত!"

মিষ্টিগ্রিস্ কহিল, "মহারাজ, কোন চিন্তা করিবেন না। দয়া প্রদর্শন করা আমার কর্ত্তব্য এবং আমার পক্ষে আহ্লাদের বিষয়।" জর্‌বীনকে লক্ষ্য করিয়া—"বদমায়েস, যদি প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে ত আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহার উত্তর দে। তুই কি ছদ্মবেশী রাজপুত্র? তুই মায়াবী, কথা কহিতেছিস্ না।"

জর্‌বীন আসন ত্যাগ না করিয়াই কহিল, "বুড়া, তুইও মায়াবী নহিস্, আমিও মায়াবী নহি।"

মন্ত্রী কহিল "দুর্বৃত্ত, তুই নিরুত্তর রহিয়াছিস্, ইহাতেই তোর অপরাধ প্রমাণিত হইতেছে।"

জর্‌বীন কহিল, "যদি আমি স্বীকার করি, তাহা হইলে আমি নির্দ্দোষী হইব?"

মন্ত্রী কহিল, "মহারাজ, ইহার দণ্ড হউক্। পৃথিবী এই পাষণ্ডের ভার বহন করিতে পারিতেছে না। এই পাপিষ্ঠের পক্ষে মৃত্যু অতি লঘুদণ্ড।"

জর্‌বীন কহিল, "বুড়া, বলিয়া যা! দাঁত খিঁচাইলে ক্ষতি নাই। দেখিস্ যেন কামড়াস্ নে।"

রুদ্ধনিশ্বাসে মিষ্টিগ্রিস্ কহিল, "মহারাজ, এই মায়াবী হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য। ইহার ফাঁসি হউক, অথবা ইহাকে দগ্ধ করিতে আদেশ হউক। আপনি রাজকন্যার পিতা বটে, কিন্তু আপনি রাজা। পিতার কর্ত্তব্য অপেক্ষা রাজার কর্ত্তব্য শ্রেষ্ঠ।"

রাজা কহিলেন, "মিষ্টিগ্রিস্, তুমি অনর্গল কথা করিতে পার বটে, কিন্তু তোমার কথা কহিবার ধরণ জঘন্য। এত সুর করিয়া বলিতে হইবে না। যাহা বলিবার আছে, সমাপ্ত কর।"

মিষ্টিগ্রিস্ হাঁপাইয়া কহিল, "মহারাজ—মৃত্যু—ফাঁসি—অগ্নি।"

যতক্ষণ এই সকল হইতেছিল, ততক্ষণ আলেলী পিতৃপার্শ্ব পরিত্যাগ করিয়া, জরবীনের পাশে গিয়া উপবেশন করিল। কহিল, "মহারাজ, আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, আদেশ করুন। ইনি আমার স্বামী। ইঁহার কপালে যাহা আছে, আমারও তাহাই আছে।"

এই আচরণে লজ্জিতা হইয়া দরবারের মহিলাগণ মুখ ঢাকিলেন। মিষ্টিগ্রিস্ পর্য্যন্ত লজ্জা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া মুখ লোহিতবর্ণ করিল।

ক্রোধান্ধ রাজা কহিলেন, "হতভাগিনী! আত্ম অপমান করিয়া তুই আপনার শাস্তিবিধান আপনি করিয়াছিস্। প্রহরিগণ! এই দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া এখনি ইহাদিগের বিবাহ দাও। তৎপরে দুই জনকে একখানা নৌকায় আরোহণ করাইয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দাও।"

প্রহরিগণ আলেলী এবং জরবীনকে ধরিয়া লইয়া চলিল। মিষ্টিগ্রিস্ কহিল, "মহারাজ, আপনার তুল্য প্রতাপশালী সম্রাট্ জগতে নাই। মহারাজের দয়া, মহারাজের হৃদয়ের কোমলতা, মহারাজের স্নেহ ভবিষ্যতে লোকের আদর্শস্বরূপ হইবে এবং সকলে শুনিয়া চমৎকৃত হইবে। আমরা এরূপ উদারতা দেখিয়া বাক্যহীন হইয়াছি। মুগ্ধ হইয়া নীরবে রহিয়াছি।"

রাজা কহিলেন, "আমাকে ছাড়িয়া আমার কন্যার কি দশা হইবে? প্রহরিগণ! মিষ্টিগ্রিসকে ধরিয়া ঐ নৌকায় দাও। এমন চতুর ব্যক্তি আমার প্রিয় আলেলীর নিকট আছে জানিলে আমার মন কতক স্থির হইবে। আর এক জন নূতন মন্ত্রী হওয়াও কিছু আমোদের কথা—আমার মন ভাল থাকিবে। মিষ্টিগ্রিস্, এখন তবে বিদায় হও।"

মিষ্টিগ্রিস্ অবাক হইয়া হাঁ করিয়া রহিল। অবশেষে রাজা এবং রাজাদিগের কৃতঘ্নতা সম্বন্ধে গালি পাড়িতে আরম্ভ করিতেই প্রহরিগণ তাহাকে বাহিরে লইয়া গেল। সে কত বিনয়, কত অশ্রুপাত করিল, কত ভয় দেখাইল, কেহ তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। তিন জনকে নৌকায় তুলিয়া দিয়া তরঙ্গরাশির মধ্যে ভাসাইয়া দিল।

রাজা হনিবী এক বিন্দু অশ্রুমোচন করিয়া, অসুখে অসময়ে ভগ্ন বৈকালীন নিদ্রা সমাপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় শয়ন করিলেন।

নিস্তব্ধ রমণীয় রাত্রি; চিরচঞ্চল সমুদ্রের উপর ম্লান জ্যোৎস্নালোক পড়িয়াছে; তীর হইতে বায়ু বহিতেছে। অল্পকালের মধ্যে নৌকা অনেক দূর চলিয়া গেল। অল্পকালের মধ্যে তরঙ্গোত্থিত পুষ্পোদ্যানের ন্যায় কাম্রী নগরী দৃষ্ট হইল। জরবীন হা'ল ধরিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে কাঠুরিয়া ও নাবিকের গীত গাহিতেছিল। তাহার চরণের নিকট আলেলী নীরবে বসিয়া স্বামীর গীত শ্রবণ করিতেছিল। সে অতীত বিস্মৃত হইয়াছিল, ভবিষ্যতে তাহার কোন চিন্তা ছিল না, জরবীনের নিকট রহিয়াছে, ইহাতেই সে সন্তুষ্ট।

মিষ্টিগ্রিসের মনের ভাব অন্যরূপ। পিঞ্জররুদ্ধ সিংহের ন্যায় সে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। জরবীন অবনতমস্তকে বসিয়া নিশ্চন্তভাবে মিষ্টিগ্রিসের কথা শুনিতেছিল। দীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করা অভ্যাস না থাকাতে, মিষ্টিগ্রিসের বাক্যবিন্যাসে তাহার নিদ্রাগম হইতেছিল।

শেষে বিরক্ত না হইয়া মিষ্টিগ্রিস্ কহিল, "হতভাগা যাদুকর, তোর যদি কোন ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষমতা দেখাইবার এই সময়। তুই কোন দেশের রাজা হইয়া আমায় মন্ত্রী করিতে পারিস্ না? আধিপত্য করিবার জন্য আমার ত কিছু চাই। যদি বন্ধুদিগকে ধনী করিতে না পারিলি, তাহা হইলে তোর ক্ষমতা থাকায় লাভ কি?"

জরবীন এক চক্ষু উন্মীলন করিয়া কহিল, "আমার ক্ষুধাবোধ হইতেছে।"

আলেলী উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া কহিল, "তোমার কি খাইতে ইচ্ছা হইতেছে?"

জরবীন কহিল, "কিছু ফল খাইতে ইচ্ছা হইতেছে!"

মিষ্টিগ্রিস্ চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার পদদ্বয়ের

মধ্য দিয়া এক বাক্স ফল ঠেলিয়া উঠিল। মিষ্টিগ্রিস্ উল্টাইয়া পড়িয়া গেল।

উঠিয়া মিষ্টিগ্রিস্ মনে মনে কহিল, "হতভাগা, তোমার ক্ষমতার রহস্য বুঝিয়াছি। যাহা তুমি চাও, তাহাই যদি পাও, তাহা হইলে আমার আর ভাবনা কি? এত দিন বৃথা মন্ত্রিত্ব করি নাই। আমার যাহা ইচ্ছা হইবে, তোমারও সেই ইচ্ছা করাইব।"

জর্বীন ফল খাইতেছে, এমন সময় মিষ্টিগ্রিস হাস্যমুখে সেলাম করিতে করিতে সম্মুখে আসিয়া কহিল, "মহাশয়, আমি আপনার বন্ধু হইবার বাসনা করি। যে সময় মহাশয়ের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম, তখন আমার হৃদয়ে আপনার প্রতি কত ভক্তি ছিল, বোধ হয় আপনি বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু আপনাকে সত্য বলিতেছি, আপনার সুখের নিমিত্তই ওরূপ করিয়াছিলাম। আমার উদ্যোগেই আপনার শুভবিবাহ এত শীঘ্র সম্পন্ন হয়।"

জর্বীন কহিল, "আমার ক্ষুধাবোধ হইতেছে, কিছু ফল দাও।"

মিষ্টিগ্রিস্ পুরা মোসাহেবের ন্যায় কহিল, "এই গ্রহণ করুন। আপনার যে সকল সামান্য কর্ম্ম করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন; এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আপনার সেবা করিতে পারি, এরূপ অনুমতি দিবেন।"

আত্মগত হইয়া সে কহিল, "মহামূর্খ, আমি কি বলিতেছি, বুঝিতে পারিতেছ না। আলেলীকে আমার পক্ষ করিতে হইবে; রমণীগণকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে প্রকাশ্যে রাজনীতি সিদ্ধ হয় না।" মৃদু হাস্য করিয়া পুনর্ব্বার কহিল, 'মহাশয়, আপনার সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে, আপনি বোধ হয় বিস্মৃত হইতেছেন। রাজপুত্রীকে কিছু উপহার দিতে আপনার ইচ্ছা হইতেছে না?"

জর্বীন কহিল, "বুড়া, তুমি আমায় বিরক্ত করিতেছ। উপহার আমি কোথায় পাইব? সমুদ্রতল হইতে বুঝি? তুমি নিজে গিয়া মৎস্যদিগের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া আইস।"

সেই মুহূর্ত্তে যেন কোন অদৃশ্য হস্ত মিষ্টিগ্রিসকে ঠেলিয়া নৌকা হইতে জলে ফেলিয়া দিল, সে তরঙ্গতলে ডুবিয়া গেল।

জর্বীন যেমত ফল খাইতেছিল, নিশ্চিন্তভাবে সেইরূপ খাইতে লাগিল। আলেলী তাহার প্রতি স্নেহদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

কিয়ৎকাল পরে জর্বীন কহিল, "দেখ, একটা শুশুক ভাসিয়া উঠিয়াছে।"

শুশুক নহে, মিষ্টিগ্রিস্! ভাসিয়া উঠিয়া সন্তরণের চেষ্টা করিতেছিল। জর্বীন তাহার কেশধারণ করিয়া টানিয়া নৌকায় তুলিল। মিষ্টিগ্রিস্ দন্ত দ্বারা নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জল মাণিক্য ধারণ করিয়াছিল। যখন তাহার বাকস্ফূর্ত্তি হইল, তখন কহিল, "মৎস্যরাজসুন্দরী রাজকন্যা আলেলীকে এই উপহার দিয়াছেন। মহাশয়, এখন দেখিতেছেন যে, আমি আপনার বিশ্বাসী ও আজ্ঞাকারী ভৃত্য। যদি কখন আপনার মন্ত্রীর আবশ্যক হয়—"

জর্বীন কহিল, "আমার ক্ষুধাবোধ হইতেছে, আমায় কিছু ফল দাও।"

মিষ্টিগ্রিস্ হতাশ হইয়া অবশেষে একটা কৌশল স্থির করিয়া বলিয়া উঠিল, "মহাশয়, সম্মুখে একবার চাহিয়া দেখুন। কেমন চমৎকার!"

আলেলী কহিল, "কই, আমি ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।"

জর্বীন চক্ষু মুছিয়া কহিল, "আমিও কিছু দেখিতে পাইতেছি না।"

মিষ্টিগ্রিস্ বিস্মিতের ন্যায় কহিল, "বলেন কি? ওই যে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদ সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছে, দেখিতে পাইতেছেন না? সমুদ্রতীর হইতে বৃহৎ সোপানশ্রেণী উঠিয়াছে, সোপানাবলীর সংখ্যা এক শত, দুই পার্শ্বে কমলালেবুর বৃক্ষশ্রেণী।"

আলেলী কহিল, "রাজপ্রাসাদে স্বার্থপর মোসাহেব ও ভৃত্যবর্গ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতে হইবে। আমি সেরূপ প্রাসাদ চাহি না।"

জর্বীন কহিল, "আমিও না। তাহার অপেক্ষা কুটীর ভাল, সেখানে শান্তি পাওয়া যায়।"

ভয়ে মিষ্টিগ্রিসের কল্পনাশক্তি উত্তেজিত হইতেছিল। সে কহিল, "এ প্রাসাদ অন্য রাজপ্রাসাদের মত নহে। ইহাতে মোসাহেবও নাই, ভৃত্যও নাই, সকল কর্ম্ম অদৃশ্য হস্ত দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। গৃহস্থিত সামগ্রীসমূহের হস্ত আছে, প্রাচীরের কর্ণ আছে।"

জরুবীন জিজ্ঞাসা করিল, "তাহাদের জিহ্বাও আছে?"

মিষ্টিগ্রিস্ কহিল, "আজ্ঞে হাঁ। তাহারা কথা কয়, কিন্তু আদেশমত চুপ করিয়া থাকে।"

জরুবীন কহিল, "তাহা হইলে তোমার অপেক্ষা বুদ্ধিমান্। এরূপ প্রাসাদ হইলে আমি পাইতে ইচ্ছা করি। এই অদ্ভুত প্রাসাদ কোথায়? আমি ত দেখিতে পাইতেছি না।"

আলেলী কহিল, "এই যে তোমার সম্মুখে।"

নৌকা তীরের অভিমুখে যাইতেছিল। সেখানে নঙ্গর ফেলিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করা যায় - জল গভীর নহে। তাহাদের সম্মুখে প্রশস্ত সোপান-শ্রেণী, তাহার উপর বারান্দা। তাহার পশ্চাতে কল্পনাতীত মনোহর প্রাসাদ।

তিন জনে হৃষ্টচিত্তে সোপান আরোহণ করিল। মিষ্টিগ্রিস্ হাঁপাইতে হাঁপাইতে পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল। দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া, 'কে আছে' বলিয়া হাঁকিল।

দ্বার স্বয়ং উত্তর করিল, "কি বলিতেছ?"

লৌহদ্বার কথা কহিতেছে শুনিয়া মিষ্টিগ্রিস্ কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, "গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই।"

দ্বার কহিল, "জরুবীন এই প্রাসাদের স্বামী। তিনি আসিলে আমি স্বয়ং মুক্ত হইব।"

নবদম্পতি উপস্থিত হইবামাত্র দ্বার আপনা আপনি মুক্ত হইয়া গেল। মিষ্টিগ্রিস্ পশ্চাতে আসিল।

বারান্দায় উঠিয়া আলেলী চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রে তরঙ্গিত হইয়া সূর্য্য-কিরণে জ্বলিতেছিল।

আলেলী কহিল, "কি মনোহর স্থান! এখানে পুষ্পিত বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিতে কেমন আরাম।"

জরুবীন কহিল, "এস, আমরা বসি।"

মিষ্টিগ্রিস্ কহিল, "কিন্তু চেয়ার কোথায়?"

"এই যে আমরা, এই যে আমরা" বলিতে বলিতে চেয়ারগুলা ছুটিয়া আসিল।

মিষ্টিগ্রিস্ কহিল, "এখানে আহার করিতে বেশ।"

জরুবীন কহিল, "কিন্তু টেবিল কোথায়?"

"এই যে আমি," বলিয়া একটি সুন্দর মেহগনী টেবিল প্রৌঢ়া গৃহিণীর ন্যায় তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এইরূপে নানাবিধ আহার্য্য সামগ্রী, বাসন, ফল আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে আহারের নিমিত্ত উপবেশন করিলে মিষ্টিগ্রিস্ কহিল, "মহাশয়, দেখুন, আপনার জন্য কত করিয়াছি। এ সকল আমার কর্ম্ম।"

কোথা হইতে শব্দ হইল, "মিথ্যাবাদী!"

মিষ্টিগ্রিস্ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। একটা স্তম্ভ হইতে শব্দ নিঃসৃত হইতেছিল।

মিষ্টিগ্রিস্ জরুবীনকে কহিল, "মহারাজ, আমাকে কেহ মিথ্যাবাদী বলিতে পারে না। আমি চিরকাল সত্য কথা বলিয়াছি।"

আবার শব্দ হইল, "মিথ্যাবাদী!"

মিষ্টিগ্রিস্ মনে মনে কহিল, "এই প্রাসাদ বড় ভয়ানক! যদি প্রাচীর সত্য কথা কয়, তাহা হইলে আমি কখন মন্ত্রী হইতে পারিব না। এ বন্দোবস্ত বদ্লাইতে হইবে।" প্রকাশ্যে কহিল, "মহারাজ, এই জনশূন্য প্রাসাদে বাস করার অপেক্ষা সেনা এবং প্রজাগণে বেষ্টিত হইয়া বাস করা ভাল বিবেচনা করিতেছেন না? প্রজাগণ কর দিবে।"

জরুবীন কহিল, "রাজা হইব? কেন?"

আলেলী কহিল, "প্রিয়তম! আমরা এইখানেই থাকিব। আমরা দুই জনেই এখানে অত্যন্ত সুখে আছি।"

মিষ্টিগ্রিস্ কহিল, "সকলেই। আমি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। যে সময় আমি আপনাদের নিকট থাকি, তখন আমি আর কিছু চাহি না।"

শব্দ হইল, "মিথ্যাবাদী!"

মিষ্টিগ্রিস্ কহিল, "মহারাজ, এ কথা আপনি শুনিবেন না। আমি আপনাকে নিশ্চিত বলিতেছি, আপনাকে ভক্তি ও মান্য করি।"

আবার কঠোর শব্দ হইল, "মিথ্যাবাদী!"

জরুবীন কহিল, "যদি তোমার সকল কথাই মিথ্যা, তাহা হইলে তুমি চন্দ্রলোকে চলিয়া যাও। মিথ্যাবাদী-দিগের সেই দেশ।"

এই কথা বলিবামাত্র মিষ্টিগ্রিস্ তীরের ন্যায় আকাশে উঠিয়া মেঘের অন্তরালে অদৃশ্য হইল।

সে আর কখন ফিরিয়া আসিয়াছে কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু ঐতিহাসিকেরা কেহ কেহ বলেন যে, অন্য নাম ধারণ করিয়া সে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে যাহাই হউক, যে রাজবাটীতে প্রাচীর পর্য্যন্ত সত্য কথা কয়, সেখানে তাহাকে কেহ দেখিতে পায় নাই।

তখন তৃতীয় ব্যক্তি কেহ রহিল না। জরবীন সমুদ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল, আলেলী সুখস্বপ্নের কল্পনা করিতেছিল। রম্য নির্জ্জনের মধ্যে প্রিয়তমের সঙ্গে বাস করা অপেক্ষা মধুরতর স্বপ্ন কি আছে? আলেলী জরবীনের হস্তধারণ করিয়া নূতন গৃহ পরিদর্শন করিতে গমন করিল। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সুন্দর তৃণভূমি, তাহার মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী বহিতেছে। নানাবিধ বৃক্ষপরিপূর্ণ উপবন, তৃণের উপর দীর্ঘ তরুচ্ছায়া পড়িয়াছে। বৃক্ষের শাখায় বিহঙ্গ গান করিতেছে।

আলেলী পুলকিতচিত্তে জরবীনকে কহিল, "এখানে কি তুমি সুখী নও? তোমার আর কিসের ইচ্ছা হইতে পারে?"

জরবীন কহিল, "আমার কখন কোন ইচ্ছা হয় নাই। কল্য হইতে কুঠার লইয়া আবার কাঠ কাটিতে আরম্ভ করিব। এখানে অনেক কাষ্ঠ আছে। স্বচ্ছন্দে এক শত বোঝা সংগ্রহ করিতে পারিব।"

আলেলী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "আমায় তুমি ভালবাস না দেখিতেছি।"

জরবীন কহিল, "তোমায় ভালবাসিব? সে আবার কি? আমি তোমায় কোনরূপ দুঃখ দিতে চাহি না—আমার কিছুমাত্র সে ইচ্ছা নাই। এই প্রাসাদ আমাদের—যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহা তোমার হইল। তোমার পিতাকে ডাকাইয়া পাঠাও, আমি খুসী হইব। আমি কাঠুরিয়া হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কাঠুরিয়াই থাকিব। রোদন করিও না। আমি তোমাকে দুঃখ দিতে চাহি না।"

আলেলী কাতরস্বরে বলিল, "জরবীন, তুমি কেন এরূপ করিতেছ? আমি কি এতই কুৎসিত ও অপ্রিয় যে তুমি আমায় ভালবাসিতে পার না?"

"তোমায় ভালবাসিব? সে কর্ম্ম আমার নয়। রোদন করিও না, কথা শুন। আবার অশ্রুপাত! আচ্ছা, যদি তাহা হইলেই তুমি সন্তুষ্ট হও ত আমি তোমায় ভালবাসিতে ইচ্ছা করি।"

আলেলী বাষ্পরুদ্ধ চক্ষু তুলিয়া জরবীনের চক্ষে আপনার প্রগাঢ় চিরস্থায়ী প্রেম প্রতিবিম্বিত দেখিল। তখন অশ্রু ভেদ করিয়া তাহার মুখে হাসি ফুটিল।

সেই সময় জলদেবী রাজা হানিবার হস্ত ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইলেন। রাজা কন্যা এবং মন্ত্রীর অদর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। কন্যা ও জামাতাকে দেখিয়া আনন্দিত চিত্তে তাহাদিগকে আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন।

জলদেবী দম্পতিকে সতত রক্ষা করিতে লাগিলেন। জরবীন ও আলেলী জগৎকে বিস্মৃত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।

জরবীনের বুদ্ধির অভাব একেবারে দূর হইয়া গেল। না যাইলেও ক্ষতি ছিল না, কারণ, দম্পতীর মধ্যে এক স্ত্রীর বুদ্ধি দুই জনের বুদ্ধির সমান।

বন্ধু

প্রথম পরিচ্ছেদ

—*—

"খোজত ফিরোঁ সাবি বন বন,
কতহু না মিলে যত্নকে নন্দন,
কওন সওয়ত বশ কিহু মোহন।"

কাননের অপর প্রান্ত হইতে আর এক জন গায়িল—

"মোরা স্বজন হয় ফুল গুলাবী
মৈকলিয়া চম্পে কে স্বজন
কওন সওয়ত বশ কিহু মোহন!"

যে পূর্ব্বে গায়িতেছিল, সে আর একটু কোমল সুরে গায়িল—

"মলুকে থাক্ বিভূতি রমায়েঁ।
ওড় লিয়েঁা গেরুয়া বস্তর,
তেরে কারণ ময় ভয়হু যোগীন্।"

কানন প্রতিধ্বনিত করিয়া উত্তর আসিল—

"বালাপন্ কি লাগ লগন,
ছোড়ত নহি কর কোটি যতন,
স্বজন মুখড়া ন দেখলা যা মনমোহন।"

দুই জনে কণ্ঠ মিলাইয়া আনুপূর্ব্বিক গায়িল—

"স্বজন মুখড়া দেখলা যা মনমোহন।
ফুক বাঁশিয়া বাজা যা-বে, তপন হিয়া বুঝা যারে,
মহারাজা হো!
বালাপন্ কি লাগ লগন,
ছোড়ত নহি কর কোটি যতন।
মলুকে থাক বিভূতি রমায়োঁ,
ওড় লিয়েঁা গেরুয়া বস্তর,
তেরে কারণ ময় ভয়হু যোগীন্।
খোজত ফিরোঁ সারি বন বন,
কতহু না মিলে যত্নকে নন্দন,
কওন সওয়ত বশ কিহু মোহন!
মোরা স্বজন হয় ফুল গুলাবী,
মৈকলিয়া চম্পে কে স্বজন,
কওন সওয়ত বশ কিহু মোহন!"

শ্রাবণের গঙ্গা স্ফীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গঙ্গাতীরে কাননে গরু-মহিষ চরিতেছে। সেই কাননে দুই যুবক গান করিতেছিল।

পরপারে চড়া ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। কোন স্থানে জল উঠিয়াছে, ছোট ছোট ঝাউগাছের মাথা জাগিয়া আছে। প্রয়াগ হইতে কিছু পূর্ব্বে একটি ছোট গ্রামের সম্মুখ দিয়া গঙ্গা বহিতেছে। বর্ষা সবে আরম্ভ হইয়াছে, এখনও গঙ্গা ও বর্ষার জল মিশিয়া চারিদিক্ জলাকীর্ণ হয় নাই। ক্ষেত্রের স্নিগ্ধ শ্যাম শোভা এ পর্য্যন্ত জলমগ্ন হয় নাই। চারিদিকে পুলকিত প্রকৃতিমূর্ত্তি। তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে আনন্দ, আবর্ত্তে নৃত্য। ধরণীর অঙ্গে উজ্জ্বল শ্যাম অম্বর। আকাশে জলভরা মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জন। প্রাণী পুলকে মগ্ন; নরনারী উল্লসিত। গ্রামে বৃক্ষে বৃক্ষে হিন্দোলা ঝুলিতেছে; বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী দোল খাইতেছে। স্ত্রীলোকেরা মিলিয়া শ্রাবণের কজরি গাহিতেছে—"অইলে সাওয়ন কি মহীনওয়াঁ সব সখী খেলে কজরি।"

রোশন ও মোহন বাল্যবন্ধু। উভয়ে জাতিতে আহীর। রোশন কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ। বাল্যকাল হইতে সে ব্যায়ামপটু। মোহন বুদ্ধিমান, কিন্তু তাদৃশ বলবান্ ছিল না। দুই জনে একত্রে গোচারণ করিত, জলে সন্তরণ করিত, দুগ্ধ-দধি বিক্রয় করিতে যাইত। আজ এই শ্রাবণমাসের প্রারম্ভে গঙ্গাতীরশোভী কাননে উভয়ে গীত গাহিতেছিল। সেই কাননের সহিত কত বাল্যক্রীড়া কৌতুকের স্মৃতি বিজড়িত ছিল।

প্রথম-বর্ষাবারিসিঞ্চনে তপ্ত ধরণী হইতে মৃত্তিকার গন্ধ নিঃসৃত হইতেছিল। আকাশে মেঘ ঘনীভূত হইতেছিল, গম্ভীর মেঘনির্ঘোষে চারিদিক ধ্বনিত হইতেছিল। গীত সমাপ্ত হইলে রোশন ও মোহন কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইল। নবীন বর্ষাগমে গঙ্গার জল স্ফীত হইয়া কল কল করিয়া ছুটিতেছিল। রোশন কহিল, "মোহন, মনে পড়ে, এক দিন তুমি এইখানে আর একটু হইলে ডুবিয়া যাইতে। আমি তোমায় রক্ষা করিয়াছিলাম।"

মোহন রোশনের হাত ধরিয়া কহিল, "আমি কি ভুলিয়া গিয়াছি? কখন কি ভুলিতে পারিব?"

দুই জনে লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া ছিল। রোশনের লাঠিতে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে তৈলনিষিক্ত ছিন্ন বস্ত্র জড়িত ছিল। বহু যত্নে রোশন সেই লাঠি রক্ষা করিত। লাঠির প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া সঙ্গীকে কহিল, "আমার লাঠি কেমন হইয়াছে দেখ।"

মোহন লাঠি হাতে করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। লাঠি পাকা বাঁশের, অত্যন্ত কঠিন ও ভারি। মোহন কহিল, "খুব মজবুত লাঠি।"

রোশন লাঠি লইয়া মাটীতে ঠুকিতে লাগিল। কহিল, "একবার দাঙ্গা হয় ত লাঠির গুণ দেখাই।"

মোহন হাসিয়া কহিল, "লাঠি থাকিলেই কি দাঙ্গা করিতে হয় নাকি?"

রোশন বিরক্তভাবে কহিল, "এখনকার লোকগুলা কোন কাজের নয়। আগে দুই গ্রামে প্রায় দাঙ্গা হইত। লাঠি মাঝে মাঝে না চালাইলে অভ্যাস থাকে না।"

এইরূপ কথাবার্তা কহিতে কহিতে দুই জনে গ্রামে ফিরিল। কাননের ভিতর দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ। রোশন অগ্রগামী হইল, মোহন তাহার পশ্চাতে চলিল। বৃক্ষশাখায় বহুবিধ পক্ষী কোলাহল করিতেছিল। রোশন তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে, গাহিতে গাহিতে চলিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে মোহন তাহার হস্তধারণ করিয়া ভীত হইয়া কহিল, "খবরদার!"

"কি হইয়াছে?" বলিয়া রোশন পশ্চাতে চাহিল। তাহার পার্শ্বে, দুই হস্ত দূরে একটা গোক্ষুরা সর্প যাইতেছিল, সে দেখিতে পায় নাই। সম্মুখে মনুষ্য ও তাহার হস্তে লাঠি দেখিয়া সর্প ফোঁস করিয়া ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল বিলম্ব হইলেই রোশন দংশিত হইত। কিন্তু সর্প যেমন ফণা তুলিল, অমনি পশ্চাৎ হইতে মোহন তাহার মাথায় লাঠি মারিল। চূর্ণমস্তক হইয়া সর্প পতিত হইল। মৃত সর্প দেখিয়া রোশন হাসিল। মৃত্যুভয় তাহারা জানিত না। কহিল, "মোহন, আমি একবার তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। আজ তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিলে; ঋণ শোধ হইয়া গেল।"

মোহন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়া কহিল, "তোমার যেমন ইচ্ছা হয় মনে কর, কিন্তু আমি জানি, কখন ঋণমুক্ত হইতে পারিব না। বন্ধুত্বে কি সামান্য উপকার-ঋণ মনে করিতে আছে?"

রোশন কহিল, "আমি যাহা বলিলাম, সেই কথাই ঠিক।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নবীন বর্ষা চঞ্চল। মেঘ জলভারে অবনত, কিন্তু চঞ্চল, চঞ্চল বিদ্যুৎ, বায়ু চঞ্চল, জলস্রোত চঞ্চল; স্বদেশে প্রবাসে মানুষের মন চঞ্চল, পৃথিবী চঞ্চলা। শাখাবিলম্বিত ঝুলনা মনের মত চঞ্চল।

বিশাল অশ্বত্থ বট-গাছ গ্রামের চারিদিকে, নব বর্ষাসারে ধৌত উজ্জ্বল শ্যাম; শাখায় হিন্দোলা ঝুলিতেছে। গান গাহিয়া গাহিয়া গ্রামের যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা দুলিতেছে। বৈকালবেলা রোশন ও মোহন গ্রামের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। হাসিতে হাসিতে যৌবনের বলদর্প-আনন্দে লঘুগতি, বেগে গমন করিতেছিল। সমবয়স্ক কাহারও সহিত দেখা হইলে দুই একটা আমোদের কথা কয়। কখনও কোন বালকের হিন্দোলা ধরিয়া বেগে দোলাইয়া দেয়, সে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে, দুই বন্ধু হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়। স্ত্রীলোক হইলে দূর হইতে তামাসা করে, হিন্দোলায় হাত দেয় না।

গ্রামের এক প্রান্তে একটা আমবৃক্ষে একটা হিন্দোলা দুলিতেছিল। সে দিকে লোকজন বড় ছিল না। দুলিতেছিল একটি যুবতী, দোলাইতেছিল আর দুই জন যুবতী। তাহাদিগকে দেখিয়া মোহন থমকিয়া দাঁড়াইল কহিল, "ও দিকে আমরা যাইব না, ফিরিয়া চল।"

রোশন বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন?"

মোহন কহিল, "সুভাগীয়া ভাল স্ত্রীলোক নয়। তাহার নামে লোকে অনেক কথা বলে।"

রোশন কহিল, "সেই জন্য কি এ পথ দিয়া চলিতেও বারণ?"

মোহন কহিল, "তা না হউক, এখন ও দিকে যাইবার আবশ্যক কি?"

রোশন কহিল, "অন্যদিকে যেমন আবশ্যক, এ দিকেও সেইরূপ আবশ্যক।"

দুই জনের মাঝে যে বসিয়া দুলিতেছিল, সেই সুভাগীয়া। দুই হাত হিন্দোলার দড়ী ধরিয়াছিল। গোল, মসৃণ বাহুযুগল দোলনের সঙ্গে নামিতেছিল, উঠিতেছিল, পূর্ব্বে যাইতেছিল, পশ্চিমে আসিতেছিল। পায়ের ঘুঙ্গুর মাঝে মাঝে বাজিতেছিল, দোলনের বেগে ওড়না পশ্চাতে উড়িতেছিল। রোশন ও মোহনকে দেখিয়া সে হাসিল। হাসি

ফুটিল না, মুখে হাসির শব্দ হইল না। চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত হইয়া আসিল, অপাঙ্গ হইতে দুই চারিবার বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল, ঘুঙ্গুর দুই চারিবার মৃদু মৃদু বাজাইল।

রোশন কহিল, "কেমন হাত! কেমন চোখ!"

মোহন কহিল, "মাগীর মুখ দেখিতে নাই!"

সুভাগীয়ার অঙ্গভঙ্গী, তাহার চক্ষের কটাক্ষ দেখিয়া রোশনের পা জড়াইতে লাগিল, পূর্ব্বে যেমন বেগে গমন করিতেছিল, তেমন আর পারিল না; হিন্দোলায় উপবিষ্ট যুবতীকে দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। যাহারা সুভাগীয়াকে দোলাইতেছিল, তাহারা কজরি গাহিতেছিল। রোশন ও মোহন তাহাদের দর্শনাতীত হইতেই সুভাগীয়া কজরির সুর ভঙ্গ করিয়া অন্য সুরে গাহিল—

"শ্যামলিয়া কি নটকী চাল জিয়া মে মেরো
বস গই রে!
তন মন হিয়া মে বস গই রে।"

রোশন হাসিয়া মোহনকে জিজ্ঞাসা করিল, "শ্যামলিয়া কে?"

মোহন রাগিয়া কহিল, "ওই জানে। ওর ভাবনা কি?"

কিছু দূর গিয়া রোশন কহিল, "ফিরিয়া চল!"

মোহন বলিল, "কোথায়?"

রোশন কহিল, "যে পথে আসিয়াছি, সেই পথে।"

মোহন কহিল, "ঐ মাগীকে তোমার দেখিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, একেলা যাও। আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।"

রোশন কহিল, "কেন, তোমাকে ধরিয়া রাখিবে না কি? তোমার মত ত আমি লোক দেখি নাই। আইস।" বলিয়া মোহনের হাত ধরিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক ফিরাইল। মোহন বল প্রকাশ না করিয়া তাহার সঙ্গে চলিল।

সুভাগীয়া পূর্ব্বের মত দুলিতেছিল। যুবকদ্বয় ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া সে আহ্লাদ গোপন করিবার চেষ্টা করিল না। তাহাদিগকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল। তাহারা সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগের পশ্চাতে গীতখণ্ড নিক্ষেপ করিল।

"কদ অই হে শ্যাম বংশীওয়ালা হমরি ওয়রিয়া না!"

রোশন পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া সুভাগীয়া ঈষৎ হস্তপ্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গনের ভঙ্গী করিল। রোশন হৃদয়ের আবেগে গাইল উঠিল,—

"তুনে আঁখ বতাকে মারা মুঝে
দিয়া পলক পলক ইশারা মুঝে!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রামের বাহিরে একখানি চালাঘরে সুভাগীয়া একা বাস করিত; কোথা হইতে আসিয়াছিল, কেহ জানিত না। কিছুদিন পূর্ব্বে গ্রামে আসিয়া, অল্প জমী লইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। রকমে বোধ হইত, অর্থের তেমন অভাব নাই। বিধবা বলিয়া পরিচয় দিত। কিন্তু তাহাদের জাতিতে দ্বিতীয়বার বিবাহে কোন বাধা ছিল না। সগাই না করিয়া সে এমন একা থাকে, তাহাতে লোকের মনে সন্দেহ হইত। তাহার রকম সকম দেখিয়া সন্দেহের কারণও ছিল। সুভাগীয়া যুবতী, একা থাকে, যাহাকে দেখে, তাহার সহিত ঠাট্টা-তামাসা করে, গ্রামের মন্দ স্ত্রীলোকদিগের সহিত গল্প গান করে। এ পর্য্যন্ত আর কিছু কেহ দেখিতে পায় নাই; কিন্তু তাহার ব্যবহারে সকলেই তাহাকে সন্দেহ করিত।

মোহন রোশনকে এই সকল কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিল। সুভাগীয়ার সঙ্গে কথা কহিলেও লোকে নিন্দা করিবে। রোশন যুবাপুরুষ, তাহারই বা মনের ঠিক কি? রোশন সকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিত। গ্রামের লোকে কি বলে, সে জন্য তাহার ত বড় ভয়! দুটা কথা কহিতে দোষ কি? মোহন যেমন, স্ত্রীলোককে পর্য্যন্ত ভয় করে!

এক দিন মোহন ও রোশন গঙ্গায় স্নান করিতেছিল। একটানা স্রোত, বেগ বাড়িয়াছে। দূরে স্ত্রীলোকেরা স্নান করিতেছিল। মোহন ও রোশন অনেকক্ষণ হইতে জলে ছিল। অন্যান্য স্নানকারীরা উঠিয়া যাইতেছিল। স্ত্রীলোকেরাও উঠিয়া গিয়াছিল। এক জন কেবল জলের মধ্যে গ্রীবা পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া বসিয়া ছিল। তাহাকে দেখিয়া মোহন জল হইতে উঠিয়া যাইতে চাহিতেছিল। রোশন উঠিতে চায় না। সুভাগীয়া তাহাদিগকে দেখিয়াও যেন দেখিতেছিল না। যখন আর সকলে উঠিয়া গেল, সুভাগীয়া সন্তরণ

করিয়া গভীর জলে গেল। রোশন মোহনকে কহিল, "আইস, আমরাও যাই।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রোশন জল ঠেলিয়া সুভাগীয়ার অভিমুখে চলিল। মোহন তাহাকে তিরস্কার করিয়া কহিল, "তোমার কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই? মাঝ গঙ্গায় উহার সহিত সাঁতার দিতে যাইতেছ?" রোশন ফিরিল। মোহনও তাহার সঙ্গে চলিল। কিছু দূর গিয়া সুভাগীয়া ফিরিয়া তাহাদিগকে দেখিল। কপট ক্রোধ করিয়া কহিল, "তোমরা যে আমার পিছনে আসিতেছ?"

রোশন কহিল, "অধিকক্ষণ পিছনে থাকিব না। এখনি তোমার পাশে যাইতেছি।"

সুভাগীয়া একটা গালি দিল। কূলের দিকে চাহিয়া দেখিল, গ্রাম হইতে অপর স্নানকারীরা আসিতেছে। আর কিছু না বলিয়া ডুব দিল। অনেক দূরে গিয়া তীরের নিকট উঠিল। জল হইতে উঠিয়া গৃহাভিমুখে গেল। রোশন ও মোহন তীরে ফিরিয়া আসিল। গৃহে যাইতে পথে মোহন কহিল, "এত করিয়া তোমায় বুঝাইতেছি, তুমি বুঝিতেছ না? তুমি খেলা মনে করিতেছ, কিন্তু সে ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমি তোমায় বলিতেছি, সুভাগীয়া সাক্ষাৎ সর্পিণী।"

রোশন যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল। অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে কহিল, "তাহা হইলে আমি তাহার বিষদাঁত ভাঙ্গিব।"

মোহন রোশনের হাত ধরিয়া কহিল, "তোমার কাজ কি ভাই? ও কেবল তোমাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছে। তুমি উহার ছলনায় ভুলিও না। আজ তোমাকে মজাইবে, কাল তোমাকে ত্যাগ করিয়া আর কাহারও সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিবে। বাল্যকাল হইতে আমি কখন তোমায় অপ্রিয় কথা বলি নাই। এখন তুমি নিজের হৃদয় বুঝিতে পারিতেছ না, সেই জন্য আমার কথা ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু যাহা বলিলাম, তাহা মনে রাখিও।"

রোশন কহিল, "তোমার কথায় জ্বালাতন হইয়াছি। হয় চুপ কর, না হয় আমার সঙ্গ ছাড়।"

মোহন নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চুপ করিল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি পড়িতেছিল। শ্রাবণের বৃষ্টি চাপিয়া আসিয়াছিল। বৃষ্টির পূর্ব্বে বজ্র, বিদ্যুৎ বিলসিয়া গর্জ্জিয়া গিয়াছিল। অন্ধকার হয় নাই। সুভাগীয়া আপনার দরজার ভিতরে দাঁড়াইয়াছিল। সম্মুখে এক বটগাছের তলায় রোশন দাঁড়াইয়াছিল। বৃষ্টি দেখিয়া যেন সেই স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহার সঙ্গে মোহন ছিল না। বৃষ্টি ক্রমে ছাড়িয়া আসিল; কয়েকবার মেঘ ডাকিল, বিদ্যুৎ চমকিল, বজ্রনির্ঘোষ ও বিদ্যুৎপ্রভা ক্রমে দূরে চলিয়া গেল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই অবকাশে রোশন একটা কজরির এক কলি গাহিল,—

"কতনেকে বেচবে মছুইনীয়া সিঙ্গিয়া এ মছরিয়া,
কতনেকে বেচবে বালা যোবনওয়া?"

সুভাগীয়া হাসিয়া তৎক্ষণাৎ পরের কলিতে উত্তর দিল,—

"আনিয়া দুআনিয়া রাজা সিঙ্গিয়া এ মছরিয়া,
লাখ ত রূপইয়া বালা যোবনা।"

সেই বৃষ্টি-বাদলের সন্ধ্যার সময় বিকিকিনি হইয়া গেল। কিনিল সুভাগীয়া, বিকাইল রোশন। বিনা মূল্যে, সাধিয়া, নিজে উপযাজক হইয়া বিকাইল। আর লক্ষ মুদ্রা মূল্যের সুভাগীয়ার বালা-যৌবন কে কিনিয়াছিল, কে জানে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেই অবধি রোশন উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। পথ চলিতে পূর্ব্বপরিচিত বন্ধুদিগের সহিত কথা কয় না, মোহনের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বন্ধ করিল। নির্লজ্জ হইয়া প্রকাশ্যরূপে সুভাগীয়ার সহিত বাস করিতে লাগিল। সুভাগীয়া ব্যতীত পৃথিবীতে যেন তাহার আর কেহই রহিল না। সুভাগীয়ার স্নানের সময় তাহার পিছনে পিছনে যাইত, সে দোলায় বসিলে তাহাকে দোলাইত, সে যে কর্ম্ম করিতে আদেশ করিত, তাহাই করিত। মুহূর্ত্তমাত্র সুভাগীয়া দৃষ্টির অন্তরাল হইলে পৃথিবী অন্ধকার দেখিত। যৌবনের দর্পতেজ গেল, মনের বল গেল, স্ফূর্ত্তি গেল, জীবনের অন্য বন্ধন গেল, রহিল কেবল সুভাগীয়া। সুভাগীয়া মায়াপাশ বিস্তার করিয়া তাহার হৃদয়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বন্ধন করিল, রোশন নিস্তেজ, নিশ্চেষ্ট হইয়া তাহার পদতলে পড়িয়া রহিল। গ্রামের লোক বলিল, সুভাগীয়া তাহাকে যাদু করিয়াছে।

সুভাগীয়ার পক্ষে এ সকল শুধু খেলা। গ্রামের

লোক তাহাকে ঘৃণা করিত, তাহার অখ্যাতি করিত, তাহাতে তাহার একটু রাগ হইয়াছিল। এই জন্য যাহাকে গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, কান্তিবিশিষ্ট দেখিল, তাহাকে হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিল। তাহার শরীরের মনের বল হরণ করিল, তাহাকে লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

কিছু দিন গেল। সুভাগীয়া মোহনকে রোশনের সঙ্গে দেখিয়াছিল, কিন্তু আর বড় একটা তাহাকে দেখিতে পাইত না। রোশন তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল, আর মোহন? মোহনের যে চিত্ত বিচলিত হয় নাই, সুভাগীয়ার তাহা মনে হইল না। সে বুঝিল, রোশন তাহার নিকটে আছে বলিয়া, মোহন দূরে থাকে। সে মনে মনে হাসিল। রোশনের সঙ্গেই সে কি চিরকাল কাটাইবে নাকি? এক দিন রোশনকে জিজ্ঞাসা করিল, "সেই যে বন্ধুটি তোমার সঙ্গে বেড়াইত, সে কোথায়?"

রোশন কহিল, "জানি না।"

সুভাগীয়া হাসিয়া কহিল, "তুমি কি সকলকে ভুলিয়া গেলে নাকি?"

রোশন স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখ দেখিয়া কহিল, "তোমাকে ত ভুলি নাই।"

সুভাগীয়া কহিল, "যদি এমন বন্ধুকে ভুলিতে পার, তাহা হইলে আমাকে ভুলিতে কতক্ষণ?"

রোশন কহিল, "তোমার জন্যই সব ভুলিয়াছি। তোমাকে ভুলিব মনে করিলে ভুলিতে পারিব না।"

সুভাগীয়া রোশনের স্কন্ধে হস্ত দিয়া, তাহার চক্ষে আপন চক্ষু হইতে তরল বৈদ্যুতা ঢালিয়া দিয়া কহিল, "দেখ, তোমার সঙ্গে তোমার কোন বন্ধু দেখা করিতে আসে না, ইহা আমার ভাল লাগে না।"

রোশন অনিমেষ নয়নে সুভাগীয়ার মুখ দেখিতে দেখিতে কহিল, "আমি কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে চাই না।"

সুভাগীয়া কহিল, "তুমি চাও আর না চাও, সকলে তোমায় এরূপ করিয়া ত্যাগ করিলে আমার অপমান হয়।"

"কিসে?" রোশন বিস্মিত হইল।

"কেন, আমার কাছে আছ বলিয়া কি কেহ তোমার ছায়া মাড়াইবে না? আমি কি এতই অধম না কি? যদি আমার জন্য তোমায় সকলে ত্যাগ করে, তাহা হইলে আমার কাছে তোমার না থাকাই ভাল।"

রোশন কিছু কর্কশ স্বরে কহিল, "ও কথা বলিও না।" সুভাগীয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মুখ নাড়িয়া কহিল, "বলিব না কেন? তুমি যদি আমার একটাও কথা না শুন, তাহা হইলে যাহা ইচ্ছা হয় বলিব, যাহা হয় করিব।"

রোশন কহিল, "তোমার কি কথা শুনি নাই?"

"এই যে কথা এখনি বলিতেছিলাম। তুমি এখানে থাকিলে তোমার সঙ্গে কেহ দেখা করিতে আসে না কেন? যে বন্ধু তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা বেড়াইত, সে কেন আসে না? তাহাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আনিতে হইবে।"

"তাহাই হইবে," বলিয়া রোশন উঠিল।

মোহন রোশনের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছিল, কিন্তু সে কি করিবে? পথে সাক্ষাৎ হইলে রোশন তাহার সহিত কথা পর্য্যন্ত কহিত না। রোশনকে সম্মুখে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল।

রোশন লজ্জিত হইয়া কহিল, "মোহন, আমি তোমার নিকট অত্যন্ত অপরাধী!"

মোহন কহিল, "আমার কোন অপরাধ কর নাই; তুমি নিজের নিকট অপরাধী।"

রোশন কহিল, "তোমার কাছে একটি অনুরোধ আছে।"

মোহন কহিল, "কি অনুরোধ?"

"তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে!"

"কোথায়?"

"যেখানে আমি থাকি।"

"সুভাগীয়ার গৃহে? তুমি কি পাগল হইয়াছ?" মোহন বড়ই বিস্মিত হইল।

"হাঁ, আমি পাগল হইয়াছি। তুমি পাগলের একটি কথা রাখ।"

মোহন বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া কহিল, "তুমি ত জান, এ কথা আমি শুনিতে পারিব না। কেন বলিতে আসিয়াছ?"

রোশন কহিল, "আমি তোমায় মিনতি করিয়া কহিতেছি। এই কথাটি তোমায় রাখিতে হইবে।"

মোহন দেখিল, রোশনের চক্ষে জল আসিয়াছে। সেই গর্ব্বিত, উদ্ধত যুবক, তাহার এই দশা!

মোহন কহিল, "এ কথা কি তুমি নিজে মনে করিয়াছ?"

"না।"

"তবে কে ?"

"সুভাগীয়া ।"

"কেন ?"

"সে বলে, তুমি যদি পূর্ব্বের মত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না কর, তাহা হইলে তাহাতে তাহার বড়ই অপমান হয় ।"

"যদি না যাই ?"

"আমি বলিয়াছি, তুমি আসিবে। তুমি না গেলে আমি মিথ্যাবাদী হইব ।"

মোহনের মনে মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা হইল, কিন্তু রোশনকে কিছু বলিল না। তাহার সঙ্গে সুভাগীয়ার গৃহে গেল ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মোহন যেমন শঙ্কিত হইল, তেমনি তাহার মনে একটু আশা হইল। রোশন এত দিন একেবারে হাত-ছাড়া হইয়াছিল। এখন তাহাকে বুঝাইবার অবকাশ হইবে। সুভাগীয়ার মোহ চিরকাল থাকিবে না। যাহাতে তাহার হাত হইতে রোশন শীঘ্র শীঘ্র রক্ষা পায়, মোহন তাহাতে যত্নবান্ হইবে।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই মোহন নিজে বিপদে পড়িল। রোশনের অবর্ত্তমানে সুভাগীয়া যেরূপ আচরণ করিত, তাহাতে মোহনের রাগও হইত, ভয়ও হইত। মোহন জানিত, সুভাগীয়া মন্দ স্ত্রীলোক, কিন্তু সে ভাবিত যে, হাজার মন্দ হইলেও এরূপ ব্যবহার করিতে পারে না। মোহনকে একা দেখিলে অর্থপূর্ণ গান করিত। হাসি-তামাসা করিত। ঘুরিয়া ফিরিয়া, তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া, মৃদু মৃদু গান করিত, "তেরো নয়নোঁনে যাদু ভারা !"

অভিনয় বিপরীতরূপ হইল। মোহন যেন লজ্জা-বতী প্রেমরসানভিজ্ঞা কিশোরী, আর সুভাগীয়া যেন আগ্রহপূর্ণ যুবাপুরুষ। মোহন পলায়ন করে, সুভা-গীয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হয়। এরূপ লুকাচুরী অধিক দিন চলিল না। অবসর বুঝিয়া এক দিন সুভাগীয়া স্পষ্ট কথা পাড়িল। কহিল, "তুমি কি কিছু বুঝিতে পার না ?"

মোহন বলিল, "কি বুঝিতে পারি না ?"

সুভাগীয়া কহিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি, দেখিতে পাও না ?"

মোহন কহিল, "তোমাতে আমাতে ও কথা হইতেই পারে না।"

"কেন ?"

"রোশন ও আমি এক রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইতে পারি না।"

সুভাগীয়া কহিল, "রোশন কে ? তোমাকে পাই-বার আশায়ই ত রোশনকে এখানে আসিতে দিই। তুমি বল ত আজই উহাকে বিদায় করিয়া দিব। উহার প্রতি আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছি। তোমার সম্মুখে রোশন কোন্ ছার !"

মোহন কহিল, "রোশনকে ত্যাগ কর, সে তোমার ইচ্ছা। কিন্তু আমি কখন তোমার জার হইব না।"

সুভাগীয়া কহিল, "তোমার মত কঠিন পুরুষ ত আমি দেখি নাই। সকলে আমায় সুন্দরী বলে, তুমি কি আমায় সুন্দর দেখ না ? আমি তোমাতে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি, আমায় নিরাশ করিও না।" বলিয়া, অধীর হইয়া, সুভাগীয়া মোহনের হাত ধরিল।

মোহন রাগিয়া, তাহাকে যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিল। হাত ছাড়াইয়া লইয়া বেগে চলিয়া গেল।

রোশন বাহিরে কোথায় গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সুভাগীয়া ওড়নায় মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে ?"

সুভাগীয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "তোমার জন্যই আমার এই অপমান হইল।"

রোশন কহিল, "অপমান ? কে তোমার অপমান করিয়াছে ?"

সুভাগীয়া পূর্ব্ববৎ কহিল, "তোমার ঐ বন্ধু মোহন দেখিতে ভালমানুষ, উহার মনে এই ছিল, কে জানে ?"

রোশন কহিল, "মোহন কি করিয়াছে ?"

সুভাগীয়া মুখ আরও ঢাকিল। বলিল, "লজ্জার কথা তোমায় কি বলিব ? আমাকে একেলা পাইয়া, এখানে আসিয়া, আমায় বেইজ্জৎ করিবার চেষ্টা করিয়া-ছিল। বলিল, 'রোশন মূর্খ, পাগল, উহাকে দেখিয়া তুমি ভুলিয়াছ ? রোশনকে তাড়াইয়া দিয়া আমার সহিত বাস কর।' আমি তাহার কথায় অসম্মত হও-য়াতে বলপ্রকাশ করিতে উদ্যত হইল। আমি তোমার নাম ধরিয়া চীৎকার করাতে চলিয়া গেল। আমি লজ্জায়, ঘৃণায় মরিয়া যাইতেছি।"

রোশন কোন কথা না কহিয়া, লাঠি তুলিয়া লইয়া বাহির হইল।

মোহন গ্রামের অপর যুবকদিগের সহিত কথোপকথন করিতেছিল। রোশন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে রুদ্ধ স্বরে কহিল, "পাপিষ্ঠ. ভণ্ড! বন্ধু হইয়া এই কাজ!"

মোহন অবাক্। জিজ্ঞাসা করিল. "কি কাজ?"

রোশন কহিল, "তুমি মনে করিয়াছিলে, সুভাগীয়া আমার কাছে কিছু বলিবে না; সেই ভরসায় তাহার অপমান করিতে গিয়াছিলে? যেমন কাজ করিয়াছ, তাহার প্রতিফল দিতেছি।" আর কিছু না বলিয়া. রোশন মোহনের মাথায় লাঠি মারিল।

চারিদিক্ হইতে লোক আসিয়া রোশনকে ধরিল। মোহনের মাথা ফাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিল।

— —

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গ্রাম হইতে কিছু দূরে আর একটি গ্রামে পুলিসের থানা ছিল। রোশনকে ধরিয়া থানায় লইয়া গেল। মোহন যাইতে অস্বীকৃত, এক জন কনেষ্টবল আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। মোহনের মাথায় রক্তমাখা আর্দ্র বস্ত্রখণ্ড বাঁধা ছিল। থানায় নায়েব দারোগা চারপাইয়ের উপর বসিয়া ছিলেন। মোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ফরিয়াদ কি?"

মোহন কহিল, "আমার কোন ফরিয়াদ নাই।"

দারোগা রোশনকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই ব্যক্তি তোমার মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে, আর তুমি বলিতেছ. তোমার ফরিয়াদ নাই? তবে থানায় আসিলে কেন?"

মোহন কহিল, "আমি আসি নাই। তোমার লোক আমাকে লইয়া আসিয়াছে।"

দারোগা সাহেব মসীপাত্র, খাগড়ার কলম ও কাগজখণ্ড বাহির করিলেন। বাম হস্তে কাগজ ধরিয়া, দোয়াতে কলম টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম?"

"মোহন।"

"বাপের নাম?"

"রঘু।"

"জাতি?"

"আহীর।"

"তুমি ফরিয়াদী?"

মোহন কহিল, "না, আমি ফরিয়াদী নই।"

দারোগা সাহেব কহিলেন, "আসামী তোমার মাথায় লাঠি মারিয়াছে কি না?"

মোহন কহিল, "মারিলেও আমি নালিশ করিতেছি না।"

দারোগা সাহেব কহিলেন, "বড়া তাজ্জব কি বাৎ! আসামীর সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ আছে?"

মোহন কহিল, "কিছু না।"

"তুমি উহার কিছু টাকা ধার?"

"এক পয়সা না।"

দারোগা সাহেব কিছু বুঝিতে পারিলেন না। গ্রামের অপর লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কেন ফরিয়াদ করিতেছে না, তোমরা কিছু জান?"

এক জন কহিল, "হুজুর, ইহাদের দোস্তি আছে।"

দারোগা কহিলেন, "এ কেমন দোস্তি? মাথা ভাঙ্গিয়া দিলেও ফরিয়াদ করিবে না?"

মোহন কিছুতেই ফরিয়াদ করিল না। অগত্যা দারোগা সাহেব কহিলেন, "এমন মোকদ্দমায় ফরিয়াদ না করিলে চালান করিতে পারি না। আসামীকে ছাড়িয়া দাও।"

রোশন ফিরিয়া সুভাগীয়ার গৃহে গেল। কিন্তু মোহনকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। সে নিরুদ্দেশ হইল।

বর্ষা গেল, শীত যায় যায়। রোশনের অবস্থা সেইরূপ—কোন কর্ম্ম করে না, কাহারও সহিত দেখা করে না। সুভাগীয়ার আচরণে দিন দিন পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। রোশনের সঙ্গে পূর্ব্বের মত কথা কয় না, তাহাকে দেখিলে কখন বিরক্ত হয়, কখন তাহার নিকট হইতে উঠিয়া যায়, অপর পুরুষের সহিত হাসিয়া কথা কয়। রোশনের মনে নানারূপ সন্দেহ হইতে লাগিল। তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল, হাস্য-গীতি বন্ধ হইয়া গেল। এক এক সময়, নিশাকালে বা সন্ধ্যার সময় একাকী অস্থির হইয়া ভ্রমণ করিত। সেই সময় তাহার মনে হইত, যেন কে তাহার সঙ্গে ঘুরিতেছে, যেন কাহার ছায়া তাহার পদানুসরণ করিতেছে, কে যেন তাহার জন্য সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে। মোহন কোথায় গেল? সুগভাগীয়া কি সত্য কথা বলিয়াছিল? মোহনকে জিজ্ঞাসা করিল না কেন? তাহার মত বন্ধু আর কোথায় পাইবে?

এক দিন রোশন সুভাগীয়াকে জিজ্ঞাসা করিল,

"তুমি মোহনের নামে আমার কাছে যাহা বলিয়াছিলে, তাহা কি সত্য ?"

সুভাগীয়া কহিল, "এখন সে কথা মনে পড়িল কেন ?"

রোশন কহিল, "মনে সর্ব্বদাই পড়ে, তোমাকে এত দিন জিজ্ঞাসা করি নাই। এখন করিতেছি।"

"তখন তোমার কাছে মিথ্যা বলিয়াছিলাম বলিলে যদি সন্তুষ্ট হও, তবে মিথ্যাই বলিয়াছিলাম।"

"এখন সত্য কথা বল।"

সুভাগীয়া ভাবিতেছিল, "যদি এ আপনা আপনি আমায় ছাড়ে, তাহা হইলে আমি বাঁচি। তাহা হইলে আমায় আর তাড়াইতে হয় না।" মুখে কহিল, "মোহন আমায় প্রার্থনা করে নাই, আমিই তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছিলাম। সে আমার কথায় সম্মত হয় নাই, তাই তোমায় রাগিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম। সে সম্মত হইলে তোমায় এত দিন এখানে থাকিতে হইত না।"

সুভাগীয়া মনে করিয়াছিল, এই কথায় রোশন রাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু সে তখন গেল না।

আর এক দিন দেখিল, সুভাগীয়া আর এক জন যুবকের সহিত ব্যঙ্গ করিতেছে। সুভাগীয়াকে নির্জ্জনে পাইয়া রোশন কহিল, "তুমি একটু সাবধানে থাকিও। আমার আর সহ্য হয় না।"

সুভাগীয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "অসহ্য হয়, এখান হইতে যাও না কেন? কে তোমায় এখানে থাকিয়া সহ্য করিতে কহিতেছে ?"

রোশন কহিল, "তোমার জন্য আমি সব হারাইয়াছি। এখন আমার সম্মুখেই এই বাড়ীতে তোমার এই ব্যবহার!"

সুভাগীয়া রাগিয়া কহিল, "এ কি তোমার বাপের বাড়ী? আমার বাড়ীতে আমার যাহা ইচ্ছা হয় করিব, তুমি বলিবার কে ?"

রোশন মৃদু মৃদু, বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "এই কথা ?"

"এই কথা কি? তোমার জন্য আমি জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছি। একটু বুদ্ধি থাকিলে এত দিনে তুমি আপনি যাইতে। কিন্তু তোমাকে না তাড়াইলে তুমি ত যাইবে না।" রাগে সুভাগীয়া গর্জ্জিতে লাগিল। মোহন বলিয়াছিল, সুভাগীয়া সর্পিণী। রোশনের সেই কথা মনে পড়িল। আর কিছু না বলিয়া বাহিরে গেল।

গভীর রাত্রে সুভাগীয়ার কুটীর হইতে একটা বিকট চীৎকার শ্রুত হইল। রোশন বেগে কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাত্রি অন্ধকার। গ্রাম নিদ্রামগ্ন। আকাশে ক্ষীণ নক্ষত্রালোক স্পন্দিত হইতেছে। শীতল পবন বহিতেছে। বৃক্ষপত্র ঝর-ঝর পত-পত শব্দে শব্দিত হইতেছে। অন্ধকারে গ্রামের সম্মুখ দিয়া গঙ্গা বহিতেছে।

সেই অন্ধকার দিয়া রোশন বেগে চলিয়া যাইতেছিল। পথে আর এক জন দাঁড়াইয়া ছিল। নক্ষত্রালোকে উভয়ে উভয়কে চিনিল।

"মোহন!"

"রোশন!"

রোশন চারিদিকে চাহিয়া সভয়ে কহিল, "তুমি এমন সময়ে কেন আসিয়াছ? এত দিন পরে আমার শাস্তি দেখিতে আসিয়াছ ?"

মোহন কহিল, "না, আমি বন্ধুর কর্ত্তব্য করিতে আসিয়াছি।"

রোশন হতাশের মত কহিল, "এখন আসিয়া কি করিবে? আর কিছু দিন আগে আসিলে হইত

মোহন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, কি হইয়াছে ?"

রোশন কহিল, "যাহা হইয়াছে, জানিতেই পারিবে। তুমি কি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছ ?"

মোহন কহিল, "আমি কি সেই সময় মার্জ্জনা করি নাই ?"

রোশন কহিল, "তাহা জানি। কি এখন আর একবার তোমার মুখে শুনিলে মনের একটা ভার লাঘব হয়।"

মোহন কহিল, "রোশন, তোমার মুখ দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে, কিছু দুর্ঘটনা হইয়াছে। কি হইয়াছে, সত্য বল।"

রোশন কহিল, "গোপন করিয়াই বা কি হইবে? কতক্ষণ এ কথা চাপা রহিবে? আমি সুভাগীয়াকে হত্যা করিয়াছি।"

সুভাগীয়ার কুটীর হইতে সেই চীৎকার মোহনের শ্রবণে পশিয়াছিল। সে কহিল, "রোশন, তোমায় এতবার বলিয়াছিলাম, তুমি আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই। অবশেষে স্ত্রীহত্যা করিলে।

আমি গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াও সদা-সর্ব্বদা তোমার সন্ধান লইতাম। কিন্তু তোমার যে অবস্থা দেখিতাম, তাহাতে বুঝিতাম যে, তোমাকে বলিলে কোন ফল হইবে না। এখন কি করিবে?”

রোশন কহিল, “কি করিব, কিছুই জানি না। জীবনে সাধ নাই। থানায় গিয়া খবর দিব, কিংবা গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।”

মোহন কহিল, “হত্যাকারীর দণ্ডে দণ্ডিত হইলে, অথবা আত্মহত্যা করিলে প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। জীবনের আশা ত্যাগ করিও না। তুমি যাহাতে রক্ষা পাও, আমি সে চেষ্টা করিব। আমার সঙ্গে আইস।”

মোহন রোশনকে সঙ্গে করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেল। পরদিবস প্রত্যূষে উঠিয়া গ্রামবৃদ্ধদিগের সহিত গোপনে অনেক কথাবার্ত্তা কহিল। ক্ষুদ্র গ্রাম, গ্রামের বৃদ্ধগণ কোন বিষয়ে একমত হইলে তাহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

দ্বিপ্রহরের সময় গ্রামে অত্যন্ত গোলযোগ হইল। সুভাগীয়ার মৃতদেহ তাহার গৃহে পড়িয়া রহিয়াছে। কে খুন করিয়াছে? গ্রামের পাটেল স্বয়ং গিয়া থানায় সংবাদ দিল। থানাদার আসিয়া তদারক আরম্ভ করিল। গ্রামশুদ্ধ লোকের জবানবন্দী লওয়া হইল। সকলেরই এক কথা, সুভাগীয়া অসচ্চরিত্রা, তাহার গৃহে অনেক রকমের লোক আসিত যাইত, অন্য গ্রাম হইতেও লোক আসিত, কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে, কে জানে? রোশন বলিল, আর সকলে যেমন যাইত, সেও সেইরূপ যাইত, কিছু দিন সুভাগীয়ার সঙ্গে বাস করিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। সম্প্রতি সে তাহার গৃহে প্রায় যাইত না। থানাদার অনেক ভয় দেখাইল, কিন্তু আর কোন কথাই প্রকাশ হইল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, সুভাগীয়ার যেরূপ স্বভাব ও তাহার যেরূপ আচরণ, তাহাতে যে এত দিন খুন হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। সেই অঞ্চলের পুলিসের সাহেব আসিয়া নিজে অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহারও চেষ্টা বিফল হইল। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, গ্রামের বাহির হইতে আর কেহ আসিয়া খুন করিয়াছে।

কয়েক মাস পরে পুলিসের হাঙ্গামা মিটিয়া গেল। সুভাগীয়ার হত্যাকাণ্ড লোক বিস্মৃত হইতে লাগিল। তাহার গৃহ ভূমিসাৎ হইল। তখন মোহন ও রোশন, গ্রামের লোকের নিকট প্রকাশ্যরূপে বিদায় গ্রহণ করিয়া কর্ম্মের চেষ্টায় অন্যত্র গেল।

কত বৎসর অতীত হইল। এক দিন শ্রাবণ মাসে মোহন ও রোশন গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

শ্রাবণের গঙ্গা তেমনি বহিতেছিল, কদম্বকুসুম তেমনি ফুটিয়াছিল। শ্যামাঙ্গিনী প্রকৃতি তেমনি শীত-স্নিগ্ধ হাসিতেছিল, চারিদিকে তেমনি আনন্দোচ্ছ্বাস, তেমনি চাঞ্চল্য। সেই আকাশে তেমনি মেঘ ছাইয়াছিল, তেমনি গুরু গুরু ডুরু ডুরু ডাকিতেছিল। কর্ষিত ক্ষেত্রে লাঙ্গলের পার্শ্বে বলদ তেমনি দাঁড়াইয়া ছিল, ক্ষেত্রে বীজাঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইয়াছিল, আলবালে বৃষ্টির জল তেমনি দাঁড়াইয়াছিল। জম্বুবৃক্ষে ফল পাকিতে আরম্ভ হইয়াছে। আন্দোলিত হিন্দোলা হইতে গীত-ধ্বনি উঠিতেছে। রমণীর কণ্ঠধ্বনি, অলঙ্কৃত হস্তের করতালি পূর্ব্বের ন্যায় শ্রুত হইতেছে। বর্ষার আগমনে সকলে নাচিতেছিল, গাহিতেছিল, হাসিতেছিল—হাসিল না কেবল রোশন। তাহার মুখে বিষাদ-গাম্ভীর্য্যের চিহ্ন অবিচলিত রহিল। মোহন ও রোশন গ্রামে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে কে গায়িল,—

“মন বনরা সে উদাস ভয়ে,
কেয়া করু মত বাঁওয়রিয়া!”

কাহার ভ্রম ?

বল্লভের প্রতি হিরণ্ময়ী

তোমায় তখন দেখি নাই। জগতে সকলে যেমন তোমায় জানিত, আমিও সেইরূপ জানিতাম। যেমন সহস্র নরনারী তোমার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছিল, আমিও সেইরূপ হইয়াছিলাম। সকলে যেমন যেমন তোমার গ্রন্থসমূহ পাঠ করিত, আমিও সেইরূপ পাঠ করিতাম। প্রভেদ ক্রমে জন্মিল। কেবল পড়িয়াই তৃপ্তি হইত না, আরও জানিবার জন্য কৌতূহল হইত। পড়িয়া তৃপ্তির অভাব নহে, তৃপ্তির সহিত অতৃপ্তি মিশ্রিত। চিত্ত, কল্পনা, মন গ্রন্থের বাহিরে গমন করিত।

মনে পড়ে, রাত্রিজাগরণ করিয়া একা তোমার গ্রন্থ পাঠ করিতাম। জ্যোৎস্নাপক্ষে ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশী তিথিতে জ্যোৎস্নালোকেই পড়িতাম। ভাষার লালিত্য, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ভাবের সরলতা, কোমলতা, গাঢ়তা দেখিয়া সেইরূপ বিস্মিত হইতাম। কত প্রেম, কত আশা, কত সুখ পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সঞ্চিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা, কত কাতরতা জাগিয়া রহিয়াছে। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য-বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। তটভঙ্গকারিণী তীব্রবাহিনী স্রোতস্বিনী, জ্যোৎস্নাস্নাত নিশীথিনী, মলয়ান্দোলিত স্ফুটকুসুম, উপবন, ছায়া-তরু-পরিবৃত শীতল-সলিল তড়াগ, বিহঙ্গ-কূজন, প্রভাতের ও সায়ংকালের শোভা এবং রহস্য, তুষার-মণ্ডিত তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী, অন্ধকার গহ্বর, মনুষ্যকোলাহল-পরিপূরিত নগর-নগরী, একে একে চক্ষের সম্মুখ দিয়া যাইত। গ্রন্থবর্ণিত নরনারী যেন চিরপরিচিতের ন্যায় প্রতীত হইত, কাহারও সুখে সুখ, কাহারও দুঃখে দুঃখ, কাহারও ব্যবহারে আনন্দ, কাহারও ব্যবহারে ক্রোধ হইত। পড়িতে পড়িতে কখন চক্ষে অশ্রু প্রবাহিত হইত, সে রাত্রে আর নিদ্রা হইত না। আপনার দুঃখ-শোক ভুলিয়া যাইতাম, বাস্তব জগৎ বিস্মৃত হইয়া কল্পিত জগতে উপনীত হইতাম। অপূর্ব্ব সৃষ্টিকুশলী প্রতিভার কুহকে মুগ্ধ হইতাম।

প্রকৃত জগতে আর কল্পিত জগতে প্রভেদই বা কি? এই জগৎ, এই জীবনসংগ্রাম, এই অর্থপিপাসা, দুই দিন পরে ত সকলই কল্পনায় পরিণত হইবে! যে রাজত্বের জন্য পুত্র পিতাকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে হত্যা করিতেছে, সে রাজত্ব কে ভোগ করে, সে রাজত্বের কি অবশিষ্ট থাকে? কোনও রাজ্যের বংশধর পর্য্যন্ত চিরকাল থাকে না। যে মোগল সাম্রাজ্যের তুল্য দ্বিতীয় সাম্রাজ্য জগতে হয় নাই, সেই তৈমুরবংশীয় এখন কে অবশিষ্ট আছে? মিশরের রাজবংশ কোথায়, সীজরের বংশ কি হইল? এই যে কৃষাণ লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়া মাঠে যাইতেছে, ইহাতে আর রাজরাজেশ্বরে প্রভেদ কি? যদি এই জগৎকে মিথ্যা স্বপ্নতুল্য বিবেচনা করিয়া কল্পিত জগৎকেই সত্য বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে ক্ষতি কি? কে তাহাকে ভ্রান্ত বলিতে সাহস করিবে?

পাঠান্তে মনে হইত, এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির কোনও গভীর প্রদেশে একটা যেন কাতর-ধ্বনি আছে, সহজে শুনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলে শুনিতে পাওয়া যায়। একটা হৃদয়ের অভাব, গভীর দুঃখের প্রতিধ্বনি যেন এই রচনার পশ্চাতে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে। তখন সৃষ্টিকে অতিক্রম করিয়া স্রষ্টাসম্বন্ধে কৌতূহল জন্মিল। যে ব্যক্তি এই অতুল প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে সুখী না দুঃখী? অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, তুমি একাকী, নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াও, নূতন লালসায় সর্ব্বদাই অস্থির। তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হইল। তুমি যেমন একা, আমিও সেইরূপ একাকিনী। অপরিচিত পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু আমি স্বতন্ত্রা, আমাকে কে নিষেধ করিবে?

প্রথমে যখন তোমাকে পত্র লিখিতে সাহস করি, তখন মনে কত আশঙ্কা, কত সঙ্কোচ উদিত হইয়াছিল। আমি অশিক্ষিতা, লিপিকৌশলশূন্যা, কোন্ সাহসে তোমাকে পত্র লিখিব? চারিদিকে তোমার যশের প্রতিধ্বনি, আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর তোমার শ্রবণে পশিবে কেন? এমন কত শত পত্র নিত্য তোমার হস্তগত হয়, তুমি পাঠ

কর কিংবা না কর, উত্তর দিবার অবকাশ হয় না, ইচ্ছাও হয় না। চিত্তের প্রগল্‌ভতা সংবরণ করিতে না পারিয়া পত্র লিখিলাম বটে, কিন্তু উত্তর পাইবার আশা কখনও করি নাই। অবশেষে যখন তোমার স্বহস্তলিখিত পত্র পাইলাম, সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল, হৃদয় অত্যন্ত চঞ্চল হইল, চক্ষের দৃষ্টি কিছুক্ষণ রহিত হইল। কতবার পাঠ করিলাম, কিছুতে তৃপ্তি হয় না। কেবল স্বচ্ছ, সরল ভাষা, অকপট অমায়িক ভাব, কেমন বিনয়! বিস্ময়ানন্দে আমার চিত্ত পুলকিত হইল।

তুমি আপনি আসিয়া আমায় দর্শন দিলে, আমার নয়নপথের পথিক হইলে। বিনয়াবনমিত নয়নে যখন আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, তখন আমার মনে হইল, এই শান্ত সুন্দর পুরুষ কোথা হইতে এমত তেজস্বিনী প্রতিভা পাইল? মনে মনে লজ্জা হইল —কখন তোমায় দেখি নাই, তোমার সহিত পরিচয় নাই, কেমন করিয়া তোমার সহিত বাক্যালাপ করিব? কি বলিয়া তোমায় সম্ভাষণ করিব? তুমিই প্রথমে কথা কহিলে, মধুর বচনে কুশল জিজ্ঞাসা করিলে। তাহার পর কি কথা হইল, সকল কথা স্মরণ নাই। তুমি চলিয়া গেলে তোমার স্মৃতিসৌরভে যেন গৃহ পরিপূর্ণ হইল, তোমার কণ্ঠস্বর যেন শ্রবণে লাগিয়া রহিল। মনে হইতে লাগিল, আবার কবে তোমায় দেখিব?

হিরন্ময়ীর প্রতি বল্লভ

কল্পনার অপেক্ষা সত্য কত সুন্দর! তোমার পত্র পাইয়া চিত্ত যেরূপ চঞ্চল হইয়াছিল, এরূপ পূর্ব্বে কখন হয় নাই। লোকমুখে যখন প্রশংসা শুনিয়াছি, মনে করিয়াছি যে, সে প্রশংসা আমার প্রাপ্য নহে। যদি আমার কোন ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সে প্রশংসা কি আমার প্রাপ্য? আমি না পাইলে আর এক জন পাইত। যাহা দৈবাধীন, সে জন্য আত্মগৌরবের কোন কারণ নাই। কিন্তু আমার জন্য কে কবে ভাবিয়াছে? আমি যে পুস্তক রচনা করি, লোকে তাহাই পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করে এবং লেখকের প্রশংসা করে। কিন্তু যেমন সকল লোকের সুখ-দুঃখ আছে, প্রশংসিত লেখকেরও যে সেইরূপ সুখ দুঃখ আছে, কয় জন বিবেচনা করে? আমি কেন একাকী দেশে দেশে ভ্রমণ করি, কেহ কখন জিজ্ঞাসা করে? আমি সুখী না দুঃখী, কেহ জানিতে চায়? হৃদয়ের শোণিতাক্ষরে কত পৃষ্ঠা লিখিয়াছি, কেহ কি ভাবিয়া দেখে? লোকে যেমন কৌতূহলের সহিত কোনও নূতন জন্তু অথবা অদ্ভুত বস্তু দর্শন করে, সেইরূপ আমাকে সকলে দেখে, লোকের চক্ষে আমি সুখপাঠ্য গ্রন্থসমূহ রচনা করিবার যন্ত্রমাত্র। আমার যে হৃদয় আছে, সুখ-দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে, কেহ তাহা বিবেচনা করে না। তুমি পাঠ করিয়া নিবৃত্ত হও নাই, গ্রন্থের গভীরতম প্রদেশে হৃদয়ের যে শূন্যতা—কাতরতা আছে, তাহা দেখিয়াছ। এই যে পত্র লিখিয়াছ, ইহাতে কেবল কৌতূহলের পরিতৃপ্তি নাই, রমণীহৃদয়ের গভীর বেদনার সহানুভূতি আছে। বলিতে লজ্জা নাই, তোমার প্রশংসায় যেমন আনন্দ অনুভব করিয়াছি, কোনও বিজ্ঞ সমালোচকের দীর্ঘ আলোচনায় এরূপ আনন্দ লাভ করি নাই। তুমি কেবল বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দ্বারা দোষগুণের বিচার কর নাই, হৃদয়ের অনুভূতি দ্বারা ভাবগ্রহণে সমর্থ হইয়াছ।

তোমায় প্রথম দেখিয়া বুঝিলাম, রূপের মোহিনী কল্পনাতীত। মূর্ত্তিমতী বাণীর ন্যায় যখন তুমি আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইলে, কিয়ৎকাল আমি মূঢ়ের ন্যায় রহিলাম। সাহস করিয়া তোমাকে চাহিয়া দেখিতে পারি নাই। স্বর্গবীণাঝঙ্কারের ন্যায় তোমার কথা শুনিলাম, সেই শব্দে হৃদয়ের যেন কত নিদ্রিত তন্ত্রী ধ্বনিতপ্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। জীবনের অসম্পূর্ণতা যেন সম্পূর্ণ হইল, হৃদয়ের শূন্যকক্ষ যেন লোকসমাগমে পরিপূর্ণ ও কোলাহলময় হইয়া উঠিল।

আবার তোমায় দেখিয়াছি। আমার অনুরোধে কৃপাপরতন্ত্র হইয়া আবার তুমি আমার সমীপে আগমন করিয়াছিলে। জ্যোৎস্নানিশীথে উপবনপ্রান্তে মন্দস্রোত নদীতটে তোমায় দেখিলাম। জ্যোৎস্না অন্তঃপ্রকৃতির ন্যায় রহস্যময়ী, নদী অন্তঃসলিলা, অন্তর্ম্মিলনের উপযুক্ত সময়, অধিক কথোপকথনের উপযুক্ত সময় নহে। নয়নের অগাধ তরল অতল স্পর্শে প্রেমরাশি, হৃদয়ের প্রতিবিম্ব নয়নে তরল দর্পণে ভাসিতেছে। কথায় মনোভাব ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল না। কথা কহিলেও তেমন স্পষ্টরূপে মনোভাব ব্যক্ত হইত না।

তুমি দাতা, আমি গ্রহীতা, অতএব আমারই

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। আশ্রয়হীনকে তুমি আশ্রয় দিয়াছ, শান্তিহীনকে তুমি শান্তি দিয়াছ, যাহাকে লোকে ভাষা ও শব্দের ঐন্দ্রজালিক স্থির করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়, তাহাকে তুমি হৃদয়বান্ ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া তাহার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছ। সকল ঋণ শোধ করা যায়, কিন্তু এ ঋণের শোধ নাই। কারণ, হৃদয়ের যে উদারতা-গুণে প্রথমে তুমি আমার পরিচয় গ্রহণ করিয়াছিলে, তত্তুল্য জগতে কিছুই নাই।

কিন্তু আমি তোমার গুণের যোগ্য নহি, মনে এই আশঙ্কা হয়। যত দিন আমাকে দেখ নাই, হয় ত কল্পনায় আমাকে বহু গুণে ভূষিত করিয়াছিলে। কালে একত্রবাসে সে ভ্রম ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, লোকমুখে কত কথা শুনিবে, যাহাদের নিকট আমার প্রশংসা শুনিয়াছ, তাহারাই হয় ত আমার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইবে, তোমার বিশ্বস্ত হৃদয়ে ক্রমে সংশয় উৎপাদিত হইবে। সর্ব্বদাই জগতে দেখিতে পাইবে, কল্পনা কোমল, কিন্তু সত্য কঠোর। যত দিন আমাদিগের আলাপ হয় নাই, তুমি আমার হৃদয়ের একাংশমাত্র জানিতে, তাহা দেখিয়াই তোমার প্রীতি জন্মে। এখন তুমি সমস্তই জানিবে, আমার দোষগুণ তোমার নিকট কিছুই গোপন থাকিবে না। তখন কি এমন দৃঢ় অনুরাগ থাকিবে, মনের এই অবস্থা থাকিবে? স্নেহের অভাবে আমার হৃদয় দুর্ব্বল, তোমার স্নেহে নির্ভর করিবার প্রলোভন প্রবল, কিন্তু তথাপি আমার এমন ইচ্ছা নাই যে, তুমি প্রতারিত হও।

এ সময় আশঙ্কা অথবা অবিশ্বাসের কথা কহা কর্ত্তব্য নহে। যে আনন্দে আমার হৃদয় পরিপ্লুত হইতেছে, তুমি বুঝিতে পারিতেছ; এত দিনে বুঝিতে পারিতেছি যে, যথার্থ সুখ, যথার্থ আনন্দ ভাষার অতীত, অনুভূতির বিষয়, বর্ণনীয় নহে। বচনাতীত আনন্দই পূর্ণ আনন্দ। জীবনের ক্ষীণ শুষ্কপ্রায় স্রোত তোমার জীবন-প্রবাহে মিশিয়া, বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া, তরঙ্গ তুলিয়া বহিতেছে। এত দিন যশের আকাঙ্ক্ষায় মিথ্যা কাল কাটাইলাম। যশ ক্ষণিক, বায়ুবাহিত শব্দমাত্র; যশের আশায়, যশ লইয়া কত দিন মানুষ জীবিত থাকিতে পারে, কত দিন তৃপ্তিলাভ করিতে পারে? তোমাকে পাইয়াছি, এই জন্য আমার চেষ্টা, আমার পরিশ্রম সার্থক। কল্পিত প্রতিভার বিনিময়ে জীবন্ত মূর্ত্তিমতী প্রতিভা পাইয়াছি। তুমি আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান কর, কল্পনার অন্ধকার প্রদেশ সকল আলোকিত কর, আমি অভিনব আলোকে নূতন দৃশ্যাবলী দেখিয়া চিত্রিত করি। তোমার প্রতিভার আলোকে আমার হৃদয় প্রভাসিত হউক।

বল্লভের প্রতি হিরণ্ময়ী।

এমন সুখের স্বপ্ন এত শীঘ্র ভাঙ্গিয়া গেল! যে সুখের আশায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম, যাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সে সুখ মরীচিকার ন্যায় মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল! তোমাকে দোষ দিতেছি না। আমারই অদৃষ্টের দোষ, বুদ্ধির দোষ। যত বড় আশা করিয়াছিলাম, হৃদয়ে ততই দারুণ আঘাত লাগিয়াছে।

তোমার কি দোষ? তোমার প্রতিভা উজ্জ্বল দীপশিখাতুল্য। কত পতঙ্গ সেই আলোকে মুগ্ধ হইয়া স্বেচ্ছায় তাহাতে পতিত হইয়া দগ্ধ হইতেছে, তুমি কাহাকে নিষেধ করিবে? তোমার আলোক অক্ষুণ্ণ হউক, যাহার ইচ্ছা মুগ্ধ হউক, মরুক। দুঃখ এই, দগ্ধ হইলাম, কিন্তু মরিলাম না। অনলে ঝাঁপ দিয়াছিলাম, পুড়িয়া মরিলে কোনও দুঃখ ছিল না। কিন্তু দগ্ধপক্ষ হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, এই দুঃখ! উড়িবার ক্ষমতা গিয়াছে, প্রাণ গেল না।

তোমার কি দোষ? তুমি কাহারও মুখাপেক্ষা কর নাই, কাহাকেও সুখ-দুঃখের সঙ্গী করিতে চাও নাই। আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আত্মসুখাভিপ্রায়ে তোমার সমীপে আগমন করিয়াছিলাম। দোষ আমার, দুর্ব্বুদ্ধি আমার, তোমাকে কি বলিব?

যদি আমি অধিক সুখের আশা করিতাম, যদি আমার জন্য তোমাকে কোন বিশেষ ত্যাগস্বীকার করিতে বলিতাম, তাহা হইলে আমার দোষ গুরুতর হইত। কিন্তু তুমি স্বয়ং বুঝিয়া দেখ, আমি কি কখন তোমার হৃদয়ে সমগ্র স্থান অধিকার করিতে চাহিয়াছি, অনুরাগে অন্ধ হইয়া কখন কি আত্মবিস্মৃত হইয়াছি? মনে কখন এমন অভিমান হয় নাই যে, আমার জন্য তুমি অন্য সুখ, অন্য কর্ম্ম, অন্য আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিবে।

তোমার জন্য আমি যে লোকাপবাদ স্বীকার করিয়াছি, তাহা তোমায় স্মরণ করিতে বলিতেছি না। আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমস্তই স্বীকার করিয়াছিলাম। তোমার প্রণয়ে ও লোকনিন্দায় কোন তুলনা আমার

মনে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তুমি কি এখন এ কথা ভাবিয়া দেখ নাই যে, তোমাকে দেখিবার পূর্ব্বে আমি যেমন ছিলাম, এখন তোমায় ত্যাগ করিলে পূর্ব্বাবস্থা আর ফিরিয়া আসিবে না? তোমার নিকটে থাকিয়া লোকের কথায় যেমন উপেক্ষা প্রদর্শন করি, তোমাকে ত্যাগ করিলে তেমন আর পারিব না?

তুমি আমাকে দুর্ব্বাক্য বল নাই, আমার সহিত কখন রূঢ় ব্যবহার কর নাই। তাহা হইলে মনে এরূপ ক্লেশ অনুভব করিতাম না, বুঝিতে পারিতাম, স্নেহের কিঞ্চিৎ লেশ তোমার হৃদয়ে আছে। কিন্তু দুই দিনের পর তুমি এমন উদাসীন হইলে যে, আমার প্রতি চাহিয়াও দেখিতে না। আমি আছি কি নাই, তোমার যেন স্মরণ নাই। তুমি আপনার চিন্তায়, আপনার কল্পনায়, আপনার প্রতিভা লইয়া ব্যস্ত থাক জানি, কিন্তু তোমার মুখ চাহিয়া যাহার দিনরাত্রি কাটিতেছে, তাহাকে কি একবারও স্মরণ হইত না? যে তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, মুহূর্ত্তমাত্র তাহার চিন্তা করিবার অবসর হইত না? নির্দ্দয়, কল্পনাই কি জীবনের সারসর্ব্বস্ব, জীবনে কি হৃদয়ের কোন অধিকার নাই?

তোমাকে অভিমানভরে মন্দ কথা বলিতেছি, এমন বিবেচনা করিও না। তোমার কোন দোষ নাই, আমিই সম্পূর্ণ অপরাধিনী। বালক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ক্রীড়নকের ন্যায় আমি পরিত্যক্ত হইয়াছি—আমার আপনার দোষে। কোন্ সাহসে তোমার হৃদয়ে স্থান পাইবার আশা করিয়াছিলাম? এখনও একটা স্পর্দ্ধার কথা মুখে আসিতেছে, অপরাধ লইও না। আর তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে না, এই জন্য বলিতেছি। এই যশোরাশির মধ্যে তোমার হৃদয়ে অভাব ছিল, আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তুমিও এ কথা স্বীকার করিয়াছিলে। সেই অভাব পূর্ণ করিবার আমার সাধ ছিল। রূপের মোহিনী নাই, গুণের মাধুরী নাই, কিন্তু হৃদয়সর্ব্বস্ব মুক্তহস্তে তোমায় দান করিতে আসিয়াছিলাম। আমার হৃদয় দিয়া তোমার শূন্যহৃদয় পূর্ণ করিব মনে করিয়াছিলাম। পুরুষের প্রতিভা, রমণীর প্রণয় একত্র হইলে কেমন ফল ফলে, ইচ্ছা করিলে তুমি দেখিতে পাইতে। তোমার সে ইচ্ছা হইল না। আমি ব্যর্থমনস্কাম হইয়া ফিরিয়া যাইতেছি।

ফিরিয়াই যাইব। তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে বড় যন্ত্রণা—লোকের গঞ্জনা, হৃদয়ের বেদনা, অতীতের অনুশোচনা। কিন্তু তোমার সম্মুখে থাকিলে আরও যন্ত্রণা। তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইবে—কবেই বা আমায় মনে করিয়াছ? কল্পনা সমুদ্র হইতে নূতন রত্ন তুলিবে, জগৎ দেখিয়া চমৎকৃত, মুগ্ধ হইবে। আবার হয় ত কোন পতঙ্গ প্রতিভালোকে আকৃষ্ট হইয়া আমার মত জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে। আন্দোলিত অগ্নিশিখার ন্যায় ঐ রূপ নয়নমুগ্ধকারী, কিন্তু স্পর্শশীতল নহে। কেবল দাহিকা শক্তি আছে, জুড়াইবার শক্তি নাই যেমন দাহ করিতেছে, তেমন স্বয়ং দগ্ধ হইতেছে। আমি আপনাকে দগ্ধ করিয়া তোমায় শীতল করিতে আসিয়াছিলাম, সেই আমার ভ্রম। তুমি যেমন ছিলে, সেইরূপ রহিলে, আমি দগ্ধকলেবরে পঙ্গুর ন্যায় জীবনাবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিব। কিন্তু তুমিই কি সুখী? যে তোমার জন্য সর্ব্বস্ব হাস্যমুখে ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিলে যদি কেহ সুখী হয়, তাহা হইলে তুমি সুখী। আমি কোন অভিযোগ করিতেছি না। কল্পনার লীলা অপরূপ, স্বীকার করি; হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের মিলন কেমন—যদি জানিতে!

উত্তর

আমি কি লিখিব? আমি অপরাধী, আমি তোমার অনুপযুক্ত, আমায় তুমি ত্যাগ করিয়া যাইতেছ। আমার বলিবার কি আছে? আমার নীরবে থাকাই কর্ত্তব্য।

নিজগুণে তুমি আমায় কৃপা করিয়াছিলে, নিজগুণে এখন নিজে অপরাধিনী হইতে চাহিতেছ। আমার অপরাধের ভার তুমি গ্রহণ করিবে, ইহাতে যদি আমি আপত্তি না করি, তাহা হইলে সে অপরাধের মার্জ্জনা নাই।

সহানুভূতি ও প্রণয়ের লালসা যদি আমি প্রথমে সংবরণ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমার নিকট এখন অপরাধী হইতাম না, তুমিও ক্লেশ পাইতে না। সেই চিত্তদৌর্ব্বল্যের বিষময় ফল ফলিয়াছে। দরিদ্র যেমন অর্থলোভ সংবরণ করিতে পারে না, আমিও সেইরূপ তোমাকে প্রাপ্তির লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই। দুর্ব্বল ব্যক্তি যেরূপ যষ্টি গ্রহণ করে, আমি তোমায় সেইরূপ সহায়স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলাম। আপনার জন্য যেমন ভাবিয়াছিলাম, তোমার জন্য তেমন ভাবি নাই। ঘোর স্বার্থপরতা আমার প্রথম অপরাধ। তোমার বিবেচনায় শেষ পর্য্যন্ত আমার সেই অপরাধ।

যে ক্ষমতায় তোমার চিত্ত আমার প্রতি প্রথমে আকৃষ্ট হয়, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। তখন এ কথা তুমি বিশ্বাস কর নাই। যে প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সে কি সকল সময় স্বয়ং গুণবান্? প্রতিভা অনেক সময় চন্দ্রালোকের তুল্য। চন্দ্র যেমন সঞ্চিত সূর্য্যালোকের আধারমাত্র, প্রতিভাশালী ব্যক্তিও অনেক সময় তদ্রূপ। সূর্য্যকিরণ অপহৃত কর, চন্দ্রের কি অবশিষ্ট থাকিবে? প্রাণিশূন্য, বৃক্ষলতাশূন্য, পর্ব্বতপূর্ণ, দগ্ধ মরুস্থান—ভীষণ, ভয়াবহ। প্রতিভা হরণ কর, অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিকে দেখিবে, দুর্ম্মুখ, অহঙ্কৃত, স্নেহশূন্য, বহুদোষাশ্রিত। আমি কি আত্মপরিচয় দ্বারা তোমাকে প্রবঞ্চিত করিবার প্রয়াস করিয়াছিলাম? হৃদয়ের, স্বভাবের সহস্র গুণে এক মুহূর্ত্তের জন্য কি আপনাকে তোমার সমতুল্য বিবেচনা করিয়াছিলাম?

যে সময় তোমার মনে হইত, আমি তোমার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি, সেই সময় তোমার চিন্তায় আমি মগ্ন। তুমি সম্মুখে থাকিলেও যেন তোমার কল্পিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম, তোমায় দেখিতে পাইতাম না। চক্ষের অন্তরাল হইলে যেমন তোমায় স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম, সম্মুখে সেরূপ দেখিতে পাইতাম না। রচনায় যেন নূতন ক্ষমতা উৎপন্ন হইল। কবি যখন বলিয়াছিলেন যে, মিলন ও বিরহ উভয়ের মধ্যে তিনি বিরহকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেন, তখন তিনি যথার্থ ভাবগ্রহণ করিয়াছিলেন। মিলনে সর্ব্বদা অসম্পূর্ণতা থাকে, বিরহ হৃদয়-মনকে পূর্ণ করে। তোমার নিকটে থাকিয়াও যেন বহুদূরে ছিলাম; তুমি সম্মুখে, কিন্তু তোমাকে সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতাম, কোথাও যেন তোমায় পাইতাম না। যে অভাব তুমি আমার গ্রন্থে লক্ষ্য করিয়াছিলে, সেই অভাব আমার হৃদয়ে। তোমাকে পাইয়া মনে হইয়াছিল, সেই অভাব পূর্ণ হইবে; কিন্তু এক অভাব পূর্ণ হইয়া নূতন অভাব সৃষ্ট হইল। এই অভাবই আমার বল, ইহাই আমার কল্পনার মূল এবং এই অভাবেই আজি আমি তোমার নিকট অপরাধী।

যদি অনুযোগপূর্ণ পত্র লিখিতে, আমার অপরাধ দেখাইয়া আমায় লজ্জিত করিতে, তাহা হইলে মনে এত অনুতাপ হইত না। তোমার স্বভাবসুন্দর গুণগ্রাম হয় ত বুঝিতে পারি নাই, তাহা হইলে হয় ত তোমায় হারাইতাম না। কিন্তু তোমায় হারাইয়াছি কি? তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইতেছ, হয় ত তোমায় আর দেখিতে পাইব না, তোমার কণ্ঠস্বর আর শুনিতে পাইব না। তথাপি আমার মনে হয়, তুমি আমারই রহিলে, তোমার স্মৃতি, তোমার প্রতিমূর্ত্তি, তোমার চিন্তা আমারই রহিল। আর কি থাকে? মিলনের সুখ, অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্য সুখের আশা, জীবনের সুখ কল্পনা, প্রণয়ের সুখ কল্পনা ও স্মৃতি। তোমার নিকট আমি চিরকালই ঋণী। তোমার নিকট যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, ইহ-জীবনে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না।

আমার অপরাধ গ্রহণ না করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় কৃপাচক্ষে আমায় দেখিও, বলিতে সাহস হয় না। একবার তুমি আমায় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ, বুঝিতে পারিয়াছ যে, আমি তোমার অগাধ স্নেহের উপযুক্ত নাই। এমন ভুল একবার ভাঙ্গিলে আর কোন উপায় নাই। তোমার অনুরাগ হারাইয়াছি। তোমার ঘৃণার পাত্র হইবার ইচ্ছা নাই। যদি কোন উপায়ে তোমার হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করিয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে সেই উপায় অবলম্বন করিতাম। কিন্তু সে সাধ্য কাহার আছে? আমার এ পর্য্যন্ত সাধ্য নাই যে, কোনরূপ অনুনয় করিয়া তোমায় প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করি। মনে যাহাই করি, তোমাকে বলিবার মুখ নাই। তুমি কোথায় থাকিবে, কেমন থাকিবে, জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই। কালে তোমার চিত্তে আবার পরিবর্ত্তন ঘটিবে কি না, তুমি স্বয়ং না জানাইলে আমি জানিতে পারিব না। কল্পনার অন্ধকার কক্ষ তুমি আলোকিত করিয়া যাইতেছ, এই জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া যাইতেছ, ইহাতেও অক্ষমা প্রকাশ পাইতেছে না। আমাকে দেখিয়া তোমার যে ভ্রম হইয়াছিল, সে ভ্রম অপনীত হইল। এই অপরাধীকে ত্যাগ করিয়া তুমি যাইবে যাও, আমি কেমন করিয়া নিষেধ করিব? মিলনে বঞ্চিত হইলাম,-কিন্তু বিরহ আমারই রহিল। স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকময়ী প্রতিভা তুমি আমাকে দিয়া যাইতেছ, আমি অধমর্ণ, এ ঋণের শোধ কখনও করিতে পারিব না।

ছায়া

১

মধ্যাহ্ন। ভাদ্রমাসের শেষে। মেঘমুক্ত আকাশের নীলিমা প্রখর রৌদ্রকিরণে উজ্জ্বল। যে দিকে চাহিয়া দেখ, আকাশসীমাস্পর্শী প্রান্তর, বৃক্ষ বিরল। রৌদ্র-কিরণে প্রান্তর হইতে বর্ষার জল শোষিত হইতেছে, সূক্ষ্ম বাষ্পের তরঙ্গ চারিদিকে লক্ষিত হইতেছে। অতিদূরে গৃধিনী উড়িতেছে। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন—শব্দ নাই, প্রান্তরে লোকসমাগম নাই, লোকের যাতায়াত পর্যান্ত নাই।

সেই জনশূন্য রৌদ্রতপ্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া আমার বন্ধু চন্দ্রকুমার ও আমি গমন করিতেছিলাম। কোথায় যাইতেছিলাম, কেন যাইতেছিলাম, আমি তাহা জানিতাম না। চন্দ্রকুমার আমার বাল্যবন্ধু। কয়েক বৎসর গৃহত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিল; সম্প্রতি গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার অনুরোধমত তাহার সঙ্গে যাইতেছিলাম। কোথায় যাইতেছিলাম, জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাই নাই।

দশ দিন হইল আমরা গৃহত্যাগ করিয়াছি, কোথায় আসিয়াছি, জানি না।

এ কয় দিন রেলে, শকটে কিংবা শিবিকায় আসিতেছিলাম, পদব্রজে চলিতে হয় নাই। অদ্য প্রাতে চন্দ্রকুমার শিবিকা বিদায় করিয়া দিয়াছে, বলিতেছে, আমাদিগকে আর অধিক দূর গমন করিতে হইবে না। সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তি নাই। কিছু দূর আসিয়া এই প্রান্তরে পড়িয়াছি। আর কত দূর যাইতে হইবে, জানি না।

নিরুদ্দেশ হইবার পূর্ব্বে চন্দ্রকুমার মজলিসী রকম লোক ছিল, গল্প-গুজব বেশ করিত। ফিরিয়া আসিয়া আর সেরূপ নাই। কথা অল্প কয়, প্রায় মৌনভাব। আজও কথাবার্ত্তা একরূপ বন্ধ।

পার্শ্বে অথবা পশ্চাতে একবারও দৃষ্টিপাত না করিয়া চন্দ্রকুমার বেগে চলিতেছিল। রৌদ্রে ও পথের শ্রান্তিতে আমি ঘর্ম্মাক্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। চন্দ্রকুমারের মুখে ক্লান্তি-চিহ্ন নাই।

মধ্যাহ্নকাল অতীত হইলে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সম্মুখে যেমন অনন্ত প্রান্তর, পশ্চাতেও সেইরূপ অনন্ত প্রান্তর। মনে সন্দেহ হইল, চন্দ্রকুমার পথ হারাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমরা কোথায় যাইতেছি? তুমি পথ হারাও নাই ত?"

"কোন চিন্তা নাই। আমার সঙ্গে নিশ্চিন্ত হইয়া আইস।"

আর কোন কথা হইল না। আমরা পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিলাম।

সূর্য্য পশ্চিমে হেলিল। চন্দ্রকুমারের ও আমার ছায়া প্রান্তরে দীর্ঘ হইয়া পড়িল। প্রান্তর-সীমায় ক্রমশঃ বিটপিশ্রেণী দেখা দিল।

সন্ধ্যার সময় প্রান্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বৃক্ষতলে একটি কুটীর দৃষ্ট হইল। কুটীরের সম্মুখে উপনীত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকুমার কহিল, "আসিয়াছি।" এই বলিয়া কুটীরে প্রবেশ করিল।

২

তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে আমিও প্রবেশ করিলাম। কুটীর অতি ক্ষুদ্র, একটিমাত্র অপ্রশস্ত গৃহ। ইহাও বুঝিলাম যে, কুটীর এ সময় শূন্য হইলেও একেবারে শূন্য নহে, মনুষ্যের যাতায়াত আছে। চন্দ্রকুমার এ ভাবে প্রবেশ করিল, যেন কুটীর তাহার নিজের। আমাকে কহিল, "বিশ্রাম কর।"

অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলাম। গৃহের কোণে মৃৎকলসীতে জল ছিল; অঞ্জলি পূরিয়া পান করিলাম। চন্দ্রকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে কয় দিন থাকিতে হইবে?"

দাঁড়াইয়া চন্দ্রকুমার কুটীরের বাহিরে দেখিতেছিল। কহিল, "পরে বলিব।"

আমি আর কিছু বলিলাম না। কুটীরতলে শুষ্ক তৃণ বিস্তৃত ছিল; তাহাতে শয়ন করিলাম। শ্রান্তিজনিত তন্দ্রা শীঘ্রই আসিল, পরে নিদ্রা আসিল।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখি, চন্দ্রকুমার কুটীরে নাই;

বাহিরে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। কুটীরের বাহিরে গমন করিলাম।

জ্যোৎস্নালোকে প্রান্তব নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় দেখাইতেছে। চারিদিকে যেন বিষাদের বৃহৎ ছায়া পড়িয়াছে। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কবিয়া মধ্যে মধ্যে কুটীবের পার্শ্বে পেচক ডাকিতেছে। মনুষ্যের মধ্যে আমি একা, চন্দ্রকুমার কোথায় গেল?

রাত্রি হইতে লাগিল। কুটীরে ফিরিয়া আসিলাম। চক্ষে আর নিদ্রা আসিল না।

গভীর রাত্রে মনুষ্যেব পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। দ্রুতপদে কে যেন কুটীরের অভিমুখে আসিতেছে। আমি উঠিয়া বসিলাম। চন্দ্রকুমার বেগে কুটীরে প্রবেশ করিল। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিঃশব্দ দ্রুতপদক্ষেপে আর এক জন প্রবেশ কবিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি স্ত্রীলোক, এই পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম। তাহার মুখ দেখিতে পাইলাম না।

চন্দ্রকুমাব ভীতের ন্যায়, উন্মত্তের ন্যায় কহিল, "আর কেহ যেন কুটীরে না প্রবেশ করে, তাহা হইলে আমাদের প্রাণ-সংশয়। তুমি দ্বাব বক্ষা কর, কেহ প্রবেশ কবিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে কাটিয়া ফেলিবে, এই ধ্বব।" বলিয়া আমার হস্তে তীক্ষ্ণধার মুক্ত অসি দিল।

আমি কোন কথা কহিলাম না, কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। চন্দ্রকুমারের কোন কথা অন্যথা করিবার যেন আমার ক্ষমতা ছিল না। তরবাবি লইয়া কুটীরদ্বারে দাঁড়াইলাম।

জ্যোৎস্নালোকে প্রান্তরের অনেক দূব দেখা যাইতেছে। যে দিকে বৃক্ষশ্রেণী, সেই দিকে কিছু অন্ধকার। কোথাও কিছু দেখিতে পাইলাম না, কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না। কুটীরে কাহারও মুখে কোন কথা নাই। ভীতি-রুদ্ধ নিশ্বাসের শব্দ কখন কখন শুনিতে পাইতেছিলাম।

অকস্মাৎ কুটীরের সম্মুখে মনুষ্যের ছায়া পতিত হইল। তরবারির উপর মুষ্টি দৃঢ় হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে যায়?"

ছায়া অপসৃত হইল, মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম না।

কুটীরে অস্ফুট ভীতিশব্দ হইল, কে করিল, বুঝিতে পারিলাম না।

আবার পূর্ব্ববৎ ছায়া দৃষ্ট হইল, আবার ডাকিলাম, "কে যায়?" আবার ছায়া অদৃশ্য হইল।

ক্রমে আমার বিশ্বাস জন্মিল যে, কোন ব্যক্তি অলক্ষিত থাকিয়া কুটীর প্রদক্ষিণ করিতেছে। জ্যোৎস্নালোকে এক একবার তাহার ছায়া দেখা যাইতেছে, কিন্তু সে স্বয়ং দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। যতবার আমি ছায়া দেখিতে পাই, ততবার একই প্রশ্ন করি, ততবার ছায়া অপসৃত হয়!

জ্যোৎস্না ক্রমে মলিন হইয়া আসিল, প্রত্যূষের পূর্ব্বগামী অস্পষ্ট অন্ধকার আকাশে দেখা দিল। তখন কুটীরের পার্শ্বে অতি মৃদু অতি বিকট হাস্যধ্বনি হইল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

৩

প্রভাত হইলে চন্দ্রকুমার কুটীরেব বাহিরে আসিল। এক রাত্রে মনুষ্যের মুখে এত পরিবর্ত্তন কখন দেখি নাই। সে সময়ে সে কথার কোন উল্লেখ করিলাম না। আমার কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল।

চন্দ্রকুমারকে বলিলাম, "দুই একটা কথা আমার জানিবার আছে। এ পর্য্যন্ত তুমি আমায় কিছু বল নাই, আমারও জানিবাব জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য হয় নাই; কিন্তু এখন সৎকর্ম্মে অথবা অসৎকর্ম্মে তোমাব সহায়তা করিতেছি, জানা প্রয়োজন।"

চন্দ্রকুমার কহিল, "অবশ্য জিজ্ঞাসা কর।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই রমণী কি তোমাব স্ত্রী? দেশে তুমি বিবাহ কর নাই?"

চন্দ্রকুমার কহিল, "একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিবে?

আমি কহিলাম, "বিশ্বাস করিব বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

"এই রমণী আমার স্ত্রী নহে।"

"তাহা হইলে তুমি ইহাকে কেমন করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিলে?"

"সকল কথা বলিতে পারিব না। এই রমণীর অথবা আমার কাহারও অসদভিপ্রায় নাই। একবার এ আমার প্রাণরক্ষা করে। তাহার পর ইহার প্রাণসংশয় হয়। আমি ইহার প্রাণরক্ষা করিয়াছি। এখন আমাদের উভয়ের প্রাণ-সংশয়। তুমি যদি পার ত আমাদিগকে রক্ষা কর। আমাদের আত্মরক্ষার সাধ্য নাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন দেশে ফিরিয়া যাইবে?"

"যদি বাঁচিয়া থাকি।"

"তখন এই রমণীকে লইয়া কি করিবে?"

"যদি আমাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হয়, তাহা হইলে বিবাহ করিব।"

"তুমি জান না?"

"আমি জিজ্ঞাসা করি নাই।"

"যদি স্বীকৃতা না হয়?"

"তাহা হইলে তোমার গৃহে থাকিবে। তাহা হইলে কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না।"

আমি বিস্মিত হইয়া চন্দ্রকুমারের মুখের দিকে চাহিলাম। কপটতার কোন লক্ষণ নাই।

আমি অন্য কথা তুলিলাম। "তুমি যে বলিতেছ, তোমাদের উভয়ের প্রাণ-সংশয়, তাহার কোন কারণ আছে? আর আত্মরক্ষা তোমার অসাধ্য কেন? তোমার বাহুতে বল আমার অপেক্ষা অধিক।"

চন্দ্রকুমার অতি কাতর হাসি হাসিল। কহিল, "রাত্রে আশঙ্কার কোন কারণ দেখ নাই?"

কুটীরপ্রদক্ষিণকারিণী ছায়া, ছায়ার অলক্ষিতে আবির্ভাব ও আচম্বিতে তিরোধান এবং সেই অতি মৃদু, অতি বিকট হাস্য আমার স্মরণ হইল। এ সকল সত্য, অথবা ভয়বিচলিত কল্পনা মাত্র? ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলাম, "যাহা দেখিয়াছিলাম, বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিতেছি না।"

"পারিবেও না। পারিলে আশঙ্কা এত হইত না। আমরা যে কারণে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তুমি এ পর্য্যন্ত সে অবস্থায় পতিত হও নাই; সেই জন্য তোমাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি।"

৪

এমন সময় রমণী কুটীরের বাহিরে আসিল। আমাকে দেখিয়া বিশেষ লজ্জিত হইল না। আমিও তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম।

রমণীকে সুন্দরী বলিলে কিছু বলা হয় না। সুন্দরী বলিলে সে রূপের কিছুই বর্ণনা হয় না। এমন নির্ম্মল সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই। মুখে হৃদয় প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সে হৃদয় নির্ব্বিকার, নির্ম্মল, প্রসন্ন। সে মুখ দেখিয়া চন্দ্রকুমারের কথায় আর সন্দেহ রহিল না।

রমণীকে দেখিয়া বিদেশীয় ভাষায় চন্দ্রকুমার তাহাকে কি বলিল। রমণীও সেই ভাষায় উত্তর দিল। আমি কিছু বুঝিতে পারিলাম না। চন্দ্রকুমার আমাকে কহিল, "আমাদের ভাষা জানে না।"

তাহার পর চন্দ্রকুমার রমণীকে অন্যান্য কথা বলিতে লাগিল। বুঝিতে পারিলাম, আমার সম্বন্ধে কিছু বলিতেছে। কারণ, কথা শুনিতে শুনিতে রমণী এক একবার সলজ্জ অথচ পুলকিত দৃষ্টিতে আমার নাম বলিয়া দিল।

রমণী ধীরে ধীরে অশ্রুতপূর্ব্ব নাম একেবারে উচ্চারণ করিতে না পারিয়া কহিল, "প্র—ভা—ত—চ—ন্দ্র।"

আমি চন্দ্রকুমারকে বলিলাম, "অত বড় নামের আবশ্যক নাই। 'প্রভাত' বলিলেই চলিবে।"

চন্দ্রকুমার বুঝাইয়া দিল। রমণী কতক নিষ্কৃতি পাইয়া আহ্লাদিত হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুততর কহিল, "প্র—ভা—ত।"

রমণীর নাম জানিবার ইচ্ছা হইলেও সহসা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। চন্দ্রকুমার আপনিই কহিল, "তুমি উহার নাম জিজ্ঞাসা করিবে না?"

"করিব বই কি।"

চন্দ্রকুমারের কথামত রমণী আপনার নাম বলিল, "বাদসা।"

নামটি নিতান্ত বিজাতীয়মত বোধ হইল না। আমাদের সঙ্গে কিছু আহার্য্য সামগ্রী ছিল। আহারাদির পর চন্দ্রকুমারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ?"

চন্দ্রকুমার কহিল, "তোমার কি পরামর্শ?"

আর এক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিলাম। এ পর্য্যন্ত চন্দ্রকুমারের ইচ্ছামতই সমস্ত হইতেছিল। কিন্তু এখন চন্দ্রকুমারের চিত্তবল যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। আমার যেরূপ ইচ্ছা, তাহারও ইচ্ছা যেন তদনুরূপ।

আমি কহিলাম, "এখানে আর রাত্রিযাপন করা পরামর্শসিদ্ধ বোধ হয় না। এখানে নানা প্রকার আশঙ্কা।"

চন্দ্রকুমার কহিল, "আমার মনে কেবল এক আশঙ্কাই প্রবল। সে আশঙ্কা এখানে যেরূপ, অন্যত্রও তদ্রূপ; প্রাণিশূন্য মরুভূমিতে যেমন, লোকালয়েও সেইরূপ; একাকী অসহায় পথে যেরূপ, সশস্ত্র সৈন্যরক্ষিত দুর্গমধ্যেও সেইরূপ। পলায়ন করিয়া এ আশঙ্কা হইতে রক্ষা পাইব না।"

এ সকল কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলাম না, কিন্তু শুনিয়া শুনিয়া বিস্ময়ের তীক্ষ্ণতা হ্রাস হইয়া যাইতেছিল। এরূপ অদ্ভুত কথা বিশ্বাস করিব কি না, তাহাও বুঝিতে পারিতেছিলাম না।

আমি বলিলাম, "সে যাহাই হউক, এখানে

আর থাকিবারও কোন আবশ্যক দেখিতেছি না।”

“কিছু না। এখনি চল! বাদলাকে ডাকিব?”

“ডাক।”

চন্দ্রকুমার রমণীকে ডাকিল আমরা গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

৫

ছায়াশূন্য প্রান্তরে চলিতে চলিতে দিনমান অতিবাহিত হইল। রমণীকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখিয়া আমি চন্দ্রকুমারকে কহিলাম, “তুমি উহার হস্ত ধারণ কর!”

হস্ত ধারণ করিলে রমণী চন্দ্রকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া যেরূপ মৃদু মৃদু হাসিল, তাহাতে তাহার হৃদয়ের ভাব লুক্কায়িত রহিল না। আমি চন্দ্রকুমারকে কহিলাম, “কেমন, তোমাকে বিবাহ করিবে কি না, এই সময় জিজ্ঞাসা করিলে হয় না?”

চন্দ্রকুমার অতি ক্ষীণ হাসিয়া কহিল, “গৃহে ফিরিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিব।”

সন্ধ্যার পর লোকালয়ে উপনীত হইলাম। রাত্রিযাপনের জন্য একটি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া লইলাম। বাদলা গৃহের ভিতর শয়ন করিল, চন্দ্রকুমার ও আমি দ্বারের নিকট শয়ন করিয়া রহিলাম। রাত্রে আমার ভাল নিদ্রা হইল না,—চন্দ্রকুমার ও রমণীর সম্বন্ধে নানারূপ চিন্তা মনে উদিত হইতে লাগিল। কিরূপে ইহাদের পরস্পরের পরিচয় হইল? কিসের আশঙ্কায় ইহারা এত ভীত? এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহাদের প্রতি আমার অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছিল। মনে হইতেছিল, যেন আমি ইহাদের সুখ-দুঃখের ভাগী, ইহাদের কোন বিপদ্ হইলে আমি তাহার জন্য দায়ী।

নিদ্রিতাবস্থায় দুই একবার চন্দ্রকুমার অস্পষ্ট স্বরে একটা কথা কহিয়াছিল। কি বলিতেছিল, ভাল বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে গৃহের ভিতরেও শব্দ শুনিতে পাইলাম। রমণী নিদ্রিতাবস্থায় যেন কি বলিতেছে। আমি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

রমণী আবার কথা কহিল। এবার বুঝিতে পারিলাম—“মীরাণ।” ভ কাতর এবং কিয়ৎ অস্পষ্ট স্বরে রমণী এই নাম বলিল। চন্দ্রকুমার পার্শ্ব ফিরিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, “মীরাণ।”

চন্দ্রকুমার যে নিদ্রিত, তাহাতে আমার কোন সংশয় ছিল না। রমণী নিদ্রিত অথবা জাগ্রত বলিতে পারি না। কিন্তু উভয়ের মুখে এক কথা যে ব্যক্তির নাম মীরাণ, উভয়েই তাহাকে জানে এবং উভয়েই তাহাকে ভয় করে। মীরাণ কে?

গৃহে একমাত্র প্রদীপ তৈলশূন্য হইয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিতেছিল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ থাকিয়া থাকিয়া এক একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে একবার জ্বলিয়া উঠিয়া নিভিয়া গেল।

তখন আমার মনে হইল যেন নিকটেই কাহারও পদশব্দ ও নিশ্বাস শুনা যাইতেছে। আমি শয্যায় উঠিয়া বসিলাম। শয্যাপার্শ্বে তরবারি ছিল, গ্রহণ করিলাম। পদশব্দ আর শুনিতে পাইলাম না।

ক্ষণকাল পরে আর এক দিকে পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। শয্যাত্যাগ করিয়া তরবারি হস্তে গৃহের বাহিরে গমন করিলাম, কিন্তু দ্বারের নিকট রহিলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। চন্দ্র অস্ত যায়। গৃহ-প্রাচীরে, বৃক্ষশিরে অল্প চন্দ্রালোক রহিয়াছে। নীচে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। মনুষ্যের কোনরূপ চিহ্ন কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ়তর হইতে লাগিল, মনুষ্য কোথাও দেখিতে পাই নাই, কিন্তু মনুষ্যকণ্ঠ শুনিতে পাইলাম। কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে, বুঝিতে পারিলাম না। শরীরে লোমাঞ্চ হইল, অজানিত আশঙ্কায় চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

শব্দ নিকটবর্ত্তী হইল। শব্দ গম্ভীর, কিন্তু উচ্চ নহে। ভাষা বুঝিতে পারিলাম না। কয়েকটা কথা বারংবার মন্ত্রের ন্যায় উচ্চারিত হইতেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কে?”

কোন উত্তর হইল না। শব্দ দূরে যাইতে লাগিল। কয়েকবার এইরূপ হইল। শব্দ নিকটে আসে, আবার দূরে চলিয়া যায়। একই কণ্ঠ, একই রূপ শব্দ। রাত্রিশেষে শব্দ দূরে চলিয়া গেল, আর কিছু শুনিতে পাইলাম না।

৬

চন্দ্রকুমারের নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম না। তাহার মানসিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে এই সকল কথা শুনিলে ভীত হইতে পারে। বলিলেও কোন ফল নাই।

রাত্রিকালে এইরূপ আশঙ্কা ও বিস্ময়জনক ব্যাপার নিত্য ঘটিতে লাগিল। আমি সকল কথাই গোপন রাখিতাম, চন্দ্রকুমার কিছু দেখিতে কিংবা শুনিতে পাইত কি না, বলিতে পারি না। আমাকে কখন কিছু বলিত না।

পথের তিন দিন অবশিষ্ট রহিল। কয়েক দিন রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় চন্দ্রকুমার এবং রমণীর মুখে "মীরাণ" এই নাম শ্রবণ করিয়াছিলাম। অবশেষে কৌতূহল সংবরণ করিতে না পারিয়া চন্দ্রকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মীরাণ কে ?"

নাম শ্রবণমাত্র চন্দ্রকুমার শিহরিয়া উঠিল, চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল, চক্ষু বিস্তৃত হইল, সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপিতে লাগিল। আমার হস্ত ধারণ করিয়া অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমায় বলিল ?"

"কেহ বলে নাই। নিদ্রিতাবস্থায় তোমার মুখেই শুনিয়াছি।" রমণীর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় তাহার নাম করিলাম না।

চন্দ্রকুমার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বাদলার মুখে শুনিয়াছ ?"

আমি কহিলাম, "নিদ্রিতাবস্থায় তাহার মুখেও শুনিয়াছি।"

চন্দ্রকুমার কোন কথাই কহিল না। কিছুক্ষণ পরে উর্দ্ধদিকে মুখ তুলিয়া কহিল, "আর অধিক বিলম্ব নাই।"

আমি বলিলাম, "কিসের ?"

চন্দ্রকুমার আমার কথার উত্তর দিল না। অন্য দিকে চলিয়া গেল।

শয়নের কাল উপস্থিত হইলে চন্দ্রকুমার নীরবে রোদন করিতে লাগিল। রমণীও কাঁদিল। হৃদয়-বিদারক কাতর স্বরে চন্দ্রকুমার কয়েকটি কথা কহিল। তাহাতে রমণীর অশ্রুধারা আরও বেগে বহিতে লাগিল।

গভীর রাত্রে সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখি, দ্বারের নিকট মনুষ্যের ছায়া। এবার আমি শয্যাত্যাগ করিলাম না, দ্বারের নিকট গমন করিলাম না, ছায়ার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিলাম। ছায়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। কিয়ৎকাল পরে আবার দৃষ্ট হইল। দেখিলাম, ছায়ার হস্ত সঞ্চালিত হইতেছে। কয়েকবার এরূপ হইল। অবশেষে একবার হস্তচ্ছায়া অত্যন্ত সঞ্চালিত হইল। গৃহের ভিতর তীব্র বিদ্যুৎশিখার ন্যায় আলোক-রশ্মি প্রবিষ্ট হইল, আবার পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকার। ছায়া অপসৃত হইল, আর কিছুই আমি দেখিতে পাইলাম না।

যে মুহূর্ত্তে বিদ্যুতের ন্যায় আলোক গৃহে প্রবেশ করিল, সেই মুহূর্ত্তে রমণী চীৎকার করিয়া উঠিল। চন্দ্রকুমার শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া রমণীর পার্শ্বে গেল। আমি আলোক উৎপাদন করিলাম। আলোক লইয়া দেখি, রমণী নিস্পন্দ, নিশ্বাস-প্রশ্বাস রহিত হইয়াছে। বজ্রাঘাতে যেরূপ মৃত্যু হয়, রমণীর সেইরূপ মৃত্যু হইয়াছে। চন্দ্রকুমার রমণীর ললাট নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আমিও তাহার সহিত দেখিলাম, রমণীর ললাটে অঙ্গুলী-চিহ্ন রহিয়াছে।

চন্দ্রকুমার চীৎকার করিয়া কহিল, "মীরাণ, আমাকে কেন লইলে না ?" এই বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় রমণীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে গৃহে আর একবার সেইরূপ বিদ্যুৎ চমকিল। চন্দ্রকুমার চীৎকার করিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। দেখিলাম, তাহার ললাটেও অঙ্গুলীর চিহ্ন রহিয়াছে।

টিকিয়া শাহ

সিপাহীযুদ্ধের কিছু দিন আগে পটনা সহরের বাহিরে গঙ্গার ধারে এক জন অউলিয়া ফকীর থাকিতেন। লোকে তাঁহাকে টিকিয়া শাহ বলিত, তাহার কারণ, তিনি যেখানে বসিয়া থাকিতেন, সেখানে সর্ব্বক্ষণ টিকার আগুণ জ্বলিত। তাঁহার সম্মুখে সেই টিকার আগুণ, আর এক পাশে রাশি রাশি টিকা। কয়েক জন টিকাওয়ালী আপনারাই আসিয়া টিকা দিয়া যাইত, কেহ তাহাদিগকে পয়সা দিত না, তাহারাও কাহারও কাছে কিছু চাহিত না। টিকিয়া শাহ নিজেও কিছু বলিতেন না, টিকাওয়ালী বা অপর কেহ মাটীতে হাত ঠেকাইয়া তাঁহাকে সেলাম করিলে তিনি কখন কদাচ চক্ষু তুলিয়া একবার চাহিয়া দেখিতেন, এই মাত্র। আগুণ কমিয়া গেলে যে কেহ সেখানে বসিয়া থাকত, দু' মুঠা টিকা ফেলিয়া দিত। হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁহার কাছে যাইত। হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীরা ধুনি জ্বালাইয়া থাকেন, মুসলমান ফকীর-দরবেশরা এক জায়গায় বসিয়া থাকেন না, আগুনও জ্বালেন না। টিকিয়া শাহের সম্মুখে কেন যে টিকার আগুন জ্বলিত, কেহ বলিতে পারিত না। তিনি কাহাকেও জ্বালিতে বলিতেন না, তাঁহাকে জ্বালিতে কেহ কখন দেখে নাই। তাঁহার অন্য নামও কেহ জানিত না। তাঁহার কাছে টিকিয়া পোড়ে, এই জন্য সকলে তাঁহাকে "টিকিয়া শাহ" বলিত।

শাহজীর দীর্ঘ বিশাল শরীর, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; মাথায় বড় বড় চুল; কিন্তু জটা নাই, গোঁফ-দাড়ী বড় বড়, কিছু কাঁচা, কিছু পাকা: গাঁজা, ভাঙ, তামাক কিছুই খান না অথচ চক্ষু লালবর্ণ, কাহারও দিকে একদৃষ্টে চাহিলে সে ভয় পাইত। লোকে তাঁহাকে "মস্ত" ফকীর বলিত।

টিকিয়া শাহ যেখানে বসিতেন, তাহার পাশে একটি ছোট কুটীর ছিল, কিন্তু কুটীরের ভিতর তিনি বড় একটা যাওয়া আসা করিতেন না। নিজে পাক করিতেন না, যে যাহা আনিয়া দিত আহার করিতেন, হিন্দু-মুসলমান বিচার করিতেন না। গঙ্গার ধারে একটা কঙ্করের ছোট পাহাড়ের উপর শিবমন্দির; সহরে যাইবার পথে নিকটেই একটি মসজীদ। মসজীদে মুয়জ্জীন যে সময় নমাজের পূর্ব্বে 'আল্লাহ হো আকবর' বলিয়া আজান দিত, তখন টিকিয়া শাহ কোরাণ শরীফের প্রত্যেক পরিচ্ছেদের আরম্ভে যে কয়টি কথা আছে, তাহাই আবৃত্তি করিতেন,—"বিসমিল্লা অব্ রহমান অব্ রহীম!" আবার যখন মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজিত, সে সময়ও ঐ কথা বলিতেন।

সারাদিন লোকের আসা-যাওয়ার বিশ্রাম ছিল না। কত লোক দর্শন করিতে আসিত, কত লোক দোয়া চাহিতে আসিত, কত লোক কত রকম কামনা করিতে আসিত। টিকিয়া শাহ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেন, কদাচ কখন দুই চারিটি কথা কহিতেন। গলার আওয়াজ ভারি, আস্তে কথা কহিলেও সকলে শুনিতে পাইত। কেহ কোনরূপ প্রার্থনা করিলে হয় কোন কথা কহিতেন না, কিম্বা সংক্ষেপে বলিতেন, তাঁহার কোন অলৌকিক ক্ষমতা নাই। কেহ অর্থ-কামনায় আসিত, কেহ সন্তান-কামনা করিত। একবার শীতকালে টিকিয়া শাহ জীর্ণ কম্বল গায় দিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় এক জন ধনী এক জোড়া শাল আনিয়া তাঁহার গায় দিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে, এক দরিদ্র ভিখারী শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শাহ সাহেব নিজের অঙ্গের শাল খুলিয়া তাহাকে দিলেন, কহিলেন, "লে বেটা, তু লে যা!"

২

বর্ষাকালে গঙ্গায় কূলে কূলে জল, একটানা স্রোত, অন্ধকার রাত্রে প্রবল বেগে ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছে। জলের প্রবাহ ও তরঙ্গভঙ্গরব ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। অন্ধকারে গঙ্গাতীরে টিকিয়া শাহ একাকী পাদচারণ করিতেছিলেন। একখানি ছোট ডিঙ্গা তীরে আসিয়া লাগিল। ডিঙ্গী হইতে দুই ব্যক্তি নামিল;—এক জন পুরুষ, অপর স্ত্রীলোক। দুই জনে ফকীরের চরণ বন্দনা করিল, তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল না। টিকিয়া শাহ কহিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে আইস।"

তিনি তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া নিজের কুটীরে লইয়া গেলেন। কুটীরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। রমণী মুখের ওড়না খুলিয়া ফেলিয়াছিল। সে সুন্দরী। পুরুষ তাহার অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়। তাহারা ভ্রাতা ও ভগিনী। টিকিয়া শাহ কহিলেন, "তোমরা আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছ। আমি ফকীর, যাহার ইচ্ছা আমার কাছে আসিতে পারে। কিন্তু এমন সময় তোমরা আসিয়াছ কেন? আমার সঙ্গে তোমাদের কি কথা?"

রমণী কহিল, "তুমি চিরকাল ফকীর ছিলে না, সংসারে তোমার কোন দুঃখও ছিল না। গৃহ ত্যাগ করিবার সময় তুমি আর কাহারও কথা ভাবিয়াছিলে?"

"যে অপর কাহারও কথা ভাবে, তাহার পক্ষে সংসার ত্যাগ করিবার চেষ্টা বৃথা।"

রমণীর ভ্রাতা কহিল, "আমরা অনেক সন্ধান করিয়া এখানে আসিয়াছি। এখানে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া গোপনে বাস করিতেছি। তুমি গৃহ-সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, সে তোমার ইচ্ছা, কিন্তু তোমার স্ত্রীর প্রতি যে কেহ কোন অত্যাচার করিতে পাবে, সে কথা একবার ভাবিয়াছ?"

"তোমরা কি করিতে আছ? আমি সংসারের সঙ্গে, সংসারে যাহাদিগের সঙ্গে সম্বন্ধ, তাহাদিগকেও ত্যাগ করিয়াছি। কোন কথা বলা বৃথা, আমার কাছে তোমাদের আসাই উচিত নয়।"

রমণী কিছু কঠিন স্বরে কহিল, "যাহাকে তুমি বিশ্বাস করিতে, সে রটাইয়াছে, তোমার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার পর তোমার সমস্ত সম্পত্তি দখল করিয়াছে।"

"কথা সত্য, সংসারের পক্ষে আমার মৃত্যু হইয়াছে।"

"এখন সে আমাকে বিবাহ করিতে চায়।"

"সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে তলাক দিই নাই, কিন্তু তুমি যদি বল ত এখনি দিতে পারি।"

"আমি আর কাহাকেও বিবাহ করিতে চাই না।"

কণ্ঠস্বরের বেগ ও বেদনা বুঝিয়া টিকিয়া শাহ রমণীর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। কহিলেন, "জফর আলী কি তোমাকে উৎপীড়ন করে? তুমি কি তাহাকে বিবাহ করিতে চাহ না?"

রমণী সেইরূপ ক্রুদ্ধ ও মর্ম্মব্যথিত স্বরে কহিল, "বরং আত্মঘাতিনী হইব, তবু স্বামী থাকিতে কিংবা না থাকিলে, দ্বিতীয়বার বিবাহ করিব না। তুমি কিছু না কর, আমি ফিরিয়া গিয়া গ্রামের সকলকে জানাইব, তুমি সংসার ত্যাগ করিয়াছ।"

টিকিয়া শাহ কহিলেন, "তোমার কাহাকেও কিছু বলিতে হইবে না, আমি ইহার প্রতীকার করিব। কিন্তু এই শেষ, তোমরা আর কখন আমার সন্ধান করিও না, করিলেও আমার দেখা পাইবে না। তোমরা এখানে আর আসিও না। এক সপ্তাহ পরে আমার সঙ্গে আবার দেখা হইবে।"

রমণী ও তাহার ভ্রাতা উঠিয়া গেল।

গভীর রাত্রে জফর আলী নিদ্রামগ্ন, এমন সময় কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। শয্যা হইতে উঠিয়া ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। জফর আলী কোন কথা কহিল না, কাহাকেও ডাকিল না। গৃহের দ্বার মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিল। কে যেন তাহার মুখ বন্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সে বরাবর সোজা চলিল। নিশীথের নিস্তব্ধতা চারি দিকে, আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে। পথে একটা অশ্বত্থবৃক্ষের তলায় অন্ধকারে এক জন দীর্ঘকায় পুরুষ দাঁড়াইয়া ছিলেন। জফর আলী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। পুরুষ স্নিগ্ধ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "জফর আলী!"

জফর আলী সিহরিয়া বলিল, "সাদত আলী।"

পুরুষ জাফর আলীর হাত ধরিলেন। মুষ্টি দৃঢ় নয়, কোনরূপ বল প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু জফর আলীর মনে হইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া গেল। পুরুষ টিকিয়া শাহ। জফর আলীকে বলিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।"

কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, কোন আপত্তি না করিয়া জফর আলী তাঁহার সঙ্গে কলের মত চলিল।

সে গ্রাম হইতে পাটনা সহর অনেক দূর, পদব্রজে যাইতে প্রায় তিন দিন লাগে। এক সপ্তাহ অতীত হইলে রাত্রিকালে জফর আলীকে সঙ্গে করিয়া টিকিয়া শাহ সহরের ভিতর একটা ছোট

বাড়ীর সম্মুখে উপনীত হইলেন। দরজা বন্ধ দেখিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন। সেই রমণীর ভ্রাতা দরজা খুলিয়া দিল। টিকিয়া শাহ ও জফর আলী ভিতরে প্রবেশ করিলে আলোকে চিনিতে পারিয়া রমণীর ভ্রাতা বিস্মিত হইয়া কহিল, "জফর আলী।"

টিকিয়া শাহ বলিলেন, "হাঁ, তোমার ভগিনীকে ডাক।"

তাঁহাদিগকে একটা ঘরে বসাইয়া রমণীর ভ্রাতা তাহার ভগিনীকে ডাকিল। সে আসিয়া একবার টিকিয়া শাহকে, একবার জফর আলীকে চাহিয়া দেখিল।

টিকিয়া শাহ রমণীকে বলিলেন, "আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, এক সপ্তাহ পরে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে। জফর আলী উপস্থিত। তাহাকে কি বলিতে চাও?"

রমণী কহিল, "আমার যাহা বলিবার বলিয়াছি। উহাকেই জিজ্ঞাসা কর।"

টিকিয়া শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "জফর আলী, তুমি রটাইয়াছ, আমার মৃত্যু হইয়াছে। আমার মৃত্যু হইলে তোমার কি লাভ?"

জফর আলী নিরুত্তর।

—আমার মৃত্যু হইলেও আমার সম্পত্তি তোমার নয়। কোন রমণীর পতি থাকিতে কিম্বা সে বিধবা হইলেও যদি সে আর কাহাকেও বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হয়—তাহা হইলে তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে নাই। এই রমণীর অনিচ্ছা থাকিলেও তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য তুমি পীড়ন করিয়াছ। এ কথা সত্য?"

"সত্য।"

"তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক দূর, আমার উপর তোমার কোন দাবী নাই। তবু তোমাকে আমি অর্থ দিয়া, বাসস্থান দিয়া সকল প্রকারে তোমার সাহায্য করিয়াছি। এ কথা সত্য?"

"সত্য।"

"এই কি তোমার কৃতজ্ঞতা?"

জফর আলী মাথা হেঁট করিল।

টিকিয়া শাহ রমণীকে কহিলেন, "জফর আলী তোমার সম্পত্তি লইয়াছে, তোমাকে অপমান করিয়াছে। সে উপস্থিত, তুমি তাহার দণ্ড কর।"

রমণী কহিল, "তোমার নিকট এ ব্যক্তি আরও গুরুতর অপরাধী।"

টিকিয়া শাহ কহিলেন, "আমি কাহারও দণ্ডদাতা নহি, আমার নিকট কেহ অপরাধী নয়।"

"তাহা হইলে আমারও কিছু বলিবার নাই। আমি গিয়া বাপের বাড়ী থাকিব।"

টিকিয়া শাহ কহিলেন, "জফর আলী, তুমি অপরাধী, কিন্তু যাহাদের কাছে অপরাধী, তাহারা কোন দণ্ড দিতে চাহে না। তুমি স্বয়ং নিজের অপরাধের দণ্ড লইতে স্বীকৃত আছ?"

জফর আলী কহিল, "আমি গ্রামে আর ফিরিয়া যাইব না, কোন সম্পত্তি লইব না, কাহাকেও বিবাহ করিতে চাহিব না। আমার নাম সকলে ভুলিয়া যাইবে।"

আর কোন কথা না বলিয়া টিকিয়া শাহ বাড়ীর বাহিরে আসিলেন। জফর আলী তাঁহার পিছনে পিছনে আসিল

তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। টিকিয়া শাহ নীরবে গঙ্গাতীরের অভিমুখে চলিলেন। সহর অতিক্রম করিয়া মাঠে আসিলেন। গঙ্গার নিকটবর্ত্তী হইলে দেখিলেন, এক ব্যক্তি গঙ্গাতীর হইতে সহরের দিকে আসিতেছে। সে টিকিয়া শাহকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর তাঁহার পদতলে পতিত হইল। টিকিয়া শাহ হাত তুলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কুটীরের সম্মুখে আসিয়া টিকিয়া শাহ জফর আলীকে কহিলেন, "যে পর্য্যন্ত প্রভাত না হয়, তুমি এখানে থাকিতে পার, তাহার পর অন্যত্র যাইবে। আমার বিষয়ে কোন কথা কাহাকেও বলিবার আবশ্যক নাই।"

প্রভাত হইলে জফর আলী কুটীর হইতে চলিয়া গেল।

তাহার পর জফর আলী অপর লোকের সঙ্গে টিকিয়া শাহকে দেখিতে আসিত। তিনি অপর লোকের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিতেন, তাহার সহিতও সেইরূপ করিতেন। জফর আলী ফকীরের দলে মিশিল। রাত্রে যে ব্যক্তি ফকীর শাহকে পথে দেখিয়াছিল, সে-ও আসিত, কিন্তু শাহজীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার কথা সাহস করিয়া কাহাকেও বলিত না।

মীরাটে সিপাহীবিদ্রোহের কিছু দিন পূর্ব্বে চারিদিকে নানা রকম জনরব উঠিতে লাগিল। সন্ন্যাসী-ফকীরদের প্রতি রাজপুরুষদের বিশেষ

সন্দেহ। পাটনা সহরে ও আশের পাশের অঞ্চলে টিকিয়া শাহের অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা, কিন্তু পুলিস তাঁহারও পিছনে লাগিল। কে তাঁহার কাছে আসে, কাহার সঙ্গে তিনি কি রকম কথা কহেন, এ সকল সন্ধান আরম্ভ হইল। একবার তাঁহাকে ধরিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, টিকিয়া শাহ 'হাঁ' 'না' কিছুই বলিলেন না, কোন কথার উত্তর দিলেন না। সাহেব রাগিয়া ফৌজদারকে কহিলেন, "এ কি বোবা ?"

"না হুজুর, ইনি কাহারও সহিত বেশী কথা কন না। সাধু-সন্ন্যাসীরা অনেকে মৌনী হন, একেবারেই কথা কহেন না।"

"আচ্ছা করিয়া বেত লাগাইলে খুব কথা কহিবে। আমি জেলার হাকিম, আমার কথার উত্তর দেয় না !"

ফৌজদার ভীত হইয়া কহিলেন, "জনাব, "নিরপরাধী ফকীরকে চোরের মত বেত মারিলে সহরের লোক দাঙ্গা করিবে। ইঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা প্রকাশ পায় নাই।"

সাহেব বিরক্ত হইয়া টিকিয়া শাহকে বিদায় করিয়া দিলেন। অকারণে এমন সাধু-পুরুষের অপমান হইয়াছে বলিয়া সহরের লোক রাগিয়া উঠিল ; কিন্তু টিকিয়া শাহ নিজে কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না, যেমন মৌন থাকিতেন সেইরূপ রহিলেন।

ইহার পর এক দিনও আর কেহ টিকিয়া শাহকে দেখিতে পাইল না। কোথায় যে চলিয়া গেলেন, কেহ জানিতে পারিল না। অনেকে অনেক কথা বলিল, তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার অনেক দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল, কিন্তু তিনি যে কোথায় গিয়াছেন, তাহা কেহ বলিতে পারিল না।

রাত্রে যে তাঁহাকে পথে দেখিয়াছিল, সে দম্ভ করিয়া বলিত, "টিকিয়া শাহকে কেহ কখন পথে চলিতে দেখিয়াছে ? আমি দেখিয়াছি।"

চন্দ্রপীড়ের ঐশ্বর্য্য

১

প্রকোষ্ঠে একাকী বসিয়া চন্দ্রপীড় দুশ্চিন্তায় মগ্ন। চন্দ্রপীড় মনোহরকান্তি যুবা পুরুষ, যত্নরঞ্জিত কুঞ্চিত কেশ, প্রশস্ত ললাট আয়ত উজ্জ্বল নয়ন। এখন ললাটে চিন্তারেখা, চক্ষের উজ্জ্বলতা বিষাদে আবৃত। সম্প্রতি তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, বাল্যকালেই মাতৃবিয়োগ হয়, গৃহে আর কেহ নাই। ভাবনার কারণ, পিতা এক কপর্দ্দকও রাখিয়া যান নাই। রাখিবার মধ্যে বৃহৎ অযত্নরক্ষিত বসতবাড়ী ও বিস্তর ঋণ। বাড়ী ত যাইবেই, কিন্তু তাহাতেও ঋণ শোধ যাইবে না। চন্দ্রপীড় এমন কোন কর্ম্ম শিখে নাই, যাহাতে নিজে উপার্জ্জন করিয়া পিতৃঋণ শোধ দিতে পারেন। তাঁহার পিতা অপব্যয় করিতেন, পুত্রকে উপার্জ্জনক্ষম করিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। অথচ পুত্রকে কখনও কোনরূপ ক্লেশ অথবা ত্যাগ-স্বীকার করিতে হয় নাই। এখন সহসা তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই গৃহ দুই চারি দিনের মধ্যে তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, সম্বল কিছুমাত্র নাই, কেমন করিয়া তাঁহার দিন কাটিবে? অপর লোকে মনে করে, তিনি ধনীর সন্তান, তাঁহার পিতা সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, বৃহৎ পৈতৃক ভবন রহিয়াছে। চন্দ্রপীড় জানেন, গজভুক্তকপিত্থবৎ শুধু বাড়ীখানা পড়িয়া আছে, ভিতরে কিছুই নাই।

গোধূলি উত্তীর্ণ হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকার আকাশ হইতে নামিয়া আসিতেছে। চারিদিক্ স্তব্ধ, বাড়ীতে কোন শব্দ নাই। যে ঘরে চন্দ্রপীড় বসিয়া ছিলেন, সেখানে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। প্রদীপের কম্পিত আলোকে গৃহপ্রাচীরে চন্দ্র-পীড়ের চঞ্চল ছায়া। অন্ধকার বাহিরে, চন্দ্রপীড়ের মনেও অন্ধকার।

অকস্মাৎ ঘরের ভিতর কে বলিল, "এমন সময় একা বসিয়া কি ভাবিতেছ?"

চন্দ্রপীড় বিস্মিত, হয় ত বিরক্ত হইবার কথা, কিন্তু কোনরূপ চঞ্চলতা প্রকাশ না করিয়া তিনি অলস ভাবে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তখন তিনি যথার্থই বিস্মিত, এমন কি, কিছু ভীত হইলেন। এ কে? এই ব্যক্তিকে তিনি ত ইহার পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই! ভীষণোজ্জ্বল মূর্ত্তি, নিঃশব্দে দ্বার অতিক্রম করিয়া চন্দ্রপীড়ের পশ্চাতে এক পাশে দাঁড়াইয়া! দেখিতে কুৎসিত নয়, বিভীষিকাও উৎপাদন করে না, তবে চন্দ্রপীড় এমন আড়ষ্ট হইয়া উঠিলেন কেন? যে কথা কহিয়াছিল, সে দিব্য সুপুরুষ, মাঝারি গড়ন, মুখে অল্প হাসি। তবে তাহাকে দেখিয়া চিত্তের এমন বিকার হইল কেন? হয় ত তাহার চক্ষু—দীর্ঘায়ত, কৃষ্ণতার, স্থির—যেন চন্দ্রপীড়ের মনে হইতেছিল, ইহার পিছনে আর কেহ আছে, সে-ও ঘরে প্রবেশ করিবে। যেন তাহার পিছন হইতে অথবা তাহার অঙ্গ হইতে এক রকম জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতেছিল, যেন সেই অল্প হাসির সহিত এক প্রকার ভীষণতা জড়িত ছিল।

চন্দ্রপীড় কহিলেন, "আপনি এমন সময় আসিয়াছেন কেন? আপনার কিছু টাকা পাওনা আছে?"

সে ব্যক্তির মুখে হাসি লাগিয়াছিল, কহিল, "না, আমার কিছু পাওনা নাই। তোমার কি অর্থাভাব, সেই জন্য ভাবিতেছ?"

"সে কথা শুনিয়া আপনার কি হইবে? আমি নিঃস্ব, বিশেষ এ সময় কে আমার উপকার করিবে?"

"আমি তোমার অভাব মোচন করিব।"

"আমি ঋণগ্রস্ত, আরও কর্জ্জ করিতে পারিব না।"

"আমি তাগাদা করিব না, তোমার কখনও ক্ষমতা হয়, ইচ্ছা হয়, শোধ করিও।"

এমন করিয়া নিজে উপযাচক হইয়া কে ধার দেয়? ইহার কি মতলব? চন্দ্রপীড় কিছু সন্দিগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি আপনাকে কখন দেখি নাই, আপনি অযাচিত হইয়া আমার উপকার করিতে চাহিতেছেন কেন?"

"সে কথায় প্রয়োজন কি? তোমার কিছু নাই, আমি তোমাকে অতুল ঐশ্বর্য্য দিতে চাহিতেছি। কেহ সাক্ষী নাই। লেখা-পড়ার কোন আবশ্যক নাই। যেমন আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতেছি, তুমিও আমাকে সেইরূপ বিশ্বাস কর।"

"আমি অনন্যোপায়, আপনি যাহা বলিবেন, তাহাতেই আমাকে স্বীকৃত হইতে হইবে।"

সে ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া চন্দ্রপীড়ের সম্মুখে আসিল, চন্দ্রপীড়ের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কহিলেন, "আপনি আমাকে কত ধার দিবেন?"

"তোমার যত আবশ্যক। তুমি আমার হাত ধরিয়া শপথ কর যে, তুমি আমার নিকট ঋণবদ্ধ হইলে।"

চন্দ্রপীড় সেইরূপ শপথ করিলেন, কিন্তু সে ব্যক্তির হস্ত ধারণ করিবার সময় তাঁহার মনে হইল, যেন তাঁহার দেহ অবশ, নিস্পন্দ হইয়া গেল, রক্ত-চলাচল বন্ধ হইয়া গেল।

সে ব্যক্তি কহিল, "তোমার গৃহে কি কিছু অর্থ নাই?"

"এক কপর্দ্দকও নাই, আমি একবারে রিক্ত-হস্ত।"

"তোমার পিতার শয্যার নীচে একবার খুঁজিয়া দেখিও।" আর কোন কথা না কহিয়া সে ব্যক্তি যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, সেইরূপ নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

চন্দ্রপীড় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। এ ব্যক্তি কে, তাঁহাকে কি বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছিল? তাঁহার পিতার শয্যার নীচে কি থাকিতে পারে? চন্দ্রপীড় কি কোন স্থানে খুঁজিতে বাকি রাখিয়াছিলেন? যদি কোথাও কিছু লুক্কায়িত থাকিত, তাহা হইলে কি তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিয়া যাইতেন না? কিছুক্ষণ এইরূপ চিন্তার পর চন্দ্রপীড় হস্তে প্রদীপ তুলিয়া লইয়া পিতার শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। শয্যা তুলিয়া দেখেন, এক রাশি সুবর্ণমুদ্রা। চন্দ্রপীড়ের হাত কাঁপিতে লাগিল, নিশ্বাস রুদ্ধ হইল। প্রদীপ রাখিয়া দিয়া মোহর গণিতে লাগিলেন। এক সহস্র, দুই সহস্র মুদ্রা! নিজের শয়নকক্ষে সেই মোহর লইয়া গিয়া একটা বাক্সে বন্ধ করিয়া শিয়রের কাছে রাখিলেন। রাত্রে সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিল না। ভাবিতে লাগিলেন—ইহা শুধু ইন্দ্রজাল, প্রভাতে উঠিয়া যখন বাক্স খুলিবেন, তখন দেখিবেন, শূন্য বাক্স পড়িয়া আছে, ভেল্কীবাজীর মত মোহর অন্তর্হিত হইয়াছে। অনেক রাত্রে নিদ্রা আসিল।

প্রভাতে উঠিয়া, চন্দ্রপীড় বাক্স খুলিয়া দেখিলেন, মোহর যেমন তেমনি রহিয়াছে, স্বপ্নও নয়, ইন্দ্রজালও নয়। সেই যে চন্দ্রপীড়ের অর্থাগম আরম্ভ হইল, তাহার আর নিবৃত্তি হইল না। কোথা হইতে কখন্ অর্থ আসে, তিনি নিজেই কিছু বুঝিতে পারিতেন না। দাসদাসী লোকজনে বাড়ী ভরিয়া গেল। যে সকল বহুমূল্য সামগ্রী আর কেহ কিনিতে পারে না, চন্দ্রপীড় অবলীলা-ক্রমে তাহা ক্রয় করিতেন। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, চন্দ্রপীড়ের এমন বিভব আসিল কোথা হইতে? তাঁহার পিতা কি সঞ্চিত অর্থ গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন? চন্দ্রপীড় নিজে এ পর্য্যন্ত কিছু উপার্জ্জন করেন নাই, তাঁহার বন্ধুরা জানিত, তিনি অলস, কখন কোন কর্ম্মে উৎসাহ ছিল না। ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তাঁহার বন্ধু-সংখ্যা বাড়িয়া গেল, মোসাহেব অনেক জুটিল।

ধনবৃদ্ধির সহিত কিন্তু চন্দ্রপীড়ের প্রকৃতিতে কোনরূপ উদারতা প্রকাশ পাইল না। আত্মীয়-স্বজন কেহ কোন অভাব জানাইতে আসিলে অথবা সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তাহাদিগকে রূঢ় কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দিতেন। দরিদ্র ভিখারী ভিক্ষা চাহিতে আসিলে হাঁকাইয়া দিতেন। দান প্রাণান্তেও করিতেন না। কাহাকেও টাকা কর্জ্জ দিলে কড়ায়-গণ্ডায় সমস্ত আদায় করিয়া লইতেন, কখনও কাহাকে কিছু রেহাই করিতেন না। যৌবনে যে একটা সহৃদয়তা থাকে, মনের প্রশস্ততা থাকে, চিত্তের সরল আবেগ থাকে, তাহার কোন লক্ষণই দেখা যাইত না। অপর পক্ষে চন্দ্রপীড় দিবানিশি প্রমোদে মত্ত থাকিতেন। কতকগুলা দুশ্চরিত্র যুবক তাঁহার সঙ্গী হইল, সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত। অপর কেহ কোন বিষয়ে সৎ-পরামর্শ দিলে তাহার কথায় কর্ণপাত করি-তেন না।

এই রকম করিয়া মাস কয়েক কাটিল। পথে, ঘাটে সর্ব্বদা লোকে চন্দ্রপীড়ের চর্চ্চা করিত, তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও তাঁহার চরিত্রহীনতার আলোচনা করিত। পথে যখন বেগবান্ অশ্ববাহিত রথে তিনি কয়েকজন বন্ধুর সহিত যাইতেন, সেই সময় লোকে পথ ছাড়িয়া দিতেন বটে, কিন্তু কেহ তাঁহাকে অভিবাদন করিত না, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদও করিত না। সম্মুখে অথবা পথের পাশে কোন দরিদ্র আতুর ব্যক্তিকে দেখিলে চন্দ্রপীড় তাহাকে কশাঘাত করিতেন আর তাঁহার বন্ধুরা তাঁহার পাশে বসিয়া নিষ্ঠুর উচ্চ হাস্য করিত। কেহ কোন

অভিযোগ করিলে চন্দ্রপীড় কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া মিটাইয়া ফেলিতেন। আশ্চর্য্যের কথা এই, যে ব্যক্তি সেই সন্ধ্যার সময় আসিয়া তাঁহাকে অর্থ-প্রাপ্তির কথা বলিয়া গিয়াছিল, সে তাহার পর আর কখন আসে নাই। চন্দ্রপীড় তাহার কথা দুই চারবার মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু আর কাহাকেও কিছু বলেন নাই। সে ব্যক্তি তাঁহার কি করিয়াছিল? তাঁহার পিতার শয্যার তলায় দেখিতে বলিয়াছিল, এই পর্য্যন্ত। এ কথা অপর লোকেও বলিতে পারিত। চন্দ্রপীড়কে সে ত কিছুই ধার দেয় নাই, তাহার সঙ্গে কোন রকম লেখাপড়াও হয় নাই। যদি সে কখন আসিয়া ঋণ শোধ করিবার কথা বলে, তাহা হইলে চন্দ্রপীড় তাহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। কিসের ধার, কবে তিনি তাহার কাছে কিছু ধার করিয়াছিলেন যে শোধ দিতে যাইবেন?

এক দিন বন্ধুদিগের সহিত বসিয়া চন্দ্রপীড় এই কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, গৃহের মধ্যে শূন্যে একটা তরবারি! কোন লোক দেখিতে পাইলেন না, কাহার হস্তে তরবারি, তাহাও দেখিতে পাইলেন না। তীক্ষ্ণধার, শাণিত, উজ্জ্বল তরবারি, সর্পের জিহ্বার ন্যায় লক্ লক্ করিতেছে! ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে অসির অগ্রভাগ চন্দ্রপীড়ের নিকটে আসিতে লাগিল, তাঁহার মনে হইল, তাঁহার কণ্ঠে বিদ্ধ হইবে। চন্দ্রপীড়ের চক্ষু ভয়ে বিস্ফারিত হইয়া স্থির হইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া কাঁপিতে লাগিল, কম্পিত হস্তে অসি সরাইয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। কোথায় অসি? চন্দ্রপীড়ের হস্ত শূন্য বায়ুতে সঞ্চালিত হইল।

পাশে যাহারা ছিল, তাড়াতাড়ি চন্দ্রপীড়কে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে, কি হইয়াছে?

চন্দ্রপীড়ের মুখ পাণ্ডুবর্ণ, ম্লান ও শুষ্ক, চক্ষে অত্যন্ত ভয়। কহিলেন, "আমাকে এক জন তরবারি দিয়া হত্যা করিতে আসিয়াছিল।"

"আমরা এত লোক রহিয়াছি, কে আবার তোমাকে হত্যা করিতে আসিবে? এখানে অপর কোন লোক আসে নাই, কাহারও হাতে আমরা তরবারি দেখি নাই।"

"আমিও কাহাকেও দেখিতে পাই নাই, কিন্তু একটা তরবারি আমার কণ্ঠের কাছে আসিতেছিল।"

"তোমার যেমন কথা! তরবারি কি আপনা আপনি আসে? আমরা কোন মানুষও দেখি নাই, তরবারিও দেখি নাই। তুমি খেয়াল দেখিতেছিলে।"

চন্দ্রপীড় কিছু প্রকৃতিস্থ হইলে বাড়ীর লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কেহ কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে তরবারি হস্তে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে কি না। সকলেই বলিল, তাহারা অপর কোন ব্যক্তিকে আসিতে দেখে নাই। সদর-দরজায় দ্বারবানরা বসিয়া থাকে, তাহাদের অলক্ষ্যে অজানা লোক কেমন করিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিবে? চন্দ্রপীড় মনে করিলেন, হয় ত তাঁহার চক্ষের ভুল হইয়া থাকিবে, হয় ত রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই বলিয়া দিবাস্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু সেই দিন হইতে তিনি কয়েক জন প্রহরী নিযুক্ত করিলেন, তাহারা অস্ত্র-ধারণ করিয়া বাহিরের দরজায় বসিয়া থাকিত, কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে বাড়ীর ভিতর আসিতে দিত না।

৩

সেই অবধি চন্দ্রপীড়ের কেমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল, সর্ব্বদাই যেন একটা বিপদের আশঙ্কা তাঁহার চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিত। বিলাস আমোদে মনকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিতেন না। আর যখন তখন সময়ে অসময়ে সেইরূপ ভয় পাইতেন। কোন মনুষ্য নাই, শত্রুর কোন চিহ্ন নাই, তবু সেই উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট, খরধার নগ্ন অসি তাঁহার গ্রীবা বিদ্ধ করিতে আসিত, চন্দ্রপীড় কম্পান্বিত-কলেবরে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিতেন। সর্ব্বাঙ্গ স্বেদাসিক্ত, চক্ষু ভীতিপূর্ণ, শুষ্ক মুখে অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিতেন না।

চিকিৎসকরা আসিয়া দেখিল, কেহ কোন রোগ নির্ণয় করিতে পারিল না। কেহ তৈলের ব্যবস্থা করিল, কেহ নিদ্রার ঔষধ দিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। চন্দ্রপীড়ের স্বভাব আরও নির্ম্মম হইয়া উঠিল। সকলকেই সর্ব্বদা উৎপীড়ন, সর্ব্বদা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ তাঁহার নিত্য কর্ম্ম হইল। তাঁহার ভৃত্যগণ, বন্ধুবান্ধবরা সকলে বিরক্ত হইত; কিন্তু কেহ তাঁহাকে পরিত্যাগও করিত না, কেন না, অর্থব্যয়ে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না, বরং ব্যয় আরও বাড়িতেছিল।

নিত্য রাত্রে নৃত্যগীত, দিবাভাগে নিত্য লোকসমাগম, তাস-পাশা খেলা, কখন ভ্রমণ, কখন নৌকাবিহার। চন্দ্রপীড় এক মুহূর্ত্ত একা থাকিতেন না, মনকে ভুলাইবার জন্য উন্মত্তের মত প্রমোদে মগ্ন থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় হইতে আশঙ্কার ছায়া কখন অপসৃত হইত না।

আবার এক দিন সন্ধ্যার সময় সেই প্রকোষ্ঠে চন্দ্রপীড় একা বসিয়া ছিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা কে কখন যে কোথায় সরিয়া গিয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। একবার ভাবিলেন, উঠিয়া কাহাকেও ডাকিবেন, কিন্তু কিছুতেই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পূর্ব্বকথা তাঁহার মনে পড়িল। পিতৃবিয়োগের পর এই ঘরে বসিয়া এক দিন ভাবিয়াছিলেন, অর্থাভাবে কেমন করিয়া সংসার চালাইবেন। সে দিন যে ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন, তাহাকে ত আর কখন দেখিতে পান নাই! সে কে? সেই কি কোন অজ্ঞাত উপায়ে চন্দ্রপীড়কে অকাতরে অর্থ যোগাইয়াছিল? তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ্য কি? আর সর্ব্বদা চন্দ্রপীড়ের প্রাণের আশঙ্কা—ইহারই বা অর্থ কি? কে ভোজবাজীর মত তরবারি দেখাইয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইত? প্রচুর অর্থ থাকিলে যে সমস্ত ভোগসুখ হয়, চন্দ্রপীড়ের তাহা ত সকলই ছিল, তবে তিনি এক পলের তরে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না কেন, কেন তাঁহাকে অহোরাত্র সশঙ্কিত থাকিতে হইত, কেন এই বিষম আশঙ্কা তিনি কখন ভুলিতে পারিতেন না? এই ত এত লোক তাঁহার কাছে আসে যায়, কেহ সঙ্গতিপন্ন, কাহারও সামান্য অবস্থা, কিন্তু কাহাকেও ত এমন সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয় না? যদি চন্দ্রপীড় দারিদ্র্য স্বীকার করিতেন, পরিশ্রম করিয়া দিনাতিপাত করিতেন, তাহা হইলেও কি তাঁহাকে দিবানিশি এইরূপ প্রাণের ভয়ে কাল কাটাইতে হইত?

সহসা তাঁহার পাশে কে বলিল, "এমন সময় একা বসিয়া কি ভাবিতেছ?"

চন্দ্রপীড় চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলেন। আবার সেই মূর্ত্তি, আবার সেই কথা! আর এক দিন এমনি সন্ধ্যার সময় একাকী বসিয়া অর্থের অভাবে চন্দ্রপীড় দুশ্চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, তখন এই ব্যক্তি এইরূপে গোপনে আসিয়া এই কথা বলিয়াছিল, আজ চন্দ্রপীড়ের প্রচুর অর্থ অথচ দুশ্চিন্তা পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক অধিক, আজও সেই ব্যক্তি সেইরূপে আসিয়া ঠিক সেই কথা বলিল। কিন্তু এ ব্যক্তি যখন প্রথম আসে, তখন চন্দ্রপীড়ের লোক-জন কেহ ছিল না, কোন অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে গৃহপ্রবেশ কঠিন নয়, কিন্তু এখন বাড়ীতে সর্ব্বত্র লোকজন, দ্বারে কঠিন প্রহরা, তাহাদের অজ্ঞাতে সকলকে বঞ্চিত করিয়া চোরের মত এ লোক কেমন করিয়া আসিল? চন্দ্রপীড়ের হৃৎপিণ্ড কে যেন চাপিয়া ধরিল; কিন্তু মুখে তিনি সাহস করিয়া বলিলেন, "কে তুমি, বিনা অনুমতিতে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছ কেন?"

যে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সে হাসিল। হাসি ব্যঙ্গপূর্ণ, কিন্তু কোন শব্দ নাই। তাহার চক্ষের দৃষ্টি যেন চন্দ্রপীড়ের হৃদয় বিদ্ধ করিতে লাগিল। কহিল, "তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?"

তাহার কণ্ঠস্বর তুষারখণ্ডের ন্যায় চন্দ্রপীড়ের শ্রবণ স্পর্শ করিল। একবার মনে করিলেন, কাহাকেও ডাকিবেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নবাগত ব্যক্তি কহিল, "পূর্ব্বে যখন আসিয়াছিলাম, সে সময় তুমি অর্থের অভাবে চিন্তিত ছিলে। এখন ত তোমার অর্থের অভাব নাই, এখন কিসের চিন্তা?"

চন্দ্রপীড়ের কণ্ঠ মুক্ত হইল, কহিলেন, "তুমি কি আমাকে হত্যা করিবে? দিবারাত্র আমাকে প্রাণের ভয় দেখাও কেন?"

"মৃত্যুভয় ত সর্ব্বদাই আছে, তাহাতে তোমার উৎকণ্ঠা কেন?"

"মৃত্যু কি খড়্গের মূর্ত্তিতে সকল সময় কণ্ঠচ্ছেদ করিতে আসে?"

"মৃত্যুর মূর্ত্তি নানারূপ, তুমি তাহার এক রূপ দেখিতে পাও।"

"ইহা তোমার কোনরূপ ভৌতিক মায়া, আমি যে তোমার নিকট ঋণী, তাহার কোন প্রমাণ আছে? তুমি কখন কিছু আমাকে দিয়াছ?'

"না দিলে তোমার অত অর্থ আসিল কোথা হইতে?"

"সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার তুমি কে?"

আবার সেই নিঃশব্দ উৎকট হাসি! হাসিয়া সে ব্যক্তি কহিল, "তুমি কি শপথ করিয়াছিলে, ভুলিয়া যাইতেছ? সেই কথা তোমাকে স্মরণ করাইতে আসিয়াছি। আমার ধার আমি

যথাসময়ে আদায় করিয়া লইব, সে জন্য কোন চিন্তা নাই।” চন্দ্রপীড়ের সমক্ষে সেই স্থানেই সে ব্যক্তি অন্তর্হিত হইল।

৪

উন্মত্তের ন্যায় গৃহের বাহিরে আসিয়া চন্দ্রপীড় যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন, তাহাকেই তিরস্কার করিতে লাগিলেন। দ্বারে প্রহরীরা আছে, বাড়ীতে চারিদিকে লোকজন, সকলের অজ্ঞাতে তাঁহার নিভৃত কক্ষে এক জন অপরিচিত ব্যক্তি কেমন করিয়া প্রবেশ করিল? যদি সে তাহাকে হত্যা করিত, তাহা হইলে কে রক্ষা করিত? চন্দ্রপীড় কাহাকেও গালি দিলেন, কাহাকেও মারিতে উদ্যত হইলেন। বাড়ীর সর্ব্বত্র, বাড়ীর বাহিরের পথে পথে সকলে সেই ব্যক্তির অন্বেষণ করিতে লাগিল। কোথায় সে? কেহ তাহাকে আসিতে দেখে নাই, কেহ যাইতে দেখে নাই।

সেই দিন হইতে চন্দ্রপীড়ের আচরণে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। আগে যেমন ভয়ে ভয়ে থাকিতেন, মুখের ভাব ম্লান, চক্ষে ভয়চকিত দৃষ্টি, সে ভাব যেন তিরোহিত হইল। বিলাস এবং ঔদ্ধত্য দুই-ই বাড়িয়া গেল। নিরবচ্ছিন্ন প্রমোদে সঙ্গীরা ক্লান্ত হইয়া পড়িত, কিন্তু চন্দ্রপীড় কিছুতে শ্রান্তি অনুভব করিতেন না। গৃহে, প্রমোদ-উদ্যানে, সজ্জিত নৌকায় নৃত্য-গীতের বিরাম নাই। তাহার উপর এক নূতন সখ, চন্দ্রপীড় তরবারি-খেলা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। নগরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ অসিযোদ্ধাকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়া চন্দ্রপীড় প্রভাতে ও সায়ংকালে অসিযুদ্ধ শিক্ষা করিতেন, বন্ধুরা দাঁড়াইয়া দেখিত ও তাঁহাকে উৎসাহিত করিত। অল্পদিনের মধ্যে অসিচালনায় চন্দ্রপীড় দক্ষ হইয়া উঠিলেন।

আর তিনি তরবারি ত্যাগ করিতেন না, অহর্নিশি তাঁহার কটিতে বাঁধা থাকিত, নর্ত্তকীরা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত, ‘তলওয়ার বাঁধিয়া নাচ দেখিতে হয়, না লড়াই করিতে হয়? তোমার বুঝি এই লড়াই?’ বন্ধুরা বলিত, চন্দ্রপীড়ের নূতন খেয়াল চাপিয়াছে। নূতন খেয়ালের অর্থ বুঝিতে বড় বিলম্ব হইল না।

কিছুদিন চন্দ্রপীড় ভয় পান নাই। এক দিন বসিয়া কোন নূতন গায়িকার গীত শ্রবণ করিতেছেন, দুই পাশে নর্ত্তকীর দল ও বিলাসপরায়ণ বন্ধুগণ। অকস্মাৎ চন্দ্রপীড়ের চক্ষের পলকপতন বন্ধ হইল, তাঁহার শ্রবণ বধির হইল। গায়িকা ও নর্ত্তকীদের মাথার উপর দিয়া, বন্ধুদিগের পাশ দিয়া তীব্রোজ্জ্বল অসি আসিতেছে! অসির মুষ্টি শূন্য, কেহ ধরিয়া নাই, আকাশবিহারী জীবন্ত উরগের ন্যায় ধীরে অথচ অভ্রান্ত সরল গতিতে চলিয়া আসিতেছে, অসির অগ্রভাগ চন্দ্রপীড়ের কণ্ঠের অভিমুখে। চন্দ্রপীড় কোষ হইতে অসি মুক্ত করিয়া লাফ দিয়া উঠিলেন, চীৎকার করিয়া কহিলেন, “কে আমাকে ভয় দেখাইতেছে? আমার কি আত্ম-রক্ষার ক্ষমতা নাই?” তাঁহার হস্তের অসি সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল, প্রতিঘাতশূন্য বায়ুতে সঞ্চালিত হইতে লাগিল।

গায়িকা ও নর্ত্তকীর দল ভীত হইয়া আর্ত্তরব করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, বন্ধুরা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দূর হইতে চন্দ্রপীড়কে নিরস্ত হইতে বলিতে লাগিল। এক জন কহিল, “আরে, কর কি, কর কি! এখনি তোমার তরবারি কাহারও অঙ্গে লাগিবে!”

চন্দ্রপীড়ের চক্ষে উন্মত্ততা, ওষ্ঠাধরে ফেনরেখা। যখন তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া হস্তের তরবারি নামাইলেন, তখন প্রকোষ্ঠ প্রায় শূন্য। গায়িকা ও নর্ত্তকীগণ সকলে পলায়ন করিয়াছে, বন্ধুরাও সেই পথে. কেবল দুই চারি জন দূরে দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রপীড় কহিলেন, “কি হইয়াছে, আর সকলে কোথায় গেল?”

বন্ধুদের মধ্যে এক জন বলিল, “সকলে প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছে। কোথাও কিছু নাই, তুমি তরবারি বাহির করিয়া ঘুরাইতে আরম্ভ করিলে, তাহা হইলে কে তোমার কাছে থাকিবে? কোথায় আমোদ-প্রমোদ হইতেছে, আর মাঝখান হইতে তুমি খুন করিতে প্রস্তুত।”

“আমাকে কে হত্যা করিতে আসিয়াছিল, তোমরা দেখিতে পাও নাই?”

“—কোথা হইতে কে আবার আসিবে? লোকে শুনিলে মনে করিবে, তোমার মাথার দোষ হইয়াছে।”

যে কয় জন ছিল, তাহারাও চলিয়া গেল। সেই অবধি চন্দ্রপীড়ের কাছে বড় একটা কেহ আসে না। চন্দ্রপীড় মুখে সাহস দেখাইতেন, কিন্তু ভিতরে তাঁহার আতঙ্ক বাড়িতে লাগিল। বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতেন, একা থাকিত

কোনমতে সাহস হইত না। নর্ত্তকীদের নিজে ডাকিতে গেলেন, তাহারা সকলে বলিল, "তোমার কাছে তরওয়াল থাকিলে আমরা তোমার বাড়ী যাইব না।" চন্দ্রপীড় প্রতিশ্রুত হইলেন, নৃত্যগীতের সময় তিনি কটিতে তরবারি রাখিবেন না।

দিন কয়েক পরে আবার চন্দ্রপীড়ের গৃহে প্রমোদসভা হইল। আবার সেইরূপ হাস্য-কোলাহল, সেইরূপ অসংযত আমোদ-বিলাসের উন্মাদনা! চন্দ্রপীড়ের মুখে হাসির বিরাম নাই। হঠাৎ তাঁহার হাসি বন্ধ হইয়া গেল। ভীতি-বিস্ফারিত চক্ষে তিনি দেখিলেন, পূর্ব্বদৃষ্ট সেই বিকটোজ্জ্বল মূর্ত্তি! গৃহে প্রবেশ করিয়া ত্বরাশূন্য গতিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। চন্দ্রপীড় কটিতে হস্তস্পর্শ করিলেন, তরবারি নাই। কহিলেন, "ইহাকে এখানে কে আসিতে দিয়াছে? ইহাকে বাহির করিয়া দিতে বল!"

গীত বাদ্য বন্ধ হইয়া গেল। গৃহশুদ্ধ লোক উঠিয়া দাঁড়াইল, কেহ কেহ কহিল, "এ ঘরে বাহিরের ত কোন লোক আসে নাই!"

চন্দ্রপীড়ের মুখে আর কথা সরিল না। তিনি একদৃষ্টে সেই ব্যক্তিকে দেখিতেছিলেন। তাহার মুখে অল্প হাসি, চক্ষে সেই মর্ম্মভেদী দৃষ্টি। আর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না, সকলেই স্তব্ধ হইয়া চন্দ্রপীড়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সকলে দেখিল, চন্দ্রপীড় একবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন, উঠিতে পারিলেন না। ক্রমশঃ তাঁহার চক্ষু ও দেহ নিস্পন্দ হইল। চক্ষের জ্যোতি নিভিয়া গেল। প্রাণশূন্য দেহ স্থির হইল।

সম্পূর্ণ

ফুটবল ফাইনাল

ও

অন্যান্য গল্প

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

ফুটবল ফাইনাল

১

কলিকাতার গড়ের মাঠে লোকে লোকারণ্য। ফুটবল শীল্ড টুর্ণামেণ্টের আজ শেষ দিন। যে দুই দলে খেলা, তাহার একটি বাঙ্গালী। ফাইনালে আজ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালী দল যাইতে পারে নাই। আজ প্রথম বাঙ্গালী দল অনেক বিখ্যাত দলকে পরাজিত করিয়া ফাইনালে আসিয়াছে। সেই জন্য এত ভিড়। শীল্ডের শেষ দিন বিস্তর লোক হয়, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এত লোক মাঠে কখন দেখা যায় নাই। ক্যাল্‌কাটা গ্রাউণ্ডে খেলা। ক্যাল্‌কাটা ক্লাবের লাল সাদা নিশান উড়িতেছে। গ্রাউণ্ডের চারি পাশে সারি দিয়া প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক দাঁড়াইয়াছে। ভিতরে চেয়ারে ও গ্যালারিতে লোক ঠাসা। পথের ধারে অসংখ্য গাড়ী ও মোটর; গাড়ীর ছাদে লোক দাঁড়াইয়াছে। গাছের ডালে লোক উঠিয়াছে। কেল্লার উঁচু জমী দিয়া খেলিবার স্থান দেখিতে পাওয়া যায়; সেখানে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়াছে। এত লোকের সমাগম মাঠে ইতঃপূর্ব্বে কেহ কখন দেখে নাই।

শ্রাবণ মাস। ক'দিন বৃষ্টি হয় নাই, মাঠে জল দাঁড়াইয়া নাই, গাঢ় সবুজ ঘাসে মাঠ ঢাকা, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। আকাশে মেঘ করিয়া আছে, কিন্তু ফাঁকা ফাঁকা মেঘে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই। বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে, সাড়ে পাঁচটায় খেলা আরম্ভ। পশ্চিমে মেঘের আড়ালে সূর্য্য অল্প অল্প দেখা যাইতেছে, কিন্তু রৌদ্রের তেমন প্রখর উত্তাপ নাই। দক্ষিণ হইতে বাতাস বহিতেছে। গঙ্গায় সারি সারি জাহাজ, বাতাসে নিশান উড়িতেছে। পথে মোটরের ও গাড়ীর ঘণ্টার অবিশ্রাম শব্দ। চারিদিকে ফেরিওয়ালারা পান-সিগারেট্ বেচিতেছে, চীনের বাদাম ভাজা, অবাক্ জলপান হাঁকিতেছে।

সেই সমবেত লক্ষ লোকের কোন দিকে দৃষ্টি নাই। তাঁবুর ভিতর হইতে যে দিক্ দিয়া খেলোয়াড়েরা রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবে, লক্ষ জোড়া চক্ষু একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া আছে। এমন জাতিই নাই, যাহাকে সে ভিড়ে দেখা যায় না। পশ্চিমে সারি সারি সাহেব-মেম বসিয়াছে, দক্ষিণে গোরারা ঘাসের উপর বসিয়াছে, উত্তরে ও পূর্ব্বে বাঙ্গালী ও অপরাপর জাতি। দড়ীর বাহিরে সংখ্যাতীত নানা জাতীয় লোক। বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক; কিন্তু হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, মোগল, পাঠান, পাঞ্জাবী, চীনাম্যান, সকল জাতিকে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে খেলার কিছুই বুঝে না, তথাপি আগ্রহের সহিত দেখিতে আসিয়াছে। ঘোড়দৌড়ের মাঠে ভিড় হয় জুয়া খেলিবার জন্য; ফুটবল্ খেলাতেও জুয়া হয়, কিন্তু অনেকে শুধু দেখিতে যায়, জুয়া খেলিতে যায় না। আজ তাহাতে শুধু খেলা দেখিবার আমোদ নয়; কৌতূহলের পশ্চাতে জাতীয়তার একটা উত্তেজনা আছে। ফুটবল খেলায় বাঙ্গালী কি এ দেশীয় অন্য কোন জাতি এ পর্য্যন্ত বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারে নাই। অল্পদিনই এ দেশে এ খেলা আরম্ভ হইয়াছে। ভাল ইংরাজ সিভিলিয়ান কিংবা মিলিটারি টীমের সহিত বাঙ্গালী দল কখনও আঁটিয়া উঠে না। ক্রিকেটে রণজিৎ সিংহের যেমন অক্ষয় যশ ও কীর্ত্তি, ফুটবলে এ দেশীয় কোন লোকের এখনও তেমন হয় নাই, তথাপি এক দল বাঙ্গালী যুবক বড় বড় 'টীম্'কে হারাইয়া শীল্ড ফাইনালে ঠেলিয়া উঠিয়াছে। আজ হারিলেও তাহারা 'রণার্স অপ্' হইবে; জিতিলে—জিতিলে যে কি হইবে, তাহা কল্পনা করিতে সেই বহু সহস্র বাঙ্গালীর অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতেছে! শীল্ড পাওয়া, দিগ্বিজয়ের তুল্য!

২

হাফ প্যাণ্ট পরা, সাদা জামা গায়ে, ডান হাতে রিষ্টলেট্ ঘড়ী বাঁধা রেফরী গ্রাউণ্ডে অবতীর্ণ হইলেন। দুই জন লাইন্সম্যান্ নিশান হাতে দৌড়িয়া আসিয়া দুই ধারে গেল। দর্শকেরা এতক্ষণ মৌমাছির চাকের মত গুন্ গুন্ করিতেছিল,

এখন কোলাহল করিতে লাগিল। রেফরী দুই একবার ঘড়ীর দিকে দেখিয়া বাঁশী বাজাইল। তাঁবুর দক্ষিণ দিকে ফাইফ ও ড্রমের ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। বাজনার তালে তালে বাদকগণ রঙ্গভূমে প্রবেশ করিল। হাইল্যাণ্ডপোষাকে ব্যাণ্ডমাষ্টার্ ছড়ি হাতে আগে আগে, পিছনে বাদকগণ সমতালে সমপদক্ষেপে চলিয়া আসিতেছে। অমনি চারিদিকে করতালিধ্বনি পড়িয়া গেল। তাহাদের পশ্চাতে গোরার টীম্—'আর্গাইল্' আসিল। গোরারা, সাহেবেরা চারিদিক্ হইতে ঘন ঘন করতালিশব্দে তাহাদিগকে অভিনন্দন করিল। তাহার পর তাঁবুর উত্তর পার্শ্ব দিয়া বাঙ্গালী টীম্—'ইউনাইটেড বেঙ্গল' নামিল। গ্রাউণ্ডের উত্তরপূর্ব্ব দিক্ হইতে, কেল্লার জমী হইতে, গাড়ীর ছাদ হইতে, গাছের ডাল হইতে একটা গর্জ্জন উঠিল, চারিদিকে ছাতা-ছড়ি ঘুরিতে লাগিল, দর্শকেরা আবেগে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ইংরাজে ও বাঙ্গালীতে বলের ও কৌশলের পরীক্ষা—কাহার জয় হইবে?

খেলা আরম্ভ হইবার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে মাঠে লোক জড় হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। লোক নানা রকমের, নানা রকমের কথাবার্ত্তাও হইতেছিল, কিন্তু ময়দানের ছোক্‌রারা সকলের চেয়ে বেশী কথা কহিতেছিল। এই ছোক্‌রার দল মাঠের একটা অঙ্গ। দশ বৎসর হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সব ছোক্‌রা। তাহাদের মধ্যে সব জাতি আছে—হিন্দু, মুসলমান, মেথর, চামার, ধাঙ্গড়, কুলি সব আছে। খেলা ও খেলোয়াড়দিগের সম্বন্ধে তাহাদের যে বিদ্যা, তাহাতে তাহারা সে বিষয়ে রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তি পাইবার উপযুক্ত। সব খেলোয়াড়ের নাড়ী-নক্ষত্র তাহারা জানে। যে ভাষায় তাহারা কথা কয়, তাহাও চমৎকার। কদর্য্য হিন্দী, অদ্ভুত বাঙ্গালা আর ইংরাজীর বুকনি মিশাইয়া একটা খিচুড়ী। তাহাদের কথার ও টীকাটিপ্পনীর স্রোত এক মুহূর্ত্ত বন্ধ হয় না, খেলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তাহারা নানারূপ জল্পনা করিতেছিল।

ছোক্‌রা নম্বর ১ বলিতেছিল, "নাটা (ইউনাইটেড) বেঙ্গল জরুর জিৎ যাবে।"

নম্বর ২। সে ত জিতবে, কিন্তু আরগাইলের গোল্‌কী (গোল্‌কীপর্) বড়া মজবুত আছে।

নম্বর ৩। হাঁ, সে বড় গোল্ বাঁচাতা।

নম্বর ৪। সেমি-ফাইনালে ওর টেংরিমে খুব চোট্ লেগেছে। এখনও ল্যাংড়াচ্ছে।

নম্বর ৫। ও কিছু নয়, গোরার জান্ বড়া কঠিন, আজ আবার ঠিক হো গেয়া।

নম্বর ১। এণ্ডর্‌সন্ সন্তর্ (সেণ্টার) ফার্-ওয়ার্ড বড়া ভারি খেলোয়াড়।

নম্বর ৪। আরে, কি বল্‌চ! নাটার বাঁয়া উইং হাওয়া মাফিক্ খেল্‌তা। নাটা শীল্ড জরুর লে যায়গা। কেৎনে খায়গা (কত বাজি রাখিবে)?

নম্বর ১। আরে, হম্ ভি তো ওহি বোল্‌তা। নাটা শীল্ড লেগা তো, হম্ কালী মায়ীকো পাঁটা চড়ায়গা।

এমন সময় তাঁবু হইতে ফুটবলটা আসিয়া ঝুপ করিয়া গ্রাউণ্ডে পড়িল। তাহার পর রেফরী ও খেলোয়াড়েরা আসিল। টস্ করিয়া গোরারা জিতিয়াছিল। তাহারা কেল্লার দিকে দক্ষিণ গোল্ লইল। বল গ্রাউণ্ডের মাঝখানে রাখা হইল, "ইউনাইটেড বেঙ্গলের" ফর্ওয়ার্ডরা বলের কাছে দাঁড়াইল। রেফরীর হুইস্‌ল্ বাজিল, খেলা আরম্ভ হইল।

তখন পশ্চিম আকাশে পাতলা মেঘের আড়ালে সূর্য্য ঝিকিমিকি করিতেছে, বাতাস ঝর-ঝর করিয়া বহিতেছে, বাতাসে ক্যাল্‌কাটা ক্লাবের নিশান দুলিয়া দুলিয়া উড়িতেছে। খেলা আরম্ভ হইবামাত্র সেই বিপুল লোকসঙ্ঘ একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

৩

যে কখন মাঠে বাঙ্গালী ও ইংরাজের ফুটবল খেলা দেখে নাই, সে সেই খেলা প্রথম দেখিলে কি মনে করিত! ইংরাজেরা বলিষ্ঠ, দৃঢ়কায়, বিশাল-বক্ষ, তাহাদের হস্তপদের মাংসপেশী স্থূল ও কঠিন। বাঙ্গালীরা অল্পবয়স্ক যুবক, ছিপছিপে গড়ন, কয়েকজন স্কুলকলেজের ছাত্র। গোরাদের সকলের পায়ে ফুটবল খেলিবার বুট, বাঙ্গালীরা নগ্নপদ। কোন্ সাহসে তাহারা খেলিতে আসিয়াছে! যদি পায়ে বুটের ঠোকর লাগে, যদি বুট-শুদ্ধ পা দিয়া শুধু পা মাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে পা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা; কিন্তু বাঙ্গালীদের সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহাদের বুট পরিয়া খেলা অভ্যাস নাই, বুট পরিয়া তাহারা ভাল দৌড়িতে পারে না। অথচ ইংরাজদের পায়ে বুট দেখিয়াও তাহারা কিছুমাত্র ভয় পায় না।

খেলা আরম্ভ হইল। বাঙ্গালীদের ফর্ওয়ার্ড

লাইনে রাইট্-উইঙ্গে লাহিড়ী আর সেণ্টর্ ফর্ওয়ার্ড বোস ভারি খেলওয়াড়। তাহারা বল দুই তিনবার পাস্ করিয়া হাফব্যাকদের ছাড়াইয়া লইয়া গেল। তাহার পর লাহিড়ী বল লইয়া নক্ষত্র-বেগে ছুটিল। এক জন ব্যাক্‌কেও ছাড়াইয়া গেল। বাকি রহিল এক জন ব্যাক আর গোল্‌কীপর্। মাঠ কাঁপাইয়া উৎসাহের গর্জ্জনধ্বনি উঠিল। ইংরাজ ও গোরারা নীরব! বাঙ্গালী যুবকরা চীৎকার করিতে লাগিল, "Go on, go on! Put it in!" মাঠের ছোক্‌রারা চেঁচাইল, "Shoot shoot!"

দুই জন হাফব্যাক্ বেগে আসিয়া লাহিড়ীকে ঘিরিল। তখন লাহিড়ী বল্ সেণ্টর্ করিল। বল্ বোসের পায়ের কাছে আসিয়াছে, এমন সময়ে আর্গাইলদিগের দ্বিতীয় ব্যাক্ তাহাকে 'চার্জ' করিল। ধাক্কা খাইয়া বোস ছিটকিয়া গিয়া পড়িল। তখন ব্যাক্ 'কিক্' করিয়া বল্ গ্রাউণ্ডের মাঝখানে পাঠাইয়া দিল। "Foul fowl!" করিয়া দেশী দর্শকেরা চেঁচাইল। ময়দানের কতকগুলা ছোক্‌রা বলিতে লাগিল, "রেফরী ডাকু হ্যায়!" তাহাদের মনের মত কিছু না হইলেই তাহারা রেফরীকে গালি দেয়।

আর্গাইলের সেণ্টর্ হাফ-ব্যাক্ বল পাইয়া রাইট-উইঙ্গে পাস্ করিয়া দিল। উইঙ্গে ডোনাল্ড ভারি তেজী খেলোয়াড়; বল্ পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া বল্ সেণ্টর করিল, সেণ্টর্ ফর্ওয়ার্ড এণ্ডর্‌সন্ ভীমকায় পাহালওয়ান; দুই পায়ের মাঝে বল্ লইয়া ঝড়ের মত গোলের দিকে ছুটিল। লেফট-উইঙ্গ দৌড়িয়া আগে চলিয়া গেল। ময়-দানের ছোক্‌রারা চেঁচাইল, "হাফসাইড, হাফসাইড (অফসাইড)!" এ সকল চীৎকারে কোন রেফরী কখন কর্ণপাত করে না;—করিলে খেলা হওয়া অসম্ভব।

এণ্ডর্‌সন্ বল্ ড্রিবল করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাকে কেহ চার্জ করিতে সাহস করিতেছে না, এমন সময় ইউনাইটেডের সেণ্টর হাফ মিত্র, এণ্ডর-সনের পিছন হইতে দৌড়িয়া আসিল। মিত্র কৃশ ও লম্বা। সে পিছন হইতে এণ্ডর্‌সনকে চার্জ না করিয়া এণ্ডর্‌সনের পায়ের মধ্য দিয়া বলে পা ঠেকাইয়া দিল। বল্ বাহির হইবামাত্র ইউনাই-টেডের আর এক জন খেলোয়াড় বল্ বাহির করিয়া দিল। খুব হাততালি পড়িয়া গেল।

৪

যাহারা খেলা দেখে, তাহারা মনে করে যে, তাহারা খেলোয়াড়দের চেয়ে ঢের বেশী খেলা বুঝে। তবে যেমন দাবা খেলা যাহারা দেখে, তাহারা খেলোয়াড়দের উপর চাল বলিয়া দেয়, তাস খেলায় কোন্ তাস খেলিতে হইবে, দেখাইয়া কিংবা বলিয়া দেয়, ফুটবলে তাহা হয় না; কারণ, খেলোয়াড়রা যদি দর্শকের কথা শোনে, তাহা হইলে খেলাই বন্ধ হইয়া যায়। ফুটবল্ ভাবিয়া চিন্তিয়া খেলিবার খেলা নয়। খেলার প্রধান অঙ্গ ক্ষিপ্রতা; যে বিলম্ব করে কিংবা ইতস্ততঃ করে, সেই ঠকে। কিন্তু তাহা জানিয়াও দর্শকদের মুখ বন্ধ হয় না। যাহার পায়ে কখনও ফুটবল ঠেকে নাই—যে নিজে খেলিতে গেলে হাস্যাস্পদ হয়—সে-ও এমনভাবে কথা কয় যেন স্বয়ং অদ্বিতীয় খেলোয়াড়। যাহারা ফুটবল্ খেলা দেখিতে যায়, তাহারা কেহই প্রায় চুপ করিয়া খেলা দেখে না, অনবরত বিচিত্র অভিমত প্রকাশ করিতে থাকে। আজও সকলে সেইরূপ করিতেছিল। এক জন দর্শক বলিতেছিল, "আর্গাইলেরা যেরূপ করিতেছে, তাহাতে অবশেষে মারামারি না করে!"

২য়। হ্যাঁ, মারামারি ফাইনালে করা তামা-সার কথা কি না! রেফরী কিসের জন্য আছে?

৩য়। আরে, রেখে দাও তোমার রেফরী! বাঙ্গালীতে আর ইংরাজে খেলায় রেফরী কবে আবার ইম্পার্শ্যাল্ হয়।"

এক জন ভদ্র লোক পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, "রেফরীর বিরুদ্ধে এ রকম কথা বলা বড় অন্যায়। সে নিজের বিবেচনায় ঠিক কাজ করে। এখন রেফরীর কি দোষ হইল?"

৩য়। মশায়, আপনারা ত সব জানেন! রেফরী ত আর হাইকোর্টের জজ নয়!

ভদ্র লোকটি কোন উত্তর দিলেন না। খেলা চলিতে লাগিল। দুই পক্ষ প্রায় সমান সমান, কিন্তু কৌশলে বাঙ্গালীরা শ্রেষ্ঠ, আর তাহাদের দৌড়িবার বেগ বেশী। ফরওয়ার্ডের দুই তিন জন একবার বল্ পাইলেই নিমিষের মধ্যে হাফ-ব্যাক্ ও ব্যাক্‌দিগকে ছাড়াইয়া যায়। আর্গাইলের হাফ-ব্যাকেরা তাহাদিগকে খুব সাবধানে আগলাইতে লাগিল।

আর্গাইলেরা একবার বল্ বাহির করিয়া দিলে থ্রোইনের পর ইউনাইটেডের দুই জন ফর্‌ওয়ার্ড বল্ পাস করিয়া লইয়া চলিল। বাঙ্গালীর এক

ফর্‌ওয়ার্ডেরা বল হেড করিয়া লইয়া চলিল। খেলার কৌশল চমৎকার! বল একেবারে মাটীতে পড়ে না, মাথায় মাথায় চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কি হইতেছে, কেহ জানিবার পূর্ব্বে সেণ্টর্‌ ফর্‌ওয়ার্ড হেড করিয়া বল গোলের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। রেফরীর হুইস্‌ল্‌ বাজিল, বল বাহির করিয়া গ্রাউণ্ডের মাঝখানে রাখা হইল, খেলোয়াড়রা আপন আপন স্থানে গেল। হাফটাইমের বাঁশী বাজিল, খেলা বন্ধ হইল।

৭

আর্গাইলেরা গোল দিবামাত্র গ্রাউণ্ডের চারিধারে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। সাহেব দর্শকেরা ঘন ঘন করতালি ধ্বনি করিতে লাগিল, গোরারা টুপি ছুড়িতে লাগিল, হাততালির শব্দ, মুখের নানাবিধ শব্দ, চারিদিকে হই-হই পড়িয়া গেল। মিলিটারি ব্যাণ্ড্‌ বাজিয়া উঠিল, ময়দানের ছোকরারা কলরব করিতে লাগিল। বাঙ্গালী দর্শকদের মুখ ম্লান হইয়া গেল। ভিড়ের মধ্যে পাড়াগাঁয়ের কতকগুলি লোক ছিল, তাহারাও চর্চ্চা করিতে লাগিল। এক জন বলিল, "ওরে ভাই লিতাই, ই ত ভাল হইল না। তবে তা বাঙ্গালীরা হার্‌বে।"

"ওরে তা লয়, তা লয়। আবার খেলায় তারা লিশ্চয় জিতবে।"

পূর্ব্ববঙ্গীয়, মাড়োয়ারী, চীনা, ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা সকলে নিজের নিজের ভাষায় নানা রকম আলোচনা করিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে যে সাহেব মেমের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারাও কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। মেমের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল, সে বলিতেছিল, "I am delighted the soldiers have won. They are now sure to get the shield!"

সাহেব সস্মিতমুখে কহিল, 'I dont know. It is true they are leading by a goal but the Bengali lads are a tough lot and bad to beat, I wouldn't bet any thing on the result, as it seems to be quite open yet.'

মেম একটু ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, You want the Bengalis to win. Is that right?"

সাহেব। I still think they deserve to win. It'll be hard lines if they don't.

চারিদিকে সিগারেটের কটু ধোঁয়া ও গন্ধ। দর্শকেরা পান চিবাইতেছে ও সিগারেট খাইতেছে। দর্শকদের মধ্যে নানা রকম লোক আছে, সকলে শুধু খেলা দেখিতে ব্যস্ত নয়। একটি মোটাসোটা বাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন। সিগারেটওয়ালা আসিলে সিগারেট্‌ কিনিয়া তাহাকে পয়সা দিবার জন্য বাবু পকেটে হাত দিলেন। অমনি তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। সমস্ত পকেট দেখিলেন, টাকার ছোট ব্যাগটি কোথাও পাইলেন না! তাঁহার মুখ ও পকেটের বিফল অন্বেষণ দেখিয়া সিগারেটওয়ালা ছোক্‌রা ব্যাপার বুঝিল! দাঁত বাহির করিয়া কহিল, "বাবু, পাকিট্‌ মার্‌ লিয়া?"

গাঁটকাটায় পকেট হইতে চুরী করিলে লোকসান যাহা হউক, লজ্জা ততোধিক হয়, কারণ, যাহার যায়, তাহার নিজেকে বড় বোকা মনে হয়! বাবু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন, "তাই ত, কখন্‌ নিয়েছে, কিছুই টের পাই নি।"

সিগারেটওয়ালা বালকের আরও কয়েকটা দাঁত বাহির হইল, বলিল, "যদি টের পাবে ত লেবে কেমন কোরে? তোমরা বাবু লোগ খেল্‌ দেখে, আর সে বেটারা তোমাদের পাকিট দেখে।"

বাবু এক জন পরিচিত লোকের কাছে পয়সা ধার করিয়া সিগারেটের দাম দিলেন।

খান্‌সামারা খেলোয়াড়দের জন্য কাটা পাতি লেবু ও বরফের টুক্‌রা লইয়া আসিল। আর্গাইলেরা গ্রাউণ্ডের বাহিরে গেল; কিন্তু ইউনাইটেডেরা গ্রাউণ্ডের মাঝখানে দাঁড়াইয়া রহিল। হাফটাইম্‌ অথবা বিশ্রামকাল এই রকম করিয়া গেল। রেফরী আসিয়া আবার হুইস্‌ল্‌ দিল। আবার খেলা আরম্ভ হইল।

৮

লোকে মনে করিয়াছিল, এক গোল হারিয়া বাঙ্গালীরা দমিয়া যাইবে, কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। হাফটাইমের পর তাহারা আরও জোরে খেলিতে লাগিল, বিশেষ লাহিড়ী ও আর এক জন ফর্‌ওয়ার্ড বার বার বল আর্গাইলদের গোলের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। আর্গাইলদের কাপ্তেন, লাহিড়ীকে আগলাইবার জন্য এক জন হাফব্যাক্‌কে ইসারা করিয়াছিল ও মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল, "Play him, Play him!" কয়েক মিনিট খেলা হইতে লোকে বুঝিতে পারিল যে, আর্গাইলেরা ক্রমাগত আত্মরক্ষা করিতেছে; বড় একটা আক্রমণ করিতেছে না! বাঙ্গালীরা

একবার বল পাইলে গোরারা আর সহজে বল কাড়িয়া লইতে পারে না। অবশেষে, তিন জন বাঙ্গালী বল পাস্ করিয়া লইয়া চলিল। আর্গাইলের এক জন হাফ-ব্যাক্ বাঙ্গালীদের এক জন ফর্‌ওয়ার্ডকে চার্জ করিতে আসিল। বাঙ্গালী ফর্‌ওয়ার্ড পা দিয়া বল একটু উঁচু করিয়া দিয়া পাশ কাটাইয়া গেল। আর এক জন ফর্‌ওয়ার্ড সেই বল বুক দিয়া আটকাইল। তাহার হাতে বল ঠেকিল কি না সকলে দেখিতে পাইল না; কিন্তু দুই এক জন গোরা খেলওয়াড় হাত তুলিয়া বলিল, "Hand ball!" অমনি গোরা দর্শকেরা চেঁচাইতে লাগিল, "Hand ball, hand ball!" রেফারী সে চীৎকারে কান দিল না। ও দিকে বল এক জন ব্যাক্‌কে ছাড়াইয়া গিয়াছে। লাহিড়ী বল লইয়া বায়ুবেগে ছুটিল। অবশিষ্ট এক জন ব্যাক তাহার নিকট হইতে বল কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু লাহিড়ী তাহাকে ফাঁকি দিয়া বল আগে লইয়া গিয়া শুট করিল! বল তীরের মত বেগে গিয়া গোলে প্রবেশ করিল। সে বল রক্ষা করিবার সাধ্য গোল-কীপরের ছিল না!

বাঙ্গালী ও দেশীয় অপর দর্শকেরা আনন্দে উন্মত্তের মত হইয়া উঠিল। ময়দানের ছোক্‌রারা লাফাইয়া নাচিতে আরম্ভ করিল, ছাতা ছড়ি কন্দুকের মত শূন্যে ঘুরিতে লাগিল, বার বার আনন্দধ্বনিতে মাঠ কাঁপিয়া উঠিল। গোরারা চুপ, সাহেবরা নিস্তব্ধ। কোলাহল একটু কমিলে সেই মেম সাহেবকে বলিল, "So the Bengalis have drawn level; I wonder whether there will be a draw and extra time will have to be played!"

সাহেব ঘড়ীর দিকে কটাক্ষ করিল, "There are fifteen minutes yet left and a great many things may happen during that, I don't think there will be a draw!"

মেমের মুখ মলিন হইয়া গেল, "You think the Bengalis will win?"

সাহেব হাসিল, 'Don't prophesy before you know! You see everything will be clear in a few minutes."

বল গ্রাউণ্ডের মাঝে রাখিয়া আবার খেলা আরম্ভ হইল। আবার বল আর্গাইলদের গোলের কাছে গিয়া উপস্থিত। গোল্-কীপর্ দৌড়িয়া গিয়া বল হাতে তুলিয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। আর্গাইলের ফর্‌ওয়ার্ডেরা বল পাইয়া ইউনাইটেডের গোলের অভিমুখে ছুটিল। গোলের কাছে হয় এক জন ব্যাকের হাত বলে ঠেকিয়া থাকিবে, অথবা আর কোন রকম ফাউল হইয়া থাকিবে,—আর্গাইলের খেলোয়াড়রা হাত তুলিয়া ফাউলের দাবী করিল! রেফরী হুইস্‌ল দিল। গোরা দর্শকেরা চেঁচাইতে লাগিল, "Penalty, penalty!"

রেফরী পেনাল্‌টীর আদেশ করিল। ময়দানের ছোক্‌রারা চীৎকার করিয়া উঠিল, "পলেন্টি পলেন্টি! বাঙ্গালী লোগকো রেফরী হবা দেগা!

বাঙ্গালী দর্শকেরাও বলিতে লাগিল, "পেনাল্‌টি হইল কেমন করিয়া? এ ত জোর করিয়া হারাইয়া দেওয়া!"

বাঙ্গালীদের গোলকীপর একা গোলের মুখে রহিল, আর সকলে সরিয়া গেল। পেনাল্‌টি লাইনের মাঝখানে বল রাখিয়া আর্গাইলের এক জন ফরওয়ার্ড শুট করিল। বল বারের উপর দিয়া চলিয়া গেল, গোল হইল না। ময়দানের ছোক্‌রারা আর বাঙ্গালীরা আনন্দসূচক কোলাহল করিতে লাগিল। গোলকিক্ হইতে বাঙ্গালীরা আবার চাপিয়া খেলিতে লাগিল। তাহাদের খেলার বিচিত্র কৌশল সমবেত লক্ষ লোক মুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল। এক জন বাঙ্গালী খেলোয়াড় দুই তিন জন গোরাকে ফাঁকি দিয়া বল লইয়া যায়। একবার এক জন বাঙ্গালী ফরওয়ার্ড বল লইয়া যাইতেছে, এমন সময় আর্গাইলের এক জন হাফ-ব্যাক তাহার পথরোধ করিল। বাঙ্গালী খেলোয়াড় বল লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুই তিনবার হাফ-ব্যাক্ তাহার নিকট হইতে বল কাড়িবার চেষ্টা করিল, প্রত্যেকবার বাঙ্গালী খেলোয়াড় বল একটু সরাইয়া দিয়া তাহাকে ঠকাইল। মাঠ শুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল! অবশেষে বাঙ্গালী খেলোয়াড় বল লইয়া পলায়ন করিল!

খেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পশ্চিম দিকে মেঘ উঠিতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চিক্‌মিক্ করিতেছে। বাতাস একটু খর বহিতেছে। বৃষ্টি আসিবার উদ্যোগ দেখিয়া সাহেবরা ও বাঙ্গালীরা ম্যাকিণ্টস গায় দিতে লাগিল।

বাতাসের সঙ্গে যেন খেলারও বেগ বাড়িল। মুহূর্ত্তমাত্র বিরাম নাই, বাঙ্গালীরা আর্গাইলদের

গোল আক্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে উহাদের এক জন ফরওয়ার্ড বল লইয়া ব্যাক্ দুই জনকে ছাড়াইয়া গেল। কোণ হইতে শুট করিল। সে রকম স্থান হইতে গোল শূট করা বড় কঠিন, কিন্তু ভোঁ করিয়া বল গোলে প্রবেশ করিল, গোলকীপর দৌড়িয়া আটকাইতে পারিল না।

সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় সেই বিশাল জনতা গর্জ্জিয়া উঠিল! করতালি-ধ্বনির পর করতালি-ধ্বনি, জয়োল্লাস, কোলাহলের পর কোলাহল! চেয়ার-বেঞ্চে দর্শকরা লাফাইয়া উঠিল, মাথার উপর অসংখ্য ছড়ি ও ছাতা ঘুরিতে লাগিল। সমুদ্রতটে যেমন দোলায়মান মহাতরঙ্গ আঘাত করে, সেইরূপ সেই মানবসমুদ্রতটে আনন্দতরঙ্গ বারংবার আঘাত করিতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিলে ভুলিতে পারা যায় না।

সেই মেম ম্লানমুখে ঈষৎ হাসিয়া সাহেবকে বলিল, "So the unexpected sometimes happens."

সাহেব গম্ভীর ভাবে বলিল, "On the contrary it is the expected that has happened. I all along expected the Bengalis to win."

"Is it all over?"

সাহেব ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, "Time's up and I think it is all over, including the shouting through we may hear some more when the shield given away."

হাটখোলা হইতে কয়েক জন পূর্ব্ববঙ্গের লোক আসিয়াছিল। এক জন কহিল, "আমি ত কইছিলাম, ইউনাইটেড জিতিবে।"

পাশে সেই দেশীয় এক জন মুসলমান দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, "মুইও ত সেই কইছিলাম।"

ময়দানের ছোক্‌রারা খুব আস্ফালন করিতেছিল। নম্বর ১ বলিতেছিল, "আজ তো বাঙ্গালী শীল্ড লে যায়গা। গোরা লোগ কিসিকো কুছ নহি সমঝতা হ্যায়।"

নম্বর ২। আজ, উন্ লোগকা মুহ কালা হুয়া।"

বল গ্রাউণ্ডের মাঝখানে লইয়া গিয়া অল্পক্ষণ খেলা হইতেই রেফরী হুইস্‌ল্ দিল! তখন জয়ধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহল করিয়া দর্শকরা গ্রাউণ্ডে প্রবেশ করিতে লাগিল!

খেলা শেষ হইলে, আর্গাইলদের কাপ্তেন আসিয়া ইউনাইটেডের কাপ্তেনের সহিত শেক্‌হ্যাণ্ড করিল। বাঙ্গালী দর্শকরা ইউনাইটেডের খেলোয়াড়ের সহিত কোলাকুলি করিতে লাগিল। যখন ইউনাইটেডের কাপ্তেন ও খেলোয়াড়রা শীল্ড আনিতে গেল, তখন ইংরেজরা ও গোরারা মিলিয়া টুপি ঘুরাইয়া তাহাদিগকে খুব 'চিয়ার' করিতে লাগিল। চারিদিকে খুব করতালি পড়িতে লাগিল। ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি বাঙ্গালীদের খেলার বিশেষ প্রশংসা করিয়া, বক্তৃতার অবসান হইলে, জেতাদিগকে শীল্ড ও মেডেল প্রদান করিলেন। দর্শকদিগের আনন্দ-ধ্বনিতে মাঠ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিয়াছে, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। পথে আলোক জ্বলিতেছে, গঙ্গাবক্ষে জাহাজে বিদ্যুতের আলোক জ্বালিয়া দিয়াছে। খেলা শেষ হইলে ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। গোধূলির অন্ধকারে সে দিনকার খেলা আলোচনা করিতে করিতে দর্শকমণ্ডলী গৃহে ফিরিল।

ফুটবল্ খেলায় সেই বৎসর বাঙ্গালীরা প্রথমবার শীল্ড পাইয়াছিল।

——

জমাল জমিল

শিখ-রাজ্যের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত; কারণ, মহারাজা রণজিৎ সিংহ প্রকৃতপক্ষে পঞ্জাবের প্রথম ও শেষ শিখ-রাজা। তাঁহার মৃত্যুর পর যে কয় জন রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই ক্ষমতাশালী ছিলেন না এবং কেহই দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করেন নাই। কিন্তু সেই সময় অপর কয়েক জন লোক নানাবিধ কৌশলে ক্ষমতাবান্ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারাও দীর্ঘকাল প্রতাপশালী হইতে পারে নাই; কারণ, এক জন পদস্থ হইলেই তাহার অনেক শত্রু হইত এবং সুবিধা পাইলেই তাহাকে হত্যা করিত। কিন্তু অর্থের ও ক্ষমতার এমনই প্রলোভন যে, এত আশঙ্কা থাকিলেও কেহ ভীত বা বিরত হইত না, প্রাণের ভয় না করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিত।

মহারাজা রণজিৎ সিংহের আমলে লাহোরের প্রসিদ্ধ ফকীরবংশীয়গণ বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। রণজিৎ সিংহ দেশের লোককে বা আত্মীয়-স্বজনকে বড় বিশ্বাস করিতেন না, বাহিরের লোক আনিয়া প্রধান প্রধান কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। বহুকাল নির্য্যাতন সহ্য করিয়া শিখরা ঘোর মুসলমান-বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তথাপি মহারাজা রণজিৎ সিংহ কয়েক জন মুসলমানকে কয়েকটি প্রধান পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এখনও হিন্দু রাজার মুসলমান মন্ত্রী ও মুসলমান রাজার হিন্দু মন্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক দিন পর্য্যন্ত দক্ষিণ হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী হিন্দু ছিলেন; জয়পুরের মহারাজা নিষ্ঠাবান্ পরম হিন্দু; কিছু দিন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী এক জন মুসলমান ছিলেন। যাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ লইয়া সর্ব্বদা জল্পনা করেন, তাঁহারা এ কথা স্মরণ রাখিবেন।

ফকীর নূরউদ্দীনের অনুচরবর্গের মধ্যে জমাল ও জমিল দুই ভাই ছিল। তাহারা যমজ, দেখিতে অনেকটা এক রকম; কিন্তু প্রভেদ ছিল। জমাল জমিলের ঘণ্টাখানেক পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, অতএব সে বড়। জমালের মুখে একটা বড় আঁচিল, জমিলের তা ছিল না। জমাল মোটা হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, জমিল কৃশ। কিন্তু দুই জনে বড় মনের মিল, আর দুই জনের প্রকৃতি এক রকম। দুই জনের চটকদার পোষাকও এক রকম। দুই জনেই ধূর্ত্ত, ক্রূর, সাহসী, লোভী। বয়স হইবে চব্বিশ পঁচিশ বৎসর। তবে জমালের অপেক্ষা জমিল অধিক চতুর; জমাল কোন সংশয়ে পড়িলে জমিলের পরামর্শ লইত। একটা ফন্দী জমিলের যত শীঘ্র যোগাইত, জমালের তত শীঘ্র যোগাইত না; জমিলের সাহস অদম্য, জমালের সকল সময় সাহস কুলাইয়া উঠিত না। অথচ কোন কর্ম্মে জমিল প্রকাশ্যে অগ্রণী হইত না, জমালকে আগে রাখিত। বড় ভাই বলিয়া তাহাকে সম্মান করিত। সেই জন্য দুই ভাইয়ের কথা উঠিলে লোকে বলিত, 'বড়ে মিঞা ত বড়ে মিঞা, ছোটে মিঞা তো সুভানল্লা!'

২

জমাল বলিল, "সাওয়ন সিং আমাদের ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিতেছে।"

জমিল বলিল, "ভাই সাহেব, সে ত বড় আজব কথা। তাহাতে তাহার কি লাভ হইবে?"

শুনিতেছি যে, সে লছমী কওরের সঙ্গে গোপনে ষড়্ করিতেছে, যাহাতে ফকীর সাহেব মশীর মাল (খাজাঞ্চি) না থাকিতে পান। তাহা হইলেই ত আমাদের মুস্কিল!"

জমিল গোঁফ পাকাইয়া কহিল, "এ কথা তোমাকে কে বলিল?"

"রামদীন বলিয়াছে। লছমীর সঙ্গে তার আশনাই আছে জান ত?"

"হাঁ, সে নিজে তাহাই বলে। কথা সত্য কি না জানি না।"

"সত্য না হইলে বলিয়া তার কি লাভ? রাণী সাহেবা ত লছমীর হাতে, সে যাহা বলে, তিনি তাহাই করেন।"

"সে কথা ঠিক। রামদীনের কথা সত্য কি না, জানিতে হইবে। আর যদি লছমী কাহারও জন্য চেষ্টা করে ত রামদীনের জন্যই করিবে, সাওয়ন সিংহের জন্য কেন?"

"সাওয়ন সিং সদর তহশীলদার, তার একটা পদ আছে, রামদীনকে কে চেনে? সাওয়ন সিং

নায়েব খাজাঞ্চি হইবে, কিন্তু রামদীন আর লছমীর হাতে সব ক্ষমতা থাকিবে।"

জমিল ভাবিতে লাগিল। মহারাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর কাহারও পদের স্থিরতা ছিল না। ফকীর নূরউদ্দীনের যথেষ্ট সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি, কিন্তু শত্রুতে তাঁহার অনিষ্ট করিতে কতক্ষণ? রাণী মীরা সাহেবা সর্ব্বেসর্ব্বা। লোকে মনে করিত, লছমী তাঁহাকে দিয়া যাহা ইচ্ছা করাইয়া লইতে পারে। জমাল জমিল ফকীর সাহেবের বদৌলত যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের আশা ছিল যে, তাহারা দরবারে বড় পদ পাইবে। ফকীর সাহেব পদচ্যুত হইলে, তাহাদের সকল আশা যায়। ভাবিয়া জমিল কহিল, "আসল কথা জানিয়া ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে।"

জমাল কহিল, "সে কাজ তোমাকে দিয়াই হইবে।"

৩

লছমী রাণী সাহেবার ঠিক দাসী বা পরিচারিকা ছিল না। নিজের বাড়ীতে থাকিত, রাণীর মহলে নিত্য যাতায়াত করিত। লছমী যুবতী, কিন্তু বিশেষ সুন্দরী নয়। তবে তাহার একটা আচ্‌কা শ্রী ছিল, আর মুখের হাসি বড় মধুর; তাহার উপর বড় বুদ্ধিমতী। লছমী কওরের ঘরে চাকর-বাকর ছাড়া অন্য পুরুষ ছিল না। সে বিধবা, ইচ্ছা করিলেই সগাই করিতে পারিত; কারণ, জাতিতে জাট। জাটেদের মধ্যে সগাই ও চাদর ঢাকা দুই রকম সগাই আছে, কিন্তু লছমী সগাই করে নাই। রাণী তাহার বশীভূত জানিয়া লছমীর কাছে অনেক উমেদার ও অনুগ্রহপ্রার্থী আসিত। লছমী দরজার আড়াল হইতে তাহাদের সহিত কথা কহিত। কথা-বার্ত্তা রামদীনকে দিয়া হইত। লোকে বলিত, রামদীন লছমীর জার, রামদীনও কথার ভাবে তাহা স্বীকার করিত।

অপরাহ্নকালে মুক্ত বাতায়নের নিকট বসিয়া লছমী সূচ-সূতা দিয়া ফুলকারির কাজ করিতেছিল। এমন সময় রামদীন সেই গৃহে প্রবেশ করিল। রামদীনের বয়স ত্রিশ বৎসর হইবে, শরীর বলিষ্ঠ, মাঝারি গড়ন, দেখিতে মন্দ নয়, কিন্তু মুখ দেখিলে বিশেষ বুদ্ধিমান মনে হয় না। সে আসিয়া লছমীর নিকটে দাঁড়াইল। লছমী তাহাকে দেখিয়া, সূচ-সূতা রাখিয়া, মাথার উপর দুই হাত তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিল। তাহার হস্তের ও বক্ষের গঠন লাবণ্যপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ-যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছিল। রামদীনের দিকে চাহিয়া সে কটাক্ষে প্রশ্ন করিল।

রামদীন ঘনাইয়া আর একটু কাছে আসিল, কিন্তু সহসা লছমীকে স্পর্শ করিতে সাহস করিল না। সে মনে করিত, লছমী তাহাকে ভালবাসে এবং লোকের কাছে সেই কথা বলিত; কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে ভালবাসার কোন কথা বলিতে সাহস করে নাই। লছমীর বড় তেজ, হঠাৎ যদি রাগিয়া উঠে, তাহা হইলে রামদীনের বিপদ। সে একবার এগাইত, আবার পিছাইত।

রামদীন কহিল, "সাওয়ল সিংহের সেই কথাটা বলিতে আসিয়াছিলাম।"

লছমী কহিল, "কি কথা?"

"কেন, তোমাকে বলিয়াছি।"

লছমী মট্‌ মট্‌ করিয়া দুইটা আঙ্গুল মট্‌কাইল। অলস ভাবে কহিল, "কত লোক আমাকে কত কথা বলে, সব কি আমার মনে থাকে?"

রামদীন বুঝিল—লক্ষণ ভাল নয়। লছমী কখন কোন কথা ভুলে না, কিন্তু যখন ভুলিবার ভাণ করে, তখন কাহার সাধ্য তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রামদীন আর এক দিক্‌ দিয়া কথাটা পাড়িল।

"সাওয়ল সিং তোমার বিশেষ অনুগত।"

লছমী ভ্রূ তুলিল, "ওয়সা বহুত হয়।"

রামদীন কহিল, "সে ত সত্য কথা। তোমার মত ক্ষমতা কাহার আছে? তবে একটা কথা তোমাকে বলি নাই। সাওয়ল সিংহ মন্ত্রীর মাল হইলে তোমাকে লক্ষ টাকা নজর দিবে।"

লছমী মুখে বলিল, "আমি কি টাকার কাঙ্গাল?" কিন্তু লোভে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রামদীন বলিল, "তোমার টাকার ভাবনা কি? কিন্তু ফকীর নূরউদ্দীন তোমাকে গ্রাহ্য করে না, তোমার আশ্রিত এক জন লোকের হাতে খাজানা থাকিলে ক্ষতি কি?"

লছমী অল্প হাসিল; কহিল, "তা ত বুঝিলাম, কিন্তু ইহাতে তোমার স্বার্থ কি?"

"সাওয়ল সিং মন্ত্রীর মাল হইলে আমি নায়েব খাজাঞ্চি হইব।"

"এইবার কথাটা স্পষ্ট হইল। তাহা হইলে আমার কাছে কে থাকিবে? লোকজনের সহিত আমি কেমন করিয়া কথাবার্ত্তা কহিব?"

"আমি সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিব। খাজানা দেখিতে কতক্ষণ লাগিবে ?"

লছমী কওর বলিল, "তবে পাকা চাকরী এখানেই থাকিবে। দোসরা লোক বাহাল করিবার আবশ্যক নাই।"

রামদীন হাত তুলিয়া কহিল, "আমি থাকিতে আর কাহারও প্রয়োজন কি ?"

লছমী রামদীনের দিকে চাহিয়া কুটিল হাসি হাসিল। কহিল, "সাওয়ল সিং ত লাখ টাকা নজর দিবে, তুমি কত দিবে ?"

"টাকা কি ছার ? আমি তোমার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত।" রামদীন সাহস করিয়া লছমীর হস্ত ধারণ করিল।

উচ্চ হাস্য করিয়া লছমী হাত ছাড়াইয়া লইল। কহিল, "শুনিতে পাই, তুমি বলিয়া বেড়াও যে, তোমার সঙ্গে আমার আশনাই আছে। এখন কি কাজেও তাই করিবে না কি ?"

রামদীন লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল। লছমীর দিকে না চাহিয়া কহিল, "মিথ্যা কথা। আমার কি এমন স্পর্দ্ধা যে, তোমার দিকে নজর তুলিব। তুমি ইচ্ছা করিলে বড় বড় সর্দ্দারেরা তোমার পদানত হয়।"

লছমী উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘৃণাপূর্ব্বক কহিল, "সে কথা মনে রাখিও। গোলামের অবস্থা গোলামের মত থাকে, সে কখন মনিব হয় না।"

লছমী চলিয়া গেল। রামদীন লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্রোধে অস্থির হইয়া বাহিরে গেল।

লছমী কাজটা ভাল করিল না। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক শত্রুসংখ্যা বাড়াইতে নাই।

৪

পাগড়ী মাথায় বুক ফুলাইয়া রামদীন ডব্বো বাজারে বেড়াইতেছিল, এমন সময় জমিলের সঙ্গে দেখা। জমিল ঝুঁকিয়া সেলাম করিল, "আদাব জনাব! মিজাজ তো আচ্ছা হয় ?"

রামদীন একটু কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "বন্দিগী মেহেরবান। মিজাজ মোবারক ?"

দুই চারিটা কথা হইতে রামদীনের লছমীকৃত অপমানের কথা সহসা মনে পড়িয়া গেল। বলিল, "আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। কখন্ ফুরসৎ হবে ?"

জমিল কহিল, "আমি হাজির আছি। আমার গরিবখানা নিকটে। আমার সঙ্গে আসুন।"

বাজারের ভিতর দিয়া একটা গলি দিয়া জমিল রামদীনকে আপনার বাড়ী লইয়া গেল। দিব্য সাজান পরিষ্কার বাড়ী, ঘরে মসলিন পাতা, রামদীনকে খুব সমাদর করিয়া বসাইল। জমাল ও জমিল দুই জনে স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকিত, একত্রে বাস করিত না। দুই জনের কেহই এ পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই।

জমিল কহিল, "আমার বড় খুশ নসীব যে, আমার বাড়ীতে আপনার কদম মোবারক আসিল।"

রামদীন কহিল, "বলেন কি সাহেব! আমার ত পরম সৌভাগ্য। কোন দিন আশা করি, আমার গরিবখানায় আপনি তশরীফ আনিবেন।"

জমিল কহিল, "আমি আপনার তাঁবেদার, যখন হুকুম করিবেন, তখনি হাজির হইব।"

কিছুক্ষণ এইরূপ কথাবার্ত্তার পর জমিল আসল কথা পাড়িল। কহিল, লালাজি, "আমাদের খোলাখুলি কথা হওয়া উচিত। গোপন করিলে কাহারও লাভ নাই।"

রামদীন এ কথায় সায় দিল, বলিল, "তা বটেই ত।"

"দেখুন, আমরা বরাবর জানি যে, সর্দ্দার সাওয়ল সিংহ ও আপনি আমাদের দোস্ত, আমরা সব কাজ পরামর্শ করিয়া করিব। এখন যে আপনারা ফকীর সাহেবের বিরুদ্ধে কাররওয়াই করিতেছেন, সেটা কি ভাল হইতেছে ?"

রামদীন একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, কহিল, "এ কথা আপনাদিগকে কে বলিল ?"

"সে কথায় কাজ কি ? কথাটা সত্য, আপনারা তাহা বেশ জানেন। ফকীর সাহেবের পদ যাইলে আমাদের রুটী মারা যায়। আপনাদের কোন অভাব নাই, তবে আমাদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করিতেছেন কেন ?"

"শেখ সাহেব, যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন হইতে আপনাদের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করিব না; বরং আমরা আপনাদের সাহায্য চাই।"

"কি কাজে ?"

"আপনারা মনে করেন যে, লছমী কওর আমাদের পক্ষে ও আমাদের সহায়তা করিতেছে ?"

"সে ত জানা কথা। লছমী কওরও আপনার হাতে।" জমিল চোখ টিপিয়া একটু হাসিল।

রামদীন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আপনারা সে সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছেন, মিথ্যা। আমারও ভুল হইয়াছিল। লছমীর বড় অহঙ্কার, আমার প্রতি দৃক্‌পাতও করে না।"

"বলেন কি, লালাজি, এ কথা ত সহজে বিশ্বাস হয় না। আপনার মত তাহার খয়েরখাঁ কে আছে?"

"সে কিছু পরোয়া করে না, আমাকে চাকরের চেয়ে অধম মনে করে। এই সে দিন আমাকে অত্যন্ত অপমান করিয়াছিল।"

"আপনাকে? এ ত বড় অন্যায় কথা!"

"আমি কি আপনাকে মিথ্যা বলিতেছি? সে অপমান আমি কখন ভুলিব না, নিশ্চয় তাহার প্রতিশোধ লইব।"

"আলবৎ, আপনি কি একটা যে সে লোক!"

"আমি ভাবিতেছি, তাহাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিব। তখন সে বুঝিতে পারিবে, আমি কে।"

"এই ত কথার মত কথা! যদি আমাকে দিয়া কিছু হয় ত আমি সব সময় হাজির আছি।"

"আপনার মদত ত অবশ্য চাই। কিন্তু এ কথা প্রকাশ হইলে আমাদের দু'জনেরই বিপদ। রাণী সাহেবা লছমীর উপর বড় মেহেরবান।"

"তোবা! আপনি আমাকে মনে করিয়াছেন কি? আমাকে দিয়া কোন কথা প্রকাশ হইতেই পারে না।"

"লছমীকে জব্দ করিলে সে আমাদের শত্রু হইবে। এমন কোন উপায় করিতে হইবে যে, সে আমাদের কোন অপকার না করিতে পারে। যাহাতে রাণী সাহেবা তাহার উপর নারাজ হইয়া যান, এমন কোন কৌশল করিতে হইবে।"

"কেয়া বাৎ লালাজি, এই ত বুদ্ধির কথা! আপনার মত বুদ্ধিমান্ কয় জন আছে?"

রামদীন খুসী হইয়া সগর্ব্বে গোঁফে চাড়া দিতে লাগিল। জমিল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কিছু হিকমৎ বাহির করিয়াছেন?"

"না, তাই ভাবিতেছি। আপনিও খুব হুঁসিয়ার লোক, আপনার মাথায় কিছু খেলিতেছে?"

জমিল স্বর নীচু করিয়া, রামদীনের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কয়েকটা কথা বলিল। শুনিয়া রামদীন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া জমিলের পিঠ চাপড়াইতে লাগিল। "কেয়া খুব, শেখ সাহেব, এ হিকমৎ বহুত আচ্ছা! কেমন করিয়া বন্দোবস্ত করিবেন?"

জমিল কহিল, "এখনি গিয়া তাহার উপায় করিতেছি। বন্দোবস্ত করিয়া আপনাকে জানাইব।"

জমিল উঠিলে রামদীন তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে খুব খাতির করিয়া বিদায় দিল।

৫

লাহোরের কেল্লার শীশমহলে রাণী মীরা সাহেবা বাস করিতেন। শীশমহলের এখন জীর্ণাবস্থা, তখন খুব সৌষ্ঠব ছিল। শীশমহলের ছাদে উঠিলে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। মহলের ভিতর হমাম, তয়খানা, নদী দেখিবার ঝরোখা। প্রবেশ করিবার দুই পথ; এক সদর ফটক দিয়া, আর এক নদীর দিক্ দিয়া। সদরে সান্ত্রীর পাহারা। নদীর দিকে দরজায়ও সিপাহী থাকিত। যে সকল স্ত্রীলোকেরা সচরাচর রাণীর কাছে যাইত, তাহারা এই পথে যাইত। সিপাহীদের সঙ্গে এক জন খোজা থাকিত, সে পাল্কীর ভিতর দেখিয়া লইত। পরিচিত স্ত্রীলোক হইলে পাল্কী মহলে প্রবেশ করিত, নহিলে খবর দিতে হইত। দাসীরাও পাল্কীতে যাতায়াত করিত। কেল্লায় প্রবেশ করিলে চারিদিকে পরিখা। পুল পার হইয়া অনেক ঘুরিয়া মহলের প্রবেশদ্বার। সেই দ্বারের পাশে সুসজ্জিত গৃহে খোজাদের সর্দ্দার ফকীরা বসিয়া থাকিত। ফকীরার প্রবল প্রতাপ। রাণীর কাছে তাহার পথ অবারিত, পুরাতন বিশ্বাসী ভৃত্য বলিয়া রাণী সাহেবা অনেক সময় তাহার কথা শুনিতেন। সকল বিষয়ে সে তাঁহার পরামর্শদাতা। রাণীর কাছে কোন আরজি করিতে হইলে, প্রথমে ফকীরার শরণাগত হইতে হইত। ফকীরা যখন ঘোড়ায় চড়িয়া রাস্তায় চলিত, তখন পথের দুই পাশে লোকে তাহাকে ঝুঁকিয়া সেলাম করিত। ফকীরা দেখিতে নপুংসকের মত কুৎসিত নয়। গৌরবর্ণ, দীর্ঘ শরীর, মুখে গুম্ফ-শ্মশ্রু না থাকিলেও মুখের ভাব প্রসন্ন গম্ভীর, কুটিলতার বিশেষ কোন চিহ্ন নাই।

কেল্লার বাহিরেই ফকীরার নিজের বাড়ী। রাত্রি দশটার সময় সে মহল হইতে বাহির হইয়া বাড়ী যাইত। রাত্রে কোন সময় ডাক পড়িলে তৎক্ষণাৎ আবার আসিত।

এক রাত্রে ফকীরা বাড়ীতে আসিয়া দেখে, জমিল বসিয়া আছে। কহিল, "সেলাম শেখ সাহেব, এত রাত্রে এত তক্‌লিফ করিলেন কেন?"

জমিল কহিল, "সে কি কথা, উজীর সাহেব! আপনার দর্শন পাওয়া ত আমাদের সৌভাগ্য। আমি আপনার কাছে জরুরী কাজে আসিয়াছি।"

ফকীরা বসিয়া বলিল, "কি বলুন?"

"আপনার কাছে কোন কথা বুঝাইয়া ফিরাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, বলিলেও কোন ফল নাই। ফকীর নুরউদ্দীন সাহেবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হইতেছে, যাহাতে তাহা সফল না হয়, সেই জন্য আপনার কাছে আসিয়াছি।"

"ফকীর সাহেব ত বড় অশরাফ লোক, তাঁহার শত্রু কেন?"

"ভাল লোকেরই ত আজকাল জিয়াদা মুস্কিল, কারণ, তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না।"

"কে ফকীর সাহেবের শত্রুতা করিতেছে?"

"সাওয়ল সিং ফকীর সাহেবের পদ চায়। লছমী কওর তাহার সহায়তা করিতেছে।"

"কেন?"

"সাওয়ল সিং তাহাকে লক্ষ মুদ্রা নজর দিবে।"

"বটে? রাণী সাহেবা লছমীর মেহেরবান, কিন্তু তাহার কথায় কি তিনি এমন অন্যায় কর্ম্ম করিবেন?"

"কি জানি! অওরতের কথা কিছু বলা যায় না।"

"সত্য কথা। যাহাতে ফকীর সাহেবের অনিষ্ট না হয়, আমি সে চেষ্টা করিব; কিন্তু লছমীকে নিরস্ত করিবার কোন উপায় নাই?"

"আমরা সে চেষ্টাও করিতেছি। আপনার কথায় বড় আশ্বস্ত হইলাম।" আর কিছুক্ষণ কথোপকথন করিয়া জমিল উঠিয়া গেল।

নিশীথের অন্ধকারে রাবী তর তর রবে বহিয়া যাইতেছিল। তীরে গাছতলায় বসিয়া এক জন ফকীর গান করিতেছিল,—

"কইসে বেড়া হোওয়ে পার।
পনিয়া গহিরী নইয়া মেরি পুরাণী,
মওলা করে পার!"

আকাশে চাহিয়া জমিল দেখিল, মাথার উপর চঞ্চলরশ্মি নক্ষত্র ফুটিয়া রহিয়াছে। নৈশ পবন সর্ব্বত্র সমীরিত, বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতেছে। মানুষের কূট বুদ্ধিতেই কি সব হয়, মানুষের উপর কেহ নাই?

৬

আনারকলি বাজারে আলিজান নামে এক প্রসিদ্ধা গায়িকা বাস করিত। আলিজান প্রবীণা, দেখিতেও তেমন সুন্দরী নয়। নাচ-মোজরায় সে বড় একটা যাইত না। প্রথম বয়সে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ইদানীং সে বাইজীর ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহার বাড়ীতে কখন কখন মোজরা হইত, সেখানে বাছা বাছা লোক উপস্থিত থাকিত। আলিজান বুদ্ধিমতী; তাহার চরিত্রও সাধারণ বাইজীদের মত নয়, সেরূপ ধরণ-ধারণও ছিল না।

এক দিন সন্ধ্যার পর ভৃত্য আসিয়া আলিজানকে খবর দিল, "শেখ জমিল সাহেব আপনার সহিত মুলাকাত করিতে আসিয়াছেন।"

আলিজান কহিল, "তাঁহাকে ডাকিয়া আন।"

জমিল আসিয়া আলিজানকে সম্ভাষণ করিল, "সেলাম ওয়ালেকুম!"

"ওয়ালেকুম সেলাম! শেখ সাহেবের বড় মেহেরবানি। বসুন।"

জমিল উপক্রমণিকার বাহুল্য না করিয়া কহিল, "আমি তোমার কাছে নিজের গরজে আসিয়াছি। ইচ্ছা করিলে তুমি ফকীর নুরউদ্দীন সাহেবের বিশেষ উপকার করিতে পার।"

"ফকীর সাহেব সাধুপুরুষ ও পদস্থ ব্যক্তি। আমার মত লোককে দিয়া তাঁহার কি উপকার হইতে পারে?"

"লছমী কওর রাণী সাহেবাকে বলিয়া তাঁহার পদে সাওয়ল সিংহকে নিযুক্ত করাইবার চেষ্টায় আছে। ফকীর সাহেব পদচ্যুত হইলে আমরা নিরুপায় হইব।"

"রাণী সাহেবার মহলে লছমীর যথেষ্ট প্রতিপত্তি। আমি এ বিষয়ে কি করিতে পারি?"

"ফকীরা আমাদের পক্ষে, সে আমাদের সাহায্য করিতেছে। রাণী সাহেবা যাহাতে লছমীর প্রতি নারাজ হন, সেই উপায় করিতে হইবে।"

"কেমন করিয়া?"

"তোমাকে বিশেষ কিছু করিতে হইবে না। তোমার পাশের বাড়ী কাহার?"

"আমার বাড়ী। উহাতে আমার সম্পর্কে এক বহিন থাকে।"

"ঐ বাড়ীটা কিছুদিনের জন্য আমার চাই।"

"কি হইবে?"

জমিল অনুচ্চস্বরে আলিজানকে কয়েকটা কথা বলিল। শুনিয়া আলিজান হাসিতে লাগিল। কহিল, "শেখ সাহেব, আপনার যেমন বুদ্ধি, তাহাতে সময়ে আপনি এই রেয়াসতে উচ্চপদ লাভ

করিবেন। আমি হুকুম তামিল করিতে প্রস্তুত, কিন্তু দেখিবেন, শেষে যেন আমার গর্দান না যায়।"

"তোমার কোন আশঙ্কা নাই। আমরা যেরূপ বন্দোবস্ত করিতেছি, তাহাতে আশা আছে যে, আমাদের কাহারও কোন বিপদ হইবে না।"

"বহুত খুব। বাড়ী আপনার কবে চাই?"

"যত শীঘ্র সুবিধা হয়।"

"আমার বহিনকে কালই গাঁয়ে পাঠাইয়া দিব। বাড়ী কাল হইতেই আপনার হাতে রহিল।"

জমিল অনেক ধন্যবাদ দিয়া, সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

অপরাহ্ণকালে শীশমহলে রাণী মীরা বসিয়া ছিলেন। সম্মুখে লছমী কওর বসিয়া ছিল। ঘর খিলান করা, উপরে কড়িকাঠ ছিল না। ঘরের উপরে দেখিতে গুম্বজের মত, তাহাতে অসংখ্য ছোট ছোট পারামাখা কাচ বসান। সায়ং-সূর্য্য-কিরণ গবাক্ষ দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া সহস্র কিরণে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল।

মীরা প্রৌঢ়া, বিধবা, বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়াছে। অঙ্গ স্থূল, মুখ সুশ্রী, মুখের ভাব গম্ভীর। লছমীকে ভালবাসিতেন বলিয়া সে তাঁহার কাছে একটু আধটু অবদার করিত।

লছমী বলিল, "আমার আরজীর কি হইল?"

রাণী কহিলেন, "এ রকম মামলা এক কথায় হয় না। ফকীর নুরউদ্দীন পুরাতন বিশ্বাসী লোক, বংশক্রমে রেয়াসতে কাজ করিয়া আসিতেছে, বিনা অপরাধে তাহাকে বিদায় করিয়া তাহার স্থানে আর এক জন লোক বাহাল করিলে অনেক কথা উঠিবে।"

"আপনি মল্কা, আপনার উপর আবার কথা কি!"

"সেই জন্যই আমাকে অনেক দিক্ ভাবিতে হয়।"

লছমী মুখ ভার করিয়া কহিল, "তবে কি আমার প্রার্থনা নামঞ্জুর হইল?"

"আমি তাহা ত বলি নাই, তবে আমাকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। ফকীর সাহেবের বিরুদ্ধে তুমি কিছু শুনিয়াছ?"

"রাণী সাহেবা, মুসলমানরা ত সকলেই আপনার বিপক্ষে, তাহাদের উপর বিশ্বাস কি?"

"ফকীর নূরউদ্দীন নিমকহারাম নন। তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলে মুসলমান-শত্রু বাড়িবে।"

"মুসলমানের দর্প চূর্ণ হইয়াছে। খালসার বিরুদ্ধে তাহারা কি করিবে?"

এমন সময় কেল্লার সদর দরজায় ডঙ্কা বাজিল। মীরা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, "আজ অমাবস্যা, রাবীতে স্নান করিতে যাইব। তুমি আমাদের সঙ্গে যাইবে?"

"যেমন হুকুম হয়।"

রাণী সাহেবা যখন বাহিরে যাইতেন, তখন কেল্লার সিংহদ্বারে ও সহরের সকল চৌমাথায় ডঙ্কা বাজিত। অমনি যে পথে রাণীর যাইবার কথা, সে পথ পরিষ্কার হইয়া যাইত; পথে বড় একটা লোক থাকিত না। রাণীর শিবিকা কিন্‌খাবের ঘেরাটোপ দিয়া মোড়া, আগে অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত, পশ্চাতে পরিচারিকাদিগের পাল্কী, তাহার পিছনে সৈন্য। ফকীরা অশ্বারোহণে রাণী সাহেবার পাল্কীর পাশে থাকিত।

শীশমহলে যাইবার সময় লছমী রামদীনকে দিয়া পাল্কী ডাকাইয়াছিল। পাল্কীর বেহারারা যে নূতন, পাল্কীতে উঠিবার সময় লছমী তাহা লক্ষ্য করে নাই।

কেল্লা হইতে যখন রাণী সাহেবার পাল্কী বাহির হইল, তখন লছমীর শিবিকা রাণীর পাল্কীর ঠিক পশ্চাতে। নদীতীরে রাণীর স্নানের স্বতন্ত্র স্থান ছিল, চারিদিকে কানাত দিয়া ঘেরা। স্নানাদি সমাপন করিয়া মীরা আবার পাল্কীতে উঠিলেন।

বাজারের ভিতর দিয়া ফিরিবার সময় এক স্থানে পথ সঙ্কীর্ণ। পথের পাশ দিয়া কয়েকটা গলি।

সহসা যে সকল সৈন্যেরা রাণী সাহেবার শিবিকার অগ্রে যাইতেছিল, তাহাদের সম্মুখে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হইল। তোপের আওয়াজ হইলে যেমন শব্দ হয়, প্রায় সেইরূপ শব্দ। মাটী কাঁপিয়া উঠিল, অশ্বসমূহ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, পথে লোক ছুটিয়া আসিল, পশ্চাতে যে সকল সৈনিক ছিল, কি হইয়াছে জানিবার জন্য ধাবিত হইল। কেবল ফকীরা অশ্বপৃষ্ঠে রাণীর শিবিকার পাশে অবিচলিত রহিল।

গলির ভিতর এক জন লোক প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। গোলমালে যখন লোকেরা শঙ্কিত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, সে সময় সে অগ্রসর হইয়া লছমীর

বাহকদিগকে সঙ্কেত করিল। তাহারা তৎক্ষণাৎ পাল্কী লইয়া সেই গলিতে প্রবেশ করিল। আর কেহ ততটা দেখিল না, কিন্তু ফকীরার সকল দিকে নজর ছিল। সে চিনিল যে, যে ব্যক্তি বাহকদিগকে সঙ্কেত করিল, সে আর কেহ নহে, রামদীন। ফকীরা এক জন খোজাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া, অশ্বের স্কন্ধের পার্শে মস্তক অবনত করিয়া, চুপি চুপি কি আদেশ করিল। আদেশমত সে অলক্ষিতে লছমীর শিবিকার অনুগামী হইল।

কাহারও কোন আঘাত লাগে নাই জানিয়া ফকীরা রাণীর শিবিকাবাহকদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিল। সৈন্তেরা রাণীর পাল্কী ঘিরিয়া চলিল। সে স্থানে পাহারা বসিল ও সহরকোতওয়াল আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিলেন।

৮

গলিতে প্রবেশ করিয়া লছমীর পাল্কী চলিয়া যাইতেছে, আগে আগে রামদীন। এমন সময় এক জন আসিয়া রামদীনের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "এ সওয়ারি কোথায় যাইবে?"

রামদীন রাগিয়া বলিল, "সে খোঁজে তোমার কাজ কি? কে তুমি?"

সেই সময় আর এক ব্যক্তি আসিয়া যে রামদীনের পথরোধ করিয়াছিল, তাহার পৃষ্ঠে হস্ত অর্পণ করিল। সে ফিরিয়া, বিস্মিত হইয়া কহিল, "জমিল।"

"জমাল!"

জমিল কহিল, "তুমি এখনি একটা গোল বাধাইবে। পথ ছাড়িয়া দাও।"

জমাল কহিল, "কি হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না।"

জমিল বিরক্ত হইয়া কহিল, "যেমন তোমার শরীর, তেমনি তোমার বুদ্ধি! আমার সঙ্গে আইস, বলিতেছি।"

জমিল জমালের হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া গেল। শিবিকা রামদীনের প্রদর্শিত পথে চলিয়া গেল।

বাহকেরা শিবিকা লইয়া একটা বাড়ীতে প্রবেশ করিল। শিবিকা প্রাঙ্গণে রাখিয়া তাহারা বাহির হইয়া গেল। রামদীনও তাহাদের সঙ্গে বাহিরে আসিয়া, বাহির হইতে সদর দরজায় শিকল বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

ক১ শিবিকা ঘেরাটোপে ঢাকা ছিল, বাহিরে কি হইতেছিল, লছমী জানিতে পায় নাই। কেল্লার ভিতর-মহলে পাল্কী আসিয়াছে মনে করিয়া, পাল্কীর দরজা খুলিয়া, ঘেরাটোপ তুলিয়া লছমী দেখিল, অপরিচিত বাড়ী, কেহ কোথাও নাই। তখন ভীত হইয়া লছমী পাল্কীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সে এদিক্ ওদিক্ দেখিতেছে, এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে এক জন দাসী বাহির হইয়া আসিল। লছমীকে দেখিয়া সেলাম করিয়া বলিল, "আসুন, বিবিসাহেব, ভিতরে আসুন।"

লছমী বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার বাড়ী?"

দাসীও বিস্মিতা হইয়া কহিল, "কেন, আপনার বাড়ী, আবার কাহার বাড়ী হইবে?"

"কেন, আমার কি বাড়ী নাই যে, আমি পরের বাড়ীতে আসিব?"

দাসী আরও বিস্মিত হইল, কহিল, "আপনি কি বলিতেছেন? এ বাড়ী আপনার জন্য ভাড়া করা হইয়াছে, আমি আপনার পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত হইয়াছি। আপনি বিস্মিত হইতেছেন কেন?"

লছমী বুঝিল, ইহার ভিতর কিছু রহস্য আছে, ধৈর্য্যচ্যুতি হইলে কোন ফল নাই। স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে এ বাড়ী ভাড়া করিয়াছে?"

"আমি তাঁহার নাম জানি না। দেখিতে বিদেশী লোকের মত, আমাকে নিযুক্ত করিয়া জিনিষপত্র আনিয়া দিয়াছেন।"

"কাহার জন্য বাড়ী ভাড়া হইয়াছে?"

"আপনার জন্য। আপনার নাম কি লছমী কওর নয়?"

লছমী দেখিল, ভিতরে কোন গভীর অভিসন্ধি আছে, এই দাসী তাহার কিছু জানে না। এমন স্থলে ভয় পাওয়া নির্ব্বোধের কাজ।

লছমী কহিল, "তবে আমারই ভুল হইয়া থাকিবে। বাহিরের দরজা খোল।"

দাসী দরজা টানিয়া দেখিল, বাহির হইতে বন্ধ। ফিরিয়া লছমীকে কহিল, "যিনি বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন, তিনি বোধ হয় আসিয়া এখনি খুলিয়া দিবেন।"

আর কোন কথা না কহিয়া লছমী বাড়ীতে প্রবেশ করিল। সকল ঘর দেখিয়া ছাদে উঠিল। ছাদের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, লঙ্ঘন করিবার

উপায় নাই। আপাততঃ এই গৃহে লছমী বন্দিনী।

কাহার এ কাজ? লছমী ভাবিতে বসিল।

সন্ধ্যা হইলে দাসী ঘরে আলো জ্বালিল। সেই সময় সদর দরজা খুলিয়া এক ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিল। তাহার পর বাড়ীর ভিতরে গিয়া, যে ঘরে লছমী বসিয়া ছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া লছমী সরিয়া দরজার আড়ালে গেল। অড়াল হইতে সে ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল।

তাহার বেশ মুসলমানের মত। লম্বা দাড়ী, চক্ষে সুরমা, পরিধানে ঢিলা পায়জামা, চাপকানের উপর কাবা, পায়ে রাওয়ালপিণ্ডীর জুতা। কহিল, "বিবি সাহেব, তসলীম!"

লছমী তাহার সম্মুখে না আসিয়া দরজার পাশ হইতে কহিল, "আমার উপর এ অত্যাচার কেন? আমি কে, জান?"

"আপনি লছমী কওর, রাণী সাহেবার বিশেষ অনুগৃহীতা, যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন।"

"আমি কে জানিয়াও আমার উপর এ জুলুম কেন? রাণী সাহেবা জানিতে পারিলে তোমার মাথা থাকিবে?"

"আমার আশা আছে যে, তাহার পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে আমার নিকা হইয়া যাইবে। কাল সকালবেলা কাজি ও সাক্ষী ডাকিব। তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া যদি কিছু অন্যায় করিয়া থাকি ত আমাকে ক্ষমা কর।"

"তুমি কে?"

আমি শেখ নিজামুদ্দীন, অটারীর জমীদার।"

লছমী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "তুমি শেখ রামদীন, আমার নিমকহারাম জাতিভ্রষ্ট গোলাম!"

রামদীন থ হইয়া গেল। কিছু পরে ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমি সত্য সত্যই মুসলমান হই নাই। তুমি আমাকে ঘৃণা করিয়া অপমান করিয়াছিলে, মনে পড়ে? আমি সে কথা ভুলিয়া যাইব, কিন্তু তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। তুমি আমাকে আনন্দ-মনে বিবাহ কর, আমি সমস্ত আয়োজন করিয়াছি।"

"কবে বিবাহ হইবে?"

"তুমি যবে বল। আজই রাত্রে হইতে পারে।"

লছমী মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিল, "তুমি এই ছিলে শেখ, তাহার পর সৈয়দ হবার কথা, তাহা না হইয়া হইতে চাও শিখ। তোমার কেশ ও হাতের কড়া কোথায়?"

রামদীন লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। কহিল, "আমাকে বিদ্রূপ করিয়া তোমার কি কোন লাভ হইবে?"

"আমি ভাবিতেছি, তুমি যে আমার খসম হইবে, আমি এমন কি সৌভাগ্য করিয়াছি।"

রামদীন রাগিয়া উঠিল! "এখন তুমি আমার হাতে পড়িয়াছ, তুমি রাজী না হও, আমি তোমাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিব।"

লছমী তীক্ষ্ণ কটাক্ষে রামদীনকে দেখিতেছিল। ধীরে ধীরে কহিল, "এই কাজে তোমার পিছনে কে আছে, বুঝিতে পারিতেছি না। নিশ্চয় ফকীর নুরউদ্দীনের লোক হইবে। তোমার ঘটে এত বুদ্ধি নাই।"

কোথায় লছমী ভয় পাইয়া রামদীনের শরণাপন্ন হইবে, না তাহাকে এইরূপ তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিতে লাগিল। রামদীন কহিল, "তুমি মনে কর, আমার নিজের কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই। তোমার বুদ্ধির কত দৌড়, এইবার দেখা যাইবে।"

লছমী কহিল, "তোমার যদি বুদ্ধিই থাকিবে ত আমার সঙ্গে এমন নিমকহারাম করিবে কেন? আমি যাহাই করিয়া থাকি, তোমার ত কোন অনিষ্ট করি নাই?"

লছমী ভিতরের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিল। রামদীন রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া কুলুপ দিয়া গেল।

৯

শীশমহলে উপনীত হইয়া রাণী ফকীরাকে ডাকাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "পথে কি হইয়াছিল?

ফকীরা কহিল, "বোধ হয়, কোন দুষ্ট বালক আতসবাজি ছুড়িয়াছিল। কোতওয়াল তদারক করিতেছেন।"

লছমীকে দেখিতে না পাইয়া রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "লছমী কোথায় গেল?"

এক জন পরিচারিকা কহিল, "হয় ত বাড়ী গিয়া থাকিবে।"

ফকীরা কহিল, "বাড়ী গিয়াছে বলিয়া আমার

মনে হয় না। তাহার পাল্কী হীরামণ্ডির একটা গলিতে গেল। তাহার বাড়ী সে দিকে নয়।"

"কোথায় গিয়াছে, জান?"

"না। জানিবার জন্য আমি এক জন খোজাকে পাঠাইয়াছি।"

"সংবাদ পাইলে আমাকে জানাইও।"

"যো হুকুম" বলিয়া ফকীরা চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর রাণী নিভৃতে বসিয়া ছিলেন, ফকীরা আসিয়া সেলাম করিল। রাণী কহিলেন, "কি সংবাদ?"

ফকীরা মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "সংবাদ বড় বিস্ময়জনক।"

"কি রকম?"

"লছমী পাল্কী করিয়া হীরামণ্ডি দিয়া বরাবর আনারকলি চলিয়া গিয়াছে। সেখানে এক জন মুসলমানের বাড়ীতে গিয়াছে, পাল্কী সেই বাড়ী-তেই আছে। পাড়াও ভাল নয়।"

ক্রোধে রাণীর মুখ বিরক্ত হইয়া উঠিল। কহি-লেন, "মিথ্যা কথা!"

ফকীরা হাত জোড় করিয়া, মাথা নোয়াইয়া কহিল, "যে খোজাকে পাঠাইয়াছিলাম, সে এই কথা বলিতেছে।"

"তুমি নিজে গিয়া জানিয়া আইস।"

ফকীরা ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া, পিছু হটিয়া, ঘরের বাহিরে গেল।

ঘণ্টাখানেক মধ্যে ফকীরা ফিরিয়া আসিল। রাণী সেই স্থানে, সেই ভাবে বসিয়া ছিলেন, ফকীরার প্রতি প্রশ্নসূচক দৃষ্টিপাত করিলেন। ফকীরা কহিল, "খোজার কথা সত্য।"

রাণীর চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইল। কঠোর স্বরে কহিলেন, "তাহাকে ধরিয়া আনিতে হুকুম দাও।"

"কেন?"

"তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিব।"

"সে কি অপরাধ করিয়াছে?"

"আমার অপমান করিয়াছে। যাহার এমন স্বভাব, সে কোন্ সাহসে আমার মহলে আসে?"

ফকীরা যুক্তকরে কহিল, "লছমী রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইবার মত কোন অপরাধ করে নাই। আপনি তাহাকে মহল হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে প্রকাশ্যরূপে কোন শাস্তি দিলে লোকে আপনার নামে নানা কথা রটাইতে পারে।"

রাণী ভাবিয়া কহিলেন, "তবে কি করা কর্ত্তব্য?"

"তাহাকে মহলে প্রবেশ করিতে না দিলেই তাহার যথেষ্ট শাস্তি হইবে।"

"সেই কথা ভাল। সেইরূপ আদেশ দাও।"

"তাহাই হইবে" বলিয়া রাণীকে অভিবাদন করিয়া ফকীরা চলিয়া গেল।

সেই রাত্রে যখন জমিল ফকীরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তখন ফকীরা তাহাকে বলিল, "সেখ সাহেব, মোবারক! তোমার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে।"

"কি হইয়াছে?"

"লছমীর মহলে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইতে তোমাদের আর কোন আশঙ্কা নাই।"

জমিল সকল কথা শুনিয়া, ফকীরার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

প্রভাতে উঠিয়া লছমী দেখিল, বাড়ীর সদর দরজা মুক্ত, বাড়ীতে কেহ কোথাও নাই, দাসীও চলিয়া গিয়াছে। পাল্কীর কাছে চার জন বাহক দাঁড়াইয়া আছে।

লছমীর সংশয় হইল যে, হয় ত কোন নূতন বিপদ উপস্থিত। ভাল করিয়া দেখিল, বেহারারা তাহার পরিচিত তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিল, "তোরা কাল আমাকে এ বাড়ীতে আনিয়াছিলি কেন?"

তাহারা একবাক্যে বলিল, "আমরা কেন আনিব? কাল ত আমরা পাল্কী লইয়া যাই নাই।"

"আজ কেমন করিয়া আসিলি?"

"এক জন লোক বলিয়া দিল।"

"কে সে?"

"তা জানি না।"

পাল্কীতে উঠিয়া লছমী নিজের বাড়ী গেল। আহারাদি করিয়া মধ্যাহ্নের পর শীশমহলে গমন করিল। দস্তুর মত প্রহরী ফটকে পাল্কীর পথরোধ করিল, "কিস্‌কি সওয়ারি?"

"লছমী কঞ্জরি।"

প্রহরী খোজাকে ডাকিল। সে পাল্কীর

পর্দ্দা তুলিয়া লছমীকে দেখিল। বলিল, "মহলে যাইবার হুকুম নাই।"

লছমী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, চক্ষু লোহিতবর্ণ করিয়া কহিল, "কি! আমি কে জানিস্?"

খোজা কহিল, "তা আর জানি না, তোমাকে নিত্য দেখিতেছি?"

"তবে আমার পাল্কী আট্কাস্ কোন্ সাহসে?"

"ডেউড়ীর হুকুম।"

লছমী কহিল, "ফকীরা সর্দ্দার কোথায়?"

"আপনার ঘরে।"

"তাহাকে ডাক।"

"রাণী সাহেবা ছাড়া তাঁহাকে আর কেহ ডাকিতে পারে না।"

"বল, একবার আমি দেখা করিতে চাই।"

খোজা চলিয়া গেল। একটু পরে ফকীরা পাল্কীর কাছে আসিয়া পর্দ্দা তুলিল। খোজা দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাগ সংবরণ করিয়া লছমী কহিল, "আমার এ অপমান কেন? আমি কি করিয়াছি?"

"নিজে বুঝিয়া দেখ।"

"আমি ত কিছুই করি নাই।"

"তোমাকে রাণী সাহেবা অনুগ্রহ করিতেন, কিন্তু দরবারের অহল্কারেরা অন্দরমহলের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না। সে বিষয়ে তুমি কেন হস্তক্ষেপ করিতে গিয়াছিলে?"

"সে কথা রাণী সাহেবা আমাকে বলিলেই ত আমি নিরস্ত হইতাম।"

"সে কথা যাক্। কাল রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে?"

লছমী মাথার উপর দুই হাত তুলিয়া শপথ করিল। "আমার সহিত কেহ শত্রুতা করিয়া আমাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিল। আমাকে যে শপথ করিতে বল, আমি করিতেছি, কেহ আমার অঙ্গস্পর্শ করে নাই।"

"সে কথা তুমি জান আর তোমার ধর্ম্ম জানে। আমরা কোন কৈফিয়ৎ চাহি না।" বাহকদিগকে আদেশ করিল, "সওয়ারি ফিরাইয়া লইয়া যাও।"

লছমী কাঁদিতে লাগিল, "একবার রাণী সাহেবার কাছে যাইতে দাও, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসি।"

"হুকুম নাই" বলিয়া গম্ভীরপদক্ষেপে ফকীরা চলিয়া গেল। লছমী কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। শীশমহলে প্রবেশ আর তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না।

১১

জমাল জমিল দুই ভাই একত্রে বসিয়া ছিল। জমিলের বুদ্ধি-কৌশল দেখিয়া জমাল এখন তাহাকে সমীহা করিত, জমিল মুখে জমালের সম্মান করিত, কিন্তু এখন তাহার কথাতেই সব হইত।

রামদীন আসিয়া সেলাম করিয়া একটু দূরে বসিল। জমিল অল্প মাথা নাড়িয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাহাকে সেলাম করিল।

রামদীন দুই একবার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া কহিল, "আমার প্রতি কি হুকুম হয়?"

জমিল কহিল, "কি বিষয়ে?"

"একটা ভাল কর্ম্ম-কাজের?"

"কেন?"

"আমি আপনাদের উপকার করিয়াছি। আমি আপনাদের পক্ষে না থাকিলে ফকীর সাহেবের কর্ম্ম লইয়া গোল বাধিত।"

"তোমার প্রধান উদ্দেশ্য লছমীর অপকার করা। তাহার নিমক খাইয়া নিমকহারামি করিয়াছ, সে তোমাকে বিশ্বাস করিত, তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছ। তাহারই পুরস্কার চাও?"

রামদীনের চক্ষু বাহির হইল, মুখ খুলিয়া গেল। "এ কি রকম কথা?"

"এই ত ঠিক কথা! তুমি লছমীর সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, দুই দিন পরে যে আমাদের সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিবে না, তাই বা কে জানে? তুমি কিছু টাকা চাও, লইয়া যাও, কিন্তু কাজ কর্ম্ম পাইবে না।"

"লছমীর কাছে যাইলে সে বাড়ী ঢুকিতে দেয় না, আপনারা এই রকম বলিতেছেন। তবে আমি যাই কোথা?"

"যেখানে নিমকহারামেরা যায়—দোজখে।"

মায়াবিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঈপ্সিত, চির-দয়িত, এস হে! নয়নের মণি, প্রাণের উত্তমাদ্ধ, কোথায় তুমি! আমি তোমার পথ চাহিয়া, কোথায় তুমি! তুমি শুনিলে না, বুঝিলে না, আমার দিকে চাহিলে না—দেখ, আমি তোমার জন্য অস্থিরচিত্ত হইয়া তোমার পথ চাহিয়া আছি। কখন তোমায় সকল কথা বলিতে পারি নাই, আজ বলিব। শুন—

এ কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম? কাহার কণ্ঠস্বর আমার শ্রবণকুহরে বাজিতেছিল? কি এ প্রহেলিকা?

স্বপ্নের অপেক্ষা সত্য আরও প্রহেলিকাময়। আকাশে শুক্ল চতুর্দ্দশীর চন্দ্র উঠিয়াছে, পর্ব্বতের উপর দেবদারুবৃক্ষমূলে আমি শয়ন করিয়া রহিয়াছি। পর্ব্বততলে বিশাল হ্রদ বায়ুবিহনে নিস্তরঙ্গ; স্থির নির্ম্মল জলে শত শত চন্দ্রবিম্ব প্রতিবিম্বিত হইতেছে। জলে কুমুদ, কহ্লার, অগণিত লোহিত পদ্ম মুদিত, প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে—চারিদিকে নয়নাভিরাম অতি মনোহর অতুলনীয় দৃশ্য, ঘন নীল মহীরুহ-সমাকীর্ণ, তুঙ্গশিখর পর্ব্বতশ্রেণী, নিম্নে সেই স্নিগ্ধ, শীতল, তুরঙ্গাহ সলিলরাশি, পার্শ্বে গাঢ় হরিদ্বর্ণ, বহুদূর-বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র—সর্ব্বোপরি ফুল্ল জ্যোৎস্নার মায়াময়ী ছায়া। এমন দৃশ্য কখন দেখি নাই। বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, এত বিচিত্র সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ কখন দেখি নাই। অতি গোপনে, এই তুঙ্গীর্ণ পর্ব্বতমালার অন্তরালে, প্রকৃতি কৃপণের মত এত ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। যে দিকে চাহিয়া দেখি, সকলই নূতন, সকলই অলৌকিক। এমন পর্ব্বত, নদী, হ্রদ কোথাও দেখি নাই; এমন বৃক্ষ, এমন ফুল কোথাও দেখি নাই; এমন শস্য, এমন তৃণও কোথাও দেখি নাই। এ কোন্ মায়াপুরে উপনীত হইলাম? শীত এ পর্য্যন্ত আগত হয় নাই। শীতকালে তুষারে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হয়, তখন এ স্থানে বাস অসম্ভব। অপরাহ্ণে এই স্থানে উপনীত হইয়া পথশ্রান্তি অপনোদন করিবার মানসে এই মনোহর বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলাম। শয়ন করিয়া নিদ্রিত হই। নিদ্রাভঙ্গে দেখি, রাত্রি হইয়াছে। অপহৃত দিবালোকের পরিবর্ত্তে জ্যোৎস্নালোকে প্রকৃতি সুষুপ্তির হাসি হাসিতেছে। আমি বিগতনিদ্রালস্যজড়িত চক্ষে সেই অপূর্ব্ব নিসর্গ-সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

স্বভাবতঃই সে স্থানে মনুষ্যসমাগম বিরল। এক্ষণে নিশাকালে চারিদিক্ একেবারে নিস্তব্ধ। সহসা দূরাগত ক্ষীণ সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণে পশিল। ধ্বনি না প্রতিধ্বনি, না পূর্ব্বশ্রুত গীতের স্মৃতিমাত্র? আবার দূর হইতে গীত শ্রুত হইল, কণ্ঠধ্বনি নিকটে আসিতে লাগিল। চারিদিকে চাহিয়া, কোথা হইতে সঙ্গীতের শব্দ আসিতেছে, প্রথমে স্থির করিতে পারিলাম না। অবশেষে দেখিলাম, দূর হইতে তরণী আসিতেছে। হ্রদের স্থির জলে দূরে ছায়া দেখা যাইতেছে। সেই তরণী হইতে সঙ্গীত-ধ্বনি উঠিতেছে। আমি পর্ব্বত হইতে হ্রদের কূলে অবতরণ করিতে লাগিলাম, তরণী নিকটে আসিতে লাগিল। দেখিলাম, অতি অপরূপসুন্দরী যুবতীগণ ক্ষেপণীহস্তে নৌকা চালিত করিতেছে, মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী বসিয়া গীত গাহিতেছে। তালে তালে ক্ষেপণী পড়িতেছে, তালে তালে চরণে নূপুর শিঞ্জিত হইতেছে, তালে তালে নৌকা চলিতেছে। এক পার্শ্বে এক তেজস্বী পুরুষ বসিয়া অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে সেই রূপভঙ্গ, ক্ষেপণীনিক্ষেপ দর্শন করিতেছে ও আলস্য সহকারে সেই গীত শ্রবণ করিতেছে। পার্শ্বে কয়েক জন অনুচর। স্বর উঠিতেছে, পড়িতেছে, ক্ষেপণী উঠিতেছে পড়িতেছে, কণ্ঠ কম্পিত হইতেছে, স্থির জলে এবং বায়ুতে যেন স্পন্দন-তরঙ্গ উঠিতেছে। জ্যোৎস্নায় ক্ষেপণী-ক্ষুত জলবিন্দু জ্বলিতেছে, যুবতীদিগের অঙ্গের অলঙ্কার জ্যোৎস্নালোকে জ্বলিতেছে। নৌকা কখন বামে কখন দক্ষিণে যাইতেছে, কখন ঘুরিতেছে, কখন জলের উপর নৃত্য করিতেছে, আর সেই নিস্তব্ধ আকাশ পরিপূরিত করিয়া, দূর পর্ব্বতগুহা প্রতিধ্বনিত করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গীত-ধ্বনি উঠিতেছে।

এই ত কাব্যপরিচিত অপ্সরাপুরী! এই ত ইন্দ্রালয়! হয় ত চিরযৌবনসম্পন্না উর্ব্বশী এবং রম্ভা এই জ্যোৎস্নালোকে মানসসরোবরের বক্ষে গান করিতেছে! হয় ত এই পুরুষ স্বয়ং ইন্দ্র কিংবা

অর্জ্জুনতুল্য অতিথি! বিস্ময়ের উপর বিস্ময় উদয় হইতে লাগিল। এমন নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যলোকে এমন রূপও ত কখন দেখি নাই! কে বলে গন্ধর্ব্বলোক পৌরাণিক উপন্যাসমাত্র? অপ্সরোলোক ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছি!

কৌতুহল-আগ্রহে আমি জলের তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম। তরণী আসিয়া সেই স্থানে লাগিল। তরণীতে উপবিষ্ট সেই পুরুষ আমার দিকে কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে?"

কয়েক জন অনুচর ও দাঁড়বাহিনী কয়েকটি রমণী নৌকা হইতে উঠিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

এক জন অনুচর ব্যঙ্গস্বরে কর্কশভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?"

আমার পরিধানে গৈরিক বসন, মস্তকে দীর্ঘ রুক্ষ কেশ, এখনও জটা পড়ে নাই। কিছু সঙ্কুচিত, কিছু ভীত হইয়া বলিলাম, "আমি সাধু।" সাধু বলিতে সকল রকম বিরাগী সন্ন্যাসী বুঝায়।

অনুচরবর্গ হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাদের দেখাদেখি স্ত্রীলোকেরাও হাসিয়া উঠিল। সঙ্গীতশব্দ যেমন মধুর ও কোমল শুনাইতেছিল, হাস্যধ্বনি তার তেমন শুনাইল না। প্রথম প্রশ্নকর্ত্তা বলিল, "সাধুর ভেকে অনেক চোর বেড়ায়। তোকে ত চোরের মত দেখাইতেছে।" রমণীগণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। নৌকায় বসিয়া পুরুষ সস্মিতমুখে রঙ্গ দেখিতেছিল।

আমি বিপদে পড়িলাম। ইহারা কে, কিছু জানি না। আমি সাধু না হই, নির্দ্দোষ পথিক, আমাকে বিদ্রূপ করিয়া ইহাদের কি লাভ? পুরুষ ও স্ত্রীলোক মিলিয়া যেরূপ করিয়া আমাকে ঘিরিয়াছে, তাহাতে পলায়নও অসম্ভব। বলিলাম, "চোর হইলে কি আমি এই পর্ব্বতে বসিয়া থাকিতাম? আমি বিদেশী পথিক, এ স্থানে আজই আসিয়াছি। আমাকে তোমরা ত্যাগ কর, এরূপ করিয়া বিদ্রূপ করিও না।"

অনুচরগণ আমাকে আরও বিদ্রূপ করিতে লাগিল, রমণীগণ হাসিতে লাগিল। নৌকায় যে পুরুষ উপবেশন করিয়া ছিল, সে ডাকিয়া বলিল, "উহাকে নৌকায় লইয়া আইস।" অনুচরেরা বলপূর্ব্বক আমাকে ধরিয়া নৌকায় তুলিল। রমণীগণ পূর্ব্বের মত ক্ষেপণী ধরিয়া নৌকা গভীর জলে লইয়া চলিল।

যে রমণী গীত গাহিতেছিল, সে আমার পার্শ্বে বসিল। আমার অঙ্গে তাহার অঙ্গস্পর্শ হইল। চারিদিকে অপর রমণীগণ ঘিরিয়া বসিল। রমণী-ব্যূহের মধ্যে আমি বন্দী হইলাম। সেই পুরুষ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। পুনরায় গীতধ্বনি উঠিল—আলস্য-লালসাপূর্ণ, কাতর প্রণয়সাধনার গীতি—কখন কণ্ঠ বাষ্পপূর্ণ হইয়া রোরুদ্যমান হইয়া ভগ্ন হইয়া যায়, কখন তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত আসিয়া হৃদয়ে আঘাত করে, আবার করুণাকাতর রাগিণীতে হৃদয়ের মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে অলঙ্কার-শিঞ্জন, হৃদয়ভেদী দীর্ঘ স্বুবর্ণশলাকার ন্যায় কটাক্ষ, অথবা কটাক্ষে বিদ্যুতের ক্ষণপ্রভা। থাকিয়া থাকিয়া রোমহর্ষণ অঙ্গস্পর্শ, কখন পার্শ্বে রমণীর করতালিধ্বনি, কখন নূপুরনিক্কণ, কখন ক্ষেপণীর পতনশব্দ, কখন জলের মৃদু মৃদু ভঙ্গরব।

রূপ এবং সঙ্গীতের মোহ আমার চিত্ত হইতে তিরোহিত হইতেছিল। বিস্ময়, বিরক্তি এবং আশঙ্কা হৃদয়কে অধিকার করিতেছিল। এ পুরুষ কে? এই রমণীগণ কেন আমাকে বেষ্টন করিয়াছে? আমি রিক্তহস্ত উদাসীন, আমাকে লইয়া ইহারা কি করিবে? কোথায় আমাকে লইয়া যাইতেছে? কিছু স্থির করিতে না পারিয়া পূর্ব্বের ন্যায় নীরব রহিলাম। কিছু দূর গিয়া হ্রদের তীরে নৌকা লাগিল। তীরে অট্টালিকা। নৌকা ত্যাগ করিয়া সকলে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। আমি অন্যত্র গমন করিবার মানসে অন্য দিকে গমন করিতে উদ্যত হইলাম। অমনি একটি যুবতী আমার হস্ত ধারণ করিল; বলিল, "কোথা যাও?"

আমি বলিলাম, "আমি বিরাগী, এ অট্টালিকায় প্রবেশ করিবার প্রয়োজন কি? আমি ভিক্ষা করিয়া দিনাতিপাত করি। তোমাদের মঙ্গল হউক, আমার হস্ত ত্যাগ কর, আমি অন্যত্র গমন করি।"

সেই যুবাপুরুষ এতক্ষণে প্রথমবার কথা কহিল, মধুর অথচ ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "বিরাগীর পক্ষে অট্টালিকাও যেমন, কুটীরও তদ্রূপ। যেখানে তোমাকে লইয়া যাইবে, সেইখানে গমন করিবে।"

আর এক জন যুবতী দ্বিতীয় হস্ত ধারণ করিল। দেখিলাম, বলপ্রকাশ বৃথা। যদি বলপূর্ব্বক রমণীদিগের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করি, তাহা হইলে অনুচরগণ আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। আমি

বল প্রকাশ না করিয়া রমণীদিগের সহিত চলিলাম।

অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া দেখি, প্রশস্ত কক্ষ-সমূহ বহুবিধ বহুমূল্য উপকরণে সজ্জিত। উজ্জ্বল আলোকে গৃহ আলোকিত হইয়াছে। রমণীগণ আমাকে লইয়া গিয়া একটি মনোহর কক্ষে উপ-বেশন করাইল। সে স্থানে সেই পুরুষ এবং তাহার অনুচরদিগকে দেখিতে পাইলাম না; কেবল কয়েকটি রমণী। তাহারা অত্যন্ত সমাদরপূর্ব্বক আমাকে অভ্যর্থনা করিল। এক জন আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া পার্শ্বের গৃহে হস্তমুখ প্রক্ষা-লনের নিমিত্ত সুবাসিত জল দেখাইয়া দিল। হস্তমুখাদি ধৌত করিয়া আমি সেই স্নানাগারের বহির্দ্বার মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলাম। দেখি, দ্বার বাহির হইতে বন্ধ। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি, দুইটি রমণী অন্য দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে, আমাকে ফিরিতে দেখিয়া এক জন কহিল, "তুমি পথ ভুলিয়া গিয়াছ? ও দিকে পথ নয়, এ দিকে আইস।" আমি লজ্জিত হইয়া পূর্ব্বের গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

গৃহের মধ্যস্থলে রৌপ্য-থালায় নানাবিধ উৎ-কৃষ্ট আহার্য্য সামগ্রী সজ্জিত রহিয়াছে। রমণীগণ আমাকে আহার করিতে অনুরোধ করিল। সমস্ত দিন অনশনে গিয়াছিল, আহারের জন্য পীড়াপীড়ির প্রয়োজন হইল না। আহারান্তে জল দেখিতে না পাইয়া পানীয় চাহিলাম। একটি রমণী সুরাপাত্র আনয়ন করিয়া, আমার হস্তে দিল। আমি বিস্মিত হইয়া পাত্র তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি জল চাহিতেছি, আমাকে সুরা দিলে কেন? সুরা আমার পানীয় নহে, আমাকে কিঞ্চিৎ শীতল জল দাও।"

রমণী বলিল, "সুরা এবং জল তোমার পক্ষে তুল্য। যাহা পাইবে, তাহাই পান করিবে।"

আমি কহিলাম, "না, অমৃত এবং গরল তুল্য নহে। আমি কখন সুরাপান করিব না।"

"তবে শরবৎ আনিয়া দিই?"

"শুধু জল পাইলেই আমি চরিতার্থ হইব।"

দ্বিতীয়বার গিয়া রমণী শরবৎ লইয়া আসিল, জল আনিল না। অগত্যা আমি তাহাই পান করিয়া আচমন করিলাম। শরবৎ মিষ্ট, সুগন্ধ-বিশিষ্ট, অত্যন্ত উপাদেয়, কিন্তু কিসের গন্ধ, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। আহারান্তে দুইটি রমণী আমাকে একটি রম্য শয়নগৃহে লইয়া গেল। প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া পর্য্যন্ত কোন পুরুষ দেখিতে পাই নাই। ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম; কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই, প্রবৃত্তিও হইতেছিল না। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া রমণীদ্বয় পর্য্যঙ্কে আমার জন্য শয্যা রচনা করিয়া দিল। এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "আর কিছু প্রয়োজন আছে?"

আমি বলিলাম, "না, এখন তোমরা যাও, আমি শয়ন করি।"

দ্বিতীয় রমণী কহিল, "পদ-সংবাহন করিব? তাহা হইলে উত্তম নিদ্রা আসিবে।"

অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া কহিলাম, "না না, কিছু করিতে হইবে না, তোমরা আপন আপন স্থানে গমন কর?"

রমণীদ্বয় বাহিরে গমন করিলে অত্যন্ত সাব-ধানে দ্বার রুদ্ধ করিয়া আমি শয়ন করিলাম। পর্য্যঙ্কে শয়ন না করিয়া ভূতলে শয়ন করিলাম।

অলক্ষ্যে বাদ্যধ্বনি উঠিল, অতি মৃদু মৃদু, ধীরে ধীরে কোথায় বাদ্য বাজিতে লাগিল। ধীরে ধীরে আমার দেহে যেন মাদকতার মত সেই শব্দ প্রবেশ করিতে লাগিল। তৎপরে যে অবস্থা উপ-স্থিত হইল, তাহা নিদ্রা কি তন্দ্রা কিংবা জাগ্রতাব-স্থায় স্বপ্নমাত্র, তাহা এ পর্য্যন্ত নিরূপণ করিতে পারি নাই। সেই শ্রুতিমধুর শব্দ যেন ক্রমে দূরে যাইতে লাগিল, অবশেষে মিলাইয়া গেল। সহসা চক্ষে যেন তীব্র আলোক পতিত হইল, চক্ষু উন্মী-লিত হইল। দেখি, শয়নগৃহ মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর আলোকে ঝলসিত হইতেছে। সে আলোক চক্ষে সহ্য হইল না, চক্ষু মুদিত করিলাম। আবার চক্ষু খুলিলাম—দেখিলাম, আলোকের তেজ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছে। ক্রমে জ্যোতি কোমলতর হইতে লাগিল; কভু নীল, কভু লোহিত, কভু হরিদ্রাবর্ণ—আলোক নানা বর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। অকস্মাৎ সেই আলোকে দুইটি অপ্সরাতুল্য কিশোরী নৃত্য করিতে করিতে আমার সম্মুখে উপনীত হইল। পদক্ষেপ এত লঘু যে, ধরণীতে পড়িতেছে কি না, বুঝিতে পারা যায় না। তাহারা কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল, এরূপ প্রশ্ন আমার মনে একবারও উদয় হইল না। নর্ত্তকীদ্বয় সহসা অদৃশ্য হইল। নির্ঝর-শব্দ শুনিতে পাইলাম, কোথায় যেন ঝর-ঝর রবে অবিশ্রান্ত জল পড়িতেছে। বিহঙ্গ-কাকলী যেন

কাননে শ্রুত হইল। কত পুষ্পের গন্ধ বহিয়া আসিতে লাগিল, কত রূপের ছবি চক্ষের সম্মুখে আসিল, কত আনন্দ-অভিনয় হৃদয়কে পুলকিত করিতে লাগিল। সহসা ঝটিকার সম্মুখে প্রদীপের ন্যায় সমস্ত নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। অন্ধকারে আমি স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। সে অবস্থাও জাগরণের অথবা সুষুপ্তির, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

গভীর রাত্রে কিংবা রাত্রিশেষে অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। এবার একেবারে সংশয়-রহিত হইলাম। দেখিলাম, মাণিক্যখচিত সুবর্ণপ্রদীপ হস্তে অবগুণ্ঠনবতী রমণী আমার শিরোদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ গালিচামণ্ডিত গৃহতল হইতে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এ রমণী কেমন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল? দ্বার যেমন রুদ্ধ ছিল, সেইরূপ রহিয়াছে, অন্য কোথাও প্রবেশ-পথ দেখিতে পাইলাম না। এমন সময় রমণী জিজ্ঞাসা করিল, "পথিক, রাত্রে উত্তম নিদ্রা হইয়াছিল?"

দেবী সরস্বতীর পদ্মাঙ্গুলির আঘাতে যেরূপ বীণা ঝঙ্কার দিয়া উঠে, রমণীর বাক্যে আমার হৃদয়ে সেইরূপ ঝঙ্কার উঠিল। মানবকণ্ঠে যে এরূপ মধু থাকে, পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। কেবল স্বর মিষ্ট নহে। যেন সেই কণ্ঠ শুনিবামাত্র কত পূর্ব্বস্মৃতি মনে উঠিতে লাগিল, যেন ভবিষ্যতের স্বর্ণদ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, যেন হৃদয়ের মূলকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি রমণীর কথায় উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?"

অবগুণ্ঠনের অন্তরালে মনে হইল, রমণী যেন মৃদু মৃদু হাসিল। সেই অমৃতনিস্যন্দিনী স্বরে কহিল, "এ আমার গৃহ। আমার গৃহে যেখানে যখন ইচ্ছা যাইতে পারি। তুমি পর্য্যঙ্ক ত্যাগ করিয়া ধরণীতে শয়ন করিয়াছিলে কেন?"

প্রশ্নের উত্তরে আমি পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, "তুমি কে?"

উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গের ন্যায় রমণী হাসিয়া উঠিল; কহিল, "আমি গৃহকর্ত্রী। যে প্রশ্ন তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা আমারই জিজ্ঞাসা করা শোভা পায়। তুমি কে?"

"আমি পথিক, ভিক্ষুক। আমাকে বন্দী করিয়া তোমার কি ফল হইবে?"

রমণী আবার হাসিল; বলিল, "বন্দীর কি এইরূপ শয়ন-গৃহ? এ গৃহে কি তোমার সহিত বন্দীর ন্যায় আচরণ হইয়াছে?"

"আমি বৈরাগ্যব্রতাবলম্বী, বিলাস চাহি না। আমাকে বলপূর্ব্বক এ গৃহে লইয়া আসিয়াছে। যদি তুমি এই গৃহের কর্ত্রী হও ত আমাকে মুক্ত করিয়া দাও, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাই।"

"আইস, তোমাকে মুক্ত করিয়া দিতেছি," বলিয়া রমণী গৃহের প্রাচীরে হস্তস্পর্শ করিল। তৎক্ষণাৎ প্রাচীরে একটি দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। এ কৌশল না দেখিলে প্রত্যয় করা যায় না। রমণী সেই দ্বার দিয়া বাহির হইল, আমি তাহার পশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত হইলাম। পশ্চাৎ হইতে দেখিলাম, রমণীর আপাদমস্তক বিচিত্র শুভ্র বসনে আচ্ছাদিত, কোমল পদক্ষেপে গমন করিতে লাগিল। কয়েকটি কক্ষ অতিক্রম করিয়া রমণী আর একটা দ্বারের সম্মুখে উপনীত হইল। আমার নিকটে আসিয়া আমার কর্ণে মৃদু মৃদু কহিল, "এই দ্বার খুলিলেই তুমি যথেচ্ছা গমন করিতে পার। যাইবার পূর্ব্বে কোন কথা বলিবার নাই?"

আমার শরীর পুলকাঞ্চিত হইল। কহিলাম, "একটা কথা——" যাহা বলিতে যাইতেছিলাম, বলিতে পারিলাম না, লজ্জায় অধোবদন হইলাম।

রমণী কহিল, "কি বলিতেছিলে, বল।"

আমি কহিলাম, "সে কথা বলা আমার পক্ষে পাপ। তুমি দ্বার মুক্ত কর, আমি বাহির হইয়া যাই।"

রমণী আবার আমার কানে কানে বলিল, "আমি বলিব? তুমি যাইবার পূর্ব্বে একবার আমার মুখ দেখিতে চাও।"

এই ইচ্ছাই আমার মনে উদয় হইয়াছিল। কোন কথা কহিতে না পারিয়া আমি মস্তক অবনত করিলাম।

রমণী কহিল, "এই ইচ্ছা তোমার আজ নূতন হয় নাই। এ দিকে দেখ।"

পার্শ্বে একটা দ্বার মুক্ত করিয়া রমণী একটি গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার অনুজ্ঞামত আমিও সেই গৃহে প্রবেশ করিলাম। রমণী প্রদীপ তুলিয়া দেখাইল, গৃহের প্রাচীরে নানাবিধ বহুসংখ্যক সন্ন্যাসীর বেশ রহিয়াছে। রমণী কহিল, "যাহারা এই বেশ ধারণ করিত, তাহারা সকলেই আমার মুখ একবার দেখিতে চাহিয়াছিল। পার্শ্বের গৃহে দেখ।" সেই গৃহের পার্শ্বে আর একটি গৃহ।

তাহার প্রাচীরে বহুসংখ্যক বহুমূল্য পরিচ্ছদ রহিয়াছে। রমণী কহিল, "ইহারাও সকলে আমার মুখ দেখিতে চাহিয়াছিল। তুমি আপনার বেশ ত্যাগ করিয়া অন্য বেশ ধারণ কর, পরে আমাকে অবগুণ্ঠন মোচন করিতে বলিও।"

আমি বিনয়পূর্ব্বক কহিলাম, "এরূপ কৌতূহল আমি ত্যাগ করিয়াছি। তোমাকে অবগুণ্ঠন মোচন করিতে হইবে না। দ্বার মুক্ত কর, আমি বাহির হইয়া যাই।"

রমণী কহিল, "এমন কথা আমাকে কেহ বলে নাই। সকলে বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়াই যে আমার মুখ দেখিতে পাইত, তাহা নয়। কিন্তু তুমি আমার মুখ দেখিবার ইচ্ছাই ত্যাগ করিয়াছ। তোমার কথায় আমি প্রীত হইয়াছি।"

আমি কহিলাম, "তোমার নিকট আমি মুক্তি প্রার্থনা করিতেছি, অপর কিছু প্রার্থনীয় নাই।"

রমণী আমার হস্ত স্পর্শ করিল—মলয়বাহিত সৌরভের ন্যায় মৃদুস্পর্শ, কিন্তু সেই স্পর্শে আমার আপাদমস্তক তীব্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গে কম্পিত হইয়া উঠিল। মৃদু মৃদু, ঈষৎ কম্পিতস্বরে রমণী কহিল, "তুমি বার বার ঐ কথা কেন বলিতেছ? তুমি ত বন্দী নও যে, মুক্তি প্রার্থনা করিতেছ। আর যদি বন্দীই হও ত রূপের, প্রেমের বন্দী, রমণীর কোমল বাহুলতার বন্দী, সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিতে চাহিতেছ কেন? আমি রূপসী কি কুৎসিতা, না দেখিয়াই চলিয়া যাইবে?"

আমি কহিলাম, "রূপের মোহই যদি অন্বেষণ করিব, তাহা হইলে এ বেশ ধারণ করিয়া এই দূরদেশে ভ্রমণ করিতেছি কেন? তুমি যে সকল কথা কহিতেছ, তাহা শ্রবণ করাও আমার পক্ষে নিষিদ্ধ।"

রমণী কহিল, "তোমার নবীন যৌবন, বৈরাগ্যের কথাই তোমার মুখে কঠোর শুনায়। আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়, আইস, আমি স্বয়ং তোমাকে পথ দেখাইয়া দিতেছি।"

দ্বার মুক্ত করিয়া রমণী প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিল। দেখিলাম, বাহিরে অল্প অন্ধকার, প্রভাত আগতপ্রায়। রমণী আমাকে পথ দেখাইয়া অগ্রে চলিল। অল্প দূর গিয়া অতি মনোহর উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। উদ্যানে লতাবেষ্টিত কুঞ্জগৃহের মধ্যে রমণী আমাকে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং পার্শ্বে বসিল।

আমি উঠিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু রমণী আমার হস্ত ধারণপূর্ব্বক আমাকে নিবারণ করিল। তাহার পর মৃদু মৃদু আমার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ আমার চিত্ত বিহ্বল হইল। অবশেষে অস্থিরচিত্তে রমণীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলাম, "তোমার অবগুণ্ঠন মোচন কর, তোমার মুখ দেখিব। অতৃপ্তনয়নে কতক্ষণ তোমার অবগুণ্ঠন দেখিব?"

এই কথা আমি বলিবামাত্র রমণী চকিতের ন্যায় আমার পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইল। মধুর ব্যঙ্গসূচক হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইলাম। তাহার পর রমণী দ্রুতগমনে চলিয়া গেল।

প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্যোদয়ের সূচনা হইতেছে। অকস্মাৎ মোহভঙ্গ হইয়া অত্যন্ত আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। বেগে পলায়ন করিবার প্রয়াস করিলাম। কোথায় পলায়ন করিব? উদ্যানের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, প্রাচীরের উপর উঠিবার অথবা তাহা লঙ্ঘন করিবার উপায় নাই। ব্যর্থ-প্রয়াস হইয়া উদ্যানের একান্তে উপবেশন করিলাম।

সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে পূর্ব্বরাত্রির পরিচিত একটি যুবতী আমাকে ডাকিতে আসিল। তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "অবগুণ্ঠনবতী এই গৃহকর্ত্রী কে?"

যুবতী হস্ত দ্বারা আমার মুখরোধ করিয়া কহিল, "ও কথা আর কখনও জিজ্ঞাসা করিও না। যদি নিজে জানিতে পার ত জানিবার চেষ্টা করিও। আর কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিলে বিপদ্ ঘটিবে।"

যুবতীর মুখ দেখিয়া বোধ হইল, বিদ্রূপ নহে। অগত্যা আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

দিবাভাগে অবগুণ্ঠনবতী রমণীকে আর দেখিতে পাইলাম না। রাত্রিকালে আমাকে গৃহের বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গেল। আবার সেইরূপ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। অট্টালিকার সম্মুখ সেই হ্রদ। সোপান-শ্রেণীর তলে সেই তরণী রহিয়াছে। সেই পুরুষ সেইরূপ হাস্যমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার সঙ্কেতমত তাহার পার্শ্বে গমন করিলাম। দুই জনে একত্রে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলাম। পুরুষ কহিল, "তুমি এখনও বেশ-পরিবর্ত্তন কর নাই?"

আমি কহিলাম, "কেন, বেশ কেন পরিবর্ত্তন করিব?"

পুরুষ কহিল, "এখানে যে আসে, সেই করে। তুমি বাদ যাইবে কেন?"

আমি কহিলাম, "বলপ্রয়োগ করিলে আমি নিরুপায়। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক আমি কখন বেশ-পরিবর্ত্তন করিব না।"

পুরুষ কহিল, "মূর্খ, আমিও তোমার মত এক দিন ঐ কথা বলিয়াছিলাম।"

বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "তুমিও বেশপরিবর্ত্তন করিয়াছ? তুমিও কি অবগুণ্ঠনবতী রমণীর মুখ—?"

পুরুষের মুখ ভয়ে শুষ্ক ও মলিন হইয়া গেল। আমার কথায় বাধা দিয়া কহিল, "চুপ কর। ও সকল কথার কখন উল্লেখ করিও না।"

পূর্ব্ব-রাত্রির মত জল-বক্ষে আবার সঙ্গীত-ধ্বনি উঠিল। সেইরূপ রূপের উচ্ছ্বাস, সেইরূপ তালের মিলন, তরণীর সেইরূপ আনন্দ-হিল্লোল। অবশেষে তরণী হ্রদের পর-পারে উপনীত হইবামাত্র আমি লম্ফ দিয়া তীরে উঠিলাম। কহিলাম, "তোমাদের আনন্দ তোমাদের থাকুক, আমি আর তোমাদের সঙ্গে যাইব না।" বলিয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলাম। পশ্চাতে হাস্য-তরঙ্গ উঠিল। ফিরিয়া দেখিলাম, রমণীগণ নৌকা হইতে উঠিয়া হাসিতে হাসিতে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে, অনুচরগণ বেগে ধাবিত হইতেছে। আমি যথাসাধ্য বেগে ধাবমান হইলাম, কিন্তু পথ আমার অপরিচিত, স্থান বন্ধুর, এরূপ স্থানে যাতায়াতের অভ্যাস নাই। অনুচরেরা অবলীলাক্রমে বেগে আসিতে লাগিল, তাহাদিগের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার আশা ত্যাগ করিতে হইল। কিছু দূর উপরে উঠিয়া দেখি, নিকটেই কয়েকটি কুটীর। তখন আমি সহায়তা পাইবার আশায় উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলাম। অনুচরেরাও আসিয়া আমাকে ধরিল।

এমন সময় কুটীর হইতে জটাজুটধারী কয়েকটি মহাকায় পুরুষ নির্গত হইলেন। আমার গৈরিক বেশ দেখিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন অতি গম্ভীরস্বরে অনুচরদিগকে কহিলেন, "ইহাকে মুক্ত কর!"

তাঁহাদিগের বিশাল মূর্ত্তি দেখিয়া অনুচরগণ আমাকে ত্যাগ করিয়া বিষণ্ণমুখে ফিরিয়া গেল। আমি সেই পুরুষদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া কুটীরে প্রবেশ করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে কুটীরে প্রবেশ করিলাম, তাহার অভ্যন্তরে এক জন সন্ন্যাসী উপবিষ্ট ছিলেন। মুখশ্রী অত্যন্ত প্রশান্ত, চক্ষু অত্যন্ত উজ্জ্বল। তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া আমি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। আমার সঙ্গে যে কয় জন সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহারা যাহা দেখিয়াছিলেন, বিবৃত করিলেন। তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিয়া আসনস্থ সন্ন্যাসী আমাকে কহিলেন, "কোন চিন্তা নাই, অদ্য রাত্রে বিশ্রাম কর। কল্য তোমায় সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

অনুচরগণ আরও লোকবল লইয়া আমায় না ধরিতে আইসে, আমি সেই আশঙ্কা প্রকাশ করিলাম। সন্ন্যাসী কহিলেন, "কোন আশঙ্কা নাই, এ স্থানে উপদ্রুত হইবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম কর।"

অপর সন্ন্যাসীরা আমাকে আর একটি কুটীর দেখাইয়া দিলেন। পর্ণশয্যায় শয়ন করিলাম।

প্রভাত হইলে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া নির্ঝরের জলে স্নান করিলাম। স্নানান্তে সন্ন্যাসি-প্রদত্ত ফলমূল ভোজন করিলাম। পূর্ব্বোক্ত প্রধান সন্ন্যাসী সেই কুটীরে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলাম। তিনি ইঙ্গিতপূর্ব্বক আমাকে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। আমি উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ব্রহ্মচারী?"

আমি ব্রহ্মচর্য্য বা অন্য কোন আশ্রমই গ্রহণ করি নাই। সন্ন্যাসীকে প্রকৃত কথাই বলিলাম। বলিলাম, "এই বেশে ভ্রমণ করিবার সুবিধা, সেই জন্য গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছি। আমি নিঃস্ব পথিকমাত্র, নানা দেশে, নানা তীর্থে পর্য্যটন করিতেছি। এ পর্য্যন্ত কিছুই শিক্ষা হয় নাই।"

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়ঃক্রম অল্প দেখিতেছি, তুমি সংসার ত্যাগ করিলে কেন?"

সকল কথা আমি খুলিয়া বলিতে পারিলাম না। বলিলাম, "আনুপূর্ব্বিক সকল কথা আমি বলিতে পারিব না, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। সংসারে সুখ না পাইয়া, বিরক্ত হইয়া আমি সংসার ত্যাগ করিয়াছি।"

সন্ন্যাসী স্মিতমুখে কহিলেন, "গোপনীয় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি না। সুখের সন্ধানেই

ভ্রম। সংসারের ভিতরেও সুখ নাই, সংসারের বাহিরেও সুখ নাই।"

আমি কহিলাম, "বিষয়ীর অপেক্ষা ত্যাগী যে অধিক সুখী, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তাহা নহে। সুখকে ত্যাগ করিলে তবেই সুখ পাওয়া যায়। সুখ ত বাহিরে নাই। আপনাতেই সুখ। আপনার ভিতরে অনুসন্ধান কর, সুখ পাইবে। সে অনুসন্ধানের ক্ষমতা না থাকে, যথাসাধ্য ইহজীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও। নিষ্ঠাতেও তৃপ্তি আছে।"

উপদেশের উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া আমি নিরুত্তর রহিলাম।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তোমার কি ইচ্ছা? এই আশ্রমে কিছু দিন অবস্থান করিবে, কিংবা অন্যত্র যাইবে?"

আমি কহিলাম, "যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে কিছু দিন আপনাদের আশ্রয়ে থাকি। যে দেশে উপস্থিত হইয়াছি, একা ভ্রমণ করিতে কিঞ্চিৎ আশঙ্কা হয়।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "কেন, আশঙ্কা কিসের?"

পূর্ব্ব দুই দিবসে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, অন্তোপান্ত কহিলাম। সন্ন্যাসী শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন; কহিলেন, "ইহা উপকথার মত শুনাইতেছে।"

আমি কহিলাম, "যাঁহারা কল্য রাত্রে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা কতক স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। আমার মুখে যাহা শুনিলেন, তাহা আমি না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "অবগুণ্ঠনবতী রমণী কে?"

"আমি কিছুই জানি না। তাহার মুখ পর্য্যন্ত দেখি নাই।"

সন্ন্যাসী মৌন হইলেন। কিয়ৎকাল পরে কহিলেন, "আমার সন্দেহ হইতেছে, এই রমণী দ্বারা বহু অনিষ্ট ঘটিয়া থাকিবে।"

"আমার তাহাই বিশ্বাস।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "ইহার কি কোন প্রতীকার নাই?"

আমি কহিলাম, "রাজা না করিলে কে করিবে?"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমরা বলশূন্য, কিন্তু একটা স্ত্রীলোকের অত্যাচার কি নিবারণ করিতে পারি না?"

"কি করিবেন?"

"তাহাই ভাবিতেছি," বলিয়া সন্ন্যাসী মৌন হইলেন।

রাত্রে আমি শয়ন করিয়া আছি, এমন সময় সন্ন্যাসী গাত্র স্পর্শ করিয়া আমায় জাগরিত করিলেন। মৃদুস্বরে কহিলেন, "উঠিয়া আমার সঙ্গে আইস।"

আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। কুটীর হইতে বাহির হইয়া সন্ন্যাসী হ্রদের অভিমুখে চলিলেন। হ্রদের সম্মুখে উপনীত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় যাইতেছেন?"

"সেই রমণীর গৃহের অভিমুখে। আমাকে পথ দেখাইয়া দাও।"

ভীত হইয়া কহিলাম, "আমি সে দিকে যাইব না। এবার ধৃত হইলে আর পলায়ন করিতে পারিব না।"

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কোন আশঙ্কা নাই, নিশ্চিন্ত হইয়া আমার সঙ্গে আইস।"

আজ রাত্রে সঙ্গীতের ধ্বনি নাই, হ্রদে তরণীর চিহ্ন নাই। অট্টালিকা কোন্ দিকে, আমার স্মরণ নাই। সন্ন্যাসীকে কেমন করিয়া পথ দেখাইয়া দিব?

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছি। তুমি কেবল গৃহ চিনিয়া লইবে।"

সন্ন্যাসী অগ্রে চলিলেন, আমি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলাম। বহুদূর গমন করিয়া দেখিলাম, হ্রদের তীরে বৃহৎ প্রাসাদ জ্যোৎস্নায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি কহিলাম, "এই বাড়ী।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি এই গৃহে প্রবেশ করিব।"

তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া আমি পিছাইয়া পড়িলাম। সন্ন্যাসী গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহার যাহাই হউক, আমার সমূহ বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এবং দ্বিতীয়বার ধৃত হইলে কি দুর্গতি হইবে, তাহাও জানি না। সন্ন্যাসীর কথায় আমার ভয় হওয়া বিচিত্র নহে। তিনি স্মিতমুখে কহিলেন, "তোমার মনে যদি শঙ্কা হয় ত গৃহের নিকটে অবস্থান করিও না। দূরে কোন এমন স্থানে গমন কর, যেখান হইতে এ গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ ভয়ের কারণ হইলে সহজে পলায়ন করিতে পারিবে। আমার জন্য কোন চিন্তা করিও না।"

সন্ন্যাসীর কথার শ্লেষ বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু

ভয় ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাঁহার কথামত কিছু দূর গমন করিয়া এক ছায়াবহুল বৃহৎ বৃক্ষতলে অবস্থান করিলাম। সে স্থান হইতে সে গৃহ দেখিতে পাওয়া যায় এবং পলায়নের পথও অবারিত। ছায়ান্ধকারে আমাকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া সন্ন্যাসী গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বৃক্ষতলে অন্ধকারে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া সেই সম্মুখস্থিত অট্টালিকানিহিত রহস্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। কোন্ সাহসে সন্ন্যাসী সেই গৃহে একা প্রবেশ করিলেন? কিরূপেই বা সেই স্থান হইতে মুক্ত হইয়া আসিবেন? কে সেই রমণী? কিসের জন্য এরূপ করিয়া এমন স্থানে বাস করে?

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। পথে পথিক নাই। হ্রদে তরণী নাই। চারিদিকে কেবল ভীতিসাধক অস্ফুট নিশীথধ্বনি। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

অনুমান রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। সহসা অট্টালিকার প্রবেশদ্বার মুক্ত হইল। সেই পথে সন্ন্যাসী বাহিরে আসিলেন। পশ্চাতে অবগুণ্ঠনাবৃতা সেই রমণী। সঙ্গে আর কেহ নাই। তাঁহারা নিষ্ক্রান্ত হইলে গৃহদ্বার পুনরায় রুদ্ধ হইল। সন্ন্যাসী স্থির অবিচলিত পদক্ষেপে আমার সন্নিধানে আগমন করিলেন। সঙ্কেতপূর্ব্বক আদেশ করিলেন, "আইস।" আমি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলাম। রমণী পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।

বিস্ময় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই রমণী ঐশ্বর্য্যশালিনী, দাসদাসীপূর্ণ অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া কেন এই সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ আগমন করিতেছে? কিরূপ কৌশলে অথবা কোন্ বলে সন্ন্যাসী এই নারীকে কিঙ্করীর মত সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন? সন্ন্যাসীর মুখে কথা নাই। রমণীও নীরব। অন্ধকারে পদধ্বনি শুনা যায়। মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি কোথাও শ্রুত হয় না। বর্দ্ধিত-কৌতূহল হইয়া আমি তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলাম। যে স্থান হইতে সন্ন্যাসী পূর্ব্বে আগমন করেন, সে দিকে ফিরিলেন না। হ্রদের কূল ত্যাগ করিয়া লোকালয়ের অভিমুখ পশ্চাতে রাখিয়া, আর এক দিকে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখি, সম্মুখে অন্ধকার অরণ্য। সন্ন্যাসী নিঃশঙ্কচিত্তে সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণী একবার দাঁড়াইল। কিন্তু সন্ন্যাসী পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করাতে পূর্ব্বের ন্যায় নীরবে তাঁহার অনুগামিনী হইল। আমি রমণীর পশ্চাৎ অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। রাত্রি অন্ধকার। অরণ্যের বাহিরে অন্ধকার। অরণ্যের ভিতরে অতি গাঢ় সূচিভেদ্য অন্ধকার। পথ আছে কি না, দেখিতে পাওয়া যায় না। পথ থাকিলেও লক্ষ্য হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু সন্ন্যাসী পূর্ব্বের ন্যায় অভ্রান্ত অবিচলিত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রমণী এবং আমি যথাসম্ভব তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম।

কিছু দূর এইরূপ গেল। কচিৎ পেচকরব, বৃক্ষশাখায় বাদুড়ের পক্ষশব্দ, দূরে কখনও কোন নিশাচর শ্বাপদের হৃৎকম্পকারী গর্জ্জন। অকস্মাৎ অনতিদূরে আলোক দেখিতে পাইলাম। নিকটে উপনীত হইয়া দেখি, অতি প্রাচীন ভগ্নাবশিষ্ট মন্দির। পার্শ্বে ভগ্নচূড়া স্তূপাকারে পতিত রহিয়াছে। চারিদিকে অতি বিশাল বটবৃক্ষশ্রেণী। চারিদিকে জটা ভূমিতে পতিত হইয়াছে। মন্দিরের প্রকোষ্ঠে আলোক জ্বলিতেছে। সন্ন্যাসীর সহিত আমরা মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। আলোক প্রদীপের নহে—ভূগর্ভস্থ কোনরূপ প্রজ্বলিত বাষ্প হইতে আলোক নির্গত হইতেছে। ক্ষীণ নীল শিখা। কখনও ম্লান, কখনও উজ্জ্বল। কখনও নির্ব্বাণোন্মুখ, কখনও জালাময়। মন্দিরের বাহিরের যেরূপ ভগ্নাবস্থা, ভিতরে সেরূপ নহে। আয়তন বৃহৎ। কক্ষ অনেকগুলি আছে, এরূপ মনে হয়। আলোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী কিছুকাল চিন্তা করিলেন। পরে আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তিষ্ঠ", রমণীকে কহিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।" কক্ষে দুই জন প্রবেশ করিলে দ্বার রুদ্ধ হইল। আমি বাহিরে সেই আলোকের সম্মুখ দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আলোকের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ক্রমে চিত্তের বিকৃতি জন্মিতে লাগিল। কোথায় আসিয়াছি, কাহার সহিত আসিয়াছি, সে জ্ঞান ক্রমশঃ লুপ্ত হইল। আলোকে নানাবিধ মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলাম। কখনও বালিকার অবয়ব, কখনও তরুণী, কখনও ভয়ঙ্কর নৃশংস পুরুষমূর্ত্তি, কখনও আলোক এবং ছায়ার নৃত্য। ক্রমশঃ দৃষ্টি স্থির হইল। দেখিলাম, সম্মুখে রত্নময় পালঙ্কের উপর সুন্দরী রমণী শয়ন করিয়া রহিয়াছে। পালঙ্কের চারিপার্শ্বে

মুগ্ধলোচনে বহুসংখ্যক পুরুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রমণী চক্ষু উন্মীলন করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ পুরুষদিগকে দেখিয়া অল্প হাসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। আপাদমস্তক বসনে আচ্ছাদিত করিল। বস্ত্রাবরণে তাহার দেহ আন্দোলিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই আবরণ পুনর্মুক্ত হইল। কোথায় সে সুন্দরী নয়নমোহিনী রমণী! শয্যা হইতে অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ, নিঃশ্বসিতা ফণিনী ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল! আমি চীৎকার করিয়া পশ্চাতে সরিয়া আসিলাম।

সেই সময় কক্ষদ্বার মুক্ত হইল। রমণী বেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। সন্ন্যাসী পূর্ব্বের ন্যায় অবিচলিত. বিশাল দেহ স্থির। অতি গম্ভীর বজ্রস্বরে কহিলেন, "অবগুণ্ঠন মুক্ত কর।"

কম্পিতহস্তে ধীরে ধীরে রমণী অবগুণ্ঠন মুক্ত করিল। আমার মত কত ব্যক্তি হয় ত বহু যত্ন করিয়াও এই রমণীর মুখ কখন দেখিতে পায় নাই। এখন সন্ন্যাসীর কঠিন আদেশে তাহার মুখ অনাবৃত হইল। আমি রুদ্ধনিশ্বাসে নির্নিমেষ লোচনে রমণীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

তেমন রূপ আমি কখন দেখি নাই, কেবল রূপ নহে, চক্ষে সেরূপ তীব্র জ্বালা পূর্ব্বে দেখি নাই। বুঝিতে পারিলাম যে, যাহার এত রূপ, সে ইচ্ছা করিলে বহু অনর্থ ঘটাইতে পারে। পূর্ব্বরাত্রে রমণীর গৃহে যে সকল পরিচ্ছদ দেখিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ হইল।

সন্ন্যাসী একবার রমণীর মুখের দিকে দেখিলেন, আর বার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর রমণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "তুমি ঐ রূপ লইয়া অসংখ্য লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছ। এই যুবক সন্ন্যাসিবেশে আসিয়াছিল, তুমি ইহারও বিপদের প্রয়াস পাইয়াছিলে। তোমার মত নারীবেশে রাক্ষসী আর আছে কি না, জানি না, কিন্তু তোমার এই দুষ্ক্রিয়া যদি রোধ না করিতে পারি, তাহা হইলে বৃথাই আমার সাধনা।"

মন্দিরের বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসী পূর্ব্বের ন্যায় পথ দেখাইয়া চলিলেন। অরণ্য অতিক্রান্ত হইলে রমণীকে কহিলেন, এখন গৃহে যাও। এখন প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

রমণী রোদন করিতে করিতে চলিয়া গেল।

তখন সন্ন্যাসী আমার প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কোমল স্বরে কহিলেন, "বৎস, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। কঠোর সন্ন্যাস-আশ্রম তোমার তরে নহে। তুমি যে রমণীকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, সে গুণবতী, তাহাকে লইয়া তুমি সুখে গৃহস্থ আশ্রম কর।"

তখন স্বপ্নশ্রুত সেই স্বর আমার শ্রবণে পুনঃ প্রবেশ করিল—"ঈপ্সিত, চিরদয়িত, এস হে!"

সন্ন্যাসী দ্রুতপদে আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। আমি পরদিবস প্রাতে গৃহমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

প্রতিশোধ

অবিনাশের উপর অতুলের ভারি রাগ হইয়াছিল। রাগ হইবার কথা। ক্লাসে বসিয়া পণ্ডিত মহাশয় যখন নানাবিধ সুরে ও অনেক রসবৈচিত্র্যের অবতারণা করিয়া ঋজুপাঠের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন অতুল কেতাবখানি খুলিয়া খুব মনোযোগসহকারে শ্রবণ করিতেছিল এবং পেন্সিল দিয়া মানে লিখিতেছিল। পণ্ডিত মহাশয় লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলেন যে, অতুল যেমন ঘাড় গুঁজিয়া একমনে লিখিতেছে, এমন আর কেহই লিখিতেছে না। পণ্ডিত মহাশয় কেদারায় বসিয়া দেখিতেছিলেন এই রকম, কিন্তু অতুলের পাশে বসিয়া অবিনাশ দেখিতেছিল আর এক রকম। সে দেখিতেছিল, অতুল খোলা কেতাবের উপর একখানি সাদা কাগজ রাখিয়া তাহার উপর পেন্সিল দিয়া অত্যন্ত যত্নের সহিত একখানি ছবি আঁকিতেছিল। ছবিখান দেখিয়া, অতুলের যে চিত্রবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা আছে, এমন মনে হয় না। আর্ট স্কুলের ছেলে হইলে তাহাকে স্কুলে রাখিত কি না সন্দেহ। আর সে ছবি স্কুলের অধ্যক্ষগণ দেখিতে পাইলে পুরস্কারটা বোধ হয় অতুলের পিঠে পড়িত। ছবিখানি কেদারায় উপবিষ্ট মানুষের মূর্তি, কিন্তু মানুষের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য বড় ছিল না। বরং বানরের সঙ্গে কতকটা ছিল, কেন না, চিত্রকর একটা লেজ বানাইয়া, কেদারার নীচে ঝুলাইয়া দিয়াছিল। ছবির মুখের সঙ্গে আর পণ্ডিত মহাশয়ের মুখের সঙ্গে যেন কতকটা সাদৃশ্য ছিল। পণ্ডিত মহাশয়ের নাকের উপর যেমন বাঁকা চশমা ছিল, ছবির নাকের উপরও সেই রকম ছিল। মাথার উপর একটা অদ্ভুত পাগড়ি, সে রকম পাগড়ি ভূ-ভারতে কেহ কোথাও বাঁধে না। পাগড়িটা আর লেজটা পণ্ডিত মহাশয়ের ছিল না। এ দুটা চিত্রকরের কল্পিত কল্পনা। চিত্র শেষ হইলে অতুল গোটা গোটা অক্ষরে নীচে লিখিল, "মাথায় পাগড়ি ও—ওকে পণ্ডিত মহাশয়।" লেখাটা তেমন বিশুদ্ধ নয়, বর্ণাশুদ্ধি দুই একটা ছিল। লেখা সমাপ্ত হইলে অতুল একদৃষ্টে ছবিখানি দেখিতে লাগিল।

আশঙ্কার কোন কারণ তাহার মনে উঠে নাই। সে ভাবিতেছিল, পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া গেলে ছবিখানা অন্য ছেলেদের দেখাইবে। গৃহশত্রুকে যে কত ভয়, সে কথা ভাবিবার তাহার অবসর হয় নাই। অবিনাশ কোন কথা না বলিয়া পাশে বসিয়া ছবিখানি দেখিতেছিল। হঠাৎ খপ করিয়া সেখানা অতুলের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া একেবারে পণ্ডিত মহাশয়ের সম্মুখে গিয়া ধরিল। পণ্ডিত মহাশয় ছবিখানা চক্ষের কাছে ধরিয়া ভাল করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া, গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "এ কার কাজ ?"

অতুল আড়ষ্ট। তাহার মুখ একবারে লাল, একবার সাদা হইয়া উঠিতেছিল, বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছিল। ছবিখানা আঁকিবার সময় যেমন মজা বোধ হইতেছিল, এখন মনের ভাব ঠিক সে রকম নয়। অবিনাশ যখন বলিল, "মহাশয়, অতুল এই ছবিখানা আঁকছিল," তখন অতুলের মুখেই সে কথা স্পষ্ট প্রমাণ হইল।

পণ্ডিত মহাশয় অতুলকে কাছে ডাকিলেন। অতুল কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে ধৃষ্ট, পাষণ্ড প্রভৃতি নানা সম্বোধনে অভিহিত করিলেন। আর যে কতকগুলা কথা বলিলেন, সেগুলা ত সংস্কৃত নহেই, বাঙ্গালা অভিধানেও পাওয়া যায় না। ছবিখানা সম্মুখে না থাকিলে, হয় ত গালি দিয়াই পণ্ডিত মহাশয়ের ক্রোধের উপশম হইত; কিন্তু তাঁহার রাগ পড়িল না। পার্শ্বে বেত্র ছিল, সেইটা তুলিয়া লইয়া অতুলকে ঘা-কতক উত্তম-মধ্যম দিলেন। তাহাতেও শাস্তি হইল না। অতুলকে ধরিয়া প্রধান শিক্ষকের নিকট লইয়া গেলেন। শিক্ষক মহাশয় ছুটীর পর এক ঘণ্টা কাল অতুলকে স্কুলে আটক থাকিতে আদেশ করিলেন, আর শাসাইলেন যে, দ্বিতীয়বার এরূপ অপরাধ করিলে তাহাকে স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

যখন স্কুল ভাঙ্গিয়া যায়, সে সময় প্রহার ও অপমানের স্মৃতি অতুলের মনে প্রবল। কিন্তু তাহার চেয়েও প্রবল অবিনাশের উপর রাগ। অবিনাশকে তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে

দেখিয়া অতুল কহিল, "মনে থাকে যেন, তোমায় দেখে নেব।"

অবিনাশের মনে তখন বড় ফুর্ত্তি। হাত দোলাইয়া, মাথা নাড়িয়া কহিল, "দেখে থাকে ঢের ঢের লোকে? আজ ত দেখেছি, আবার না হয় এক দিন দেখ্‌ব।" সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

সেই এক ঘণ্টা অতুলের পক্ষে যেন কাটে না। মনে মনে কত কি যে ভাবিতে লাগিল, তাহা বলা যায় না। কখন ভাবিল যে, সন্ধ্যার পর পুকুরের ধারে যদি কোন দিন অবিনাশকে একা পায় ত তাহাকে জলে চুবাইবে। আবার ভাবিল যে, আজই রাত্রে গিয়া অবিনাশের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিবে। একবার ভাবিল, তাহাকে দেখিতে পাইলেই মারিবে। তাহার বইগুলা লইয়া পুড়াইয়া দিবে, তাহার গায় কাঁটা ফুটাইয়া দিবে, সকলের সাক্ষাতে তাহাকে গালি দিবে। মনে মনে কতবার অবিনাশকে জলে চুবাইল, তাহাকে পুড়াইয়া মারিল, তাহাকে পথে অপমানিত করিল। শাস্তির সময় অতিবাহিত হইলে অতুল রাগে গব্‌গব্ করিতে করিতে বাড়ী গেল।

অতুলকে ভয় না করুক, অবিনাশ অন্য ছেলেদিগকে কিছু ভয় করিত। যখন সে স্কুল হইতে বাহির হইয়া যায়, তখন দেখে যে, তাহাদের শ্রেণীর এক দল বালক জড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা তাহাকে দেখিয়া টিটকারী দিতে লাগিল ও নানারূপে শাসাইতে লাগিল। তখন অবিনাশের মনে হইতে লাগিল যে, অতুলকে ও রকম করিয়া ধরাইয়া দেওয়া কাজটা বড় ভাল হয় নাই।

পরদিবস অতুলের রাগ কতক পড়িলেও পড়িতে পারিত; কিন্তু বেত্রাঘাতের বেদনা তখনও গায়ে ছিল। আর পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি ত তিলমাত্রও রাগ হয় নাই, রাগটা সম্পূর্ণ ছিল অবিনাশের উপর। স্কুলে গিয়া অতুল দেখিল, সকল ছেলেই তাহার দিকে, সকলেই অবিনাশের উপর রাগিয়া অস্থির, সকলেই তাহাকে জব্দ করিবার জন্য একান্ত উৎসুক। কিন্তু হঠাৎ একটা কিছু রাগের মাথায় করিয়া ফেলিলে মুস্কিল। তাহা হইলে বুলর-বুয়রের মত একটা কিছু গণ্ডগোল বাধিবার নিতান্ত সম্ভাবনা। কারণ, অবিনাশ ছেলে-মহলে একঘরে হইলেও সে শিক্ষক এবং পণ্ডিত মহাশয়ের শরণাপন্ন, তাহার উপর একটা কিছু অত্যাচার হইলে ধাক্কাটা তাঁহারা সামলাইবেন। শিক্ষকেরা সব এক দিকে, আর কতকগুলি ছেলে এক দিকে, এমন অবস্থায় সমান যুদ্ধ হইতেই পারে না। তাহাতে শিক্ষকদিগের কোন দোষ ছিল না, তাঁহাদের উপর কোন ছেলের রাগ ছিল না। অতএব সহসা প্রকাশ্যভাবে অবিনাশের সঙ্গে মারামারি কিংবা ঝগড়া করা যায় না। টিফিনের ছুটীর সময় অতুল ও কয়েক জন বন্ধু মিলিয়া একটা উপায় ঠাহরাইতে লাগিল। তাহাদের কথাবার্ত্তা যদি তখন শুনিতে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে যে, এমন যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ পোলিটিশান যেখানে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় না। পরামর্শটা যখন স্থির হইল, তখন চারিদিকে হেলিওগ্রাফিক কিংবা মেসনিক সঙ্কেত হইয়া গেল। অবিনাশ তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিল না।

ছুটীর পর অবিনাশ বাড়ী যাইতেছে, পথে দেখে, তাহাদের ক্লাসের কয়েকটি ছেলে। অতুল তাহাদের মধ্যে নাই। এক জন বলিল, "অরে কালা দেও!"

ওয়াজিদ আলি শাহ-প্রণীত ইন্দ্রসভার অভিনয় সম্প্রতি পার্সি থিয়েটারে হইয়া গিয়াছিল। অবিনাশও দেখিতে গিয়াছিল। 'কালা দেও' নিন্দুক ও চাটুবাদী চরিত্র। নামটা শুনিয়া অবিনাশের মুখ লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু শুনিতে পায় নাই, এই রকম ভান করিয়া, না দাঁড়াইয়া, চলিয়া যাইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ আর এক জন বলিয়া উঠিল, 'Titus Oates!"

এ নামটা আরও তাজা! আজিকার পড়ার ভিতর। 'টাইটস্ ওটস্, এক জনকে বলিলে সে কি চুপ করিয়া থাকিতে পারে? অবিনাশের পা আর তেমন জোরে চলে না। এমন রাগ হইতেছিল যে, দাঁড়াইয়া দুটা কথা শুনাইয়া দিলেও দিতে পারিত, কিন্তু সাহসে কুলাইয়া উঠিতেছিল না। কিন্তু সে চলিয়া যাইবে কোথা? তাহার পশ্চাতে পদশব্দ আসিতে লাগিল, আর কণ্ঠশব্দ আরও দ্রুত আসিতে লাগিল।

"শকুনি মামা! বলি, ও শকুনি মামা!"

"বিভীষণ যাও কোথা?"

"ওহে গড়াচড় চণ্ড!"

পরীক্ষার সময় এত ইতিহাস ও রূপক ছেলেগুলির যোগাইত কি না বিশেষ সন্দেহস্থল, কিন্তু এখন তাহারা হু হু করিয়া পুরাণ, ইতিহাস, নাটক, নভেল হইতে কতকগুলি প্রধান প্রধান

চরিত্রের নাম আওড়াইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে ধর্ম্মশাস্ত্র আসিল।

"Cain!"

"Satan!"

সয়তানের পর আর চলে না। তোমার আমার না চলিতে পারে, কিন্তু যাহারা চালাইতেছিল, তাহাদের অক্ষয় তূণ! তাহারা বাইবেল, ইংরাজী, পুরাণ, রূপক, ইতিহাস, থিয়েটারী নাটক সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া একেবারে সাফ বাঙ্গালা ধরিল।

"বিশ্বাসঘাতক!"

"বদমায়েস!"

"চোর!"

অবিনাশ আর সহ্য করিতে পারিল না। ফিরিয়া কহিল, "আমাকে বল্‌চ?"

প্যারেডের সময় সৈন্যগণ যেমন সকলে একত্রে অধ্যক্ষের আজ্ঞা পালন করে, 'রাইট এবাউট' বলিবামাত্র সকলে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ অবিনাশের কথা শুনিবামাত্র অপরপক্ষীয় সকলে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কেহ কোন কথা কয় না, দেখিয়া অবিনাশের একটু ভরসা হইল। আর একটু নিকটে গিয়া, বিলক্ষণ রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, "ও কথাগুলা কি আমায় বলা হচ্ছিল?"

তখন সেই শিক্ষিত সৈন্যদল আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। এক জন বলিল, "কে হে তুমি, তোমাকে চিনি না।"

অমনি সারিবন্দি রব উঠিল, "আমরা কেউ তোমায় চিনি না।"

গালাগালি বরং ছিল ভাল, কিন্তু এ যে একেবারে ছুরীর ঘা, অর্থাৎ কর্ত্তন, কি না কটিং। অবিনাশ এতটুকু হইয়া মাটীতে মিশাইয়া গেল। বাড়ীর দিকে যখন আবার ফিরিল, তখন পূর্ব্বের সেই পৃষ্ঠভেদী, কর্ণবিদারী বাক্যবাণ। অবশেষে অবিনাশ রণে ভঙ্গ দিয়া বেগে পলায়ন করিল। শত্রুপক্ষের জয়ধ্বনি এবং কঠোর আনন্দনিনাদ অনেক দূর পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেল।

অবিনাশের একমাত্র উপায় ছিল। সে তাহাই অবলম্বন করিল। পরদিবস গিয়া শিক্ষকের কাছে ফরিয়াদ করিল, বলিল, "মহাশয়, অতুল পণ্ডিতমহাশয়ের ছবি আঁকিতেছিল দেখিয়া আমি তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছিলাম, সেই জন্য ছেলেরা সব মিলিয়া কাল বাড়ী যাইবার সময় আমায় গালি দিয়াছিল।"

"কে কে ছিল?"

"গোপাল, বিপিন, যোগেন, মোহন, শ্যাম, নবীন, অধর, বিনয়, মহেশ, কেদার, তারিণী, আরও অনেকে ছিল।"

"বটে? গোপাল!"

"আজ্ঞা।"

"তুমি কাল পথে অবিনাশকে গালাগালি দিয়াছিলে?"

"মিথ্যা কথা, মহাশয়! কাল আমি অবিনাশকে পথে দেখিও নাই।"

"বিপিন!"

"আজ্ঞা, সমস্ত মিথ্যা। অতুলের নামে একটা সত্য দোষ পাইয়া অবিনাশ আমাদের সকলের নামে মিথ্যা বলিতেছে।"

অবিনাশ বলিল, "না মহাশয়, আমি সত্য বলিতেছি। উহারা এখন মিথ্যা বলিতেছে, ভয়ে স্বীকার করিতেছে না।"

অপরাধীরা কেহই কোন কথা স্বীকার করে না। শিক্ষক মহাশয় তখন অবিনাশকে বলিলেন, "তোমার কেহ সাক্ষী আছে? ইহারা যে তোমায় গালি দিয়াছিল, আর কেহ শুনিয়াছিল?"

অবিনাশের মোকদ্দমা জিতিবার আশাটা তখন কমিতে লাগিল। বলিল, "না, মহাশয়, আর কেহ ছিল না, কেবল ইহারাই ছিল।"

"তাহা হইলে শুধু তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া ক্লাসের অর্দ্ধেক ছেলেকে শাস্তি দিতে পারি না। বিশেষ, ইহাদের নামে এত দিন আমি কোন অভিযোগ শুনি নাই।"

ক্লাসে টু শব্দটি নাই। অবিনাশ চুপ। আর সব ছেলেদের মুখে কথা নাই, হাসির কোন চিহ্ন নাই। বিচার এই রকম ছাড়া আর অন্য রকম হইতে পারে না, তাহাদের মুখের ভাবে সেইরূপ বুঝায়। অবিনাশের নালিশ দাখিল দপ্তর হইয়া গেল।

দুইটার সময় যখন জলযোগের অবকাশ হইল, তখন হাস্য-টিট্‌কারীর তরঙ্গে নাকানি-চোকানি খাইয়া অবিনাশ আবার শিক্ষক মহাশয়ের কাছে ছুটিল। তিনি একটি অন্ধকার কুঠুরীতে অতি জীর্ণ, ভগ্নপৃষ্ঠ, ভগ্নবাহু কেদারায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। অবিনাশকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার কি?"

"মহাশয়, আমাকে দেখিয়া উহারা হাসিতেছে ও মুখ ভেঙ্গ্‌চাইতেছে। আপনি আমার কথা

তখন বিশ্বাস করিলেন না, কিন্তু আমি আপনাকে দেখাইয়া দিতে পারি।"

"তোমার কথায় আমি অবিশ্বাস করি নাই, কিন্তু শুধু তোমার কথায় অনেকগুলি ছেলেকে সাজা দিলে স্কুলের ক্ষতি হইবে। কিন্তু আমি যদি স্বচক্ষে দেখিতে পাই বা স্বকর্ণে শুনিতে পাই, তাহা হইলে ত তোমার কথা প্রমাণ হইয়া গেল।"

"আচ্ছা, মহাশয়, আজই আপনাকে দেখাইয়া দিব।"

"কখন?"

"ছুটীর পর। বাড়ী যাইবার পথে।"

"আমি থাকিলে ত তোমায় কেহ কিছু বলিবে না।"

"তা কেন মহাশয়, আপনি একটু আগে গিয়া মিত্রদের বাড়ীতে একটু বসিবেন। জানালার একটা পাখি খুলিয়া রাখিলেই সব দেখিতে পাইবেন, শুনিতেও পাইবেন।"

"ভাল কথা, তাহাই হইবে।"

অবিনাশ একটু খুসী হইয়া ক্লাসে ফিরিল। মনে করিতেছিল, খুব একটা ষ্ট্রাটেজিক্ চাল চালিয়াছে। কিন্তু কত গোয়েন্দা যে তাহাকে চক্ষে চক্ষে রাখিতেছিল, সে সন্ধান সে রাখিত না। ছুটীর পর যখন সে এদিক্ ওদিক চাহিতে চাহিতে মৃদুপদবিক্ষেপে মিত্রদের বাড়ীর সম্মুখে উপনীত হইল, সেখানে গোপাল, বিপিন, যোগেন কোম্পানীর কাহারও টিকিটি পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল না। জানালার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র ভিতর হইতে প্রশ্ন আসিল, "কই, তারা সব কোথায়?"

বড়মুখ করিয় অবিনাশ এই কৌশল করিয়াছিল, কিন্তু একটাও পাখীর একটা পালক পর্য্যন্ত ফাঁদে পড়িল না। লজ্জিত হইয়া কহিল, "আজ এক জনও আসে নাই। বোধ হয়, কোন রকম করিয়া টের পাইয়া থাকিবে।"

ভিতর হইতে শিক্ষক একটু রুষ্টস্বরে কহিলেন, "আমি না থাকিলে কাল হয় ত ক্লাসে আসিয়া আবার নালিশ করিতে।"

অবিনাশ কহিল, "মহাশয়, আমি কি মিথ্যা বলিয়াছি?"

"তাহা জানি না। তুমি এখন বাড়ী যাও।"

অবিনাশ বাড়ী গেল, কিন্তু তাহার মন পূর্ব্বদিনের অপেক্ষা খারাপ হইয়া গেল।

তার পরদিন অবিনাশ যখন স্কুলে যাইতেছে, তখন পথে এক জন লোক তাহার হাতে একখানা কাগজ দিয়া চলিয়া গেল। লোকটা কে, অবিনাশ ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না। মনে করিল, বুঝি থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল। খুলিয়া দেখে কাগজখানি বিচিত্র কবিতায় পূর্ণ ও সে নিজে সেই কবিতাগুলির লক্ষ্য। পড়িতে পড়িতে সে রাগে লজ্জায় অস্থির হইয়া উঠিল। কাগজখানা সহস্র খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পদদলিত করিল। স্কুলের ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখে, অতুলের দল-বল সকলে দাঁড়াইয়া একখানা কাগজ লইয়া পড়িতেছে। সকলের মুখের হাসি আর ধরে না। কাগজখানা কি, অবিনাশের বুঝিতে বাকি রহিল না। সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় দুই চারি জন তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল, আর দুই এক জন জোরে জোরে সেই অপূর্ব্ব কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল। অবিনাশ রাগে কাঁদ-কাঁদ হইয়া যখন বেগে পথরোধকারীদিগকে ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল, তখন ভারি হাসির ধুম পড়িয়া গেল।

ক্লাসে গিয়া অবিনাশ আবার শিক্ষকের কাছে লাগাইল। বলিল, "মহাশয়, পদ্য লিখিয়া আমায় গালাগালি দিয়াছে।"

"কোথায় পদ্য দেখি।"

নিজের খানা অবিনাশ ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। বলিল, "ইহাদের সকলের কাছে আছে, খুঁজিলে পাওয়া যাইবে।"

শিক্ষক মহাশয় আদেশ করিলেন, "আচ্ছা, খুঁজিয়া বাহির কর।"

অতুল হঠাৎ একবার ধরা পড়িয়াছিল বলিয়া যে সকলেই ধরা পড়িবে, সে সম্ভাবনা অল্প। অনেক খোঁজ হইল, কিন্তু কবিতা বা কবিকে পাওয়া গেল না। শিক্ষক তখন রাগিয়া গেলেন, বলিলেন, "তুমি যদি রোজ রোজ এই রকম অনর্থক নালিশ কর, তাহা হইলে তোমার সাজা হইবে।"

সময় বুঝিয়া গোপাল বলিল, "মহাশয়, কাল মিথ্যা করিয়া আমাদের নামে বলিয়াছিল যে, আমরা গালি দিয়াছি। আজ বলিতেছে, কবিতা লিখিয়াছি। রোজ রোজ ত এই রকম একটা না একটা মিথ্যা অপবাদ দিতে পারে।"

তখন আরও অনেকের মুখ ফুটিল। শিক্ষক বলিলেন, "এবার মিথ্যা অভিযোগ করিলে অবিনাশের বিলক্ষণ শাস্তি হইবে।"

অবিনাশের বুক দমিয়া গেল।

পণ্ডিত মহাশয়ের ঘণ্টায় কেহ কিছু বলিল না। তাহার পর শিক্ষক মহাশয় আবার আসিলেন। তিনি বসিয়া পড়াইতেছেন, এমন সময় অবিনাশ চীৎকার করিয়া লাফাইয়া উঠিল। "দেখুন দেখি মহাশয়!"

"কি?"

"এই আমায় চিমটী কাটিতেছে।"

"কে?"

"গোপাল।"

গোপাল যেখানে বসিয়াছিল, সে স্থান হইতে অবিনাশকে চিম্‌টী কাটা অসম্ভব। গোপাল দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, "মহাশয়, এখান হইতে কি আমি উহাকে চিম্‌টী কাটিতে পারি?"

শিক্ষক ভাল করিয়া দেখিলেন, তাহার পর কহিলেন, "অবিনাশ, আজ ছুটীর পর তুমি এক ঘণ্টা স্কুলে আটক থাকিবে।"

অবিনাশ ঢোক গিলিয়া বসিয়া পড়িল। আর সকলে গম্ভীর, কাহারও মুখে হাসির নাম-নিশানাও নাই।

বাড়ী যাইবার সময় অতুল কয়েদীর সম্মুখে গেল। বলিল, "কেমন, আমার মত ঢের ঢের দেখেছ না?"

অবিনাশ কহিল, "যাও যাও, সকলে মিলে মিথ্যা কথা ব'লে আবার চালাকি!"

"বলেছিলে না আর এক দিন দেখবে? এখন দেখ্‌চ ত?

"তার আর হয়েচে কি! তুমিও এক দিন কয়েদ ছিলে, আমিও না হয় এক দিন রইলাম। তার আর ভয় কিসের?"

"শুধু বুঝি এই! এই ত সবে আরম্ভ। এখনি হয়েচে কি। দেখো, তোমার কি দশাটা হয়।" বলিয়া অতুল ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অবিনাশের তখন রাগই বেশী, ভয় পাইবার কথা নয়। সে রাগের মুখে অতুলের অনুপস্থিতে তাহাকে বিস্তর মন্দ কথা বলিল। অতুলও এক দিন এইরূপ বলিয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার সহায় অনেকে, অবিনাশ অসহায়।

সে দিনও গেল। তাহার পরদিন যে শিক্ষক অবিনাশকে আটক রাখিয়াছিলেন, তিনি পড়াইতেছিলেন। অবিনাশের পাশে যে বসিয়াছিল, সে এ কয় দিনের ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত নির্লিপ্ত ছিল। অবিনাশের বই একখানা লইয়া সে পাতা উল্টাইতেছিল। হঠাৎ বইখানা হাতে করিয়া উঠিয়া শিক্ষক মহাশয়ের নিকট গেল। অবিনাশ এ পর্য্যন্ত কিছু সন্দেহ করে নাই।

যাহার হাতে কেতাব ছিল, সে খুলিয়া শিক্ষক মহাশয়কে দেখাইল। কেতাবের ভিতর একখানি সাদা কাগজে শিক্ষক মহাশয়ের মূর্ত্তি আঁকা। আর মূর্ত্তি বলিয়া মূর্ত্তি! অতুল পণ্ডিত মহাশয়ের যে ছবি আঁকিয়াছিল, সে ইহার তুলনায় ত সোনার চাঁদ। শিক্ষক মহাশয়ের মাথায় গাধার টুপি, কপালে শিং। ছবির নীচে নানাবিধ নাম—তাহার একটা পড়িলে মানুষের এক বৎসর রাগ যায় না। শিক্ষক মহাশয় সকল পড়িলেন। তিনি পণ্ডিত মহাশয়ের মত ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। অবিনাশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু বলিবার আছে?"

অবিনাশের মুখে কথা সরে না। বলিল, "মহাশয়, যে দিব্য করিতে বলেন, সেই দিব্য করিয়া বলিতে পারি, আমি ও ছবি আঁকি নাই। আমি ছবি আঁকিতে একেবারে জানি না। শত্রুতা করিয়া ইহারাই কেহ আমার কেতাবের ভিতর রাখিয়া দিয়া থাকিবে।"

শিক্ষক মহাশয়ের তরফ হইতে অন্য ছেলেরা কথা পাড়িল। এক জন বলিল, "অতুলের বেলা যে অবিনাশ শত্রুতা করে নাই, তাহাই বা কে জানে?"

আর এক জন, "মহাশয়, কাল আপনি অবিনাশকে স্কুলে আটক করিয়াছিলেন বলিয়া বাড়ীতে এই ছবি আঁকিয়াছে। আজ আনিয়া আমাদের দেখাইতেছিল। এখন আবার অস্বীকার করিতেছে।"

ক্লাসসুদ্ধ জুরী একবাক্যে অবিনাশকে অপরাধী সাব্যস্ত করিল। বিচারপতি যিনি, তিনি ফরিয়াদী, এজন্য শাস্তির ভার নিজে লইলেন না। প্রধান শিক্ষকের ঘরে কোর্ট মার্শাল বসিল, চট্‌ করিয়া ড্রমহেড বিচার হইয়া গেল। সমবেত স্কুলের সাক্ষাতে অবিনাশের বেত্রদণ্ড হইল। যত বা অপমান, ততই বেত্রাঘাতের জ্বালা। তাহার পর অবিনাশের মস্তকে রাজমুকুটের ন্যায় গর্দ্দভ-উষ্ণীষ রক্ষিত হইল। পার্শ্বে দুই চারি জন নকীব দাঁড়াইল, তাহারা অবিনাশের দুই হাত ধরিয়া ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিতে লাগিল এবং অতি মুক্তকণ্ঠে তাহার অক্ষয় কীর্ত্তি ও তাহার পুরস্কার ঘোষণা করিতে লাগিল। পরিশেষে বারান্দায় একটা বেঞ্চের উপর অবিনাশ দাঁড়াইল। স্কুল ভাঙ্গিবার সময় পর্য্যন্ত সেইরূপ দাঁড়াইবার হুকুম।

স্কুল ভাঙ্গিল। বাহিরে আসিয়া অতুল, গোপাল, বিপিন, যোগেন প্রভৃতি অবিনাশকে ঘিরিল। অতুল বলিল, "কি চাঁদ, ঢের দেখেচ না? তোমায় যদি রোজ নূতনতর না দেখাই ত আমার নামই নয়।"

সমিস্বরে রব উঠিল, "রসো বাবা, এখনি হয়েচে কি! এখনো অনেক দেখতে বাকি আছে।"

অবিনাশ কিছু উত্তর করিল না। আজ তাহার পরাজয়ের কিছু আর বাকি ছিল না। লাঞ্ছিত, অপমানিত, তিরস্কৃত, প্রহারিত হইয়া সে ধূলির অধম হইয়া গিয়াছিল।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পড়িতে লাগিল,

judas Iscariot!"

"দুঃশাসন!"

"রাবণ।"

অবিনাশ কাঁদিয়া ফেলিল। শিক্ষকদিগের কাছে আর কোন আশা ছিল না। এখন সব শত্রুপক্ষ, মিত্রপক্ষ আর কেহ অবশিষ্ট রহিল না। রহিল কেবল রোদন। সেই তাহার একমাত্র সহায়। 'বালানাং রোদনং বলম্।' অবিনাশ কাঁদিতে লাগিল।

তখন অতুলের কৃপা হইল, বলিল, "আর কখন কারুর নামে লাগাবে?"

অবিনাশ ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া বলিল, "তোমরা আমায় মেরে ফেল, তা হ'লে তোমাদের সাধ মিটবে।"

"আর কখন কারুর নামে লাগাবে?"

অবিনাশ শপথ করিয়া বলিল, "আর কখনও না।"

"বল ঘাট।"

"ঘাট।"

"নাকে খত দাও।"

অবিনাশ নাকে খত দিল।

"আচ্ছা, এবার তোমায় মাপ করা গেল," বলিয়া অতুল সসৈন্যে বিজয়ী সেনাপতির মত হর্ষধ্বনি করিতে করিতে গৃহে চলিয়া গেল।

ছোট বৌ

পাঁচটির ঘরে একটি নতুন মানুষ এলে, একটু তার নতুন নতুন ঠেকে। তার পর আবার পাঁচ রকম দেখে, পাঁচ জনের সঙ্গে মিশে সয়ে যায়। এই কথা ছোট বৌকে ঠান্‌দিদি বোঝান। ছোট বৌর মনে হয় যে—এই শ্বশুরবাড়ীতে ঠান্‌দিদিই যেন তার একটু আপনার লোক, আর যেন কেউ আপনার নেই। শ্বশুরবাড়ীর ছোট বৌটির উপর বেশী টান হবার কথা, কিন্তু তিনি বড়, মেজ, সেজ, ন বৌদের যেমন করেন, ছোটটিকে তেমন করেন না। ছোট বৌর তাই মনে হয়, কিন্তু আর আর বৌরা বলে যে, শাশুড়ী ভিতরে ভিতরে বৌকাঁট্‌কী, কোন বৌকে বড় আপনার মত করেন না। মেয়েদের উপর যতখানি টান, বৌদের উপরে ততটা নয়। এ দিকে ঝিকে মেরে যে বৌকে শিক্ষা দেওয়া, গৃহিণীর তাও নেই। মারবার সময় বৌদের উপরেই পড়ে। সত্য কি আর হাত তোলেন, তবে মুখনাড়াটা, আস্‌টা বৌদের অদৃষ্টেই ঘটে। ছোট বৌ মনে করে, তার ভাগ্যেই বেশী। ঠান্‌দিদির মুখে মন্দ কথা নেই, যখন পারেন, ছোট বৌকে আপনার কাছে ডেকে নিয়ে দুটা মিষ্ট কথা বলেন, তাই ছোট বৌ তাঁকে আপনার মনে করে।

ছোট বৌ যে সত্য খুব ছোট, তা নয়। খুব ছোট বয়সে তার বিয়ে হয় নি, আর বিয়ে হ'তেই সে শ্বশুর-ঘর কর্‌তে আসে নি। বিয়ের পর বছর দুই বাপের বাড়ী ছিল। তার বরের সেইখানে নিমন্ত্রণ হ'ত, সেইখানে দু'জনের ভাব হয়। শ্বশুর-বাড়ীও ছোট বৌয়ের প্রায় এক বছর হ'ল। বয়স এখন সতেরো বৎসর, নাম কুসুমকুমারী। স্বামীর নাম চন্দ্রনাথ। চন্দ্রনাথ বাড়ীর ছোট ছেলে, স্বভাব বড় লাজুক, পড়াশুনা বেশ করে। বাপের শাসন, মা'র শাসন, ভাইদের শাসন, মাথা চাড়া দিবার তার বড় ক্ষমতা ছিল না। দিনের বেলা বাড়ীর ভিতরে গেলে স্ত্রী তাহার সম্মুখে বাহির হইত না, দৈবাৎ দেখা হইলে সে-ও লজ্জায় কথা কহিত না। রাত্রে যা কিছু কথাবার্তা হইত, সে-ও চুপি চুপি, ভয়, পাছে কেহ আড়ি পাতিয়া শোনে। এইরূপে ভয়ে লজ্জায় দুইজনের ভালবাসা তেমন ফুটিয়া বাহির হইতে পারিত না, কিছু সঙ্কীর্ণ ছিল। কিন্তু সেই কারণে বড় গভীর, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত তলায় তলায় বহিত। ছোট বৌ সকল কথা স্বামীর কাছেও খুলিয়া বলিত না। সে জানিত যে, তাহার স্বামীর কোন ক্ষমতা নাই, কোনরূপ স্বাধীনতা নাই। এই জন্য সে আপনার ছোট ছোট দুঃখগুলি নিজে বহন করিত, তাহার অংশ স্বামীকে দিয়া স্বামীর হৃদয় ভারাক্রান্ত করিত না। স্বামীর কাছে কেবল শান্তি ও সান্ত্বনা, রাত্রে প্রদীপের আলোকে দুই জনে পরস্পরের মুখ দেখিয়া অগাধ তৃপ্তি লাভ করিত।

চন্দ্রনাথ আইনের পড়া পড়িত। ভাইয়েরা কেহ কেরাণীগিরি করিত, কেহ বাড়ী বসিয়া মুরুব্বিগিরি করিত। তাহারা সকলে মিলিয়া সময়ে সময়ে চন্দ্রনাথকে বলিত, "তুই আইন প'ড়ে কি কোর্‌বি? তুই যে মুখচোরা, কখন উকীল হ'তে পারবিনে। জজ সাহেবের মুখ দেখেই মুখ শুকিয়ে যাবে।"

চন্দ্রনাথ নিরুৎসাহ হইয়া জিজ্ঞাসা করিত, "তবে কি কোর্‌ব, মেজ দাদা?"

মেজ দাদা মুরুব্বি, ওকালতী কি কেরাণীগিরি, কোন ঝঞ্ঝাট নাই। বলিতেন, "তুই ত বি, এ, পাশ কোরেছিস্‌ মন্দ নয়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এক্‌জামিন দে না। তা না পারিস্‌ ত ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের কেরাণীগিরির এক্‌জামিন দে। ওকালতী টোকালতী তোর কিছু হবে না।"

ক্ষীণ প্রতিবাদের স্বরে চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিত, "চাকরীর চেয়ে ওকালতী ভাল নয় কি?"

"তুই যে একেবারে স্বাধীন হবি দেখ্‌চি। তা তোর সে সব কিছু হবে না, তোর তেমন স্বভাব নয়।"

এরূপ সিদ্ধান্তের পর চন্দ্রনাথ কাজেই নিরুত্তর হইত।

ওদিকে ছোট বৌ নানা লোকের কাছে নানা কথা শুনিত। যাহার যে কাজ, সে তাহাকেই ফরমায়েশ করিত, এ দিকে তাহার কাজ কাহারও পসন্দ হইত না। যদি পান হইতে চূণ খসিল, অসাবধানতায় কাহারও দুধের বাটি পড়িয়া গেল, অমনি যাহার যাহা ইচ্ছা সে বলিয়া উঠিত, "এ আর কারুর কাজ নয়, ছোট বৌর কাজ।"

তা সে কাজ ছোট বৌর হউক আর না হউক। ননদরা অন্য বউয়ের উপর বড় একটা হুকুম খাটাইতে পারিত না, আর গৃহিণী স্বয়ং সব সময় তাহাদের সঙ্গে বড় একটা আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। কিন্তু ছোট বৌ এখনও কতক নরম, কিংবা হয় ত, বিধাতা তাহাকে নরম করিয়াই গড়িয়াছিলেন। সেই জন্য তাহার উপর আর সকলেই গরম।

এক দিন ছোট বৌ এক বাটি দুধ উপরে লইয়া যাইতেছিল। সিঁড়ি দিয়া এক জন ননদ ঝড়ের মত নামিয়া আসিতেছে। ছোট বৌ সাবধান হইতে, পাশ কাটাইতে ননদ তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল। গায়ে গা ঠেকিয়া ছোট বৌর হাতের বাটি হইতে দুধ চলকিয়া পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ গৃহিণীর কাছে সংবাদ গেল। গৃহিণী রাগিয়া বলিলেন, "ছোট বৌ-মা, তোমার কি কোন যোগ্যতা নেই? এক বাটি দুধ আন্‌তে পার না? আর এই কল্‌কেত্তা সহরে দুধ বড় সস্তা না কি যে, ইচ্ছে হ'লেই ফেলে দেবে?"

ছোট বৌ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "আমি ত ইচ্ছে ক'রে দুধ ফেলি নি, মা, ছোট ঠাকুরঝি সিঁড়ি থেকে নামছিল, না দেখ্‌তে পেয়ে হাতে হাত ঠেকে প'ড়ে গিয়েছে।"

এই কথা যেই বলা, অমনি আর রক্ষা নাই। "যত দোষ আমাদের মেয়েদের, আর তুমি লক্ষ্মীঠাক্‌রুণ আমার বাড়ীতে এয়েচ! লক্ষ্মীছাড়ার মেয়ে না হ'লে এমন দশা হয়? যেমন বাপ-মা, তেমনি মেয়ে হবে না ত কি? আবার নিজে দোষ কোরে আমার মেয়েদের নামে লাগান! আস্পর্দ্ধাও ত কম নয়!"

ছোট বৌ চক্ষের জলে কিছু দেখিতে পায় না। কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া আপনার ঘরে খিল দিল।

এ রকম সর্ব্বদাই হইত। অনেক রাত্রে সকলে ঘুমাইলে পর চন্দ্রনাথ স্ত্রীর মুখ দেখিয়া দেখিয়া বলিত, "বোধ হয়, তোমার মনে সুখ নেই। তুমি আমায় কোন কথা বল না কেন?"

ছোট বৌ হাসিয়া স্বামীর মুখে হাত দিত। বলিত, "কিসের আবার অসুখ? পাঁচ জনের সঙ্গে ঘর কোর্‌তে গেলে পাঁচটা কথা হয়। তাতে আবার অসুখ? আর তুমি ত আমায় কিছু বল না, তা হ'লে বরং দুঃখ হ'ত।"

চন্দ্রনাথ কুসুমকুমারীকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিত, "তুমি যে মুখে কথাটি না বয়ে সব সহ্য কোরে থাক, তা বেশ আমি বুঝ্‌তে পারি। চিরদিন এমন কোরে যাবে না। আমার যদি কোন যোগ্যতা থাকে, তা হ'লে এক দিন তুমি নিজের ঘরের গিন্নী হবে, পাঁচ জনের কেন, এক জনেরও কথা শুন্‌তে হবে না।"

ছোট বৌ অগাধ ভালবাসার অটল বিশ্বাসের সহিত বলিত, "ও সব কথা তুমি ভেব না। তোমার কাছে থাক্‌লেই আমার সুখ। আর মেয়েমানুষ একটু আধটু সহ্য না কোর্‌লে চল্‌বে কেন?"

তা, তাহাকে সহ্য করিতে হইত অনেক। বড়জাদের ছেলেদের দুধ খাওয়ান, স্নান করাইয়া দেওয়া, গা মুছাইয়া দেওয়া, চুল বাঁধিয়া দেওয়া, সব করিত, তাহাতেও সকলের মন উঠিত না। কেহ একটু কিছু ত্রুটি পাইলে হয়! তাহা হইলে সে দিন বৌর কাঁদিয়াই অর্দ্ধেক দিন কাটিত। কেবল ঠানদিদি তাহার হইয়া সময়ে সময়ে দুটা কথা বলিতেন, তাহার দিকে একটু টান করিতেন।

ছোট বৌ রাত্রে সকলে শয়ন করিতে গেলে নিজের ঘরে শয়ন করিতে যায়। আগে গেলে পাছে কেহ কিছু তাহাকে বলে, এই জন্য তাহার বড় লজ্জা করে। সমস্ত দিনের অসুখ অশান্তি বহন করিয়া সে রাত্রে স্বামীর প্রীতিপূর্ণ মুখ দেখিয়া সব ভুলিত। অভিযোগ অনুযোগ করা তাহার স্বভাব নয়, এই জন্য সে স্বামীর কাছে কাহারও বিরুদ্ধে কোন কথা বলিত না। এক রাত্রে ঠান্‌দিদির ঘর হইতে বাহির হইয়া সে আপনার শয়নগৃহে যাইতেছে, দুয়ারের সম্মুখে গিয়াছে, এমন সময় সেজ বৌ আপনার ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বলিলেন, "ছোট বৌ, একটা কথা শুনে যাও।"

ছোট বৌ অমনি ফিরিয়া তাঁহার কাছে গেল। বলিল, "কি বল্‌চ সেজ দিদি?"

"আমার কাপড়খানা ছাদে শুকাচ্চে, পেড়ে নিয়ে এস ত। নতুন ঝি পোড়ারমুখী তুল্‌তে ভুলে গিয়েছে, ঝিয়েরা কেউ রাত্রে থাকে না।"

ছোট বৌ বলিল, "কাল সকালে হ'লে হবে না?"

"আমি রাত থাক্‌তে উঠে কাপড় ছাড়ি। আর সমস্ত রাত ছাদে প'ড়ে থাক্‌লে কাপড়খানা হিমে ভিজে যাবে।"

ছোট বৌ একটু ভাবিয়া বলিল, "তবে তুমি আমার সঙ্গে এস দিদি।"

"সর্ব্বরক্ষে! এত রাত্রে আমি ছাদে উঠ্‌তে পারব না। সে দিন মেজ ঠাকুরঝি ছাদে সাদা কাপড় পরা একটা মেয়েমানুষ দেখেছিল। রাত্রি হ'লে আমার গা ছম্ ছম্ করে, কেউ না দাঁড়ালে আমি ঘর থেকে বেরুতে পারি নে। আমি ভাই, তোমার সঙ্গে যেতে পারব না। তুমি না হয় তোমার ঘরের আলোটা নিয়ে যাও! আমার ঘরের আলো আমি দিতে পারব না।"

ভূতের ভয় যে সেজ বৌঠাকুরাণীর একচেটিয়া, তা নয়। ছোট বৌরও সে ভয় যথেষ্ট আছে। অন্য কোন কাজ হইলে সে কোন আপত্তি না করিয়া তখনই যাইত, কিন্তু এত রাত্রে ছাদে একা যাইতে কোনমতে তাহার সাহস হইতেছিল না। বিশেষ সাদা কাপড় পরা মেয়েমানুষের কথা সে-ও শুনিয়াছিল, অগত্যা বলিল, "আমারও বড় ভয় করে ভাই। এত রাত্রে ছাদে একলা কেমন কোরে যাব?"

"কেন, তোমার আবার এত ভয় কিসের? সেখানে ত আর বাঘ ভাল্লুক ব'সে নেই!"

এমন সময় চন্দ্রনাথ ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল, "সেজ বৌ, তোমাদের দু জনের সমান ভরসা। আমি ছাদ থেকে তোমার কাপড় এনে দেব?"

তাহাকে দেখিয়া এক গলা ঘোমটা দিয়া ছোট বৌ এক পাশে দাঁড়াইল। সেজ বৌ মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া বলিল, "ছোট্ ঠাকুরপোর যে এখনও ঘুম নেই? তা বৌ কাছে না এলে ঘুম হবেই বা কেমন কোরে? তা তুমি তাড়াতাড়ি ছুটে এসেচ কেন, তোমার বৌকে ত আর আমি বাঘের মুখে দিই নি।"

চন্দ্রনাথ বলিল, "সে কথা ত নয়। আমি না গেলে তোমার কাপড় আস্‌বে না।"

"কেন, তোমার বৌকে তুমি যেতে দেবে না?"

"তোমার যেমন ভয় করে, ওরও সেই রকম ভয়। আমি এখনি এনে দিচ্চি।"

"না, না, তোমার আর অত উপকার কোর্‌তে হবে না। তোমাদের ঘেন্না-পিত্তি নেই, এড়া কাপড়, আমার কাচা কাপড় ছুঁতে হবে না।"

"আচ্ছা, তবে ছোট বৌ এনে দিক্, আমি দাঁড়াচ্চি।"

সেজ বৌ আবার মুখে কাপড় দিয়া হাসি চাপিল, বলিল, "সেই বেশ কথা, কিন্তু দেখো, যেন কাপড় আন্‌বার সময় ছোট বৌকে ছুঁয়ে ফেল না।"

ছোট বৌ প্রথমে স্বামীর সঙ্গে যাইতে চায় না, অনেক পীড়াপীড়ির পর গেল। ছাদে উঠিয়া হাসিয়া স্বামীকে বলিল, "তোমার আবার সাত তাড়াতাড়ি উঠে আসা কেন? আমি না হয় একা আস্‌তেম। কাল সব আমায় ঠাট্টা কর্‌বে।"

চন্দ্রনাথ বুঝিল, ঠাট্টার চেয়ে কিছু গুরুতর হইবে।

থাকিতে থাকিতে ছোট বৌ কতকটা ভাঙ্গা কুলার মত হইল। যাহার যাহা ছাই ফেলিবার থাকিত, সেটা তার উপর দিয়াই যাইত। কিন্তু সে ছাই তাহার নির্ম্মল অঙ্গে লাগিত না।

চন্দ্রনাথ আইনের পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইল। মুরুব্বি এবং কেরাণী অগ্রজেরা বলিলেন, "ও যে ভাল পাস হবে, সে ত জানা কথা। কিন্তু ওকালতী করা ওর কর্ম্ম নয়।"

পাস হইয়া চন্দ্রনাথ স্থির করিল, দূরে একটা জেলায় গিয়া ওকালতী করিবে। কলেজে জলপানী পাইয়াছিল, তাহার তিন শো টাকা জমা করিয়াছিল। আরও কিছু টাকার আবশ্যক। চন্দ্রনাথ মনে করিয়াছিল, পিতার নিকট কিছু না চাহিয়া যদি চলে ত ভাল হয়। রাত্রে সে ছোট বৌর সহিত পরামর্শ করিল।

ছোট বৌ বলিল, "সেই কথা ত ঠিক। তুমি বাবার কাছে কেন টাকা চাইবে? তোমার যে টাকা আছে ও আমার যে গহনা আছে, তা বেচে তোমার এক বছর বেশ চল্‌বে। আর যেই যা বলুক, আমি জানি যে, তোমার শীঘ্র রোজগার হবে।"

চন্দ্রনাথ বলিল, "তোমার গহনা বেচ্‌তে হবে না, কিছু দিন বাঁধা রাখলেই বোধ হয় হবে।"

"তা তোমার যেমন ভাল বোধ হয়, তাই কোরো", বলিয়া ছোট বৌ গহনা বাহির করিতে উঠিল।

চন্দ্রনাথ তাহাকে হাত ধরিয়া নিবারণ করিল। বলিল, "এই রাত্রেই ত আর চাইনে। যখন দরকার হবে, তখন চেয়ে নেব।"

ছোট বৌর গহনা লইয়া চন্দ্রনাথ হাজার টাকায় বাঁধা রাখিল। তের শো টাকা হাতে লইয়া সে কর্ম্মক্ষেত্রে যাইবার উদ্যোগ করিল।

যাইবার পূর্ব্বরাত্রে ছোট বৌর কাছে বিদায় লইতে হইল, কারণ, যাইবার দিন তাহার সঙ্গে বেশী কথা কহিবার ত অবকাশ হইবে না! ছোট বৌর ছল ছল চক্ষু, কিন্তু সে স্বামীকে এক মুহূর্ত্তের জন্য নিরুৎসাহ করে নাই। চন্দ্রনাথ দুই হাতের ভিতর তাহার মুখখানি ধরিয়া বলিল, "তোমায় ফেলে যাচ্ছি, এই আমার দুঃখ। এ বাড়ীতে তোমায় ত কেউ আপনার মত করে না। যত দিন না তোমাকে আমি নিয়ে যাব, তত দিন তোমার কষ্ট হবে।"

ছোট বৌ পতিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাহার বুকে মুখ রাখিয়া কহিল, "তোমাকে না দেখে যে কষ্ট, তা ছাড়া, আর আমার কষ্ট কি? বাড়ীতে আমার চেয়ে সকলে বড়, আর সকলের সমান আমি হব কেমন কোরে? তুমি সেখানে গিয়া আমার জন্য ভেব না; তা হ'লে ভাল ক'রে কাজকর্ম্ম কোর্‌তে পার্‌বে না। আমার এখানে কোন কষ্ট হবে না।"

চন্দ্রনাথ বক্ষঃস্থিত মুখ তুলিয়া সেই মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার জন্য ভাবব না? ভাবব ব'লেই আরও বেশী কোরে কাজ কোর্‌ব—যদি কাজ পাই।"

যখন চন্দ্রনাথ দূর বিদেশে চলিয়া গেল, ছোট বৌর সঙ্গে একবার অমনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখা করিয়া গেল। সংক্ষেপে বিদায়ের দুইটা কথা—ছোট বৌ তাও পারিল না—চক্ষের জল সংবরণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বুক ফাটিয়া, চোখ ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইল। সেই অশ্রুসিক্ত নয়ন চুম্বন করিয়া চন্দ্রনাথ চলিয়া গেল।

চন্দ্রনাথ যাইবার পনর দিন পরে এক দিন গৃহিণী কোন আত্মীয়ের বাড়ী যাইবেন। সঙ্গে অবিবাহিতা ছোট কন্যা যাইবে। তাহাকে সাজাইবার জন্য গহনার প্রয়োজন। ছোট বৌর ডাক পড়িল। গৃহিণী বলিলেন, "ছোট বৌমা, তোমার গহনাগুলি দাও ত, ফুলিকে পরিয়ে নিয়ে যাব।" কন্যার নাম ফুলকুমারী।

ছোট বৌর মুখ ম্লান হইয়া গেল। বলিল, "গহনা ত আমার কাছে নেই।"

"সে কি কথা? তুমি বাপের বাড়ী থেকে আস্‌বার সময় ত গহনা নিয়ে এসেছিলে।"

"গহনা উনি নিয়েছেন।"

"তুমি রইলে এখানে আর চন্দ্র তোমার গহনা বিদেশে নিয়ে গেল। এ কি রকম আক্কেল!"

"তিনি নিয়ে যান নি। কিছু টাকার দরকার ছিল, তাই বাঁধা দিয়ে নিয়েছেন।"

"বৌয়ের গহনা বাঁধা রেখে টাকা? এমন বুদ্ধি তার হ'ল কবে? আর দু'জনে পরামর্শ ক'রে এই কাজ করা হয়েছে, আমরা এর বাষ্পবিন্দুও জানি নে।"

এই কথা লইয়া তুমুল কাণ্ড বাধিল। ছোট বৌর কাঁচা মাথা কাটা যাইতে যাইতে রহিল। চন্দ্রনাথের কাছে চিঠি গেল, সে এ কথার কোন উত্তর দিল না।

মাসখানেক পরে চন্দ্রনাথ পিতাকে চিঠি লিখিল। মর্ম্ম এই—"প্রথম মাসে ৭০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি। গহনা বন্ধক রাখিয়া যে টাকা আনিয়াছিলাম, তাহার ৫০০৲ টাকা, সেই টাকা হইতে শোধ করিলাম। ১৫০৲ টাকা রেজেষ্টারী করিয়া আপনাকে পাঠাইতেছি। ৫০৲ টাকা নিজের ব্যয়ের জন্য রাখিলাম।"

কর্ত্তা আসিয়া গৃহিণীকে চিঠি পড়িয়া শুনাইলেন। ১৫০৲ টাকার নোট গৃহিণীর হাতে দিলেন। বলিলেন, "চন্দ্রই আমার ছেলের মত ছেলে। সে আমার মুখোজ্জ্বল কোর্‌বে।"

ছেলের উপার্জ্জিত টাকা হাতে করিয়া গৃহিণীর মন টলিল। ছোট বৌর প্রতি দৃষ্টি প্রসন্ন হইল।

চন্দ্রনাথের সহোদর কেরাণী ও মুরুব্বিমহলেও একটা অন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহারা বলিল, "নতুন জায়গা, তাই প্রথম মাসে কিছু পেয়েছে। এর পর আর কিছু হবে না।"

কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইল। দ্বিতীয় মাসে ছোট বৌর গহনা বন্ধনমুক্ত হইয়া আবার ছোট বৌর হাতে আসিল। কর্ত্তার হাতে আরও দেড় শত টাকা আসিল। তাহা ছাড়া ছোট বৌর নামে কুড়ি টাকার মনি অডার আসিল। চন্দ্রনাথের লজ্জা কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে প্রকাশ্যে কেহ কোন কথা কহিল না। টাকা পাইয়া, অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া ছোট বৌ শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে দিতে গেল। তিনি বলিলেন, "না মা, ও-টাকা তোমায় পাঠিয়েছে, তোমার কাছেই থাক্। তোমারও ত হাতখরচ আছে।"

তিন চার মাস পরেই চন্দ্রনাথ মাতাকে পত্র লিখিল, ছোট বৌকে আনিতে শীঘ্র বাড়ী যাইব। যে চন্দ্রনাথ দিনের বেলা লজ্জায় স্ত্রীর সহিত দেখা করিত না, সে এ রকম চিঠি লেখে! কিন্তু এ কথাও ছোট বৌর সাক্ষাতে কেহ তুলিল না।

চন্দ্রনাথ বাড়ী আসিয়া ছোট বৌকে লইয়া গেল। যাইবার সময় শাশুড়ী, ননদ, জায়েরা সকলে ছোট বৌকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তখন সেই কোমল, সজল নয়ন, আনত আনন, বিমল রূপের ছবি দেখিয়া সকলেই গৃহলক্ষ্মীকে চিনিতে পারিল। শাশুড়ী বলিলেন, "মা, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী। আবার শীঘ্র ঘরে এস।"

জায়েরা বলিলেন, "ভাই, মনে কোরে আমাদের চিঠি দিও।" কম্পিত অধরপল্লবে, অশ্রুপূর্ণলোচনে ছোট বৌ সকলের পদধূলি লইল। পদধূলি মস্তকে করিয়া চলিয়া গেল।

চন্দ্রনাথের ভ্রাতা বলিলেন, "আমরা ত বরাবরই বলিতেছিলাম যে, চন্দ্র একটা মানুষের মত মানুষ হবে! অমন ছেলে আজকাল কয়টা হয়?"

বিদেশে, কিছুদিন পরে ছোট বৌ সেজ বৌর পত্র পাইল। সেজ বৌ লিখিতেছেন, "ভাই, তুমি গিয়ে অবধি তোমার জন্য আমার বড় মন কেমন করে। এ বাড়ীতে আমি যেমন তোমায় ভালবাসি, এমন আর কেউ বাসে না। শুনেচি, তোমাদের দেশে নাকি বড় চমৎকার লেপের ওয়াড় পাওয়া যায়। আমায় দু'খানা শীঘ্র পাঠিয়ে দিও, আমার বড় দরকার।"

পত্র হস্তে ছোট বৌ স্বামীর কাছে গেল। বলিল, "সেজ দিদি দু'খানা লেপের ওয়াড় চেয়েছেন, তাঁকে পাঠিয়ে দিতে হবে।"

"কই, চিঠি দেখি!"

হাসিয়া ছোট বৌ চিঠি হাতে দিল। চন্দ্রনাথ পড়িয়া বলিল, "ভালবাসাতে ত কোন সন্দেহই নেই। অত ভাল না বাস্‌লে, রাত্রের বেলা ভূতের ভয় ব'লে নিজে ছাদে না উঠে তোমাকে পাঠাতে চাইবেন কেন?"

ছোট বৌ একেবারে মুখ ফুটিয়া হাসিয়া উঠিল। "সেই কথা কি চিরকাল মনে কোরে রাখতে হবে না কি?"

চন্দ্রনাথও সরল, উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "মনে কোরে রাখ্‌ব না? মনে আছে ব'লেই সেজ বৌকে দু'টো লেপের ওয়াড় না পাঠিয়ে তিনটে পাঠাব!"

সুরজ কওর

১

পাঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পরেই শিখরাজ্যের পতনের সূচনা হইল। কে কবে কাহাকে হত্যা করে স্থির নাই, চারিদিকে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র, স্ত্রীলোকেরাও তাহাতে যোগ দিত। মহারাজ শের সিংহ সৈন্য পরিবেক্ষণ করিতেছিলেন; তাঁহাকে সেইখানে গুলী করিয়া মারিল। রাজা ধ্যান সিংহ রণজিৎ সিংহের প্রধান মন্ত্রী, তিনি একটা দল বাঁধিতেছিলেন, এমন সময় তিনিও নিহত হইলেন।

ধ্যান সিংহের প্রকাণ্ড হবেলী (বাড়ী) এখনও লাহোরে দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্যান সিংহের ভাই মহারাজ গোলাব সিংহ কাশ্মীরের বর্ত্তমান মহারাজের পিতামহ। সেই হবেলীর পাশে একটা গলিতে এক ঘর শিখ বাস করিত। তাহাদের কথা শিখ-ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ অনেক বড় বড় ঘটনায় তাহারা জড়িত ছিল।

বাড়ীতে বাস করিত হরি সিংহ। হরি সিংহের বয়স সাতাইশ হইবে; খালসা শিখ, মাথার লম্বা চুল কাঠের চিরুণী দিয়া জড়াইয়া রাখা, দাড়ী পাকাইয়া কানে জড়াইয়া বাঁধা। চক্ষু দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ, দীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীর। পাগড়ী ফিকা নীল রংএর, কোমরে তরবারি, পিস্তল। তখন বিনা হাতিয়ারে কেহ বাড়ীর বাহির হইত না।

হরি সিংহ বাড়ী আসে যায়; কখনও একা আসে, কখনও সঙ্গে কেহ থাকে। তখন চারিদিকে রক্তারক্তি; বড় বড় মাথা কখন্ কোন্টা আছে, কখন্ নাই, তাহার কোন স্থিরতা ছিল না; সকলে আপন আপন শত্রু মিত্র লইয়া ব্যস্ত, সকলে আপন আপন প্রাণরক্ষায় যত্নবান্।

২

রাজা ধ্যান সিংহের হবেলীর সম্মুখে রাজপথ। অল্প দূর গিয়া উত্তরমুখে একটা গলি। সেই গলিতে কিছু দূর গিয়া হরি সিংহের বাড়ী। বাড়ী ছোট, কিন্তু খুব উচ্চ, ছাদে উঠিলে সহরের অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়; বিশেষ, রাজা ধ্যান সিংহের প্রাসাদের অন্দরমহলের একটি ঘর দেখিতে পাওয়া যাইত। ঘরের দরজা প্রায় বন্ধ থাকিত; কিন্তু খোলা থাকিলে হরি সিংহের বাড়ীর ছাদের এক প্রান্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত। হরি সিংহের বাড়ীর সদর দরজা প্রায়ই বন্ধ থাকিত। এমন অনেকের থাকিত, কিন্তু হরি সিংহের দরজা খোলা প্রায় কেহই দেখিতে পাইত না। তখন কে কোথায় কি করিতেছে, কেহ জানিতে পাইত না; সহসা এক দিন কোন হত্যাকাণ্ডে সহর শুদ্ধ লোক সশঙ্ক হইয়া উঠিত।

হরি সিংহের বাড়ীর দরজা ঠেলিলে কেহ সহজে সাড়া পাইত না। অনেক ঠেলাঠেলি করিলে, হয় ত, উপরের একটা জানালা খুলিয়া স্ত্রীকণ্ঠে কেহ বলিত যে, বাড়ীতে পুরুষমানুষ কেহ নাই; আবার জানালা বন্ধ হইয়া যাইত। রাজা ধ্যান সিংহের হবেলীর নিকটেই টকসালি দরজা। সহরে প্রবেশ করিবার কয়েকটি দ্বার— তাহার মধ্যে একটি এই। এখন টকসালী দরজা সমভূমি হইয়া গিয়াছে। এক দিন রাত্রি এগারটার সময় এক ব্যক্তি এই দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়া, রাজা ধ্যান সিংহের হবেলী উত্তীর্ণ হইয়া, হরি সিংহের বাড়ীর অভিমুখে গমন করিতেছিল। আকৃতি কিছু খর্ব্ব, মাথায় মস্ত পাগড়ি, শীতকাল বলিয়া একটা মোটা লুই জড়াইয়াছিল, তাহাতে মুখ ভাল দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল না। হরি সিংহের বাড়ীর সম্মুখে গিয়া কয়েকবার এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ধীরে ধীরে দ্বারে করাঘাত করিল। করাঘাতের কিছু কৌশল ছিল। কয়েকবার সেইরূপ আঘাত করাতে দরজার ভিতরেও কে সঙ্কেতসূচক আঘাত করিল। আগন্তুক আবার পূর্ব্বের ন্যায় করাঘাত করাতে দরজা সাবধানে মুক্ত হইল। আগন্তুক মুখের ঢাকা খুলিয়া ফেলিল। প্রদীপহস্তে একটি স্ত্রীলোক দরজার ভিতরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে আগন্তুককে ভাল করিয়া দেখিয়া প্রবেশ করিতে সঙ্কেত করিল। সে ব্যক্তি প্রবেশ করিবামাত্র রমণী আবার দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

রমণীর বয়স হইয়াছে, আকার এবং মুখের ভাব কঠোর। জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কি আছে?"

"তাহা জানি না। হুকুম পাইয়া আসিয়াছি।" এই ব্যক্তি খর্ব্বাকার হইলেও অত্যন্ত বলবান্, বিশাল মুখশ্রী, চক্ষু ক্ষুদ্র কিন্তু বড় তীক্ষ্ণ, মুখের ভাব উগ্র; কটিতে অসি, ছোরা, পিস্তল।

রমণী তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি ঘরে বসিতে বলিল। তাহার পর সে চলিয়া গেল, আগন্তুক একা বসিয়া রহিল।

কিয়ৎকাল পরে হরি সিংহ আসিল। কহিল, "মঙ্গল সিংহ, আর একটা কাজ পড়িয়াছে।"

মঙ্গল সিংহ অল্প হাসিয়া কহিল, "তাহা ত বুঝিতে পারিয়াছি, নহিলে আবার তলব হইবে কেন?"

"কাজটা কিছু শক্ত, তোমাকে দিয়া হইবে কি না ভাবিতেছি।"

মঙ্গল সিংহ মাথা তুলিয়া কিছু রুক্ষভাবে কহিল, "কি এমন কাজ, যাহা আমাকে দিয়া হইবে না?"

হরি সিংহ স্মিতমুখে কহিল, "তোমাকে আমি জানি, তোমার প্রতি আমার কোন সংশয় নাই। এ কাজে এক জন স্ত্রীলোক আমাদের প্রধান শত্রু, তাহার সহিত কৌশলে তুমি পারিবে কি না ভাবিতেছি।"

মঙ্গল সিংহ মাথা নীচু করিয়া, দাড়িতে হাত বুলাইয়া কহিল, "সে কথা মানি। কৌশলে স্ত্রীলোককে কে কবে আঁটিয়া উঠিয়াছে!"

"এ স্ত্রীলোক অত্যন্ত চতুর, তাহাতে তাহার ভয়ের লেশমাত্র নাই। কাজ অত্যন্ত সাবধানে করিতে হইবে। গোল হইলে আমাদের সকলেরই বিপদ, কেহ রক্ষা পাইবে না।"

মঙ্গল সিংহ মৃদু মৃদু বলিল, "বিপদকে কি আমরা ভয় করি? আর এখন কাহার বিপদ নাই? ঘরে বসিয়া একেবারে নির্লিপ্তভাবেও যে থাকে, তাহারও সমূহ বিপদ।"

হরি সিংহের বড় বড় চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, "মঙ্গল সিংহ,—তুমি আমাকে বেশ জান। বিপদের কথা নয়, কার্য্য সিদ্ধ হইবে কি না, তাহাই ভাবিতেছি।"

মঙ্গল সিংহ কহিল, "সেই ত কথা!"

মঙ্গল সিংহ নিজে কোন কথা পাড়িল না, বা জিজ্ঞাসা করিল না,—কোনরূপ কৌতূহল প্রকাশ করিল না। সে হরি সিংহকে চিনিত।

আর কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর দুই জনে উঠিল। মঙ্গল সিংহ চলিয়া গেল, হরি সিংহ দরজা বন্ধ করিয়া উপরে গেল।

৩

উপরে গিয়া হরি সিংহ একটা উজ্জ্বল আলোকশালী লণ্ঠন জ্বালিয়া সেইটা হাতে করিয়া ছাদে উঠিল। ছাদের যে স্থান হইতে রাজা ধ্যান সিংহের অন্দরমহলের একটি ঘর দেখা যাইত, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া লণ্ঠন তুলিয়া কয়েকবার আন্দোলন করিল। সেই সঙ্কেতের উত্তরে রাজা ধ্যান সিংহের হবেলীর সেই দরজা হইতে একটা আলোক দেখা গেল, কিন্তু উহা তৎক্ষণাৎ অপসৃত হইল। হরি সিংহ লণ্ঠন নিবাইয়া নীচে আসিয়া শয়ন করিল।

পরদিবস গভীর রাত্রে হরি সিংহ সশস্ত্র হইয়া সাবধানে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। অনেক গলি-ঘুঁজি ঘুরিয়া একটা ছোট বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে বাড়ী রাজা ধ্যান সিংহের প্রাসাদের ঠিক পশ্চাতে, কিন্তু হরি সিংহ অনেকটা পথ ঘুরিয়া আসিয়াছিল। হরি সিংহ রুদ্ধ দ্বারে তিনবার মৃদু মৃদু করাঘাত করিল। আবার কিছু পরে দুইবার আঘাত করিল। তখন দ্বার ধীরে ধীরে মুক্ত হইল, কিন্তু যে দ্বার খুলিল, সে চকিতের মত সরিয়া গেল। হরি সিংহ দেখিল, দ্বার মুক্ত, কিন্তু দ্বারপথে কেহ দাঁড়াইয়া নাই।

মুক্তপথে সহসা প্রবেশ না করিয়া হরি সিংহ একটু দাঁড়াইল। তখন কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিত না, সকলের প্রাণে ভয়; কারণে হউক, অকারণে হউক, যেখানে সেখানে হত্যাকাণ্ড হইত। হরি সিংহ নির্ভীক হইলেও তাহাকেও একটু বিবেচনা করিতে হইল।

সহসা সেই স্তব্ধ গৃহে রমণীকণ্ঠে হাস্যধ্বনি হইল। অতি মধুর স্বরে কে কহিল, "কোন আশঙ্কা নাই, ভিতরে আইস।"

হরি সিংহ বলিল, "আশঙ্কা নয়, না ডাকিলে অপরিচিত গৃহে প্রবেশ করিব কি না ভাবিতেছিলাম।"

"গৃহ অপরিচিত হউক, তুমি ত অনাহূত নও। ভিতরে আইস।"

হরি সিংহ প্রবেশ করিয়া দুয়ার ভেজাইয়া দিল। সে আর একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই পশ্চাতে দরজা রুদ্ধ হইল। হরি সিংহ অসিমুষ্টি

ধারণ করিয়া আর কিছু দূর গিয়া দেখিল, একটি কক্ষে আলোক জ্বলিতেছে। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, গালিচার উপর চাদর পাতা রহিয়াছে। হরি সিংহ সেইখানে উপবেশন করিল।

যেখানে হরি সিংহ বসিল, তাহার পশ্চাতে একটি দরজা ছিল। অল্পক্ষণ পরেই সেই দরজা অল্প মুক্ত হইল। পূর্ব্বশ্রুত রমণীকণ্ঠে কে কহিল, "তোমাকে কেন ডাকাইয়াছি, জান ?"

হরি সিংহ ফিরিয়া সেই দিকে চাহিল। রমণী দরজার অন্তরালে দাঁড়াইয়া ছিল, শুধু তাহার ঘাঘরা ও মাথার চাদরের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল।

হরি সিংহ বলিল, "তাহা কেমন করিয়া জানিব? আপনি কে, তাহাও আমি জানি না, তবে কোন কঠিন কার্য্য না হইলে আমাকে ডাকিতেন না, এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি।"

অর্দ্ধমুক্ত দরজায় রমণী আর একটু সরিয়া আসিল, তাহার অলঙ্কার-শিঞ্জিতের মৃদুধ্বনি হইল। কহিল, "আমার পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন? যে কর্ম্মে তোমায় নিযুক্ত করিব, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার দিব, আর তোমার কি চাই ?"

হরি সিংহ কিছু গর্ব্বিতভাবে কহিল, যদি আপনি শুনিয়া থাকেন যে, আমি কেবল গুণ্ডাগিরি করি, টাকার লোভে সব করিয়া থাকি, তাহা হইলে সে মিথ্যা কথা। সকল কথা না জানিয়া কোন কর্ম্মে আমি হস্তক্ষেপ করি না। অর্থলোভের জন্য সকল কর্ম্ম স্বীকারও করি না।"

রমণী একটু বিরক্তভাবে কহিল, "তবে তোমাকে দিয়া আমার কর্ম্ম হইবে না।"

"আপনার যেমন অভিরুচি"—বলিয়া হরি সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমণী ব্যস্তভাবে আর একটু অগ্রসর হইল, হাত বাড়াইয়া হরি সিংহকে উঠিতে নিষেধ করিল। হস্তের গঠন, অঙ্গুলি বড় সুন্দর। হরি সিংহ দেখিল, একটি অঙ্গুলিতে হীরার আংটি জ্বলিতেছে।

রমণী কহিল, "তোমার মত পুরুষের এত সহজে ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া উচিত নয়। তোমার কথা সবিশেষ অবগত না হইলে তোমার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতাম না। এ বাড়ীতে আমরা ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি নাই, ইহাতে বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার প্রতি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। যাহা তুমি জানিতে চাও, তাহা আমাকে বলিতেই হইবে; কিন্তু তুমি বুঝিতে পারিবে যে, এই কর্ম্মে আমার যে শুধু প্রাণের শঙ্কা আছে, তা নয়, দুইটি প্রধান প্রধান বংশের অসম্মানের আশঙ্কা আছে। আমার প্রাণ ত তুচ্ছ, কিন্তু যাহাতে বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা হয়,তাহা তোমায় করিতে হইবে।"

রমণী কিছু বেগের সহিত এই কয়টি কথা বলিল। হরি সিংহ আবার উপবেশন করিল; জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি করিতে হইবে ?"

"সুন্দর সিংহকে সরাইতে হইবে।"

হরি সিংহ সহজে বিস্মিত হইবার লোক নয়, কিন্তু সে এই কথা শুনিয়া বিস্ময়ে চমকিয়া উঠিল। যেখানে রমণী দাঁড়াইয়া ছিল, সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, রমণীর অঙ্গুরীমণ্ডিত, চম্পকনিন্দিত অঙ্গুলি দ্বারে লগ্ন রহিয়াছে, হস্তের কাছে মাথার ওড়না একটু চঞ্চল হইয়াছে। হরি সিংহ বিস্ময় গোপন করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"তোমরা জান, সুন্দর সিংহ নির্ম্মল-চরিত্র, মহৎ-স্বভাব, কিন্তু সে যে কি সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতেছে, তাহা বাহিরের কেহ জানে না। তাহার মৃত্যু না হইলে কাহারও মঙ্গল নাই।" কণ্ঠস্বর অতি মৃদু, কিন্তু তাহাতে একটা এমন নির্ম্মমতা যে, হরি সিংহ বুঝিতে পারিল, এ সামান্যা রমণী নয়।

হরি সিংহ কহিল, "সুন্দর সিংহকে লোকে শুধু ভাল বলে না, তাহার যথেষ্ট লোকবল আছে। তাহাকে সরাইবার চেষ্টা বিফল হইবার সম্ভাবনা।"

রমণী তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে কহিল, "রাজা ধ্যান সিংহকে কি লোকে ভাল বলিত না,—তাঁহার লোকবল ছিল না? তাঁহার মত বলশালী লোক কে ছিল?"

হরি সিংহ অনেকক্ষণ মৌনী রহিল। তাহার পর কহিল, "যে কর্ম্মে তুমি আমাকে নিয়োগ করিতেছ, উহা অতি কঠিন, তথাপি তুমি আমার একটা কথা রাখিলে আমি স্বীকৃত আছি।"

অতি মৃদু, অতি মধুর, অতি লঘু হাস্যধ্বনি হইল। রমণী কহিল, "কি কথা?"

"আমি তোমার পরিচয় জানি না, তুমি কেন সুন্দর সিংহের বিরোধী, তাহা জানি না। কিছু না জানিয়া আমি এ কর্ম্ম স্বীকার করিব না।"

"তোমার কি জানিবার আবশ্যক? পুরস্কার

তুমি যাহা চাও পাইবে চাও ত তোমায় আগাম টাকা দিব।"

হরি সিংহ কিছু বেগের সহিত কহিল, "আবার তোমার ভুল হইতেছে, আমি পেশাদার গুণ্ডা কিংবা খুনী নই। তুমি আর কোন লোক দেখ।"

আবার সেইরূপ মৃদু হাস্যধ্বনি হইল। রমণী কহিল, "তুমি বিরক্ত হইও না। কি চাও?"

"তোমাকে একবার দেখিতে চাই।"

"আমাকে দেখিয়া কি হইবে? তাহাতে ত আমার পরিচয় পাইবে না?"

"না পাই,—তোমাকে ত দেখিতে পাইব। তুমি কেমন সুন্দরী দেখিতে চাই।"

"আমি কি সুন্দরী?"

"দেখিলে বুঝিতে পারিব।"

"তবে দেখ,"—বলিয়া রমণী গৃহে প্রবেশ করিল। মাথার ওড়না সরাইয়া ফেলিয়াছিল। অনাবৃত সস্মিত মুখে হরি সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল।

হরি সিংহও চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে সে নিস্পন্দ হইল। অনেকক্ষণ পরে রমণী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দেখা হইয়াছে?"

তখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া হরি সিংহের মোহভঙ্গ হইল; কহিল, "না,—এমন রূপ দেখিয়া ফুরায় না। আমাকে যাহা করিতে বলিবে, আমি স্বীকৃত আছি।"

রমণী কহিল, "তবে আজ যাও, কা'ল এই সময়ে আবার আসিও।"

রমণী মুখে হরি সিংহকে বিদায় দিল বটে, কিন্তু হাসিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হরি সিংহ তাহাকে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। অমনি রমণী পিছাইয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল; কহিল, "শুধু দেখিবার কথা, আমার নিকটে আসিও না। কা'ল আবার দেখা হইবে।"

হরি সিংহ কহিল,—"তোমার নাম কি?"

"নাম বলিলেই ত পরিচয় দেওয়া হইল। তা তোমায় বলিলে ক্ষতি কি! আমার নাম সুরজ কওর!"

হরি সিংহ নির্নিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিল। সুরজ কওর তাহার প্রতি লোল কটাক্ষপাত করিয়া ধীরে ধীরে দ্বার রুদ্ধ করিল।

হরি সিংহ গৃহে ফিরিয়া গেল। শয়নকক্ষে গিয়া মৃদু মৃদু গাহিল,—

অজব সিঙ্গার ময় ডিঠা তেরা জাটি,
জাটি দি সোহনি সুরত লাগ্‌দি মিঠি।

(হে জাট-কন্যে, তোমার অপূর্ব্ব বেশ দেখিলাম জাটকন্যার শোভনরূপ বড় মধুর লাগিল)।

সে রাত্রে হরি সিংহের নিদ্রা হইল না।

লাহোরের পশ্চিমে রাবীর তীরে বিশাল অন্ধকার অরণ্য। সেই অরণ্যের ভিতর দিয়া একটি পথ; সেই পথ দিয়া সকলে স্নান করিতে যাইত। দস্যু ও শ্বাপদের ভয় বলিয়া সে পথে বড় একটা লোক স্নানের সময় ব্যতীত চলিত না। প্রায় কেহই যাইত না।

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। নদীর পারে আর গাছের মাথায় অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। সেই সময় দুই ব্যক্তি আব্‌ছায়ায় একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। এক জন মঙ্গল সিংহ, দ্বিতীয় হরি সিংহের গৃহে যে তাহাকে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল, সেই রমণী।

মঙ্গল সিংহ বলিতেছিল, "প্রেম দেঈ, এমন কি গোপনীয় কথা যে তুমি এমন সময়ে আমাকে ডাকিয়াছ? তোমার কি ভয় নাই?"

প্রেম দেঈর ভ্রূ কুঞ্চিত, চক্ষু ক্রোধে জ্বলিতেছিল, কহিল, "আমার কন্যা চন্দার সহিত হরি সিংহের বিবাহ স্থির করিয়াছি, এমন সময় হরি সিংহ সুরজ কওরের পাল্লায় পড়িল। তাহার কাছে কাহারও নিস্তার নাই! সুরজ কওর আপনার কার্য্যসিদ্ধ করে, তাহার পর যাহাকে সে জন্য নিযুক্ত করে, তাহাকে বিনাশ করে।"

মঙ্গল সিংহ হাত উল্টাইয়া কহিল, "আমি কি করিব? এখন ত রোজ এমন ঘটিতেছে।"

"আমার একটা যদি উপকার হয়?"

"রাজি আছি। কিন্তু যদি আমার বিপদ হয়?"

"যাহাতে না হয়, আমি তাহার উপায় করিব।"

"আমায় কি করিতে হইবে?"

"সুরজ কওরকে সরাইতে হইবে।"

"স্ত্রীহত্যা! আমাকে দিয়া হইবে না।"

"পিশাচী কি স্ত্রী?"

"পিশাচী দেখিতে পাই?"

"তাহা হইলে তোমারও হরি সিংহের দশা হইবে।"

"ক্ষতি কি?"

"তাহাকে দেখিবার আবশ্যক কি? সে পাপীয়সীকে মারিলে আমি তোমাকে দুশো আশ-রফি দিব।"

"আগাম?"

"আগাম একশো, পরে একশো।"

"দাও", বলিয়া মঙ্গল সিংহ হাত পাতিল, প্রেম দেঈ তাহার হাতে তোড়ায় বাঁধা এক শো আশ-রফি দিল।

মঙ্গল সিংহ বলিল, "তাহার সন্ধান পাইব কেমন করিয়া?"

দুই জনে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। রাত্রি হইয়া আসিল। তখন দুই জনে সরে ফিরিয়া গেল।

ইহারা সকলেই অন্ধকারের চক্রে ঘুরিতেছিল। হরি সিংহ যে স্ত্রীলোকের কথা মঙ্গল সিংহকে বলিয়াছিল, সে কি সুরজ কওর না প্রেম দেঈ?— তাহা সে নিজেই জানিত না। কিছু শোনা কথা, কিছু কাল্পত; এই রকম করিয়া তখন নানা ভীষণ ঘটনা ঘটিত। যে অপরকে ধরিবার কল পাতিত, অনেক সময় তাহার নিজের মাথা সেই কলে পড়িত।

রাজা ধ্যান সিংহের মৃত্যুর কারণ সিন্ধিয়ান সর্দ্দার-গণ। তাহারা তিন ভাই অত্যন্ত দুর্দান্ত,—মনে করিয়াছিল, সকল শত্রুকে নাশ করিয়া পঞ্জাব হস্তগত করিবে। নামে না হউক, কাজে রাজা হইবে। অবশেষে তাহাদেরও ধ্বংসপ্রাপ্তি হইল! সে ইতি-হাসের কথা।

সুন্দর সিংহ এই সিন্ধিয়ানদিগের দলের লোক। বয়স অল্প, বড় সুপুরুষ, মধ্যাকৃতি, গড়ন কিছু কৃশ। মুখের মধ্যে চক্ষু বড় সুন্দর। কিন্তু চক্ষু সর্ব্বদা নত করিয়া থাকিত, সকল সময় তাহার চক্ষের সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যাইত না। সুন্দর সিংহ বুদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাশালী বলিয়া তাহার লোক জুটিয়াছিল অনেক, আর নির্দ্দোষচরিত্র বলিয়া লোকে তাহার প্রশংসা করিত। সুন্দর সিংহ বড় একটা কোথাও যাওয়া আসা করিত না, কিন্তু সকলেই জানিত যে, সিন্ধিয়ানদিগের দলে সেই প্রধান ব্যক্তি।

সন্ধ্যার পর সুন্দর সিংহ আপনার ঘরে বসিয়া ছিল। নিকটে আর কেহই ছিল না। একটা ভৃত্য আসিয়া কহিল, "সর্দ্দার সাহেব, একটা স্ত্রীলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চায়।"

"স্ত্রীলোক? এমন সময়?"

"হাঁ হুজুর।"

"কে সে? আর কখন আসিয়াছিল?"

"না। বলিতেছে, বিশেষ কথা আছে, আপনাকে ছাড়া কাহাকেও বলিবে না।"

সুন্দর সিংহ একটু ভাবিল। ভাবিয়া কহিল, "ডাক তাহাকে।"

প্রেম দেঈ আসিয়া সুন্দর সিংহের সম্মুখে দাঁড়াইল। সুন্দর সিংহের চক্ষু নিবিড় কৃষ্ণতার, চক্ষের পাতা ভারি, দৃষ্টির ভাব অলস, চাহনির ভঙ্গী বড় সুন্দর। একবার চাহিয়া চক্ষু নত করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে? আমার সঙ্গে দেখা করিতে চাহিয়াছ কেন?"

"আমি কে, বলিয়া কোন ফল নাই, কারণ, আমাকে তুমি চিনিতে পারিবে না। তোমার বড় বিপদ্, সেই কথা তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।"

সুন্দর সিংহের কোমরে ছোরা ছিল, তাহার মুষ্টি বহুমূল্য পাথর দিয়া বাঁধান। সুন্দর সিংহ তাহাতে হাত রাখিয়া, হাই তুলিয়া কহিল, "বিপদ্ ত এখন সকলের। আমার নূতন বিপদ্ কি?"

"সুরজ কওর তোমাকে হত্যা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছে।"

"সুরজ কওর কে?"

প্রেম দেঈ অত্যন্ত বিস্মিত হইল!

"সুরজ কওরকে কে না জানে? রাজা ধ্যান সিংহের বংশের সহিত তাহার দূর-সম্পর্ক আছে। অত বড় ভয়ানক স্ত্রীলোক পাঞ্জাবে নাই। তুমি তাহাকে জান না, এ কেমন কথা?"

"স্ত্রীলোককে কেমন করিয়া জানিব? আর আমি ত সুরজ কওরের কোন অনিষ্ট করি নাই।"

অঙ্গুলি দিয়া সুন্দর সিংহ ছোরার মুষ্টি নাড়াচাড়া করিতেছিল।

"তুমি সিন্ধিয়ানদের দলে, সুরজ কওর রাজা ধ্যান সিংহের পক্ষে। তোমার প্রতি শত্রুতার আর কি কোন কারণ নাই?"

সুন্দর সিংহ কহিল, "তুমি যে আমাকে সাব-ধান করিয়া দিয়াছ, সে জন্য ধন্যবাদ করিতেছি। আমার দ্বারা যদি কখনও তোমার উপকার হয় ত আমাকে স্মরণ করিও।"

প্রেম দেঈ বিদায় হইল। সে ঘরের বাহিরে গেলে সুন্দর সিংহ এক জন লোককে ডাকিয়া চুপি চুপি কয়েকটা কথা বলিল; সে শুনিয়া বাহিরে গেল।

ঘণ্টাখানেক পরে সে লোকটা ফিরিয়া আসিল। সুন্দর সিংহের সম্মুখে মাথা নোয়াইয়া মৃদু স্বরে কহিল, "হরি সিংহের বাড়ী।"

"আচ্ছা বাত হয়". বলিয়া সুন্দর সিংহ তাহাকে বিদায় করিল। তাহার পর অল্প হাসিল। সুন্দর সিংহের চাহনি সুন্দর, কিন্তু হাসির ভাব বড় নিষ্ঠুর।

৬

যে বাড়ীতে সুরজ কওরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, রাত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ে হরি সিংহ সেখানে উপস্থিত হইল! দ্বারে সেইরূপ আঘাত করাতে দ্বার মুক্ত হইল। হরি সিংহ প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল। সুরজ কওর আলো হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হরি সিংহকে পূর্ব্বদিনের ঘরে বসাইয়া, আলো রাখিয়া সেই দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। এবার আর দরজার আড়ালে গেল না।

হরি সিংহ সুরজ কওরকে দেখিতে লাগিল। সুরজ কওর মাথায় ওড়না দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু মুখে অবগুণ্ঠন ছিল না।

সুরজ কওর কহিল, "সুন্দর সিংহকে কেমন করিয়া সরাইবে স্থির করিয়াছ?"

হরি সিংহ কহিল, "এখনও ঠিক করি নাই। কিন্তু এ কাজে একা কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন। আর এক জন লোকের আবশ্যক।"

"তোমার কোনও লোক নাই?"

"আছে, বেশ বিশ্বাসী লোক। তাহাকেই নিযুক্ত করিব।"

"কত টাকা চাই?"

হরি সিংহ স্থির দৃষ্টিতে সুরজ কওরের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমার কিছু চাই না, সেই লোকটাকে যাহা ইচ্ছা হয় দিও।"

"তোমার কিছু চাই না?"

"চাই। আমি তোমাকে চাই।"

সুরজ কওর হাসিয়া মুখে কাপড় দিল। মধুমাখা স্বরে কহিল, "তাই স্বীকার; কিন্তু পুরস্কারের দাবি কর্ম্মসিদ্ধির পর।"

"কিছু বায়না পাই না?"

"এ সওদায় বায়না নাই।"

হরি সিংহ অগ্রসর হইল, সুরজ কওর পিছাইল। হরি সিংহ তাহার ওড়না ধরিল. সুরজ কওর ওড়না ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, "তোমাকে বিশ্বাস করিয়া আমি একা গৃহে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়াছি। এই কি সে বিশ্বাসের ফল?"

হরি সিংহ আর এগাইল না, আর হাত বাড়াইল না। সতৃষ্ণ নয়নে সুরজ কওরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুরজ কওর ওড়নার অঞ্চল ধরিয়া হরি সিংহের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছিল। সে কটাক্ষে তরল বিদ্যুতের আনাগোনা, সে কটাক্ষে প্রেমের আহ্বান। চক্ষের খেলায় সুরজ কওরের তুল্য আর কেহ ছিল না।

হরি সিংহ যুক্তকরে কহিল, "শুধু দেখিয়া ফিরিয়া যাইব?"

সুরজ কওর আসিয়া হরি সিংহের হস্তধারণ করিল; কহিল, "এই ত দরশ-পরশ হইল! আমি যে কাজ বলিয়াছি, করিয়া আইস, তখন আমার অদেয় আর কিছুই থাকিবে না—

'হীরা ভি দিউঙ্গি মোতি ভি দিউঙ্গি,
দিউঙ্গি গলে কা হার!
যো মাঙ্গো সো দিউঙ্গি'!"

পদ্মকোরকে উপবেশনোন্মুখ ভ্রমর-গুঞ্জনের ন্যায় সুরজ কওর এই গীতখণ্ড আবৃত্তি করিল। আবার তখনই সরিয়া গিয়া হরি সিংহকে যাইতে ইঙ্গিত করিল। হরি সিংহ কহিল, "আবার কবে দেখা হইবে?"

"যখন ইচ্ছা। কার্য্যসিদ্ধি করিয়া আইস।"

হরি সিংহ চলিয়া গেল। সুরজ কওর যখন দ্বার রুদ্ধ করিয়া ফিরিতেছে, তখন দেখিল, একটা দরজায় এক জন বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধার বয়স অনেক, চর্ম্ম লোল, কেবল চক্ষু বড় উজ্জ্বল। সুরজ কওরকে দেখিয়া কহিল, "এখনও তোর আশা মিটিল না? আরও কত চাই?"

সুরজ কওর হাসিল। এবার হাসি মধুর নয়, তীব্র; কহিল, "পতঙ্গ যত পোড়ে, তাহাতে কি শিখা নিবে? পোড়াইয়াই শিখার সুখ!"

রাত্রে সুরজ কওর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল। কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিবে। মাথার ওড়না খুলিয়া, পালঙ্কে রাখিয়া শয্যায় বসিবার

উপক্রম করিতেছে, এমন সময় যেন ঘরের মধ্যে কিসের শব্দ হইল। সুরজ কওর স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল। শব্দ তখনই বন্ধ হইয়া গেল বটে, কিন্তু সুরজ কওরের মনে সংশয় হইল যে, ঘরে কোন মনুষ্য লুক্কায়িত আছে। তখন সুরজ কওর একবার কাসিয়া, হাতের অলঙ্কারের শব্দ করিয়া, মাথার অলঙ্কার খুলিল। তাহার পর মস্তকের বেণী খুলিয়া ফেলিয়া কেশ এলাইয়া দিল। পায়ের নূপুর খুলিয়া রাখিয়া, জামা খুলিয়া, সূক্ষ্ম মলমলের চাদর দিয়া অঙ্গ আবৃত করিল। তাহাতে অঙ্গের রূপলাবণ্য ঢাকা পড়িল না, বরং আরও যেন ফুটিয়া উঠিল। পালঙ্কের এক পাশে একটা বড় আরশী ছিল, সুরজ কওর চিরুণী হাতে করিয়া আরশীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতে লাগিল।

আরশীতে ঘরের অনেকটা প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। সুরজ কওর চুল আঁচড়াইবার সময় অলক্ষ্যে ঘরের কোথায় কি আছে দেখিতেছিল।

ঘরের এক কোণে একটা আলমারির মত ছিল। সেটা কাপড়-চোপড়ে ঢাকা। সুরজ কওর অপাঙ্গে দেখিল, সেইখানে বস্ত্রাদি ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। তাহার পর বস্ত্রের মধ্য দিয়া একটা হাত বাহির হইল; হাতে তীক্ষ্ণধার ছুরী। তাহার পর কাপড়ের ভিতর দিয়া একটা মুখের কিয়দংশ দেখা গেল। গুম্ফশ্মশ্রুমণ্ডিত বৃহৎ মুখ, ক্ষুদ্র চক্ষু জ্বলিতেছে।

সুরজ কওর সমস্ত দেখিল, অথচ তাহার দৃষ্টি আরশীতে নিজের মুখের প্রতিবিম্বের দিকে। চুল আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে চাদর যেন অনবধানতা বশতঃ বক্ষ হইতে অল্প স্রস্ত হইল। আলমারির পাশ হইতে মুখখানা আরও বাহিরে আসিল। যে লুকাইয়া ছিল, সে একদৃষ্টে সুরজ কওরের অনাবৃত রূপ দেখিতে লাগিল।

চকিতের মত সুরজ কওর দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা ভেজান ছিল; একটা দরজা খুলিয়া ধীরভাবে কহিল, "ঘরে কে লুকাইয়া আছ, বাহির হইয়া আইস, নহিলে লোক ডাকিব।"

সুরজ কওর চীৎকার করিল না, পলায়নের চেষ্টা করিল না, ভয়বিচলিত হইল না। সে তেমন রমণীই নয়,—পুরুষ দেখিয়া সে পলায়ন করিতে জানিত না।

মঙ্গল সিংহ ঘরের মাঝখানে আসিয়া জানু পাতিয়া হাত যোড় করিল। হাতের ছোরা ঝন ঝন্ করিয়া পড়িয়া গেল। তাহার মুখ শুষ্ক, সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। কহিল, "আমি অপরাধী, তোমার যেমন ইচ্ছা হয় কর।"

সুরজ কওর দরজা ছাড়িয়া নিশ্চিন্তভাবে মঙ্গল সিংহের নিকটে গিয়া ছুরী উঠাইয়া লইল। দৃষ্টি ছিল মঙ্গল সিংহের মুখের দিকে। সে দৃষ্টিতে রাগের বা ভয়ের লেশমাত্র ছিল না; ছিল অভয়, ছিল আশা, ছিল আকর্ষণ। মঙ্গল সিংহ মূঢ়ের মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সুরজ কওর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

"মঙ্গল সিং।"

"চুরী করিতে আসিয়াছিলে?"

মঙ্গল সিংহ মাথা নাড়িল।

সুরজ কওর অঙ্গুলী দিয়া ছুরীর ধার পরীক্ষা করিতেছিল, কহিল, "আমাকে হত্যা করিতে আসিয়াছিলে?"

মঙ্গল সিংহ মস্তক নত করিয়া কহিল, "হাঁ। এখন তোমার লোকজনকে ডাকিয়া আমাকে বধ করিবার আদেশ দাও।"

সুরজ কওর কহিল, "আমার দিকে চাহিয়া দেখ।" মঙ্গল সিংহ অনুতপ্ত-পিপাসু নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল।

সুরজ কওর বক্ষের কাপড় সরাইয়া ছুরীর অগ্রভাগ বক্ষে বসাইল। কহিল, "এইখানে ছুরী বিদ্ধ করিতে? আমার কি মরিবার বয়স হইয়াছে? তোমার কাছে আমি কি অপরাধ করিয়াছি? আমি অসহায়া স্ত্রীলোক, তুমি বলবান্ পুরুষ, আমাকে মারিলে তোমার কি পৌরুষ বাড়িবে? তাহাতেই যদি তুমি সন্তুষ্ট হও ত এই নাও ছুরী, আমাকে মারিয়া নির্ভয়ে পলায়ন কর, কেহ তোমাকে ধরিবে না।"

সুরজ কওর মঙ্গল সিংহের হাতে ছুরী দিল। মঙ্গল সিংহ ছুরী দূরে ফেলিয়া দিয়া সুরজ কওরের চরণ জড়াইয়া ধরিল; রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "বল, আমাকে মার্জ্জনা করিবে, নচেৎ পা ছাড়িব না।"

সুরজ কওর আপনার পা ছাড়াইয়া লইল। ছাড়াইবার সময় মঙ্গল সিংহের হাতে তাহার হাত ঠেকিল—একটু ঠেকিয়া রহিল, কোমল অঙ্গুলী দ্বারা যেন মঙ্গল সিংহের কঠিন অঙ্গুলী একবার অল্প ঈষৎ চাপিল, ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া লইল। মঙ্গল সিংহের দেহ ও মন আনন্দে অবশ হইল।

এবার সুরজ কওর সরিয়া বেশী দূরে গেল না। দাঁড়াইয়া মঙ্গল সিংহকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, মঙ্গল সিংহ কলের মত উত্তর দিতে লাগিল।

"তোমাকে কে আমাকে হত্যা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল?"

"প্রেম দেঈ।"

"কেন?"

"তাহা জানি না।"

"কত টাকা পাইবার কথা?"

"একশো আশরফি আগাম, একশো আশরফি পরে।"

"এখন কি করিবে?"

"টাকা ফিরাইয়া দিব।"

"ফিরাইয়া দিও না, তাহা হইলে প্রেম দেঈ অন্য লোক দেখিবে অথবা তোমার অনিষ্টচেষ্টা করিবে। তাহাকে বল, এবার সুযোগ হইল না, তুমি অপর সুযোগ পাইলেই আমাকে মারিয়া ফেলিবে।"

মঙ্গল সিংহ চুপ করিয়া রহিল। সুরজ কওর বলিতে লাগিল, "এখন হইতে তুমি আমার কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে। প্রেম দেঈ হইতে আমার কোন আশঙ্কা নাই, সে আমার কি করিবে? তুমি হরি সিংহকে জান?"

"জানি।"

"সে কোন কাজ তোমায় দিয়াছে?"

"একটা কি কাজের জন্য আমাকে ডাকাইয়াছিল, কিন্তু কি কাজ, তাহা জানি না।"

সুরজ কওর একটু হাসিল। কি কাজ, সে জানিত। কহিল, "যখন জানিতে পারিবে, আমাকে আসিয়া বলিয়া যাইও।"

"কেমন করিয়া আসিব?"

"আজ কেমন করিয়া আসিয়াছিলে?"

"আর এক জন প্রবেশপথ ও তোমার ঘর দেখাইয়া দিয়াছিল।"

"এবার আমি নিজে দেখাইয়া দিব, তোমার কোন চিন্তা নাই!"

আলমারি খুলিয়া সুরজ কওর এক মুটা আশরফি মঙ্গল সিংহের হাতে দিতে গেল। সে কোনমতে লইল না। তখন সুরজ কওর কহিল, "এইবার যখন আমার কোন কাজ করিবে, তখন তোমার পুরস্কার দিব।"

মঙ্গল সিংহ কহিল, "তুমি যাহা আদেশ করিবে, করিব, কিন্তু পুরস্কার লইব না। আজিকার কথা কখন ভুলিব না। আজীবন তোমার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব।"

সুরজ কওর দ্বার খুলিল; মঙ্গল সিংহকে সঙ্গে লইয়া গিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। মঙ্গল সিংহ আবার দেখা করিতে চাহিলে কি করিতে হইবে বলিয়া দিল।

লোলায়মান শিখার ন্যায় সুরজ কওরের রূপ পুরুষকে পতঙ্গের মত আকর্ষণ করিত। মঙ্গল সিংহও বহ্নিবিক্ষু হইল।

৮

মোরী দরজার বাহিরে সুন্দর সিংহের একটা বাগানবাড়ী ছিল। কোন কোন দিন রাত্রে সুন্দর সিংহ সেইখানে থাকিত। বাগান-বাড়ীতে সে বিলাসিতা কিংবা প্রমোদের জন্য যাইত না, বিশ্রামের জন্য যাইত। সহরে তাহাকে লোকে নানা প্রকার কাজের ও অকাজের জন্য—অনুগ্রহের জন্য—বিরক্ত করিত।

রাত্রি অধিক হয় নাই। সুন্দর সিংহ আহার করিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঘরে ঢালা বিছানায় বসিয়া ছিল। স্থির মুখের ভাব ও নত চক্ষুতে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

দরজা খুলিয়া এক জন স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিয়া আবার দরজা ভেজাইয়া দিল। মাথার কাপড় খুলিয়া সুন্দর সিংহের সম্মুখে দাঁড়াইল। সুন্দর সিংহ দেখিল, সুরজ কওর।

সুন্দর সিংহ উঠিয়া দাঁড়াইল। সুরজ কওরের দিকে যখন চাহিয়া দেখিল, তখন তাহার দৃষ্টি বড় কঠোর। আবার চক্ষু নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে?"

সুন্দর সিংহের মুখের ও চক্ষের রুষ্ট ভাব দেখিয়া সুরজ কওর অধর দংশন করিল। কথা কহিবার সময় স্মিতমুখে কহিল, "আমাকে সকলেই পথ ছাড়িয়া দেয়, আমার পথ সর্ব্বত্রই মুক্ত।"

"জানি। কিন্তু এমন সময় আমার কাছে কেন? আমার লোকেরা কি মনে করিবে?"

"যাহা করিবার, তাহাই করিবে। তাহাতে আমাদের কি আসিয়া যায়?"

"আমার বিশেষ আসিয়া যায়, সর্দ্দারেরা শুনিলে কি মনে করিবে?"

"তুমি কি তাহাদের ভয় কর?"

"আমি তাহাদের নিমক খাই।"

"তুমি ইচ্ছা করিলে দেশের মালিক হইতে পার।"

"তুমি আমার সহায়তা করিবে ?"

"সে কথা ত তোমাকে বলিয়াছি।"

"তোমার রূপে মুগ্ধ হইয়া তোমার জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত নয়, এমন লোক বোধ হয় নাই। কিন্তু আমি তোমার প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা করিনা, দেশের সর্ব্বনাশ করিতে চাহি না।"

সূরজ কওরের চক্ষে বিদ্যুদগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কম্পিত রুদ্ধ স্বরে কহিল, "আমাকে ঘৃণা করিয়া তোমার কি লাভ হইবে ?"

"না হইতে পারে। তোমার শত্রুতা ভয়ানক জানি। আমাকে হত্যা করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছ, জানি। কিন্তু প্রাণের ভয় থাকিলে আমি এখানে আসিতাম না, প্রাণভয়ে তোমার শরণাপন্ন বা প্রণয়প্রার্থী হইব না।"

সূরজ কওর আবেগের সহিত সুন্দর সিংহের হস্ত ধারণ করিল; কহিল, "এত লোকে আমাকে সুন্দর দেখে, তুমি কি আমাকে সুন্দর দেখ না ? তুমি আমাকে অপমান কর, তাহাতে আমার রাগ হয় না, তুমি আমাকে ভালবাস না, তাহাতে আমার দুঃখ হয় না। তোমার হৃদয় যে পাষাণ, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে স্বীকৃত আছি। নিষ্ঠুর, চিরকাল কি আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে ?"

সুন্দর সিংহ বল প্রকাশ না করিয়া আপনার হস্ত মুক্ত করিল। কহিল, "শুধু লালসার চক্ষে দেখিলে, যেমন অপর লোকে তোমাকে কামনা করে, আমিও সেইরূপ করিতাম। কিন্তু আমি তোমার অতুল রূপ দেখি নাই, তোমার স্বভাব জানি। তোমার দ্বারা অমঙ্গল ছাড়া কাহারও মঙ্গল হইবে না, তোমার রূপের আগুনে পুড়িয়া মরিবার আমার সাধ নাই, এই জন্য আমি দূরে থাকি।"

দরজায় মৃদু আঘাত হইল। সুন্দর সিংহ সূরজ কওরের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। এক জন ভৃত্য ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "সর্দ্দার সাহেব আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

"যাইতেছি," বলিয়া সুন্দর সিংহ সূরজ কওরকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "ইহাকে বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দাও।"

ভৃত্য দরজা খুলিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইল। সূরজ কওর বাহিরে যাইবার সময় অতি মৃদুস্বরে সুন্দর সিংহকে কহিল, "এই শেষ কথা ?"

সুন্দর সিংহ সেইরূপ স্বরে কহিল, "কেমন করিয়া বলিব ?"

সূরজ কওর বাহিরে গেল। সুন্দর সিংহ সিদ্ধিয়ান সর্দ্দারের হাবেলীতে গমন করিল।

৯

সুন্দর সিংহ যখন ফিরিল, তখন রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। সঙ্গে কোন লোক ছিল না। সহরের ফটক হইতে বাহির হইলেই চারিদিকে গাছপালার অন্ধকার। কিছু দূর গিয়া দেখিল, এক জন লোক পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি ?"

যাহাকে তুমি চাও, আমি সেই। আমি সুন্দর সিংহ। তুমি হরি সিংহ।"

"কেমন করিয়া জানিলে ?

"সে কথা বলিতে রাত বাড়িয়া যাইবে। আমি জানি, তুমি সূরজ কওরের গুণ্ডা। আমাকে মারিলে কত টাকা পাইবে ?"

"আমি তোমাকে সম্মুখযুদ্ধে মারিব স্থির করিয়া অন্যায় করিয়াছি। তোমাকে পশুর মত মারিলেই হইত। তোমার বড় স্পর্দ্ধা।"

"কিসে ?"

"তুমি সূরজ কওরের নাম মুখে আন !"

"কথা ঠিক। তাহার নাম মুখে আনিলে পাপ হয়।"

"তোমাকে মারিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া কুকুরকে দিব।"

সুন্দর সিং তরবারির উল্টা দিক দিয়া হরি সিংহের মুখে আঘাত করিল; কহিল, "মুখ আস্ফালন গুণ্ডার কাজ, মরদের নয়। আগে আমাকে মারিবার চেষ্টা কর, তাহার পর অন্য কথা।"

হরি সিংহের তুলনায় সুন্দর সিংহ কিছুই নয়। হরি সিংহ দীর্ঘ বলিষ্ঠ জোয়ান, সুন্দর সিংহ খর্ব্বাকার শীর্ণ পুরুষ। কিন্তু তলোয়ার খেলে হাতের কাজের কৌশলে ও দেহের স্ফূর্ত্তিতে,—অঙ্গের আয়তনে নয়। অল্পক্ষণ অস্ত্রচালনা করিয়া হরি সিংহ বুঝিল যে, সে অস্ত্রবিদ্যায় অসাধারণ কুশলী হইলেও সুন্দর সিংহ তাহার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। হরি সিংহ হটিতে লাগিল।

সুন্দর সিংহ কহিল, "সূরজ কওরের জন্য অনেকে মরিয়াছে, আজ তুমিও মরিবে। কিছু বলিবার আছে ?"

"মুখে নয়," বলিয়া হরি সিংহ প্রচণ্ড বেগে সুন্দর সিংহকে আক্রমণ করিল। সুন্দর সিংহ লম্ফ দিয়া সরিয়া গেল। হরি সিংহ আঘাত করিয়া সম্মুখের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়িল।

উঠিয়া অসি তুলিবার পূর্ব্বেই সুন্দর সিংহ বিচিত্র বেগের সহিত হরি সিংহের প্রসারিত হস্তের নীচে দিয়া আপনার অসি চালনা করিল। অসি হরি সিংহের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল।

"ওয়াহ গুরু কি ফতে!" বলিয়া হরি সিংহ পড়িল। দু একবার কাঁপিয়া স্থির হইল, আর কোন কথা কহিল না।

১০

সূরজ কওরের বাড়ী ফিরিবার সময় পথে হরি সিংহের সহিত দেখা হইয়াছিল; তখন যে কথা হয়, তাহার ফলে হরি সিংহ মরিল।

বাড়ীর কাছে আসিয়া সূরজ কওর দেখিল, মঙ্গল সিংহ দাঁড়াইয়া আছে। মঙ্গল সিংহ কহিল, "তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

"আমার সঙ্গে আইস", বলিয়া সূরজ কওর মঙ্গল সিংহকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। সূরজ কওর আপনার কক্ষে প্রবেশ করিল। মঙ্গল সিংহ তাহার পশ্চাৎ প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

সূরজ কওর জিজ্ঞাসা করিল, "দরজা বন্ধ করিলে কেন?"

"কি জানি, যদি আর কেহ আইসে।" এই বলিয়া মঙ্গল সিংহ সূরজ কওরের হস্ত বলপূর্ব্বক ধারণ করিল। সূরজ কওর দুই একবার চেষ্টা করিয়া হস্ত মুক্ত করিতে পারিল না। কহিল, "এ কি এ?"

"এই আমার পুরস্কার", বলিয়া মঙ্গল সিংহ সূরজ কওরকে আলিঙ্গন করিল।

ক্রুদ্ধা ব্যাঘ্রীর মত সূরজ কওরের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; বলিল, 'মূর্খ, মরিবার ইচ্ছা হইয়াছে?"

"কে আমাকে মারিবে? তুমি আমাকে নিজে ডাকিয়া আনিয়াছ, এখন গোল করিলে কি হইবে?"

সূরজ কওর কহিল, "কাহাকেও ডাকিতে হইবে না, তোমার মৃত্যু তোমাকে ডাকিয়া আনিয়াছে।" সূরজ কওর আপনার বাম হস্ত মঙ্গল সিংহের হস্তের উপর রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দিয়া নিজের বাম হস্ত চাপিল। মুহূর্ত্ত পরে মঙ্গল সিংহ বিকট চীৎকার-রবে সূরজ কওরকে পরিত্যাগ করিয়া বজ্রাহতের মত পতিত হইল। ছট্‌ফট্ করিয়া কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মৃত্যু হইল! সূরজ কওর বাম হস্তের আংটী ঘুরাইয়া দেখিল। আংটীতে তীব্র বিষ ও তাহার ভিতর সূক্ষ্ম সূচী ছিল, কল টিপিয়া সূরজ কওর তাহা বন্ধ করিল। তখন আংটীর উপর এক খণ্ড হীরক জ্বলিতে লাগিল।

সূরজ কওর দরজা খুলিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, সেই বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে বলিল, "ঘরে একটা মৃতদেহ আছে। লোক ডাকিয়া ফেলিয়া দিতে বল।"

বৃদ্ধা বলিল, "আবার?"

সূরজ কওর তাচ্ছীল্যভাবে হাত নাড়িল, কোন কথা কহিল না।

এমন সময় বেগে ছুটিয়া আসিয়া এক ব্যক্তি সূরজ কওরের পৃষ্ঠে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বিদ্ধ করিল। সূরজ কওর কাতরোক্তি করিয়া, ফিরিয়া দেখিল, প্রেম দেঈ! কহিল, "তুমি? তোমাকে আমি হিসাবের মধ্যেই আনি নাই! আমার ভুল হইয়াছিল।"

প্রেম দেঈ বেগে পলায়ন করিল। রক্তে সূরজ কওরের পৃষ্ঠ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, শরীর অবসন্ন হইল, চক্ষে অন্ধকার দেখিল। প্রথমে সূরজ কওর দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার পর ভূতলে বসিয়া পড়িল।

সহসা বাহিরের দরজা মুক্ত হইল, সুন্দর সিংহ প্রবেশ করিল। সূরজ কওরের রক্তাক্ত কলেবর ও ভূতলে শোণিতস্রোত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি? কে এমন করিল?"

সূরজ কওর ক্ষীণ হাসি হাসিল;—কহিল, "প্রেম দেঈ।"

"আমি দেখিলাম, সে ছুটিয়া যাইতেছে।"

"যাইতে দাও। তাহাকে ধরিবার আবশ্যক নাই।"

সুন্দর সিংহ সূরজ কওরের পাশে বসিয়া তাহার হস্ত গ্রহণ করিল। প্রেম ও করুণায় তাহার চক্ষু ভরিয়া আসিয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আঘাত কি অধিক লাগিয়াছে?"

সূরজ কওরের কণ্ঠ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, কহিল, "আমার অধিক বিলম্ব নাই। তুমি একটু ব'স, তোমায় দেখি।"

সুন্দর সিংহ বসিয়া রহিল, সূরজ কওর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাহার চক্ষের জ্যোতিঃ ম্লান হইতে লাগিল। সুন্দর সিংহ মুখ নত করিয়া সূরজ কওরকে চুম্বন করিল। সূরজ কওর চক্ষু মুদ্রিত করিল, তাহার হাত সুন্দর সিংহের হাতে রহিল। ক্ষীণ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সূরজ কওর স্থির হইল।

পতঙ্গদহনকারী দীপ্ত শিখা নির্ব্বাপিত হইল।

দেবরাত ও প্রসেন

১

ভৈমগণ সমুদ্রে অবগাহন করিবার জন্য অবতরণ করিতেছিলেন। যুগ্ম মূর্ত্তি, হাত ধরাধরি করিয়া, দুই দুই বিশালবক্ষ যুবক সিকতায় যাইতেছিলেন। জোড়া জোড়া, দুইয়ের পর দুই। কটি পর্য্যন্ত মুক্ত দেহ, দীর্ঘ দোলায়মান বাহুতে দৃঢ় মাংসপেশী, নির্ম্মল অনিন্দ্য মুখশ্রী, প্রশান্ত আনন। বর্ণ পক্ব-গোধূমের ন্যায়, মস্তকে কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ, কটিতে ধড়া আঁটা। স্বচ্ছন্দ লঘু পদক্ষেপ, সিক্ত সিকতায় পদের অঙ্গুলীচিহ্ন বসিয়া যাইতেছে, গুল্ফের চিহ্ন অস্পষ্ট। পশ্চাতে নবোদিত সূর্য্য, বীরগণের সম্মুখে ছায়া দীর্ঘ হইয়া চলিয়াছে, তাঁহারা জলে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাদের ছায়া জলে পতিত হইতেছে। হাসিতে হাসিতে তাঁহারা ঘোর গম্ভীরনাদী, উচ্ছ্বাসিত, ফেনকিরীটী তরঙ্গভঙ্গসঙ্কুল সাগরপ্রবাহে প্রবেশ করিতেছেন। তাঁহাদের হস্তবিক্ষেপে সলিলরাশি মথিত হইতেছে।

সমুদ্রগর্ভ হইতে কিছু দূরে একটি অনতি-উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ উঠিয়াছে। ভৈমগণ সেই শিখরে আরোহণ করিয়া লম্ফ দিয়া আবার জলে পড়িতে লাগিলেন। একে একে যেমন সলিল হইতে পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলেন, অমনি ঋজু কেশ হইতে মুক্তামালার ন্যায় জলবিন্দু সূর্য্যকিরণে ঝলমলায়মান হইয়া পড়িতে লাগিল, আর্দ্র শরীরে জলব্যায়ামের কারণে শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল, নিশ্বাসের বেগে সাগরতরঙ্গের তুল্য বক্ষে উত্থান-পতন হইতে লাগিল। ক্রীড়ায় বৈচিত্র্য-সম্পাদনের নিমিত্ত এক জন ভৈম আর এক জনকে পর্ব্বত-শিখর হইতে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

বালসূর্য্য ক্রমে তরুণ হইতে লাগিল। ভৈমগণ ক্লান্ত হইয়া তীরে উঠিলেন, এবার আর ছায়া তেমন দীর্ঘ নয়, তাঁহাদের সমুন্নত দেহের অপেক্ষা ক্ষুদ্র। হাসিতে হাসিতে তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

২

কত ভৈমগণের নাম করিব? চিত্রকেতু, সমরথ, প্রসেন, মহস্থান, রণঞ্জয়, কৃতরথ, উদাবসু, দেবরাত ইত্যাদি। ইঁহাদের মধ্যে দেবরাত সকলের অপেক্ষা সুপুরুষ, বয়সও অল্প। দেবরাত ও প্রসেন দূর-সম্বন্ধে ভাই, কিন্তু দুই জনে অভিন্ন-হৃদয়। যেখানে দেবরাত, সেইখানে প্রসেন, দুই জনে সর্ব্বদা একত্রে থাকিতেন। ভৈমগণ ক্ষত্রিয় যুবা পুরুষ, দলবদ্ধ হইয়া মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন। সমুদ্র হইতে কিছু দূরে বিশাল নিবিড় অরণ্য, তাহাতে বহুসংখ্যক শ্বাপদ,—ব্যাঘ্র, ঋক্ষ, বন্য হস্তী নির্ভয়ে বিচরণ করিত। অরণ্যের বাহিরে নির্ঝরের পার্শ্বে শিবির স্থাপন করিয়া ভৈমগণ মৃগয়া করিতেছিলেন। অস্ত্রের মধ্যে ধনুর্ব্বাণ, শল্য ও গদা, কিন্তু কোন হিংস্র জন্তু তাঁহাদিগের নিকট এড়াইতে পারিত না। পদব্রজে তাঁহারা শার্দ্দূল শীকার করিতেন, বৃক্ষের অন্তরাল হইতে হস্তী নিধন করিতেন। কেবল বন্য মহিষের বেলা তাঁহারা সন্তর্পণে থাকিতেন। এক দিন দেবরাত বড় রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি আর প্রসেন আহারের জন্য শূল্যপক্ব করিবার নিমিত্ত, স্থূল মৃগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, আচম্বিতে গুল্মলতা ছিন্ন করিয়া, অর্দ্ধ-চক্রের আকারে বৃহৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট বিপুলকায় মহিষ তাঁহাদের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহাদিগকে ক্ষণকাল দেখিয়া, শৃঙ্গ ও মস্তক নত করিয়া খুরের দ্বারা ধরণীতে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ইহাই আক্রমণ করিবার উপক্রম। শৃঙ্গীকে দেখিয়া দেবরাত অবিলম্বে ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। তিনি হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিলেন, কিন্তু মহিষ কিছু পার্শ্বে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ভল্ল তাহার দক্ষিণ স্কন্ধে বিদ্ধ হইল। কিন্তু যে বাহু হইতে অস্ত্র মুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে অপরিসীম বল, ভল্লের নিশিত মুখ মহিষের মাংসপেশীতে, প্রবিষ্ট হইয়া অস্ত্র তাহার অঙ্গে বিদ্ধ রহিল। মহিষ ফিরিয়া বেগে আবার অরণ্যে প্রবেশ করিল।

দুজনেই আহত শৃঙ্গীর অনুসরণ করিলেন। দেবরাত কহিলেন, "আমি আগে যাইতেছি, তুমি কিছু পরে আইস। দুই জনে একসঙ্গে যাওয়া উচিত নয়।"

প্রসেন কহিলেন, "তাহা জানি, আমি অগ্রসর হইতেছি।"

দেবরাত নিষেধ-সঙ্কেতে প্রসেনের বাহু স্পর্শ করিলেন—স্পর্শ অতি মৃদু, কিন্তু তাহাতে বজ্রকঠিন বলের ইঙ্গিত—কহিলেন, "আমি আঘাত করিয়াছি, অগ্রে আমি যাইব।"

প্রসেন তৎক্ষণাৎ পিছাইয়া পড়িলেন।

বৃক্ষের শাখা ভঙ্গ, লতাউৎপাটন প্রভৃতি শব্দ কিছুক্ষণ শুনিতে পাওয়া গেল, তাহার পর আর কোন শব্দ নাই। দেবরাত ও প্রসেন উভয়ে নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই জনে সতর্ক, দুই জনের হাতে অস্ত্র। দেবরাত কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া দাঁড়ান, প্রসেনও সেইরূপ দাঁড়ান। অনেক দূর এইরূপে গিয়া দেবরাত উৎকর্ণ হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে আহত মহিষ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ক্ষিপ্রকারিতাবশতঃ দেবরাত স্বয়ং রক্ষা পাইলেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরীয় বস্ত্র মহিষের শৃঙ্গে লাগিয়া ছিন্ন হইয়া গেল। দেবরাত লৌহ-গদা ঘুরাইয়া এত বলের সহিত মহিষের পশ্চাদ্দিকের পদে আঘাত করিলেন যে, সেই মহাকায় পশু ধরাতলে পতিত হইল। প্রসেন আসিয়া শল্য দ্বারা তাহাকে নিহত করিলেন।

৩

চিত্রকেতু কহিলেন, "আমরা নিত্য মৃগয়া করিতেছি, চল, এক দিন জনপদ দেখিতে যাই।"

মহত্মান কহিলেন, "জনপদ কোথায়? এই বৃহৎ অরণ্য ও তদপেক্ষা বৃহত্তর বারিধি দেখিতেছি। নিকটে কোথায় লোকনিবাস আছে কি না, জানি না। প্রাতে অরণ্যে প্রবেশ করি, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসি, সমুদ্রের পরিপূর্ণ ছন্দে নিদ্রিত হই। নগরের সংবাদ কোথায় পাইলে?"

চিত্রকেতু কহিলেন, "আমি তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, আমাকে অনেক সংবাদ রাখিতে হয়।"

উদাবসু কহিলেন, "নগরে মোদক পাওয়া যাইবে, আমাদিগকে লইয়া চল। দগ্ধ মাংস আহার করিয়া কত দিন থাকিব?"

কৃতরথ সৃক্কণী লেহন করিয়া কহিলেন, "লোকালয়ে শর্করা-দধিরই বা অভাব কি?"

অমর্ষণ, রণঞ্জয়, দেবরাত সকলে নগরে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আহার করিয়া সকলে বসিয়াছেন, মধ্যস্থলে প্রজ্বলিত অগ্নি। শিবির বেষ্টন করিয়া এইরূপ কিছু দূরে দূরে জলন্ত অগ্নিব্যূহ, সমস্ত রাত্রি এইরূপ জ্বলে, কোন হিংস্র জন্তু সাহস করিয়া শিবিরের নিকট আসিতে পারে না।

অরণ্যে কখন কখন শৃগাল ও ফেরুর রব, তাহার পর শার্দ্দূলের হৃৎকম্পকারী গর্জ্জন। সর্ব্বোপরি দিক্ ও অম্বর পরিপূর্ণ করিয়া সরিৎপতির অক্লিষ্ট অবিচ্ছিন্ন উচ্ছ্বাসধ্বনি, ধরিত্রীর মুক্ত বিশাল বক্ষ হইতে যেন কোন গম্ভীর রহস্যবার্ত্তা কোন আদি ছন্দে নিরন্তর স্তনিত হইয়া আকাশে উঠিতেছে। সমুদ্রের উপরে নক্ষত্রখচিত নিশীথিনীর বিস্তার, নিসর্গের বিশাল উদারতা চারিদিকে ছাইয়া রহিয়াছে।

মৃদুমন্দ নৈশ বায়ুতে আন্দোলিত অগ্নিশিখায় ভৈমদিগের ছায়া ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। ভৈমেরা অস্ত্র নিশিত করিতেছেন, তীরের ফলক ও পুঙ্খ পরীক্ষা করিতেছেন, অন্য সকল অস্ত্র পরিষ্কার করিতেছেন।

চিত্রকেতু কহিলেন, "কল্য মৃগয়ায় না গিয়া আমরা নগরে যাইব।"

শিবির হইতে কয়েক যোজন দূরে সমুদ্র-তটে বরুণায়ন নামে জনপদ। পরদিবস প্রভাতে অরণ্যে প্রবেশ না করিয়া তাঁহারা জনপদের অভিমুখে প্রস্থিত হইলেন। অস্ত্র কেহ ত্যাগ করিলেন না, অন্য দিন যেমন সকল অস্ত্র লইয়া যাইতেন, আজও সেইরূপ। দীর্ঘপদবিক্ষেপে সমগতি হৈহয় বীরেরা গমন করিতে লাগিলেন, প্রতি পদক্ষেপে লৌহকণ্টকবিকীর্ণ গদা-সমূহে ঘণ্টিকা-ধ্বনি হইতে লাগিল, পদে গজচর্ম্মনির্ম্মিত পাদুকা। বেলা ছয় দণ্ড অতীত হইলে তাঁহারা বরুণায়ন নগরে উপনীত হইলেন। নগরের আয়তন বৃহৎ নয়, কিন্তু দেখিলেই বিবেচনা হয়—সমৃদ্ধিশালী। অনেক বণিকের বাস, তাহাদের ধনে নগরের ঋদ্ধি হইয়াছে। কোন কোন সৌধের প্রবেশদ্বার অস্ত্রধারী রক্ষকগণকর্ত্তৃক রক্ষিত, কোথাও দেবায়তন, কোথাও নগরবাসীদিগের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত পুষ্পিত উদ্যান। সেই দ্বাদশ জন পুরুষকে যাহারা পথে দেখিল, তাহারা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল, অনেকে পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। অস্ত্রধারী রক্ষকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখ দেখিতে লাগিল। ইহারা কোন্ দেশবাসী? মিত্রভাবে নগরে প্রবেশ করিয়াছে অথবা শত্রুভাবে? তাহাদের সংখ্যা দেখিয়া শত্রুশঙ্কা দূর হইল, অথচ তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে গেলেও রক্ষক সৈনিক পুরুষদের কিছু মানের লাঘব হয়।

এমন অতিথি, অভ্যাগত, পর্য্যটক কত আসে কত যায়, কে তাহার সংবাদ রাখে? ভৈমদের যেমন চারিদিকে দৃষ্টি ছিল, সেইরূপ রক্ষকগণও তাহাদের চক্ষে পড়িল, রক্ষকগণের অস্ত্রসমূহ লক্ষ্য করিয়া দেখিল। ভৈমদিগের অস্ত্রের তুলনায় রক্ষকদের অস্ত্র ক্ষুদ্র ও লঘু, তাহাদের আকৃতির অপেক্ষা গুম্ফ-শ্মশ্রুর আড়ম্বর অধিক। নগরবাসীদিগের স্নানাহারের সময় অলিন্দ ও গবাক্ষে পুররমণীগণ দাঁড়াইয়া নাই, পথে যাহারা পড়িল, তাহারা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। চিত্রকেতু এবং তাঁহার সঙ্গিগণ নগরে কোথাও বিলম্ব না করিয়া পান্থনিবাসে গমন করিলেন।

আহারাদি করিতে কিছু সময় অতিবাহিত হইল। মৃগয়ার শুষ্ক দগ্ধ সামগ্রী ও নগরের পাক-পরিপাটীর প্রভেদ ভৈমগণ উত্তমরূপে অনুভব করিলেন। যেমন আকৃতি, আহারও তদনুরূপ। কয়েক জনে আহারের আনন্দে নগরের এক জন প্রধান হট্টপতির দধি ও মোদক নিঃশেষ করিলেন। মূল্য দিবার কালে উদারহস্ত গণনা না করিয়াই কয়েক খণ্ড সুবর্ণ বাহির করিয়া দিলেন। মিতব্যয়ী বণিক্‌দিগের নগরে এরূপ ব্যয়শৌণ্ডতা দেখিয়া পান্থশালা ও বিপণির লোকেরা বিবেচনা করিল, ইঁহারা কোন শূরবংশের রাজপুত্র হইবেন। আহারের পর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া তেজস্বী নয়নাভিরাম বীরগণ নগর-পরিদর্শনে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যুগ্মগতি তাঁহাদের অভ্যস্ত, পাশাপাশি দুই জন, তাহার পশ্চাতে দুই জন, আরও পশ্চাতে আর দুই জন। রাজপথের মধ্য দিয়া, কিছুমাত্র ত্বরান্বিত না হইয়া, আন্দোলিত শিথিল-গতিতে বন্ধুগণ গমন করিতে লাগিলেন। রূপ ও শৌর্য্য মূর্ত্তিমান্, অথচ কোথাও পরুষতা নাই। বিশাল কুবলয়-নয়ন চতুর্দ্দিকে ভ্রাম্যমাণ, মুখে হাস্যের বিরাম নাই। অতিথি-আগারে আসিয়া অল্পমূল্যের বিস্তর মুদ্রা ক্রয় করিয়াছিলেন, পথে আতুর-ভিক্ষুককে মুক্তহস্তে দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু পথে লোকে লক্ষ্য করিল যে, তাঁহারা কাহাকেও দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিতেছিলেন না। অপর পথিক যে কেহ হউক, তাঁহাদিগকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিতেছিল, শিবিকা অথবা অশ্ববাহিত রথ হইলেও সরিয়া যাইতেছিল। গবাক্ষে ও সৌধের উপর দাঁড়াইয়া মহিলাগণ তাঁহাদিগকে দেখিতেছিল। দেবরাত ও প্রসেন সকলের পশ্চাতে যাইতেছিলেন। কিছু দূর এইরূপে গিয়া ভৈমগণ দেখিলেন, রাজপথের মধ্যস্থলে এক জন বামন দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দৈর্ঘ্যে সপ্তবর্ষীয় বালক তুল্য, শরীরের পক্ষে মস্তক বৃহৎ, গোলাকার লোহিত চক্ষু, মস্তকে রুক্ষ অকুঞ্চিত কেশ, বাহু আজানুলম্বিত, অঙ্গে হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র। পার্শ্বে লোকেরা দাঁড়াইয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিতেছে ও সে তাহাদিগকে গালি দিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রহার করিবার জন্য হস্তস্থিত দণ্ডকাষ্ঠ উত্তোলন করিতেছে। তাহার সে ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছে না। ভৈমদিগকে দেখিয়া আর সকলে সরিয়া গেল; কিন্তু বামন সরিল না, সমুদ্যত যষ্টি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চিত্রকেতু ও মহস্থান অগ্রে যাইতেছিলেন। চিত্রকেতু হাস্যমুখে বামনকে কহিলেন, "তুমি এরূপ করিয়া পথরোধ করিলে লোকের যাতায়াত বন্ধ হইয়া যাইবে।"

কৌতুক বুঝিতে পারিয়া দর্শকেরা অট্ট হাস্য করিয়া উঠিল। বামন আরক্তলোচনে কহিল, "কে তোমরা যে তোমাদিগকে পথ ছাড়িয়া দিব? তোমরা কি রাজপুত্র না রাজশ্যালক?"

দর্শকগণ করতালি দিয়া হাসিতে লাগিল। এবার হাসির লক্ষ্য ভৈমগণ। তাঁহারাও মুক্তকণ্ঠে হাসিতে লাগিলেন। চিত্রকেতু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "পথে বাধা দেখিলে আমরা অপসারণ করিয়া থাকি, কিন্তু আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তুমি বীর, অতএব তোমাকে কোনরূপ ক্লেশ দিব না!"

এই বলিয়া এক হস্তে বামনকে তুলিয়া লইয়া নিজের স্কন্ধে রক্ষা করিলেন। বামনের দেহ ও তাহার হস্তস্থিত যষ্টি চিত্রকেতুর হস্তের মধ্যে রহিল, সে কোনমতে মুক্ত হইতে না পারিয়া চিত্রকেতুকে গালি দিতে লাগিল। ভৈমগণ যেমন পথে যাইতেছিলেন, সেইরূপ চলিলেন, দর্শকরা তাঁহাদের সঙ্গে হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে চলিল। কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই একটি রমণী চিত্রকেতুর সম্মুখে আসিয়া কহিল, "উহাকে কখন নামাইও না, কখন ছাড়িয়া দিও না।"

চিত্রকেতু কিছু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "কেন? এই ক্ষুদ্র বীর তোমার কে হয়?"

রমণী চীৎকার করিয়া কহিল, "ঐ গর্ভদাসকেই জিজ্ঞাসা কর। আমাকে এরূপ জ্বালাতন করে যে, তাহা বলিবার নয়।"

চিত্রকেতুর স্কন্ধ হইতে বামন চীৎকার করিল, "দেখিস্ দাসীপুত্রী, গৃহে গিয়া যদি সূর্পনখার ন্যায়

তোর নাসাচ্ছেদন না করি, তাহা হইলে আমার নামই নয়।"

দর্শকরা হাসিয়া অস্থির। এক জন কহিল, "উহার নাসায় তোমার হাত পৌঁছিবে কেমন করিয়া?"

রমণী বামনের স্ত্রী। স্বামী যেমন হ্রস্ব, স্ত্রী সেইরূপ দীর্ঘ, তবে এক্ষণে চিত্রকেতুর প্রাসাদে বামন অধোমুখ হইয়া ভার্য্যার প্রতি তর্জ্জন করিতেছিল।

কিছু দূর যাইতে বামনের ক্রোধ উপশম হইল। দুই পদ আন্দোলিত করিয়া যথাসাধ্য উচ্চ স্বরে কহিতে লাগিল, "কেহ গর্দ্দভে আরোহণ করে, কেহ অশ্বে আরোহণ করে, কেহ বা শূদ্র-বাহিত শিবিকায় গমন করে, রাজা গজেন্দ্রপৃষ্ঠে গমন করেন, কিন্তু আমার মত দৈত্যের স্কন্ধে কে আরোহণ করে?"

হাস্যের তরঙ্গে ভৈমগণের পথযাত্রা কঠিন হইল। কিছু কৌতুক কিছু কৃত্রিম কোপের ব্যপদেশে চিত্রকেতু সহসা বামনকে কন্দুকের ন্যায় শূন্যে নিক্ষেপ করিলেন। ভীত হইয়া আর্ত্তস্বরে বামন চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার দণ্ডকাষ্ঠ ভূমিতে পড়িয়া গেল। কয়েকবার এইরূপ করিতে বামন রোদন করিয়া কহিল, "পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর! এই অসুরের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর, নতুবা আমাকে হত্যা করিবে!"

চিত্রকেতু তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভূমিতে নামাইয়া দিয়া তাহার হস্তে দুই খণ্ড সুবর্ণ দিলেন। অমনি বামনের পত্নী আসিয়া সুবর্ণ-খণ্ডদ্বয় বলপূর্ব্বক তাহার হস্ত হইতে গ্রহণ করিল। বামন তাহার সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎকাল ভৈমদিগের পথরোধ হইল। দেবরাত ও প্রসেন পশ্চাতে কিছু দূরে ছিলেন। তাঁহারাও দাঁড়াইলেন। পথের পার্শ্বে বৃহৎ প্রাসাদ। ভৈমেরা প্রাসাদের লৌহদ্বার ও রক্ষকদিগকে অতিক্রম করিয়া আসিতেছিলেন। দেবরাত ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, মুক্ত বাতায়নে তিরস্করণীর পার্শ্বে এক যুবতী রমণী দাঁড়াইয়া কৌতূহলপূর্ণ তরলায়তলোচনে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছে। কেশে কুসুমদাম, কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল, আকাশের ন্যায় নীল বসন, বক্ষে রত্নখচিত কঞ্চুক। দেবরাত দেখিতে পাইলেন। একবার কটাক্ষে কটাক্ষ মিলিল। দেবরাত আবার উন্মুখ হইয়া দেখিবার প্রয়াস করিতেছিলেন।

রমণী তিরস্করণীর অন্তরালে অপসৃত হইল। দেবরাতের সম্মুখে মৃণালসমন্বিত একটি কমল নিপতিত হইল। দেবরাত পুষ্প উঠাইয়া লইলেন।

৪

দেবরাতের মৃগয়ার অনুরাগ শিথিল হইয়া গেল। মৃগয়ার ব্যসনে তাঁহারা এত দূরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বরুণায়ন নগরে প্রবেশ করিয়া অবধি মৃগয়ায় তাঁহার কিছুমাত্র স্পৃহা রহিল না। অথচ যদি তাঁহাকে কেহ সে সময় নিজের নগরে ফিরিয়া যাইতে বলিত, তাহা হইলে তিনি কিছুতেই সম্মত হইতেন না।

দুই এক দিন পরে অপর সকলের সহিত গম্ভীর গহনে প্রবেশ করিয়া দেবরাত আবার তখনই অলক্ষ্যে বাহির হইয়া আসিলেন। শিবিরে ফিরিয়া অশ্ব সজ্জিত করিয়া নগরের মুখে ধাবিত হইলেন। অল্পদূরে গিয়া পশ্চাতে অশ্বের পদশব্দ শ্রবণ করিয়া ফিরিয়া দেখিলেন, প্রসেন অশ্বারোহণে আসিতেছেন। দেবরাত রুষ্ট হইয়া অশ্ব সংযত করিলেন, প্রসেন আসিলে কহিলেন, "তুমি আসিতেছ কেন?"

"একা থাকিলে আশঙ্কা অধিক।"

"হউক, আমি একাই যাইব, তুমি নিবৃত্ত হও।"

"তোমার রক্ষার জন্য আমরা সকলে দায়ী। আমি কাহাকেও কিছু বলি নাই, কিন্তু নিবৃত্ত হইলে আমাকে বলিতে হইবে, তাহা হইলে সকলেই তোমার অনুগামী হইবে।"

"আমি নিজের ইচ্ছায় যাইতেছি, তুমি আমার সঙ্গে কেন?"

"তোমাকে কোথাও যাইতে নিষেধ করি নাই, আমি তোমার সঙ্গেও থাকিব না, কিন্তু প্রয়োজন হইলে তোমার সহায়তা করিব।"

"আমি কোথায় যাইতেছি তুমি জান?"

"জানি। তোমাকে আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না, তোমার আনুকূল্য ব্যতীত তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিব না, কিন্তু তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিও না।"

"তুমি আমার নিষেধ শুনিবে না, কিন্তু আমার পথে যেন কণ্টক হইও না।"

"আমি তোমার পথের কণ্টক নিবারিত করিব।"

দেবরাত আর কোন কথা কহিলেন না।

উভয়ে বেগে অশ্বচালনা করিলেন। নগরদ্বারে উপনীত হইয়া দেবরাত কহিলেন, "অশ্ব এই স্থানে ত্যাগ করিতে হইবে, অশ্বারোহণে নগরে প্রবেশ করিব না।"

সম্মুখে কয়েকটি কুটীরে বৃষলেরা বাস করিত। এক জন যুবককে দেখিয়া প্রসেন তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমরা নগর হইতে যে পর্য্যন্ত ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ আমাদের অশ্ব রক্ষা কর।" কুটীরের নিকটে দুইটি বৃক্ষে অশ্ব বদ্ধ করিয়া প্রসেন বৃষলকে এক খণ্ড স্বর্ণ প্রদান করিয়া কহিলেন, "ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে আরও পুরস্কার দিব।"

বৃষল বাক্‌শূন্য হইয়া সুবর্ণখণ্ড এবং দৈত্যদ্বয়কে দেখিতে লাগিল। দেবরাত ও প্রসেন নগরে প্রবেশ করিলেন। দেবরাত কহিলেন, "তুমি কি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে?"

"না, আমি অনেক পশ্চাতে থাকিব।"

"আমি লীলাকমলের সঙ্কেত অনুসারে আসিয়াছি।"

"উত্তম। যাহাতে তোমার কোনরূপ অশুভ না হয়, আমি তাহাতে যত্নবান্ থাকিব।"

"তোমাকে দেখিলে রমণী গবাক্ষে দাঁড়াইবে না।"

"সে দিনও ত আমি তোমার সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু আজ সে আমাকে দেখিতে পাইবে না।"

প্রসেন পিছাইয়া পড়িলেন। যে প্রাসাদে রমণী বাস করে, তাহার নিকট উপস্থিত হইলে, দেবরাত প্রসেনকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি পশ্চাতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিলেন; প্রসেনের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। দেবরাত পথের দুই পার্শ্বে দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে যাইতেছিলেন। দ্বারের রক্ষকগণ তাঁহাকে দেখিয়া পরস্পরে কহিল, "যাহারা সে দিন আসিয়াছিল, এ ব্যক্তি তাহাদেরই এক জন।" দেবরাত স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহাদিগকে দেখিয়া অগ্রসর হইলেন। যে গবাক্ষে সে দিন সুন্দরীকে দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি। তিনি যেমন নিকটে আসিতে লাগিলেন, গবাক্ষে তিরস্করণী তেমনি চঞ্চল হইতে লাগিল। রক্ষকেরা লক্ষ্য করিতেছে কি না, জানিবার জন্য দেবরাত পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন,—দেখিলেন, প্রসেন রক্ষকদের সহিত এরূপ উৎসাহ ও স্ফূর্তির সহিত কথোপকথন করিতেছেন যে, তাহাদের আর কোন দিকে লক্ষ্য নাই, দেবরাত বুঝিলেন, প্রসেন তাঁহার অনুকূলতা করিতেছেন। গবাক্ষের নীচে উপনীত হইয়া দেবরাত দেখিলেন, রমণী গবাক্ষের সমক্ষে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি যেমন তাহার অভিমুখে চাহিয়া দেখিলেন, রমণীও তাঁহার প্রতি সেইরূপ চাহিয়া দেখিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বস্ত্রের অন্তরালে অদৃশ্য হইল।

দেবরাত দাঁড়াইলেন না, যেরূপ মন্দগতিতে গমন করিতেছিলেন, সেইরূপ চলিলেন। অল্প দূর গিয়াই পথ আর এক দিকে ফিরিয়াছে। পথ ফিরিয়া দেবরাত দেখিলেন, পূর্ব্বদিনের সেই বামন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেবরাতকে দেখিয়া এক চক্ষু টিপিয়া, দন্ত মুক্ত করিয়া, নিঃশব্দে হাসিল। দেবরাত কিছু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আমাকে দেখিয়া হাসিতেছ কেন?"

বামন দেবরাতকে ইঙ্গিত করিয়া একটা ক্ষুদ্র পথে লইয়া গেল। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। তখন বামন বস্ত্রের ভিতর হইতে মুদ্রাঙ্কিত একখানি পত্র বাহির করিয়া দেবরাতের হস্তে দিল। পত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিত, তাহাতে অগুরুর সুগন্ধ। দেবরাত খুলিয়া পড়িলেন—'আপনি ক্ষত্রিয়, আমি ক্ষত্রিয়কন্যা! যদি আর কিছু জানিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সন্ধ্যার পর দেবায়তনে উপস্থিত থাকিবেন।"

কাহারও নাম নাই। দেবরাত বামনকে এক খণ্ড সুবর্ণ দিয়া কহিলেন, "উত্তম কথা। পত্রের কোন উত্তর নাই।"

বামন মস্তক নাড়িয়া, আর একবার চক্ষু টিপিয়া প্রস্থান করিল। দেবরাত অন্যপথে চলিলেন, কিন্তু যে গৃহে রমণী বাস করে, সে দিকে আর গমন করিলেন না। পথে প্রসেনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রসেন কহিলেন, "এইবার চল, শিবিরে ফিরিয়া যাই।"

দেবরাত সকল কথা বলিলেন, প্রসেনকে পত্র দেখাইলেন। প্রসেন কহিলেন, "দেবায়তনে যাইতে হইবে?"

"নহিলে এখানে আসিয়াছি কেন? আমার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছ না?"

"পারিতেছি। চল, দেবায়তনের সন্ধান করা যাউক।"

দেবায়তন কোথায় জানিয়া, দুই বন্ধু নগরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, রাজপথে আলোক জ্বলিল, রাজমার্গে রাজবল্লভ পুরুষেরা ও অপর লোকেরা বিচরণ করিতে লাগিল। দেবরাত ও প্রসেন দেবায়তনে প্রবেশ করিলেন।

সেখানে বহু লোকসমাগম। চারিদিকে উদ্যান, মধ্যে মধ্যে ঘনচ্ছায় প্রাচীন ন্যগ্রোধ বৃক্ষ। দেবরাত অগ্রে, প্রসেন কিছু দূর পশ্চাতে। দেবরাত চারিদিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সেই জনতামধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবায়তনের পশ্চাদ্দিকে ক্ষুদ্র দ্বার, দেবরাত সেই স্থানে উপনীত হইতেই দ্বারদেশ হইতে একটি রমণী অগ্রসর হইয়া অতি লঘুস্বরে দেবরাতের কর্ণে কহিল, "আমার সঙ্গে আসুন।"

রমণী সেই দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল, দেবরাত তাহার পশ্চাতে। কোন কথা না কহিয়া দ্রুত লঘু গতিতে রমণী পথ দেখাইয়া চলিল। সম্মুখে বৃহৎ বটবৃক্ষ, তাহার তলায় অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আর একটি রমণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেবরাতের সঙ্গিনী দেবরাতকে সেই স্থানে লইয়া গিয়া সরিয়া গেল। যেখানে বৃক্ষের ছায়া প্রায় শেষ হইয়াছে, সেখানে রমণী কণ্টকিতশরীরে সভয়ে দেখিল, এক জন দীর্ঘকায় পুরুষ প্রস্তরের মূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রমণীর কণ্ঠ শুষ্ক হইল, নিশ্বাসপতনের ন্যায় মৃদুস্বরে কহিল, "আপনি কে?"

সেইরূপ স্বরে পুরুষ কহিল, "তুমি কে?"

রমণী নিরুত্তর। পুরুষ তাহার হস্ত ধারণ করিল। রমণী একবার হস্ত মোচন করিবার চেষ্টা করিল, সে চেষ্টা বৃথা। চীৎকার করিতে তাহার সাহস হইল না। পুরুষ তাহার কর্ণে কহিল, "ভয় নাই, আমি শত্রু নহি। যে পুরুষকে তুমি পথ দেখাইয়া আনিলে, তিনি আমার পরম বন্ধু। তাঁহার কোন বিপদ না হয়, সেই জন্য আমি সঙ্গে আসিয়াছি। তুমি কাহার সঙ্গে আসিয়াছ?"

"আমার প্রাণতুল্য প্রিয় সখী চিত্রলেখার।"

"তোমার নাম কি?"

"মদনিকা।"

"তোমার করস্পর্শেই তোমার নামের সার্থকতা অনুভব করিতেছি।"

"এখন কি বিদ্রূপের সময়?"

"বিপদের সময়ও ত আমার মনে হইতেছে না। দেখিলে ত, রূপবান্ পুরুষ রূপসীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াই থাকে, আমরা না হয় পরস্পরকে না দেখিয়াই মুগ্ধ হই, এবং তোমার সখী ও আমার সখা যেরূপ সম্ভাষণ করিতেছেন, আমরাও সেইরূপ করি। পরিচয় বা শুধু এক পক্ষের হয় কেন? আমার সখার নাম দেবরাত, আমার নাম প্রসেন।"

দেবায়তনে মৃদঙ্গধ্বনি হইল। বামাকণ্ঠে মৃদুস্বরে শব্দ হইল, মদনিকে!

প্রসেন মদনিকার হস্ত মুক্ত করিলেন। সে গিয়া দেবরাত ও চিত্রলেখাকে সঙ্গে লইয়া আসিল, দেবরাত কহিলেন, "প্রসেন, তোমার কথা আমি চিত্রলেখাকে বলিয়াছি।"

প্রসেন কহিল, "আমিও তোমার কথা মদনিকাকে বলিয়াছি। মদনিকা আমার সঙ্গে যাইতে চায়!"

মদনিকা কহিল, "মিথ্যা কথা! আমি কখন তোমার মুখ পর্য্যন্ত দেখি নাই

প্রসেন কহিলেন, "সে ক্ষোভ তোমার এখনি মিটিবে। রাজমার্গে চল।"

দেবরাত ও প্রসেন প্রথমে বাহিরে আসিলেন। চিত্রলেখা ও মদনিকা আবার দেবায়তনে প্রবেশ করিয়া ঘুরিয়া আসিলেন। দেবায়তনদ্বারে কয়েক জন রক্ষক দাঁড়াইয়া ছিল। দেবরাত ও প্রসেন আর এক দিকে নিকটেই দাঁড়াইলেন। চিত্রলেখা ও মদনিকা বাহিরে আসিতেই দেখা হইল। চিত্রলেখার মুখে লজ্জার রক্তবর্ণ, মদনিকা প্রসেনের দিকে চাহিয়া রহিল।

গৃহে ফিরিয়া চিত্রলেখা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মদনিকে, প্রসেন যাহা বলিলেন, তাহা কি সত্য?"

মদনিকা মস্তক নত করিল।

৫

শিবিরে ফিরিবার পথে দেবরাত প্রসেনকে সকল কথা বলিলেন। চিত্রলেখার পিতা-মাতা নাই, মাতুলের গৃহে থাকেন। মাতুল ধনী, কিন্তু অর্থলুব্ধ, অর্থের লোভে এক জন বৃদ্ধের সহিত ভাগিনেয়ীর বিবাহ ধার্য্য করিয়াছেন। এক পক্ষের মধ্যে বিবাহ হইবে। চিত্রলেখা দেবরাতকে দেখিয়া মুক্তি ও বন্ধন উভয় আশা করিয়াছিলেন। দেবরাত স্বীকৃত হইয়াছিলেন। আজ কৃষ্ণা দশমী। ত্রয়োদশী-রাত্রে দেবায়তনে বহু লোকের সমাগম হইবে। সেই রাত্রে চিত্রলেখাকে হরণ করিতে হইবে।

প্রসেন কহিলেন, "এ কথা আর সকলকে বলিতে হইবে, সকলে মিলিত হইয়া চিত্রলেখাকে উদ্ধার করিতে হইবে।"

দেবরাত কহিলেন, "শিবিরে গিয়া বলিব। চিত্রলেখার সঙ্গে কি মদনিকা যাইবে?"

"তাহাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই।

তাহাদের দুই জনে বড় প্রীতি, চিত্রলেখার সঙ্গে মদনিকা না আসিলে তাহার প্রতি উৎপীড়ন হইতে পারে।"

"তোমার সহিত কোন কথা হইয়াছিল?"

"সে আমাকে দেখিয়া প্রথমে শঙ্কিতা হইয়াছিল, স্পষ্ট কোন কথা হয় নাই। চিত্রলেখার সহিত তোমার কোন কথা হয় নাই?"

"না, সংক্ষেপে কেবল তাহার নিজের কথা হইতেছিল।"

"চিত্রলেখা ও মদনিকা দুই জনকে হরণ করিতে হইবে।"

"যদি মদনিকা যাইতে স্বীকার না করে?"

"তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা যাইবে।"

আর সকলে শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া দেবরাত ও প্রসেনকে দেখিতে না পাইয়া নানারূপ কল্পনা করিতেছিলেন। দুই বন্ধু ফিরিয়া আসিলে দেবরাতের নিয়োগমত প্রসেন সকল কথা বলিলেন। ভৈমেরা আনন্দে দেবরাতের নানারূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দুষ্মন্তের সহিত দেবরাতের তুলনা হইল। ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কর্ম্ম হইয়াছে! রুক্মিণী-সুভদ্রার হরণ হইয়াছিল, ইহা ত কিছুই নয়।

কৃতরথ, উদাবসু, অমর্ষণ, মহস্বান, চিত্রকেতু, রণঞ্জয় সকলে আস্ফালন করিতে লাগিলেন। রক্ষকরা কি করিবে? এক সহস্র সৈনিক থাকিলেও কোন চিন্তা নাই। রমণীকে যুদ্ধভয় হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

ত্রয়োদশীর প্রভাতে শিবিরভঙ্গ হইল। অপরাহ্ণে ভৈমগণ বণিকের বেশে নগরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অশ্বের বেগ সংযত, ফিরিবার কালে বেগের প্রয়োজন হইবে। সন্ধ্যার পর নগরে প্রবেশ করিয়া দেবায়তন হইতে কিছু দূরে একটা অন্ধকার স্থানে সকলে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। এক জন অশ্বের নিকটে রহিলেন আর সকলে দেবায়তনের সম্মুখে জনতার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবরাত ও প্রসেন একে একে দেবায়তনের মধ্যে গমন করিলেন।

অর্দ্ধ দণ্ড পরে চিত্রলেখা ও মদনিকা দেবায়তনে প্রবেশ করিলেন, রক্ষকরা বাহিরে রহিল। দুই জনে দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে দেবরাত ও প্রসেনকে দেখিতে পাইলেন। চিত্রলেখা ও মদনিকা যেমন একটা স্তম্ভের অন্তরালে আসিলেন, অমনি দেবরাত চিত্রলেখার পার্শ্বে আসিয়া কহিলেন, "এইবার বাহিরে চল। সব প্রস্তুত!"

দুই সখী দেবায়তনের বাহিরে আসিলেন, পশ্চাতে দেবরাত ও প্রসেন। চিত্রলেখা ও মদনিকাকে দেখিয়া রক্ষকেরা কিছু বিস্মিত হইল। কারণ, তাহারা মনে করিয়াছিল, তাঁহারা দেবায়তনে কয়েক দণ্ড অতিবাহিত করিবেন। দেবরাত চিত্রলেখাকে ও প্রসেন মদনিকাকে চকিতের ন্যায় তুলিয়া লইয়া বেগে ধাবমান হইলেন। রক্ষকরা চীৎকার করিয়া তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ভৈমগণ অস্ত্রহস্তে তাহাদের পথরোধ করিলেন। দেবরাত ও প্রসেন অশ্বসমূহের নিকট উপনীত হইয়া চিত্রলেখা ও মদনিকাকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া লম্ফ দিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আরোহণ করিলেন, চিত্রলেখা দেবরাতের ও মদনিকা প্রসেনের কটি ধারণ করিলেন। কেহ কোন কথা কহিল না। দুই অশ্ব বেগে ধাবিত হইল। রাজমার্গে অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া পথিকেরা পথ ছাড়িয়া দিল। নগরদ্বার অতিক্রান্ত হইয়া মুক্ত প্রান্তরে অশ্বারোহিদ্বয় দুই সখীকে লইয়া ধাবিত হইলেন।

মদনিকা প্রসেনের কর্ণের নিকট মুখ রাখিয়া কহিল, "আমাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছ কেন?"

প্রসেন কহিলেন, "এমন অপরাধ আমি করিব না। অশ্ব সংযত করিতেছি, তুমি অবতরণ করিয়া নগরে ফিরিয়া যাও।"

মদনিকা হাসিয়া কহিল, "সখীকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইব?"

রক্ষকগণ ভৈমদিগের নিকট শীঘ্র পরাস্ত হইল। ভৈমগণ অশ্বে আরোহণ করিয়া সবেগে দেবরাত ও প্রসেনের অনুসরণ করিলেন। রক্ষকগণ গিয়া সংবাদ দিতে, অপর সৈনিক সংগ্রহ করিয়া ভৈমদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইতে বিলম্ব হইল। পথেও মধ্যে মধ্যে অশ্বখুরের চিহ্ন দেখিয়া লইতে সময় লাগিল। দেবরাত ও প্রসেন ক্রমে অশ্বের বেগ শিথিল করিলে অপর ভৈমগণ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। অশ্বের ভার লাঘব করিবার জন্য দেবরাত ও প্রসেন অবতরণ করিয়া এক হস্তে বল্গা ও অপর হস্তে চিত্রলেখার ও মদনিকার হস্ত কিংবা কটি ধারণ করিয়া অশ্বের পার্শ্বে দৌড়িতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্লান্ত হইলে আর দুই জন তাঁহাদের পরিবর্ত্তে অশ্বের পার্শ্ব গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা অশ্বে আরোহণ করিলেন। এইরূপে

সকলে পালা করিয়া চলিলেন। অশ্ব সমূহকেও অধিক ক্লান্ত করিলেন না, মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিতে দিয়া সকলেই কিছু দূর পদব্রজে গমন করিতেছিলেন। এইরূপে রাত্রি অতিবাহিত হইল। প্রভাতে সকলে তাঁহাদের বাসস্থান ভোজ-নগরে প্রবেশ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে নগরে সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়া গেল। অনেক দিন এরূপ ঘটনা শ্রুত হয় নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এরূপ বিবাহ প্রশস্ত ও গৌরবের বিষয়। ক্ষত্রিয়েরা স্ত্রী ও পুরুষে দলে দলে দেবরাত ও প্রসেনের গৃহে গিয়া চিত্রলেখা ও মদনিকাকে দেখিলেন। দুই জনেই সুন্দরী, দুই জনেই প্রফুল্লমুখী।

নিভৃতে প্রসেন মদনিকাকে কহিলেন, "আমি তোমাকে না দেখিয়াই হরণ করিয়াছি। আমাকে দেখিলে তুমি আমার সঙ্গে আসিতে?"

মদনিকা গূঢ় মৃদু হাসিয়া কহিল, "কি জানি?"

পর্ব্বতবাসিনী

(দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

পর্ব্বতবাসিনী

আভাস

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। পর্ব্বতশ্রেণীর উপত্যকাপথে দুই জন পথিক। এক জন বিদেশী, দেশপর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন, আর এক জন সেই প্রদেশবাসী, যৎকিঞ্চিৎ অর্থলাভের আশায় তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে।

পর্ব্বতের উপরে সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্ত উভয়ই সুন্দর। শৃঙ্গের উপর শৃঙ্গ, অভ্রভেদী চূড়া সমূহ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। কোথাও পর্ব্বতশিখরে মেঘ জড়াইয়া উঠিতেছে। কোথাও পর্ব্বতঝরণার অবিশ্রাম ঝর ঝর শব্দ। সেই বিজন প্রদেশে পর্ব্বতের গুহায় গুহায় সেই মৃদুমধুর শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া অতি গম্ভীর, ধীর গর্জ্জন করিতেছে। উপত্যকাপার্শ্বে একটা বিশাল শৃঙ্গ পথিকের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; ললাটে ভ্রূকুটী, যেন মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে। কদাচিৎ একটা বৃহৎ শিলাখণ্ড বজ্রনাদে খসিয়া পড়িতেছে; শৃঙ্গে শৃঙ্গে, শিখরে শিখরে, আহত প্রত্যাহত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর রবে গড়াইয়া পড়িতেছে। পথিক চমকিত, ভীত হইতেছে। চারিদিকে প্রতিধ্বনি; এই মস্তকের উপরে, এই দক্ষিণে, এই উত্তরে, ঐ দূরদিগন্তে পুনঃ পুনঃ সেই বজ্রনিনাদ।

এ দিকে সূর্য্য ডুবিতেছে। এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গের পশ্চাতে লুকাইতেছে। পর্ব্বতশিখরে অস্তগামী সূর্য্যের তরল কনকপ্রবাহ, তাহার ভিতরে হরিদ্বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতা-গুল্ম। সেইখানে মেঘ বিচরণ করিতেছে। কখন হরিণ, কখন বাঘ, কখন রাজা, কখন ভিখারী, নানাবেশ ধারণ করিতেছে। কখন অর্ণবযানের আকারে সেই স্বর্ণসাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। পথিক মোহিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

সূর্য্য অস্ত গেল। আকাশের প্রান্তভাগ ক্রমে ক্রমে ধূসরবর্ণ হইয়া আসিল, কেবল মধ্যভাগ গাঢ় নীল রহিল। তখন পথপ্রদর্শক পথিককে ইঙ্গিত করিয়া দেখাইল, ঐ দেখুন।

পথিক নির্দ্দিষ্ট পথে চাহিয়া দেখিলেন। অনেক দূরে তুঙ্গ শৃঙ্গশ্রেণী দাঁড়াইয়া আর একটা শিখর উঠিয়াছে। পথ নিতান্ত বন্ধুর, মনুষ্যের অগম্য। গিরিশৃঙ্গ আকাশভেদী, দেখিতে গেলে দৃষ্টি চলে না। মেঘমালা একবার অন্ধকার করিয়া জড়াইয়া ধরিতেছে, আবার ঘুরিয়া চলিয়া যাইতেছে, আবার জড়াইতেছে। পথিক অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

পর্ব্বতবাসী জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু দেখিতে পাইতেছেন?"

পথিক উত্তর করিলেন, "না।"

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু দেখিতে পাইতেছেন? মনুষ্যমূর্ত্তি, রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন কি? বস্ত্রাঞ্চল অথবা হস্তের আন্দোলন, কিংবা বিলম্বিত কেশ, কিছু দেখিতে পাইতেছেন কি? আবার ভাল করিয়া দেখুন।"

পথিক পুনরপি অতি ব্যগ্রভাবে চাহিয়া দেখিলেন। অনেকক্ষণ চাহিয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে চক্ষু ভরিয়া আসিল। পরিশেষে ভ্রমক্রমেই হউক অথবা যথার্থই হউক, তাঁহার বোধ হইল, যেন সেই নক্ষত্রস্পর্শী পর্ব্বতশিখরে মুক্তকেশী রমণী দাঁড়াইয়া আছে। পবনে তাহার বসনাঞ্চল উড়িতেছে।

পথিক ফিরিয়া সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি?"

পর্ব্বতবাসী চারিদিকে চাহিয়া নমিতস্বরে কহিল, "ও তারা বাই। আমরা গল্প শুনিয়াছি, সে ঐ পাহাড়ে বাস করিত। অদ্যাবধি তাহার প্রেতাত্মা পর্ব্বতশিখরে বিচরণ করে। আপনি স্বচক্ষে দেখিলেন।"

এই বলিয়া সে পথ দেখাইয়া পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে লাগিল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রভাত হইয়াছে। পর্ব্বতের উপরে প্রভাত। আকাশ বেশ পরিষ্কার, বড় কোমল, সেই কোমল আকাশের গায়ে কঠিন গিরিশৃঙ্গের ছায়া। বড় পাহাড়ের উপরে ছোট ছোট গাছ, কদাচিৎ দুই একটা বড় গাছ। বৃক্ষপত্র কম্পিত করিয়া প্রভাত-পবন বহিল। পাখীগুলি গাছের ডালে বসিয়া পাখা ঝাড়িতেছিল, একে একে তাহারা আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল, আবার গাছে বসিয়া পালক ফুলাইয়া প্রভাত-সঙ্গীত ধরিল। নির্ঝরিণী বাঁকিয়া বাঁকিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া, সারারাত্রি ছুটিতে-ছিল—অন্ধকারে, আবার প্রভাতের আলোক পাইল। কাল পাথরে জল আছাড়িয়া পড়িয়া সাদা ঢেউ, সাদা ফেন তুলিল, সমীরণ আসিয়া তরঙ্গদল তাড়িত করিল, জল আর একটু দ্রুত ছুটিল, তরঙ্গ আর একটু উঁচু হইল, আঘাত-প্রতি-ঘাতের বেগ আর একটু বাড়িল। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যোদয় হইল। প্রথমে পূর্ব্বদিকের নীলবর্ণ উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ, তার পরে ঈষৎ লাল, দেখিতে দেখিতে ঘোর লাল, সাদা সাদা দুই একখান বিরল মেঘ-খণ্ড ঘোর লাল, গাছের মাথা, পাতার উপরে শিশির-বিন্দু, জলের ঢেউ, ঢেউয়ের ফেনা, সব লাল। শেষে পর্ব্বতের অন্তরালে তপন উদিত হইল। মাতার স্কন্ধে উঠিয়া, জননীর নিবিড় কৃষ্ণ কেশ-গুচ্ছের মধ্য হইতে বালক যেমন হর্ষোৎফুল্ললোচনে চাহিয়া থাকে, উন্নত পাষাণস্তূপের পশ্চাতে সূর্য্য সেইরূপ উদিত হইল। নির্ঝরিণীর জলকণা বৃক্ষ-পত্রে শিশিরবিন্দু প্রতিক্ষিপ্ত সূর্য্যকিরণে ঝলমল করিতে লাগিল। অধিত্যকা, উপত্যকা সানু-প্রদেশ, দ্রোণি, সমুদয় আলোকিত হইল। পর্ব্বত-পাদমূল হইতে গাভীগণ তৃণশষ্পের আশায় গোক্ষুরচিহ্নিত পথে দ্রুতগতি পর্ব্বত আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল, কোথাও বা পিচ্ছিল জানিয়া সাবধানে উঠিতে লাগিল। পথিপার্শ্বে কোথাও একটা শৃগাল শয়ন করিয়া ছিল, গোশৃঙ্গ দেখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। বৃক্ষশাখা ত্যাগ করিয়া বিহঙ্গমকুল আহারান্বেষণে লোকা-লয়ে চলিল, কতকগুলা উপত্যকায় গিয়া কীটের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

পর্ব্বততল হইতে কিছু দূরে একটি বিস্তৃত দেব-খাত। হ্রদ হইতে আর কিছু অন্তরে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। গিরিশ্রেণীর নাম সাতপুরা, গ্রামের নাম সেতারা। মহারাষ্ট্রীয় দেশে সেতারা অতি বৃহৎ নগরীর নাম, সে নগর স্বতন্ত্র।

গ্রীষ্মকাল। প্রভাতসমীরণসঞ্চালিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা হ্রদের কূলে মৃদু মৃদু আঘাত করিতেছিল। গ্রামবাসীরা একে একে স্নান করিতেছে। বালকের দল ক্রীড়া করিতে আসিল। সুশীতল বায়ু সেবনে স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়া তাহারা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। এক জন কেবল তাহাদের খেলায় যোগ দিল না, দূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতে লাগিল। দুই একটি বালক খেলা ছাড়িয়া কিছু বিস্ময়ের সহিত তাহাকে দেখিতে লাগিল। ভাল করিয়া দেখিতে গেলে বিস্ময়ের সম্ভাবনাই উদ্রেক হয়। বালকের বেশে পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা! স্ত্রীলোকের বেশে যুবতী বলিতে হয়, কিন্তু পুরুষের বেশে বালিকা। রমণীস্বভাব-শোভন লজ্জা বালিকার কিছুমাত্র ছিল না। পুরুষের বেশ, দীর্ঘায়ত সবল শরীর, বিশাল বিস্ফা-রিত চক্ষের দৃষ্টি স্থির, গর্ব্বিত; নিবিড় কৃষ্ণতারা, নয়নে তীব্রজ্যোতি, ওষ্ঠাধর ঈষন্মুক্ত, গর্ব্বস্ফুরিত; সরল উন্নত নাসিকা, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত। দীর্ঘ, কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশ রুক্ষ, অবেণীবদ্ধ, মুক্ত,—স্কন্ধে, বুকে, পৃষ্ঠে ঝুলিতেছে। শরীর স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক, শারী-রিক সুস্থতাজনিত প্রফুল্লতা মুখে লক্ষিত হইতেছে। দেহ এখনও যৌবনের পূর্ণায়তন প্রাপ্ত হয় নাই।

বালিকা দাঁড়াইয়া বালকদিগের খেলা দেখিতে-ছিল, তাহার পরে চক্ষু ফিরাইয়া পর্ব্বতশিখরে নবীন রৌদ্রের শোভা দেখিতে লাগিল। কিছু-ক্ষণ পরে ক্লান্ত দৃষ্টি শীতল জলের দিকে ফিরিয়া তরঙ্গসমূহের উত্থানপতন দেখিতে লাগিল। এই অবসরে দ্বাদশবর্ষীয় একটি বালক সমধিক কুতূহল-পরবশ হইয়া বালিকার নিকটে আসিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়াছিল। বালিকা একটু পরেই মুখ ফিরাইয়া বালককে দেখিতে পাইল, তখন একটু হাসিয়া জলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কি পদ্মফুল?"

বহুদূরে সেই বিস্তৃত জলরাশির গর্ভে তরঙ্গের বক্ষপরে বিকসিত রক্তোৎপল প্রভাতসমীরণ ও তরঙ্গের তাড়নে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া হেলিতে দুলিতেছিল, এক একবার জলে নিমজ্জিত হইতেছিল।

বালক একবার বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, "হাঁ।"

বালিকা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এমন ফুল

কেউ তোলে না কেন? তুলিতে কি বারণ আছে? তোমরা কেন তোল না?"

বলিতে বলিতে বালিকার নয়নপ্রান্তে একটু হাসির রেখা দেখা দিল, মাথা নাড়িয়া কথা কহিতে এক গুচ্ছ কেশ তাহার চক্ষের উপর আসিয়া পড়িল, বিরক্তভাবে কেশগুচ্ছ হাত দিয়া সরাইয়া ফেলিল।

বালক বলিল, "এক এক দিন আমরা ভেলা বাঁধিয়া ফুল তুলি। সব দিন ভেলা বাঁধা হয় না, সকলে বারণ করে। সব দিন ফুল তোলাও হয় না। আমার ভেলায় চড়িতে ভয় করে। এক দিন আর একটু হইলে আমি ডুবিয়া গিয়াছিলাম।"

বালিকা এইবার ভাল করিয়া বালকের দিকে মুখ ফিরাইল, কহিল, "এতটা সাঁতার দিয়ে কি কেউ যেতে পারে না যে, ভেলা বাঁধিতে হয়? এতটা সাঁতার দেওয়া কি বড় শক্ত?"

বালকের হাসি পাইল, ভয়ও বোধ হইল, বলিল, "দুই এক জন পারে। কিন্তু তাহারা আমাদের গাঁয়ে থাকে না। আর কেউ এতখানি সাঁতার দিতে পারে না।"

বালিকার চক্ষু আর একটু চঞ্চল, মুখ আর একটু রাঙ্গা হইল, বলিল, "কেন? আমি এখনই তুলিতে যাইব। এইটুকু সাঁতার দেওয়া কি এমনি একটা মস্ত কাজ না কি?" এই বলিয়া বালিকা জলের দিকে অগ্রসর হইল।

বালক আর দাঁড়াইল না। উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া তাহার সঙ্গীদিগকে সংবাদ দিল। তাহারা আসিয়া বালিকাকে ঘিরিল। স্নানকারীরা এ সংবাদ পাইয়া বালিকাকে নিষেধ করিতে আসিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিল, "পুরুষের মত কাপড় পরণে এ মেয়েটা কে? এ ত আমাদের গ্রামের মেয়ে নয়।" এক জন বলিল, "আমি উহাকে চিনি। ও রঘুজীর কন্যা, তাহার একমাত্র সন্তান। মামার বাড়ী না কোথায় থাকিত, কাল বাপের সঙ্গে গ্রামে আসিয়াছে। আসিয়াই এই কাণ্ড! কি পাহাড়ে মেয়ে বাপ! বাপের মেয়ে বটে!" আর এক জন বলিল, "ডুবে মরে মরুক না, আমাদের তাতে কি?" এক জন যুবক সকলের পশ্চাতে আসিতেছিল, সে বলিল, "ও যে তারা!"

সকলে মিলিয়া বালিকাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কেহ ভৎর্সনা করিতে লাগিল, কেহ বুঝাইতে আরম্ভ করিল, কেহ চুপ করিয়া রহিল। বালিকা কিছুই উত্তর করে না, কেবল মুখ টিপিয়া একটু একটু হাসে, আর মাঝে মাঝে এক একবার জলের দিকে একটু অগ্রসর হয়। বালিকা কাহারও কথা শুনে না দেখিয়া এক জন কহিল, "আমি গিয়ে রঘুজীকে ডাকিয়া আনিতেছি, তোমরা সে পর্য্যন্ত উহাকে ধরিয়া রাখ। বাপের কাছে উচিত শাস্তি পাইবে।" বালিকা তবু শোনে না, জলের দিকেই যায়। এমন সময়ে যে যুবক কহিয়াছিল, ও যে তারা, সে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারার পরিচিত এই এক ব্যক্তি, সে আসিয়াই তারাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিল, "তারা, তুই কি পাগল হয়েছিস না কি? তোর কি প্রাণ এতই ভারি হয়েছে যে, এই জলে সে বোঝা নামাতে এসেছিস্?"

তারা মাথা নাড়িল। সেই কুঞ্চিত কৃষ্ণকেশগুচ্ছ তাহার চক্ষের উপর আসিয়া পড়িল। তারার এ বিপদ সর্ব্বদাই ঘটিত। কেশগুচ্ছ সরাইয়া তারা হাসিয়া উঠিল। সে হাসি সরল বালিকার! হাসিয়া কহিল, "এতে পাগলামি কি দেখলে? আমি ফুল তুলিয়া আনিতেছি, তোমরা দেখ। চেষ্টা করিলে সকলেই পারে।" এই বলিয়া দ্রুতপদে বালুকাসৈকতে অবতরণ করিতে লাগিল।

যুবক ধাবিত হইয়া তাহার হস্ত ধরিল, বলিল, "তুই কি কথা বুঝিবি না? এ সব কি মেয়েমানুষের কাজ? যে সাহস পুরুষের শোভা পায়, সে সাহসে মেয়েমানুষের কাজ কি?"

বালিকা ফিরিয়া দাঁড়াইল। অতি বেগে আপনার হস্ত মুক্ত করিল। এখন আর বালিকার আকৃতি নহে, এখন গর্ব্বিতা যুবতী। ধীর, মুক্ত স্বরে কহিল, "আমার কাজ নয়, তোমার কাজ ত? তুমি ত পুরুষ, তবে ফুল তুলিয়া আন না কেন?"

আসন্ন ঝটিকার অব্যবহিত পূর্ব্বে আকাশ আরও শান্ত হইল। চুলের আড়ালে চক্ষুযুগল বড় উজ্জ্বলরূপে জ্বলিতেছিল। তারার মুখের উপর কেশগুচ্ছ আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এবার আর সরান হইল না।

যুবক কোন উত্তর করিল না, এক পদ পশ্চাতে সরিল।

ঝড় বহিল। বালিকা অতি উচ্চৈর্হাস্য করিয়া কহিল, "পুরুষ যেমন, সাহস তেমন! নহিলে কি পুরুষে সাহসের পথে বাধা দেয়? তুমি যাও, গিয়ে ভেলা বাঁধ গে। দেখো যেন বাঁধন শক্ত হয়। তার পর ফুল তুলিও।"

যুবকের বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ হইবে। তারার সহিত তাহার এক দিনের পরিচয় মাত্র। শম্ভুজী তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার আচরণে তাহাকে নিতান্ত মূঢ়া বালিকা স্থির করিয়াছিল। যে ব্যাঘ্রীর কোমল করতল দেখিয়া তাহার সহিত খেলা করিতেছিল, এতক্ষণ নখর দেখিতে পায় নাই। এইবার তাহার হস্তে নখ বিদ্ধ হইল।

বালিকার কাছে এরূপ অপমানিত হইয়া শম্ভুজী একটা কিছু কঠোর উত্তর দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে কে বলিল, "আর গোলে কাজ নাই। ঐ রঘুজী আসিতেছে।"

সকলে সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল। দীর্ঘ যষ্টি হস্তে এক জন লোক গ্রাম হইতে হ্রদের দিকে আসিতেছিল। আকৃতি ঈষৎ খর্ব্ব, কিন্তু সেই বিশাল বক্ষ, দীর্ঘ, স্থূল, কঠিন বাহু অসুরবলের পরিচায়ক, ভ্রূযুগল মিলিত, অন্ধকার; ক্ষুদ্র, উজ্জ্বল, কোটরনিবিষ্ট চক্ষু; ওষ্ঠাধর স্থূল, কর্কশ; শ্মশ্রু কঠিন, কুঞ্চিত, নিবিড়; কেশ অর্দ্ধপলিত, অর্দ্ধ তাম্রবর্ণ, অযত্নে জটাবদ্ধ হইয়াছে। পথিক একাকী পথ চলিতে সে মূর্ত্তি দেখিলে, অর্থনাশ, প্রাণনাশের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়। পিতা কন্যাকে একত্র দেখিলে মনে হয় যেন কঠিন শিলাসম্ভূতা অমৃতসলিলা নির্ঝরিণী দেখিলাম।

রঘুজীকে আসিতে দেখিয়া সকলে একটু সম্ভ্রমের সহিত সরিয়া দাঁড়াইল। রঘুজী দেখিল, সকলে মিলিয়া তাহার কন্যাকে ঘিরিয়াছে। সে তারাকে চিনিত। মিলিত ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া, ললাট অন্ধকার করিয়া, কর্কশ, ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

এক জন বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া উত্তর করিল, "তোমার কন্যা বড় দুরন্ত! সে সাঁতারিয়া ঐ ফুল তুলিতে চাহে। আমরা এত করিয়া বারণ করিলাম, কিছুতে শোনে না। তুমি আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে। এমন অসমসাহসিক কাজে কি এই বালিকার প্রবৃত্ত হওয়া উচিত?"

রঘুজী একবার সেই ইতস্ততঃ অন্দোলিত ফুল্ল কমল দেখিল, আর একবার তাহার কন্যার দিকে কটাক্ষ করিল। তখন তাহার অধরপ্রান্ত ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই ফুল্ তুলতে পারিবি?"

তারার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, "আমি না পারি, ডুবিয়া মরিব, সেও স্বীকার, কিন্তু আমি ফুল তুলিতে যাইব। আমি কি কখন এতটা সাঁতার দিই নাই?"

রঘুজীর ললাট একটু পরিষ্কার হইল, কহিল, "তবে যা!"

এই আদেশ শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। প্রথম বক্তা কহিল, "রঘুজী, তুমিও কি পাগল হইলে না কি? তোমার আর কেহ নাই, এই একটি সন্তান। তাহারও মরণের উপায় নিজে করিয়া দিতেছ? এতটা সাঁতার দিয়া কি ফিরিয়া আসিতে পারিবে? নিশ্চিত ডুবিবে।"

রঘুজীর ললাট কুঞ্চিত হইয়া ফুলিয়া উঠিল। চক্ষুর্দ্বয় আরও ক্ষুদ্র হইয়া আরও উজ্জ্বল হইল। হস্তস্থিত যষ্টি বাম কক্ষে রাখিয়া, প্রসারিত বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করিয়া, বিপুল বৃষগ্রীবা উত্তোলন করিয়া, তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট স্বরে কহিল, "যাহা অপরের অসাধ্য, তাহা আমার অসাধ্য নহে। যাহা অপরের পুত্রের অসাধ্য, তাহা আমার কন্যার পক্ষেও অসাধ্য নহে। আমার শোণিতে, আমার বংশে বল আছে। তারা আপনার ইচ্ছায় যাইতেছে, আমি তাহাকে যাইতে বলি নাই। আপনার প্রাণের ভয়ে বা আপনার সন্তানের ভয়ে রঘুজী কখন সাহসের পথে বাধা দিয়াছে, এ কথা আজ পর্য্যন্ত কেহ বলে নাই। কেহ কখন বলিবে না

সকলে চমৎকৃত হইল। সকলে নিরুত্তরে রহিল

রঘুজীর কন্যাও শম্ভুজীকে এই কথা বলিয়াছিল।

তারা একেবারে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা অস্ফুট পুলকের স্বরে মৃদু মৃদু তাহার চরণ চুম্বন করিতে লাগিল। উন্নত শরীর আরও উন্নত করিয়া তারা কটির বসন আরও আঁটিয়া বাঁধিল, তৎপরে অতিবেগে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক জলে পড়িল। অম্বুরাশি ঘোরকোলাহলে বিদারিত হইয়া ফেনময় উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া কূলে আহত হইল। সে ফেন, সে তরঙ্গ আবার ধীরে ধীরে মিশাইয়া গেল।

অনেক দূর গিয়া বালিকা ভাসিয়া উঠিল। তখন একবার মাথা নাড়িয়া, হংসীর মত দ্রুত সন্তরণ করিয়া চলিল। কুঞ্চিত, কৃষ্ণ, দীর্ঘ কেশভার সলিলসংস্পর্শে ঋজু হইয়া, তরঙ্গের মৃদু মৃদু আন্দোলনে উঠিতে পড়িতে লাগিল। বালিকা

অবলীলাক্রমে দ্রুত সন্তরণ করিয়া চলিল। একবার কূলের দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

কূলে দাঁড়াইয়া সকলেই দেখিতেছিল। বালক খেলা ভুলিয়া, বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে প্রভাততপনালোকিত স্বর্ণশ্যাম জলে সেই অনাবৃত শ্বেত বাহুযুগলের অবিশ্রাম সঞ্চালন আর সেই কৃষ্ণ কেশরাশির আন্দোলন দেখিতেছিল। স্নানকারী আর্দ্রবসনে তাহাই দেখিতেছিল, বস্ত্র তাহার অঙ্গেই শুকাইতেছিল। এক এক জন এক একবার রঘুজীর প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছিল।

রঘুজীর নিকটে আর কেহ ছিল না, সে একাই দাঁড়াইয়া ছিল। দক্ষিণ হস্তে যষ্টির মধ্যভাগ ধারণ করিয়া, বামমুষ্টির মধ্যে যষ্টির অগ্রভাগ রাখিয়া, মুষ্টির উপরে চিবুক রাখিয়া, একদৃষ্টে সন্তরণমানা বালিকার প্রতি চাহিয়া ছিল। ললাট, ভ্রূ অতি ঘনকুঞ্চিত, চক্ষের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ। সে চক্ষে স্নেহের লেশমাত্র ছিল না।

তারা সাঁতারিয়া অনেক দূর গেল। অবশেষে ফুলের কাছে গেল। একবার হাত বাড়াইয়া আবার হাত টানিয়া লইল,—হাতে বুঝি কাঁটা ফুটিল! আবার হাত বাড়াইল, এবারে ফুল ছিঁড়িল। ছিঁড়িয়া, সনাল, উৎফুল্ল, প্রস্ফুটিত রক্তপদ্ম দক্ষিণ হস্তে তুলিয়া ধরিল। তীরাস্থিত দর্শকবৃন্দের মধ্যে বিস্ময়ের অস্ফুট ধ্বনি উঠিল, আবার সকলে ভাবিল, ফিরিয়া আসিতে পারিবে কি?

তারা ফুল ছিঁড়িল দেখিয়া রঘুজী আর দাঁড়াইল না, ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেল। গমনকালে তাহার অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাসির চিহ্ন লক্ষিত হইতেছিল, আবার একটু পরে সে ললাটে চিরপরিচিত অন্ধকার ফিরিয়া আসিল।

বোধ হয়, এই রঘুজীর অপত্যস্নেহ! চলিয়া গেল, বালিকা ডুবিবে কি বাঁচিবে, একবার ভাবিল না! বালিকা মরিলে তাহার হত্যা কাহাকে লাগিবে?

ফুল ছিঁড়িয়া বালিকা কূলের অভিমুখে ফিরিল।

এবার সে অন্ধকার কেশরাশি দেখা গেল না, কেবল সেই বহুদূরবর্ত্তী, দুনিরীক্ষ্য, সুন্দর মুখমণ্ডলের উপর লোহিত তপনকিরণে জলবিন্দু মিশিয়া ঝলমল করিতে লাগিল। সন্তরণের তরে হস্তদ্বয় মুক্ত রাখিবার জন্য পদ্মমৃণাল দন্তে ধারণ করিল,—রাঙ্গামুখে রাঙ্গাফুল ফুটিল, কমলে কমল মিলিল!

তারা পাছে ডুবিয়া মরে, কি উপায়ে তাহাকে রক্ষা করা যাইতে পারে, কূলে দাঁড়াইয়া অনেকে সেই পরামর্শ করিতেছিল। ইহাদের মধ্যে শম্ভুজী প্রধান। তারাকে ফিরিতে দেখিয়া সে কহিল, "যখন দেখিব, তারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাহাকে ধরিয়া ডাঙ্গায় লইয়া আসিব।" এই বলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

তাহার দেখাদেখি আরও পাঁচ সাত জন জলে পড়িল।

শম্ভুজী সকলের আগে আগে সাঁতার দিয়া চলিল। আর সকলে তাহার অনুবর্ত্তী হইল। অনেক দূরে গিয়া শম্ভুজী দেখিল, কমলমুখে জলদেবীর মত বালিকা চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু মুখ পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু হীনজ্যোতি, হস্তদ্বয় কষ্টে সঞ্চালিত হইতেছে। শম্ভুজী সাঁতারিয়া তাহার পাশে গেল, কহিল, "তারা, ধন্য তোর বল! কিন্তু আর ত তুই পারিবি না। এখন না ধরিলে ডুবিয়া যাইবি। আয় আমার হাতের উপর ভর দে, আমি তোকে কিনারায় লইয়া যাইতেছি।"

তারার চক্ষু পূর্ব্বের মত জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু আবার তখনি নিভিয়া গেল। মুখের ফুল হাতে করিয়া কহিল—সে স্বর পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণতর, কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ—"তুমি আমায় বাঁচাইবে? লোকে বলিবে, শম্ভুজী তারাকে রক্ষা করিয়াছে। আমি মরিলেও তোমার হাত ধরিব না, তোমাকে ছুঁইব না। তুমি আমাকে ধরিলেই ডুবিব। তুমিও মরিবে। আমার নিকটে আসিও না, সরিয়া যাও।"

শম্ভুজী সরিয়া গেল। তারার পানে চাহিয়া দেখিল, এ এক নূতন রূপ। সে রূপ তাহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া রহিল। দেখিল, মলিন মুখ, তবুও ভিতরে অনল জ্বলিতেছে। দেখিল, অতি স্বচ্ছ, শীতল, জ্যোতিহীন নয়নযুগলের মধ্যে প্রজ্বলিত, তরল বিদ্যুদ্বহ্নি জ্বলিতেছে। সে জ্বলন্ত শিখা দেখিয়া শম্ভুজী পতঙ্গের সদৃশ অনিবার্য্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হইল।

শম্ভুজী সরিয়া গেল বটে, কিন্তু একেবারে ফিরিয়া আসিল না! মগ্নমান ব্যক্তি তৃণ পাইলেও তাহা অবলম্বন করে, তারা প্রাণের দায়ে কি শম্ভুজীর হাত ধরিবে না?

আর কেহ তারার নিকটে যাইতে সাহস করিল না।

তারা অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে কূলের নিকট আসিল। হাত-পা অবশ হইয়া পড়িল, আর চলে না, একবার ভাবিল, ডাঙ্গায় আসিয়া বুঝি ডুবিলাম। যন্ত্রণায় চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। এমন সময়ে পায়ে মাটী ঠেকিল। তারা দাঁড়াইতে পারে না, চক্ষে অন্ধকার দেখিল, কর্ণরন্ধ্রে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ শুনিল, তাহার পরে আর কিছু শুনিল না, কিছু দেখিল না। বালিকা চেতনা হারাইল।

সে কিনারায় আসিয়াছিল। অর্দ্ধ অঙ্গ বালুকায় প্রোথিত হইল। কটি পর্য্যন্ত জলে নিমজ্জিত রহিল। দৃঢ়নিমীলিত চক্ষে, মুখে, আর্দ্র-কেশে বালুকা প্রবিয়া গেল। আবিল, বালুকাময় তরঙ্গ বক্ষে লাগিল, আর একটা ঢেউ আসিয়া সে বালুকা ধৌত করিয়া লইয়া গেল। বদনবিচ্যুত রক্তসরোজিনী জলে ভাসিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রঘুজী গৃহে ফিরিয়া গেল। তাহার বাটীতে এক জন ভৃত্য ও এক দাসী। ভৃত্যের নাম মহাদেব, দাসীর নাম কেহ জানে না, সকলে তাহাকে মায়ী বলিয়া ডাকে। রঘুজী তাহাদিগকে বলিল, "তারা বুঝি ডুবিয়া মরে, তোরা দেখিতে চাস্ ত যা।"

মহাদেব বৃদ্ধ, মায়ী বর্ষীয়সী। দুইজনেই রঘুজীর কথা শুনিয়া একেবারে হ্রদের দিকে ছুটিল। ওঠে কি পড়ে, সে জ্ঞান নাই।

তারা রঘুজীর কন্যা। রঘুজী কন্যাকে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া নিশ্চিন্তে ফিরিয়া আসিল। এক ভৃত্য আর এক দাসী, তাহারা তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে ছুটিল।

তাহারা দুজনে এত দৌড়িল কেন? তাহারা তারাকে মানুষ করিয়াছিল।

তারা অশৈশব মাতৃহারা।

ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে মায়ী কহিল, "হায়, কোন্ দিন মেয়েটা অপঘাতে মারা যাবে, আর আমি দেখিতে পাব না। এমন বাপের ঘরেও জন্মেছিল!"

বলিতে বলিতে বুড়ী কাঁদিয়া ফেলিল। মহাদেব কহিল, "এখন চুপ কর, মেয়েটা মরিল কি বাঁচিয়া আছে দেখ, তার পর না হয় কাঁদিও!"

দুজনে হাঁপাইতে হাঁপাইতে গিয়া দেখিল, তারা কিনারায় উঠিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মায়ী জানু পাতিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।

ফুলটি ভাসিয়া যায় দেখিয়া একটি বালক সেটি তুলিয়া মায়ীর হাতে দিল।

শম্ভুজী জল হইতে উঠিয়া আসিয়া মায়ীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। আবার সকলে মিলিয়া মূর্চ্ছিতা বালিকাকে ঘিরিল।

মায়ী তাহার মুদ্রিত চক্ষে হাত বুলাইয়া মহাদেবকে কহিল, "এ যে অজ্ঞান হইয়াছে। ইহাকে বাড়ী লইয়া যাইব কেমন করিয়া?"

মহাদেব বলিয়া উঠিল, "কেন, আমি লইয়া যাইব। তাহাকে আমি বুকে-পিঠে করিয়া মানুষ করিলাম, আর তাহাকে এইটুকু লইয়া যাইতে পারিব না? তারা যে সে দিন পর্য্যন্ত আমার কাঁধে উঠিত।"

মায়ী। তবে আর বিলম্ব করিও না। ঘরে লইয়া চল।

শম্ভুজী পাশ হইতে মহাদেবকে বলিল, "আমি লইয়া যাইতেছি। আমি তোমার অপেক্ষা সবল আছি।"

মহাদেব হস্ত দ্বারা নিষেধ করিল। তাহার পর তারাকে দুই হাতে ধরিয়া তুলিল। তারার মস্তক মহাদেবের স্কন্ধে ঝুলিয়া পড়িল। লম্বিত কেশের মধ্যে বালুকাকণার উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। মায়ী মহাদেবের পশ্চাৎ চলিল।

শম্ভুজী ভাবিতেছিল, লজ্জার উপর লজ্জা পাইতেছি. পদে পদে অপ্রতিভ হইতেছি। না জানি, কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম।

রঘুজী গৃহে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেতারা অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। সেই গ্রামে রঘুজীর নিবাস। তাহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র। রঘুজী যৌবনকালেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। পুত্রের দুর্বৃত্ত চরিত্র দেখিয়া তাহার পিতা অকালেই কালমুখে পতিত হইলেন। রঘুজীর শৈশবাবস্থায়ই তাহার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। গ্রামে রঘুজীর কোন আত্মীয়-স্বজন ছিল না।

দস্যু হইবার পূর্ব্বে রঘুজী বিবাহ করিয়াছিল। সে বিবাহের একটিমাত্র ফল - তারা।

অনেক দিন পরে রঘুজী অকস্মাৎ গ্রামে ফিরিয়া আসিল। বসতবাটী ভগ্ন, পতিতাবস্থায় প্রায় সমভূমি হইয়া গিয়াছে। রঘুজী পুনর্ব্বার গৃহ নির্ম্মিত করাইয়া, জমী ক্রয় করিয়া লোকজন নিযুক্ত করিয়া বাস করিতে লাগিল। লোকে দেখিল, গ্রামের মধ্যে রঘুজীই ধনবান্। গ্রামবাসীরা গরীব, তাহারা সর্ব্বদাই ধারকর্জ্জ করে। রঘুজী সুদে টাকা খাটাইতে আরম্ভ করিল।

কিছু দিন পরে রঘুজী তারাকে তাহার মাতুলালয় হইতে লইয়া আসিল। পূর্ব্বে তারা পিতার নিকটেই থাকিত, মায়ী ও মহাদেব তাহাকে লালনপালন করিত। কিছু দিন মাতুলালয়ে ছিল। তাহার সঙ্গে মায়ী আর মহাদেব সেতারায় আসিল। ইতিপূর্ব্বে তারা আর কখন সেতারায় আসে নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ছোট গ্রামে একটা বড় গোলযোগ বাধিল। রঘুজীর কন্যার অদ্ভুত বলের ও সাহসের কথা শুনিয়া সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইল, কেহ বা মাথা নাড়িয়া অবিশ্বাস করিল। যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারা কহিল, "আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।" যাহারা দেখে নাই, তাহারা কহিল, "গুণ করিয়াছে।" যে দেশের কথা বলিতেছি, সেখানে ভোজবাজী, ইন্দ্রজাল ও অপরাপর কুহক এবং ভৌতিক বিদ্যায় বিশ্বাস বড় প্রবল। অনেকে, বিশেষতঃ যুবকেরা একবার তারাকে দেখিবার আশায় রঘুজীর বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিত। দুঃখের বিষয়, অনেকের সে কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইল না। গৃহের সম্মুখে জনতার কারণ জানিতে পারিয়া রঘুজী যষ্টিহস্তে ধাবমান হইল। তারাও কি মনে করিয়া কিছু দিন আর গৃহের বাহির হইত না।

জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। রঘুজীর কন্যাদর্শনের কৌতূহলও সেতারাগ্রামবাসীদের মনে বহুদিন রহিল না। দিনকতক পথে বাহির হইলে লোকে অঙ্গুলী দিয়া তারাকে দেখাইয়া দিত। কয়েক দিবস পরে তাহারও নিবৃত্তি হইল।

তারা সুন্দরী, এ কথা বলিয়াছি। যে সৌন্দর্য্য কোমলতাময়, যে সৌন্দর্য্য অপরিস্ফুট চম্পকের মত অর্দ্ধ-স্ফুট, অর্দ্ধ-অস্ফুট, এ সে সৌন্দর্য্য নয়। তাহার রূপ প্রজাপতির পাখার রূপ নয়। তবু তারা অসামান্য সুন্দরী। সে রূপ যে দেখিত, সেই মুগ্ধ হইত। সুতরাং তাহার অনেক খেলিবার সঙ্গী জুটিত, কিন্তু তারা বড় একটা কাহারও সহিত মিশিত না। তাহার উগ্রস্বভাব দেখিয়া অনেকে সরিয়া গেল।

কেবল এক জন রহিল। শম্ভুজী রঘুজীর প্রতিবেশী। গৃহে কেবল তাহার মাতা ছিল। শম্ভুজী তারাকে পাইবার আশা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া, সে অনল হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিল। এ দিকে সে রঘুজীর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। সর্ব্বদাই আনুগত্য ও অশেষ সম্ভ্রম প্রকাশ করিয়া, কর্কশ কথায়ও নিরুত্তর রহিয়া, সে ক্রমশঃ রঘুজীর নিকটে বড় আদর পাইতে লাগিল।

শম্ভুজী বড় চতুর। সে যখন দেখিল যে, তারা তাহার কথায় কর্ণপাত করে না, তখন মনে করিল, রঘুজীকে হাত করিলে তাহার কন্যাকে পাইতে পারিবে, সেই জন্য সে রঘুজীর মনস্তুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। আবার যখন দেখিল যে, রঘুজীর বাটীতে রঘুজীর অভিপ্রায়বিরুদ্ধ কখনো কিছু হয় না, কেহ কখনো তাহার আজ্ঞা অবহেলা করিতে সাহস করে না, রঘুজী যাহা বলে, তাহাই হয়, তখন তাহার মনে তারাকে পাইবার আশা আরও বলবতী হইল। সুবিধা পাইলে তারার কাছেও প্রণয়ের কথা পাড়িত।

রঘুজীর বাটীর পশ্চাতে বৃহৎ উদ্যান। উদ্যানে ফলের গাছেরই সংখ্যা অধিক, তারা আসিয়া দুই চারিটি ফুলের গাছ বসাইয়াছিল। এক দিন বৈকালে তারা বাগানে বসিয়া ফুলগাছগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে, কোন গাছের শুষ্কপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে, একটি গোলাপগাছের পাতায় কীট প্রবেশ করিয়াছে, খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই কীট বাহির করিতেছে। কুঞ্চিত কেশ তেমনই চক্ষের উপর আসিয়া পড়িতেছে, বামহস্তে সে কেশগুচ্ছ সরাইয়া আবার গাছের একটি শুষ্ক শাখা ভাঙ্গিতেছে। একটি গোলাপ শুকাইয়া বৃন্তচ্যুত হইয়াছে, তারা সে বৃন্তটিও ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেছে। ফুলই যদি ঝরিল ত বৃন্তে কাজ কি? সুখই যদি হারাইলাম, তবে তাহার স্মৃতি থাকে কেন?

পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া তারা একটু চমকিয়া

উঠিল। হস্তে কণ্টক বিদ্ধ হইল। ফিরিয়া দেখিল, শম্ভুজী আসিতেছে। শম্ভুজী আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল। তারার হস্তে যে স্থলে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছিল, সেই ছিদ্রমুখে এক বিন্দু রক্ত বহিল। সে রক্তবিন্দু তৎক্ষণাৎ ধূলিতে মুছিয়া ফেলিল, অতএব শম্ভুজী তাহা দেখিতে পাইল না।

শম্ভুজী তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, "তারা, তোমার গাছগুলি যে বেশ হয়েছে।"

এক দিনের পরিচয়ে শম্ভুজী তারাকে 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। ছয় মাসের আলাপে "তুমি' বলিয়া কথা কহিতেছে।

ফুল তোলার পর শম্ভুজী তারাকে আর বালিকা বিবেচনা করিত না।

শম্ভুজীর কথা শুনিয়া তারা হাসিল না। তাহার সহিত আলাপে তারার আহ্লাদ হয় না, এ কথা শম্ভুজী জানিত, কিন্তু মনকে বুঝাইতে পারিত না। তারার কথা তাহার কর্ণে অতি মধুর লাগিত, তারাকে দেখিবার জন্য তাহার হৃদয় লালায়িত হইত। হৃদয়ের আকর্ষণ, মনকে বুঝাইলে বুঝিবে কেন?

আর এক কথা। শম্ভুজী ভাবিত, তারা আজ আমায় ভাল না বাসুক, দু'দিন পরে ত বাসিতে পারে। সে দিন ফুল তুলিতে সাহস করি নাই বলিয়াই তারা আমার উপর অসন্তুষ্ট, কিন্তু সাহসের অপর পরিচয় পাইলে ত আবার আমাকে অন্য চক্ষে দেখিতে পারে। রঘুজী হয় ত এখনি তাহার কন্যার সহিত আমার বিবাহে সম্মত হইতে পারে, কিন্তু আর কিছুদিনে যদি তারার মত ফিরাইতে পারি, তাহা হইলে আরও ভাল হয়। এই ভাবিয়া শম্ভুজী অপেক্ষা করিতেছিল।

অপর পক্ষে শম্ভুজীর উপরে তারার বিষদৃষ্টি পড়িয়াছিল। আপনার হাত হইলে হয় ত শম্ভুজীকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিত না। কেবল পিতার ভয়ে তাহাকে দুর্ব্বাক্য বলিতে পারিত না। রঘুজীর কাছে তারা নিষ্ঠুর ব্যবহার ও নির্দ্দয় প্রহার ব্যতীত আর কোন আদর পায় নাই, এই জন্য সে রঘুজীকে ভাল না বাসুক, ভয় করিত। যেখানে ভয় বাস করে, ভালবাসা সে দেশে প্রায় থাকে না। পিতার ভয়ে তারা চুপ করিয়া থাকিত, শম্ভুজীর সহিত কথাবার্ত্তাও কহিত।

শম্ভুজীর মুখে আপনার ফুলগাছের সুখ্যাতি শুনিয়া তারা কহিল, "কই না, গাছে বড় পোকা ধরিয়াছে, ফুল ভাল হয় না।"

শম্ভুজী হাসিয়া একটি অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত গোলাপ ছিঁড়িয়া কহিল, "এই যে, বেশ ফুল ফুটিয়াছে। তুমি চুল বাঁধ না, নহিলে তোমার খোঁপায় পরাইয়া দিতাম। তারা, এখন ত তুমি আর নিতান্ত ছেলেমানুষ নও, এখন আর তোমার পুরুষের মত কাপড় পরা ভাল দেখায় না। আর তুমি চুলের যে অযত্ন কর, তাহাতে তোমার চুলে কোন্ দিন জটা পড়িবে। এই যে জটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।" এই বলিয়া তারার মস্তকের দিকে হস্ত প্রসারিত করিল।

তারা মাথা নাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার ভ্রূভঙ্গ করিল, আবার তখনি হাসিয়া উঠিল। কহিল, "আমার চুলে জটা পড়িলই বা? আমি ঘোমটা টানিয়া, পায়ে কাপড় জড়াইয়া কি করিব? আমি বেশ আছি, আমি বরাবর এমনি থাকিব।"

শম্ভুজী। তারা, তোমার বিবাহের সময় হইয়াছে। দু'দিন পরে তোমার পিতা তোমার বিবাহ দিবেন। এ কথা স্মরণ করিও।

তারা একটু বিস্মিত, একটু ভীত হইল। চক্ষের উপর হইতে কেশ সরাইতে গিয়া ভ্রমক্রমে আরও চুল টানিয়া চোখের উপর ফেলিল। অনেক কষ্টে কেশরাশি যথাস্থানে সংরক্ষিত হইলে, শম্ভুজী দেখিল, তারার চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু টল্ টল্ করিতেছে, প্রায় গণ্ড বহিয়া পড়ে। এক হাতে চুল টানিতে টানিতে তারা কহিতে লাগিল, "বিবাহ? আমার আবার বিবাহ কেন? আমি পিতাকে মিনতি করিব, যেন আমার বিবাহ না দেন। আমি বিবাহ করিব না।"

শম্ভুজী তারার প্রতি কাতর নয়নে চাহিয়া কাতরভাবে কহিল, "তারা, আমার জন্য কি একবারও ভাব না? আমি যে তোমায় কত ভালবাসি, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না? তোমার পিতা আমাদের বিবাহে কখন আপত্তি করিবেন না। বল, আমাকে বিবাহ করিবে কি না?"

এই বলিয়া তারার হাত ধরিল।

তারা হাত ছাড়াইয়া লইল। চক্ষের দুই বিন্দু জল চক্ষেই শুকাইল, গড়াইয়া পড়িল না। বাম হস্তে আর এক বিন্দু রক্ত বহিল, তাহাও ধূলিতে মুছিল।

শম্ভুজীর মুখে প্রণয়ের কথা তারা নূতন শুনে নাই। বিবাহের কথাই নূতন শুনিল। ইতঃপূর্ব্বে শম্ভুজী বলিত, আমাকে ভালবাস।

আমাকে ভালবাস না কেন? আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি কেন আমাকে ভালবাসিবে না? আজ সে বলিল, আমাকে বিবাহ কর। তাই তারা ভয় পাইল।

হাত ছাড়াইয়া লইয়া তারা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

তারার মৌনভাব দেখিয়া শম্ভুজী ভরসা পাইয়া বলিতে লাগিল, "আমাকে বাঁচাও, তারা! বল, আমাকে বিবাহ করিবে, নাহিলে আমি মরিব। আমি যেমন তোমায় ভালবাসি, এমন আর কেহ কখন তোমাকে বাসিবে না। আমার কি অপরাধ দেখিলে, তারা? আমার দিকে চাহিবে না কি? বল, আমাকে বিবাহ করিবে কি না?"

তারা মাথা তুলিয়া চারিদিকে চাহিতেছিল। এবার আর নিরুত্তরে রহিল না। নয়নপ্রান্তে অতি মৃদু, অতি ক্ষীণ হাসি দেখা দিল, শম্ভুজী তাহা দেখিতে পাইল না, দেখিলেও কিছু বুঝিতে পারিত না। সেই মৃদু হাসি অমৃতময় নহে, গরলময়। বজ্রপতনের পূর্ব্বে বিজলী বিকসিল। একটু হাসিয়া তারা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বিবাহ হইলে স্ত্রীকে স্বামীর সম্পূর্ণ বশে থাকিতে হয় ত? স্বামীর সকল আজ্ঞা পালন করিতে হয় ত?"

বিস্ময়ের আতিশয্যে শম্ভুজী অবাক্ হইয়া রহিল, উত্তরে কেবল কহিল, "হাঁ, এ কথা কেন?"

তারা। না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। আচ্ছা, স্বামীর শরীরে স্ত্রীর অপেক্ষা অধিক বল থাকা উচিত ত?"

শম্ভুজী হাঁ করিয়া রহিল। মনে মনে ভাবিল, ভাল ছেলেমানুষের কাছে বিবাহের কথা পাড়িয়াছিলাম। অবশেষে উত্তর করিল, "স্ত্রীজাতি পুরুষের অপেক্ষা অনেক দুর্ব্বল। স্ত্রীলোকের বাহুতে বলের আবশ্যক কি? তাহাদের কটাক্ষেই কত বীর পরাজিত হয়।"

তারা রসিকতাটা বুঝিল না, অথবা বুঝিবার চেষ্টা করিল না। কয়েক পদ অন্তরে একটা বৃহৎ তিন্তিড়ী-বৃক্ষ ছিল, তাহার একটা শাখা বৃক্ষমূল হইতে কিছু উচ্চে ঝুলিতেছিল। তারা গিয়া সেই ডাল ধরিল, তাহার পরে শম্ভুজীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "আমি এই ডাল নোয়াইয়া ভূমিতে রাখিতেছি, তুমি এক, দুই, করিয়া দশ অবধি গণ।"

বালিকা দুই হস্তে শাখা ধরিয়া সবলে নোয়াইয়া ধরিল। বৃক্ষশাখা, বৃক্ষপত্র ধূলিধূসরিত হইল।

শম্ভুজী অবাক্, আরও অবাক্ হইয়া গণিতে আরম্ভ করিল, এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ,—

বালিকা শাখা পরিত্যাগ করিল।

তৎপরে কহিল, "তুমি এইবারে ধর, আমি পনর পর্য্যন্ত গণিতেছি।"

এইবার শম্ভুজী বুঝিতে পারিল। তাবার কথার উত্তর না করিয়া বিরক্তভাবে কহিল, "আমি তোমার সহিত আমাদের বিবাহের কথা কহিতে আসিলাম, আর তুমি ছেলেখেলা আরম্ভ করিলে?"

তারা পূর্ব্বের মত মৃদু মৃদু কহিল, "তুমি আমাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যস্ত, আর আমার একটি সামান্য কথা রাখিতে পার না?"

শম্ভুজী উপায়ান্তর না দেখিয়া, বৃক্ষতলে গিয়া ডাল ধরিল।

তারা কহিল, "তুমি নোয়াইয়া ধর, আমি গণিতেছি।"

শম্ভুজী প্রথমবারে ডাল নোয়াইতে পারিল না, পরে অনেক কষ্টে নানাবিধ মুখভঙ্গী করিয়া, ডাল নোয়াইল।

তারা জোরে জোরে, স্পষ্টস্বরে গণিতে লাগিল,—এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, ছয়,—

শম্ভুজী আর ডাল ধরিয়া রাখিতে পারিল না। বৃক্ষশাখা হস্তমুক্ত হইয়া অতি বেগে উপরে উঠিয়া গেল। তৎপরিবর্ত্তে শম্ভুজীর নবীনশ্মশ্রুশোভিত মুখ ধূলি চুম্বিল। তারা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

তারা দেখিল, শম্ভুজী উঠিতে পারিতেছে না, অবশ্য কোথাও আঘাত লাগিয়া থাকিবে, অমনি তাহার হাসি থামিয়া গেল, দ্রুতপদে তাহার পার্শ্বে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠাইল। ধীরে ধীরে তাহাকে তরুমূলে বসাইল।

শম্ভুজীর বড় অধিক লাগে নাই। চক্ষে মুখে ধূলা প্রবেশ করাতে ও দারুণ অপমানের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছিল। আপনা-আপনি উঠিয়া অধোবদনে গাত্রের ধূলা ঝাড়িতে লাগিল। তাহার পরে উঠিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া, তারা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "শম্ভুজী, আমারই দোষে তোমার আঘাত লাগিয়াছে, এ জন্য আমি তোমার কাছে মার্জ্জনা চাহিতেছি। তোমার নিকটে আমার একটি অনুরোধ আছে। আর কখন বিবাহের কথা

তুলিও না। আমি, বোধ হয়, কোন কালেই বিবাহ করিব না। তুমি যদি আমাকে ভালবাস, তাহা হইলে আমি তোমাকে ভাই বলিয়া জানিব। অন্য সম্বন্ধের প্রার্থী হইও না।"

শম্ভুজী একটিও কথা কহিল না, ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

তারা বড় দুষ্ট। শম্ভুজী তাহার অপেক্ষা বলে ন্যূন হউক, ডাল নোয়াইয়া তাহাকে বড় লজ্জা দিল। বৃক্ষশাখা অবনত করা যে তারার অভ্যস্ত, শম্ভুজী তাহা জানিত না।

সেই অবধি শম্ভুজী তারাকে কিছুই বলিত না। তারা নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া কখন কখন নিজে তাহার সহিত কথা কহিত। শম্ভুজী বিবাহের কোন কথা তুলিত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেতারা হইতে ক্রোশ দুই অন্তরে ভীলপুর নামে আর একটি গ্রাম। ভীলপুর অপেক্ষাকৃত কিছু বড়। এই গ্রামে প্রতি বৎসর একটা মেলা হয়। সেই উপলক্ষে নানাবিধ উৎসবাদি হইত। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে অনেক লোক মেলা দেখিতে সমবেত হইত। এই সময়ে সেই মেলা উপস্থিত হইল।

সেতারা এবং ভীলপুরের মধ্যে পর্ব্বতের কিয়দংশ আর একটা ক্ষুদ্র জঙ্গল ব্যবধান। পর্ব্বতের পাদদেশ বেড়িয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ। পথ দুর্গম নহে। এই সুবিধা পাইয়া গ্রামশুদ্ধ লোক মেলা দেখিতে ভাঙ্গিত।

তিন দিন করিয়া মেলা থাকে। মাঝের দিন বড় জাঁক। সেই দিন রঘুজী মেলা দেখিতে চলিল। শম্ভুজী কোন প্রয়োজনে গ্রামান্তরে গিয়াছিল। দাসদাসীরাও সেই দিন ছুটি পাইল। তাহারা ভাল কাপড় পরিয়া, যথাসাধ্য অর্থ সঙ্গে লইয়া, তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে মেলা দেখিতে চলিল। রঘুজী তারাকে ডাকিয়া আপনার সঙ্গে লইল, আর তাহাকে বলিয়া রাখিল, "যদি তুই বরাবর আমার কাছে না থাকিস্ ত তোর হাড় ভাঙ্গিব।" অগত্যা তারা মুখ একটু বিকৃত করিয়া পিতার সমভিব্যাহারে চলিল।

সে দিন গ্রামে প্রায় কেহ রহিল না; গ্রাম প্রায় শূন্য হইল। কোন কুটীরের সম্মুখে কদাচিৎ জনৈক চলৎশক্তিরহিত বৃদ্ধ রৌদ্রে বসিয়া তামাকু টানিতে টানিতে, কাসিতে কাসিতে, নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে করিতে অস্ফুটস্বরে যৌবনকালের ঘটনাসমূহ স্মরণ করিতেছে! কখনও বা "বাড়ীর সকলে চলিয়া গেল, তাহাকে কে তামাকু সাজিয়া দেয়" এই বলিয়া গালি পাড়িতেছে। ঘরের ভিতরে বুড়ী খট্টায় শয়িতাবস্থায়, পুত্রবধূ সাজিয়া গুজিয়া তামাসা দেখিতে গিয়াছে, এই কারণে তাহাকে নানাবিধ মধুর সম্বোধনে অভিহিত করিতেছে।

যাহারা মেলা দেখিতে চলিয়াছে, তাহাদের আজ আর আনন্দের সীমা নাই। যুবকেরা লাঠী হাতে বাঁকা পাগড়ি বাঁধিয়া চলিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেরা কেহ দাদার হাত ধরিয়া, কেহ মাতার হাত ধরিয়া মহা কুতূহলে চলিয়াছে। সকলের মুখে হাসি, সকলেই মেলার গল্প করিতেছে। তরুণীকুল ললাটপ্রদেশ সিন্দূর ও তৈলনিষিক্ত করিয়া মা শীতলার রূপে চলিয়াছেন। রাঙা জমীর উপর নানাবর্ণের চিত্র বিচিত্র করা চৌদ্দহাতি সাড়ী কুঞ্চিত করিয়া পরিধান; হাতে রাঙের কাঁকণ অথবা কাঁসার তাড়, পায়ে সেই বিষম গুরুভার কাঁসার মল। কেহ বা অংসরমতে কজ্জলশোভিত নয়নের দুই চারিটা প্রাণঘাতী কটাক্ষ হানিতেছেন; কেহ বা অপাঙ্গে দৃষ্টি করিয়া তাঁহার প্রতিবেশিনীর মল আপন চরণালঙ্কার অপেক্ষা ভারি কি না, অথবা তাহার সাড়ীর ফুলগুলি অধিকতর চাকচিক্যবিশিষ্ট কি না, তাহাই লক্ষ্য করিতেছেন।

সকলে সারি সারি চলিয়াছে। পরক্ষণে পশ্চাতে রাখিয়া সকলে জঙ্গলে প্রবেশ করিল। বনে অনেক জাতীয় গাছ, কোথাও নিবিড় অরণ্য, কোথাও বিটপিশ্রেণী বিরল। তাহারই মধ্য দিয়া মনুষ্যপদচিহ্নিত সঙ্কীর্ণ পথ। সেই পথে একে একে দর্শকদল চলিল।

কিছু দূর গিয়া তাহারা জঙ্গল পার হইল। তখন নিদাঘের উত্তপ্ত দিবসে দ্বিপ্রহরসময়ে মধুমক্ষিকার গুন্ গুন্ রব যেমন কাননবিহারীর শ্রবণে মধুর শ্রুত হয়, দূর হইতে জনতাকোলাহল সেইরূপ মধুর হইয়া তাহাদের শ্রবণে পশিল। যুবকবৃন্দ দীর্ঘচরণবিক্ষেপে চলিল, বালকেরা যাহাদের হাত ধরিয়াছিল, তাহাদের হাত ছাড়াইয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। ইহা দেখিয়া সাধীরা বালক-বালিকার হাত চাপিয়া ধরিলেন, কেহ বা

সন্তান কোলে করিয়া ছুটিলেন। যুবতীগণ লীলা-গমন পরিহার পূর্ব্বক মল বাজাইয়া দ্রুতগমনে চলিল। সিন্দুর, তৈল এবং স্বেদবিন্দু একত্রে মিশিয়া, ললাট বহিয়া, নাসিকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দীর্ঘপুণ্ড্ররূপে পরিশোভিত হইল।

মধুমক্ষিকাগুঞ্জন সাগরগর্জ্জনে পরিণত হইল। বিন্দু বিন্দু জলে বিশাল সমুদ্র হয়, একটি একটি মনুষ্য মিলিত হইয়া বিশাল মনুষ্যজলধি রচিত হইয়াছে। সমুদ্র কদাচ স্থির থাকে না, সেই মানব-সমুদ্রও স্থির ছিল না। কখন এ দিকে কখন ও দিকে আলোড়িত, তরঙ্গিত, ক্ষুব্ধ হইতেছে। যে দিকে নূতন আমোদের বা কৌতূহলের বাতাস উঠিতেছে, তরঙ্গদল সেই দিকে প্রবলবেগে প্রধাবিত হইতেছে। সে তরঙ্গ রোধ করে, কাহার সাধ্য? তরঙ্গমুখে যাহা পড়িতেছে, তাহাই ভাসিয়া যাইতেছে। নিবাত-নিস্তব্ধ সমুদ্রও যেমন একেবারে স্তব্ধ না হইয়া, পরিশ্রান্ত মহাকায় সজীব প্রাণীর তুল্য বক্ষঃ স্ফীত ও সঙ্কুচিত করিতে থাকে, মানবসমুদ্রও সেইরূপ নিরন্তর বিচলিত হইতেছে। যে নূতন আসিতেছে, সেই অপার সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ মিশাইয়া যাইতেছে। সেতারা হইতে যাহারা আসিল, তাহারাও বিশাল সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ মিশাইয়া গেল।

রঘুজীর বাহুতে বিপুল বল। সেই ভুজযুগল সঞ্চালিত করিয়া, মনুষ্যতরঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করিল। তারা তাহার পশ্চাতে চলিল, নয়নে চঞ্চল জ্যোতি, অধরে কুটিল হাসি। দুই এক জন ঠেলা খাইয়া রঘুজীর প্রতি ক্রোধ-কষায়িত লোচনে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া আর কিছু করিতে বা বলিতে সাহস হইল না। সে অঞ্চলে অনেকেই রঘুজীকে চিনিত, তাহাকে দেখিয়া অনেকে পথ ছাড়িয়া দিল।

চারিদিকে লোকারণ্য। পণ্যবীথিকায় বসিয়া বিক্রেতা চীৎকার করিয়া ক্রেতা ডাকিতেছে। অসাবধানতাপ্রযুক্ত কেহ একটা বালকের চরণ মর্দ্দিত করিয়া গিয়াছে; বালক মাতার হাত ধরিয়া হাঁ করিয়া কাঁদিতেছে ও দরবিগলিত অশ্রু-লোচনে সন্নিহিত মিষ্টান্নের দোকানের দিকে এক-দৃষ্টে চাহিয়া আছে। মাতা, সন্তানের চরণমর্দ্দন-কারীর উদ্দেশে উচ্চরবে গালি দিতেছেন। কোন রমণীর সাড়ীতে চরণধূলি লাগিয়াছে, যাঁহার চরণ, গালির ধমকে, তিনি পলাইবার পথ পান না। বার্দ্ধক্যনত, শীর্ণ কলেবর, বিভূতিভূষিত উর্দ্ধবাহু নিঃশব্দে ভিক্ষা চাহিতেছে, যুবতী সম্মুখে পাইলে আরও চাপিয়া ধরিতেছে। এ দিকে রমণীর লোল কটাক্ষ, ও দিকে তর্জ্জন-গর্জ্জন আর মারামারি। এখানে ঐন্দ্রজালিকের কৌতুক-প্রদর্শন; ওখানে মল্লের আস্ফোট-ধ্বনি। কোথাও নাগরদোলায় আরোহণ করিয়া বালকেরা ঘুরিতেছে; কোথাও কোন সুন্দরী কাচের কর্ণাভরণ ক্রয় করিয়া পুলকিতমনে বার বার তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছেন। এক স্থানে মাটীর পুতুল বিক্রীত হইতেছে; কতকগুলি বালক অনিমেষ-লোচনে সেই স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া খেলনা দেখিতেছে। কেহ চায় ঘোড়া, কেহ চায় মাটীর হাতী, কেহ চায় মাটীর মহাদেব। চারিদিকে ঠেলাঠেলি, হুড়াহুড়ি। সর্ব্বত্র কোলাহল আর সর্ব্বত্র ধূলা।

এক দিকে বড় ভিড়। রঘুজী তারাকে সঙ্গে করিয়া সেই দিকে গেল। সেখানে নানাবিধ ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শিত হইতেছে। দর্শকেরা তাহাতে বড় মনোযোগ না করিয়া যেন আর কিছুর অপেক্ষা করিতেছে। রঙ্গস্থলের বাহিরে একটা পকটী বৃক্ষ ছিল, তারা সেই বৃক্ষে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার পাশে এক জন দীর্ঘকায় তরুণবয়স্ক যুবা গুন্‌মনে মৃদু মৃদু গান করিতেছিল, তারা তাহাকে বড় লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই।

এমন সময়ে সেতারানিবাসী এক জন যুবক সেই স্থলে উপস্থিত হইল এবং তারাকে নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত যুবককে কহিল, "এই সেই তারা।" দীর্ঘকায় যুবক এই কথা শ্রবণ করিয়া সাগ্রহে ও সমুৎসুকভাবে তারাকে ভাল করিয়া দেখিল।

তারার পরিধানে পূর্ব্বের মত পুরুষের বস্ত্রই ছিল। মস্তকে কোন আবরণ ছিল না।

আপনার নাম শুনিয়া তারা সবিস্ময়ে ফিরিয়া দেখিল, এক জন অতি তরুণবয়স্ক, দীর্ঘাকৃতি, মনোহর কান্তি, যুবা পুরুষ বামহস্তে সূর্য্যকিরণ আবৃত করিয়া সোৎসুক-নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তেমন রূপ তারা কখন দেখে নাই। কুঞ্চিত কেশ স্কন্ধে পড়িয়াছে; ললাট প্রশস্ত, নির্ম্মল; ভ্রূযুগ সূক্ষ্ম, দীর্ঘ, তূলিচিত্রিত; চক্ষু দীর্ঘায়ত, কৃষ্ণতার, সমুজ্জ্বল, হাস্যপূর্ণ; নাসিকা দীর্ঘ, সরল, উন্নত; ওষ্ঠাধর ভাস্করের শিক্ষাস্থল; মুখে অতি মধুর, অতি সরল হাসি; চিবুকে নবীন কোমল শ্মশ্রু; দেবাকৃতি বীরাবয়ব। চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে তারা চক্ষু অবনত করিল।

লজ্জায় গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষে অভূতপূর্ব্ব মোহের আবেশ আসিল; তারা লজ্জায় অধোবদনে রহিল।

এত দিনে তারা বুঝিল, সে পার্ব্বত্যপ্রকৃতি কঠিনহৃদয়া বীরনারী নহে, অবশচিত্ত সামান্য মানবীমাত্র।

এই সময়ে যুবককে কে ডাকিল, "গোকুলজী আর কেন বিলম্ব করিতেছ? তোমার জন্য এক লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, দেখিতেছ না?"

যুবক হাসিয়া রঙ্গভূমিমধ্যে প্রবেশ করিল।

রুদ্ধনিশ্বাসে তারা সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

গোকুলজী ঈষৎ হাস্য করিয়া অঙ্গবস্ত্র খুলিয়া রাখিল। তখন তাহার অর্দ্ধগোলাকার বাহুমূল, দৃঢ় মাংসপেশী, বিশাল বক্ষ, ক্ষীণ কটি দর্শন করিয়া লোকে অস্ফুটস্বরে অনেক সুখ্যাতি করিল।

ভিড়ের ভিতরে শব্দ হইল, "পথ ছাড়, অশ্ব আনিতেছে।" অমনি সলিলরাশিতুল্য দুই দিকে লোক সরিয়া গেল। ছয় জন লোকে দুইটা স্থূল রজ্জু ধরিয়া, দীর্ঘকেশযুক্ত, আচ্ছাদিতচক্ষু একটা অশ্ব রঙ্গস্থলে আনয়ন করিল। চক্ষু আবদ্ধ বলিয়া অশ্ব স্থির ছিল; লোকে বুঝিল, পার্ব্বতীয় অশ্ব, এ পর্য্যন্ত বশীকৃত হয় নাই।

গোকুলজী অগ্রসর হইয়া অশ্বের কেশর মুষ্টিমধ্যে ধরিল। দর্শকেরা অনেক পশ্চাতে সরিয়া গেল, অতএব রঙ্গভূমির পরিসর বর্দ্ধিত হইল। রজ্জুধারিগণ রজ্জু উন্মোচন পূর্ব্বক পলায়ন করিল। তখন গোকুলজী সহাস্যে অশ্বের চক্ষুর আবরণ খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল। সেই মুহূর্ত্তে অশ্ব লম্ফ প্রদান করিয়া বেগে পলায়নের চেষ্টা পাইল।

গগনবিহারী শ্যেনপক্ষী দেখিলে কপোতকুল যেরূপ ভীত হয়, গোকুলজীর বিক্রহস্তে সেই ঘোটক দেখিয়া দর্শককুল সেইরূপ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সকলে আত্মরক্ষায় যত্নবান রহিল, কিন্তু কেহ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল না। কৌতূহলের আকর্ষণ এমনি বলবৎ।

পর্কটীবৃক্ষে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া তারা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। যৎকালে ভীতির অস্ফুট শব্দ করিয়া আর সকলে ইতস্ততঃ করিতেছে, তারা শিলাখণ্ডবৎ অটল রহিল, কোন দিকে এক পদ সরিল না।

অনন্তর দর্শকমণ্ডলী অতি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিল। লোকালয়ের মানব বনের পশুকে, প্রভূত বলসম্পন্ন পর্ব্বতের অশ্বকে একা বাহুবলে বশীভূত করিতেছে। অশ্ব কদাচ পৃষ্ঠে মনুষ্যভার বহে নাই, মনুষ্যের হস্ত অঙ্গস্পর্শ করিলে চমকিয়া উঠে; সম্মুখে বিপুল মানবসমুদ্র এবং তাহার ভীতিবর্দ্ধক মনুষ্যের কোলাহল; ভয়ে সে নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সাধ্যমত পলায়নের চেষ্টা করিতেছে। গোকুলজী বজ্রমুষ্টিতে তাহার কেশর ধরিয়া রহিয়াছে। অদ্ভুত দ্বন্দ্বযুদ্ধ! বিচিত্র প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয়! মানবে আর অশ্বে বলের পরীক্ষা! মানুষের বুদ্ধি, কৌশল, চাতুরী, কিছু নাই; মাত্র বাহুবল। একবার অশ্ব গোকুলজীকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, আবার গোকুলজী সিংহবলে তাহাকে টানিয়া আনিতেছে। অশ্বখুরে অন্ধকার ধূলিরাশি উঠিল।

উভয়ে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইল। অশ্বের নাসারন্ধ্রে ফেন ছুটিল। গোকুলজীর ধূলি এবং ঘর্ম্মে আপাদমস্তক কর্দ্দমাক্ত হইল। অবশেষে গোকুলজী অশ্বের কেশর পরিত্যাগ করিয়া তাহার নাসিকার উপরিভাগ চাপিয়া ধরিল। অশ্ব তখন নিশ্চেষ্ট হইয়া কাঁপিতে লাগিল। গোকুলজী বার বার অশ্বের স্কন্ধে করতাড়না করিল। তথাপি অশ্ব নিশ্চেষ্ট রহিল। অশ্ববশীকরণ সমাধা হইল।

ধন্য বাহুবল!

মানবসমুদ্রমধ্যে সন্তোষসূচক মহাকোলাহল উঠিল। তারা তখনি পূর্ব্ববৎ স্থির রহিল।

গোকুলজী ললাটের স্বেদ মুছিতে মুছিতে রঙ্গস্থলের বাহিরে আসিল। অমনি এক জন তাহার হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "এ দেশে গোকুলজীকে বলে আঁটে, এমন কেহ নাই।" রঘুজী পাশে দাঁড়াইয়া এই কথা শুনিল। কথাটা তাহার বড়ই অসহ্য বোধ হইল। কর্কশ স্বরে চীৎকার করিয়া কহিল, "একটা বালককে লইয়া মিথ্যা বড়াই কেন? গোলাজীর বেটা গোকুলজী, আমি তাহাকে জানি।"

গোকুলজী হাঁপাইতে হাঁপাইতে স্বেদ মুছিতেছিল। সে রঘুজীকে চিনিত। তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি জান রঘুজী?"

রঘুজী সেইরূপ কর্কশ স্বরে উত্তর করিল, "আমি তোমার পিতাকে বিলক্ষণ জানি। তাহার কত বল ছিল, তাহাও জানি। আজ তুমি একটা ঘোড়া ধরিয়া দিগ্বিজয়ী হইলে। কি বাপের বেটা রে!"

গোকুলজী রঘুজীকে চিনিত বটে, কিন্তু তাহাকে ভয় করিত না। কথা শুনিয়া গম্ভীরভাবে কহিল, "দেখ, রঘুজী, আমার পিতা ইহলোকে নাই। তিনি থাকিলে আমাকে

তোমার কথার উত্তর দিতে হইত না। আমার পিতার কত বল ছিল, তাহা তুমি জান। যখন আর কেহ তোমার বলে পারিত না, তখন তিনি তোমার সমকক্ষ ছিলেন, এ কথা তোমার স্মরণ থাকিতে পারে।"

রঘুজী উত্তরে কটু করিয়া গালি দিল; "তোর বাপ যেমন মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক ছিল, তুইও সেইরূপ হইয়াছিস্।"

মর্ম্মাহত সিংহের ন্যায় গোকুলজী লম্ফ দিয়া রঘুজীর গলদেশে হস্ত অর্পিত করিল, তৎপরে ক্রোধকম্পিত স্বরে কহিল, "রঘুজী, তোমার শুভ্র কেশ বলিয়াই আজ আমার হাতে রক্ষা পাইলে, নহিলে আমার পিতার নিন্দা বা অপমান করিয়া তুমি কখনও অক্ষত শরীরে গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিতে না।"

গোকুলজী সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। রঘুজীর হাতে লাঠী ছিল। লাঠী ত্যাগ করিয়া কহিল, "বালক, পলিতকেশ হইলেও তোর অপেক্ষা হীনবল নহি।" এই বলিয়া তাহাকে মুষ্ট্যাঘাত করিল। তখন দুই জনে হাতাহাতি আরম্ভ হইল।

অশ্ববশীকরণের পর সকলে মনে করিয়াছিল, এখানে আর কিছু দেখিবার নাই, এই ভাবিয়া অনেকে চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় নূতন ব্যাপারটা দেখিতে দাঁড়াইল। রঘুজীকে অনেকেই চিনিত, তাহার সামর্থ্য প্রচুর, এ কথাও অনেকে জানিত। এই কারণে অনেকে আরও কুতূহলী হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কেহ মধ্যস্থ হইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস করিল না।

গোকুলজী দীর্ঘাকৃতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্ফূর্ত্তিপূর্ণ রঘুজী খর্ব্বকায়, কঠিনগ্রন্থি, কিন্তু অসীম সামর্থ্যশালী। দুই জনে ক্রোধান্ধ, দুই জনে মহা বলবান্; গোকুলজী পূর্ব্বপরিশ্রমে পরিক্লান্ত, রঘুজী অশ্রান্ত। প্রথমেই রঘুজী গোকুলকে দুই হস্তে ধরিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিল। সে হস্তে মত্তহস্তীর বল ব্যস্তিত্রস্ত গোকুলজী স্রোতোমুখে বেতসীতুল্য অবনত হইয়া প্রায় ধরাশায়িত হইল। সেই সময় তাহার স্ফূর্ত্তি কাজে লাগিল। চরণদ্বয় ভূমিতে সবলে স্থাপিত করিয়া, জলে মীনবৎ ঘুরিয়া রঘুজীর ভুজবন্ধ হইতে বাহির হইয়া গেল। রঘুজী চক্ষু পালটিতে দীর্ঘ বাহু দ্বারা গোকুলজী তাহার কটিদেশ বেষ্টিত করিল। একবার, দুই বার, তিনবার রঘুজী প্রবলবেগে সে বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিল, তিনবার সে চেষ্টা বিফল হইল। যে বাহুতে অশ্ব বশীভূত হইয়াছিল, সে বাহুর বল সহজ নয়। রঘুজী কঠিন বন্ধনে পড়িল। গোকুলজী তাহার কটি আরও দৃঢ়রূপে ধরিল। তাহার পর তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিল। সকলে দেখিল, রঘুজী বিপদে পড়িয়াছে, এইবার যদি গোকুলজী তাহাকে তুলিয়া ধরণীতে নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে তাহার পরাজয় হয়। গ্রামবাসী যেমন সভয়ে বহুপুরাতন, পূর্ব্বপুরুষপ্রতিষ্ঠিত, বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষের উপর ভীম প্রভঞ্জনের দৌরাত্ম্য দেখে, প্রভঞ্জনবলে তরুশাখা মড়মড় করিতেছে, দুর্দ্দমনীয় আঘাতে প্রকাণ্ড তরু ধীরে ধীরে উন্মূলিত হইতেছে, দেখিয়া যেমন ভীত হয়, যে মুহূর্ত্তে উন্নতমস্তক তরুবর ভূমিশায়ী হইবে, সভয়ে সেই মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে থাকে, দর্শকশ্রেণীও সেইরূপ সভয়ে রঘুজীর যে মুহূর্ত্তে পরাজয় হইবে, সেই মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

তিনবার গোকুলজী রঘুজীকে শূন্যে তুলিবার উদ্যম করিল। তিনবার রঘুজী মৃত্তিকাপ্রোথিত প্রস্তরবৎ অটল রহিল। চতুর্থবার রঘুজী শূন্যে উঠিল। গোকুলজী তাহাকে মাথার উপরে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিল, অপর মুহূর্ত্তে কি মনে করিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে নামাইয়া দিল। তৎপরে ধীরস্বরে কহিল, "রঘুজী, তোমাকে বলে পরাজিত করিয়া অপমানিত করিলে আমার পৌরুষ বাড়িবে না। আমাকে গালি দিতে হয় দিও, তোমায় আমি কিছু বলিব না, আমার পিতার অবমাননা সহ্য করিতে পারি না।"

এইমাত্র বলিয়া গোকুলজী ধীরগমনে চলিয়া গেল।

পর্কটীবৃক্ষতলে চিত্রার্পিত মূর্ত্তিতুল্য তারা দাঁড়াইয়াছিল। গমনকালে গোকুলজী তাহাকে বলিয়া গেল, "তোমার সাহসের ও বলের অদ্ভুত পরিচয় শুনিয়া তোমার সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা ছিল। তোমার পিতার দোষে তাহাতে বঞ্চিত হইলাম।" এই বলিয়া, উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। তারার সহিত গোকুলজী কথা কহিয়াছে, রঘুজী তাহা দেখিতে পাইল না।

রঘুজী বিনাবাক্যে লাঠী তুলিয়া লইয়া, চারিদিকে চাহিয়া তারাকে দেখিল, তাহার পর তাহাকে অনুসরণ করিতে সঙ্কেত করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

জঙ্গলের পথে সে সময় অন্য পথিক ছিল না। রঘুজী আগে আগে, তারা পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল।

বনমধ্যে গাছে গাছে পক্ষীর কূজন শান্ত হইতেছিল। বৃক্ষচ্ছায়া দীর্ঘ হইয়া পূর্ব্বদিকে হেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তারা মাথা তুলিয়া গাছের পাতা, গাছের মাথা, তাহার উপরে সূর্য্যকিরণ, আর বৃক্ষশাখার বিহঙ্গের পক্ষবিধূনন দেখিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তাহার পর একটা বৃক্ষমূলে বসিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমি বাড়ী যাইব না।"

রঘুজী ফিরিয়া চাহিল। সে অদ্যাবধি তারাকে কখন রোদন করিতে দেখে নাই। তাহাকে রোদন করিতে দেখিয়া, দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া কহিল, "তুই কি পাগল হয়েছিস্ না কি? কাঁদিতেছিস্ কেন? উঠিয়া দাঁড়া!"

তারা উঠিয়া দাঁড়াইল। পুনরপি কাঁদিয়া কহিল, "আমি বাড়ী যাইব না।"

রঘুজী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কাঁদিতেছিস্ কেন?"

তারা আর থাকিতে পারিল না। উন্মত্তার মত কহিল, "তুমি অনর্থক সকলের সঙ্গে কেন অসদ্ব্যবহার কর? গোকুলজী তোমার কি করিয়াছিল যে, তুমি তাহার সহিত কলহ করিলে?"

অসহ্য অপমান রঘুজীর হৃদয়ে জাগরূক ছিল। বৈরসাধনের কোন উপায় ছিল না, এ কারণে অপমানানল আরও প্রজ্বলিতভাবে জ্বলিতেছিল। উত্তরে রঘুজী দুই হাতে লাঠী ধরিয়া ঘুরাইয়া তাহার পৃষ্ঠে প্রহার করিল। ছিন্নকদলীবৎ তারা ভূতলে পতিত হইল। মেরুদণ্ড প্রায় ভগ্ন হইয়া গেল। তারা যন্ত্রণায় চীৎকার করিল না, কোনও শব্দ করিল না। গতজীবন মানবদেহের তুল্য নিস্পন্দ রহিল।

রঘুজী তাহার পর তাহাকে লাথি মারিয়া উঠাইল, কহিল, "বাড়ী যা। আবার এরূপ কথা শুনিলে তোকে প্রাণে বধ করিব।"

তারা বিনা শব্দে, বাষ্পবিহীন চক্ষে, ধূলিধূসরিত অঙ্গে, মজ্জাগত যন্ত্রণায়, ধীরে ধীরে উঠিয়া বাড়ী গেল। কাহাকেও কোন কথা বলিল না।

দুইটিমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিল। সেই দিন অবধি তারা পুরুষের বেশ পরিত্যাগ করিল। সেই দিন অবধি পিতাকে পিতৃসম্বোধন রহিত করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রঘুজী ইহার কিছু জানিল না। তারাকে সে শৈশবাবধি প্রহার করিয়া আসিয়াছে। এক দিন এক ঘা লাঠী খাইয়াই তারা পিতার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিবে? এ কথা শুনিলে রঘুজী হয় ত হাসিত। হয় ত আবার তারাকে প্রহার করিত।

কিছু দিন গেল। ইদানীং রঘুজী তারাকে একটাও দুর্ব্বাক্য বলিত না, তাহার গায়ে হাত তুলিত না। এরূপ আচরণে অনেকে বিস্মিত হইল, মায়ী মনে করিল, হাজার হোক্ বাপ ত বটে। এখন মেয়ের বয়স হয়েছে, এখন কি আর মারাধরা ভাল দেখায়? তাই আর কিছু বলে না।

তারা এখন তেমন চঞ্চল, তেমন দুরন্ত নাই। গৃহকর্ম্মে এখন বেশ মন। তাহার আর সে বেশ নাই, কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ আর তেমন চক্ষের উপর পড়ে না। এখন তারা চুল বাঁধে। মায়ী পূর্ব্বে তারাকে কেবল বুঝাইত যে, দুরন্ত হইতে নাই। কিন্তু তারাকে শান্তশিষ্ট দেখিয়া তাহার বড় ভাবনা হইল। তারাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে হাসিয়া এই কথা বলিত, "আমি ত এখন আর ছেলেমানুষ নই।"

শম্ভুজী রঘুজীর দক্ষিণ হস্ত হইয়া উঠিল। সে তারার সহিত আর বড় একটা কথাবার্ত্তা কহিত না। বিবাহের কথা রঘুজীকে বলাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া তাহাকে আর কিছু বলিত না।

তারা এক এক দিন পর্ব্বতে বেড়াইতে যায়, মধ্যে মধ্যে সেখানে যাইতে বড় ভালবাসে।

এক দিন তারা একাকিনী পর্ব্বতের উপরে অন্যমনে বেড়াইতেছিল। সময়টা বৈকালবেলা। গ্রামের লোকে বলিত, পাহাড়ে কত রকম ভূতপ্রেত বাস করে। তারার সে সকল ভয় কিছুমাত্র ছিল না। একটা ঝরণায় ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে। এক খণ্ড পাথরের উপর বসিয়া তারা জলে দুই পা ডুবাইয়া রহিয়াছে। আর একটু দূরে একটা গোরু জল খাইতেছে। ছোট ছোট গাছগুলি দেখিতে এমন সুন্দর! একটা হরিণ কোথা হইতে উল্লম্ফনপূর্ব্বক তারার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। পলকের মধ্যে লম্ফের পর লম্ফ দিয়া দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। মুখ ফিরিয়া তারা দেখিল,—পর্ব্বতশিখর হইতে দীর্ঘকায় যুবক ধনুর্ব্বাণ হস্তে ক্ষিপ্রচরণে নামিয়া আসিতেছে! তারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার মনে করিল, দৌড়িয়া পলাই। পলাইতে

চাহিল, কিন্তু পা উঠিল না। কাজেই দাঁড়াইয়া রহিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাপড়ের আঁচল টানিতে লাগিল।

ও তারা! এত লজ্জা হইল কবে, কাহাকেই বা এত লজ্জা?

দীর্ঘাকৃতি পুরুষ তারার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে দেখিতে পাইয়া সচকিতে কহিয়া উঠিল, "তারা, এখানে যে!" বলিয়াই সলজ্জভাবে দশনে অধর চাপিল। তারার সহিত তাহার তেমন পরিচয় নাই, সে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল কেন? আবার সে সহস্র লোকের সমক্ষে তারার পিতার অবমাননা করিয়াছে, সে কথা কি তাহার স্মরণ নাই? তবে সে তাহার সহিত কোন্ সাহসে কথা কয়?

দুই জনে অনেকক্ষণ নীরবে রহিল। তারার আঁচল ছিঁড়িবার উপক্রম হইল। মনে করিল, কি আপদ্! আর কখন বাড়ীর বাহিরে যাইব না।

গোকুলজী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি যে এখানে?"

আঃ! তাহার যত উপদ্রব আঁচলের উপর। আঁচল ছিঁড়িলে কি হইবে?

শেষ বলিল, "আমি কোন কোন দিন এখানে আসি। তুমি যে এখানে?"

গোকুলজী। আমি সর্ব্বদা হরিণের চেষ্টায় আসি। আজ কিছু করিতে পারিলাম না। তোমার সম্মুখ দিয়া হরিণ পলাইয়া গেল।

তারা দেখিল, আর কিছু বলিবার খুঁজিয়া পায় না। সুতরাং চুপ করিয়া রহিল।

গোকুলজী মনে করিল, বোধ করি, তারা আমার উপর অসন্তুষ্ট, তাই আর কিছু বলিতেছে না। এখন যাওয়াই ভাল। এই ভাবিয়া বলিল, "সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। এখন আর তোমার এখানে থাকা উচিত নয়।"

তারা। তোমারও বাড়ী যাওয়া উচিত; বাড়ীতে তোমার স্ত্রী হয় ত তোমার জন্য ভাবিতেছে।

গোকুলজী বড় হাসিল, বলিল, "আমার আবার স্ত্রী কোথায়? ঘরে কেবল মা আছে, আর কেহ নাই। বুড়া আমাকে ছাড়িয়া দেয় না। আমি মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না।" বলিতে বলিতে গোকুলজীর দৃষ্টি, গোকুলজীর মুখের ভাব বড় কোমল হইয়া আসিল। তারা কটাক্ষে তাহা দেখিল। তাহার বুকের ভিতরে কি যেন একটা চাপিয়া ধরিল। কহিল, "তবে আমি যাই।" বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি পাপ! এখনও পা ওঠে না।

গোকুলজী বলিল, "সে দিন তোমার পিতা মিছামিছি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছিলেন। আমার পিতার নামে মিথ্যা অপবাদ শুনিয়া আমি রাগে অন্ধ হইয়াছিলাম। তোমার বাপকে আমি জানি। তিনি ইহজন্মে আর আমার মিত্র হইবেন না। তুমিও কি আমার উপর রাগ করিয়াছ?"

তারা তাড়াতাড়ি উত্তর করিল, "না, না, তোমার কোন অপরাধ ছিল না। আমি তোমার উপর কিছু রাগ করি নাই।"

গোকুলজী তখন কহিতে লাগিল, "ভীলপুরেই আমার নিবাস। তোমার পিতার সঙ্গে আমার পিতার পরিচয় ছিল। মহাদেব নামে আমাদের গ্রামের এক জন লোক তোমার বাপের ভৃত্য ছিল, হয় ত এখনও আছে। সে আমাদের জানে।"

তারা কিছু বলে না দেখিয়া গোকুলজী সস্মিতমুখে কহিল, "পূর্ব্বে তোমার আর এক বেশ দেখিয়াছিলাম। সে বেশে তোমায় বড় সুন্দর দেখাইত।"

বামহস্তের অঙ্গুলীতে অঞ্চল জড়াইতে জড়াইতে তারা উত্তর করিল, "পুরুষের বেশ ধারণ করা স্ত্রীলোকের অনুচিত। আমি আর পুরুষের মত কাপড় পরিব না।"

গোকুলজী অবশেষে বলিল, "তোমার সঙ্গে একটু যাইব কি?"

তারা কহিল, "না।" মনে মনে ভাবিল, "একটু সঙ্গে আসিলে ক্ষতি কি?"

পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল।

তারা ও গোকুলজী ভিন্ন পথে চলিয়া গেল। তারা বাড়ী যাইতে পথে কেবল মনে মনে বলিতে লাগিল, ঘরে আর কেহ নাই, কেবল মা আছে। গোকুলজীর মা বই আর কেহ নাই। আর আমার, আমার কে আছে?

সেই রাত্রে তারা মহাদেবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মেলার দিন যে অশ্ব বশীভূত করিয়াছিল, সে কে?"

মহাদেব বুড়া হইয়াছিল, গল্প করিতে ভাল বাসিত। বলিল, "সে কি? এত দিন আমি তোকে বলি নাই? গোকুলজীর ভীলপুরে নিবাস। আমারও সেই গ্রামে বাড়ী। গোকুলজীর বাপ বালাজী বড় সজ্জন ছিল, কিন্তু বড় গরীব। আগে

অবস্থা ভাল ছিল। বালাজীর গায়ে বিলক্ষণ বল। এ অঞ্চলে রঘুজীর সঙ্গে সে ছাড়া আর কেহ পারিত না। শুনিয়াছি না কি এক দিন রঘুজী তার সঙ্গে পারে নাই। বালাজীর উপর রঘুজীর বড় আক্রোশ। কিন্তু বালাজী কখনো কাহারও কোন অপকার করিত না। গোকুলজীর মত সুপুত্র আর নাই। মায়ের এমন সেবা করে যে, শুনিলে চোখে জল আসে। আর তার সামর্থ্য তুই ত দেখেছিস্। তার উপর দেবতার কৃপা আছে। সে তোদের স্বজাতি রে! গোকুলজীর সঙ্গে তোর বিয়ে হ'লে বেশ হয়। কনের মতন বর হয়।"

তারা হাসিয়া উঠিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিবস প্রাতে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া তারা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা রহিয়াছে, এমন সময় রঘুজী তাহাকে ডাকিল। তারা একবার মায়ীর দিকে চাহিল, যেন কটাক্ষে জিজ্ঞাসা করিল, আজ যে আমার বড় ডাক পড়িল? রঘুজী বাহিরের ঘরে বসিয়া রহিয়াছে, ঘরখানি একতালা, সঙ্কীর্ণ, অনুচ্চদ্বার, এক দিকে একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ। তারা ঘরে প্রবেশ করিয়া সেই গবাক্ষে পিঠ দিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে কেন ডাকিয়াছ?"

রঘুজী দরজার দিকে চাহিয়া ছিল। দরজার বাহিরে খানিক দূরে ঘাসের উপর বসিয়া দুই জন লোক দুইখানা পাথর হাতে লইয়া দুইটা কোদালে শাণ দিতেছে। তারার প্রশ্ন শুনিয়া রঘুজী ফিরিয়া চাহিল।

তারা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে কেন ডাকিয়াছ?"

রঘুজী বড় বিস্মিত হইল, তাহার পর বড় বিরক্ত হইল। তাহার কন্যা তাহাকে প্রশ্ন করে? বলিল, "হাঁ, আমি ডাকিয়াছি। কেন ডাকিয়াছি, তোর সে খোঁজে কাজ কি?"

তারা কখন ভয়ে রঘুজীর মুখের দিকে চাহিতে পারে না। আজ সে স্বচ্ছন্দে স্থির দৃষ্টিতে রঘুজীর দিকে চাহিয়া রহিল। একবার চক্ষু নত করিল না, একবার ঘাড় হেঁট করিল না, সভয়ে ইতস্ততঃ করিল না। দিব্য গবাক্ষের নিকট দেওয়ালে পিঠ দিয়া লম্বিত বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া রহিল। আজ সে নিশ্চয় একটা কিছু মনে করিয়াছে।

তারা পূর্ব্বের মত বলিল, "কেন ডাকিয়াছ বল, নহিলে আমি যাই।"

রঘুজী ভ্রূকুটী করিয়া কহিল, "চুপ করিয়া সমস্ত দিন দাঁড়াইয়া থাক্। আমি তোকে কেন ডাকিয়াছি বলিব না।"

তারা "আচ্ছা" বলিয়া স্থির হইয়া রহিল।

রঘুজী রাগিয়া বলিল, "দূর হইয়া যা!"

তারা নিঃশব্দে চলিয়া যায়, রঘুজী আবার ধমক দিয়া দাঁড়াইতে বলিল। তারা দাঁড়াইয়া রহিল।

রঘুজীর রাগ বাড়িতে লাগিল। ইচ্ছা যে তারাকে মারে, কিন্তু মারিবার কোন কারণ তখন না পাইয়া তাহাকে কহিল, "কেন তোকে ডাকিয়াছি জানিস্?"

তারা। না।

রঘুজী। শম্ভুজী তোকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে। তুই না কি বলিয়াছিস্ যে, তাহাকে বিবাহ করিবি না?

তারা। বলিয়াছি।

রঘুজী। তুই কি তাহাকে বিবাহ করিবি না?

তারা। না।

রঘু। তুই ভাবিয়াছিস্ যে, তুই আপনার মতে বিবাহ করিবি, না? এক মাসের মধ্যে শম্ভুজীর সঙ্গে তোর বিবাহ দিব।

তারা। আমি শম্ভুজীকে বিবাহ করিব না।

রঘু। আমি বলিতেছি, শম্ভুজীর সঙ্গে তোর বিবাহ দিব। আমার ইচ্ছার বিপরীত কখন কিছু হয়?

তারা। আমার উপর আর তোমার ইচ্ছা চলিবে না। শম্ভুজীকে আমি কখন বিবাহ করিব না।

অন্যদিন হইলে এতক্ষণ রঘুজী তাহাকে মারিত। আজ সে বড়ই বিস্মিত হইয়াছিল। ক্রোধ সংবরণ করিয়া অন্য কথা আরম্ভ করিল। বলিল, "আমার অনেক টাকা আছে, জানিস্?"

তারা। জানি।

রঘু। আমার কথা না শুনিলে তোকে আমি কিছু দিয়া যাইব না। তোকে পথে দাঁড়াইতে হইবে। আমি আপন সম্পত্তি শম্ভুজীকে দিয়া যাইব।

তারা হাত কচলাইয়া সানন্দে বলিল,

"স্বচ্ছন্দে। তুমি শম্ভুজীকে সব দাও, আমি এক পয়সাও চাই না। আমায় ছাড়া শম্ভুজীকে সব দাও।

রঘুজীর হার হইল। আবার বলিল, "তুই আমার খাইয়া মানুষ হইয়াছিস্। তোতে আমাতে সম্বন্ধ আছে।"

এইবার তারার মুখ লাল হইয়া উঠিল। মস্তক উত্তোলন করিয়া গর্ব্বিতস্বরে বলিল, "তোমাতে আমাতে আবার সম্বন্ধ কি? তুমি আমাকে কেন মানুষ করিয়াছিলে? জীবনের ভার আমার গলায় কেন গাঁথিয়া দিয়াছিলে? এ বোঝা আমার বড় ভারি হইয়াছে। তুমি যে জীবন রক্ষা করিয়াছ, সে জীবনে আমার কাজ কি? আমাকে তখনি মারিয়া ফেলিলে না কেন? তোমায় আমায় আবার সম্বন্ধ কি? কোন সম্বন্ধ নাই।"

রঘুজীর মুখ বড় মলিন হইয়া গেল। সে বসিয়া ছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল? রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "কি বলিলি, আবার বল্ দেখি।"

তারা কহিল, "যে দিন তুমি আমার পিঠে লাঠি মারিয়াছিলে, সেই দিন হইতে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে। তোমার সঙ্গে যেমন সম্বন্ধ, আর ঐ পাহাড়ের সঙ্গেও আমার তেমনি সম্বন্ধ।" এই বলিয়া মুক্তগবাক্ষপথে হস্ত প্রসারিত করিল। সেখান হইতে পর্ব্বত দেখা যায়। তাহার পর বলিতে লাগিল, "বরঞ্চ পাহাড়ের সঙ্গে আমার কিছু সম্বন্ধ আছে, তবু তোমার সহিত নাই।"

রঘুজী লাফাইয়া তারার মুখে করাঘাত করিল। পর-মুহূর্ত্তে তারাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তাহার বুকে পা দিয়া দাঁড়াইল। তারার বোধ হইল, যেন বুকে পাথর দিয়া চাপিয়া ধরিতেছে। যন্ত্রণায় প্রাণ অস্থির হইল। অস্থিপঞ্জর যেন চূর্ণ হইয়া গেল। শ্বাস রুদ্ধ, প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। পাছে যাতনায় চীৎকার করিতে হয়, এই কারণে তারা দন্তে দৃঢ়রূপে অধর চাপিয়া ধরিল, তাহাতে অধর কাটিয়া রক্ত বহিল।

রঘুজীর মুখ নরকের মত অন্ধকার হইয়া উঠিল, চক্ষে নরকানল জ্বলিতেছিল। কেবল দন্তে দন্ত ঘর্ষিত করিয়া বলিতে লাগিল, "তবে এই পাথর বুকে ধর্। মর্ মর্, আজ তোকে মারিয়া ফেলিব।"

তারা একবারমাত্র বলিল, "মারিয়া ফেল। মরিলেই বাঁচি। অনন্তর অধর চাপিয়া, অবিকৃত মুখে স্থিরনেত্রে রঘুজীর দিকে চাহিয়া রহিল। সে চক্ষে যন্ত্রণার লেশমাত্র নাই, শুধু অত্যন্ত ঘৃণা। সে ঘৃণার অচঞ্চল দৃষ্টিতে রঘুজী চঞ্চল হইল।

পিতার বাৎসল্য নাই, মমতা নাই, সন্তানের ভক্তি নাই, পিতৃস্নেহ নাই। নিতান্ত স্বভাবের বিরোধী। এখন এক জন পুরুষে আর এক রমণীতে বলের পরীক্ষা হইতেছে। পুরুষের হৃদয়ে হত্যার পাপ-বাসনা বড় প্রবল; রমণীর হৃদয়ে অসীম ঘৃণা। দুই জনে কায়মনোবাক্যে দুই জনের শত্রু। উভয়ে প্রাণপণে উভয়কে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিতেছে। উভয়ে অনন্যচিত্ত। অতি ভীষণ দৃশ্য!

রঘুজী পা নামাইয়া লইল। বলিল, "তোকে হত্যা করিয়া অনর্থক পাপ সংগ্রহ করিব না, ধরা ইতিপূর্ব্বেই ভারি হইয়াছে।"

তারা অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল। অনেকক্ষণ তাহার উঠিবার শক্তি রহিল না। শেষে দুই হাতে ভর দিয়া উঠিয়া দাড়াইল।

রঘুজীর সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। দুজনেই বুঝিল যে, রঘুজীর হার হইয়াছে। দুই জনে দীর্ঘকাল হিংস্র জন্তুর সদৃশ পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিল।

কিয়ৎকাল পরে রঘুজী ধীরে ধীরে বলিল, "আমার সঙ্গে তোর কোন সম্বন্ধ নাই, বরং পাহাড়ের সঙ্গে আছে, বটে? তবে শোন্। তুই আমার বাড়ী ছেড়ে ঐ পাহাড়ে গিয়ে থাকবি। সেখানে কেমন ঘর মিলে, একবার দেখে আয়। দু চার দিনে গোরুগুলা পাহাড়ের উপর চরাইবার জন্য নিয়ে যাবার কথা। আজকেই তুই সেই গোরুর সঙ্গে যাবি। পাহাড়ের উপর দুমাস গোরুর রক্ষণাবেক্ষণ করিবি। পাহাড়ের নীচে আমার লোক থাকিবে। তোকে কখনো নামিতে দেখিলে আবার তোকে ধরিয়া পাহাড়ের উপর রাখিয়া আসিবে। যখন শীত পড়িবে, পাহাড়ের উপর আর বড় ঘাস থাকিবে না, তখন গোরুগুলা সঙ্গে নিয়ে আসিবি। দেখি, তা হ'লে আমার কথা শুনিস্ কি না।"

তারা উত্তরে বলিল, "হানি কি? আমার এখন সর্ব্বত্র সমান। আজই পাহাড়ে যাইব।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এই নিদারুণ নির্ব্বাসনাজ্ঞা মুহূর্ত্তের মধ্যে রঘুজীর গৃহে প্রচারিত হইল, মায়ী ছুটিয়া একেবারে রঘুজীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। কত কাঁদিল, কত বুঝাইল,

কত পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইল, বলিল, "তোমার সতী লক্ষ্মী স্ত্রীকে কত কষ্ট দিয়াছিলে, একবার মনে করিয়া দেখ। সেই স্ত্রীর একটি কন্যা, তাহাকে আজ গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিতেছ। পাহাড়ের উপর গিয়া বাছা মরিয়া যাইবে। মাথার উপর দেবতা আছেন, রঘুজী, এমন কর্ম্ম করিও না। পাপের উপর আর পাপ চাপাইও না। তারার মা স্বর্গে গিয়াছে, আর তাহার আত্মাকে কষ্ট দিও না!"

রঘুজী কোন কথা শুনিল না। তখন বুড়ী রাগের মুখে তাহাকে গালি দিল। রঘুজী উঠিয়া তাহাকে লাথি মারিল। মায়ী ঘরের বাহিরে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। মহাদেব বকিতে বকিতে আসিতেছিল, রঘুজীর হাতে লাঠি দেখিয়া সরিয়া গেল। শম্ভুজী অনেক করিয়া বুঝাইল। রঘুজী কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। কহিল, "পাহাড়ের সহিত সম্বন্ধ আছে, পাহাড়েই গিয়া থাকিবে।" তারাও সকলকে নিষেধ করিল, বলিল, "আমি পাহাড়ে বেশ থাকব। গোরুর দুধ আর ফলমূল খাইয়া, পাহাড়ের উপর একটা ঘর বাঁধিয়া থাকব। তোমরা কেহ রঘুজীকে অনুমত করিবার চেষ্টা করিও না। আমার আর এখানে থাকিবার মন নাই।"

মায়ী আর মহাদেব দেখিল, তারা এখন পিতাকে রঘুজী বলে, আর পিতা বলে না। তাহারা ভাবিল, একটা বিশেষ কিছু ঘটিয়া থাকিবে।

তারার পক্ষে দুটা কথা বলে এমন কেহ বা ছিল? একটা চাকর, একটা দাসী, দুই জনে যাহা বলিবার তাহা বলিল, আর কাঁদিল, আর কি করিবে? শম্ভুজীর আধিপত্য যথেষ্ট, সেও অনেক চেষ্টা করিল, শেষে ধমক খাইয়া চুপ করিয়া গেল। তারা যার নাড়ী-ছেঁড়া ধন, সে ত আর ইহসংসারে নাই। তারার কষ্ট দেখিলে যার বুক ফাটিয়া যায়, সে ত আর নাই। অভাগী নির্ব্বাসিতা, এ কথা শুনিলে যে গৃহসংসারে জলাঞ্জলি দিয়া কন্যাকে লইয়া আপনি নির্ব্বাসিতা হইত, সে জননী ত আর নাই। যাহার জননী আছে, তাহার আবার গৃহনির্ব্বাসন কি? মা কি সন্তানকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে? যেখানে মাতা, সেই গৃহ, পিত্রালয় মাতুলালয় ত কথার কথা। যে মাতৃহারা, সেই প্রকৃত নির্ব্বাসিত। সে মঙ্গলময় স্নেহরাজ্য হইতে যে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, সে ত পথের পথিক। পথ হাঁটিয়া শ্রান্ত হইলে আর ত কেহ কোলে করিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া সে শ্রান্তি দূর করে না; আর ত কেহ তেমন বক্ষে লইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করে না। যাহার নিকটে থাকিলে মস্তকের উপর নীলাকাশমাত্র আবরণ রহিলে বোধ হয়, গৃহের ভিতর আছি, সে ত আর নাই!

মাতার মমতা কেমন, তারা তাহা বুঝিতে না বুঝিতেই মাতার মুখ হারাইয়া গেল। দুই পা চলিতে হইলে যখন চারিবার আছাড় খায়, থলমল করিয়া একটু চলে, আবার, আছাড় খায়, মুখে লাল আর ধূলা, আর রাঙ্গা মুখে দুই চারিটি খুদে খুদে মুক্তার মত দাঁত, যখন আধ আধ করিয়া মা বলিয়া ডাকিত, হাসিতে হাসিতে লাল ফেলিতে ফেলিতে মা'র বুকে মুখ লুকাইত, সেই সময় মা'র মুখ হারাইয়া গেল। সে মুখের আলোক নিভিয়া গেল, কই, আর ত জ্বলিল না? সেই অবধি তারার অদৃষ্ট অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। মাতার মুখ ভুলিয়া তারা রঘুজীর অন্ধকার ললাট চিনিতে শিখিল। সে ললাটে স্নেহের কোমল কর কখনো স্পর্শ করে নাই, সে চক্ষে স্নেহের প্রশান্ত আলোক কখনও জ্বলে নাই। তারার জীবনাকাশে ঊষাকালে অরুণ উঠিতে না উঠিতেই মেঘ উঠিল, তারার জীবন ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

দিবা দ্বিপ্রহরের পর তারা গৃহত্যাগ করিল।

গোরুর পাল ছাড়া পাইলেই পর্ব্বতের দিকে যাইত, তাহাদের লইয়া যাইতে কোন কষ্ট হয় না। চারি জন রাখাল ও চারি জন রঘুজীর বেতনভোগী তাহার আদেশক্রমে সেই সঙ্গে গেল, পর্ব্বতের পদপ্রান্তে পৌঁছিলে তাহারা ফিরিয়া আসিবে।

গ্রামে একটি সঙ্গতিশূন্য বৃদ্ধা তাহার একমাত্র কন্যাকে লইয়া বাস করিত। কন্যাটির নাম সোহিনী, তারার অপেক্ষা পাঁচ সাত বৎসরের বড়। সোহিনী কখন কখন রঘুজীর গৃহে কাজকর্ম্ম করিত; কখন ধান ভানিত, কখন ডাল ভাঙ্গিত, কখন ময়দা পিষিত। মায়ী গোপনে সোহিনী ও তাহার মাতার অনেক সাহায্য করিত। মহাদেব রঘুজীর অজ্ঞাতসারে সোহিনীকে তারার সঙ্গে যাইতে বলিল, আর তাহাকে অনেক করিয়া বলিয়া দিল, "অন্ততঃ দুই চারি দিন তারার সঙ্গে থাকিও।"

তারার সঙ্গে আর কেহ যাইতে পাইল না, রঘুজীর নিষেধ ছিল। তারাও কাহাকে লইতে অসম্মত হইল।

পর্ব্বতের যে অংশ দিয়া লোকের যাতায়াত ছিল, সে দিকে গোরু চরিবার মত তেমন ঘাস-পাতা জন্মিত না। গোচারণের স্থান আর এক দিকে। রঘুজীর বেতনভুক্ত রাখালেরা সেইখানে গোরু চরাইত। এবারেও সেই স্থলে গাভীর পাল লইয়া যাইবার আদেশ। পাহাড়ের নীচে লোক রাখিবার কথা রঘুজী তারাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিয়াছিল।

পাহাড়ে উঠিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তারার সঙ্গীরা সকলে ফিরিল, কেবল সোহিনী রহিল।

জনপ্রাণিশূন্য দুর্গম স্থান। চারিদিকে পর্ব্বত-শিখর। দূর্ব্বাদলবিমণ্ডিত অতি বিশাল স্তূপাকার শিলারাশি। একটা শৃঙ্গ আকাশের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে, আর একটা এক দিকে হেলিয়া আছে। শিখরের উপরে গাছগুলি ক্ষুদ্র ঝোপের মত দেখাইতেছে। একটা প্রশস্ত উপত্যকা ঘুরিয়া বাঁকিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে। পাখী উড়িয়া পাহাড়ের নীচে কুলায়ে যাইতেছে। আর সেই সর্ব্বব্যাপী নিস্তব্ধতা অতি ভয়ানক!

তারা একটা ঝরণায় হাত পা ধুইয়া, অঞ্জলি পূরিয়া জল পান করিল। সোহিনীও তৃষ্ণায় কাতর। সেও তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া অঞ্চল খুলিয়া জলপান বাহির করিয়া তারাকে খাইতে বলিল। তারা তাহাকে হস্ত দ্বারা নিবারণ করিল।

চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া তারা দেখিল, স্থান বিজন ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। গোরুগুলা এদিক সেদিক চরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের রোমন্থন-শব্দ, কখন বা নীড়োন্মুখ একটা পক্ষীর চীৎকার, পর্ব্বত-নির্ঝরের শব্দ কখন শ্রবণে পশে, কখন পশে না, নচেৎ সেই উচ্চ পর্ব্বতপৃষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে শব্দশূন্য।

তারা চক্ষু ফিরাইয়া আপনার হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখিল,—দেখিল, সে হৃদয় বড় শূন্য। তবে শূন্যে শূন্যে মিশুক না কেন? উপরে সেই নিস্তব্ধ নীল শূন্য, চারিদিকে পাষাণময় হৃদয়বিহীন শূন্যতা, আর তারার সেই শূন্যময় হৃদয়, এই তিনে একত্র হইয়া মিশুক না কেন? সমানে সমানে ত মিলিবার কথা। তারাও ভাবিতেছিল তাই। রঘুজীর গৃহে আমার স্থান হইল না, আমি তাহার গৃহে থাকিবার উপযুক্ত নহি। এইবার ত আমি আমার যথার্থ বাসস্থানে আসিয়াছি। এখানে আসা আমার পক্ষে আবার নির্ব্বাসন কি? এই ত আমার গৃহ। এইখানে আমার ঘর, এই পাহাড় আমার জনক-জননী। আমার চক্ষে এ স্থান জনশূন্য নয়। যেমন আমার হৃদয়, তেমনি এই স্থান। কেন, এখানে থাকিলে আমার কষ্ট কি? আমি এখানে বেশ থাকিব।

তা হইল কৈ, তারা? এ স্থান যে বড় শূন্য। তোমার শূন্য হৃদয় অপেক্ষাও শূন্য। দেখ দেখি, তোমার হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে কোথাও কি কিছু নাই? হৃদয় কি এতই শূন্য? এই বয়সেই কি সব শূন্য? তবে এ পর্ব্বতের সহিত তোমার হৃদয় একীভূত হয় না কেন?

কেন হইবে? কার হৃদয় এত নিস্তব্ধ যে, কোথাও কোন শব্দ শুনা যায় না? তারা আশার কথা কানে তত স্পষ্ট শুনিতে পায় না। আশা ত কখন কাহাকে ছাড়ে না। তারা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, আশার মূর্ত্তি বড় ভাল দেখিতে পায় না। কান পাতিয়া শুনিল, আশার সে মধুর রাগিণী তেমন স্পষ্ট শুনিতে পায় না। সুতরাং তারা নিতান্ত সঙ্গিহারা হইল, চতুর্দ্দিক্ নিতান্ত শূন্যময় দেখিল। তবু হৃদয় একেবারে শূন্য নয়। পথ চলিয়া তারা বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। খানিকক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে সেই কঠিন শয্যায় শয়ন করিবামাত্র নিদ্রিত হইল। যে শ্রান্ত, তাহার নিদ্রার জন্য সুখশয্যার আবশ্যক হয় না।

সোহিনী ভাবিতেছিল আর কিছু। স্থানটা এরূপ নির্জ্জন দেখিয়াই তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। গভীর নিস্তব্ধতা তাহার পক্ষে মহা কোলাহলময় হইয়া উঠিল। চারিদিক্ হইতে যেন নানাবিধ বিভীষিকা তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই সঙ্গে আবার কিছু কিছু সম্ভবপর ভয়ের কারণ তাহার স্মরণে আসিতে লাগিল। একবার ভাবিল, যদি রঘুজী তারার সহিত আমার এ স্থলে অবস্থানবার্ত্তা বর্ণাক্ষরেও জানিতে পারে, তাহা হইলেই আমার সর্ব্বনাশ। প্রাণরক্ষা হয় ত অন্নের উপায় ঘুচিবে। তাহার বাটীতে খাটিয়া খাই, তাহাও আর পাইব না। আবার এ দিকে পাহাড়ে কত কি থাকে, ভর সন্ধ্যাবেলা পাহাড়ের উপর দুইটিমাত্র স্ত্রীলোক! নিকটে কেহ কোথাও নাই। কেন মরিতে আসিয়াছিলাম, আগে কেন ভাবি নাই?

সোহিনীর গা ছম্-ছম্ করিতেছে, এক

একবার গায়ে কাঁটা দিতেছে, এমন সময় সে দেখিল যে, তারা নিদ্রিতা।

মোহিনী একবার মনে করিল, চীৎকার করি, আবার তখনি ভাবিল, পালাই। তখনও তেমন অন্ধকার হয় নাই। যাহারা সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা হয় ত এখনো বহুদূরে যায় নাই। মোহিনী আর দ্বিতীয় চিন্তা করিল না। আস্তে আস্তে উঠিয়া দুই চারি পা সাবধানে চলিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

তারা নিদ্রিতাবস্থায় অতি বিচিত্র স্বপ্ন দেখিল। শৈলশিখরে এক জন মহাকায় পুরুষ উপবিষ্ট রহিয়াছে। শরীর কৃষ্ণবর্ণ, হস্তপদ দীর্ঘ, অতিশয় প্রশান্ত, অতিশয় গম্ভীর মূর্ত্তি। মস্তকে দীর্ঘ জটা-জুট। চক্ষে পলক নাই, কটাক্ষ নাই। তারা চাহিয়া দেখিল, সে চক্ষু তুষারাবৃত। দেখিতে দেখিতে তাহার হাত-পা হিম হইয়া আসিল, বক্ষের ভিতরে যেন সেই শীতলতা প্রবেশ করিয়া, তাহার হৃদয়কে কম্পিত করিল। তারা সেই তুষারময় চক্ষু দেখিয়া কাঁপিতে লাগিল।

জটাধারী পুরুষ তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া নিকটে ডাকিল। তারা উঠিয়া তাহার কাছে গেল। মহাকায় পুরুষ বলিল, "তারা, তুই আজ হইতে আমার কন্যা হইলি। আমি এই পর্ব্বতের দেবতা। তোর পিতা তোকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এখন তুই আমার আশ্রয়ে থাক্। আমি তোকে কন্যা বলিলাম, তুই আমাকে পিতা বলিবি। আমার নিকটে থাকিবি?"

শব্দ অতি গম্ভীর শুত হইল। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত-শিখরশ্রেণী অবনত-মস্তকে সে কথা শুনিতেছে। তারা মনে করিল, আকাশবাণী হইতেছে। উত্তর করিল, "তোমার নিকটে থাকিব। আমার আর স্থান কোথায়?"

অতিকায় পুরুষ দীর্ঘ হস্তদ্বয় প্রসারিত করিয়া তারাকে ধরিয়া ক্রোড়ে টানিয়া লইল।

সে ক্রোড়ের স্পর্শ নিতান্ত শীতল, রক্ত জমিয়া যায়। তারা অস্ফুট স্বরে কহিল, "আমায় বড় শীত বোধ হইতেছে।"

নীহারচক্ষু পুরুষ সে কথা শুনিতে না পাইয়া তারাকে কহিল, "আমার আরও কন্যা আছে। চাহিয়া দেখ।"

তারা বিস্মিত হইয়া দেখিল, সাত জন যুবতী তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাত জনই অপূর্ব্ব সুন্দরী, আলুলায়িতকেশা, সে কেশ চরণে লুটাইয়া পড়িয়াছে। সবই সুন্দর, কেবল নয়ন তুষারময়! সকলে মিলিয়া হাততালি দিয়া পুলকভরে নৃত্য করিতেছে। এক জন তারার হাত ধরিয়া তাহাকে সেই পুরুষের অঙ্কদেশ হইতে টানিয়া তুলিল। সকলে হাসিয়া কহিল, "আমরা আর একটি ভগিনী পাইয়াছি।" এই বলিয়া আবার ঘুরিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। আগুল্‌ফলম্বিত কেশরাশি অপূর্ব্ব তরঙ্গিত হইল।

এক জন হাসিয়া তারার বেণী খুলিয়া দিল। আর এক জন তাহার গলা ধরিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিল। তারা কাতরস্বরে কহিল, "আমি শীতে মরি, আমাকে অঙ্গবস্ত্র দাও।"

গলবেষ্টিকা সর্পিণীকে কেহ যেমন সত্বর পরিত্যাগ করে, সপ্তসুন্দরী সেইরূপ তারাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে দাঁড়াইল। সকলের অপেক্ষা যে প্রগল্‌ভা, সে কহিল, "আমরা পাষাণকন্যা, আমাদের আবার শীতগ্রীষ্ম কি? সর্ব্বনাশ! আমরা ভুজঙ্গিনীকে বক্ষে পুষিতে উদ্যত হইয়াছিলাম! এ যে মানবী, ইহাকে এখানে কেন আনিলে? ইহার হৃদয়ে যে খেলো পাপ পৃথিবীর বাসনা প্রবল রহিয়াছে। পিতঃ! ইহাকে দূর কর, দূর কর, নাহলে আমরা কলঙ্কিত হইব।"

পাষাণ পুরুষ উত্তর করিল, "ইহার হৃদয়ে যাহা আছে, তাহা বাহির করিয়া ফেলিয়া দাও। তখন এ তোমাদের ভগিনী হইবার উপযুক্ত হইবে।"

সপ্তযুবতী তুষারনয়নে তারার প্রতি তীব্র দৃষ্টি-পাত করিল। তারার বোধ হইল, যেন তাহার হৃদয় ভেদ করিয়া সেই শীতল কটাক্ষ ছুটিতেছে। হৃদয়ের গভীরতম, অন্তরতম প্রদেশ সে দৃষ্টি হইতে লুকায়িত রহিল না। তারা আপনার হৃদয়ের ভিতরে দেখিল, এ কি? অন্তরে বাহিরে এ কে? হৃদয়ের অতিশয় প্রচ্ছন্ন কন্দরে, আবার চক্ষের সম্মুখে এ দীর্ঘকায়, মনোমোহন সুন্দর যুবাপুরুষ কে? তারা চমকিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে গোকুলজী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

মহাকায় পুরুষ অতি গম্ভীর স্বরে কহিল, "এই সকল অনর্থের মূল। ইহাকে শিখরশৃঙ্গ হইতে নীচে ফেলিয়া দাও।"

সাত জনে গোকুলজীকে ধরিয়া শিখরশৃঙ্গে লইয়া চলিল, সেইখান হইতে তাহাকে নীচে ফেলিয়া দিবে। কত সহস্র হস্ত নীচে পাষাণের উপর পড়িয়া তাহার অস্থি চূর্ণ হইয়া যাইবে।

গোকুলজী স্বয়ং নিশ্চেষ্ট, যন্ত্রচালিত পুত্তলিকা সদৃশ। নিস্পন্দ নয়নে কাতরদৃষ্টিতে তারার প্রতি চাহিয়া তাহাকে কটাক্ষে বলিতেছে, "আমাকে রক্ষা কর। ইহাদিগের হস্ত হইতে আমাকে মুক্ত কর।"

তারা আজানুপ্রণত হইয়া, যুক্তকরে, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে মহাকায় পুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আমি তোমার নিকটে থাকিতে চাহি না, তুমি গোকুলজীকে ছাড়িয়া দাও। আমি সংসারের যন্ত্রণা ভোগ করিতে স্বীকৃত আছি, তুমি গোকুলজীকে ছাড়িয়া দাও। আমি এখনি গোকুলজীকে লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি। তোমার পায়ে ধরি, তুমি গোকুলজীকে ছাড়িয়া দাও।"

পাষাণপুরুষ কিছুই শুনিল না, কহিল, "সংসারে তোর কপালে যন্ত্রণা ব্যতীত আর কিছুই নাই। তুই সংসারের সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া এইখানে থাক্। গোকুলজীর দ্বারা তোর কেবল অমঙ্গল হইবে।"

সপ্তরমণী মিলিত হইয়া গোকুলজীকে টানিয়া পর্ব্বতশিখরে লইয়া যাইতেছে। তারা চীৎকার করিয়া ছুটিয়া গিয়া গোকুলজীকে ধরিয়া তাহাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য টানাটানি আরম্ভ করিল। পাষাণরমণীদের চক্ষে ঘৃণায় এবং ক্রোধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল। তুষারনয়নে অগ্নিকণা! তারা প্রাণপণে গোকুলজীকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, দেখিয়া এক জন কহিল, "ইহাকেও নীচে ফেলিয়া দাও।"

তারা দেখিল, উভয়েরই প্রাণ যায়। প্রাণভয়ে তখন সে চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকারে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

যামিনী অন্ধকার, কিন্তু আকাশ নির্ম্মল। আকাশে নক্ষত্র বায়ুবিচলিত প্রদীপের মত কম্পিত হইতেছে।

চক্ষু মুছিয়া তারা উঠিয়া বসিল। তখনো তাহার বক্ষের ভিতর গুর্ গুর্ করিতেছে। মুখ ফিরাইয়া ডাকিল, "সোহিনি!" কেহ কোন উত্তর দিল না। উঠিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। তখন তাহার ভীতিশূন্য হৃদয়েও একবার ভয়ের সঞ্চার হইল। উপত্যকাপথে কিছু দূর গিয়া অতি মুক্তকণ্ঠে ডাকিল, "সোহিনি! সোহিনি!" প্রতিধ্বনি ছুটিয়া নিমেষের মধ্যে পর্ব্বতের গহ্বরে গহ্বরে ডাকিল, "সোহিনি! সোহিনি!" উপত্যকায় ছুটিয়া নীচে গিয়া ডাকিল, "সোহিনি! সোহিনি!" পর্ব্বতশিখরে উঠিয়া, তার পর আকাশে উঠিয়া, ক্ষীণতর স্বরে ডাকিল, "সোহিনি! সোহিনি!" তৎপরে দিগন্তে মিলাইয়া গেল। কেহ কোথাও কোন উত্তর দিল না, কেবল গোরুগুলা চর্ব্বিতচর্ব্বণ পরিত্যাগ করিয়া কিয়ৎকাল চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, দুই একটা দুই একবার ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া পূর্ব্বের মত স্থির ভাবে রোমন্থনে নিযুক্ত হইল।

এই সময়ে শৃগালে প্রহর ডাকিল।

সেই জনমানবশূন্য ভয়ঙ্কর পর্ব্বতে তারা এখন একাকিনী। কিন্তু সে হৃদয় ভয়ে বিচলিত হইবার নহে। তারা বুঝিল, যে কারণেই হউক, সোহিনী তাহাকে একেলা রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই পর্ব্বতেই এখন তাহাকে থাকিতে হইবে। আজ রাত্রে কোথায় যাইবে?

এই ভাবিয়া সেই তারকিত, নক্ষত্রখচিত, অনন্ত নীলাম্বরতলে শয়ন করিল। পথের পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন, পুনর্ব্বার অবিলম্বে নিদ্রিত হইল। সমস্ত রাত্রি তারকারাজি সহস্র চক্ষু মেলিয়া পাষাণশয্যায় শয়িত সেই রূপরাশি দেখিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ

ভীলপুর গ্রামের এক প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কুটীর; সেই কুটীরে গোকুলজী ও তাহার জননী বাস করে। দুইটি ঘর, খড়ের চাল, তাহার উপরে খোলা। এক ঘরে গোকুলজী থাকে, আর এক ঘরে তাহার মাতা পাক করে, শয়ন করে। ঘরের একদিকে উনান পাতা, আর একদিকে একখানি সঙ্কীর্ণ চারপাই; সেই চারপায়ের উপর পরিষ্কার বিছানা। দেয়ালে বাঁশের চোঙ্গ করা তৈল রহিয়াছে। হাঁড়িতে চাল, ডাল, লবণ, ময়দা। মেজের উপর কিছু তরকারি। ঘরখানি দেখিলেই জানা যায় যে, সে গরীবের বাসস্থান। ঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থা দেখিলে ইহাও বোধ হয় যে, যাহারা সে ঘরে থাকে, তাহারা প্রসন্নচিত্ত, আপনার অদৃষ্টের নিন্দা করে না। গোকুলজীর ঘরে চারিদিকে মৃগয়ার উপকরণ, একটা শার্দ্দূলচর্ম্ম, খানকতক মৃগচর্ম্ম, ধনুক, শরপূর্ণ তূণ, আরও কত কি রহিয়াছে। শয়নের নিমিত্ত একখানি চারপাই।

গোকুলজীর মাতা পাক করিতেছে; গোকুলজী গৃহদ্বারে বসিয়া এক খণ্ড বর্শাফলক মার্জ্জিত করিতেছে, সূর্য্যরশ্মি বর্শাফলকে প্রতিফলিত হইতেছে। গোকুলজীর মাতা প্রাচীনা, শুভ্রকেশ স্কন্ধে ঝুলিতেছে, মাংস-চর্ম্ম লোল, কিন্তু চক্ষের জ্যোতি হ্রাস হয় নাই, দৃষ্টি স্নেহপূর্ণ। মাতাপুত্রে কথোপকথন হইতেছিল।

গোকুলজী বলিতেছে, "মা, তুই এখন আর ভাল রাঁধিতে পারিস্‌নে। আমি এমন চমৎকার রাঁধিতে শিখিয়াছি। এইবার হইতে আমি পাক করিব।"

বুড়ী একটু হাসিয়া কহিল, "নে বাপু, তুই আর জ্বালাস্‌নে। আমি বুঝি তোর কথা বুঝিতে পারিনে? আমার রাঁধিলে পাছে কষ্ট হয়, তাই তুই একটা ফন্দী বার কোরে আপনি রাঁধিতে আরম্ভ করবি, না? তুই ত আমায় কোন কর্ম্মই করিতে দিস্‌নে। আমার বিছানা পর্য্যন্ত আপনি পাতিস্। আমার ত রাঁধিতে কোন কষ্ট হয় না, তবু তুই রোজ খোঁচাবি। দেখ, শেষে আমি পায়ের উপর পা দিয়ে বসেই ম'রে যাব।"

গো। এখন আর মরিতে হয় না। এখন তোর কিসের বয়স? তোর পাকা চুল আবার কাল হবে এখন দেখিস্।

মা। যদি সুসন্তানের সেবায় বেঁচে থাকবার হ'ত, তা হ'লে আমার এ সুখ কখনো ফুরাইত না। দশ ছেলে-মেয়ে যা না করে, তুই আমার তাই করিতেছিস্। আর জন্মে না জানি কত পুণ্যই কোরেছিলেম, তাই তোর মত সন্তান পেটে ধরেছি। লোকে আমাদের দুঃখী বলে, কিন্তু আমার যত সুখ, এত সুখ মানুষের কদাচ ঘটে।

এই বলিয়া বুড়ী চক্ষু মুছিল।

গোকুলজী মাতার দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া বসিয়াছিল। মাতার এই কথা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া কহিল, "দেখ মা, ও সব কথা বলিবি ত একটা বউ আনিয়া তোর গলায় গাঁথিয়া দিব। তখন সুখ টের পাবি।"

মা। যদি বিয়ে করিস্, তা হ'লে ত ভালই হয়। বউ এসে আমার সেবা করিবে, আর আমিও বউয়ের মুখ দেখিয়া বত্তাই। তোর যেমন কথা, তুই কেবল বলিস্ যে, বউ এলে আমার কষ্ট হবে। তা তুই ত বুঝেও বুঝবি নি।

গো। আচ্ছা, মা, সে দিন মহাদেব যে তোর কাছে এয়েছিল, সে তোকে কি বলিয়া গেল?

মা। ও কপাল, তুই বুঝি তাই ভাবছিলি? গোকুল, দেখ, তুই বুঝি মনে করিস যে, আমি বুড় হয়েছি, আর চোখে কিছু দেখতে পাই নে। ওরে, এখনও তেমন চোখের মাথা খাই নি। রঘুজীর মেয়েকে তুই বিয়ে করতে চাস, কেমন? রঘুজীর মেয়েকে বিয়ে করতে তোর ইচ্ছা হ'লেও রঘুজী বিয়ে দেবে কি? আর দেখ, আমি লোকের মুখে শুনতে পাই যে, মেয়েটা বড় দুরন্ত। রঘুজী না কি তাকে বাড়ীর বার্ ক'রে দিয়েছে?

গোকুলজী কৃত্রিম কোপে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া কহিল, "তুই যদি আমাকে মিছামিছি মন্দ কথা বল্‌বি, ত এখনি ভাতের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আর তোর পা টিপিয়া ভাঙ্গিয়া দিব।" এই বলিয়া তাড়াতাড়ি মায়ের পদসেবা করিতে আরম্ভ করিল।

মাতা বিব্রত হইয়া গোকুলজীর হাত ধরিয়া বলিল, "এমন ছেলে ত কোথাও দেখি নি। কোন কাজ করতে দেবে না, কেবল ব্যস্ত কোরবে। সর্ বাছা, এখন স'রে যা, আমি ভাতের হাঁড়ি নামাই।"

গোকুলজী পা ছাড়িয়া মাথা ধরিল, বলিল, "মা তোর পাকা চুল তুলে দিই।"

বুড়ী রাগিয়া কহিল, "তুই ত আচ্ছা জ্বালাতন আরম্ভ করলি। ভাত গ'লে পাঁক হয়ে যায়, আর তুই এলি পাকা চুল তুলতে। এখন স'রে যা।" এই বলিয়া আবার চক্ষু মুছিল।

গোকুলজী তখন মা'র বিছানা ঝাড়িয়া আবার পাতিল। বুড়ী পানের সঙ্গে একটু করিয়া দোক্তা খায়, গোকুলজী দোক্তা দিয়া পান সাজিতে বসিল।

ভীলপুর গ্রামের এক প্রান্তে, ক্ষুদ্র কুটীরে, দরিদ্র বিধবা তাহার একমাত্র পুত্রকে লইয়া এইরূপে বাস করিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ

নিস্তব্ধ বিজন পর্ব্বতোপরি অনাবৃত মস্তকে তারা নিদ্রাভিভূত ছিল। পরদিবস প্রত্যুষে উঠিয়া গোকুল

পান করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল, তাহার পর পর্ব্বত-জাত সুমিষ্ট সুপক্ব ফল আহরণ করিয়া ভোজনানন্তর ঝরণার শীতল জল পান করিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে, অন্য কথা ভাবিতে বসিল। মাথার উপরে আকাশমাত্র চন্দ্রাতপ রাখিয়া নিদ্রা যাওয়া অসম্ভব। মাথা রাখিবার একটা স্থান চাই। এই মনে করিয়া তারা একটা মনোমত স্থান অন্বেষণ করিতে চলিল। এ-দিক ও-দিক ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিতে পাইল, উপত্যকার পার্শ্বে একটা বৃহৎ গণ্ডশৈল পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার নিম্নভাগ কতকটা একটা গহ্বরের মত, ডাল-পাতা জড় করিয়া সহজেই একটা কুটীর নির্ম্মাণ করা যায়। বিশেষ, সে স্থলে ঝড়-বৃষ্টি কোনক্রমেই লাগিতে পারে না। তারা স্থির করিল, এই স্থানে গৃহ-নির্ম্মাণ করিব।

কাজটাও বিশেষ অসাধ্য ব্যাপার নয়। পাহাড়ে গাছপালা বিস্তর, শুষ্কপর্ণ সংগ্রহ করিয়া, গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া অনায়াসে কুটীর রচিত হয়। গহ্বরের মুখের কাছে কতকগুলা গাছের ডাল রাখিয়া খুঁটির কার্য্য চলে। সেই খুঁটিতে লতা-পাতা জড়াইয়া গৃহপ্রাচীর নির্ম্মিত হইল। ভিতরে সেইরূপ একটা বেড়ার গৃহদ্বার, আর এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর অর্গল হইল। কুটীর নির্ম্মিত হইলে তারার আর আনন্দের সীমা রহিল না। একবার কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখে, আবার দূর হইতে অনিমেষলোচনে দেখে, একবার এ-পাশ দিয়া দেখে, আবার ও-পাশ দিয়া দেখে, অবশেষে ভিতরে গিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিল। দেখ, তারা কেমন ঘর বাঁধিয়াছে! এ তারার নিজের গৃহ, এখান হইতে কে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে? তারা হাসিয়াই আকুল। সে হাসি শুনিলে বুঝা যায় না যে, তারা যুবতী, সে হাসি দেখিলে জানা যায় না, তাহার কত দুঃখ। মনুষ্যের হৃদয়মন্দিরে দুঃখ সর্ব্বদা প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। কতবার সে দ্বারে করাঘাত করে, কেহ তাহাকে প্রবেশ করিতে দেয় না। কত রন্ধ্র অন্বেষণ করে, কোথাও প্রবেশপথ পায় না। কতবার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াও বাস করিতে পায় না। এমন কত দিনের পর সে হৃদয়ের সিংহাসনে আরোহণ করে, আর কেহ তাহাকে সে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারে না। এ পর্য্যন্ত তারার হৃদয়-রাজ্য একেবারে দুঃখের হস্তগত হয় নাই। এমন স্থলে তারাকে একেলা পাইয়া দুঃখ আপন রাজ্য স্থাপন করিবার যত্ন করিতেছিল। বুঝি তারা তাহাকে হাসিয়া তাড়াইয়া দিল।

দুই মাস দীর্ঘকাল। মানুষ মানুষের আসঙ্গ-লিপ্সু। যেখানে মানুষের মুখ দেখিতে পাই না, সে স্থানে এক দিন যাপন করা এক যুগ বলিয়া বোধ হয়। একে রমণী, তাহাতে যুবতী। অনেকাংশে অপ্রাকৃত, তবু মানুষী। বিশেষ সে স্থান ভীতিসঙ্কুল। মনুষ্যমুখ দেখিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, মনুষ্যের জীবনঘাতী হিংস্র বন্যপশু দেখিবার অনেক সম্ভাবনা। জীবনরক্ষার কোন উপায় নাই। এমন স্থলে তারা দুই মাস কাটাইবে কিরূপে?

মানবজগতের আর এক মোহময় বন্ধনের গ্রন্থি তাহার হৃদয়ে পড়িয়াছিল। সে বন্ধন প্রণয়ের। প্রথম প্রণয়, রমণীহৃদয়ের প্রণয়, অদম্য প্রকৃতির প্রণয়, শিলারুদ্ধ উষ্ণ প্রস্রবণের ন্যায় তাহার হৃদয়ের মধ্যে নিরুদ্ধ ছিল। পর্ব্বতে উঠিয়া প্রথম রজনীতে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহাতেও বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। সেই ভীষণ স্থানে তারা সম্পূর্ণ একাকিনী। দুই মাসকাল অতীত না হইলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না, ইহাও তাহার স্থিরসঙ্কল্প।

এমন সঙ্কল্প কেন? তারা কি তাহার পিতার কথার বাধ্য? তাহা নহে। গোকুলজী যে তাহার প্রতি প্রণয়াসক্ত, তাহার ত সে কোন প্রমাণ পায় নাই। আবার যে তাহাদের পরস্পরে কখন সাক্ষাৎ হইবে, তাহাও সংশয়স্থল। তবে গোকুলজীর মূর্ত্তি হৃদয়মন্দিরে ধ্যান করিয়া কি হইবে? এই পর্ব্বত নিতান্ত নির্জ্জন। এইখানে গোকুলজীকে সহজে ভুলিতে পারিব। কোন্ সুখেই বা গৃহে ফিরিব? আমার গৃহই বা কোথায়? আর গোকুলজী?—গোকুলজী হইতে ত আমার কোন মঙ্গল হইবে না। এই কথা বলিতে বলিতে স্বপ্নদৃষ্ট তুষারচক্ষু পাষাণপুরুষ তাহার স্মরণ হইত। সে শিহরিয়া উঠিত।

চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতপ্রাচীরপরিবেষ্টিত বৃহৎ কারাগারমধ্যে তারা বন্দিনী। পলাইলে কেহ তাহার গতিরোধ করিবে না, কিন্তু পলায়ন করিয়া কোথায় যাইবে? মনুষ্যসমাজে কে তাহাকে আশ্রয় দিবে? মানুষের আবাসস্থান যেন একটা সমুদ্রবিশেষ; নিষ্ঠুর তরঙ্গমালা তারাকে সে সমুদ্র হইতে ভাসাইয়া লইয়া, তরঙ্গ হইতে তরঙ্গে বহন করিয়া অবশেষে এই শিলাময় উপকূলে নিক্ষেপ করিয়াছে।

গোকুলজীকে ভোলা দূরে থাকুক, তাহার স্মৃতি দিন দিন গাঢ়তর হইয়া উঠিল। বিরলে

বাসিয়া স্মৃতি ও কল্পনা একত্রে যোগ দিল। যোগ দিয়া তারা'র হৃদয়ে হৃদয়ে, শোণিতে শোণিতে, জাগ্রতে স্বপ্নে গোকুলজীর মূর্ত্তি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিল। দিনমানে সূর্য্য, রাত্রে কখনও নক্ষত্রপরিবৃত চন্দ্র, কখন কেবল চঞ্চলজ্যোতি তারকারাশি। তারা কেবল তাহাই দেখিত। ভাবিত, প্রভাত-সূর্য্যের পশ্চাতে গোকুলজী আসিতেছে। চন্দ্রের সহিত সে মুখের তুলনা করিত, ক্ষীণরশ্মি নক্ষত্রের পশ্চাতে গোকুলজীর জ্যোতির্ম্ময় আয়ত লোচন দেখিতে পাইত। দ্রুতগামিনী ভয়চকিতলোচনা হরিণী দেখিলে মনে করিত, পশ্চাতে ধনুর্দ্ধারী গোকুলজী আসিতেছে। মেঘে সহস্রবিধ মূর্ত্তি দেখিলেও কেবল মনে করিত, গোকুলজীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছি। তাহার চিত্ত আর তাহার বশে নহে, প্রেমে তন্ময় হইয়া উঠিল।

প্রণয় দুই প্রকার;—এক কল্পনা, আর এক সম্ভোগ। আমি যাহাকে ভালবাসি, সে আমার নিকটে আসিয়াছে, আমি তাহাকে স্পর্শ করিতেছি। আনন্দসাগর উচ্ছ্বসিত, উচ্ছলিত হইতেছে। এই এক প্রকার প্রেম। আমি যাহাকে ভালবাসি, সে আমার নিকটে নাই। কল্পনায় আমি তাহাকে সহস্ররূপ প্রণয়োপহার দিতেছি। হৃদয়ের কতরূপ আবেগ স্মৃতির কৌশলগ্রথিত ঘটনাবলী, কল্পনার উন্মাদকারিণী লহরী। অদর্শনের যন্ত্রণা, কুহকিনী কল্পনার প্রণোদনা। এই আর এক প্রেম। এক প্রেম বিরহ, আর এক প্রেম মিলন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রঘুজীর গৃহে এখন শম্ভুজীই সর্ব্বেসর্ব্বা। তারার গৃহনির্ব্বাসনের পর সে ভিন্ন রূপ ধারণ করিল। শম্ভুজীর তরেই তারা পর্ব্বতবাসিনী, এই কারণে মায়ী এবং মহাদেব উভয়েই তাহার উপর রুষ্ট। মায়ী একবার কথায় কথায় শম্ভুজীকে দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিল। সেই অবধি শম্ভুজী তাহাদের উপর পীড়ন আরম্ভ করিল। রঘুজী মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত শম্ভুজীর বশীভূত। তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শুনিলে শম্ভুজীকে কিছু বলা দূরে থাকুক, অভিযোগীকে মারিতে উদ্যত হইত। সংসারের সমুদায় ভার শম্ভুজীর উপর। যাহাকে ইচ্ছা রাখে, যাহাকে ইচ্ছা তাড়াইয়া দেয়। মহাদেবকে তাড়াইবার চেষ্টা করায় মহাদেব বলিয়াছিল, আমি এ বৃদ্ধ বয়সে আর কোথায় যাইব? তাড়াইয়া দাও, দ্বারের সম্মুখে অনাহারে মরিয়া থাকিব। এই শুনিয়া শম্ভুজী তাহাকে বহুশ্রমসাধ্য কর্ম্মে সর্ব্বদাই নিযুক্ত রাখিত। বলিত যে, কাজ না করিলে খাইতে পাইবে না। এইরূপ আরও বহুবিধ অত্যাচারে সকলে সশঙ্কিত রহিত।

দুই মাস অতিবাহিত হইল। তারা পর্ব্বত-প্রবাস হইতে গৃহাভিমুখে ফিরিল। গোরুর পাল আগেই গিয়া গোগৃহে প্রবেশ করিল।

পাহাড় হইতে রঘুজীর গৃহে আসিতে পথে সোহিনীর বাড়ী। সোহিনী অপরাহ্ণকালে বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় তারাকে দেখিতে পাইল। সোহিনী আসিয়া তারার হাত ধরিল।

তারার আর তেমন রূপ নাই। মাথায় জটা, গায় খড়ি উঠিতেছে। মলিন-ছিন্নবসনা, যোগিনী-মূর্ত্তি। কিন্তু সে তারার চক্ষের দৃষ্টি পূর্ব্বাপেক্ষা চঞ্চল। সোহিনী তাহাকে দেখিয়া এক ফোঁটা চক্ষের জল মুছিল। বলিল, "আমি তোমাকে ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া কি আমার উপর রাগ করিয়াছ?"

তারা হাসিয়া কহিল, "না, আমি রাগ করি নাই। আমি সেখানে বেশ ছিলাম।"

সো। তবে তুমি একবার আমার সঙ্গে এস। এখনি বাড়ী যেও না।

তারা। কেন?

সো। তোমাকে একটা বিশেষ কথা বলিবার আছে। খানিকক্ষণ আমাদের ঘরে ব'স, তার পর বাড়ী যাইও।

তারা সোহিনীর মুখ দেখিয়া বুঝিল, তাহার মনে কোন অমঙ্গল সংবাদ আছে, মুখে বলিতে পারিতেছে না। তখন সে সোহিনীর সঙ্গে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

সোহিনী উত্তর করিল, "এত ব্যস্ত কেন? একটু ব'স, মুখে-হাতে জল দাও, তার পর বলিব এখন।"

তারা বিরক্ত হইয়া কহিল, "কি বলিবার আছে, বল, নহিলে আমি চলিলাম।"

সোহিনী। বলিতেছিলাম কি, তোমাদের বাড়ীতে অনেক নূতন কাণ্ড হইয়াছে। শম্ভুজীই কর্ত্তা, যা ইচ্ছা তাই করে। সে এখন বড় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে।

তারা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তা আমি

জানি। আর কিছু আছে? আমাকে ডাকিলে কেন? এই কথা বলিবার জন্য?"

সো। না, শুধু এই কথা নয়। আরও কথা আছে। সে মহাদেবকে বড় যন্ত্রণা দেয়। আর মায়ীকে তাড়াইয়া দিয়াছে।

তারার মুখের ভাবে কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইল না। পূর্ব্বের অপেক্ষা কিছু স্থিরভাবে কহিল, "আর কি?"

সো। তাহার পর মায়ীর বড় ব্যারাম হইয়াছে, বাঁচে কি না সন্দেহ।

তারা দুই তিনবার স্থির দৃষ্টিতে সোহিনীর মুখের দিকে চাহিয়া, ধীরে ধীরে বলিল, "মায়ী আর বাঁচিয়া নাই, সত্য বল?"

সোহিনী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "হাঁ।"

তারার স্বর কিছুমাত্র কম্পিত হইল না, পূর্ব্বের মত স্থির স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—এবার কণ্ঠস্বর আরও ধীর আরও মৃদু—"সে ক'দিন মরিয়াছে।"

সো। দিন পাঁচ ছয়।

তারা। কোথায়?

সো। আমাদের বাড়ীতে। শম্ভুজী তাহাকে তাড়াইয়া দিলে আমাদের বাড়ীতে দিন দশেক ছিল। ব্যারাম হইয়া আরও দশ দিন বাঁচিয়াছিল। সে সময় কেবল তোমার নাম করিত।

তারা আর কিছু না বলিয়া পিতৃ-গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

সোহিনী মনে ভাবিল, ধন্য মেয়ে! শরীরে যদি কিছু মায়া থাকে! বুড়ী মা'র মত মানুষ কোরেছিল, তার জন্যে একবার কাঁদলে না গা, একবার আহা বল্‌লে না! বেশ কোরেছিল বাপ ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এমন পাষাণপ্রাণ মেয়ের পাহাড়েই থাকা ভাল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গৃহে প্রবেশ করিতে তারা দেখিল, গৃহদ্বারে একটা স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। সে তারাকে ঘরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। তারা কিছু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকটা কালো, চক্ষু দুটা লাল লাল, তারার দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গসূচক অল্প হাস্য করিতেছিল। তারাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া কহিল, "আমাকে নতুন দেখ্‌চ না? আমি নতুন এসেছি বটে, কিন্তু সব এখন আমার হাতে। তুমি বুঝি কর্ত্তার মেয়ে? তা আমি কি করব বল? কর্ত্তা বলেচে যে, যদি তুমি তার কথা শোন, তবেই বাড়ী ঢুক্‌তে পাবে। কি কথা, তা ভাল জানি না, কিন্তু আমায় আগে না বল্লে কর্ত্তা তোমার সঙ্গে দেখা করবে না। আর যদি তুমি এখনও আপনার গোঁ বজায় রাখতে চাও ত তোমায় গোয়ালঘরে শুতে হবে।" এই বলিয়া মাগী একটু হাসিল।

বার দুই তারার চক্ষু হইতে বিদ্যুৎ ছুটিল, শেষে ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিল, "তুই দাসী, তোর কিছু অপরাধ নাই। নহিলে তোর মুখ দিয়া রক্ত তুলিতাম। স'রে যা! পথ ছাড়!"

দাসীর মূর্ত্তি ফিরিল। হাত নাড়িয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল, "জানি লো জানি, তোর বড় তেজ! তেজ দেখাতে হয়, তোর বাপকে দেখা গে যা। আমার কাছে কিসের তেজ দেখাস লা? আমি কি তোর খাই না তোর পরি যে, তোকে ভয় করব? বাপে ঠাঁই দেয় না ঘরে, ছুঁড়ী এল আমার কাছে জোর দেখাতে। বেরো এখান থেকে। যা, গোয়ালঘরে যা!"

তারা দন্তের উপর দন্ত রাখিয়া কহিল, "ভাল চাস্ ত স'রে যা। স'রে যা বল্‌চি।"

দাসী আর এক পা আগে আসিয়া কহিল, "কি লা, মারবি না কি? মার্ দেখি, তোর কত বড় সাধ্য?"

তারা একবার বদ্ধমুষ্টি মারিবার হেতু উঠাইল, আবার তখনি হাত নামাইল।

দাসী তাড়াতাড়ি একটা চেলা-কাঠ তুলিয়া লইয়া, সেইটা দক্ষিণ হস্তে আস্ফালন করিয়া কহিল, "এক ঘা যদি মার্‌বি ত তোকে সাত ঘা মারব। আয় না একবার, তোর পিঠে এই চেলা-কাঠ বসিয়ে দিই, তখন সুখ টের পাবি।"

তারা আর কিছু না বলিয়া সেখান হইতে ফিরিল। দাসী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল।

তারার হৃদয়ের ভিতর কি হইতেছিল, কে বলিবে? গৃহদ্বারে এইরূপে অপমানিত হইয়া, ঘুরিয়া বাড়ীর পশ্চাতে যে উদ্যান, সেইখানে গেল। এইখানে তারা ফুলগাছ রোপণ করিত। এইখানে শম্ভুজীকে মর্ম্মপীড়িত করিয়াছিল। এখন তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইতেছে।

উদ্যানে গিয়া তারা দেখিতে পাইল, মহাদেব কুঠার হস্তে কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে। মহাদেব এখন আরও বৃদ্ধ, শীর্ণ, অবনতকায়, মরণাপন্ন।

মহাদেবকে দেখিয়া তারা কহিল, "মহাদেব, তুমি যে কাঠ কাটিতেছ ? এ ত তোমার কাজ নয়।"

মহাদেব ফিরিয়া তারাকে দেখিল। দেখিয়া ললাটের স্বেদবিন্দু মুছিল। মুছিয়া বলিল, "তারা এসেছিস্? তোকে যে আর দেখ্‌তে পাব, সে আশা ছিল না। মামী মরেছে, বেঁচেছে। আমি এখন মরিলেই বাঁচি। এই বয়সে কপালে এত কষ্টও ছিল!" এই বলিয়া বৃদ্ধ বালকের মত রোদন করিতে লাগিল।

তারা তাহার হাত হইতে কুঠার লইয়া ভূতলে রাখিল। তাহার পর তাহার হাত ধরিয়া আম্র-বৃক্ষতলে বসাইল। বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে, সব বল।"

বৃদ্ধ কাঁদিয়া কহিল, "ওইগুলি কাঠ না কাটিলে খাইতে পাইব না। আমায় ছেড়ে দে, আমি আগে কাঠ কাটি, তাহার পর বলিব। এখনি শম্ভুজী আসিবে।" এই বলিয়া সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

তারা বৃদ্ধের হাত চাপিয়া ধরিয়া, উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, "তুমি কি সারাদিন অনাহারে আছ ?"

মহাদেব ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "কাঠ না কাটিলে রাত্রেও কিছু পাইব না, বরং প্রহারের জ্বালায় প্রাণ যাইবে।" এই বলিয়া বৃদ্ধ কাঁপিতে লাগিল।

তারা বলিল, "আমি যতক্ষণ আছি, তোমার কোন ভয় নাই। আমার সমক্ষে যদি কেহ তোমার গায়ে হাত দেয়, তাহাকে আমি ভাল করিয়া শিক্ষা দিব। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া আমার অপেক্ষা কর। এখনি খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিতেছি।"

এই বলিয়া তারা পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিল।

এইবার তারা একেবারে রন্ধনশালায় গিয়া উপস্থিত। দ্বারে সেই দাসী বসিয়াছিল। তারাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া, কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি লা! আবার যে বড় এলি ?"

তারা জিজ্ঞাসা করিল, "খাবার কোথায় ?"

দাসী কটিদেশে দুই হস্ত রক্ষা করিয়া কহিল, "খাবার এখানে কেন ? তোকে সেই গোয়ালঘরে খাবার দিয়ে আস্‌ব। এখানে এসেছিস্ কেন ?"

তারা আবার বলিল, "আমার জন্য নয়। খাবার কোথায় আছে, বল।"

দাসী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, হাসিয়া বলিল, "নেকামি করিস্ কেন ? নিজে পেটের জ্বালা দেখাতে বড় লজ্জা করে বুঝি ?"

এবার আর কিছু না বলিয়া তারা দাসীকে পদাঘাত করিল। দাসী মুখের ভরে পড়িয়া গেল। তারা গৃহে প্রবেশ করিয়া থালায় আহারদ্রব্য, ঘটী করিয়া জল লইয়া আবার উদ্যানে গেল। সেখানে গিয়া দেখিল, মহাদেব পূর্ব্বের মত কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে। তারা আম্রতরুতলে থালা-ঘটী রাখিয়া পুনর্ব্বার মহাদেবের হস্ত হইতে কুঠার লইয়া তাহাকে খাইতে বলিল। মহাদেব অনশনে কাতর, দ্বিতীয় কথা না বলিয়া আহারে বসিয়া গেল। আহার করিতে করিতে বলিল, "আজ সব কাঠ কাটা হইল না। না জানি অদৃষ্টে কত ভোগই আছে।"

তারা কহিল, "তোমার ভয় নাই, তুমি আহার করিয়া একটু বিশ্রাম কর। আমি তোমার কাঠ কাটিয়া রাখিতেছি।"

তারা স্বয়ং ক্ষুৎপিপাসাপীড়িতা। মহাদেব তাহা জানে না, তারাও কিছু বলিল না।

যতক্ষণ মহাদেব আহার করিতেছিল, ততক্ষণ তারা তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল। আহারান্তে তাহাকে বলিল, "তুমি এইখানে একটু ব'স, আমি কাঠ কাটিয়া আনিতেছি।"

মহাদেব অনেক দিন এমন বিশ্রামের অবকাশ পায় নাই। সে বসিয়া রহিল। তারা এক হাতে কাষ্ঠভার, অপর হস্তে কুঠার লইয়া কিয়দ্দূর উদ্যানের ভিতর গিয়া কাষ্ঠ ছেদন করিতে আরম্ভ করিল। কুঠারের এক এক আঘাতে কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড হইয়া বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। কাঠুরিয়া সে হস্তের বল দেখিলে নিঃসন্দেহ বিস্মিত হইত।

সে পর্য্যন্ত তেমন অন্ধকার হয় নাই। তারা কাষ্ঠ-চ্ছেদন প্রায় সমাপ্ত করিয়াছে, এমন সময় কাতর আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইল। অনুমানে বুঝিল, মহাদেব আর্ত্তনাদ করিতেছে। কুঠার হস্তে তারা সেই দিকে ছুটিয়া গেল। গিয়া দেখিল, মহাদেব ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া চীৎকার করিতেছে, শম্ভুজী বারংবার তাহাকে নির্দ্দয়রূপে কশাঘাত করিতেছে, আর বলিতেছে, "বড় বসিয়া বসিয়া আহার করিতিস, না ? এখনও কেবল বসিয়াই থাবি, কেমন ? আচ্ছা খা, এই খা, এই খা, এই খা, আরও খা।" বৃদ্ধ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে।

সহসা শম্ভুজী দেখিল, মস্তকে দীর্ঘ জটা, চক্ষে অতি ভয়ানক কোপকটাক্ষ, এক ভৈরবী বেগে

তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভৈরবীর নয়নাগ্নি, তাড়িৎপ্রবাহের ন্যায় শম্ভুজীর চক্ষু ঝলসিত করিল। তারা আসিয়াই কহিল, "নরাধম, এই খা!" সন্ধ্যালোকে একবার শাণিত কুঠার চমকিল। সেই মুহূর্ত্তে শম্ভুজী হতচেতন হইয়া ভূতলশায়ী হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

রন্ধন-গৃহদ্বারে মুখরা দাসী পদাহত হইয়া কিয়ৎকাল দুঃখের ভরে ভূপাতিত রহিল। তাহার পর উঠিয়া বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু রগড়াইয়া আরক্তবর্ণ করিল। তখন ধীরে ধীরে উঠিয়া রঘুজীর ঘরে গেল। তাহার সম্মুখে কাঁদিয়া বলিল, "আমি আর এখানে থাকব না। আমি চল্লাম।"

রঘুজী পীড়িত, বাতরোগে শয্যাশায়িত। অস্থিগ্রন্থি সকল অবশ, অসাড়, বাতের বেদনায় অস্থির। দাসীকে রোদন করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? কি হইয়াছে?"

দাসী কহিল, "তোমার সেই মেয়ে আসিয়াই বিনাপরাধে আমাকে লাথি মারিয়াছে। আমি আর এখানে থাকব না।" এই বলিয়াই দাসী চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল।

রঘুজী যন্ত্রণা সহকারে উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "সে কোথায় আছে?"

তারা থালা হাতে করিয়া বাড়ীর পিছন দিকে গেল, দাসী তাহা দেখিয়াছিল। রঘুজীর কথায় উত্তর করিল, "বোধ হয়, বাগানে আছে।"

রঘুজী বলিল, "তুই যা, আমি বাগানে যাইতেছি। তুই আমার আগে সেইখানে গিয়া তাহাকে দেখ্।"

দাসী রঘুজীর ঘর হইতে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া, দ্রুতগতি বাগানের দিকে চলিয়া গেল। রঘুজী লাঠী ধরিয়া অনেক কষ্টে পশ্চাতে আসিতেছিল।

দাসী উদ্যানে প্রবেশ করিয়াই দেখিল, তারা শম্ভুজীর মস্তকে কুঠারাঘাত করিল ও শম্ভুজী রুধিরাক্তকলেবরে ধরণীশয়ন করিল। এই দেখিয়াই দাসী প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে বাবা রে! খুন করেছে রে! তোমরা সব দৌড়ে এস গো। ওরে, খুন কল্লে রে!"

শম্ভুজী মুমূর্ষুর মত পড়িয়া গেল দেখিয়া তারার চৈতন্য হইল। কুঠার পরিত্যাগপূর্ব্বক, যেখানে দাসী দাঁড়াইয়া ছিল, সেই দিকে গেল। তাহাকে দেখিয়া দাসী চীৎকার করিতে লাগিল, "খুন ক'রে পালিয়ে যাচ্ছে গো! খুনে মাগীকে তোমরা ধর গো!"

তারা ধীরে ধীরে দাসীকে কহিল, "আমি পলাই নাই। তুই চীৎকার রাখিয়া শম্ভুজীকে দেখ্। সত্য সত্যই উহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি কি না, আগে দেখ্। তাহার পর চীৎকার করিস্।"

দাসী ভীতা হইয়া শম্ভুজীর নিকটে গেল। চীৎকারও বন্ধ হইল। তাহার সে উগ্রচণ্ডামূর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়াছে।

তারা স্থির গতিতে গৃহে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় দেখিল, যষ্টির উপর ভর করিয়া দ্বারের সম্মুখে রঘুজী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রঘুজী ক্লিষ্ট, দুর্ব্বল, যন্ত্রণাকাতর, কিন্তু এ সময় ক্রোধে কাঁপিতেছে। মুখমণ্ডল অতি বিকট অন্ধকার।

নিকটেই আর একটা মুক্ত দ্বার দেখিয়া তারা সেই পথে ঘরে প্রবেশ করিল। সেখান হইতে বাহির হইয়া গৃহপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইল। দাসীর চীৎকারে চারি পাঁচ জন লোক পার্শ্বস্থিত ক্ষেত্র হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। তাহারা রঘুজীর বেতনভুক্ত। দেখিতে দেখিতে আরও চারি পাঁচ জন লোক আসিয়া জুটিল। প্রাঙ্গণ লোকে পূরিতে আরম্ভ হইল। রঘুজী আবার লাঠী ধরিয়া প্রাঙ্গণের নিকটে আসিয়া তারাকে দেখিতে পাইয়া দাঁড়াইল। তারা স্থির, গম্ভীর, সম্পূর্ণ অবিচলিত।

শম্ভুজী মরে নাই। তারা কুঠারের শাণিতাগ্র দিয়া আঘাত করে নাই, তাহা হইলে শম্ভুজীর নিশ্চিত প্রাণবিনাশ হইত। কুঠারের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া প্রহার করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু সেই আঘাতে শম্ভুজী মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। মস্তকাবরণ-চর্ম্ম কাটিয়া যাওয়ায় রক্ত বহিতেছিল। অল্পকাল পরে চৈতন্যপ্রাপ্তি হইলে শম্ভুজী হস্তদ্বয়ের ভরে উঠিয়া বসিল। পরিহিত বস্ত্রের কিয়দংশ ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া প্রাঙ্গণের উপরে যাইয়া দাঁড়াইল। দাসীও সেই সময় উঠিয়া গেল।

রঘুজী তারার দিকে চাহিয়া ভৃত্যদিগকে বলিল, "উহাকে ধর্।"

তারা একবার তাহাদের দিকে কটাক্ষ করিল।

তাহারা কেহ তাহাকে ধরিতে অগ্রসর হইল না। তারা রঘুজীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "আমাকে ধরিতে হইবে না, সঙ্গে লোক থাকিলেই হইবে। আমায় কোথায় যাইতে হইবে বল, আমি আপনিই যাইতেছি।"

রঘুজী। আমার বাড়ীতে আমিই বিচারকর্ত্তা। আমার নিকট অপরাধ করিয়া কেহ কখন অন্য বিচারালয়ে যায় নাই। আমার কন্যা আমার দণ্ডে দণ্ডিত হইবে? তোরা উহাকে ধর, আমি বলিতেছি।

তারা গর্জ্জিয়া উঠিল, "সাবধান, কেহ আমাকে ধরিও না। তুমি আমার অপরাধের বিচার করিবে, রঘুজী? মনুষ্যহত্যা-স্ত্রীহত্যার পাতকী, মানবকুলকলঙ্ক, তুমি আমার বিচারকর্ত্তা? কাপুরুষ, দুর্ব্বলের পীড়ককে উচিত শাস্তি দিয়াছি, তুমি আমার বিচার করিবে? রঘুজী, তোমার বিচার ঐখানে হইতেছে" এই বলিয়া ঊর্দ্ধে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিল।

সে ভীম মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার অঙ্গস্পর্শ করিবার কাহারও সাধ্য রহিল না।

ক্রোধে রঘুজীর বাক্‌শক্তি রহিত হইবার উপক্রম হইল। রুদ্ধকণ্ঠে পার্শ্বস্থ একটা ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ভীরু, একটা বালিকাকে ধরিতে পারিস্ না? আমি আপনিই ধরিতেছি।" এই বলিয়া লাঠী ধরিয়া, তারা যে দিকে দাঁড়াইয়া ছিল, সেই দিকে বহু কষ্টে অগ্রসর হইল।

তারা আর এক দিকে সরিয়া গেল। রঘুজী স্বয়ং আসিতেছে দেখিয়া দুই জন বলিষ্ঠকায় পুরুষ সাহস করিয়া তারাকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল। তারা মাথা তুলিয়া, জটাভার আন্দোলিত করিয়া, চক্ষু হইতে জলন্ত বিদ্যুৎ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "আমি কোথাও পালাই নাই। এখনও কেহ আমায় স্পর্শ করিও না। শম্ভুজীর দশা মনে রাখিও।" তাহারা নিরস্ত হইল।

রঘুজীর দিকে ফিরিয়া তারা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ধরিয়া কি করিবে?"

রঘুজী বেদনায় অস্থির, আর চলিতে পারে না। যে স্থলে দণ্ডায়মান ছিল, সেই স্থান হইতে উত্তর করিল, "তোকে ধরিয়া বন্য পশুর মত একটা ঘরে পুরিয়া রাখিব। যত দিন তোর দর্প না চূর্ণ হয়, তত দিন তোকে মুক্ত করিব না।"

তারার পক্ষে ইহাই অত্যন্ত কঠিন শাস্তি। সে ভীত হইয়া কাতর স্বরে কহিল, "আমার জন্য আর কোন শাস্তির বিধান কর, আমাকে প্রাণে কর, কিন্তু আমাকে ঘরে বন্ধ করিও না, সে যন্ত্র আমি সহ্য করিতে পারিব না।"

রঘুজী অল্প, ঈষৎ—পিশাচে যদি ঈষৎ হাসিতে পারে সেইরূপ—অল্প হাসিয়া কহিল, "আমাকে তুই জানিস্। আমি তোকে আর কোন শাস্তি দিব না।" অনুচরগণকে বলিল, "উহাকে এখনি ধর, নহিলে কাল তোদের সকলকে দূর করিয়া দিব।"

এরূপ আজ্ঞা শুনিয়া সকলে তারাকে ধরিতে উদ্যত হইল। যে দুই জন তাহাকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়াছিল, তাহারা তারার দুই হস্ত ধারণ করিল।

গহন বনে শাবক রাখিয়া আহারান্বেষণে লোকালয়ে আগতা ব্যাঘ্রী অকস্মাৎ কারাবরুদ্ধ হইলে যেরূপ ভীত ও ক্রুদ্ধ হয়, তারা রঘুজীর দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া সেইরূপ বিকলচিত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিবার চিন্তিবার অবকাশ রহিল না। দুই জনে তাহার হস্ত ধরিল দেখিয়া সে অতি বেগে আপনার হস্ত আকর্ষণ করিল। এক জন হস্তাকর্ষণের বেগে দূরে নিপতিত হইল, আর এক জন দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া রহিল। মুক্তহস্তে তারা তৎক্ষণাৎ তাহার মুখে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিল। সে তাহার হস্ত পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। তাহার নাসিকা দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল।

নিমেষমধ্যে তারা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া চুল্লী হইতে এক খণ্ড জলন্ত ইন্ধন-কাষ্ঠ তুলিয়া লইয়া মাথার উপর ঘুরাইতে ঘুরাইতে ঘর হইতে বাহির হইল। হুতাশননয়না, হুতাশনহস্তা, রুদ্ররূপিণী রমণী দেখিয়া যে যে দিকে পাইল, পলায়ন করিল। বাটীর বাহিরে আসিয়া তারা দেখিল, রঘুজীর উত্তেজনায় অনেকে তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছে। তাহার শরীরে আর বড় বল নাই। এত লোকে পশ্চাদ্ধাবিত হইলে পলায়ন দুষ্কর। আর কোন উপায় না দেখিলে নিস্তার নাই।

তারা ফিরিয়া দাঁড়াইল। সে যে স্থানে দাঁড়াইল, সেখান হইতে অনুমান পঞ্চাশ হস্ত দূরে একটা বৃহৎ মরাই ছিল। তাহার উপরে আঁটি-বাঁধা রাশীকৃত খড় থাকিত। তারা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে উপহাস করিয়া কহিল, "আমাকে ধরিবে? তবে ধর!" এই বলিয়া জলন্ত কাষ্ঠখণ্ড ঘুরাইয়া মরাইয়ের উপর নিক্ষেপ করিল। খড় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

'কি হইল! কি হইল!' বলিয়া সকলে আগুন নিভাইতে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে অগ্নি বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

সেই অবকাশে তারা বাই পিঞ্জরমুক্ত বনবাসিনী কুরঙ্গিণীর মত লঘুপদক্ষেপে পলায়ন করিল। আবার যে পর্ব্বতবাসিনী, সেই পর্ব্বতবাসিনী হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হূ—হূ—হূ—হূ বায়ু বহিল। পর্ব্বতশিখর হইতে নামিয়া উপত্যকায় প্রধাবিত হইয়া, পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থিত তরুলতা, প্রমথিত, তরুমূল উন্মূলিত করিয়া ভীষণ ঝটিকা গর্জ্জিতে লাগিল। বাত্যাবিতাড়িত রাশি রাশি উপলখণ্ড চট্ চট্ শব্দে প্রস্তরে প্রহত হইল। ঘূর্ণীবায়ু ধূলিস্তম্ভ তুলিয়া ক্ষিপ্তের মত ইতস্ততঃ আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণমেঘ ঝটিকামুখে ধাবিত হইয়া শিখরিশৃঙ্গে জমিয়া বসিল। কাল মেঘের পর কাল মেঘ, দেখিতে দেখিতে আকাশ বিচ্ছেদশূন্য কৃষ্ণজলদে সমাচ্ছন্ন হইল। আকাশ অত্যন্ত অন্ধকার, মসীময়। পর্ব্বতের উপরে তুমুল ঝটিকা। ধূলিরাশি বায়ুবেগে উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশে উঠিল। মেঘ আকাশ হইতে নামিয়া ধূলির সহিত মিশিল। সঙ্কীর্ণসলিলা নির্ম্মল নির্ঝরিণীর জল আবিল হইয়া উঠিল। পর্ব্বতপ্রদেশের নিস্তব্ধতার সমাধি ভঙ্গ করিয়া ঝঞ্ঝা গর্জ্জিতে লাগিল।

গগনব্যাপী অন্ধকারময় মেঘের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া দীর্ঘ বিদ্যুৎ চমকিল। তাহার পর মেঘগর্জ্জন। আবার গগনপ্রান্ত হইতে পর্ব্বতশিখরের উপরিভাগ পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ হানিল। আবার অতি ভয়ঙ্কর রবে দীর্ঘকাল মেঘ মন্দ্রিত হইল। অদ্রিগুহায় সহস্র স্থলে সে গর্জ্জন প্রতিধ্বনিত হইয়া, এক কন্দর হইতে অন্য কন্দরে, উপত্যকা হইতে অধিত্যকায় দ্বিগুণিত হইয়া গড়াইতে লাগিল। ভয়বিহ্বলা হরিণী দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলাইল। কোন পশু ভীত হইয়া গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল, গুহাভ্যন্তরে ভৈরব শব্দ শুনিয়া বেগে পলায়ন করিল। কদাচিৎ কোন পক্ষীর কাতর চীৎকার ঝটিকাগর্জ্জনের মধ্যে শ্রুত হয়। মেঘগর্জ্জনের মধ্যে মধ্যে ঝঞ্ঝাবায়ু আঘূর্ণিত হইয়া গর্জ্জিতে লাগিল।

মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে মাত্র। তথাপি পর্ব্বতের উপর মেঘে অন্ধকার করিয়া রহিয়াছে। উপত্যকায় সেই সময় দুই পথিক অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে। এক জন অশ্বপৃষ্ঠে আর এক জন অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া যাইতেছে, এমন সময় সহসা তাহাদের মস্তকের উপর দিয়া ঝটিকা বহিল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকিল, মেঘ গর্জ্জিল। চক্ষে, নাসিকায়, মুখে ধূলা পুরিয়া যাওয়াতে তাহাদের নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। অন্ধকারে দিঙ্‌নিরূপণের উপায় রহিল না। অশ্ব যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে লাগিল। অশ্বারোহণে একটি রমণী ছিল। সে তাহার সঙ্গীকে মিনতি করিতেছিল, "অশ্বের মুখরজ্জু ছাড়িয়া দিও না।"

অকস্মাৎ ধূলিপূর্ণ ঘূর্ণীবায়ু তাহাদিগকে আবৃত করিলে অশ্ব ভীত হইয়া সবেগে ধাবিত হইবার চেষ্টা করিল। বলিষ্ঠ পুরুষ তাহাকে নিরস্ত করিল। রমণী ভয়ে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইল। সহসা সেই মানবশূন্য প্রদেশে মনুষ্যকণ্ঠে সেই চীৎকারের প্রতিশব্দ হইল। অশ্বমুখরজ্জুধারী পুরুষ মনে করিলেন, এ শব্দ প্রতিধ্বনিমাত্র। তখন আবার শুনিলেন, অদূরে ঝটিকা এবং মেঘের গর্জ্জন ভেদ করিয়া অতি তীক্ষ্ণ মনুষ্যকণ্ঠ আশ্বাসবাক্য প্রদান করিতেছে। পথিক তখন ভেরীনিনাদ তুল্য স্বরে ডাকিয়া কহিলেন, "আমরা অত্যন্ত বিপদে পড়িয়াছি, এ ভয়াবহ স্থানে আর কোন মনুষ্য আছে কি?"

এই সময় ধূলিরাশি অপসৃত হওয়াতে পথিক চক্ষু মর্দ্দিত করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। অশ্বারোহিণী অপহৃতচেতন হইয়া নিমীলিত চক্ষে অশ্বপৃষ্ঠে রহিয়াছে। পাদচারী পুরুষ এক হস্তে তাঁহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়াছেন, আর এক হস্তে অশ্বের মুখরজ্জু ধরিয়াছেন। রমণীর মস্তক তাঁহার স্কন্ধে রক্ষিত হইয়াছে। অশ্ব ভয়ে নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পথিক বড় বিপদে পড়িয়াছেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। কিয়দ্দূরে এক জন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া পথিক বলিয়া উঠিলেন, "মহাদেব! এ যে স্ত্রীলোক!" মনে করিলেন, ইহাকে দিয়া উপকৃত হওয়া দূরে যাউক, ইহার বিপদ্ আমার অপেক্ষাও অধিক।

পথিক বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, রমণী স্থিরপদক্ষেপে দ্রুতগতি সেই অভিমুখে আসিতেছে। সমীপে আসিলে দুই জনেই পরস্পরকে চিনিতে

পারিয়া চমকিয়া উঠিল। এক জন মনে মনে বলিল, 'গোকুলজী!' অপর ব্যক্তি অস্ফুট স্বরে কহিল, 'রঘুজীর কন্যা!'

ইতিপূর্ব্বে তারাকে দেখিলে গোকুলজীর আহ্লাদের সীমা থাকিত না। এখন সে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। তারা তাহা লক্ষ্য করিল।

গোকুলজী অনায়াসে বুঝিল যে, তারা গৃহ-নির্ব্বাসিত হইয়া পর্ব্বতে কোন স্থানে বাস করে, ঘটনাক্রমে এই বিপত্তিকালে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। গোকুলজী প্রথম বিস্ময়ের ভাব লুপ্ত হইলে কথঞ্চিৎ পরুষ স্বরে তাহাকে কহিল, "তোমা দ্বারা আমাদের কি সাহায্য হইবে? যে পিতৃগৃহে অগ্নিপ্রদান করে, তার নিকট উপকৃত হওয়ার চেয়ে মরণ ভাল।"

তারার চক্ষের জ্যোতি নিভিয়া গেল, হৃদয় স্তম্ভিত হইল। মনোভাব গোপন করিয়া দৃঢ় স্বরে কহিল, "বিপদের সময় কোন বিচার চলে না। আমি অতি পাপিষ্ঠা হইলেও এ সময় আমাকে ঘৃণা করিও না। একবার এ দিকে চাহিয়া দেখ।" এই বলিয়া অশ্বপৃষ্ঠস্থিতা রমণীকে ক্রোড়ে করিয়া নামাইল। রমণী তখনও অচৈতন্য।

তারা মূর্চ্ছিত যুবতীর প্রতি একবার অতি তীব্র কটাক্ষপাত করিল, তাহার পর তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া, গোকুলজীকে কহিল, "তুমি অশ্ব লইয়া আমার পশ্চাৎ আইস। আমার কুটীর অতি নিকটে।"

তখনও প্রবলবেগে ঝটিকা গর্জ্জিতেছে। তারা যুবতীকে ক্রোড়ে করিয়া অনায়াসে কুটীরমুখে চলিল। গোকুলজী তাহার অদ্ভুত সামর্থ্য দেখিয়া মনে মনে বলিল, "বিধাতঃ! এমন শরীরে পাপের বাসস্থান কেন নির্দ্দেশ করিয়াছিলে?"

কুটীরে প্রবেশ করিয়া তারা মূর্চ্ছিতা রমণীকে পর্ণশয্যায় শয়ন করাইল। তাহার পর তাহার চৈতন্যোৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মুখে জলসিঞ্চনানন্তর মুখমণ্ডল নির্ম্মল হইলে তারা দেখিল যে, সে বড় সুন্দরী। একবার ঈর্ষ্যানল জ্বলিয়া উঠিল; তারা ভাবিল, আমার অপেক্ষা এ কোন্ অংশে সুন্দরী যে, গোকুলজী ইহাকে বিবাহ করিল? আবার তখনি ভাবিল, আমার ত সে সব আশা ঘুচিয়াছে। গোকুলজী যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করুন না কেন, আমার তাতে কি?

তবু হৃদয় মানিল না। তারা মনকে কত বুঝাইল, তবু মন বুঝিল না। কত শতবার তারা গোকুলজীর মূর্ত্তি ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, শত-বার সে মূর্ত্তি তাহার স্মৃতিপটে উজ্জ্বলতর বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছিল। কতবার ভাবিত, আমি পাথারে ভাসিয়াছি, কোথাও কূল-কিনারা পাইব না তবু আশার একটি তৃণ ছাড়িতে পারিত না। কতবার ভাবিত, আমি মনুষ্যসমাজবহির্ভূত, মানুষ যে বন্ধনে আবদ্ধ হয়, আমি তাহাতে বাঁধা পড়িব কেন? ইহাতে হৃদয়ে আরও কঠিন নিগড় পড়িল। পোড়া মন এমনি অবুঝ, যত বুঝাও, তত আরও উল্টা বুঝিবে। যখন তারার প্রতীতি জন্মিল যে, এই যুবতী গোকুলজীর বিবাহিতা স্ত্রী, তখন তাহার হৃদয় বিদীর্ণ মরুভূমির মত একেবারে শূন্য হইয়া উঠিল। বিষাদসাগরে ভাসমান তরণী যেন অগাধ জলে নিমগ্ন হইল। কুটীরের বাহিরে ঝটিকাগর্জ্জন যেন দূরে মিশাইয়া গেল। কুটীর-দ্বারে গোকুলজীর মুখ ভাল লক্ষিত হয় না। লুপ্তচেতন তরুণীর সুন্দর মুখ অন্ধকারে লুকাইল। তারা চতুর্দ্দিকে চক্ষু ফিরাইল। চক্ষে কেবল অন্ধকার দেখা যায়, আর কিছু না। তখন সে দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিল।

কতক্ষণ পরে মূর্চ্ছিতা রমণী চেতনা পাইয়া চক্ষুরুন্মীলিত করিয়া সাতিশয় বিস্ময় সহকারে দেখিল, সে এক ক্ষুদ্র কুটীরমধ্যে কোমল শয্যায় শয়ান রহিয়াছে। আরও বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাহার পার্শ্বদেশে এক যোগিনী হস্তদ্বয়ের মধ্যে মুখ লুক্কায়িত করিয়া বসিয়া আছে। তৈলশূন্য জটাভার চারিদিকে পড়িয়াছে, পরিধেয় বসন ছিন্ন, গ্রন্থিবিশিষ্ট, নিতান্ত মলিন। যুবতী কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া মনে ভাবিল, এ কে? আসন্ন বিপদ্ হইতে এই তপস্বিনী নিশ্চিত আমাকে রক্ষা করিয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া তাহার মুখ দেখি-বার জন্য হস্ত দ্বারা তাহার অঙ্গস্পর্শ করিল। বিজন-বাসিনী সঙ্কুচিত হইয়া হাত সরাইয়া লইল। দুই জনে পরস্পর চাহিয়া দেখিল, দুই জনেই সুন্দরী। তারার চক্ষের জ্যোতি বড় প্রখর, কোমল-চক্ষু কোমলপ্রকৃতি সুন্দরী সে চক্ষের সমক্ষে আপনার চক্ষু অবনত করিল।

গোকুলজী কুটীরের বাহিরে অশ্ব বন্ধন করিয়া কুটীরের দ্বারদেশে নীরবে দণ্ডায়মান ছিল, রমণী প্রকৃতিস্থ হইয়াছে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন গোরী, এখন কিছু ভাল বোধ হইতেছে?"

গৌরী নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কথা কহিবার শক্তি নাই। হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করিল, ভাল আছি।

তারা মনোভাব গোপন করিয়া গৌরীকে বলিল, "বড় দুর্ব্বল হইয়াছ। একটু দুধ গরম করিয়া দিতেছি, পান কর। তাহা হইলে শরীরে একটু বল পাইবে।"

গোকুলজী কিছু বেগের সহিত শুষ্কভাবে কহিল, "দুধ খাইবার কোন আবশ্যক নাই। আমরা এখনি যাইব।"

তারা গোকুলজীর দিকে স্থিরদৃষ্টি ফিরাইয়া অকম্পিত স্বরে কহিল, "নিতান্ত নির্দ্দয় হইলেও এমন অবস্থায় স্ত্রীলোককে পথ চলিতে বলে না। অসময়ে চণ্ডালের আতিথ্যও অস্বীকার করিতে নাই। যে এখনও কথা কহিতে পারিতেছে না, তাহাকে এই পর্ব্বতের উপর দিয়া ঝড়বৃষ্টিতে লইয়া যাইতে কি তোমার কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ হয় না?"

এই বলিয়া তারা দুধ গরম করিতে বসিল।

পাহাড়ের উপর দু চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়িয়া আবার থামিয়া গেল। ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল।

গোকুলজী তাহার কথায় কোন উত্তর না দিয়া, কুটীরের বাহিরে, যেখানে অশ্ব বাঁধা ছিল, সেই-খানে চলিয়া গেল।

তারা অনেক সন্ধান করিয়া দু একটি মৃৎপাত্র জড় করিয়াছিল। একটি পাত্রে দুগ্ধ কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইলে অল্প অল্প করিয়া গৌরীকে পান করাইল। তাহার পর বাহিরে গিয়া গোকুলজীকে বলিল, "কুটীরে কিছু ফলমূল আছে, আসিয়া আহার কর। আমার গৃহে আহার করিলে জাত যাইবে না।"

গোকুলজী উত্তর করিল, "আমার ক্ষুধাবোধ হয় নাই। আমি কিছু খাইব না।"

তারা একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার সঙ্গে কি তোমার স্ত্রী?"

গোকুলজী বিরক্তভাবে কহিল, "সে খোঁজে তোমার কাজ কি?" তারা কিছুমাত্র রাগ করিল না। আবার অতি করুণস্বরে কহিল, "লোকে যাই বলুক, গোকুলজী, তুমি আমাকে তত মন্দ মনে করিও না। তুমি ত ভিতরকার সব খবর জান না।"

গো। ভিতরকার খবর জানিবার আবশ্যক কি? তুমি কি শম্ভুজীকে খুন করিবার চেষ্টা কর নাই? শম্ভুজী হাজার দোষ করিলেও তোমার পাপের ভাগ ত কিছু কমিবে না? পিতৃগৃহে অগ্নি জ্বালাইয়া পলায়ন করিয়াছিলে, তাহার অপেক্ষা মহাপাতক কিছু আছে? তোমার নিকটে উপকৃত না হইয়া যদি আমরা গিরিগহ্বরে পতিত হইতাম ত ভাল হইত।

তারার নয়নে অগ্নি জ্বলিল। সে প্রকৃতির অনবনমনীয় গর্ব্ব ফিরিয়া আসিল। উদ্ধতস্বরে কহিল, "তুমি আমাকে মন্দ কথা বলিবার কে? আমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিব, সে জন্য তোমার কাছে দায়ী নহি। তুমি কি জানিবে, কেন আমি শম্ভুজীকে আঘাত করিয়াছিলাম, কেন আমি রঘুজীর গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া-ছিলাম? তুমি আমাকে মন্দ কথা বলিবে কেন? তোমার কোন কথা আমি কেন সহ্য করিব?"

গোকুলজী ভাবিল, বাঘিনীর ঘরে আসিয়া তাহাকে ঘাঁটান ভাল নহে। এই ভাবিয়া নিরু-ত্তর হইল। তারার সম্বন্ধে তাহার যে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহা আরও দৃঢ় হইল।

তারা কুটীরে ফিরিয়া গেল। অভিমানানল নির্ব্বাপিত হইল। কুটীরে গিয়া দেখিল, গৌরী উঠিয়া বসিয়াছে। তারা তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "যিনি তোমার সঙ্গে আছেন, উনি কি তোমার স্বামী?"

গৌরী একটুখানি দুষ্ট হাসি হাসিয়া, চোখ ঘুরাইয়া, তাহার পানে আড়নয়নে কটাক্ষ করিয়া কহিল, "না।"

তারা। তবে কি উনি তোমায় বিবাহ করি-বার জন্য লইয়া যাইতেছেন?

গৌরী। না।

তারা। কিছু দিন পরে তোমাদের বিবাহ হইবে?

গৌরী না।

"তবে"—এই বলিয়াই তারা চুপ করিল।

গৌরী বুঝিয়া কিছু গম্ভীরভাবে কহিল, "আমি তোমার কথা বুঝিয়াছি। তবে আমি পরপুরুষের সঙ্গে কেন একাকিনী এমন পথ দিয়া যাইতেছি, তুমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাও। এই কথাটির উত্তর দিতে পারিব না। নিষেধ আছে। তুমি সে কথা জিজ্ঞাসা করিও না।"

তারা কিছু চিন্তিতা হইল, কিছু ভাল বুঝিতে

পারিল না। অবশেষে কহিল, "আজ রাত্রি তোমরা এইখানেই থাক, কাল প্রাতে যাইও।"

গৌরী হাসিয়া বলিল, "ক্ষতি কি! তুমি আমাকে যে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছ, সে ঋণ কখন শুধিতে পারিব না। তা না হয় তোমার আশ্রয়ে একটা রাত থাকিলাম। সে ত ভালই।"

এই সময় গোকুলজী পুনরায় কুটীরদ্বারের সম্মুখে আসিল। তারা তাহাকে দেখিয়া বলিল, "আজ তোমরা এইখানে থাক। কাল না হয় যাইও। এখনও কি হয় বলা যায় না।"

বৃষ্টি আদৌ অধিক পড়ে নাই। ঝটিকার বেগ অনেক পরিমাণে শমিত হইয়াছিল, মেঘগর্জ্জনও ক্রমে বিরল হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু আকাশ ঘোরতর মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার রহিল।

গোকুলজী কহিল, "আর আমরা থাকিতে পারি না। এখন আর কোন ভয় নাই। আমরা চলিলাম।"

গৌরী গোকুলজীকে সম্বোধন করিয়া মধুরকণ্ঠে কহিল, "তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন? ইঁনি আমাকে এমন বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, ইঁহার ত একটা কথা রাখা উচিত। আকাশ এখনও অন্ধকার হইয়া আছে, আজ রাত্রি এখানে থাকিলে দোষ কি? তুমি কিছু খাও দাও। ঘোড়াটাকে কিছু খাইতে দাও, তার পর কাল সকালবেলা যাইব।"

গোকুলজী কঠোরস্বরে কহিল, "এখনই যাইতে হইবে। তুমি আর বিলম্ব করিও না, উঠিয়া আইস।"

গোকুলজীর অন্ধকার মুখ দেখিয়া গৌরী আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। তারার নিকটে বিদায় লইবার মানসে তাহার চরণস্পর্শ করিতে উদ্যত হইল। তারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া নিবারণ করিল। গোকুলজী আসিয়া গৌরীর হাত ধরিয়া, ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "অনর্থক আর বিলম্ব করিও না। আমার সঙ্গে আইস।"

গৌরী অতিমাত্র বিস্মিতা, অজানিত ভয়ে ভীত হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় গোকুলজীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বাহিরে আসিয়া গোকুলজী তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া অশ্বের মুখ-রজ্জু ধরিয়া শীঘ্রগমনে চলিয়া গেল। পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল না।

পর্ব্বতের পথ অত্যন্ত উচ্চনীচ, গোকুলজী শীঘ্রই পথ চিনিয়া লইয়া তারার দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

তখন কুটীরমধ্যে প্রস্তরাসনে বসিয়া অভাগী তারা রোদন করিতে লাগিল। দুই হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া সেই প্রাণিশূন্য ভয়ঙ্কর স্থানে আপনার অদৃষ্ট ভাবিতে লাগিল। অঙ্গুলীর মধ্য দিয়া আগে বড় বড় দু ফোঁটা অশ্রুজল, দুইটা মুক্তার মত গড়াইয়া পড়িল। তার পর আরও দু ফোঁটা, তার পর অবিরল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। ভাবিল, কি কপাল লইয়া সংসারে আসিয়াছিলাম! পূর্ব্বজন্মকৃত কত পাপের ফল ভোগ করিতেছি। গোকুলজী, কুক্ষণে তোমায় আমায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কেন গৃহবহিষ্কৃত হইয়াছিলাম, তা কি তুমি জান না? সে কথা যে বলিবার নয়, গোকুলজী, তা নহিলে আজ আমি তোমায় সব কথা খুলিয়া বলিতাম। বুকে যে পাথর বাঁধিয়াছি, আজ সে পাথর তোমার সাক্ষাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম। লোকে বলিবে, তারা মহাপাপিষ্ঠা। তারা কেন যে পাপিষ্ঠা হইল, তাহা ত কেহ জানিবে না। গোকুলজী, গৃহত্যাগ করিয়া এই পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছিলাম কার আশায়, তা তোমাকে কেমন করিয়া বলিব? হায়, স্বপ্নের কথা কেন ভুলিলাম? কেন আবার লোকালয়ে ফিরিলাম? যে সুখ অদৃষ্টে নাই, কেন সে সুখের আশায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম? পর্ব্বতশিখর হইতে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম না কেন? গোকুলজী ত আমার মনের কথা কিছুই জানিবে না। সে ত আমাকে চিরকাল ঘোর পাপিষ্ঠা মনে করিবে। তাহাকে সব কথা না বলিয়া কেমন করিয়া মরিব? সে যদি নিরপরাধে আমাকে গুরুতর অপরাধিনী মনে করে, তাহা হইলে আমি মরণেও শান্তি পাইব না। কেন গোকুলজীর সহিত বিবাদ করিলাম, কেন তাহাকে কুকথা বলিলাম? কেন তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলাম না, কেন তাহার নিকটে সব কথা বলিলাম না? তাহা হইলে তাহার কোমল হৃদয়ে দয়া হইত, তাহা হইলে সে আমায় তৃণবৎ পায়ে ঠেলিয়া যাইত না। তাহাকে বলিয়াই বা কি ফল? গোকুলজী আমাকে মন্দ মনে করিল, তাহাতেই বা আমার কি? আমি ত আর তাহাকে পাইবার আশা রাখি না। এই যে ননীর পুতুলের মত সুন্দরী দেখিলাম, ওই কি গোকুলের স্ত্রী নয়? স্ত্রী নয় ত কি? বিবাহ না করিয়া থাকে, বিবাহ করিবে। গোকুলজীর ত কখন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবার নয়। মাগীকে যত জিজ্ঞাসা করি, তত হাসে আর কেবল বলে, না! ইচ্ছা হইল,

ছুঁড়ীর দাঁত ভাঙ্গিয়া দিই। তারি বা অপরাধ কি? কাকেই বা দোষ দিই? দোষ ত আমার অদৃষ্টের। কপালে কোন সুখই লেখে নাই। আমার মত পোড়াকপালীর মরণ হওয়াই ভাল।

বিষাদ, বিদ্বেষ, ক্ষীণ আশা, প্রবল নিরাশা, এইরূপ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী আরও কত ভাব তুমুল বেগে তারার হৃদয়ের মধ্যে আন্দোলিত, আলোড়িত, পরস্পর প্রতিহত হইতে লাগিল। সে একাসনে নিস্পন্দভাবে উপবিষ্ট হইয়া অনবরত নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল। রোদন আর চিন্তা। দুই নয়ন দিয়া অশ্রুধারা অবিরত একভাবে প্রবাহিত হইতেছে। চিন্তার ধারা সহস্রমুখে ছুটিতেছে। অশ্রুধারা একমুখী, চিন্তা সহস্রমুখী। রমণীর অতল হৃদয়ে অগণিত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

অন্ধকারে মেঘের অন্তরালে সূর্য্য অলক্ষিতে অস্তমিত হইল। মেঘ দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া অন্ধকার করিয়া রহিল। মাঝে মাঝে অন্ধকার দীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। আকাশে একটিও তারা উঠিল না। আকাশ, পর্ব্বত, সমভূমি সব এক হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় একটি পাখী ডাকিল না। সমীরণ এক একবার সোঁ সোঁ করিয়া ছুটিয়া আসে, আবার ভয় পাইয়া দূরে পলায়ন করে। হরিণী বৃক্ষমূলে অঙ্গ রক্ষা করিয়া নিদ্রার জন্য আসিল না। অন্ধকার গাঢ়, গাঢ়তর হইয়া আসিল। বৃক্ষপত্র বহিয়া প্রস্তরের উপর টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। শৃগাল ভয়ে প্রহর ডাকিল না। গুটিকতক খদ্যোতিকা কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া অন্ধকারের গর্ভে ডুবিয়া গেল। ক্রমে বিদ্যুৎ বিরল হইল। বায়ুসঞ্চরণ ক্রমে ক্রমে শান্ত হইয়া একেবারে রহিত হইল। চারিদিক্ নিঝুম, নিস্তব্ধ। অন্তঃশূন্য, দিগ্বিদিক্‌শূন্য, জনপ্রাণিশূন্য, ভয়ময় অন্ধকার ভূমণ্ডল অধিকার করিল। পর্ব্বতঝরণার পতনশব্দ নিস্তব্ধতার মধ্যে অতি ভীষণ শ্রুত হইতেছে। জীবনের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় না, সৃষ্টি যেন অন্ধকারসমুদ্রে নিমজ্জিত হইল। কেবল অন্ধকারের অদৃশ্য ভয়ঙ্কর তরঙ্গভঙ্গ নিঃশব্দে কোলাহল করিতে লাগিল।

সে সময় সেই পর্ব্বতের উপরে মনুষ্যের অবস্থান কদাচিৎ সম্ভাবিত নহে। পর্ব্বতবাসী পশুকুল পর্য্যন্ত ত্রাসে পলায়ন করিয়াছিল, মনুষ্য কোন্ সাহসে সেখানে বাস করিবে? সে স্থান দেখিলে কে বলিত যে, সেখানে জীবিত প্রাণী বাস করে? কে বলিত যে, সেই সময় দগ্ধচিত্ত রমণী একাকিনী সেই পর্ব্বতপ্রদেশে বসিয়া আপনার ভাবনায় মগ্ন ছিল? ক্ষুদ্র কুটীরে বসিয়া অজস্র রোদন করিতেছিল? বাহিরের বিভীষিকাময়ী রজনী দেখিয়া সে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই; সে দিকে তাহার মনই ছিল না। আপনার হৃদয়সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতে আকুল, আর কোন দিকে চাহিবার তাহার অবসর ছিল না। মথ্যমান জলধির ঘোর গর্জ্জনে বধির যে, তাহার অন্য দিকে কর্ণপাত করিবার সাধ্য কি? মানুষের মন অগাধ, অপার, অনন্ত,—অসীম সমুদ্র ত তাহার ক্ষুদ্র উপমাস্থলমাত্র। সে সমুদ্র কেহ দেখিতে পায় না, এজন্য সে সমুদ্র অপ্রমেয়। সে সমুদ্রকল্লোল কেহ শুনিতে পায় না, এ জন্য সে সমুদ্র ভয়ঙ্কর। সে সমুদ্র মানুষে কল্পনা করিতে পারে না, এই জন্য সে সমুদ্র অতি বিশাল।

সেই সমুদ্রে তুফান উঠিয়াছে!

কুটীরের বাহিরে যে রজনী বড় ভয়ঙ্করী, তারা সে কথা একবার মনে করিল না; কিছু আহার করিল না; একবার উঠিল না। এক মুহূর্ত্তের জন্য নিদ্রা তাহার চক্ষে আসিল না। চতুষ্পার্শ্বে অত্যন্ত অন্ধকার এবং ভয়ানক নিস্তব্ধ। সে স্থলে মনুষ্য ভয়বিহ্বল হইয়া মূর্চ্ছিত হয়। চতুষ্পার্শ্বে সেই অন্ধকার, মধ্যস্থলে রুক্ষ জটাধারিণী রমণী। বাহিরে দৃষ্টি নাই, বাহিরে দৃষ্টি করিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই। মুদিত-নয়নে হস্ত দ্বারা চক্ষু আবৃত করিয়া বসিয়া আছে। মুদিত-নয়নে দর দর ধারা। নয়নজলে হৃদয়াগ্নির নির্ব্বাণ করিবার প্রযত্ন করিতেছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ধূ ধূ করিয়া জলিয়া উঠিল দেখিয়া সকলে আগুন নিভাইতে ছুটিল। আগুন লাগিলে যত লোকে চীৎকার করে, তত লোকে কখনই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার যত্ন করে না। কথায় বলে, 'কারও সর্ব্বনাশ, কারও পৌষমাস।' জল আনিতে আগুন নিভাইতে মরাইয়ের ধান ভস্মীভূত হইয়া গেল, কিন্তু অগ্নি আর বিস্তৃত হইল না। রঘুজীর গৃহ রক্ষা পাইল।

গ্রামের লোকে পূর্ব্বেই তারাকে বড় দুরন্ত মনে করিত। এখন লোকে তাহাকে রাক্ষসী

স্থির করিল। জননীরা শিশুদিগকে তাহার নাম করিয়া ভয় দেখাইত, যুবতীরা ভয়ে তাহার নাম পর্য্যন্ত করিত না।

রঘুজীর পীড়া সেই রাত্রে বৃদ্ধি হইল। সে আর তারার নাম করিত না। তারাকে অন্বেষণ করিয়া ধৃত করিবার জন্ম দুই জন লোক সম্মত হওয়াতে রঘুজী তাহাদিগকে গালি দিল। বলিল, "আমার কন্যা মরিয়াছে। তাহাকে খুঁজিবার আবশ্যক নাই।"

পীড়া দিন দিন বাড়িতে লাগিল। গ্রামের চিকিৎসক যথাসাধ্য প্রলেপ ও অন্যান্য ঔষধি প্রয়োগ করিলেন; কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। পীড়ার সময়ে শম্ভুজী দিবানিশি রঘুজীর নিকটে থাকিত। সকলে বুঝিল, এবার রঘুজী রক্ষা পাইবে না। কেবল রঘুজী এ কথা বিশ্বাস করিত না। এক দিন চিকিৎসক বলিলেন, "রঘুজী, তুমি আপনার বিষয়-আশয়ের একটা বন্দোবস্ত কর, মানুষের কবে দিন আসে, বলা ত যায় না।"

রঘুজী অত্যন্ত বিস্মিত ও কুপিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি মরিব না কি?"

চিকিৎসক। না, তা নয়। তবু ত কিছু বলা যায় না। ব্যারাম দিন দিন বাড়িতেছে, তোমার আর উত্থানশক্তি নাই। মানুষ কখন্ আছে, কখন্ নাই, তা ত কেহ বলিতে পারে না।

রঘুজী রাগিয়া কহিল, "তুমি দূর হও। তুমি আমায় আরোগ্য না করিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছ।"

চিকিৎসক, রোগী হাতছাড়া হয় দেখিয়া, তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। অর্থের প্রত্যাশা মানুষে, বিশেষ চিকিৎসকে সহজে ছাড়িতে পারে না। রঘুজীর খাটের পাশে তাহার লাঠি থাকিত, সেই লাঠি ধরিয়া কবিরাজ মহাশয়ের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। কবিরাজের মাথা কাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিল। তিনি দুই হাতে মাথা ধরিয়া কাতরোক্তি করিতে করিতে পলায়ন করিলেন।

মৃত্যু ঘনাইয়া আসিতেছিল। রঘুজী ভীত হইয়া শম্ভুজীকে ডাকাইয়া আপন সম্পত্তি তাহাকে দান করিতে চাহিল। শম্ভুজী তাহাতে স্বীকৃত হইল না। অতঃপর তাহার পরামর্শে রঘুজী দুই জন সাক্ষীর সমক্ষে আর এক দানপত্র লিখাইল, তাহার মর্ম্ম কেহ জানিল না।

মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে রঘুজীর বিকার হইল। বিকারাবস্থায় অনর্গল প্রলাপ উচ্চারণ করিত। সে সকল কথা কেবল শম্ভুজী আর সেই দাসী শুনিত। প্রলাপকালীন অনেক কথা তাহারা বুঝিতে পারিত না, অনেক কথা শুনিয়া তাহাদের লোমহর্ষণ হইত। রঘুজী কখন কখন তারার নাম করিত। কখন কখন অন্যমনে আর কাহার নাম করিয়া স্নেহের দু একটি কথা বলিত। তাহাতে পাতকীর পাপকথা আরও ভয়ঙ্কর শুনাইত।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিবস রঘুজী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। নিকটে শম্ভুজীকে না দেখিতে পাইয়া, তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইল। শম্ভুজী আসিল না। রঘুজী তখন তাহাকে অশ্রাব্য গালি পাড়িতে লাগিল। তাহাতে সে আবার বিকারগ্রস্ত হইল। পরদিবস তাহার মৃত্যু হইল।

তারা শম্ভুজীকে আঘাত করিল দেখিয়া মহাদেব পলায়ন করিয়াছিল। এত দিন যে সে শম্ভুজীর নিষ্ঠুর ব্যবহার সহ্য করিয়াছিল, তাহার একটি কারণ ছিল। মহাদেব মনে করিত, তারা ফিরিয়া আসিলে শম্ভুজী ঈদৃশ কঠোর আচরণ পরিত্যাগ করিবে। বৃদ্ধবয়সে যাইবে বা কোথা? কেহ ত তাহাকে বিনা পরিশ্রমে আহার যোগাইবে না। এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া সে কোথাও যায় নাই। তারার নির্ব্বাসনের পর নিজের কষ্টের দিকে তাহার আর বড় দৃষ্টি ছিল না। মায়ীর মৃত্যুর পর তাহার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। জীবনে অনাস্থা এবং মরণ তাহার একমাত্র কামনা হইয়া উঠিল। চিত্ত অবশ, শিশুর ন্যায় দুর্ব্বল। শম্ভুজীর উৎপীড়নে শরীরও ভগ্ন হইয়া পড়িল। নানা কারণে মহাদেব এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও পলায়নে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু যে সময় দেখিল, শম্ভুজী দারুণ আঘাতে ধরাশায়ী হইল, তখন নানাবিধ নূতন আশঙ্কায় তাহার চিত্ত অধিকৃত হইল। মনে করিল, শম্ভুজী আরোগ্য লাভ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবে। এইরূপ নানাবিধ আশঙ্কায় বিকৃতচিত্ত হইয়া পলায়ন করিল।

গ্রামের অনেকে সময়ে অসময়ে মহাদেবের নিকট উপকৃত, শম্ভুজীর হস্তে তাহার নির্যাতনের সংবাদ পাইয়া অনেকের দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল, এজন্য মহাদেবকে অন্নের জন্ম লালায়িত হইতে হইল না। তাহাকে প্রতিদিন খাইতে দেয়, গ্রামে

এমন কাহারও সঙ্গতি ছিল না, পর্য্যায়ক্রমে দুই বেলা করিয়া সকলে আহার করাইত। রাত্রিকালে মহাদেব এক জনের বাড়ীতে শয়ন করিত। গ্রামে অনেকেই রঘুজীর টাকা ধারে, সে ইচ্ছা করিলে টাকার জন্ম পীড়াপীড়ি করিয়া মহাদেবকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিত। এখন রঘুজী পীড়িত, মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, সুতরাং সে কিছু করিতে পারিল না। মহাদেবের অন্নকষ্ট রক্ষা হইল।

রঘুজীর মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া মহাদেব মনে করিল, তারাকে ডাকিয়া আনিব। এখন ত তাহারি বাড়ী, তাহারি ঘর, সে কেন পাহাড়ে বনের পশুর মত থাকে? তারাকে যেমন করিয়া পারি, খুঁজিয়া লইব। এই সঙ্কল্প করিয়া পর্ব্বতের অভিমুখে যাত্রা করিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পর্ব্বতের প্রান্তদেশে চঞ্চললোচনা বিকলাঙ্গী তারা উন্মাদিনীর মত বিচরণ করিতেছে। কোন দিন আহার নাই, কোন রাত্রে নিদ্রা নাই, অসীম আকাশে কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় অসংযত উদ্‌ভ্রান্ত গতিতে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে। হৃদয়মধ্যে কখন নরকের জ্বালা, কখন শূন্যময় নিরাশা। ঝঞ্ঝা-তাড়িত, আবর্ত্তসঙ্কুল, ভীমনাদে কল্লোলিত হৃদয়-সমুদ্রের উচ্ছ্বাসে ব্যাকুলিত হইয়া, বিবেকশূন্য হইয়া, তারার চিত্তের বিকৃতি জন্মিবার উপক্রম হইয়া উঠিল। সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে এক-মাত্র আলোক দেখিতে পাইল—মরণ! কিন্তু আত্মঘাতিনী হইতে তারার প্রবৃত্তি হইল না, সাহস হইল না; ভাবিল, কেন মরিব? কাহার তরে মরিব? আত্মহত্যা করিয়া কেন অনন্ত নরক ভোগ করিব? গোকুলজীকে পাইলাম না বলিয়া মরিব? গোকুলজী আমার কে? আমার শরীরে রমণীধর্ম্ম কিছুই নাই, তবু আমি পতঙ্গের মত কেন প্রণয়ানলে ঝাঁপ দিই? মরিলেই বা আমার কি সুখ? লোকে না জানুক, আমি ত জানিব যে, গোকুলজীর জন্য প্রাণত্যাগ করিলাম। ছি! ছি! সহস্র নরক-যন্ত্রণা এ চিন্তার তুল্য নয়। আমি মরিব না।

তারা মরিল না। কিন্তু বাঁচিয়াও কোন সুখ দেখিতে পাইল না। চিত্তের চাঞ্চল্য বশতঃ সর্ব্বদা ভ্রমণ করিত। কুটীরের আশ্রয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিল।

এই অবস্থায় এক দিন মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তারার সে মূর্ত্তি দেখিয়া মহাদেব ভীত হইল। মনে করিল, পাগল হইয়া গিয়াছে। মহাদেবকে দেখিয়া তারা চক্ষু স্থির করিয়া কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "শম্ভুজী তোমায় তাড়াইয়া দিয়াছে?"

মহাদেব মাথা নাড়িল। ধীরে ধীরে সমস্ত কথা তারাকে অবগত করাইল। রঘুজীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া, শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া, জানুদ্বয়মধ্যে মস্তক রাখিয়া তারা চিন্তা করিতে লাগিল। পিতৃ-বিয়োগ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল বলিলে, মিথ্যা বলা হয়। বুঝি সে হৃদয় বড় কঠিন, বুঝি সে চক্ষের জল ফুরাইয়াছিল, তাই সে কাঁদিল না। কেবল বসিয়া ভাবিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চিন্তার পর মাথা তুলিয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন ত শম্ভুজীই সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী?"

মহাদেব বলিল, "না, সে কেন বিষয় পাইবে? মরণের সময় বোধ হয় তোর বাপের বুদ্ধি ফিরিয়া থাকিবে। শম্ভুজী বলিতেছে, তারার বাড়ী, তারার বিষয়, সে আসিলেই তাহার হাতে সব বুঝাইয়া দিব। আমি তোকে ডাকিতে আসিয়াছি। তোর বাড়ীতে এখন তুই না থাকিবি ত কে থাকিবে? তুই না ফিরিলে আমি বা কোথায় আশ্রয় পাইব?"

তখন তারা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধের হাত ধরিল, কহিল, "তবে চল, বাড়ী যাই।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

তারা ফিরিয়া আসিল। এবার আর গোগৃহে যাইবার আদেশ শুনিতে পাইল না, এখন তারাই গৃহকর্ত্রী। রঘুজীর যাহা টাকা ছিল, তাহা শম্ভু-জীর হাতে। তারা আসিবামাত্র শম্ভুজী তাহার হাতে চাবি দিয়া টাকা বুঝাইতে আরম্ভ করিল। তারা বড় লজ্জিত হইল। শম্ভুজী তাহার নিকটে অপমানিত হইয়া প্রহার সহ্য করিয়াও প্রতিশোধ লইবার কোন চেষ্টা করিল না। রঘুজীর অর্থে হস্তক্ষেপ করে নাই, এখন আবার তারাকে টাকার হিসাব বুঝাইয়া দিতেছে। তারা হিসাবপত্র কিছু

না শুনিয়া, কিছু লজ্জার সহিত, কিছু বিষণ্নভাবে বলিল, "শম্ভুজী, আমাকে হিসাব বুঝাইবার আবশ্যক নাই। তুমি আমার সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছ বলিয়া আমি তোমাকে অর্দ্ধেক অংশ দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি এই অর্থের অর্দ্ধাংশ লইয়া যাও।"

শম্ভুজী বলিল, "আমি এক পয়সাও লইব না। তোমার সম্পত্তি, তুমি সুখে ভোগ কর।"

তারা কহিল, "না লও, আমি তোমায় পীড়াপীড়ি করিব না। কিন্তু এ বাড়ীর সহিত তোমার আর কোন সম্বন্ধ নাই। তোমার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হইবে না। যাহারা এ বাড়ীর বেতনভোগী, তাহারা পূর্ব্বের মত নিযুক্ত থাকিবে।"

শম্ভুজী কোন উত্তর করিল না, একবার মস্তকে হস্তস্পর্শ করিল। তারা দেখিল, তাহার মস্তকে বৃহৎ ক্ষতচিহ্ন রহিয়াছে। বুঝিল, শম্ভুজী কিছু বিস্মৃত হয় নাই।

শম্ভুজী কোন উত্তর না দিয়া সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রঘুজীর কন্যা ফিরিয়া আসিয়া পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছে শুনিয়া গ্রামের লোকে বড় ভয় পাইল। যে দাসী তারাকে অপমানিত করিয়াছিল, সে রঘুজীর মৃত্যুর পরেই অন্যত্র চলিয়া গেল। যাহারা রঘুজীর অন্নে প্রতিপালিত, তাহারা মনে করিল, এইবার আমাদের অন্ন মারা যাইবে। লোকে মনে করিল, তারা বাই না জানি কতই অত্যাচার করিবে।

তারা বাই সে সব কিছুই করিল না। যে দিন গৃহে ফিরিল, তাহার পরদিবস ভৃত্য, ক্ষেত্রের কৃষাণ, রাখাল, সকলকে ডাকাইয়া কহিল, "তোমরা যেমন পূর্ব্বে কাজ করিতে, তেমনি করিবে। কাহারও চাকরী যাইবে না।"

এই কথা শুনিয়া, তাহারা বড় বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইয়া আপন আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের আনন্দ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। রঘুজীর লাঠীর চিহ্ন তাহাদের অনেকের ছিল, সে দাগ ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেল। এখন আর কেহ তাহাদিগকে মারে না। পূর্ব্বে কর্ম্মে কিছুমাত্র ত্রুটি হইলে, রঘুজী মাহিয়ানা কাটিত, এখন আর সে সব নাই। কোন ঝঞ্চাটই নাই। পরিজনবর্গের মধ্যে তারার বড় প্রশংসা উঠিল। মহাদেবের দিন ফিরিল। সে এখন পায়ের উপর পা দিয়া রাজার হালে দিনাতিপাত করিতে লাগিল। তারা তাহাকে কোন কর্ম্ম করিতে দেয় না, নিকটে বসিয়া আহার করায়, আরও সহস্র যত্ন করে। সময়ে সময়ে মহাদেবের নিকট মায়ীর জন্য কাঁদিত। মহাদেব অল্পকালের মধ্যেই আবার সুস্থকায় ও সবল হইয়া উঠিল। তখন সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে অসম্মত। তারাকে কহিল, "চাকরবাকরগুলা সব ফাঁকি দেয়, তুই ত তাহাদের দেখিবি না। আমি তাহাদের কাজকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিব।" তারা মহাদেবের আগ্রহ দেখিয়া সম্মত হইল। মহাদেব সেই অবধি একরূপ ঘরের কর্ত্তা হইয়া উঠিল।

গ্রামের মধ্যে যাহারা নিতান্ত দীন, দুঃখী, তারার অনুরোধমতে মহাদেব তাহাদের সন্ধান লইত। তারা মলিনবেশে স্বয়ং তাহাদের সাহায্য করিতে যাইত। ইহাতে লোকে আরও আশ্চর্য্য হইল।

সুদে কর্জ্জ দেওয়া তারা আসিয়া বন্ধ করিল। গ্রামের লোকেরা বড় গরীব, অনেক সময় তাহাদের ধার করিতে হয়। রঘুজী সুদে সুদে তাহাদের রক্ত শোষণ করিতেছিল, এখন তাহারা বিনা সুদে ঋণ পাইয়া দুই হাত তুলিয়া তারাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

বেশভূষায় তারার কখন তেমন অভিরুচি ছিল না। এখন সে ভাল ভাল কাপড়, ভাল ভাল গহনা পরিতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া গ্রামের যুবতীদিগের বড় হিংসা হইত। বুড়া-বুড়ীরা বলিত, "আহা, পরুক্, পরুক্, বাপ থাক্‌তে ত কোন সাধ মেটাতে পারে নাই। এখন একটি বর মিলিলেই হয়, তা হ'লে সব সুখই হয়। এত গুণের মেয়ে কখনো হয় না।"

বর ত মিলিবার ভাবনা ছিল না, কিন্তু কন্যার মনের মতন বর এখন কোথায় পাওয়া যায়? রঘুজী ত আর নাই যে, জোর করিয়া তারার বিবাহ দিবে। তারার আর কোনও অভিভাবক নাই, সে ইচ্ছা করিলেই নিজে বিবাহ করিতে পারে। মহাদেব বারকতক বিবাহের জন্য খোঁচাখুঁচি করাতে তারা কিছু বিরক্ত হইল, বলিল, "আমি বিবাহ করিব না।" মহাদেব মুখে আর কিছু বলিল না, কিন্তু মনে করিল, যদি বিবাহই না করিবে ত এত সাজগোজ কিসের জন্য? আগে ত এ সব কিছু ছিল না।

গ্রামের জন কতক যুবকের আশা ছিল, তাহারা তারার প্রণয়চক্ষে পড়িবে। এই আশায় তাহারা মনোহর বেশ ধারণ করিয়া মহাদেবের সহিত

সাক্ষাৎ করিতে আসিত। মহাদেব তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিত না। যুবকদিগের আশা ছিল, ক্রমশঃ তারার সহিত কথোপকথন চলিবে। তারা তাহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। তাহারা অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

শম্ভুজী কোন কথা ভুলিবার লোক নয়। মনের কোন সঙ্কল্পও সহজে ছাড়িতে জানে না। মস্তকের কুঠারচিহ্ন সে এক দিনের—এক দণ্ডের তবেও ভুলিয়া যায় নাই, তথাপি সে তারার কোন অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল না। মৃত্যুকালে রঘুজী আপনার সঞ্চিত সমুদয় অর্থ তাহাকে দিতে চাহিয়াছিল, তাহা সে লইল না। তারা তাহাকে আপনার গৃহে আসিতে নিষেধ করিল, তাহাতেও সে ভাল মন্দ কিছুই বলিল না। কেন? শম্ভুজী ত কোন সদ্‌গুণে ভূষিত নহে। এরূপ আচরণের নিশ্চিত কোন গূঢ় কারণ থাকিবে।

মস্তকে আহত হইয়া শম্ভুজীর প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রথমে বড় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। মনে করিয়াছিল, মস্তকের ক্ষতচিহ্নের শোধ তুলিবে। এই সময় শম্ভুজী নিজের মন বুঝিতে পারিল না। তাহার মস্তকে ক্ষতস্থান চিহ্নিত হইবার পূর্ব্বে তাহার হৃদয়ের মধ্যে আর এক মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। সে মূর্ত্তি তারার। শম্ভুজী যত তাহাকে পরম শত্রু বিবেচনা করিবার চেষ্টা করে, প্রণয়ের অপূর্ব্ব বন্ধন আরও হৃদয়ের মধ্যে জড়িত হইয়া যায়। অপমানের শোধ দিব মনে করিলেই তারাকে বিবাহ করিবার আশা উদিত হয়। দ্বেষ, ক্রোধ, অপমানজ্ঞান কিছুই রহিল না। প্রণয়ের বহ্নিতে আর সব আগুন মিশিয়া গেল। নানাবিধ বিরুদ্ধ ভাব-সমূহ মিশ্রিত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হইল। অগ্নি সর্ব্বভুক্, আগুন লাগিলে সব জ্বলে। শম্ভুজীর মস্তকের কেশাগ্র হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত কেবল জ্বলিতে লাগিল,—প্রণয়। বুদ্ধি, চৈতন্ত, হিতাহিতজ্ঞান সব লুপ্ত হইল। জীবন তারাময় হইয়া উঠিল। কেবল ভাবিত, কিসে তারা আমার হইবে। এ অগ্নি হৃদয়ে পোষণ করিতে হৃদয় প্রায় দগ্ধ হইয়া গেল। তারা! তারা! তারা! তারার মোহিনী মূর্ত্তি তাহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিল। সে নাম তাহার একমাত্র মোহমন্ত্র হইয়া উঠিল। তারা তাহাকে হতশ্রদ্ধা করে, বিদ্রূপ করে, একবার প্রায় হত্যা করিয়াছিল, এখন সে তাহার সহিত চাক্ষুষ দেখা হইলে বিরক্ত হয়, এ সকল কথা কি শম্ভুজী জানিত না? সব জানিত। তারা যে আর এক জনকে প্রেমের চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছে, তাহাও সে জানিত। কেমন করিয়া জানিল, তাহা কিছুই জানি না। লোকে বলে, প্রেম অন্ধ, আবার প্রেম যেমন দেখিতে পায়, যেমন শুনিতে পায়, এমন আর কেহ পারে না। তবে মিছামিছি হৃদয়কে ভস্ম করিয়া কি হইবে? তারাকে ত পাইবার কিছুমাত্র আশা নাই, তবু শম্ভুজী দিনরাত্রি সেই চিন্তা করে কেন? যাহাকে পাইবার নয়, তাহাকেই চায় কেন?

ঐ ত গোল। যাহা পাই না, তাহাই চাই। জননীর কোলে বালক, আর কিছু চায় না, চায় আকাশের চাঁদ। এত জিনিস আছে, কোটি চন্দ্রের অপেক্ষা সুন্দর এমন মায়ের মুখ রহিয়াছে, কিন্তু সেই ক্ষুদ্র শিশু,—তাহার কিছুতেই মন ওঠে না। আকাশে ওই যে চাঁদ আছে, সেইটি চাই। অপ্রাপ্য সামগ্রী পাইবার জন্য মানুষ চিরকাল বালকের মত লালায়িত হয়।

শম্ভুজী হৃদয়কে বুঝাইতে পারিল না। তারাকে পাইবার আশা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইলে জীবনধারণ অসম্ভব। শম্ভুজী সে আশা ত্যাগ করিল না। প্রাণপণে তাহা পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

হৃদয়ের এই অবস্থা, এই প্রেমাত্মক ভাব তাহাকে গোপন করিতে হইবে, নাহিলে আশা সফল হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা রহিবে না। শম্ভুজী তাহাই করিল। তাহার চিত্তের প্রকৃত অবস্থা কেহ জানিল না।

তারা ফুলগাছ বড় ভালবাসে। উদ্যানে পুনরায় পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিয়া প্রতিদিবস সায়ংকালে সেই স্থলে পদচারণ করিত। এক দিন অকস্মাৎ সেই স্থানে শম্ভুজী আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া তারা বড় অপ্রসন্ন হইল। জিজ্ঞাসা করিল, "আবার যে এখানে আসিয়াছ? আমি ত তোমাকে আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছি।"

শম্ভুজী কহিল, "আমি ত পূর্ব্বেকার কোন কথা বলিতেছি না। যদি তোমার নিকটে অপরাধ করিয়া থাকি, আমার ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। তবু যদি তুমি আমাকে আসিতে বারণ কর, তাহা

হইলে না হয় আর আসিব না। যদি আমাকে আসিতে দাও, তাহা হইলে দু একটা খবর সময়ে সময়ে শুনিতে পাও।”

তারা উত্তর করিল, “আমার কোন খবরে কাজ নাই। যাহা দরকার, তাহা মহাদেবের কাছে শুনিতে পাই।”

শম্ভুজী। গোকুলজীর বিবাহ হইবার কত কথা হইতেছে, শুনিয়াছ কি?

তারা বলিল, “গোকুলজীর বিবাহ হইলে আমার কি? আমায় এ সংবাদ দেওয়ার আবশ্যক?”

তারার স্বরের কিছু বিকৃতি হইল না, কিন্তু মুখ বড় মলিন হইয়া গেল।

শম্ভুজী যেন ভিতরের কিছুই জানে না, অম্লান-মুখে বলিল, “তোমার পিতার সহিত গোকুলজীর এক দিন বিবাদ হইয়াছিল, তুমি তাহা দেখিয়াছিলে। আমি ভাবিয়াছিলাম, গোকুলজীকে তোমার মনে থাকিতে পারে। না থাকে ত আর সে কথায় কাজ নাই।”

এই বলিয়া শম্ভুজী প্রত্যাবর্ত্তনে উদ্যত হইল।

এখন তারার হৃদয়কন্দরনিহিত অনলে আহুতি পড়িয়াছিল। কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়া মাত্র শম্ভুজী ফিরিয়া যায়। তারা টোপ গিলিল দেখিয়া শম্ভুজী দড়ী-হাতে ফিরিল। এ দিকে দড়ীতে টান পড়িল। তারা অন্তরের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “গোকুলজীর কোথায় বিবাহ হইল?”

শম্ভুজী যেন দাঁড়াইতে অনিচ্ছুক, ঘাড় ফিরাইয়া কহিল, “সে সব অনেক কথা। লোকে যে কত রকম বলে, কিছু বলা যায় না। কিন্তু বিবাহ স্থির।”

তারা অধীরা হইয়া শম্ভুজীর নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি হইয়াছে, ঠিক ঠিক বল, আমার কাছে কোন কথা লুকাইও না।”

হাসি চাপিয়া শম্ভুজী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—এত ধীরে ধীরে যে তারার অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল, অথচ সে বিরক্তি মুখেও প্রকাশ করা যায় না,—“গোকুলজীর বিবাহ গ্রামেই হইবে, অন্য গ্রামে নয়। কিন্তু এমন নূতনতর বিবাহ কেহ কখন দেখে নাই। কন্যাটির নাম গৌরী, তাহাকে গোকুলজী মাস দুই হইল কোথা হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছে। কোথায় নিবাস, কি জাতি, কাহার কন্যা, কেহ কিছু জানে না। যদি একেবারে বিবাহ করিয়া লইয়া আসিত, তাহা হইলে কোন কথাই থাকিত না। সেই জন্য কত লোকে কত মন্দ বলে। তাহারা একত্রে থাকে না। গোকুলজী কন্যাটিকে এক বুড়ীর বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছে, নিজেও অনেক সময় সেইখানেই থাকে। এখন তখন করিয়া আজ পর্য্যন্ত বিবাহ হইল না। গোকুলজী কাহাকেও কিছু বলে না, গৌরীও কিছু বলে না। কাজেই লোকে কত কি মনে করে।”

এই সকল কথা শুনিয়া তারা সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একটি গাছের পাতা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে ভাবিতে লাগিল। শম্ভুজী ততক্ষণ ক্ষুধিত-লোচনে তারাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিল। অবশেষে তারা গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

সেই দিন হইতে শম্ভুজী সর্ব্বদা যাতায়াত করিত, তারাও আর কিছু বলিত না। শম্ভুজী আত্মসম্বন্ধে কোন কথাই বলিত না, অনবরত গোকুলজী ও গৌরীর বিষয়ে নানা কথা বলিত। তাহার মধ্যে কিছু সত্য, অধিকাংশ শম্ভুজীর স্বকপোলকল্পিত। তারাও আর কিছু সন্দেহ না করিয়া, বিমনা হইয়া তাহার কথা শুনিত। তারা সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক। গোকুলজীর আশা অল্পে অল্পে হৃদয় হইতে অন্তরিত হইতে লাগিল। শম্ভুজী কতক্ষণ তাহার কাছে বসিয়া বসিয়া গল্প করিত। কতক্ষণ প্রেমপূর্ণ কাতরনয়নে, কখনও পাপের অনলচক্ষে চাহিয়া থাকিত। তারা কিছুই লক্ষ্য করিত না। লোকে কত কথা রটাইতে পারে, তাহা একবারও মনে করিত না। কেবলই ভাবিত। দুঃখের অন্ধকার-ছায়া তাহার হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল।

শম্ভুজী অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। তারার শরীরে সর্ব্বক্ষণ অগ্নি জ্বলিতে লাগিল।

এইরূপে মাস কয়েক গেল। ভাবনায় ভাবনায় তারার শরীর অবসন্ন হইল। চক্ষের কোলে কালি পড়িল। সে অস্থির বিদ্যুতের মত দৃষ্টি আর নাই। রূপভাঙ্গা, নিরাশ মূর্ত্তি। চক্ষের দৃষ্টি যেন অভাবময়, যেন শূন্যময়। যেন সে চক্ষে কি ছিল, আর যেন নাই। মুখের উপর কেমন একটি জ্যোতির্ম্ময় ভাব ছিল, সেটি যেন কে অপহরণ করিয়াছে। প্রদীপশিখার কিরণ একটি একটি করিয়া আবৃত করিলে যেমন সে আলোক হীনপ্রভ হয়, তেমনি সে মুখ মলিন হইয়া গেল।

তাহা দেখিয়া শম্ভুজীর দয়া হইল না। সে ত

ইহাই চায়। গোকুলজীর মূর্ত্তি তাহার হৃদয় হইতে অপনীত হইলে, সে হৃদয়ে স্থান পাওয়া সহজ হইবে, এই আশায় সে প্রতিদিন গোকুলজীর বিরুদ্ধে নানা কথা বলিত। তারা সব কথা অনায়াসে বিশ্বাস করিত।

এইরূপে কিছু কাল অতীত হইলে, শম্ভুজীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। আর তারাকে দেখিয়াই তৃপ্তি হয় না। এক দিন সন্ধ্যার সময় তারা অধোবদনে গৃহদ্বারে উপবিষ্ট রহিয়াছে, এমন সময় শম্ভুজী আসিয়া তারার পার্শ্বে বসিল। তারা সেইরূপ নিম্নমুখে স্থিরভাবে বসিয়াই রহিল।

শম্ভুজী কহিল, "তারা, তোমার এত ভাবনা কিসের? গোকুলজীর বিবাহ হইলে তোমার কি ক্ষতি?"

তারা মুখ না তুলিয়া বলিল, "আমার ক্ষতি কি?"

শ। তুমি মনে কর, আমি তোমার মন বুঝি না। গোকুলজী যখন তোমার ভাবনা ভাবে না, তখন তুমি কেন অনর্থক তার জন্য কষ্ট পাও? ছি! তাহাকে মনে স্থান দিলে তোমার পাপ হইবে।

তারা মস্তক উত্তোলন না করিয়াই কহিল, "মরার উপর খাঁড়া মারিলে কি লাভ, শম্ভুজী? আমি মনে মনে আপনাকে যত ধিক্কার দিয়াছি, তত আর কেহ দিতে পারিবে না। পাপ চিন্তাকে আর মনে স্থান দিব না।"

শম্ভুজী তখন মনোভাব গোপন না করিয়া বলিয়া উঠিল, "তারা, আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ দেখি। যে দিন অবধি তোমাকে দেখিয়াছি, সে দিন হইতে আমার আর দ্বিতীয় চিন্তা নাই। তুমি আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছ, আমার দিকে ফিরিয়াও চাও নাই, আমাকে অপমানিত করিয়াছ, আমার প্রাণসংহারে পর্য্যন্ত উদ্যত হইয়াছিলে। তুমি আমার কি লাঞ্ছনা না করিয়াছ? আর আমি? তোমার জন্য তোমার পিতার নিকট কতবার তিরস্কৃত হইয়াছি। মৃত্যুকালে তোমার পিতা আমাকে সমস্ত বিষয় লিখিয়া দিতে চাহিলেন, আমি লইলাম না। কাহার জন্য? আমি কি টাকার কাঙ্গাল? আমি কি এমনি নীচাশয় যে, তোমাকে গৃহশূন্য, সংস্থানশূন্য করিয়া তোমার পিতার ত্যক্ত সম্পত্তি ভোগ করিব? আমি তোমাকে কতবার ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছি, কখনও এক নিমেষের জন্য ভুলিতে পারি নাই। কি দোষে আমি তোমার চক্ষের শূল হইলাম? গোকুলজী কোথাকার কে যে, তুমি তাহার জন্য পাগল হইয়াছ? কয়বারই বা তাহাকে দেখিয়াছ? আমাকে বিবাহ করিলে কি তুমি পতিত হইবে?"

শম্ভুজীর কথা সমাপ্ত হইলে, তারা মাথা তুলিয়া সজলনয়নে, করুণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে কহিল, "শম্ভুজী, আমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা ত্যাগ কর। আমি পাপীয়সী, মনে মনে পরকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। আমাকে কেন বিবাহ করিতে চাহিতেছ? আমাকে বিবাহ করিয়া ত সুখী হইবে না। আমার অপেক্ষা তোমার কত সুন্দরী স্ত্রী মিলিবে। ছি! ছি! আমি কি তোমার উপযুক্ত?"

শম্ভুজী সেই কাতরকটাক্ষে উন্মত্ত হইয়া কহিতে লাগিল, "তুমি আমার উপযুক্ত নও, না আমি তোমার স্বামী হইবার অনুপযুক্ত? তুমি সহস্র পাপ করিলেও আমার চক্ষে পরম পুণ্যবতী। আমায় রাখ, আমায় বিবাহ কর। তোমাকে না পাইলে আমি বাঁচিব না।"

তারা কহিল, "ছি! ও কথা আর বলিও না।"

শম্ভুজী ক্ষিপ্তের মত তারাকে বাহু দ্বারা বেষ্টিত করিয়া কহিল, "তুমি আমার, আর তোমাকে ছাড়িয়া দিব না।"

বালকের ভুজবন্ধন যেরূপ অবলীলাক্রমে ছিন্ন করা যায়, তারা সেইরূপ শম্ভুজীর বাহুবেষ্টন হইতে মুক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "শম্ভুজী, এখন আর কাহাকেও মন্দ কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। তোমাকে অনেকবার অপমান করিয়াছি, এখন আর তোমায় কিছু বলিব না। তুমি এখান হইতে এখনি দূর হও, আর কখন আমার গৃহ অপবিত্র করিও না।"

শম্ভুজীও আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারার কথায় কিছু না বলিয়া কিয়ৎকাল নীরবে রহিল। তারার পর ধীরে ধীরে বলিল, "তুমি কি আমার কথায় কান দিবে না? আমায় কি কোনমতে বিবাহ করিবে না?"

তারার চক্ষে ঘৃণা জ্বলিতেছিল। কহিল, "তাহা কি তুমি আজ জানিলে?"

শম্ভুজী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে বিবাহ করিবে না?"

তারা কুপিত হইয়া কহিল, "শীঘ্র দূর হইয়া যাও, নহিলে অন্য উপায়ে তাড়াইব।"

তখন শম্ভুজী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার

পিতা অন্তিমকালে একখানি দানপত্র লিখাইয়াছিলেন, জান ?”

তারা কথঞ্চিৎ বিস্মিত হইল, কহিল, “না।”

এই সময় শম্ভুজী তারার প্রতি বিষময় কটাক্ষ করিতেছিল ; পথিকের স্কন্ধদেশে লম্ফ প্রদান করিবার পূর্ব্বে ব্যাঘ্র যেরূপ তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, সেইরূপ চাহিয়া ছিল।

তারার কথায় অন্য উত্তর না দিয়া শম্ভুজী বস্ত্রমধ্য হইতে এক খণ্ড কাগজ বাহির করিল। সেইখানি তারার সম্মুখে ধরিয়া কহিল, “এই সেই দানপত্র। ইহাব দুই জন সাক্ষী বর্ত্তমান আছে। পত্রের মর্ম্ম অবগত আছ ?”

তারা কহিল, “না।”

ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র যেরূপ নিঃশব্দে লাঙ্গুল আস্ফালন করিতে থাকে, নিঃশব্দে সন্নিহিত শঙ্কাশূন্য পথিকের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, শম্ভুজী সেইরূপ শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, “এ দানপত্রের কথা শুন নাই ?”

তারা। না।

শম্ভুজী। এই লও, একবার দেখ, ইহাতে কি লেখা আছে।

তারা। আমি পড়িতে জানি না।

শম্ভুজী। এ দানপত্রে কি লেখা আছে, শুনিতে চাও ?

তারা। বল।

শম্ভুজী। তোমার পিতা এই দানপত্রে লিখাইয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর ছয় মাসের মধ্যে যদি তুমি আমাকে বিবাহ না কর ত তোমাকে সমুদয় পৈতৃক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

তারা ভাল করিয়া শম্ভুজীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া একটু হাসিল। হাসিয়া কহিল, “শম্ভুজী, তোমরা কেহই আমাকে এ পর্য্যন্ত চিনিতে পারিলে না। দানপত্র যে লিখিয়াছিল, সেও আমাকে চিনিতে পারে নাই, তুমিও আমাকে চিনিতে পার নাই। এই তুচ্ছ সম্পত্তির জন্য তোমার মত ঘৃণিত অধমকে বিবাহ করিব ? এত দিন পর্ব্বতে বাস করিলাম, আর এখন পারিব না ? এ গৃহ, এ বিষয় সব তোমার রহিল। আমি চলিলাম, আর এ গৃহে প্রবেশ করিব না।”

শম্ভুজী তারার চরণে নিপতিত হইয়া, দুই হাতে তাহার চরণ দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া, ভগ্নস্বরে কহিল, “তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাইও না। আমি কেবল তোমাকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম। তুমি গেলে আমি তোমার বিষয় লইয়া কি করিব ? এখানে থাকিলে তবু তোমাকে দেখিতে পাইব। এই দেখ, আর তোমায় ভয় দেখাইতে পারিব না।”

এই বলিয়া তারার চরণ ত্যাগ করিয়া দানপত্র ছিন্ন ছিন্ন করিয়া সহস্র খণ্ড করিয়া ফেলিল।

শম্ভুজীর ধূল্যবলুণ্ঠিত মূর্ত্তি দেখিয়া তারার দয়া হইল। কহিল, “শম্ভুজী, উঠিয়া বাড়ী যাও। আমি এ সকল কথা ভুলিয়া যাইব, কিন্তু তুমি আর ভবিষ্যতে এরূপ বালকের ন্যায় আচরণ করিও না। আর কখন বিবাহের উল্লেখ করিও না।”

শম্ভুজী উঠিয়া বাড়ী গেল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পর কয়েক দিন শম্ভুজী আসিল না। এক দিন সে একটা বড় খবর লইয়া আসিল। তারা যে গৌরীকে দেখিয়াছিল, শম্ভুজী তাহা জানিত না। কহিল, “একটা ছোট রকম মেলা হইবে। স্থানটা সেতারাও নয়, ভীলপুরও নয়, মাঝামাঝি একটা জায়গা। সেখানে গৌরী নিশ্চয় যাইবে। সেইখানে গিয়া একবার তাহাকে দেখিয়া আসিলে হয় না ?”

গৌরীকে তারা একবার দেখিয়াছিল, শম্ভুজী তাহা জানিত না। শম্ভুজীর কথায় তারা কোন উত্তর না দিয়া আপনার মনে ভাবিতে লাগিল। শম্ভুজী মনে করিয়াছিল, একটা মস্ত খবর আনিয়াছি। এরূপ গতিক দেখিয়া চলিয়া গেল।

তারা ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা স্থির করিল। পূর্ব্বেকার মত এখন আর তাহার বেশভূষার তেমন পারিপাট্য নাই। মলিন বেশ, মলিন কেশ, মলিন মূর্ত্তি। মেলার দিনে তারা যত্ন করিয়া অঙ্গরাগ করিল, অতি বিচিত্র বহুমূল্য বসন পরিধান করিল, কেশ সযত্নে রঞ্জিত করিল, কানে সোনা পরিল, অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী পরিল, নয়নে কজ্জল পরিল, অধরে তাম্বুল দিল। এইরূপে সজ্জিত হইয়া মহাদেবকে সঙ্গে করিয়া মেলা দেখিতে গেল।

মেলার এক স্থলে কতকগুলি স্ত্রীলোক জড় হইয়াছিল। তাহাদের সুবিধার জন্য পুরুষেরা তাহাদিগকে সেই দিকটা ছাড়িয়া দিয়াছিল। মধ্যস্থলে উচ্চ স্থান, সেখানে বসিবার বেশ সুবিধা।

সেইখানে গৌরী বসিয়া ছিল, তাহার পাশে এক জন বৃদ্ধা। তারা মহাদেবকে সঙ্গে করিয়া সেই দিকে গেল। তাহাকে দেখিয়াই চারিদিকে কানাকানি, গা-টেপাটেপি, অঙ্গুলীনির্দ্দেশ হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক জন বলিলেন, "ঐ বুঝি রঘুজীর কন্যা? লজ্জা নেই, সরম নেই, পুরুষমানুষের মতন হুট্ হট্ কোরে বেড়াচ্চে।" আর এক জন কহিলেন, "মাগীর ঠ্যাকার দেখ! টাকার গুমরে ফাটচেন! কাপড় রে, গহনা রে, গায়ে আর ধর্‌ছে না। তবু যদি অমন বাপের মেয়ে না হতিস্!" অপর এক জন কহিলেন, "বাবা, এমন মেয়ে সাত জন্মে দেখি নি। হন্ হন্ কোরে আস্‌চে দেখ। আগে কত গুণবতীই ছিলেন, এখন না কি তবু একটু ভাল হয়েচে। জাতসাপের বংশ,—আবার কোন্ দিন ফোঁস কোরে ওঠে দেখ।"

এইরূপ নানা কথা চলিতেছে, এমন সময় তারা তাহাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত। অমনি সকলে চুপ, যেন কেহ তাহাকে চেনেই না, যেন কেহ তাহার ছায়াই মাড়ায় নাই। এক জন পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধার কানে কানে বলিয়া দিল, "যদি কেউ তোমাকে উঠিতে বলে, কখনও উঠিও না।" আর এক জন গৌরীর গা টিপিয়া দিল, "তুমি প্রাণান্তে নড়িও না।"

সমবেত স্ত্রীলোকরা তারাকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। সে একেবারে যেখানে গৌরী ও বৃদ্ধা উপবেশন করিয়া ছিল, সেইখানে গেল। গৌরী তাহাকে ভ্রমেও চিনতে পারিল না। পর্ব্বতের সে চীরপরিহিতা, কালিমাময়ী, জটা-ধারিণী মূর্ত্তিতে আর এই গর্ব্বিতা সুন্দরী যুবতীতে অনেক প্রভেদ। তারা গৌরীকে সম্বোধন করিয়া উদ্ধতস্বরে কহিল, "এ স্থান তোমাদের জন্য নয়। তোমরা অন্যত্র যাও। তোমরা এ স্থলের উপযুক্ত নও।"

গৌরী বড় ভালমানুষ, ঝগড়া করিতে চায় না। তারাকে দেখিয়া মনে করিল, দূর হউক, সরিয়া যাই, তাহাতে অপমান কি? ইহাকে দেখিয়া বড়মানুষ বোধ হইতেছে। মিছামিছি ইহার সহিত ঝগড়া করিয়া কি হইবে? সরিয়াই যাই।

এই ভাবিয়া গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল।

গৌরীর পাশে যে বুড়া বসিয়া ছিল, সে মাগী বড় কুঁদুলী। তারার কথায় তাহার গা জলিয়া উঠিল। গৌরী উঠিয়া যায় দেখিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। তারার দিকে ফিরিয়া আর এক হাত নাড়িয়া কহিল, "কেন গা, তুমি কি রাজার রাণী এয়েচ না কি যে, তোমায় দেখে উঠে যেতে হবে? তুমিও এয়েচ যেমন দেখতে, আমরাও এয়েচি তেমনি দেখতে। তোমার খরিদ করা জায়গাও নয়, আমার কেনাও নয়। বড় মানুষ আছ, বাছা, আপনার ঘরে আছ। তা, এখানে তোমায় দেখে কেউ সর্‌বে কেন?"

তারা, বুড়ীর কথায় কিছু না বলিয়া গৌরীকে বলিল, "গ্রামে গোকুলজীর সঙ্গে ঢলাঢলি করিয়া এখানে বসিতে লজ্জা করে না? এ স্থান দুশ্চা-রিণীর বসিবার জন্য নয়।"

গৌরী রাগিয়া কহিল, "তোমাকে আমি চিনি না, কোথাও কিছু নাই, তুমি এখানে আসিয়া আমায় মন্দ বলিতেছ, আমায় মিথ্যা অপবাদ দিতেছ। কে তুমি যে, আমি তোমায় ভয় করিব? গালি দিলেই গালি শুনিতে হইবে।" এই বলিয়া গৌরী আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিল। তাহার কোমল মুখখানি বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

তারা ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের মত গৌরীর হাত টানিয়া সরাইয়া দিল। গৌরী অধোবদনে অজস্র রোদন করিতে লাগিল। রোদন দেখিলে বোধ হয় যেন, তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।

এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের পর চারিদিকে গর্ব্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া তারা চলিয়া গেল। নারীদল ভয়ে তাহার সাক্ষাতে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। বুড়ী পর্য্যন্ত চুপ করিয়া রহিল।

তারা এই জন্যই আসিয়াছিল। মেলায় আসি-বার তাহার দুইটি উদ্দেশ্য। প্রথম গোকুলজীর নেত্রপথে পতিত হওয়া, দ্বিতীয় লোকের সমক্ষে গৌরীকে অপমান করা। দুই উদ্দেশ্যই পূর্ণ হইল। মেলায় প্রবেশ করিতে গোকুলজীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে গোকুলজী তৎক্ষণাৎ অন্য দিকে চক্ষু ফিরাইল। সুতরাং কথাবার্ত্তা আর কিছু হইল না। গৌরীকে যেরূপে অপমানিত করিল, তাহা উপরে বিবৃত হইয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

গ্রামের প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র কুটীরমধ্যে গোকুলজী এখন একাকী। পাশের ঘরে চাবপাই পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহাতে আর বিছানা পাতা নাই। গোকুলজীর মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। যে সময় তারা পিতৃগৃহে অগ্নি জ্বালাইয়া পলায়ন করে, সেই সময় বৃদ্ধার কাল হয়।

ঘর দু'খানি এখনও পূর্ব্বের মত পরিষ্কার। গোকুলজীর মাতার ঘর আগে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি রহিয়াছে। গোকুলজী নিত্য সব দেখে, স্বহস্তে ঘর ঝাঁট দেয়, পরিষ্কার করে, যেটি যেখানে থাকে, যত্নপূর্ব্বক সেইটি সেইখানে রাখে। বুড়ীর সাজা পান রাখিবার পিতলের একটি ছোট বাটা ছিল, গোকুলজী সেটি প্রত্যহ মাজিয়া রাখে। পানবাটা ঝক্ ঝক্ করিতেছে, তাহাতে মুখ দেখা যায়। দোক্তা রাখিবার একটি ছোট ঝাঁপি ছিল, তাহার ভিতরে এখনো দোক্তা রহিয়াছে। দিনের বেলা চারপাইয়ের উপর বিছানা দেখিতে পাওয়া যায় না সত্য; কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গোকুলজী বিছানা পাতে ও প্রাতে তুলিয়া রাখে। বিছানা আগেকার মত ঝরঝরে পরিষ্কার।

মাতার মৃত্যু হইলে পর কয়েক দিবস গোকুলজী কুটীরের বাহির হইত না। এক দিন বাহির হইয়া, গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেল। লোকে ভাবিল, মাতৃশোকে বুঝি গোকুলজী গ্রাম ছাড়িল। দুই তিন সপ্তাহ পরে গোকুলজী একটি যুবতী সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। লোকে আবার ভাবিল, গোকুলজী বিবাহ করিয়া আসিয়াছে।

সত্য হউক, মিথ্যা হউক, লোকে একটা কিছু মনে করিতে কখন ছাড়ে না। গোকুলজীর সম্বন্ধে লোকে দুইবার দুই রকম মনে করিল, দুইবারই ভুল। গোকুলজী গ্রাম ছাড়িয়াও যায় নাই, সঙ্গিনী যুবতীকে বিবাহ করিয়াও লইয়া আইসে নাই।

গোকুলজীদের গ্রামে একটি কুটীরে এক বিধবা বাস করে। তাহার ত্রিসংসারে কেহ ছিল না, সে একাই থাকিত। স্ত্রীলোকটি অর্দ্ধবয়স্কা, প্রাচীনাই বলিতে হয়, তবে নিতান্ত বৃদ্ধা নয়। মাথার চুল বেশী ভাগ কাল, মাঝে মাঝে সাদা চুল দেখা দিয়াছে। চক্ষু দুটি কাল, কিছু ছোট ছোট। ললাট ও ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত। দেখিলে বোধ হয়, স্ত্রীলোকটি কিছু কোপন-স্বভাবা। বাস্তবিক এই তাহার একমাত্র দোষ, নহিলে তাহার আর কোন দোষ ছিল না। পরিশ্রমে অকাতর, প্রতিবেশীদিগের উপকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। এ জন্য গ্রামের লোকেরা তাহার অনেক প্রত্যুপকার করিত।

গোকুলজী যুবতীকে সঙ্গে করিয়া আপনার কুটীরে প্রবেশ না করিয়া একবারে সেই বিধবা স্ত্রীলোকটির কুটীরে গেল। গোকুলজীর সহিত বিধবার পূর্ব্বেই কিছু কথাবার্ত্তা হইয়া থাকিবে, কারণ, সে গৌরীকে দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত না হইয়া কহিল, "কি গোকুল, এই মেয়েটি?"

গৌরী নিতান্ত মেয়েটি নয়, সে বিধবার কথা শুনিয়া একটু হাসিল।

গোকুলজী উত্তর করিল, "হাঁ। কেমন, একে রাখতে পারবে ত?"

বিধবা বলিল, "শুন কথা! মানুষের কাছে মানুষ থাকবে, তার আবার কথা। এস ত বাছা!" এই বলিয়া সে অগ্রসর হইয়া গৌরীর হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল। গৌরীও কিছু না বলিয়া তাহার সঙ্গে গেল। গোকুলজী আপনার কুটীরে ফিরিয়া গেল।

বিধবা কয়েক দিনের মধ্যেই গৌরীকে কন্যার মত স্নেহ করিতে আরম্ভ করিল; গৌরীও যথাসাধ্য তাহার সেবা করিত।

মেলার দিন গৌরী ও বিধবা স্ত্রীলোকটি একত্রে মেলা দেখিতে যায়, সেইখানে সর্ব্বজনসমক্ষে তারা নিরপরাধে গৌরীকে অপমান করিল। গৌরী বৃদ্ধার হাত ধরিয়া অধোবদনে কাঁদিতে কাঁদিতে কুটীরাভিমুখে গমন করিল। বিধবা চীৎকার করিয়া তারাকে গালি পাড়িতে লাগিল।

পথে গোকুলজীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। গৌরীকে কাঁদিতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে?"

গৌরী কোন উত্তর করিল না, অধোবদনে কাতর-হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গিনী কহিল, "সেতারার তারা বাই, রঘুজীর কন্যা, তাকে জান ত? মাগী বিনা দোষে আমার বাছাকে গাল দিয়েচে আর নড়া ধোরে ফেলে দিয়েচে। দর্পহারী মধুসূদন আছেন, মাগীর দর্প চূর্ণ হবে হবে হবে!"

সেই পথের ধারে দাঁড়াইয়া, গোকুলজী একটি একটি করিয়া সব কথা শুনিল। তখন তাহার

নির্ম্মল ললাট অন্ধকার হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধর স্ফুরিল, চক্ষে বিদ্যুৎ ঘনীভূত হইল। ধীরে ধীরে বলিল, "আমি কখনও তাহার কোন অনিষ্ট করি নাই। একবার তাহার পিতার সহিত বিবাদ হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাহার কন্যার রাগ হইবার কোন কথা ছিল না। সে আমাকে নিজে বলিয়াছিল যে, তাহার কিছু রাগ হয় নাই, তুই একবার আমার সঙ্গে মিষ্ট কথাও কহিয়াছিল। এখন তাহার অন্তরের গরল প্রকাশ করিতেছে। গৌরী, পর্ব্বতবাসিনীকে মনে পড়ে?"

গৌরী রোদন ভুলিয়া সাশ্চর্য্যে কহিল, "পড়ে বৈ কি!"

গোকুলজী। এই সেই। সেই জটাধারিণী, মলিনাঙ্গী রমণী আর এই ধনগর্ব্বিতা যুবতী, দুই-ই এক। পর্ব্বতপ্রবাসে রঘুজীর কন্যা অনেক দিন কাটাইয়াছিল। তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে কেন অসম্মত হইয়াছিলাম, এখন কি তা বুঝিলে?

গৌরী। ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গোকুলজী। আজ তাহার আচরণ দেখিলে ত? আমি তাহার কিছু করি নাই, অথচ সে আমার পরম শত্রু। সে মনে করিয়াছে, আমরা গরীব, অপমানের শোধ তুলিতে পারিব না। আমাকে কিছু বলিলে, আমি হয় ত কিছু মনে করিতাম না, সহ্য করিয়া যাইতাম। কিন্তু কিছুমাত্র দোষ না পাইয়া এত লোকের সাক্ষাতে যখন তোমায় অপমান করিয়াছে, তখন ইহার প্রতিফল দিতেই দিব।

গৌরী। তা হউক, আমায় অপমান করিয়াছে, করিয়াছে। তুমি কি করিতে কি করিবে, আর কথায় কাজ নাই। আর মেলা দেখিতে না গেলেই হইবে। তুমি রাগের মাথায় কি করিয়া বসিবে, তার ত ঠিক নাই। তোমার পায়ে পড়ি, আর কোন গোল করো না। যা হবার, তা হয়ে গিয়েছে।

গোকুলজী। না, না, সে সব ভয় কিছু নাই। আমি কখন স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিব না। সে যেমন লোকের সাক্ষাতে তোমার মাথা হেঁট করেছে, আমিও তেমনি করিব। কিন্তু তার অঙ্গস্পর্শ করিব না।

এই বলিয়াই গোকুলজী চলিয়া গেল। গৌরী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বিধবার সঙ্গে বাড়ী গেল।

দুঃখের জগতে আরও দুঃখ এই,—তুমি আমার মন বুঝ না, আমি তোমার মন বুঝিতে পারি না। গোকুলজী তারার মন জানিল না। কেন যে তারা গৌরীর অপমান করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিল না। তারা যথার্থ গুরুতর অপরাধ অপরাধিনী। কিন্তু সে অপরাধ যে কেন করিয়াছিল, গোকুলজী তাহা একবার বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল না। তারা যে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী, গোকুলজী আর কাহারও প্রণয়াসক্ত হইবে, ইহা তাহার প্রাণে সয় না, এই কারণেই যে গৌরীকে অপমানিত করিয়াছিল, তাহা আর কেহ জানিতে পারিল না। যে গোকুলজীর জন্য তারা অকারণে অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সে গোকুলজীই তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল।

দুইটি মানুষ, একে অপরের জন্য গঠিত, পরস্পরের প্রতি স্বতঃই আকর্ষিত হইবে। আবার দেখিবে, সহসা তাহাদের মধ্যে এমন এক ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহাতে পরস্পর আকৃষ্ট না হইয়া অন্তরিত হয় ও ক্রমশঃ ভিন্ন মুখে গমন করিতে থাকে। এইরূপে ক্রমাগত দীর্ঘ, দীর্ঘতর ব্যবধান ঘটিতে ঘটিতে অকস্মাৎ তাহারা আর এক স্থলে গিয়া মিলিত হয়। যেখানে মিলিবার কথা, হয় ত ঠিক তাহার বিপরীত স্থানে মিলন সংঘটিত হয়। যাহাদের ইহজীবনেই মিলন হইবার কথা, তাহারা হয় ত মরণে মিলিত হয়।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

এক দিবস প্রাতঃকালে মহাদেব গৃহকর্ম্মের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত রহিয়াছে, এমন সময় গোকুলজী গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। মহাদেব ব্যস্তসমস্তভাবে এদিক্ ওদিক্ করিতেছে, কখন ঘরের ভিতর যাইতেছে, কখন বাহিরে আসিতেছে, একটা ভৃত্যকে তিরস্কার করিতেছে, আর এক জনকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছে। গোকুলজী হাসিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "মহাদেব, আমাকে চিনিতে পার?"

মহাদেব ফিরিয়া গোকুলজীকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিল, "কে, গোকুলজী? তোমায় আর চিনিতে পারিব না? কোথা থেকে হে? আজ বড় ভাগ্য। এস, এস!"

এই বলিয়া বৃদ্ধ গোকুলজীর হাত ধরিয়া হড়্ হড়্ করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর বসাইল। গোকুলজী হাসিতে হাসিতে কহিল, "মহাদেব, তুমি আমাদের যেমন শুভানুধ্যায়ী, তাহাতে তোমার

সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা-শুনা করা আমার কর্ত্তব্য। আগে তুমি আমাদের বাড়ী যেতে আস্‌তে, এখন ত আর যাও না। তা, এখন কার কাছেই বা যাবে?”

এই বলিয়া গোকুলজী মস্তক অবনত করিল।

মহাদেব। ভাল মন্দ ত সকলেরই আছে, গোকুলজী! তোমার মা'র বয়সও হয়েছিল। তোমার কি চিরকাল শোক করা উচিত?

গোকুলজী। না, তাই এত দিন তোমার কাছে আসিতে পারি নাই। তা নহিলে আরও আগে আসিতাম। তোমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা সর্ব্বদাই হয়। কিন্তু এ বাড়ীতে আসিতেও বড় সাহস হয় না। রঘুজীর কন্যা রাগ করিতে পারেন।

ম। সে কি? কেন রাগ করিবে? তুমি তারার কি করিয়াছ?

গো। কিছু করি নাই। তবে সেই যে একবার রঘুজীর সঙ্গে ঝগড়া-মারামারি হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই জন্য যদি কিছু মনে করিয়া থাকেন।

মহাদেব হাসিয়া উঠিল। কহিল, “তবে তুমি তারাকে চেন না। আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে তারা তোমায় কিছু বলিবে? সে তেমন মেয়ে নয়।”

অন্য গৃহ হইতে কে ডাকিল, “মহাদেব, কোথায় তুমি?”

মহাদেব উত্তর করিল, “এই যে আমি।”

যে ডাকিতেছিল, সে গৃহে প্রবেশ করিল। কহিল, “আমি তোমায় বাহিরে খুঁজিয়া পাইলাম না। আজ যে তুমি বড় ঘরের ভিতর বসিয়া আছ? কিছু অসুখ করিয়াছে না কি?”

মহাদেব। না। এই গোকুলজী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তাই ইঁহাকে ঘরে বসাইয়াছি। তুমি কি ইঁহাকে চেন না?

চেনে না? তারা গোকুলজীকে চেনে না? চন্দ্র সূর্য্যকে চেনে না? ফুল ভ্রমরকে চেনে না? চিরদরিদ্র চিরাকাঙ্ক্ষিতকে চেনে না? কথা শুন! যাহাকে ভাবিয়া বাঁচিয়া আছি, তাহাকে আমি চিনি না! যে জীবনের কেন্দ্রস্থান, যাহাকে উপলক্ষ করিয়া জীবনের চক্র ঘুরিতেছে, তাহাকে চিনি না? হৃদয়ের সন্ধ্যাকাশে যে একটিমাত্র নক্ষত্র জ্বলিতেছে, সে নক্ষত্র আমি চিনি না?

সেই গোকুলজী আজ তারার গৃহে পদার্পণ করিয়াছে, আজ সে তারার ঘরে বসিয়াছে। আর তারা তাহাকে চিনিবে না? আজ ত সে গোকুলজীকে নিকটে পাইয়াছে। আজ সে কেন তাহাকে আত্মসমর্পণ করুক না? তাহার চরণ ধরিয়া মিনতি করিয়া বলুক না কেন,—জীবিতেশ্বর, আমি তোমাকে মনে মনে বরমাল্য দান করিয়াছি, তুমি আমার স্বামী। বিধাতা আমাদিগকে পরস্পরের তরে সৃজন করিয়াছেন। তুমি আমাকে বিবাহ কর। লোকে যাহা বলিতে হয় বলুক। তাহাতে আমাদিগের কি ক্ষতি? আজ তুমি আমার গৃহে আসিয়াছ। তোমাকে কি বলিয়া অভ্যর্থনা করিব, তোমাকে কি করিয়া সমাদর করিব? তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব, তোমাকে আমার জীবন সর্ব্বস্ব দিব, গ্রহণ কর।

তারা ত এ সব কথা বলিল না। কেন?

গোকুলজী তাহাকে চায় না। সে যে অন্যের প্রণয়ী।

তবে তারা কি বলিবে? চুপ করিয়া থাকিবে? তাও কি পারা যায়? তবে কি বলিবে, গোকুলজীকে চিনি না? ছি! মিথ্যা বলিবে? তারা বলিল, “চিনিব না কেন?”

মহাদেব বলিতে লাগিল, “গোকুলজী কেমন লোক, তা তোমার বলিয়া থাকিব। সম্প্রতি ইঁহার মাতার কাল হইয়াছে। ইঁনি এ বাড়ীতে কখন আসেন নাই। আজ আসিয়াছেন।”

তারা এখন কথা খুঁজিয়া পাইল, কহিল, “তা বেশ ত, উনি যদি আমাদের বাড়ী কখন কখন আসেন, সে ত আমাদের সৌভাগ্যের কথা।”

মহাদেব কহিল, “আমিও তাই বলিতেছিলাম।”

এমন সময় বাহিরে ডাক পড়িল, “মহাদেব।” মহাদেব তাড়াতাড়ি উঠিয়া তারাকে কহিল, “তুমি একটু গোকুলজীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও, আমি এখনি আসতেছি। বাহিরে ক্ষেতের লোক আমায় ডাক্‌চে।”

মহাদেব উঠিয়া গেল। সে লোকের সাক্ষাতে তারাকে “তুমি” বলে। নির্জ্জনে আদর করিয়া “তুই” বলিত।

ঘরে রহিল কেবল তারা আর গোকুলজী। এইবার বিষম বিপদ্‌। কে কি বলিবে? কে আগে কথা কহিবে? তারা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এই দেখিয়া গোকুলজী কথা কহিল, বলিল, “পর্ব্বতে যখন তোমার সহিত দেখা হইয়াছিল, তখন তোমাকে অনর্থক মন্দ কথা বলিয়াছিলাম। সে অপরাধ কি মার্জ্জনা কর নাই?”

তারা। কি মার্জ্জনা করিব? তুমি আমার যে কথা বলিয়াছিলে, গ্রামশুদ্ধ লোকে সে সময় আমায় সেই কথা বলিতেছিল। বরং আমি যে তোমায় দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিলাম, সে জন্ম আমার মার্জ্জনা চাওয়া উচিত।

গোকুলজী। অমন কথা বলিও না। তুমি যে আমায় কোন মন্দ কথা বলিয়াছিলে, তাহা ত স্মরণ হয় না; বরঞ্চ আমাদের খুব যত্ন করিয়াছিলে, তাহাই মনে পড়ে।

তারা কথা ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বিবাহ কবে হইল? বলিতে কিছু আপত্তি আছে কি?"

গোকুলজী অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিল, "সে কি? আমার বিবাহ—কৈ, আমার ত বিবাহ হইবার কোন কথা নাই। সে সম্বন্ধে যদি কিছু শুনিয়া থাক, সব মিথ্যা কথা। আমি সত্য বলিতেছি, আমার বিবাহের এখন কোন সম্ভাবনা নাই। সে সম্বন্ধে যাহা কিছু শুনিবে, কিছু বিশ্বাস করিও না। সব মিথ্যা কথা।"

তারার শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল, সম্পূর্ণ কণ্ঠরোধ হইল। তাহার ভয় হইল, পাছে হৃদয়ের কোলাহল গোকুলজী শুনিতে পায়। সেই ভয়ে বস্ত্রের মধ্যে হস্ত দিয়া হৃদয় চাপিয়া ধরিল। অনেকক্ষণ পরে তাহার কণ্ঠস্বর ফিরিয়া আসিল। তখন সে অতি মৃদু স্বরে, মস্তক উত্তোলন না করিয়া কহিতে লাগিল, "গোকুলজী, আমি আর একটা অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়াছি, তাহা আমার এখন স্মরণ হইতেছে—"

গো। কৈ—না? তুমি ত আমার কিছু অপকার কর নাই।

তারা। আমি এক দিবস বিনা দোষে গৌরীকে অপমান করিয়াছিলাম।

গো। আমি ত তা জানি না। আর স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে সামান্য একটা ঝগড়া হইলে আমাদের ত জানিবার আবশ্যক নাই। গৌরীর সহিত তোমার ঝগড়া হইলে আমি রাগ করিব কেন! সে আমার কে?

গোকুলজী মিথ্যা বলিল। সে আজ পর্য্যন্ত মিথ্যা বলে নাই। আজ সে অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য মিথ্যা কথা কহিল। গোকুলজীর মনে কি ছিল, তাহা জানিলে তারা তাহাকে দেখিয়া কখন এত আনন্দিত হইত না।

তারা আর কিছু বলিল না। তাহার হৃদয়ে আনন্দ উথলিতেছে।

মহাদেব ঘরে ফিরিয়া আসিয়া গোকুলজীকে কহিল, "গোকুলজী, অনেক বেলা হইয়াছে, ভীলপুর এখান হইতে অনেক দূর। আজ এখানে আহার কর।"

গোকুলজী কহিল, "না, বাড়ী যাই। আমাদের একটু অবেলায় আহার করিলে কোন অপকার হয় না।" এমন সময় তারার দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল, —অমনি মহাদেবকে পুনর্ব্বার কহিল, "তা তুমি যদি বল ত এখানেই আহার করি।"

গোকুলজী আহার করিয়া মহাদেবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। মাঝে মাঝে তারাও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। বৈকালবেলা গোকুলজী তারার সহিত দেখা করিয়া গেল। গমনকালে বলিয়া গেল, "পারি ত কাল আসিব।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

গোকুলজী চলিয়া গেলে মহাদেব তারাকে কহিল, "দেখ্ তারা, আমি ভাবিতেছিলাম কি যে, গোকুলজীর সঙ্গে তোর বিবাহ হইলে বড় সুখের হইত। আমার তা হ'লে মরণকালে আর কোন দুঃখ থাকিত না। এই কথা তোকে আর একবার বলেছিলাম না? তা বিয়ের কথা বল্লেই ত তুই রাগ করিস্। এ দিকে গোকুলজীরও না কি আর এক জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়েছে।"

তারা। সব মিথ্যা কথা। গোকুলজী আজ আমাকে নিজে বলেছে যে, তার বিয়ে হবার কোন কথা নাই। লোকে কেবল মিথ্যা রটায়।

মহাদেব তারার মুখের দিকে চাহিয়া কিছু বিস্মিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি তোর সঙ্গে বিয়ে হবে না কি?"

তারা। তুমি কেবল ঐ কথাই বল। গোকুলজীর বিবাহ হয় নাই বলিয়াই কি আমার সঙ্গে বিবাহ হইবে? যেমন তোমার কথা!

এবার ত তারা রাগ করিল না। আর একবার তারাকে এই কথা বলাতে সে হাসিয়াছিল। তবে কি তারা গোকুলজীকে ভালবাসে? মহাদেব ভাবিতে লাগিল। বুড়া মানুষ, কত কথা মনে আসে, কত মনে আসে না। এ কথাটা ভাবিতে সে কথাটা ভুলিয়া যায়। মাথামুণ্ড, ছাইভস্ম, আপনার মনে কত কি ভাবিল। ভাবিয়া স্থির করিল,

তারা গোকুলজীকে ভালবাসে। তাহার পরেই স্থির করিল, ইহাদের বিবাহ দিব।

আর তারা? সে কি ভাবিতেছিল? সে এই-মাত্র বুঝিল যে, হৃদয়ের মধ্যে আনন্দের বন্যা আসিয়া সব ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। দু'দণ্ড বসিয়া যে ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবে, কি দুঃখ ছিল, কি দুঃখ নাই, কিসের জন্য এত আনন্দ, তাহার সে ক্ষমতা রহিল না। শুষ্ক হৃদয়, তাহাতে বিন্দু বিন্দু জলসেচন করিবারও উপায় ছিল না। সে হৃদয় মরুভূমির তুল্য হইয়া উঠিতেছিল। সে হৃদয়ের মধ্যে সহসা অতি বেগে বন্যা ছুটিল। সেই বন্যা সব ডুবাইল, সব গ্রাস করিল। চক্ষু অন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, আর থাকে না। দিন দিন দৃষ্টির হ্রাস হইতেছে, অবশেষে চক্ষে আর আলোক প্রবেশ করে না। এমন সময় অকস্মাৎ অন্ধতা ঘুচাইলে কি হয়? সূর্য্যরশ্মি যে চক্ষে অনেক দিন প্রবেশ করিতে পায় নাই, সে চক্ষে অকস্মাৎ সূর্য্যের আলোক পতিত হইলে চক্ষু নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বিষাদের ভাবনায় এক রাত্রির মধ্যে কৃষ্ণকেশ শুভ্রবর্ণ হইতে শুনা গিয়াছে। অভাবনীয় আকস্মিক আনন্দের আতিশয্যে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়াছে, এরূপ শুনা যায়। যাহার হৃদয় আনন্দ-পরিপ্লুত, সে চিন্তা করিবে কিরূপে? গভীর নিশীথে স্বপ্নবশে কেহ যেমন মুদিতনয়নে ভ্রমণ করে, তারার সেইরূপ মোহজনিত অবস্থা উপস্থিত হইল। কোন মাদক দ্রব্য সেবন করিলে যেরূপ বিকলচিত্ত ও বিকলাঙ্গ হওয়া যায়, তারার ঠিক সেই দশা হইল। চলিতে পা টলে, ভাবিতে মাথা টলে। মৃতপ্রায় আশা পুনর্জীবিত হইয়া তারাকে পাগল করিয়া তুলিল। হর্ষসমুদ্রে তরঙ্গ-দোলায় তাহাকে দোলাইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে শ্রবণে পশিতেছিল,—বহুদূরশ্রুত ভগ্নকণ্ঠ রোদন-সঙ্গীত, এখন যেন হৃদয়ের মধ্যে কে শ্রুতিহর মধুর গীত গায়িল। আকাশে চন্দ্র হাসিল। সঙ্গীতে মাদকতা আছে, প্রেমে মাদকতা আছে, সর্ব্বা-পেক্ষা আশাভাণ্ড মাদকতাময়। সে নেশা কখন ছাড়ে না। তারা সেই পাত্র পূর্ণ করিয়া পান করিল। গোকুলজী আর কাহারও নয়। সে আর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। আজ সে তারার বাটীতে আসিয়াছিল, তারার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছে,—আর,—আর সে বলি-য়াছে, আবার আসিবে।—তাহাতে কি হইল? কি হইল?—শুন, আশা কি বলিতেছে। সে বলিতেছে, সব হইল, গোকুলজী তারার হইল, তারারই হইয়াছে। কি হইল? কি হইল না? আবার কল্পনাকে জিজ্ঞাসা কর। সে বলে, আমিই সুখ। পৃথিবীতে বা পৃথিবীর বাহিরে যাহা কিছু সুখ আছে, তাহা আমারই ভাণ্ডারে। মানুষে আর যাহা কিছু সুখ পায়, তাহা আমার উচ্ছিষ্ট-মাত্র। আমিই সুখের সার, বাকী সুখ নীরস। যদি প্রকৃত সুখ চাও ত আমাকে ভজ। তবে মায়াময়ি, তোমার ইন্দ্রজাল দেখাও, তারাকে মুগ্ধ কর। তারা অসংযতচিত্ত, হৃদয়ে অপ্রতিহত প্রণয়ের লীলাময়ী লহরী। মরাল-মরালী স্বর্ণ-সরোবরে ভাসিতেছে। আকাশে চন্দ্র হাসিতেছে, তাহার নিকটে একটি নক্ষত্র। দুই একখানি ছোট ছোট সাদা মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া বাতাস ঘুমন্ত গাছগুলির মাথা নাড়িয়া দিতেছে, আর তাহারা বিরক্ত হইয়া মর্ম্মর করিতেছে। জীবন আর মৃত্যু এই এক মুহূর্ত্তে মিশিয়া গিয়াছে। জীবনরাজ্যের শেষ সীমার পর মরণ-রাজ্যের আরম্ভ। এখন সে সীমা আর অনু-ভব করা যায় না। এই এক মুহূর্ত্তে জীবন-মৃত্যু সমান, সুখ-দুঃখ সমান, স্বর্গ-নরক থাকে না। সর্ব্বত্রই স্বর্গ, সর্ব্বত্রই জীবন, সর্ব্বত্রই সুখ। তারার চক্ষে ঘুম নাই। এত সুখের ভার বুকে করিয়া নিদ্রা হয় না। এ সুখরাশির কিছু বিলান চাই। তাই তারা বিনিদ্র-নয়নে জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর হৃদয়ে আপনার সুখের স্রোত ঢালিতেছে। রজ-নীর মত এমন রহস্য-সখী আর কোথায়? দুঃখের কথা বল, চুপ করিয়া শুনিবে, কিছু বলিবে না, কেবল তোমার নিশ্বাসের সহিত আপন নিশ্বাস মিশাইবে। সুখের কথা বল, নীরবে হাসিবে। নিশীথের কানে কানে মনের সব কথা বল, কিছু-মাত্র আশঙ্কা নাই। সে সব কথা আর কেহ জানিবে না। মহাসমুদ্রে সহস্র সহস্র নদ-নদী, ক্ষুদ্র তটিনী, সলিলধারা ঢালিতেছে। সে জলরাশি সমুদ্র নিজগর্ভে ধারণ করিতেছে। কোন কথা কয় না, সমুদ্রতীর কখন উদ্বেলিত হয় না। মানু-ষের সুখ-দুঃখের, ভাবনা-চিন্তার, পাপ-পুণ্যের, এইরূপ আরও লক্ষ লক্ষ স্রোত রজনীর গর্ভে মিশাইয়া যায়। রজনী সমুদয় আপনার গর্ভে ধারণ করে। নির্ম্মল অমৃত-সলিলই হউক অথবা লবণাক্ত গরলধারাই হউক হাস্যের লহরীই হউক অথবা রোদনের অশ্রুই হউক, নিঃশব্দে রজনী সম-স্তই আপনার বিশাল প্রশান্ত গর্ভে ধারণ করে।

প্রেম তুচ্ছ সামগ্রী নয়। প্রেমে পৃথিবী, প্রেমে স্বর্গ অনুপ্রাণিত হয়। বিশাল বিশ্বের ধমনীর মধ্যে প্রেমই জীবন। পৃথিবীর মধ্যে যে মুহূর্ত্তে নরনারী প্রেমে বদ্ধ হয়, যে মুহূর্ত্তে আর এক নবীন দম্পতি মিলিত হয়, সেই এক মাহেন্দ্রক্ষণ। সে মুহূর্ত্তে নন্দনবনে পারিজাত ও মন্দার ফোটে, সে মুহূর্ত্তে নরকে যমদূত পাপীকে তাড়না করিতে বিস্মৃত হয়, হতভাগা নরের আত্মা এক মুহূর্ত্তের জন্য পরিত্রাণ পায়।

কে বলিয়াছে, নারী ভালবাসিতে জানে, ইহাই তাহার গুণের চরমোৎকর্ষ নয়? রমণী ভালবাসিতে জানে বলিয়াই অপরাপর মহৎ কার্য্য সমাধা করিতে সমর্থ হয়। ভালবাসাই তাহার মূলমন্ত্র। যে দিন রমণী ভালবাসিতে জানিবে না, সে দিন চন্দ্র-সূর্য্যের গতিরোধ হইবে, বসুন্ধরা স্তম্ভিত হইবে, নক্ষত্র নিভিয়া যাইবে।

৫ম পরিচ্ছেদ

তাহার পরদিবস গোকুলজী আবার আসিল। মহাদেব মনে করিল, সম্বন্ধ পাকাপাকি হইতেছে। এই বিবেচনা করিয়া সে তারা ও গোকুলজীকে একত্রে বসাইয়া, কোন কর্ম্মের ছলনায় নিজে উঠিয়া যাইত। গোকুলজী ঘন ঘন আসা-যাওয়া করিতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় দুই সপ্তাহ অতীত হইলে, এক দিন গোকুলজী তাহাকে নির্জ্জনে পাইয়া কহিল, "তুমি এক দিন তোমার বাড়ীর সম্মুখে একটা উৎসব করিয়া গ্রামের লোককে নিমন্ত্রিত কর। যুবকেরা ব্যায়ামক্রীড়া প্রদর্শন করিবে, আমিও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিব।"

তারা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

গোকুলজী প্রণয়ের কোন কথা তারার সাক্ষাতে বলিত না। সে জন্য তারা দুঃখিত নহে। ভাবিত, আজ না হয় কাল, এক দিন গোকুলজী আমার প্রণয়প্রার্থী হইবেই।

উৎসবের দিন আগত। মহাদেব অনেক ব্যয় করিয়া নানাবিধ আয়োজন করিল। তারা আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে স্বয়ং সমাদর করিয়া বসাইল। বালকেরা মাঠে খেলা করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা আর এক দিকে বসিল। গৌরী আসে নাই, সে ভীলপুরে বৃদ্ধার কুটীরে বসিয়া ছিল। তাহার নিমন্ত্রণও হয় নাই।

গোকুলজী প্রাতঃকালে আসিয়াই বরাবর তারার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছিল। তাহা দেখিয়া যুবকেরা আপনা-আপনি অনেক বিদ্রূপ করিতে লাগিল। এক জন বলিল, "গোকুলজী হুঁসিয়ার লোক কি না। গৌরীকে বিবাহ করিলে ত অর্থলাভ হইবার কোন আশা নাই। তারাকে বিবাহ করিলে অর্থচিন্তা আর থাকিবে না। তাই সে এখন তারাকে বিবাহ করিবার ফিকির করিতেছে।" আর এক জন কহিল, "তারাও বুঝি স্বয়ংবরা হইয়াছে। দেখ না, গোকুলজীর দিকে কেমন চাহিয়া আছে।"

তারার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি হইয়াছিল। এত লোকের সাক্ষাতে গোকুলজী অনবরত তাহার সঙ্গে ঘুরিতেছে, লোকে যে তাহাতে মন্দ মনে করিতে পারে, এ জ্ঞান তাহার ছিল না। সে আনন্দে অধীর; ভাবিতেছিল, গোকুলজী যখন তাহার নিকটে রহিয়াছে, তখন আমাদের মিলন হইবেই। লোকে দেখিলই বা?

শম্ভুজী সব খবর রাখে। তারার বাড়ীতে ইদানীং সে যাতায়াত পরিত্যাগ করিয়াছিল। আজ সেও এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া সব দেখিতেছিল।

অপরাহ্নে ব্যায়ামক্রীড়া আরম্ভ হইল। সে সময় গোকুলজী নানাবিধ আশ্চর্য্য ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতাকে চমৎকৃত করিল। তারাও হর্ষবিকসিত চক্ষে চাহিয়া ছিল।

ক্রীড়া সমাপন করিয়া গোকুলজী ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে তারার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়াই তারাকে উচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তারা, তুমি কি আমাকে পতিত্বে বরণ করিবে?"

তারা লজ্জায় অধোবদন হইল। অস্ফুটস্বরে কহিল, "এত লোকের মাঝখানে?"

গোকুলজী পূর্ব্ববৎ স্পষ্টাক্ষরে কহিল, "এত লোকের মাঝখানে হইলই বা? ইহাতে আবার লজ্জা কি? আমার কথার উত্তর দাও।"

সকলে রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিল।

তখন তারা প্রেমাশ্রুপূর্ণলোচনে গোকুলজীর চক্ষের দিকে চাহিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে কহিল, "আমি তোমায় যে দিন দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে তোমায় সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি।"

ভিড়ের মধ্য হইতে ঠেলাঠেলি করিয়া শম্ভু

অগ্রসর হইল। চক্ষু-কর্ণ ব্যতীত তাহার অন্যান্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি বর্জিত হইয়াছিল।

গোকুলজী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ঘৃণাব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিল,—কণ্ঠস্বর অতি মৃদু। সমবেত লোকমণ্ডলী প্রত্যেক অক্ষর শুনিতে পাইল,—"তবে শোন, রঘুজীর কন্যা! তোমার অর্থ আছে, এ জন্য তুমি মনে করিয়াছ যে, দরিদ্রের অপমান করিলে সে অপমানের কেহ প্রতিশোধ লইবে না। সেই সাহসে ঐশ্বর্য্যমত্ত হইয়া তুমি বিনাপরাধে সর্ব্বসাক্ষাতে গৌরীর দারুণ অপমান করিয়াছিলে। এখন শোন। তুমি ধনবতী, আমি দরিদ্র। তুমি আমাকে অযাচিত প্রেম দান করিতেছ, আমাকে মালা দিতে স্বীকৃত আছ। আমি তোমায় গ্রহণ করিব না। নিরপরাধিনী অবলার ঘোর অবমাননা করিয়াছিলে। সে ভ্রমেও তোমার কোন অপরাধ করে নাই। আজ সেই অপমানের প্রতিশোধ হইল। আমি তোমার প্রণয় চাহি না। তুমি আমার উপযুক্ত নও। আমার কথার এত লোক সাক্ষী। তোমার প্রেম ভবিষ্যতে যে চাহিবে, তাহাকে অকাতরে বিতরণ করিও।"

তীব্র ব্যঙ্গের মর্ম্মচ্ছেদী কণ্ঠস্বর দূর পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইয়া নীরব হইল। গোকুলজী নিজ গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেল।

অনাহূত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা তারার প্রণয়প্রার্থী হইয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়াছিল, তাহারা গোকুলজীর কথা সমাপ্ত হইলে হাসিতে হাসিতে তাহাকে কহিল, "বাহাবা, গোকুলজী, আচ্ছা বলিয়াছ! থোঁতা মুখ আচ্ছা ভোঁতা হয়েছে।"

গোকুলজী দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

মহাদেব ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে দ্রুতবেগে গোকুলজীর অনুসরণ করিল। তাহার ইচ্ছা, গোকুলজীকে মনের সাধ মিটাইয়া তিরস্কার করে। কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাহাকে দেখিতে পাইল না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

তারার মাথা ঘুরিয়া আসিল। নিকটে এমন কোন অবলম্বন ছিল না, যাহা ধরিয়া দাঁড়াইবে। তবু সে দাঁড়াইয়া রহিল। বজ্রাহতের তুল্য স্থির রহিল। সেই সময় কে তাহার কর্ণে বলিল, "এ অপমানের প্রতিফল আছে।"

তারা মাথা তুলিয়া চাহিল। নিকটে আর কোন লোক ছিল না, সকলে প্রস্থান করিয়াছিল। যে দুই চারি জন লোক ছিল, তাহারাও ক্রমে চলিয়া গেল। তারার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া শম্ভুজী বলিতেছিল, "এ অপমানের প্রতিশোধ আছে।"

তারা শম্ভুজীকে দেখিতে পাইল। শম্ভুজী দেখিল, তারার মুখ পাংশুবর্ণ, চক্ষের জ্যোতি নিবিয়া গিয়াছে। তারা তাহার কথা শুনিতে পাইল না, দেখিয়া শম্ভুজী আবার কহিল, "এ অপমানের কি প্রতিশোধ নাই?"

তারার মস্তকে, হৃদয়ে সহস্র নরকজ্বালা, চক্ষের সম্মুখে নরক নৃত্য করিতেছিল। নরক হইতে কে আসিয়া তারার কানে কানে কহিল, "এ অপমানের একমাত্র প্রতিবিধান আছে।"

শম্ভুজীকে দেখিয়া তারার শিরার মধ্যে রক্ত-স্রোতঃ বেগে প্রবাহিত হইয়া তাহার মুখ অন্ধকার করিয়া তুলিল। চক্ষে একবারমাত্র লোহিত বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল।

তারা কথা কহিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। শোণিতস্রোতঃ স্বর রুদ্ধ হইল। কণ্ঠ হইতে বাঙ্-নিষ্পত্তি হইল না। মুখমণ্ডল আরও অন্ধকার হইয়া উঠিল।

সে আবার বাক্যস্ফূর্ত্তির প্রয়াস করিল। এবার কণ্ঠ হইতে শব্দ নির্গত হইল। ভগ্ন, জড়িত কণ্ঠে কহিল, "এ অপমানের একমাত্র প্রতিশোধ আছে।"

শম্ভুজী আরও নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি উপায়ে?"

তাহাদের অঙ্গস্পর্শ হইল।

তারা কহিল, "যে মুখ আমার অপমান করিয়াছে, সেই মুখ চরণতলে দলিত করিতে পারি, তাহার জিহ্বা ছেদন করিয়া কুক্কুরকে খাওয়াইতে পারি, আর তাহার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া গৌরীর ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিতে পারি, তবেই আমার এ অপমান ভুলিতে পারিব। নহিলে বৃথাই জীবন। গোকুলজী জীবিত থাকিতে আমার শান্তি নাই।"

শম্ভুজী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কহিল, "যে তোমার এ উপকার করিবে, যে গোকুলজীকে নিধন করিবে, তাহাকে তুমি কি দিবে?"

তারা। তাহাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।

তখন আশা শম্ভুজীর কর্ণে পৈশাচ মন্ত্র প্রদান

করিল। সে কহিল, "গোকুলজী আর কখন প্রাতঃ-সূর্য্যের মুখ দেখিবে না, সে ভার আমার উপর। আমাকে তুমি বিবাহ করিবে?"

তারা হস্তোত্তোলন করিয়া কহিল, "আমার হৃদয়ের মধ্যে যে নরক জ্বলিতেছে, সেই নরক সাক্ষী করিয়া কহিতেছি, আমি তোমায় বিবাহ করিব। পূর্ব্বে আমার ভ্রম হইয়াছিল, নহিলে এত দিন তোমাকে বিবাহ করিতাম। আমার এ নরকাগ্নি কোন দিন আমাকেই ভস্মীভূত করিত। এখন আমরা দুই জনে মিলিত হইয়া এ অগ্নিতে হবিঃপ্রদান করিব। গোকুলজী মরুক, তাহার শোণিতে এ অনল নিভাইব।"

শম্ভুজী কহিল, "আমি শপথ করিতেছি, তোমার পায়ের কাঁটা না তুলিয়া জলস্পর্শ করিব না। তোমাকে লাভ করিবার জন্য সহস্র গোকুলজীর প্রাণ বধ করিতে পারি। তাহাকে আজ রাত্রেই হত্যা করিব! আজ রাত্রেই তোমাকে সে সংবাদ আনিয়া দিব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।"

তারা কহিল, "ভাল। তুমি যেন সিদ্ধকাম হও।"

শম্ভুজী তারাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। তারা তাহাকে নিবারিত করিয়া কহিল, "কি? আমাদের আবার আলিঙ্গন কি? কোমল-হৃদয় নরনারী যাহা করে, আমরাও কি তাই করিব? ছি! হাত ধর শপথ কর, গোকুলজীর রক্ত আনিয়া আমার কপালে সিন্দূর পরাইবে।"

দুই জনে দুই জনের হাত চাপিয়া ধরিল, দুই জনে পরস্পর নয়নের ভিতরে দীর্ঘকাল চাহিয়া রহিল, আর কোন কথা কহিল না। দুই জনে মনে মনে শপথ করিল।

তৎকালে সে স্থলে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না।

এই লোমহর্ষণ স্বয়ংবরের ভয়ঙ্কর পণ আর কেহ শুনিল না।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

পশ্চিম-গগনে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেব সে পণ শুনিলেন। তিনি আর বিলম্ব করিলেন না। অন্ধকার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে সম্মুখীন করিয়া দিননাথ মুখ লুকাইলেন। নিঃশব্দে সন্ধ্যা আসিল। তাহার অঞ্চল ধারণ করিয়া, আপনার অঞ্চলে নক্ষত্র পূরিয়া যামিনী আসিল। যেমন নিত্য আসে, তেমনি আসিল। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রাত্রি। চাঁদ উঠিল না। একটি, দুটি, তিনটি করিয়া তারা উঠিল,—ক্ষীণ, চঞ্চল-জ্যোতি, ছোট ছোট মুখের মত, হারান মুখের মত, আশার আলোকের মত, চিরবাঞ্ছিত অস্পৃশ্য প্রিয়জনের মত। জন্মাবধি নক্ষত্র দেখিয়া আসিতেছি, কখন নক্ষত্র স্পর্শ করিতে পাইলাম না। বালকে যাহা দেখে, তাহাই স্পর্শ করে, কিন্তু মানুষের এ সাধ কখন মেটে না। নক্ষত্রকুল জগতের পাপপুণ্যের অনন্ত সাক্ষী, তাহারা এ পৃথিবীর সব জানে, আমরা তাহাদের কিছু জানি না।

নক্ষত্র যদি কথা কহিতে পারিত, কোটি বৎসর ধরিয়া কি দেখিয়া আসিতেছে, মনুষ্যের অগোচর মানব-হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে নিহিত তথ্যসমূহ যদি বলিতে পারিত, তাহা হইলে ইতিহাসে আর মিথ্যা বলিত না। মানবচরিত্র লোকে কেবল কল্পনা করিত না, বহির্জগৎ অন্তর্জ্জগৎ এরূপ সংশয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন রহিত না।

যামিনী আসিয়া দাঁড়াইল। তুমি যেই হও না কেন, নিশাগমে তোমার স্পষ্ট বোধ হইবে যেন কে তোমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। যখন দেখিবে, রাত্রি আসিয়া তোমার গাত্রস্পর্শ করিল, অমনি সাবধান হইবে। মনে কোন পাপ-চিন্তা আছে? সাবধান, তবে সাবধান! দেখিও, যেন রাত্রির পরামর্শে মনোভাব কার্য্যে না পরিণত হয়। প্রদীপ জ্বাল, দ্বার রুদ্ধ কর, নিশীথে কদাচ একাকী বাহির হইও না। বিবেচনাশূন্য হইয়া রজনীর ক্রোড়ে কখন ঝাঁপ দিও না। সে তোমাকে ক্রোড়ে লইবে, অঙ্গে কোমল, সুশীতল হস্ত বুলাইবে, সুবুদ্ধিকে ঘুম পাড়াইবে, দুর্ব্বুদ্ধিকে জাগাইয়া রাখিবে।

তুমি বিষণ্ণমুখি, অভাগিনি, রাত্রিকালে মাথায় হাত দিয়া একেলা বসিয়া ভাবিও না। ছি! উঠ, ঘরে যাও, রাত্রিকালে একান্তে এরূপ একাকিনী বসিয়া থাকিও না, কেহ কিছু মন্দ বলিয়াছে? সে আবার ভাল কথা বলিবে। তুমি কাহার কাছে মনের কথা বলিতেছ? সর্ব্বনাশ! এমন রাত্রের কাছে এমন দুঃখের কথা! অন্ধতামসী নিশি কি তোমাকে চক্ষের জল মুছিতে বলিবে, সে কি তোমায় আশ্বাস প্রদান করিবে? সে কি বলিবে, জান? সে বলিবে, নারীজন্মে অনন্ত দুঃখ, তোমার এ দুঃখ ইহজন্মে ঘুচিবে না। সূর্য্যের আলোক দুঃখময়। তুমি আলোকরাজ্য হইতে পলায়ন কর। আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে

অনন্ত অন্ধকারে, সুবিস্তীর্ণ নিশারাজ্যে লইয়া যাইব। সে অন্ধকারে তারকা নাই। সেখানে আর তোমাকে এ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না, এ যন্ত্রণাজ্বালা চিরদিনের মত ঘুচিবে। ঘরে একটু দড়ী নাই? না থাকে, বস্ত্রাঞ্চল ত আছে। রাত্রে মরিও না, লোকে আমার নিন্দা করিবে। সূর্য্যালোকে, নিভৃতকক্ষে, গলায় ফাঁস দিও, আমি তোমায় রাত্রিকালে আসিয়া লইয়া যাইব।

পা টিপিয়া টিপিয়া শোণিতাক্ত-কলেবরে, ঘূর্ণিত আরক্ত চক্ষে, পাণ্ডুর অধরে নরহত্যাকারী যাইতেছে। মনে করিতেছে, যামিনীই আমার পরম হিতকরী। লুকাও, লুকাও, নক্ষত্রের মুখ ঢাক, পথঘাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন কর, আমি তোমার আশ্রয় লইয়াছি। তোমার কৃপায় পলায়ন করিব। হস্তে শোণিত লিপ্ত রহিয়াছে। জল পাইলেই হস্ত প্রক্ষালন পূর্ব্বক আবার পলাইব। কেহ আমাকে ধরিতে পারিবে না, কেহ আমাকে বিচারালয়ে নীত করিবে না। প্রভাতকে নিকটে আসিতে দিও না। তোমার জয় হউক, ধরাতলে তোমার অনন্ত রাজ্য স্থাপিত হউক। মূর্খ! পাপে তোমার চিত্ত ভ্রষ্ট হইয়াছে। আজ যে রজনীর গুণগান করিতেছ, কাল সেই রজনীকে ভয়ে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আজ রজনী কিছু বলিতেছে না, কাল তোমায় বিভীষিকা দেখাইবে। কাল তোমার মনের মুকুরে ভীষণ অন্ধকারময় মূর্ত্তি-সমূহ প্রতিবিম্বিত করিবে, কাল তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইবে। মানুষে দেখুক আর নাই দেখুক, রাজদণ্ডে দণ্ডিত হও আর নাই হও, নিশীথের নির্য্যাতন এড়াইতে পারিবে না, সহস্র বৃশ্চিক তোমায় দংশিতে থাকিবে। রজনীর অন্ধকার-পটে পরিণামের চিত্র, নরকের চিত্র দেখিতে পাইবে। নিশীথে যমদূতগণ তোমাকে ধরিবার জন্য কৃষ্ণবর্ণ হস্ত প্রসারিবে। তখন সূর্য্যের আলোকের জন্য লালায়িত হইবে, রাজদণ্ডও সুখের বোধ হইবে।

এ আবার কে? দেখ, দেখ! ইহার মনে কোন খলকপট নাই। কোন পাপ-ইচ্ছা নাই, ধনমানের আশা নাই, যশ মর্য্যাদার প্রার্থী নয়। একমনে তন্মনা হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তারা গণিতেছে?—না, তাহার হাতে যে বাঁশী আছে, তাহার কোলে বীণা রহিয়াছে। শোন, নিশীথ-বংশীধ্বনি! কদম্বমূলে নিশীথেই বাঁশী বাজিত, না—যখন যমুনা উজান বহিত? ওই শোন, আকাশে নক্ষত্র অবনত-মস্তকে শুনিতেছে, পৃথিবীতে ফুল মাথা তুলিয়া তাহাই শুনিতেছে, সুপ্ত শিশু স্বপ্নে সেই মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া হাসিতেছে। আবার দেখ, বীণা তুলিয়া লইল। বীণার তারে নক্ষত্রকে নক্ষত্রের সহিত বাঁধিতেছে, ফুলকে ফুলের সহিত বাঁধিতেছে।' হৃদয়কে হৃদয়ের সহিত বাঁধিতেছে। তাহার পরে অঙ্গুলীর আঘাতে বীণার ঝঙ্কার দিয়া গায়িল, 'সব মিশিয়া যাও, কেহ দূরে থাকিও না। সকলে মিলিয়া একসুরে গান গাও। সব এক, দুই কিছু নয়।' যামিনী সস্নেহে নক্ষত্রহীরকখচিত স্বপ্নবিজড়িত নীল অঞ্চলে তাহার মস্তক আবৃত করিয়াছে।

জ্ঞান চাও? বিশাল বিশ্বের আয়তন পরিমিত করিতে চাও? শতসূর্য্য তুল্য এক এক নক্ষত্রের ব্যাস, পরিধি জানিতে চাও? সৃষ্টির কতদূর পর্য্যন্ত প্রসার; বিশ্বের পর বিশ্ব, এক সৌরজগতের পর আর এক সৌরজগৎ, পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের পর নীহারিকারূপী অনুমিত ব্রহ্মাণ্ড; যেখানে অন্ধকার অসঙ্কোচে বিচরণ করিতে পারে না, আলোকের পদক্ষেপ শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করে; আবার এই বিশ্বক্ষেত্রের পতিত ভূমিস্বরূপ চিরান্ধকার অরাজক স্থান কল্পনা করিতে চাও; যেখানে নিয়ম নাই, সমুদয় বিশৃঙ্খলাময়, যেখানে অণু, সূক্ষ্মাণু, পরমাণু কখন আশ্লিষ্ট হয় না, অন্ধকারে অবিচ্ছিন্ন বিলোড়িত হইতে থাকে, যেখানে সৃজনের অপূর্ব্ব মন্ত্র কখন উচ্চারিত হয় নাই? কল্পনাকে অভিভূত করিতে চাও? মনুষ্যত্বের গৌরব বর্দ্ধিত করিতে চাও? এই সময়, তবে এই সময়। দেখ দেখি, নক্ষত্রে কিছু সাহায্য করে কি না? মৃত্তিকাময় কীটাণু-কীট ক্ষুদ্র মানব নক্ষত্রের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে কি না? বিশ্বকাব্য-প্রণেতার গ্রন্থ পাঠ করিতে চাও? এই সময়, তবে এই সময়।

রজনী গভীরা হইতেছে, স্তরের উপর অন্ধকারস্তর নামিতেছে, অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছে। তারা কোথায়?

প্রতিশোধানল কর্তৃক উত্তেজিত হইয়া সে গোকুলজীর প্রাণ-হননে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। শম্ভুজী তাহার চক্ষে অতিশয় ঘৃণার পাত্র, তথাপি সে অসঙ্কোচে তাহাকে পাণিপ্রদানে সম্মত হইল।

অথচ সে গোকুলজীকে প্রাণের অধিক ভালবাসিত।

এই কি সেই ভালবাসার ফল? গোকুলজী কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া তাহার প্রাণবিনাশে উদ্যত হইল?

ইহাই নিয়ম। যাহাকে ভালবাসি, তাহার একটি কথাও সহ্য করা যায় না। প্রণয়ের অপমানে যত ক্রোধ হয়, এত আর কিছুতে নয়। তারার হৃদয়ের মধ্যে অগ্নুদ্গারী পর্ব্বত লুক্কায়িত ছিল, গোকুলজীর হৃদয়ভেদী অবমাননায় সে পর্ব্বত জ্বলিয়া উঠিল, তরলবহ্নিপ্রবাহে তারা স্বয়ং দগ্ধ হইল, সেই অগ্নিস্রোতে গোকুলজীকে দগ্ধ করিবার উপক্রম করিল।

সন্ধ্যা হইলে তারা ভাবিতে বসিল। মহাদেব বুঝাইতে আসিলে তাহাকে ইঙ্গিত দ্বারা নিষেধ করিল। আবার ভাবিতে বসিল, কিছু ভাবিতে পারিল না। আপাদমস্তকে কেবল প্রজ্বলিত অগ্নি জ্বলিতে লাগিল।

রাত্রি হইয়া আসিল। তারা কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিল না। জ্বলিতে, পুড়িতে, ভাবিতে লাগিল।

আরও রাত্রি হইল। মহাদেব আহারের জন্য ডাকিতে আসিল। তাহাকে তারা ধমক দিল। সে চলিয়া গেল।

তারা গৃহের বাহিরে আসিল। নিশীথের শীতল পবন তাহার ললাট, কপোল স্পর্শ করিল। সে ভাবিতে লাগিল।

ভাবিতেছিল, গোকুলজী আমার দারুণ অপমান করিয়াছে। আমি তাহার প্রাণ লইব। তাহা হইলে আর কেহ কখন আমার অপমান করিবে না। গৌরী কাঁদিবে, তাহার সে অশ্রুমুখ দেখিলে আমার প্রাণ শীতল হইবে। শম্ভুজী আমার ভর্ত্তা হইবে? তা হইলই বা? সে যে গোকুলজীকে হত্যা করিবে, তাহার হস্ত যে নরশোণিতে কলুষিত হইবে! তাহাতে তাহার অপরাধ কি? আমিই ত তাহাকে সে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছি। আচ্ছা, গোকুলজী মরিলে আমার কি লাভ? লোকে নিশ্চয় আমাকে সন্দেহ করিবে। মনে করিবে, আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি। লোকে যাহা ইচ্ছা হয় মনে করুক না কেন, আমার তাতে কি? লোকের জন্য যেন না-ই ভাবিলাম, নিজের জন্য ভাবিতে হয় ত। গোকুলজীকে মারিলে পরে কি আমার মনে কষ্ট হইবে না? এখনি যখন সাত-পাঁচ ভাবিতেছি, তখন না জানি কত মনঃকষ্টই ভোগ করিতে হইবে। তাহাকে মারিয়া কি হইবে? সে বাঁচিয়া থাকুক, অন্য কোন উপায়ে এ অপমানের পরিশোধ তুলিব। দূর ছাই! মিছে এ ভাবনা কেন? গোকুলজীকে কে বধ করিবে? শম্ভুজী? ভাল হাসির কথা! শৃগালে সিংহ বধ করিবে! কি জানি, বলা যায় কি? যদি কোন কৌশলে অকস্মাৎ তাহার প্রাণনাশ করে, তা ত পারে। যদি নিদ্রিতাবস্থায় তাহার কুটীরে প্রবেশ করিয়া তাহার গলায় ছুরী বসাইয়া দেয়! কেন শম্ভুজীকে এমন কথা বলিয়াছিলাম? সে হাসিতে হাসিতে রক্তমাখা হস্তে আমাকে আলিঙ্গন করিবে! তাহার অপেক্ষা গোকুলজীর কাছে শতবার অপমানিত হওয়া ভাল। নরহন্তার সহধর্ম্মিণী, নরহত্যাপাপভাগিনী! জীয়ন্তেই আমাকে যমদূতগণ পীড়ন করিবে। শম্ভুজী কোথায়? একবার তাহাকে খুঁজিলে হয় না? সে ত বলিয়াছে, আজ রাত্রেই গোকুলজীকে হত্যা করিবে। বোধ হয়, আজ পারিবে না। তাহার সহিত যদি দেখা হয় ত তাহাকে নিষেধ করিয়া দিব।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। তারা শঙ্কাশূন্য-হৃদয়ে অন্ধকার রজনীমধ্যে একাকিনী বিচরণ করিতে লাগিল।

কোথায় যাইবে? শম্ভুজীকে কোথায় অন্বেষণ করিবে?

শম্ভুজীর গৃহে? সেখানে ত সে নাই!

ভীমপুরের পথে? সেই ভাল, কিন্তু সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা কি?

অন্ধকার রজনী। বসন্তকাল। আকাশময় তারকা। শীতল পবন মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইতেছে। নিরবচ্ছিন্ন ঝিল্লীরব। গাছগুলা দীর্ঘকায় অন্ধকারের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তলায় রাশি রাশি শুষ্ক পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারই মধ্য দিয়া অপ্রশস্ত পথ।

তারা মন্দগমনে চলিল। ভয়ে নহে! শম্ভুজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশা অল্প।

শুষ্ক বৃক্ষপত্রের মধ্যে কি খস্ খস্ করিয়া উঠিল। নিশাচর সর্প? তারা সরিয়া দাঁড়াইল।

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আবার দাঁড়াইল। কোথায় যেন শব্দ শুনিতে পাইল।

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, আর কোন শব্দ শোনা যায় না।

অনর্থক দাঁড়াইয়া কি হইবে? আবার চলিতে লাগিল, চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে

ভাবিতে পথ হারাইয়া গেল। অনিশ্চিত গতিতে এদিক সেদিক ভ্রমণ করিতে লাগিল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। ঝিল্লীরব আর তেমন শোনা যায় না। বাতাস আর একটু শীতল হইল, আর একটু খর বহিল। বৃক্ষতলে বৃক্ষপত্রমধ্যে খদ্যোতিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

তারা উপরে চাহিল। দেখিল, উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে এক খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে মেঘখণ্ড তাহার মস্তকের উপর আসিল; তাহার বোধ হইল যেন, সে মেঘ আকাশের মধ্যে স্থির হইল।

তাহার মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল।

চারিদিকে চাহিয়া বুঝিল, পথ হারাইয়া গিয়াছে। কোথায় আসিয়াছে, ভাল বুঝিতে পারিল না।

অকস্মাৎ যেন দুর হইতে মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইল।

তখনও সেই কৃষ্ণমেঘ তাহার মস্তকের উপর অন্ধকার করিয়া রহিয়াছে।

তারা সভয়ে কহিল, "এখানে কোন মনুষ্য আছে ?"

কোথাও কিছু না। কেবল গভীর স্তব্ধতা।

সম্মুখে পর্ব্বতের অস্পষ্ট রেখা দেখা যাইতেছে। মাথার উপর অন্ধকার বলিয়া ভাল দেখা যায় না।

আর একবার বলিল, "কেহ আমার কথা শুনিতেছ ?"

একটা পেচক কর্কশ কণ্ঠে উত্তর দিল। নিশীথের শ্রবণে সে কর্কশ স্বর ভীষণ শ্রুত হইল।

মেঘখণ্ড ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

তখন তারা স্পষ্ট দেখিতে পাইল, অতি নিকটে নিম্ন গিরিশ্রেণী রহিয়াছে। বুঝিল যে, সে স্থান গ্রামের এক প্রান্তে স্থিত। সেখান হইতে তাহার গৃহ অধিক দুর নয়।

সহসা অতি নিকট চীৎকার শ্রুত হইল। চীৎকার-ধ্বনি পর্ব্বত-গহ্বরে পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইয়া নিশীথের গর্ভে ডুবিয়া গেল।

আবার চারিদিক্ ভয়ানক নিস্তব্ধ।

তাহার মনে দারুণ সন্দেহ জন্মিল। সাহসে ভর করিয়া, যে দিকে চীৎকার শুনিয়াছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইল।

বিপরীত দিক্ হইতে অন্ধকারে আর এক মনুষ্য-মূর্ত্তি অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে সম্মুখবর্ত্তী হইল।

?"

"তারা !"

"এখানে ?"

"তুমি এখানে ?"

"কাহার অনুসন্ধানে ?"

"তোমার।"

"সংবাদ কি ?"

"তুমি আমার।"

এই বলিয়া শম্ভুজী বাহু প্রসারিত করিয়া তারাকে আলিঙ্গন করিতে আসিল। তারা লম্ফ দিয়া আর এক দিকে দাঁড়াইয়া কহিল, "এখন নয়, কাহার চীৎকার শুনিলাম ?"

"যে তোমাকে অপমান করিয়াছিল, তাহার।"

"সে কোথায় ?"

"পর্ব্বতগহ্বরে। সে আর এখন চীৎকার করিবে না।"

তারা পুনর্ব্বার লম্ফ দিয়া দুই হস্তে শম্ভুজীর বাহুর উপরিভাগ দৃঢ়রূপে ধরিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "কি ? সত্য কথা ?"

"সত্য কথা। চীৎকার কর কেন ? যদি কেহ শুনিতে পায়; হাত অত চাপিও না, লাগে।"

"সে কোথায় আছে ? কত দূরে ?" তারা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

"গহ্বরের মুখ অতি নিকটে। সে বহুদুরে, ধরণীগর্ভে।"

"আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল।"

"সেখানে গিয়া কি হইবে ? কিছু ত দেখিতে পাইবে না। রাত শেষ হইল, চল, বাড়ী যাই।"

"তা হউক। বাড়ী খুব কাছে। তুমি আমাকে আগে সেই স্থানটা দেখাও।"

শম্ভুজী তারাকে পথ দেখাইয়া চলিল। পথিমধ্যে তারা কহিল, "যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সব বল।"

"সে অনেক কথা। বিবাহের পর বলিব।"

"তুমি এখনি বল। দাঁড়াইয়া শুনিব।"

"তবে শুন। তোমার নিকট হইতে বিদায় হইয়া গৃহ হইতে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা লইলাম। তাহার পর ভীলপুরের পথে অতি বেগে ধাবিত হইলাম। সে পথে গোকুলজী থাকিলে নিঃসন্দেহ তাহার সহিত দেখা হইত। অর্দ্ধেক পথ চলিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিলাম। আসিতে অন্ধকার হইল। তোমার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দেখি, গোকুলজী প্রচ্ছন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাহসটা একবার দেখ। বোধ হয়, তোমাকে আরও কিছু অপমান করিবার

অভিপ্রায় ছিল। সেখানে তাহাকে মারিতে সাহস হইল না। একে ত ছুরী লইয়াও তাহার সম্মুখে যাওয়া সহজ নয়, আবার তাহাতে চারিদিকে লোকজন থাকে, চীৎকার করিলে অনেক লোক জড় হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ নানা কথা ভাবিতেছি, এমন সময় সে এই দিকে আসিল। আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম, এমন সুবিধা আর হইবে না। হয় মারিব, না হয় মরিব। আর কেহ দেখিবে না। অনেকক্ষণ কোন সুবিধা হইল না। সে চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল, অলক্ষ্যভাবে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী হইতে পারিলাম না। অবশেষে আমি একটা কন্দরের নিকটে বসিয়া বালকের মত মৃদু মৃদু রোদন করিতে লাগিলাম। গোকুলজী দ্রুতপদে আমার নিকটে আসিল। ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাতে গিয়া পৃষ্ঠে ছুরী বিদ্ধ করিলাম। যেমন ফিরিয়া আমার হাত ধরিবে, অমনি ঠেলা মারিয়া তাহাকে পর্ব্বতকন্দরে নিক্ষেপ করিলাম। —এই জায়গাটা।"

গহ্বরের মুখ হইতে হাত দশেক অন্তরে দাঁড়াইয়া শম্ভুজী অঙ্গুলী দ্বারা স্থানটা নির্দ্দেশ করিয়া দিল। তাহার পর হাসিয়া কহিল, "তারা, আমাদের বিবাহ হইবে কবে ?"

তারা তৎক্ষণাৎ কহিল, "এই দণ্ডে, এই মুহূর্ত্তে।"

"এখন তামাসার সময় নয়। এইমাত্র একটা খুন করিয়াছি।"

"তামাসা নয়। সত্যই বলিয়াছি।"

শম্ভুজী অস্ফুট আলোকে তারার মুখ দেখিয়া বুঝিল, বিদ্রূপ নয়। বুঝিয়া এক এক পা করিয়া পিছাইতে লাগিল।

তারা দীর্ঘ চরণক্ষেপে শম্ভুজীর পার্শ্বে আসিয়া তাহার হস্ত লৌহমুষ্টিতে ধারণ করিয়া কহিল, "মূর্খ, পালাও কোথায় ? আইস, বিবাহ করিবে।" এই বলিয়া তাহাকে পর্ব্বতকন্দরের মুখের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

শম্ভুজী ভীত হইয়া কহিল, "সে কি ? আমায় কেন টানাটানি করিতেছ ?"

"বিবাহের জন্য। যেখানে গোকুলজী গিয়াছে, সেইখানে আমাদের বিবাহ হইবে।"

"বিদ্রূপ মন্দ নয়। আমার সঙ্গে কি এই বিবাহের পণ করিয়াছিলে ?"

"নরক সাক্ষী করিয়াছিলাম। চল, আমরা নরকে যাই। আমরা অক্ষয় নরক ভোগ করিব।"

"আমার এমন বিবাহে কাজ নাই। আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে চাহি না।"

"শুন, শম্ভুজী! তুমি যখন আমাকে প্রথমে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে, তখন আমার হাতে কাঁটা বিঁধিয়া রক্ত পড়িয়াছিল। তখন আমি কিছু বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিতে পারিতেছি। শোণিত-স্রোতেই আমাদের বিবাহ হইবে। সে সময় আসিয়াছে।" সর্পিণীর গরল-নিশ্বাসের ন্যায় এ কথা শম্ভুজীর কর্ণে লাগিল।

গহ্বরমুখে এবং তারা ও শম্ভুজীর মধ্যে তিন হাত মাত্র ব্যবধান রহিল।

শম্ভুজী প্রাণের দায়ে টানাটানি আরম্ভ করিল। গৃধিনীর চঞ্চুর মধ্যে ভুজঙ্গ যেমন ছট্‌ফট্ করে, সেইরূপ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তারা এক অঙ্গুলী পশ্চাতে সরিল না, অল্পে অল্পে শম্ভুজীকে টানিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। শম্ভুজী প্রাণভয়ে কাতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

আর এক পদ অগ্রসর হইলেই গহ্বরে পতিত হয়, এমন সময় গহ্বরের মধ্য হইতে অতি ক্ষীণ শব্দ হইল, "রক্ষা কর!"

প্রতিধ্বনি ? না আশার ছলনা ?

তারা মুখ নত করিয়া তীব্র কণ্ঠে কহিল, "গোকুলজী, তুমি কি জীবিত আছ ?"

তারা কান পাতিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কিছু শোনা গেল না, অবশেষে পুনর্ব্বার ক্ষীণস্বরে শব্দ হইল, "আছি। রক্ষা কর!"

তারা পূর্ব্ববৎ কহিল, "তুমি যেমন আছ, তেমনি আর কিছুক্ষণ থাক। তোমাকে রক্ষা করিব।"

আর কোন উত্তর আসিল না।

আগ্রহাতিশয়ে তারা শম্ভুজীকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া প্রাণভয়ে বেগে পলায়ন করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

তারা ফিরিয়া, শম্ভুজীর জন্য কিছুমাত্র চিন্তিত না হইয়া গ্রামমুখে ধাবিত হইল। কোন বাধা না মানিয়া, অনুল্লঙ্ঘনীয় স্থান সকল অতিক্রান্ত করিয়া, লতাপাতা ছিন্ন করিয়া, চরণে বিদলিত করিয়া

বায়ুবেগে ছুটিল। তীক্ষ্ণ উপলখণ্ড চরণে বিদ্ধ হইয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গে কণ্টক ফুটিতে লাগিল, তাহাতে সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। একেবারে গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই ডাকিল, "মহাদেব, উঠ, উঠ!"

মহাদেব ধড়মড় করিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে? কি হইয়াছে?"

"উঠ, উঠ, ভারি বিপদ। এক জন লোকের প্রাণ যায়। তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে।"

মহাদেব অন্ধকারে তাড়াতাড়ি চকমকি পাথর বাহির করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিল। তাহার পর গন্ধকের কাঠি জ্বালিয়া প্রদীপ জ্বালিল। প্রদীপালোকে তারার মুখ দেখিতে পাইয়া কহিল, "কি, ব্যাপারখানা কি? হয়েছে কি?"

"এখন বলিবার সময় নাই। এক জন লোকের প্রাণ যায়, এখন বিলম্ব করিলে তাহার প্রাণরক্ষা হইবে না। সঙ্গে মোটা মোটা দড়ী-কাছি যত পার লও। আরও জনকতক লোক ডাকিয়া আমার সঙ্গে এস। দেরী কোরো না।"

"কোথায় যাইতে হইবে?"

"আমি পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।"

মহাদেব প্রদীপহাতে লইয়া দড়াদড়ী সংগ্রহ করিল। তারা দেখিয়া কহিল, "ইহাতে কুলাইবে না।"

মহাদেব বলিল, "ঘরে ত আর নাই। যারা ক্ষেতে কাজ করে, তাহাদের কাছে মোটা মোটা বড় বড় কাছি আছে।"

"চল, তাদের বাড়ী যাই।"

বাড়ীতে যে দুই এক জন লোক ছিল, তাহাদিগকে ডাকিয়া লইয়া, তারা ত্বরান্বিত হইয়া, কৃষকদিগের গৃহে গেল। মহাদেব বেগে গমন করিতে অসমর্থ হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে পিছাইয়া পড়িল। তারা চীৎকার করিয়া কৃষক-পরিবারের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া, রজ্জু ও সাত আট জন লোক লইয়া, পর্ব্বতগহ্বরাভিমুখে ফিরিয়া চলিল।

কন্দরে পৌঁছিতে আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল, নক্ষত্র একে একে মিলাইয়া গেল, আকাশের নীলিমা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। শুক্রতারার নিম্নে দুটি একটি কিরণাঙ্গুলীশীর্ষ দেখা দিল। যে কন্দরে গোকুলজী পতিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কোথাও কোথাও বৃক্ষলতা, কোথাও কোথাও পা রাখিবার মত দুই একটা শিলাখণ্ড আছে। তাহাতে পতনশীল জীবের কিছুক্ষণ কালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা। গহ্বর অত্যন্ত গভীর, অতলস্পর্শ। ভিতরে এক খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে, উপরে পতনশব্দ শুনা যায় না। কন্দরাভ্যন্তরে কুজ্ঝটিকায় সমুদয় আচ্ছন্ন রহিয়াছে। পঞ্চ হস্ত নীচে আর কিছু দেখা যায় না। কুজ্ঝটিকা নিম্ন হইতে ক্রমশঃ উপরে ঘনাইয়া উঠিতেছে।

তারা মুখ বাড়াইয়া চাহিয়া দেখিল।

শুভ্রবর্ণ কুজ্ঝটিকা পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছে, আর কিছু দেখা যায় না।

পূর্ব্বাকাশে শুক্রতারা মলিন হইতেছিল।

তারা ডাকিল, "গোকুলজী, কোথায় আছ?"

পার্শ্বস্থ লোকেরা গোকুলজীর নাম শুনিয়া শিহরিয়া তারার নিকট হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইল।"

তারা আবার ডাকিল, অতি উচ্চকণ্ঠে ডাকিল।

কোন উত্তর নাই। হয় ত কুজ্ঝটিকা ভেদ করিয়া ক্ষীণ স্বর আসিতে পারিল না। হয় ত গোকুলজী আর জীবিত নাই।

তারা ফিরিয়া কহিল, "দড়ী মজবুত করিয়া বাঁধ। কে নীচে যাইবে?"

সকলে নিরুত্তর রহিল।

তারা মনে মনে হাসিল। তাহার সেই ফুলতোলা মনে হইল। প্রকাশ্যে কহিল, "শীঘ্র দড়ী বাঁধ। কোন চিন্তা নাই, আমিই নীচে যাইব।"

যোজনা করিয়া রজ্জু বিলক্ষণ দীর্ঘ হইয়াছিল। রজ্জু লইয়া তারা আপনার কটিদেশে দৃঢ়রূপে বাঁধিল। তাহার পর বলিল, "আর একগাছা রজ্জু প্রস্তুত কর। একগাছায় দুই জনের ভর সহিবে না। জীবিত হউক্, মৃত হউক্, আমি গোকুলজীকে তুলিয়া আনিব। না পারি, আমি আর উঠিব না। তোমরা দড়ী সামলাও। ভাল করিয়া ধর, আমি ঝাঁপ দিব।"

সকলে মিলিয়া রজ্জুর অপর প্রান্তে এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর জড়াইয়া প্রাণপণে টানিয়া রহিল। তারা আর একবার নীচে চাহিয়া লাফাইয়া পড়িল।

শিথিল রজ্জুতে অতি বেগে আকর্ষণ পড়িল। তারা পর্ব্বতকন্দরগর্ভে ঝুলিতেছে!

যদি রজ্জু ছিঁড়িয়া যায়!

যাহারা উপরে দড়ি ধরিয়াছিল, তাহারা প্রস্তরখণ্ডে ভাল করিয়া দড়ী বাঁধিয়া, দুই তিন জনের

হাতে সেই দড়ী দিয়া, গহ্বরের ধারে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন নীচে চাহিয়া দেখিল।

কুজ্ঝটিকা চক্রীভূত, কুণ্ডলীভূত হইয়া, গড়াইয়া গড়াইয়া, জড়াইয়া জড়াইয়া, পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছে!

নীচে হইতে দড়ী চারিদিকে স্থানান্তরিত হইতে লাগিল।

তারা গোকুলজীকে অন্বেষণ করিতেছিল।

রজ্জু শিথিল হইল।

কোন উপায়ে হয় ত বৃক্ষমূল ধরিয়া তারা উপরে উঠিতেছে। গোকুলজীকে খুঁজিতেছে।

সূর্য্য উঠিল।

গ্রাম হইতে লোক ছুটিয়া আসিতেছে। কৃষকপত্নীরা সকলকে সংবাদ দিয়াছিল।

গহ্বরপার্শ্বে বিস্তর লোক দাঁড়াইল। পালা করিয়া তিন চার জনে দড়ী ধরিয়া রহিল।

রজ্জু বড় শিথিল হইয়াছে।

বোধ হয়, তারা অনেক উপরে উঠিয়াছে।

সহসা অতি তীব্র চীৎকারধ্বনি উঠিল।

বহু দূরে নয়, অনেক নীচে নয়। যেন অল্প দূরে, বিংশ হস্ত নীচে সেই চীৎকার শ্রুত হইল।

তারা গোকুলজীকে দেখিতে পাইয়াছে? ভয় পাইয়াছে? তাহাকে সর্প দংশন করিয়াছে? মূর্চ্ছিত হইয়াছে?

সকলে ব্যগ্রচিত্তে দড়ীর দিকে চাহিয়া রহিল। দড়ী কোন সঙ্কেত করিল না। সুস্থির।

রৌদ্র বাড়িতে লাগিল। কুজ্ঝটিকাজাল তরল হইতে আরম্ভ হইল।

দড়ী সজোরে নড়িয়া উঠিল। মহাদেব সে সঙ্কেত বুঝিয়া আর একগাছা রজ্জু ফেলিয়া দিল।

রজ্জু স্পন্দনরহিত হইল।

অনেকক্ষণ পরে আবার দুই রজ্জু একত্রে স্পন্দিত হইল।

মহাদেব কহিল, "এইবারে সকলে মিলিয়া দড়ী ধর! দুই দড়ী ভাল করিয়া পাথরে বাঁধ। তাহার পর আস্তে আস্তে তোল। হুড়াহুড়ি করিও না। জোরে টানিও না। দুই দড়ী একসঙ্গে টান। ধীরে, ধীরে।"

কুজ্ঝটিকা ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেল।

তখন সকলে দেখিল, তারা নিম্নমুখী হইয়া সাবধানে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গোকুলজীর কটিরজ্জু ধারণ করিয়াছে। বামহস্তে বৃক্ষ, প্রস্তর ধরিয়া গোকুলজীর ও আপনার শরীর রক্ষা করিতেছে, যাহাতে অঙ্গে আঘাত না লাগে। গোকুলজীর মস্তক স্কন্ধে ঝুলিতেছে, দেখিতে মৃতপ্রায়। নীচে অত্যন্ত অন্ধকার।

উপর হইতে ধীরে ধীরে টানিতে লাগিল।

যদি রজ্জু ছিঁড়িয়া যায়! যাহারা দড়ী টানিতেছে, তাহাদের হস্ত হইতে যদি রজ্জু স্খলিত হয়! যদি কটিবন্ধন খুলিয়া যায়!

সে সব কিছু হইল না। গহ্বরের মুখের সমীপবর্ত্তী হইলে সকলে মিলিয়া গোকুলজী ও তারাকে টানিয়া তুলিল। দুই জনকে ধরিয়া বসাইল। দুই জনে পড়িয়া গেল। গোকুলজী নিমীলিতচক্ষু, শ্বাসপ্রশ্বাস অনুভব করা যায় না; সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত, পৃষ্ঠ দিয়া এখনও অল্প অল্প রক্ত বহিতেছে।

তারা একদৃষ্টে গোকুলজীর দিকে চাহিয়া ছিল। বাহিরে আসিয়াও অন্য দিকে চাহিল না। গোকুলজীর পার্শ্বে পতিত হইয়া তাহার বক্ষের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিল। কিছু পরে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইল।

গোকুলজীর হৃদয়ের উপর তারার দক্ষিণ হস্ত স্থাপিতই রহিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

মহাদেব জনকতক লোকের সাহায্যে দুই জনকে তদবস্থায় গৃহে লইয়া গেল। তারা মূর্চ্ছিতা, গোকুলজী জীবন্মৃত। গোকুলজীকে নিজের ঘরে শয়ন করাইল। তারাকে তাহার ঘরে পাঠাইয়া দিল।

লোকে সন্দেহ করিয়াছিল; তারাই কোন উপায়ে গোকুলজীকে পর্ব্বতগহ্বরস্বরূপ সাক্ষাৎ মৃত্যুগ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া থাকিবে। তারার অলৌকিক সাহস এবং পরের প্রাণরক্ষার জন্য এরূপ আত্মবিসর্জ্জন দেখিয়া তাহাদের সে সন্দেহ নিরাকৃত হইল। সে দৃশ্য তাহারা কখন ভুলিল না।

গোকুলজীর পৃষ্ঠক্ষত দিয়া রক্ত বহিয়া তাহাকে আরও বলশূন্য এবং জীবনশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল, মহাদেব ক্ষতমুখ বন্ধ করিয়া শোণিতস্রাব বন্ধ করিল। অল্পে অল্পে গোকুলজীর চৈতন্যোদয় হইল।

তারার মূর্চ্ছা দীর্ঘকাল ভঙ্গ হইল না। মানুষের শরীর, মন তার-বাঁধা যন্ত্রের মত। তারার শরীরে

মনে এত আকর্ষণ পড়িয়াছিল যে, অন্য কেহ হইলে জীবনরক্ষা ভার হইত। তারা অনেকক্ষণ মূর্চ্ছিত রহিল।

মূর্চ্ছাপগমে তারা চারিদিকে চাহিয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "গোকুলজী!"

নিকটে এক জন দাসী শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল, কহিল, "গোকুলজী বাঁচিয়া আছে! একটু ভাল আছে।"

তারা আবার মূর্চ্ছিত হইল।

অনেকক্ষণ পরে যখন তাহার উত্তমরূপ চৈতন্য হইল, তখন সে এত দুর্ব্বল যে, শয্যা হইতে উঠিতে পারে না। সেই অবস্থায় মহাদেবকে ডাকাইল। মহাদেব আসিলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গোকুলজী কেমন আছে?"

"অনেক ভাল।"

"বাঁচিবে ত?"

"বাঁচিবে বৈ কি। সে জন্য তুই কোন চিন্তা করিস্ না। এখন উঠে হেঁটে বেড়া।"

তারা কহিল, "বড় কাহিল বোধ হইতেছে। উঠিতে পারিতেছি না।"

"শরীরের আর অপরাধ কি? ধন্য সাহস তোর! আজ তুই দেবতার কাজ করিয়াছিস্। তা, খেলে দেলেই কাহিল সেরে যাবে এখন।"

তারা আর একবার কহিল, "না সারিলে যেন গোকুলজী না যায়।"

"পাগল না কি! এখন কি গোকুলজীর নড়িবার শক্তি আছে? কেউ যদি তাকে নিতে আসে, তখন আমি যেতে দিলে ত!"

যেই তারা একটু বল পাইল, অমনি উঠিয়া গিয়া গোকুলজীর শয্যার পাশে বসিল। গোকুল-জীর মুখ ম্লান, চক্ষু মুদ্রিত, অর্দ্ধচৈতন্যাবস্থায় শয়ান রহিয়াছে। সে তারাকে দেখিতে পাইল না, দেখিলেও চিনিতে পারিত না। সে এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ চেতনা প্রাপ্ত হয় নাই।

দিন দুই পরে তারা গোকুলজীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছে, এমন সময় অকস্মাৎ গৌরী সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া তারার রাগ হইল, কহিল, "এখানে কোন্ ভরসায় আসিয়াছিস্? তোর বুকে যে বড় বল দেখিতে পাই।"

গৌরী রাগিয়া কহিল, "আমি তোমার বাড়ী আসি নি, তোমার কাছেও আসি নি। যাহার কাছে আসিয়াছি, সে ঐ শুইয়া রহিয়াছে।"

তারা দেখিল, গোকুলজী নিদ্রিত। সে নতচক্ষে কিয়ৎকাল ভাবিয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া মনে মনে বলিল, "আমারই ভুল। পাপের প্রায়শ্চিত্তের সময় আসিয়াছে।" এই ভাবিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

গৌরী আসিয়া গোকুলজীর পাশে বসিল।

অল্পকাল পরেই তারা ফিরিয়া আসিয়া গৌরীকে বলিল, "একবার পাশের ঘরে এস। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

তারার কথায় কিছু রাগ নাই, তবু গৌরীর তত সাহস হইল না। কহিল, "কি বলিবে, এই-খানেই বল, আমি আর কোথাও যাইব না।"

তারা ঘরে আসিয়া, গোকুলজীর চরণের নিকট দাঁড়াইয়া, গৌরীকে নিকটে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল, "তুমি আমাকে বড় মন্দ মনে কর, না? যথার্থ কথা। আমার মত পাপীয়সী আর ইহজগতে নাই। সেই পাপের সাধ্যমত প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমার এই বাড়ী তোমাদের দিয়া পাহাড়ে চলিলাম। এই ঘরদোর তোমাদের রহিল।"

গৌরী আকাশ হইতে পড়িল। ভাবিল, তারা পাগল হইয়াছে। কহিল, "সে কি কথা! তোমার বাড়ী আমি নেব, সে আবার কেমন কথা! তোমার বাড়ী, তোমার ঘর, তুমি জন্ম জন্ম ভোগ কর, আমি কেন নিতে গেলাম? এমন অনাছিষ্টি কথাও মানুষে বলে!"

তারা আবার কহিল, "আমার কথা শোন। কোন উত্তর করিও না। গোকুলজী তোমাকে চায়, তুমি গোকুলজীকে চাও, আমি মাঝখানে কেন? আমার মন আমার বশে নয়। আমি এখানে থাকিলে তোমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অনেক ব্যাঘাত জন্মিবে। আমি এ পাপ মন বশ করিব। সংসারে আমার আর কোন বন্ধন নাই। আমি পর্ব্বতে চলিলাম। সেখানে কোন জ্বালা নাই। যাবার সময় তোমাদের এই বাড়ী আর আমার বিষয়সম্পত্তি দিয়া চলিলাম। দিয়াই আমার সুখ, আমার এটুকু সুখে বিঘ্ন ঘটাইও না। গোকুল-জীকে আমি বেশ জানি। তাহার কাছে মহা-দেবের কোন কষ্ট হইবে না। মহাদেবের নিজের টাকাও আছে। তুমি ভাল করিয়া গোকুলজীর শুশ্রূষা করিও। বিবাহের সময় একবার আমাকে মনে পড়িবে ত? আমি চলিলাম। এই ধর।"

এই বলিয়া তারা গৌরীর হাতে এক গোছা চাবি দিল।

গৌরীর মুখ কাঁদ-কাঁদ হইল। সে অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে কহিল, "তোমার বড় ভুল হইয়াছে, তারা! তুমি কি মনে করিতে কি মনে করিয়াছ। আমাদের বিবাহ কখনও হবার কথা নয়। সব কথা যদি বলিবার হইত—"

তারা আর দাঁড়াইল না।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

এত দিনে সব ফুরাইল, আশা-ভরসা সব ঘুচিল, সব সাধ মিটিল। প্রণয় গিয়াছে, আর গৃহসংসারে কাজ কি? যে পাখীর জন্য খাঁচা কিনিয়াছিলাম, সেই পাখী উড়িয়া গিয়াছে। এখন আর পিঞ্জর লইয়া কি হইবে? রূপ বল, যৌবন বল, অর্থ বল, এ সব লইয়াও মানুষ বাস করে বটে। শুধু কি প্রণয় লইয়াই লোকে ঘর করে? না, তা নয়। অল্পবয়সে অনাথিনী হইয়াও ত বিধবা বনে যায় না। সংসারে তার কোন সুখই নাই, তবু ত সে সংসারেই থাকে। তবে তারার প্রকৃতি তেমন ছিল না; তারার হৃদয়ে যে সময় যে আগুন জ্বলে, তাহাতেই আর সব পুড়িয়া যায়। যখন প্রণয়ের রাজত্ব, তখন আর সব দাহ হইতেছিল। প্রেম গেল ত আর কিছু পুড়িবার রহিল না। এখন কি পোড়াইবে? নিজে পুড়িবে?

পাপের গরল চিন্তাকে তারা আপনার হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল। এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। সংসারের সুখ ঐশ্বর্য্যে একেবারে জলাঞ্জলি দিল, ইহার কমে প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। পাহাড়ে থাকা তাহার অভ্যাস, সেইখানে গিয়া একা রহিল।

ঝঞ্ঝাবাত, প্রবল ঝটিকা দেখিলে ভয় হয়। মেঘ-গর্জ্জনে হৃৎকম্প হয়। বিদ্যুৎ চমকিলে প্রাণ চমকিয়া ওঠে, চক্ষু ঝলসিত হয়। সমুদ্রে তুফান অতি ঘোরদর্শন, উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা দেখিলে প্রাণ শুকাইয়া যায়। ঝটিকা গর্জ্জিতেছে, রুদ্ধ দ্বার বেগে আহত করিতেছে, গাছপালা ভাঙ্গিয়া, ফুল ছিঁড়িয়া ভীষণ কণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, কখন সিংহগর্জ্জনে ধরাতল কম্পিত করিতেছে। সে হুহুঙ্কার শুনিলে প্রাণী ভীত হয়।

আর এক প্রকার ঝটিকার দৌরাত্ম্য কেহ দেখিতে পায় না, কেহ শুনিতে পায় না। সে ঝড় কোন কথা কয় না, কোন সাড়া দেয় না, কোন শব্দ করে না। সে ঝড় অন্ধকার করিয়া নিঃশব্দপদসঞ্চারে আইসে। অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার! সেই—সেই ঘোরান্ধকারে সে একা ভ্রমণ করে। সে মূক, অন্ধ। বাহু প্রসারিত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে। যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই নিঃশব্দে চূর্ণিত-বিচূর্ণিত করে। আবার বক্রপদক্ষেপে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। অন্ধকারে মেঘ গর্জ্জন করে না, বিদ্যুৎপ্রভা স্ফুরিত হয় না। কেবল অন্ধকার বাড়িতে থাকে, আর সেই অন্ধকারে সেই ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা যাহা পায়, তাহাই ধরিয়া চাপিতে থাকে। সে ঝটিকার অবসানে চাহিয়া দেখ, আর কিছু দেখিতে পাইবে না। যেখানে সুন্দর হর্ম্ম্যশোভিত নগরী দেখিতেছিলে, সেখানে আর তাহার চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইবে না। যেখানে সহস্র জীবের আনন্দ-কোলাহল শুনিতেছিলে, সেখানে জীবনের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইবে না। যেখানে জনপদ, সেখানে মরু; যেখানে মনোহর অরণ্যানী, সেখানে বিশাল প্রান্তর; যেখানে কলরব, সেখানে শুদ্ধতা; যেখানে স্রোতস্বতী, সেখানে মরীচিকা দৃষ্ট হইবে।

এ ঝটিকা বড় ভয়ানক।

তারার হৃদয়ে এই ঝড় বহিয়াছিল।

দুঃখের মধ্যে এইটুকুই সুখ। যাহার মস্তকে বজ্রাঘাত হয়, তাহাকে আর কোন যাতনা ভোগ করিতে হয় না। সে কোন যন্ত্রণা অনুভব করে না। ঘোর আপৎকালে লোক স্তম্ভিত হয়। অত্যন্ত প্রিয়জনের মৃত্যুতে লোকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়। তাহাতেই অনেক রক্ষা। তারা নিজের উপর রাগ করিয়া আসিয়াছিল। কেন রাগ করিয়াছিল, তাহা ভাবিতে গিয়া কিছু ঠিক পায় না। মন শিথিল, শরীর শিথিল, বুদ্ধি স্খলিত হইতে লাগিল। তাহার প্রাণের মধ্যে অতি বিস্তীর্ণ মরুভূমি ধূ-ধূ করিতে লাগিল। পর্ব্বতে ফলাহারমাত্র প্রাণধারণের উপায়। সব দিন ফল আহরণেও যাইত না। শরীর দিন দিন অবসন্ন, হীনবল হইয়া পড়িল। তারা ভাবিল, মৃত্যু নিকট।

পাহাড়ে প্রভাতকালে পাখী ডাকিত, নির্ঝর কলকল রব করিয়া, চঞ্চল বেগে নীচে গড়াইয়া যাইত, প্রভাতপবনের স্পর্শে রজনীর মোহ-ভঙ্গ হইত, মেঘ সূর্য্যের কিরণ চুরি করিয়া, পর্ব্বত-শিখরের কণ্ঠে বসিয়া, তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে। পর্ব্বতগুহার মুখে লতাপাতায়

ফুল ফুটিয়া প্রভাত-সূর্য্যালোকে হাসিত। মধ্যাহ্ন-কালে পাতার আড়ালে বসিয়া বনবিহঙ্গিনী করুণ স্বরে গান করিত।

সূর্য্য আলো করিয়া উদিত হয়, রক্তমুখে অস্ত যায়। পূর্ণিমার চন্দ্র ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া অন্ধকারে লুকাইল, তাহাতে তারাগুলির মুখ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আবার পূর্ণিমা আসিল। পবিত্র কিরণে পর্ব্বত ধৌত করিয়া চন্দ্র উঠিল। তারা কুটীরের বাহিরে বসিয়া এক খণ্ড প্রস্তরে মস্তক রক্ষা করিয়া শূন্যমনে চাঁদের পানে চাহিয়া আছে। সে কি ভাবিতেছে? সে কি আপনার অদৃষ্টের কথা মনে করিতেছে? জীবনে কোথাও সুখ নাই, তাহাই ভাবিতেছে? না, তাহার সে ক্ষমতা নাই। দুঃখের ভাবনা ভাবা আরও দুঃখ। সেটি তারার ঘটে নাই। চাঁদ উঠিল, তাহার হৃদয় আলোকিত হইল না। সে চাহিয়াই রহিল। চাঁদ মাথার উপরে উঠিতেছে, আবার পশ্চিমে হেলিয়া পড়িল, মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে, কখন আকাশপ্রান্তে তারা খসিতেছে, কখন শুষ্কপত্রের পতনশব্দ, শৃগালরব, কখন পবনের মর্ম্মর সরসর নিশ্বাস, কখন ঝরণাপাতশব্দ, কখন নিশীথপ্রতিধ্বনি। তারা বসিয়া, শেষে শয়ন করিয়া চাহিয়া রহিল। কিছু দেখিল না, কিছু শুনিল না। শূন্যমনে, শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়াই রহিল। চন্দ্র পশ্চিমে গেল, বায়ু শীতল, তারার একবার একটু শীত বোধ হইল, আবার সে চাহিয়া রহিল। পরিশেষে তাহার চক্ষে নিদ্রা আসিল।

সূর্য্যকিরণস্পর্শে তারার নিদ্রাভঙ্গ হইল। শিশিরসিক্ত কেশে মলিন মুখখানি তুলিয়া তারা ভাবিল, উঠিয়া কুটীরমধ্যে যাই। প্রভাত-সূর্য্যের আলোক ভাল লাগিল বলিয়া আর উঠিল না। ম্লানমুখে, শিশিরমুক্তাশোভিত কেশে, প্রভাত-কালে যেন ম্লানকমলিনী তুল্য বসিয়া রহিল।

সহসা তারা দেখিল, সেই নির্জ্জন, মনুষ্যশূন্য স্থানে এক জন লোক আসিতেছে। দূর হইতে মুখ চেনা যায় না, তবু তারার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। দীর্ঘচরণবিক্ষেপে তারার কুটীরাভিমুখে কে চলিয়া আসিতেছে। আর কি চিনিতে বাকী থাকে?

যষ্টি হস্তে, যষ্টির উপর ভর করিয়া গোকুলজী পর্ব্বতারোহণ করিতেছে।

বাণবিদ্ধ বিহঙ্গিনী তুল্য তারা কাতর চীৎকার করিয়া কহিল, "এখানে, এখানেও আবার আসে কেন? যাহা ভুলিতে আসিয়াছি, আবার তাহাই মনে পড়িবে।"

গোকুলজী দ্রুত চলিয়া আসিতেছে, দেখিয়া তারা তাহাকে হস্ত দ্বারা ফিরিতে ইঙ্গিত করিল। গোকুলজী ফিরিল না। তখন তারা যে প্রস্তর-খণ্ডে মস্তক রক্ষা করিয়া নিশাযাপন করিয়াছিল, তাহাই দুই হস্তে জড়াইয়া প্রস্তরে মুখ লুকাইল।

গোকুলজী আসিয়া কহিল, "এ কি এ, তারা?"

তারা কহিল, "যাও, যাও, তুমি এখানে কেন? এখান হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও। আমি আর কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করি না। তুমি এখান হইতে যাও।"

শীর্ণ শুষ্ক লতাজাল যেমন সহজে কোন বৃক্ষ হইতে উন্মোচন করা যায়, গোকুলজী সেইরূপ তারার বাহুবন্ধন খুলিয়া তাহাকে আপনার বক্ষে ধারণ করিল। তারা মুমূর্ষুর মত কহিল "কি কর, আমাকে ছাড়িয়া দাও! তুমি যাও, যাও, এখানে কেন আসিয়াছ?"

গোকুলজী কহিল, "শোন, একটা কথা শোন।" তাহার পর সে তারার রুক্ষ কেশে শিশিরবিন্দু দেখিয়া কহিয়া উঠিল, "তুমি কি সমস্ত রাত্রি হিমে বসিয়া ছিলে? চল, আমার সঙ্গে বাড়ী চল।"

তারা গোকুলজীর আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া একটু দূরে গিয়া বসিল। কহিল, "গোকুলজী, তুমি আমার নিকট আসিও না। যাহা বলিবার হয়, ঐখান হইতেই বল। আমি আর ঘরে ফিরিব না। সে কথা আমায় বলিও না।"

গোকুলজী। আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব বলিয়া আসিলাম, আর তুমি যাইবে না?

তারা। না, আমি না যাই, তোমার তাতে ক্ষতি কি?

গোকুলজী কহিল, "আমার তাতে কি? তুমি না ফিরিলে আমার বাঁচিয়া কি সুখ? তোমাকে না পাইলে জীবনে সুখ কোথায়?"

"ও কি কথা! তুমি গৌরীর সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর কর। আমার কাছে ও সকল কথা কি তোমার বলা উচিত?"

"তারা, আজ তোমাকে অনেক কথা বলিতে হইবে, নহিলে তুমি বুঝিবে না। আর কাহাকেও সে সব কথা বলিবার নয়। কিন্তু তোমাকে বলিতেই হইবে। প্রণয় কি, তাহা আমি আগে

জানিতাম না। তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার প্রাণে নূতন আলোক আসিয়াছে। আমার প্রাণ তুমি একবার রক্ষা করিয়াছ। তোমাকে না পাইলে সে প্রাণে আমার কাজ কি?"

তারা মাথা নাড়িল।

গোকুলজী আবার বলিতে লাগিল, "তবে খুলিয়া না বলিলে বুঝিবে না। গৌরী আমার ভগিনী।"

তারা চমকিত হইয়া উঠিল। আগে অনেক কথা বুঝিতে পারিত না, এখন বুঝিল। আবার ভাবিল, ভ্রাতা ভগিনীর সম্বন্ধ লুকাইবে কেন?

"শুন তারা! কলঙ্কের কথা বলিয়াই আমি এ সম্বন্ধ গোপন করিয়াছি। গৌরী আমার সহোদরা ভগিনী নয়। আমার পিতা কিছু দিন আর এক স্থানে গিয়া একেলা বাস করিতেন। সেইখানে গৌরীর জন্ম হয়। গৌরীর মাতার সহিত আমার পিতার বিবাহ হয় নাই। পিতা এ কথা অনেক দিন পরে আমার জননীকে বলিয়াছিলেন। মেয়েটি বড় কষ্ট পাইতেছে শুনিয়া মাতা মৃত্যুকালে আমাকে সব কথা বলিয়া যান। গৌরীর মাতা জীবিত নাই। তাই আমি তাহাকে একটা আশ্রয় দিয়াছি। এখন বুঝিলে?"

তারা বুঝিল। কিন্তু ভাবিল, গোকুলজী আমায় যে ভালবাসে, সে কেবল কৃতজ্ঞতার ফল। আমি ইহার একটু উপকার করিয়াছিলাম, তাই সে আমায় বিবাহ করিতে চাহিতেছে। প্রকাশ্যে কহিল, "গৌরী যেন তোমার ভগিনী হইল। কিন্তু আমার সঙ্গে আর এ জগতের কোন সম্বন্ধ নাই। আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়াছি।"

"আমার সহিতও কি তোমার সম্বন্ধ নাই? নহিলে আপনার প্রাণ দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে কেন? সে ভয়ঙ্কর দিনে তুমি না থাকিলে কে আমায় রক্ষা করিত? যে পাপিষ্ঠ আমার জীবনবিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কে তাহার চেষ্টা বিফল করিল? তারা, আর তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না। তুমি আমার সঙ্গে না যাও, আমি তোমায় কখন পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। আমি এখনও দুর্ব্বল, সকলে আমাকে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছিল। আমি কাহারও কথা শুনি নাই। তুমি ত আমার মন জান না। যে দিন তোমাকে আমি প্রথম দেখিয়াছিলাম, সেই দিন হইতেই আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। লোকে তোমার অনেক কুৎসা করিত, সকলে তোমায় বড় মন্দ বলিত বলিয়া আমি তোমার নিকটে আসিতাম না; দূরে থাকিতাম। সেই জন্য যখন এই স্থলে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন তোমাকে মন্দ কথা বলিয়াছিলাম, তোমার কুটীরে অবস্থান করি নাই। তখন আমার হৃদয়ের ভিতর কি হইতেছিল, জান? আমার ভয় ছিল, পাছে তোমার কাছে অধিকক্ষণ থাকিলে তোমাকে না ছাড়িতে পারি, পাছে তুমি আমায় তাচ্ছীল্য কর, উপহাস কর। লোকমুখে তোমার আচরণ শুনিয়া কতবার তোমাকে একেবারে ভুলিবার চেষ্টা করিতাম, কখন পারিতাম না। শেষে যখন শুনিলাম, তুমি বিনা দোষে গৌরীর অপমান করিয়াছ, তখন ক্রোধে অন্ধ হইলাম। গৌরী নেহাত ভালমানুষ, কখনও কাহার সহিত কলহ করে না, সেই জন্য আরও রাগ হইল। ক্রোধোপশম না হইতেই তোমাকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় অপমানিত করিলাম। তাহার পর মনের মধ্যে কি হইতেছিল, তা কি তুমি জান, তারা? মনে মনে আপনাকে কত ধিক্কার দিয়াছিলাম, বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া তোমার মলিন মুখখানি স্মরণ করিয়া মরিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, তা কি তুমি জান? পরে অন্ধকার হইলে আমি তোমার বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, তোমার দেখা পাইলে তোমার পা ধরিয়া তোমার কাছে মার্জ্জনা চাহিব, তাহা হইলে আর তোমার রাগ থাকিবে না। বুকের ভিতর হু হু করিয়া জ্বলিতেছিল, তারা! তোমার দেখা না পাইয়া অস্থির হইয়া কোথায় চলিয়া গেলাম। শেষে দেখি, পাহাড়ে গিয়া পড়িয়াছি। ভাবিলাম, সেইখানে বেড়াইলে মনের জ্বালা একটু জুড়াইবে। এমন সময় বালকের রোদনশব্দ শুনিতে পাইয়া সে দিকে গেলাম। সন্দেহ হইল, কোন বালক পথহারা হইয়া একা কাঁদিতেছে। তাহার পর কি হইল, আমি জানি না। তুমি জান। বোধ হয়, ডাকাতে আর কাহারও সন্ধানে ফিরিতে ফিরিতে ভ্রমবশতঃ আমাকেই মারিয়াছিল। তুমি আমার প্রাণদাত্রী, তুমি আমায় রক্ষা করিলে। এখন আমি তোমায় ছাড়িয়া একেলা ফিরিয়া যাইব?"

গোকুলজী তারার চরণের নিকট শয়ন করিয়া করতলে মস্তক ন্যস্ত করিয়া সেই সব কথা বলিল।

তারার চক্ষের আলোক অন্ধকারে মিশাইল।

ধীরে ধীরে কহিল, "গোকুলজী তুমি আমাকে বিবাহ করিবার বাসনা পরিত্যাগ কর। তোমার আমার মধ্যে নরক মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। আমি ঘোর পাপিষ্ঠা। শোন তুমি, শুনিয়া আমার নিকট হইতে পলায়ন কর। তুমি বাঁচিতেছ, তস্করে তোমার প্রাণ হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া থাকিবে। শোন গোকুলজী, সে তস্কর আমি। স্বহস্তে আমি তোমার জীবনবিনাশে উদ্যত হই নাই, কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর পাতকে আর এক জনকে নিয়োগ করিয়াছিলাম। সে কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিলে তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিয়াছিলাম। গোকুলজী, শ্রবণপথ রোধ কর, আমার দিকে চাহিও না। এইবার এ অপবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর।"

গোকুলজী ধীরে ধীরে উঠিয়া, মৃদু মৃদু হাসিল। তাহার পর তারার দিকে চাহিয়া অতি মুক্তকণ্ঠে কহিল, "শোন তারা, সূর্য্য সাক্ষী, এই প্রকাণ্ড পর্ব্বত সাক্ষী, তুমি যেমন আছ, তেমনি আমি তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব। তুমি যেমন দোষাশ্রিত আছ, তেমনি থাক। আমি তোমা হইতে ভাল চাহি না। একবার ছাড়িয়া তুমি যদি শতবার আমায় হত্যা করিতে চাহিতে, তাহা হইলেও আমি তোমাকে প্রাণতুল্য ভালবাসিব। তুমি আমার প্রাণদাত্রী, তোমা ব্যতীত আমার জীবনে সুখ নাই। তোমার ঘরে তুমি যাইবে চল। এস, তুমি আমার হৃদয়কে আলোকিত করিবে, এস!"

সূর্য্যের মুখ বড় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

গোকুলজী তারাকে তুলিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাহার মুখচুম্বন করিল। তারা বাতকম্পিত পত্রবৎ থর থর কাঁপিতে লাগিল। তাহার মুখ গোকুলজীর বক্ষে ঢুলিয়া পড়িল। গোকুলজী সেই শীর্ণ, সুন্দর মুখ তুলিয়া আবার চুম্বিত করিয়া কহিল, "তুমি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছ। তোমার সে বল গেল কোথায়?"

তারা ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "তুমিই বা কি হইয়াছ?"

গোকুলজী বলিল, "আমি তবু তোমার চেয়ে ঢের সবল আছি। আর কিছু দিনে সারিয়া উঠিব। তখন তোমারও এ মূর্ত্তি থাকিবে না।"

তারা একটুখানি হাসিল।

গোকুলজী কহিল, "চল, তবে বাড়ী যাই।"

"চল।"

দুই জনে পরস্পরের মুখ দেখিতে দেখিতে প্রভাত-তপনালোকে পর্ব্বত হইতে নামিয়া চলিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ মহাদেব তারাকে দেখিতে না পাইয়া বড় ব্যাকুল হইয়া গৌরীকে জিজ্ঞাসা করাতে গৌরী তাহাকে সব বলিল, কেবল গোকুলজীর সহিত আপন সম্বন্ধ গোপন রাখিল। মহাদেব পুনরায় তারার সন্ধানে পর্ব্বতে যাইবে স্থির করিয়া গোকুলজীর নিকট বিদায় লইতে গেল। গোকুলজী তখন বড় দুর্ব্বল, কিন্তু মস্তিষ্কের কোন জড়তা নাই। মহাদেবের মুখে তারার পর্ব্বতপ্রস্থানসংবাদ অবগত হইয়া গোকুলজী গৌরীকে ডাকিয়া তাহার মুখে সব বৃত্তান্ত জানিল। তখন সে ক্ষীণ হস্ত দ্বারা মহাদেবের হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে বলিল, "মহাদেব, তুমি তারাকে আনিতে যাইও না। বোধ হয়, তোমার সঙ্গে সে আসিবে না। আমার একটা কথা রাখ। আমি তারাকে আনিতে যাইব। এক সপ্তাহের মধ্যে বেশ সবল হইয়া উঠিব। তারা আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। কেন? আমি তাহার দারুণ অপমান করিয়াছিলাম বলিয়া। এখন এ প্রাণ লইয়া আমি কি করিব? দেখ মহাদেব, যে সময় তারাকে অপমান করি, তখন আমার হৃদয়ে তারার মূর্ত্তি জাগিতেছিল। তুমি আমার কথা বুঝিতে পারিবে না। যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে কেমন করিয়া এমন অপমান করিলাম? শুন মহাদেব, ক্রোধের বেগে প্রণয় ভাসিয়া গিয়াছিল। তুমি আমার এই কথা রাখ। তারাকে আমি আনিতে যাইব। যে জীবন তারা রক্ষা করিয়াছে, সে জীবন তারার। তারাকে না পাইলে এ জীবনে কাজ নাই। আমি গিয়া নিজে তারাকে জিজ্ঞাসা করিব, এমন অপমানের পর সে আবার আমার মুখ দেখিতে পারে কি না? জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? সে অপমানের ত প্রতিশোধ হইয়াছে। আমি তারার মর্ম্মে আঘাত করিয়াছি, সে আপনার জীবন উপেক্ষা করিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছে। মহাদেব, আমি তারাকে আনিতে যাইব। তুমি যাইও না।"

মহাদেব গোকুলজীর কাতরতা দেখিয়া তাহার

কথায় সম্মত হইল। কিন্তু গোকুলজী সুস্থ সবল হইতে তিন সপ্তাহ লাগিল। তথনও সে তেমন সবল হয় নাই। গৌরী কোনমতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না। মহাদেব কহিল, "গোকুলজী, আর দুই চারি দিন পরে যাইও। এখন গিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে কি না সন্দেহ।"

গোকুলজী একটু হাসিয়া কহিল, "আমি যাইতে না পাইলে কখন সবল হইব না। তারাকে আনিতে আমার শরীরে দ্বিগুণ বল বাড়িবে।"

গোকুলজী পর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থিত হইলে মহাদেব ও গৌরী অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত তাহার পথ চাহিয়া রহিল। পরদিবস দ্বিপ্রহরসময়ে গোকুলজী ও তারা ফিরিয়া আসিল।

তারার মুখ দেখিয়া গৌরী বুঝিল, তারা সব জানিয়াছে। সে কিছু সঙ্কুচিত হইয়া তারার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তারা তাহাকে আলিঙ্গন করিল।

এত দিনের পর মহাদেবের আশা পূর্ণ হইল। সে সেই রাত্রে তাড়াতাড়ি উদ্যোগ করিয়া গোকুল-জীর সহিত তারার বিবাহ দিল।

বিবাহের কয়েক দিন পরে গৌরী তারাকে কহিল, "আমি ভীলপুরে যাইব।" তারা তাহাকে কোনমতে ছাড়িয়া দেয় না। গৌরী অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, বলিল, "যে আমাকে এত দিন আশ্রয় দিয়াছিল, তাহাকে একবার বলিয়া আসি। নহিলে মনে করিবে, আমি তোমার কাছে সুখে থাকিয়া তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছি।" তখন তারা তাহাকে বলিল, "আচ্ছা, তুমি যাও, কিন্তু শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতে হইবে। আসিবে বল?"

গৌরী শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে, প্রতিশ্রুত হইয়া ভীলপুরে গেল।

সুন্দর আর সুন্দরী, বাঞ্ছিতের সহিত বাঞ্ছিত মিলিল। জীবনের অস্থির মানদণ্ড এত দিনে স্থির হইল। কাল-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া আছি, পশ্চাতে কোলাহল, সম্মুখে কোলাহল, কিরূপে পার হইব, জানি না, কি করিব, জানি না, চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এমন সময় কে আসিয়া আমার হাত ধরিল। বহিঃপ্রকৃতির আকর্ষণ আর অন্তঃপ্রকৃতির আকর্ষণ। এ উহাকে টানিতেছে। কেহ জানে না, কে কাহাকে টানিতেছে, সহসা দুই জনের মিলন হইল। অমনি সব পূর্ণ হইল, শূন্য কলস অমৃতপূর্ণ হইল, অন্ধকার কক্ষ আলোকময় হইল, জীবনের বাসনাময় মহাশূন্য পূরিয়া গেল।

শম্ভুজী আর ফিরিল না, সেই অন্ধকারে নিশাশেষে নিরুদ্দেশ হইল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মনুষ্যের জীবনের সহিত স্রোতস্বিনীর সাদৃশ্য দর্শিত হইয়া থাকে। তটিনী যেমন নানা দেশ বহিয়া যায়, মানুষের জীবন তেমনি বহুবিধ অবস্থায় পতিত হয়। নদীর পথ যেমন বক্র, মনুষ্যের জীবনপথ তেমনি জটিল। পথে কোথাও মরু, কোথাও কুসুমিত কানন, কখনও পাষাণভেদ করিয়া অন্ধকারে বহিতেছে, কোথাও সূর্য্যকিরণে তরঙ্গ তুলিয়া হাসিতেছে. পরিণামে সেই বিশাল সাগরসঙ্গম, কাল-সমুদ্রের অতল গর্ভ। সেই জন্য জীবনকে তটিনী বলে।

কখন অন্তরূপ প্রবাহিণী দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও কোন নির্ঝর কত দূর অন্ধকারে বহিয়া যায়, সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায় না। অবশেষে প্রশান্ত নদীরূপে, সূর্য্যালোকে, শস্যশোভিত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। কিছু দূর এই-রূপে বহিয়া অকস্মাৎ অতি বেগে নিরবলম্ব পর্ব্বতপার্শ্ব দিয়া শত সহস্র হস্ত নীচে পতিত হয়। সে প্রশান্ত, আনন্দোদ্বেলিত মূর্ত্তি আর থাকে না, সে মধুর শান্তি ভয়ঙ্কর অশান্তিময় হইয়া উঠে।

তারার জীবনতটিনী এত দিনের পর শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। এইবার প্রপাত সম্মুখে।

গোকুলজীর সহিত বিবাহ হইলে তারার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। ভাবিল, এত দিনের পর বুঝি দুঃখের অবসান হইয়াছে। গৌরীকে আপনার গৃহে আনিয়া তারা তাহাকে সহোদরার মত যত্ন করিতে লাগিল।

এইরূপে কয়েক মাস গেল। কয়েক মাস পরে তারার সেই পূর্ণ সুখের মধ্যে একটা কিসের অপূর্ণতা প্রবেশ করিল। নির্ম্মল জ্যোৎস্নারাত্রে আকাশপ্রান্তে কোথায় যেন একটা মেঘ উঠিল। তারার সুখ হরণ করিবার জন্য অন্ধকার হইতে যেন একটা দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত হইল। কোন ছিদ্র পাইয়া নলের শরীরে কলি প্রবেশ করিল। তারার হৃদয়ে অজানিত দুঃখের অস্পষ্ট ছায়া পড়িল।

এক দিন রাত্রে তারা স্বামীর পার্শ্বে শয়িতা-বস্থায় স্বপ্ন দেখিল।

দেখিল, পর্ব্বতশৃঙ্গে সেই ভীষণাকৃতি পাষাণ-পুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। নক্ষত্রকিরণ দীর্ঘ জটায় প্রতিঘাত করিতেছে, শুভ্র, নির্নিমেষ চক্ষে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। কটি, চরণ বেষ্টিত করিয়া জলদমালা ফিরিতেছে। চরণপার্শ্বে ইন্দ্রধনু শোভিতেছে, ক্ষণে উঠিতেছে, ক্ষণে মিলাইতেছে। মহাপুরুষ উর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান ছিল, ধীরে ধীরে তারার দিকে মুখ ফিরাইল। নক্ষত্রকিরণ তুষার-চক্ষে প্রতিহত হইয়া তারার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। তারাকে দেখিয়া মহাপুরুষ বিশাল ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিল। কাদম্বিনীকুল সন্ত্রস্ত হইয়া, অন্ধকার পক্ষ বিস্তার করিয়া ঘুরিতে লাগিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিল। তৎপরে মহাকায় পুরুষ দূরমেঘগর্জ্জনবৎ গম্ভীর স্বরে তারাকে কহিল, "যখন লোকালয়ে তোর স্থান হয় নাই, তখন আমি তোকে আশ্রয় দিয়াছিলাম। যখন মানুষে তোকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন আমি তোকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিলাম। পাপীয়সি, মানুষী তুই, তুই সে উপকার বিস্মৃত হইয়াছিস্। আমি বলিয়াছিলাম, গোকুলজীকে দিয়া তোর অমঙ্গল হইবে, তুই গোকুলজীকে পরিত্যাগ কর্। তুই তাহা পারিলি না, আবার গোকুলজীকে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছিস্। আমার কথা মিথ্যা হইবে? দেখ্, আমি এই পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যে দিন আমি মিথ্যা বলিব, সে দিন এই পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইবে। এখন কি তুই সুখে আছিস্? তোর সুখ কোথায়?"

তারা চক্ষু মুদ্রিত করিল। গম্ভীর বাণী নীরব হইল। তারার হৃদয়ে বার বার প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল, 'সুখ কোথায়?'

আবার দূরে মেঘ গর্জ্জিল। তারার শ্রবণে শব্দ পশিল, 'চাহিয়া দেখ!'

তারা চাহিয়া দেখিল। পাষাণপুরুষের চরণ-তলে সপ্ত পাষাণকন্যা ক্রীড়া করিতেছে, শুভ্র মেঘ-মালা তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কেহ হাসিতেছে, কেহ গান করিতেছে, কেহ রুক্ষকেশ দোলাইতেছে,—শুভ্র মেঘে যেন কৃষ্ণ সৌদামিনী খেলিতেছে। কাহারও মস্তকে ইন্দ্রধনু মুকুটের মত শোভিতেছে। কেহ প্রস্তরখণ্ড নীচে নিক্ষেপ করিয়া তাহার পশ্চাৎ চাহিয়া দেখিতেছে। এক জন তারাকে দেখিতে পাইয়া অপর সকলকে ইঙ্গিত করিল। সকলে মিলিয়া তুষারশুভ্র অঙ্গুলী দিয়া তারাকে ডাকিতে লাগিল। তাহার পর সর্ব্বকনিষ্ঠা দূরবংশীধ্বনিসম স্বরে তারাকে কহিল, "আমরা সাত ভগিনী, পিতা বলিয়াছেন, আমা-দের আর এক ভগিনী আসিবে। তুমি সেই ভগিনী। মানুষের ঘরে জন্মিলে কি হয়? আমরা তোমাকে ছাড়িব না, তুমি আমাদের ছাড়িতে পারিবে না। একবার আমরা মনে করিয়াছি-লাম, তুমি বুঝি যথার্থই মানবী, সেই জন্য তোমাকে ভয় দেখাইয়াছিলাম। সে কথা তুমি ভুলিয়া যাও। তুমি যখন পর্ব্বতে একাকিনী বাস করিতে, তখন আমরা তোমায় রক্ষা করিতাম। তুমি আমাদের ভগিনী, আমাদের নিকটে এস। এখানে সুখদুঃখ নাই, শীত-গ্রীষ্ম নাই, প্রণয়-পাপ নাই। এস, আমাদের সঙ্গিনী হইবে।"

তারা আবার চক্ষু মুদিল। বায়ুভরে মধুর কণ্ঠধ্বনি আন্দোলিত হইয়া ধীরে ধীরে মিশাইয়া গেল। পূর্ব্বে তারা এই সপ্তকন্যাকে দেখিয়া ভীত হইয়াছিল। এখন তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। সুমধুর কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে লাগিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে সমীরণতরঙ্গে আবার অমৃতময় শব্দ ভাসিয়া আসিল, 'দেখ! দেখ!'

চক্ষু মেলিয়া তারা দেখিল, সপ্তসুন্দরী পাষাণ-পুরুষকে ঘিরিয়া হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়াছে। হাত ধরাধরি করিয়া তাহারা ঘুরিতে লাগিল, সেই সঙ্গে মেঘ ও ইন্দ্রধনু ঘুরিতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা পর্ব্বতশৃঙ্গ ছাড়াইয়া শূন্যে উঠিতে লাগিল। পাষাণপুরুষও সেই সময়ে ধীরে ধীরে উর্দ্ধে উত্থিত হইল। তুষারচক্ষু রমণীগণ হাসিতে হাসিতে তারাকে ডাকিতে লাগিল, "আয়! আয়!" ক্রমে তাহারা মেঘ ছাড়াইয়া, নীলাকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, আর দূরকণ্ঠে আকাশ পূরিয়া ডাকিতে লাগিল, "আয়! আয়!" অপ্সরাকণ্ঠ, বেণুস্বরনিন্দিত কণ্ঠধ্বনির সহিত মধ্যে মধ্যে জলদগম্ভীর স্বরে শব্দ হইতে লাগিল, "আয়! আয়!" ক্রমে শব্দমাত্র রহিল, পাষাণ-পুরুষ ও পাষাণকন্যাগণ নক্ষত্রালোকে অন্তর্হিত হইল।

তারা কণ্টকিত-গাত্রে অস্ফুট চীৎকার করিয়া জাগরিত হইল। গোকুলজী সজাগ ছিল, অস্ফুট চীৎকার শুনিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তারা, ভয় পাইয়াছ?"

প্রথমবার জিজ্ঞাসা করাতে তারা শুনিতে পাইল না, দ্বিতীয়বারে উত্তর করিল, "না, ভয় পাই নাই। একটা দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলাম।"

গোকুলজী জিজ্ঞাসা করিল, "কি স্বপ্ন দেখিতেছিলে ?"

তারা বলিল, "আমি তাহা বলিব না। তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করিও না।"

গোকুলজী মনে করিল, তারা স্বপ্নে পিতাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া থাকিবে, এই জন্য কিছু বলিতেছে না। এই ভাবিয়া আর জিজ্ঞাসা করিল না।

সে স্বপ্ন তারা আর ভুলিতে পারিল না। জাগ্রতে শব্দ শুনিতে লাগিল, "আয়! আয়!" এক দিন তারা গোকুলজীকে কহিল, "চল, একবার পাহাড়ে যাই।"

গোকুলজী হাসিয়া কহিল, "তুমি যে পাহাড়ের মায়া ছাড়িতে পার না, দেখিতে পাই। পর্ব্বতবাসের সাধ কি এখনো মেটে নাই ?"

তারা বলিল, "না, সে জন্য নয়। যেখানে এত দিন ছিলাম, সেখানে আর একবার যাইতে ইচ্ছা করে। আমার সে কুটীর তোমার দেখিতে ইচ্ছা হয় না কি ?"

গোকুলজী নিরুত্তর হইল। তারা স্বামীকে কহিল, "আমরা দুই জনে যাইব, আর কাহাকেও সঙ্গে লইব না।" গোকুলজী স্বীকৃত হইল।

পর্ব্বতে উঠিবার সময় গোকুলজী বলিল, "মনে পড়ে ? এই স্থানে তোমায় দেখিয়াছিলাম ?"

তারা স্বামীর মুখে প্রেমপূর্ণ চক্ষু স্থাপিত করিয়া কহিল, "মনে নাই ? সেই তোমার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।"

গোকুলজী হাসিতে লাগিল। কহিল, "তখন ত ঘর স্ত্রী ছিল না যে, আমার জন্য ভাবিবে। এখন ভাবিবার লোক হইয়াছে। কিন্তু তখন ভাবিবার আর এক জন ছিল, সে আর এখন নাই।"

এই কথা বলিতে বলিতে গোকুলজী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। তারা গোকুলজীর বিষাদের কারণ বুঝিতে পারিয়া আর কোন কথা কহিল না। দুই জনে নিঃশব্দে পাশাপাশি চলিতে লাগিল।

তাহার কুটীরে পৌঁছিতে বেলা প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহে ফিরিয়া আসিবার কথা।

কুটীরে প্রবেশ করিয়া গোকুলজী কহিল, "তারা, তুমি বিনা সাহায্যে এ গৃহ কিরূপে নির্ম্মাণ করিলে ?"

তারা হাসিয়া কহিল, "তখন দাঁড়াইবার একটা স্থান ছিল না, গৃহ নির্ম্মাণ না করিলে থাকি কোথা ? আকাশের পাখী বাসা বাঁধিতে পারে, আর মানুষ একা একটা ঘর নির্ম্মাণ করিতে পারে না ?"

কিছু কাল বিশ্রামের পর তারা আবার কহিল, "আমার এই গৃহে আজ তোমার নিমন্ত্রণ। এক দিন তুমি এখানে আহার কর নাই। আজ খাইতে হইবে। আমি ফল আহরণ করিব।"

গোকুলজী তারার হাত ধরিয়া কহিল, "সে সময়ের অপরাধ কি এখনো ভুলিতে পার নাই ?"

তারা। তুমি আমার সর্ব্বস্ব। পূর্ব্বকথা তুলিয়া তুমি আপনাকে অপরাধী মনে করিও না। তোমাকে পাইয়াই আমার সুখ। আমার নিকটে তুমি অপরাধী ?

এইরূপে দুই জনে অনেক কথা হইল। সেই শব্দহীন স্থানে প্রেমের মৃদু মৃদু কথা হইতে লাগিল। সে স্থানে কাহারও চীৎকার করিতে ইচ্ছা হয় না, উচ্চ স্বরে কথা কহিতে সাহস হয় না। দম্পতি-যুগল মৃদু গম্ভীর স্বরে পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত করিল।

কতক্ষণ পরে তারা উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "তুমি একটু ব'স, আমি ফল আহরণ করিয়া লইয়া আসি।"

গোকুলজী উঠিয়া, তারাকে বক্ষে ধরিয়া কহিল, "তোমাকে একেলা যাইতে দিব না। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

তারা কহিল, "না, তাহা হইবে না। তুমি এইখানে আমার অপেক্ষা কর। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। আমার এ অনুরোধ রাখিতে হইবে। তুমি আমার সঙ্গে আসিও না।"

গোকুলজী অনেক পীড়াপীড়ি করিল, তারা কিছুতে শুনিল না। অগত্যা গোকুলজী কুটীরে রহিল, তারা ফল আহরণে বাহিরে গেল।

তারা বাহিরে আসিয়া দেখিল, আকাশে দুইখানি কালো মেঘ রহিয়াছে, তাহাতে দুর্য্যোগের কোন আশঙ্কা নাই; বিশেষ তখন শীতকাল, সে সময়ে ঝড়বৃষ্টি প্রায় হয় না। তারা নির্ভয়ে চলিতে লাগিল। যে দিকে ফলমূল পাওয়া যায়, সেই দিকে চলিল।

অকস্মাৎ এক খণ্ড কৃষ্ণমেঘ সূর্য্য আবৃত করিল। তারা রোমাঞ্চিতকলেবরে শব্দ শুনিল, 'আয়, আয়!' ফিরিয়া দেখিল, অতিদূরে শিখরিশৃঙ্গে কৃষ্ণকায় প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তারা

কাঁপিতে লাগিল। তাহার শ্রবণে গম্ভীর, গম্ভীরতর শব্দ পশিতে লাগিল, 'আয়! আয়!' পরিশেষে সহস্র মেঘগর্জ্জন তুল্য ধ্বনি গর্জ্জিতে লাগিল, 'আয় আয়!' তারার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি হইল। যে দিকে পাষাণদেবতার মূর্ত্তি দেখিল, সেই দিকে অস্থির গতিতে অগ্রসর হইল। সে পথ অত্যন্ত দুর্গম এবং পিচ্ছিল।

তারার পশ্চাতে ঝটিকা গর্জ্জিতেছিল। সে গর্জ্জন সে শুনিতে পাইল না। কম্পান্বিত-কলেবরে মহাকায় পুরুষের অভিমুখে চলিল। শিলাচূর্ণ সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল, তবু সে ফিরিল না। কিছু দূর গিয়া সহসা তাহার পদস্খলন হইল। ঝটিকার তীব্রকণ্ঠের সহিত অতি বিকট চীৎকার মিশাইয়া গেল।

গোকুলজী, তারার বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাহার অন্বেষণে বাহির হইল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, আকাশে মেঘ উঠিয়েছে। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার করিয়া ঝটিকা বহিল। গোকুলজী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া দ্রুতপদে ইতস্ততঃ তারার অন্বেষণ করিতে লাগিল এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, "তারা! তারা!" অনেক দূর দ্রুতগমনে গিয়া, গোকুলজী অতি বিকট চীৎকার শুনিতে পাইল। অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠে পতিত হইল।

যে মৃত্যুমুখ হইতে তারা গোকুলজীকে রক্ষা করিয়াছিল, স্বয়ং সেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল! গোকুলজী মৃতের মত পতিত রহিল।

উভয়ের বধির শ্রবণে ঝটিকা গর্জ্জিতে লাগিল।

সম্পূর্ণ

নব নগর

—*—

বাজ সুনইছিঅ চাঁদক চোরি

—বিদ্যাপতি

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

চন্দ্রচূড়	...	...	নবখণ্ডের রাজা
শিবনাথ	...	...	মন্ত্রী
বিশ্বম্ভর	...	...	কোটাল
উমাচরণ		...	সভাপণ্ডিত
ব্রজলাল	...	...	বিদূষক
করালী	...	...	কোষাধ্যক্ষ
আত্মারাম	...	...	কৃপণ ধনী নাগরিক

অমাত্য, সভাসদ, বালকের দল, মাতালের দল, কোটালের অনুচরগণ, প্রহরিগণ, নাগরিকগণ, গুরুমহাশয়, প্রতিহারী।

রমণী

চিত্রলেখা	...	...	রাণী
সুশোভিনী	...	...	মন্ত্রীর পত্নী
জগদম্বা	...	...	কোটালের পত্নী
শুচিস্মিতা	...	...	সভাপণ্ডিতের পত্নী
প্রিয়ংবদা	...	...	বিদূষকের পত্নী
চন্দ্রাবতী	...	...	আত্মারামের পত্নী

কিশোরীর দল, যুবতীর দল, রমণীগণ, প্রতিবাসিনী, পরিচারিণী, দাসী।

নব নগর

প্রস্তাবনা

(গান)

শুনে থাকবে দুনিয়ায়
আছে অনেক রাজ্য রাজওয়াড়া,
তারি মধ্যে এই একটা
কতক মতক বেয়াড়া।
হেথায় কিছু নেইক ঢাকাঢাকি,
একেবারে সব ফাঁকাফাঁকি,
যে দিকেতে চেয়ে দেখ,
'শম্ভুক' জাতের পাড়া।
রাত পোহালে ফর্সা হোলে,
ছেলেরা ব'সে পড়া ভোলে,
ডাকাডাকি কর যদি কেউ দেবে না সাড়া
চলেছে যে যার ঘাড় গুঁজে,
আঁদাড়-পাঁদাড় খুঁজে খুঁজে,
জিগ্‌গেস্ করলে থমকে দাঁড়ায়
একেবারে খাড়া।
মাগী-মদ্দ সবাই সমান,
ঢেকশেলে কেউ ভানে না ধান,
মিন্সে করে বড়র বড়র
মাগী দেয় সে নথনাড়া।

প্রথম অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

সম্মুখে পাঠশালা।

প্রাতঃকাল।

(এক দল বালকের প্রবেশ)

(গান)

চলেছি সব ছেলের দল পাঠশালে,
সন্ধ্যেবেলা বাছুর যেমন ফেরে গোয়ালে।
মোরা হাম্বা রবে ডাকি না,
হুঙ্কার দিলে করে মানা,
গুটগুটিয়ে চলেছি তাই বাবলা গাছের আড়ালে।
কোঁচোড়ে আছে ভাজা মুড়ি,
তপ্ত কাঁঠাল-বিচী দু'খুড়,
তাই দুটো মুখে দিয়ে যাত্রা করি সকালে।
পথে কোথাও কালো জাম,
কোথাও আহা কাঁচ আম,
পেড়ে আনি তাড়াতাড়ি উঠে মগডালে!

প্রথম বালক। ওরে, চুপ কর্, পাঠশালা এল।

দ্বিতীয়। চুপ, চুপ, সব চুপ।

তৃতীয়। এখানে যে কেউ কোথাও নেই। গুরুমশাই কোথায়?

(আর এক দিক্ হইতে অন্য এক বালকের প্রবেশ)

নূতন বালক। আজ গুরুমশাই আস্‌বেন না।

প্রথম। কেন?

নূতন বালক। তাঁর দাড়ী কামাতে গোঁফ কেটে গিয়েছে।

চতুর্থ। দাড়ী কামাতে গোঁফ কাট্‌ল?

নূতন। ও সে একই কথা। উপরে আর নীচে!

পঞ্চম। হুর্‌রে। চল্ তবে আমরা গুলীডাণ্ডা খেলি গে।

প্রথম। দূর হাঁদা! সে ত রোজই আছে। আয়, আমরা এইখানে গুরুমশাই-গুরুমশাই খেলি।

সকলে। (হাততালি দিয়া) ও একটা নতুন খেলা, খুব মজা হবে।

প্রথম। আমি যেন গুরুমশাই।

পঞ্চম। বাঃ, তুই কেন? আমি গুরুমশাই হব।

তৃতীয়। আচ্ছা, তবে আঙ্গুল মট্‌কা।

নূতন। এ কি চোর চোর খেলা যে, আঙ্গুল মট্‌কান হবে? গুরুমশাই কি চোর?

প্রথম। তবে আমি গুরুমশাই।

সকলে। আচ্ছা, তাই সই।

(প্রথম বালকের বেত্রহস্তে গম্ভীরমুখে গুরুমহাশয়ের আসনে উপবেশন)

গুরুমহাশয়। এই, কানাই! (দ্বিতীয় বালক)।

কানাই। আজ্ঞে!

গুরুমহাশয়। আমার চা কই?

কানাই। চা? আপনি ত সকালবেলা আদা-ছোলা খান।

গুরুমহাশয়। সে কাল এখন আর নেই। শীগ্‌গির চা নিয়ে আয়!

কানাই। আজ্ঞে, মোড়ের চায়ের দোকান খুলেচে, এক্ষুনি নিয়ে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

গুরুমহাশয়। মেধো! (তৃতীয় বালক)।

মেধো। আজ্ঞে!

গুরুমহাশয়। ওরে আমাকে সিগারেট দে!

মেধো। আগে ত আমায় বলেন নি। হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক সেজে দি?

গুরুমহাশয়। ও সব এখন উঠে গেছে। কাঁচি মার্কা সিগারেট নিয়ে আয়।

মেধো। এই যে পানের দোকান থেকে নিয়ে আসি।

(বহির্গমন)

(চা এবং সিগারেট লইয়া কানাই এবং মেধোর প্রবেশ)

গুরুমহাশয়। (চা পান করিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে) হরিচরণ, পড়া হয়েছে?

হরিচরণ (চতুর্থ বালক)। হয়েছে, গুরুমশাই।

গুরুমহাশয়। নামতা?

হরিচরণ। হ্যাঁ, মশাই।

গুরুমহাশয়। পাঁচ সাত্তে কত বল্ দেখি?

হরিচরণ। সাঁইত্রিশ।

গুরুমহাশয়। অ্যাঁ!

গোবরা (পঞ্চম বালক)। (গুরুমহাশয়ের চক্ষের কাছে অঙ্গুলী দিয়া) গুরুমশাই, আমি বলব?

গুরুমহাশয়। দেখি, তুই কেমন পারিস?

গোবরা। উনচল্লিশ।

গুরুমহাশয়। ঠিক (বেত তুলিয়া) এস ত বাপু হরিচরণ, হাত পাত ত!

হরিচরণ। (দুই হাত কচলাইতে কচলাইতে) হেঁই, গুরুমশাই, এবারটা মাপ করুন্, এই কান ধর্‌ছি। (তথাকরণ)।

গুরুমহাশয়। আচ্ছা, এবার মাপ কর্‌লুম। কাল দুটো কই মাছ আনিস্।

হরিচরণ। (এক গাল হাসিয়া) দুটো কেন, গুরুমশাই, চারটে আন্‌ব।

গুরুমহাশয়। জ—রে নয়, শুধু মাথা সার।

হরিচরণ। না, না, দিশী—দিশী!

গুরুমহাশয়। বাঞ্ছারাম! (নূতন বালক)।

বাঞ্ছারাম। আজ্ঞে!

গুরুমহাশয়। তোর ভূগোলের পড়া হয়েছে?

বাঞ্ছারাম। হ্যাঁ, মশাই, হয়েছে। কাল রাত্তিরে সব পড়া করেছি।

গুরুমহাশয়। বল্ ত লণ্ডন্ কোথায়?

বাঞ্ছারাম। লণ্ডন্? (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) সে মশাই অনে—ক দূর।

গুরুমহাশয়। কোন্ দেশের রাজধানী?

বাঞ্ছারাম। কোন দেশের রাজধানী? (ঢোক গিলিয়া) কোন্ দেশের রাজধানী? কোন্ দেশের রাজধানী? আমেরিকার গুরুমশাই, আমেরিকার।

গুরুমহাশয়। এর নাম তোর পড়া হয়েছে?

বাঞ্ছারাম। না মশাই। ওটা ভুল। জর্ম্মনীর, সত্যি জর্ম্মনীর।

গুরুমহাশয়। বাপের টাকা আছে কি না, আর পড়া শোনায় দরকার কি? এস ত আমার আলালের ঘরের দুলাল, একবার দাঁড়াও দেখি সেজে নাড়ুগোপাল! বাঃ খুব বলেচি! কথায় কথায় মিল! দুলাল আর গোপাল মিলে গেল। একেবারে পদ্য!

বাঞ্ছারাম। গুরুমশাই, আমাদের আবাদ থেকে অনেক জিনিষ এসেচে। কাল একটা মস্ত লাউ নিয়ে আস্‌ব।

গুরুমহাশয়। আজ তুই রেহাই পেলি, কিন্তু খবরদার, কাল থেকে যেন পড়া ভুল না হয়। আর লাউয়ের সঙ্গে যদি একটা কুমড়া থাকে—বুঝলি?

বাঞ্ছারাম। মশাই, তা আর বুঝি নি? ঠিক আন্‌ব।

গোবরা। গুরুমশাই, একবার বাইরে যাব?

গুরুমহাশয়। কেন?

গোবরা। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

গুরুমহাশয়। সকাল বেলা তেষ্টা?

গোবরা। হ্যাঁ মশাই, সত্যি। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

গুরুমহাশয়। আচ্ছা, দেরী করিস্‌নে। যাবি আর আস্‌বি।

গোবরা। (বাহিরে গিয়া তখনি দৌড়িয়া ফিরিয়া আসিল) ওরে, এবার সত্যি গুরুমশাই! বাঁশবাগান পেরিয়েছে, এল ব'লে!

(বালকেরা তৎক্ষণাৎ আপন আপন স্থানে বসিয়া বই খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল)

(গুরুমহাশয়ের প্রবেশ)

গুরুমহাশয়। আজ আমার বিলম্ব হ'ল। অবিশ্যি তার কারণ আছে, বিনা কারণে কিছু হয় না। কার্য্যকারণে নিত্য সম্বন্ধ। এই যে শান্ত শিষ্ট সভ্য শিশুপাল, অধ্যয়নে নিবিষ্টচিত্ত! বলি, তোমা-দের এতক্ষণ কি হচ্ছিল?

রামলাল (প্রথম বালক)। এই ত ব'সে আমরা পড়ছি মশাই। ভাবছিলুম, আপনার কোন অসুখ-বিসুখ হয় নি ত!

গুরুমহাশয়। বিষ্ণু, বিষ্ণু! তা না, তা না। তবে হ'তে কতক্ষণ? শরীরং ব্যাধিমন্দিরং। আমার পুত্রবধূ কি না বউমা সমস্ত রাত্রি প্রসববেদনার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন, আজ মাহেন্দ্রক্ষণে একটি পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে? সেই কারণে বিলম্ব। এখনও চিত্ত কিছু প্রক্ষিপ্ত কি না বিক্ষিপ্ত, কিছু চঞ্চল। আজ এই শুভ অশৌচ, তাতে মনটা কিঞ্চিৎ দোলায়-মান। আজ তোমাদের ছুটী!

বালকের দল। (লাফাইয়া উঠিয়া) গুরুমশাই, আটকৌড়ের দিন আমরা কুলো পিটোতে যাব। আটকৌড়ে বাটকৌড়ে, ছেলে আছে ঘরে!

গুরুমহাশয়। স্থির হও, স্থির হও! বড় আনন্দের কথা, কিন্তু আমার ঘরে পয়সা-কড়ি, খই-মুড়কি কিছুই নেই।

বালকের দল। তার জন্য ভাবনা নেই, সে সব হয়ে যাবে অখন। আমরা নিয়ে যাব।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান—প্রাতঃকাল।

(ফুল হস্তে এক দল কিশোরীর প্রবেশ)

(গান)

ভোরের বেলাই উঠে মোরা ফুল তুলি,
ফুল তুলি, ফুল তুলি, ফুল তুলি!
ডাকে কোয়েল, ডাকে দোয়েল, ডাকে বুলবুলি,
বুলবুলি, বুলবুলি, বুলবুলি,
কত ফুল থরে থরে,
গন্ধে আকাশ ভার ভরে,
ফুলের ফাঁকে ফেরে আঙুল চুলবুলি,
চুলবুলি, চুলবুলি, চুলবুলি!
পুবে রবি চোখ ঠারে,
বনে বনে উঁকি মারে,
হেসে দেখে খোলা আছে প্রাণের ঘুলঘুলি,
ঘুলঘুলি, ঘুলঘুলি, ঘুলঘুলি!

প্রথম কিশোরী (সৌদামিনী)। রোজ রোজ আর ভাল লাগে না। ভোরের বেলাই যেই ঘুমটি আসে, অমনি সাত তাড়াতাড়ি উঠে কাপড় কেচে ফুল তোল রে, স্নান্ কর রে, ত্যান্ কর রে, জ্বালা-তন ধ'রে যায়। নয় কি কাদি?

কাদম্বিনী। ও কথা আর বলিস্ নে, সদি। ফুল যে এমন জিনিষ, তাতেই অরুচি হয়ে গেছে। ওই যে কোথাকার কোন্ সম্পর্কে তেকেলে এক ঠান্‌দি আছেন, তাঁর ত সারা রাত ঘুম নেই, কেবল খক্ খক্ কোরে কাসে আর রাত চারটে না বাজ্‌তেই কাউকে আর শুয়ে থাক্‌তে দেবে না। ওরে, গঙ্গা নাইতে যাবি? আর যারা গঙ্গা নাইতে যাবে না, তাদেরি কি রক্ষে আছে না কি? হ্যাঁ লা, রাত পুইয়েচে, ফর্সা হলো, এখনও তোদের ঘুম ভাঙ্গে না? পুকুরপাড়ে যাবি নে? যা যা, শীগ্‌গির ফুল তুলে নিয়ে আয়, নইলে কৈবর্ত্ত পাড়ার মেয়েগুলো সব ফুল চুরী কোরে নিয়ে যাবে। মা, মা, রোজ রোজ এই রকম শুনে শুনে হাড় কালি হ'ল। বিজি, তুই পথে আস্‌তে আমায় কি বলছিলি?

ব্রজেশ্বরী। ও ভাই, আমাদের সকলেরই সমান, এ বলে আমাকে দেখ্, ও বলে আমাকে দেখ। কোন ঘরে ঠান্‌দি, কোন ঘরে বিধবা পিসী, কোথাও বা চোদ্দ পুরুষের কার মাসী। আমাদের সঙ্গে বাদ সাধাই ওঁদের প্রধান কাজ।

কথায় কথায় ঐ এক খোঁটা—আমরা ছুঁড়ী, আমরা বাচাল, আমরা ভাবুনে, আমাদের কিছু ভাল নয়। ওঁরা ত কেউ কখনো আমাদের বয়সী ছিলেন না, মা'র পেট থেকে যেমন ফোক্‌লা পড়েছিলেন, চিরকাল তেম্‌নি আছেন, দাঁত আর ওঠে নি, না দুধে দাঁত, না অন্য দাঁত। এক এক সময় এমনি মনে হয় যে, যদি আমাদের এ বয়স না হ'ত, একেবারে সব বয়স ডিঙিয়ে বুড়ী থুড়্‌থুড়ী হতাম, তা হ'লে আর কোন বালাই থাক্‌ত না, দিনরাত্রি এ খোঁটা-গঞ্জনা শুন্‌তে হ'ত না।

চঞ্চলা (চতুর্থ)। তাই বা কেন? ওরা ব'কে মরুক গে, তা ব'লে কি যে বয়সের যা, তা হবে না? আমাদের এ বয়স আর মন আমরাও আনি নি, আর হিংসুটে বুড়ীগুলোও এনে দেয় নি! ওদের কথায় আমরা সব ছেড়ে দেব? তার চেয়ে বরং আঁতুড়ে আমাদের খানিক নুণ গিলিয়ে মারলে না কেন? তা হ'লেই ত গোল চুকে যেত। কি বলিস্, বিনি?

বিনোদিনী। আমি ও সব কথা কানেই তুলি নে। আমি রাত্তিরে ঘুমিয়ে রাজপুত্তুরের আর সদাগর-পুত্তুরের স্বপন দেখি, ভোরবেলা ঘুম ভেঙ্গে মনে করি, কবে রাজপুত্তুর হাতী কোরে এসে আমায় দোলায় চাপিয়ে নিয়ে যাবে। ডাকাডাকি কোরে ভোরবেলা তুলে দেয়, তাই রাগ ধরে, তা নইলে সকালবেলা কত ভাল লাগে। এই ফুলের গন্ধ, পাখীর গান, তার সাথে কত কথা মনে আসে! এমন সময় আর ত হবে না, এমন সুখের দিন কেন হেলায় হারাব? বলুক্‌গে যে যার বল্‌বার, আমাদের দিন ত আমাদেরই আছে। যদি বয়স ফেরবার হ'ত, তা হ'লে আমাদের মত হ'তে না চাইত কে. তা তিনি বুড়ীই হোন আর খুকীই হোন?

সৌদামিনী। রূপকথা যদি সত্যি হ'ত, তা হ'লে আমি রাজকন্যা হতাম, সোনার কাঠি চোঁয়ালে ঘুমিয়ে পড়তুম, রূপার কাঠি চোঁয়ালে জেগে উঠ্‌তুম।

চঞ্চলা। সে ত রূপকথা, আর এখানে যে সত্যিকার রাজকন্যার বিয়ে। অঘ্রাণ মাসে না কি বিয়ে হবে?

কাদম্বিনী। তাতে আমাদের কি? বেল পাকলে কাকের কি?

ব্রজেশ্বরী। কেন, আমরা সব দেখতে শুনতে পাব ত! কত ঘটা হবে, কত রোশনাই হবে, কত গান-বাজনা হবে, আমরা সব উলু দিতে, গান গাইতে যাব, কোন্ না মিঠাই-মণ্ডা খেতে পাব।

বিনোদিনী। তা না হয়, তুই এখন থেকে গিয়ে রাজার দোরে পাত পেতে ব'সে থাক্ গে।

ব্রজেশ্বরী। দেখবো লো দেখব তখন, তুই কেমন দরজায় খিল দিয়ে কানে তুলো গুঁজে ব'সে থাকিস্!

বিনোদিনী। তা ব'লে তোর মতন আমার নোলা সগবগ করচে না।

সৌদামিনী। বিনি, তুই ত বড় কুঁদুলে! সকালবেলা কোঁদল করচিস্ কেন?

বিনোদিনী। বেশ, বেশ, আমি না হয় কুঁদুলে। তোমরা ত সব ভাল, তা হ'লেই ভাল।

কাদম্বিনী। না ভাই, রাগ করিস্ নে। সকালবেলা রাগারাগি করলে সারাটা দিন খারাপ হয়ে যায়। বল্ দেখি, রাজকন্যাকে ত সবাই সব দেবে, আর আমরা কি দেব?

বিনোদিনী। আমরা কোথায় কি পাব ভাই, আমরা যে গরীব মানুষ?

কাদম্বিনী। তা হোক্, আমরা ত এক ছড়া ফুলের মালাও দিতে পারব।

চঞ্চলা। শুধু তা কেন? বিনোদিনী কত রকম ছবি আঁক্‌তে পারে, ভাল ভাল ছবি এঁকে দেবে।

ব্রজেশ্বরী। রাজপুত্র যে বর হবে, সে কেমন দেখতে?

সৌদামিনী। শুন্‌তে পাই, খুব ভাল দেখতে, ঠিক যেন কার্ত্তিকের মত।

বিনোদিনী। রাজকন্যার ভাগ্যি ভাল।

কাদম্বিনী। তা নইলে সেই বা রাজকন্যা হবে কেন, আর আমাদেরই বা যে পায়, সেই পায়ে প্যাঁতলায় কেন?

চঞ্চলা। বরাৎ!

সৌদামিনী। রাজকন্যা ডাকসাইটে সুন্দরী, মন্দিরে যেতে কত দিন দেখেছি।

ব্রজেশ্বরী। যার কপাল ভাল, তার সব ভাল।

বিনোদিনী। হ্যাঁ ভাই, রাজার সভা দেখেছিস? এক এক জন যেন এক একটি অবতার।

কাদম্বিনী। যা বলেছিস্ ভাই, লাখ কথার এক কথা!

বিনোদিনী। রাজা বড় ভাল মানুষ, তবে যদি বুদ্ধির কথা বলিস্—

চঞ্চলা। সে কথা আর ব'লে কাজ নেই।

সৌদামিনী। মন্ত্রী ত গোমড়ামুখো, ভুলেও মুখে একবারটি হাসি নেই।

বিনোদিনী। সেনাপতি ত কালে ভদ্রে কখন আসেন, সৈন্য নিয়েই ব্যস্ত। চোখ দু'টো যেন ভাঁটার মতন, গোঁপ জোড়া খাড়া, যেন সজারুর কাঁটা।

ব্রজেশ্বরী। আর কোটাল? যেন একটা ডাকাত, দেখলে ভয় করে। মনে করে, মস্ত একটা মরদ। মরদের মুরদ কত। সে দিন একটা পাহাড়ী এসে নগরে উৎপাত করতে আরম্ভ করলে। কোটাল-মশাই গেলেন তাকে নিজে ধরতে, হাতে লেঙ্গি তরওয়াল। সে না একটা ছোরা বার ক'রে, করলে কোটালকে তাড়া। এই আর কোথায় আছে! কোটাল ত দে ছুট, এই পড়ে কি সেই পড়ে! দেখে পথের লোক হেসে মরে!

বিনোদিনী। তা ভাই, যাই বল, বিদূষককে আমার বেশ লাগে। ভাঁড়ামি করুক, ভাঁড়ামি ওর কাজ, কিন্তু খুব সেয়ানা, আর বেশ ভাল। বউকে খুব ভালবাসে আর সবাইকে যত্ন-আত্তি করে। এক দিন দেখি, খাবারের ঠোঙ্গা হাতে ক'রে বিদূষক যাচ্চে। পথে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদ্চে। বিদূষক জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েচে?" মেয়েটি বল্লে, 'কাল থেকে খেতে পাই নি, বড় ক্ষিদে পেয়েচে।' বিদূষক তক্ষুনি তার হাতে খাবারের ঠোঙ্গাটি দিলে, আর এ দিক্ ও দিক্ তাকিয়ে, পাছে কেউ দেখতে পায়, তার হাতে কটি পয়সা দিলে, বল্লে, 'আর কেঁদ না মা, এই খাও আর কিছু কিনে নিও।'

কাদম্বিনী। ওর শরীরে অনেক গুণ।

বিনোদিনী। আর ঐ যে টিকওয়ালা কটা আছে, সভাসদ, সভাপণ্ডিত আর কি কি, ওগুলো কিছু নয়। ওরা শুধু উপসর্গ।

সৌদামিনী। রাজা মন্ত্রী অনেক রাত হ'ল, এখন যে যার ঘরে চ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজসভা—বেলা এক প্রহর।

মন্ত্রী, অমাত্য, সভাসদ, সভাপণ্ডিত,
বিদূষক চাটুকার প্রভৃতি।

(অগ্রে প্রতিহারী, পশ্চাৎ রাজার প্রবেশ)

(সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "জয়, মহারাজের জয়!" রাজা যুক্তকরে নমস্কার করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।)

রাজা। মঙ্গল, সকলের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল, প্রজার মঙ্গল, নগরের কুশল?

মন্ত্রী। রাজন, সর্ব্বত্র কুশল।

রাজা। রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশ থেকে দূত সংবাদ এনেছে?

মন্ত্রী। দূত আগতপ্রায়।

রাজা। উত্তম। গ্রীষ্মের প্রকোপ কেমন?

সভাসদ। মহারাজ, ও কথা আর বলবেন না। অস্থির, অস্থির, প্রাণ অস্থির, পিপাসায় প্রাণ যায়। রাত্রে ত নিদ্রার নাম নেই, পাখা ন'ড়তে নাড়তে হাত ভেরে যায়।

সভাপণ্ডিত। আর মহারাজ, সে যন্ত্রণা আর কহতব্য নয়। একে ত শয্যাকণ্টক, তার উপর ব্রাহ্মণীর বাক্য-যন্ত্রণা। নিদ্রা না হ'লে আর গ্রীষ্মের জ্বালায় ছটফট না ক'রে আর উপায় কি! এই ব্রাহ্মণীর রাগ, বলেন, তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত হয়।

রাজা। বলুন, বলুন, কথাটা সব শোনা যাক্। খুব শ্রুতিরোচক হবে।

বিদূষক। মহারাজ, আমি বলছি, আমি সব জানি। পণ্ডিতমশাই কি কোন কথা গুছিয়ে বল্‌তে পারেন, না ওঁর কথার কোন ছিরি আছে? অমর, পাণিনি, মুগ্ধবোধ কণ্ঠস্থ, কিন্তু একটা সোজা কথা ভাল ক'রে বল্‌তে পারেন না। সাধে কি ব্রাহ্মণীর রাগ? এই যে গ্রীষ্মের কথা হচ্চে, সে ব্যাপারখানা এই; এমনি গ্রীষ্মের টান যে, সব শুকিয়ে যাচ্চে। রাত্তিরে যখন জলযোগের পর হরীতকী মুখে পণ্ডিতমশাই নাকে নস্য টিপ্‌লেন, তখন দু চারটে হাঁচি হয়ে নাকটা পরিষ্কার হবার কথা, তা না হয়ে হাঁচি গেল শুকিয়ে। হাঁচি ত পড়ল না, পড়বার মধ্যে পণ্ডিতমশাইয়ের মুখের হরীতকখণ্ড ব্রাহ্মণীর গায় পড়ল। এতে কার না রাগ হয়?

সভাপণ্ডিত। (চটিয়া উঠিয়া) সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা!

বিদূষক। মিথ্যা বই কি! আপনার সাক্ষী কে? ডাকুন আপনার ব্রাহ্মণীকে।

(রাজা ও সভাশুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন)

(কোটালের প্রবেশ)

রাজা। এই যে কোটালমশায়! নগরে শান্তিরক্ষার সংবাদ কি?

কোটাল। মহারাজ, সংবাদ উত্তম। দুইটা লোক গরুর গাড়ী চাপা পড়েছে, তার মধ্যে এক জন টেরা, গাড়ীখানা হয় ত বাঁকা দেখে থাকবে। দশটা চুরী হয়েছে, তার মধ্যে একটা পোষা কুকুর, সে জন্য গৃহস্থ বড় চেঁচামেচি করছে। ডাকাতি আড়াইটে, অর্থাৎ দুটো পুরা আর একটায় ডাকাত পড়তেই পাড়ার লোক গোলমাল করে, ডাকাতেরা পালিয়ে যায়। দুইজন স্ত্রীলোক ঘর ছেড়ে পলায়ন করেছে অর্থাৎ বেরিয়ে গিয়েছে। গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে তিন জন, বিষ খেয়ে দু জন আর দু জন জলে ডুবে মরেছে। আর একটা অতি সামান্য ঘটনা, একটা লোক খুন হয়েছে, তার মুণ্ডটা পাওয়া যাচ্ছে না, ধড়টা প'ড়ে রয়েছে। মানুষটা কে, এখনও সনাক্ত হয় নি। মহারাজ, নগরে অতি উত্তম শান্তিরক্ষা হচ্ছে, কোন ত্রুটি পাবেন না।

রাজা। কোটালের শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা প্রশংসার যোগ্য।

চাটুকার। মহারাজ, একবার নয়, সাতবার কোরে। কোটালকে শিরোপা দেওয়া উচিত।

বিদূষক। পৃষ্ঠেও যৎকিঞ্চিৎ।

কোটাল। (ক্রোধভরে) কি বলছ হে বেল্লিক?

বিদূষক। বল্‌ছি, মল্লিকমশাই, আপনার মত সুবন্দোবস্ত করলে মাসখানেক পরে আর শান্তিরক্ষার কোন প্রয়োজন হবে না।

কোটাল। কেন?

বিদূষক। চুরী, ডাকাতি, খুন, আত্মহত্যা—নগর বেবাক ফর্সা হয়ে যাবে।

কোটাল। মহারাজ, এই ধৃষ্টের শাসন হওয়া উচিত, বড্ড বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে।

রাজা। ওর ত ওই কাজ! ওর কথা ধর্ত্তব্যই নয়।

বিদূষক। কোটালমশাই, রাগ করেন কেন?

(কোষাধ্যক্ষের প্রবেশ)

বিদূষক। এবার শান্তি নয়, এবার কড়াক্রান্তি!

রাজা। আপনার বক্তব্য কি?

কোষাধ্যক্ষ। মহারাজ, ধনাগার ছিল পূর্ণ, এখন শূন্য বললে অত্যুক্তি হয় না।

রাজা। বলেন কি?

সকলে। মশাই, রাজসভায় রাজার সম্মুখে আপনি বলছেন কি? রাজকোষ শূন্য? কুবেরের অক্ষয় ভাণ্ডার খালি? এও কি কখন হয়?

কোষাধ্যক্ষ। এমন কথা কি মিথ্যা বলা যায়? মহারাজ, একটা পুরানো সিন্দুকে গোটা পাঁচেক মোহর ছিল, তাও ইঁদুরে কোথায় টেনে নিয়ে গিয়েছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত ইঁদুরের গর্ত্ত খোঁড়া হচ্ছে।

বিদূষক। হাঁ হাঁ, চুরী বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা! ইঁদুর চোর আজ অবধি কোথাও ধরা পড়েছে? ধরা পড়ে বটে ইঁদুরকলে, কিন্তু তাতে সাধু আর চোর ইঁদুরে প্রভেদ হয় না। কেমন, কোটালমশাই, এটাও আপনার রোজনামচায় লেখেন! পারেন এ চোর ধরতে? চুরী ত চুরী, একেবারে রাজার ধনাগারে!

রাজা। মন্ত্রী, এ সব ত আপনার খোঁজ রাখা উচিত। এত বড় রাজ্যের সব ভার আপনার উপর, আর আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, কোষাধ্যক্ষকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করছেন না?

মন্ত্রী। এই যে মহারাজ, করছি, করছি। এতক্ষণ করি নি, তা হ'লে আপনার কথার উপর কথা কওয়া হ'ত। হ্যা হে, কাল ত তুমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কিংবা রাত্রিকালেও আমাকে কোন কথা বল নি। খাজনা খালি শুনলে প্রজারা বলবে কি?

কোষাধ্যক্ষ। মশাই, কাল রাত্রে দশটা গ্রামের খাজনা আস্‌বার কথা ছিল।

মন্ত্রী। কত?

কোষাধ্যক্ষ। তা শতাবধি গাড়ী ধান হবে। আড়তদারেরা ব'সে ছিল, তখনি টাকা দিয়ে নিয়ে যেত। তা হ'লে আজ ত রাজকোষ পূর্ণ থাকত!

মন্ত্রী। কেন এল না ?

কোষাধ্যক্ষ। মশাই, বড় কুসংবাদ, বল্‌তে সাহস হচ্ছে না।

রাজা। নির্ভয়ে বল।

কোষাধ্যক্ষ। ধর্ম্মাবতার, গ্রামে গ্রামে পঙ্গপাল এসে সব ধান খেয়ে গিয়েছে, খাজনার সিকিও পাওয়া যাবে না।

রাজা। মন্ত্রী, এ ত ভয়ানক সংবাদ! সাত দিন পরে সম্রাটের কর্জ্জ শোধ দিতে হবে, নইলে তিনি নগর অধিকার করবেন।

সকলে। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! তা হ'লে ঘরের চালার খড়টুকুও থাকবে না।

রাজা। মন্ত্রী, একটা বিহিত করতেই হবে। চার দিনের মধ্যে আমার টাকা চাই।

মন্ত্রী। তাই ত, মহারাজ, তাই ত, চার দিনের ভিতর টাকা চাই! মাসখানেকের মধ্যে আর ত কোথাও থেকে আদায়ের কথা নেই।

রাজা। না পাওয়া গেলে সম্রাট এসে এই নগর থেকে আদায় করবেন। আপনার বাড়ীর খানাতল্লাসী হবে প্রথম।

মন্ত্রী। (শুষ্ক মুখে) সে কি কথা, মহারাজ! আমার অপরাধ ?

রাজা। অপরাধ এই যে, আপনি মন্ত্রী আর ধনাগার শূন্য। আর এই সভায় যাঁরা উপস্থিত আছেন, তাঁরা কেউ রক্ষা পাবেন না, নগরে ঘরে ঘরে তল্লাস হবে।

সকলে। তা হ'লেই ত সর্ব্বনাশ, আমাদের পথে দাঁড়াতে হবে।

রাজা। তবে যে পারেন, একটা উপায় ঠাহরান। দরকার হ'লে এত বড় রাজ্যে কিছু টাকা পাওয়া যায় না, এও কি কথা ?

অমাত্য। সেনাপতিকে ডাকা হয় না কেন ?

রাজা। তিনি কি করবেন ?

অমাত্য। যদি কোথাও শত্রু থাকে, গিয়ে লুটপাট ক'রে আনবেন।

বিদূষক। শত্রুগুলো চালকুমড়ার মত শিকের ঝোলান আছে, পেড়ে এনে কচ্‌ কচ্‌ ক'রে কেটে ফেল্‌লেই হ'ল!

রাজা। অমাত্য, তোমার অসম্ভব কথা। আপনারা সব এমন বুদ্ধিমান, কেউ পণ্ডিত, কেউ রাজকর্ম্মে দক্ষ, আপনারা একটা কিছু উপায় বল্‌তে পারেন না? (সকলে নীরব)

রাজা। মন্ত্রী, এ বুদ্ধি আপনার দেওয়া উচিত। আপনার চেয়ে কে বেশী জানে ?

মন্ত্রী। মহারাজ, আমার ত কোন বুদ্ধিই যোগাচ্ছে না।

রাজা। বিদূষক, ঠাট্টাবিদ্রূপ করাই তোমার কাজ, কিন্তু তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে আমার বড় আস্থা আছে। তুমি বিবেচনা ক'রে একটা পরামর্শ দাও।

বিদূষক। মহারাজ, সত্য বল্‌ছেন?

রাজা। এ কি অসত্য বল্‌বার সময়?

বিদূষক। মহারাজ, ভূমিতে যা উৎপন্ন হয়, তার ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য। গরীব চাষার যা ধান জন্মায়, তার ছ ভাগের এক ভাগ রাজভাণ্ডারে আসে, আর যা অন্যস্থানে উৎপন্ন হয়, তার কোন ভাগ আসে না কেন? নগরে কত বণিক, কত ধনী, কত রাজকর্ম্মচারী আছে, তারা রাজকোষে কি দেয়? এই মন্ত্রীমশাই আছেন, কোটালমশাই আছেন, এঁরা কি দেন?

মন্ত্রী। আর কোটাল: আমাদের কি আছে যে, আমরা দেব? বেতন যা পাই, তাতে সংসার-খরচই কুলায় না।

বিদূষক। ভাল, আপনারা যেন নিঃস্ব, কিন্তু আমি আর এক শ্রেণীর লোকের কথা ভাবছি, তাদের সম্বন্ধে কোন আপত্তি হ'তেই পারে না। যারা কৃপণ, যাদের সঞ্চিত অর্থের কেহ উত্তরাধিকারী নেই, তাদের অর্থ রাজকোষে আসে না কেন? মহারাজ, এক রাজার কথা আমার মনে আস্‌ছে।

রাজা। কি রকম?

বিদূষক। এক রাজা ছিলেন, তিনি গুপ্তচর লাগিয়ে সন্ধান রাখতেন, রাজ্যে কারা অর্থ-সঞ্চয় করছে, আর যা সঞ্চয় করে, তা যক্ষের মত আগলে থাকে। তিনি চুপচাপ ব'সে থাকতেন, তাদের কিছু বলতেন না। তার পর এক দিন তাদের সঞ্চিত অর্থ গ্রহণ করতেন। যাতে তাদের খাবার পরবার কষ্ট না হয়, এ রকম অর্থ ছেড়ে দিতেন।

রাজা। এ অতি উত্তম পরামর্শ!

সকলে। সাধু, সাধু!

চাটুকার। মহারাজ, বিদূষকই মন্ত্রী হবার উপযুক্ত। এর মত পরামর্শ কেউ দিতে পারেন নি।

বিদূষক। না, আমি কোন পদ চাই নে, কারুর অন্ন মারতে চাই নে, যেমন আছি, বেশ

আছি। তবে যদি মহারাজের অনুমতি হয়, তা হ'লে অক্লেশে আর বিনা অত্যাচারে কোথায় প্রচুর অর্থ পাওয়া যেতে পারে, তা ব'লে দিতে পারি।

রাজা। তোমার পরামর্শ আমি গ্রহণ করছি। এই কার্য্যসাধনের জন্ত তোমার কি রকম সাহায্য ও লোকবলের দরকার? এ বিষয়ে সকলেই তোমার অধীন, মন্ত্রী পর্য্যন্ত।

বিদূষক। কোটাল আর তাঁর কয়েক জন প্রহরী হ'লেই যথেষ্ট হবে।

রাজা। কোটালমশায়, শুনলেন? যেমন আমার আজ্ঞা, সেই রকম বিদূষকের আজ্ঞা পালন করবেন।

কোটাল। যে আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা। এখনকার মত সভাভঙ্গ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সভাপণ্ডিতের গৃহ—প্রাতঃকাল।

(সভাপণ্ডিত ঘরের দাওয়ায় বসিয়া, সম্মুখে কতকগুলি পুঁথি। ব্রাহ্মণী দরজার চৌকাঠ-গোড়ায় বসিয়া চাল বাছিতেছেন)।

সভাপণ্ডিত। (পুঁথি উল্টাইয়া) কথাটা শুনতে ভাল, কিন্তু শাস্ত্রের অনুমোদিত ত হওয়া চাই। যদি কেউ অপুত্রক হয় আর তার পিণ্ডাধিকারী কেউ না থাকে ত তার মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি রাজারই প্রাপ্য, কিন্তু কোন ব্যক্তির জীব দশায় রাজা কেমন ক'রে তার অর্থ নিতে পারেন? মনু বলছেন, জলোকার শোণিত-পানের ন্যায়, বৎসের দুগ্ধপানের ন্যায় এবং ভ্রমরের মধুপানের ন্যায় অল্পে অল্পে প্রজাবর্গের নিকট হ'তে বার্ষিক কর গ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য। ভগবান্ মনু আবার স্পষ্ট বলছেন, রাজা অতি তৃষ্ণাবশতঃ প্রজার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করতঃ তাহাদের মূলোৎপাটন করিবেন না। এ সর্ব্বস্ব গ্রহণ নয় ত আর কি? বিদূষক আবার একটা মানুষ, তার পরামর্শ মতে এত বড় একটা অসমসাহসের কাজ, শাস্ত্রে বেটা একেবারেই নিন্দনীয়! তার পর লোকনিন্দা আছে।

ব্রাহ্মণী। তুমি ব'সে আপনার মনে কি বিড়বিড় ক'রে বকছ? পাগল হও নি ত? বলে, বিড়বিড়ে ভাতার আর মিট্‌মিটে পিদ্দীম। সইতে পারি নে!

সভাপণ্ডিত। না, এই শাস্ত্র দেখ্‌ছি, একটা কাজ শাস্ত্রসঙ্গত কি না, তাই বিচার করছি।

ব্রাহ্মণী। ঘরে হাঁড়ি চড়বে না, কোন্ শাস্তোরে লেখে বল দেখি?

সভাপণ্ডিত। মহাভারত! ওটা কি কোন শাস্ত্রের কথা! এই ত তুমি চাল বাছ!

ব্রাহ্মণী। এত কটা চাল ছাড়া ঘরে নুণ পর্য্যন্ত নেই। একটা বেগুন নেই যে, পুড়িয়ে দেব।

সভাপণ্ডিত। এই যে সে দিন পাশের বাড়ী থেকে কতকগুলো কচু দিয়ে গেল।

ব্রাহ্মণী। তুমি কচু-পোড়া ছাড়া আর কি খাবে? এ দিকে শুনতে কি না রাজার সভাপণ্ডিত, নামের ডাকে গগন ফাটে, আর ঘরে ত এ দিক্ কুলোতে ও দিক্ কুলোয় না। বলি, এ মাসের দক্ষিণে পেয়েছ?

সভাপণ্ডিত। রাজভাণ্ডারে অর্থাভাব!

ব্রাহ্মণী। কবে যে অভাব নেই, তা ত জানি নে। এখন তুমি বিদূষকের নাম করছিলে কেন?

সভাপণ্ডিত। সে রাজকোষে অর্থ আসবার একটা উপায় ঠাউরেছে, কিন্তু সেটা শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

ব্রাহ্মণী। রাজকোষে টাকা এলে তুমি মাইনে পাবে ত?

সভাপণ্ডিত। তা পাব বৈ কি।

ব্রাহ্মণী। সেটাও কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ? বিদূষক কোথেকে টাকা আনবে?

সভাপণ্ডিত। কৃপণদের লুকানো টাকা বের ক'রে নেবে।

ব্রাহ্মণী। বেঁচে থাকুক বিদূষক, যক্ষির ধন বের ক'রে সদ্ব্যবহার করা ত একটা মস্ত কাজ, একটা পাপী উদ্ধার হয়।

সভাপণ্ডিত। বলছে যাদের ছেলেপুলে নেই, কেউ উত্তরাধিকারী নেই, এই রকম কৃপণদের টাকা নিলে কোন দোষ নেই।

ব্রাহ্মণী। ঠিক কথা! এ কি কম বুদ্ধির কথা! এমন লোক থাকতে তুমি হ'লে সভাপণ্ডিত আর ঐ হোঁৎকাটা হ'ল মন্ত্রী! আঁটকুড়ের ধন! ছেলে নেই, পুলে নেই, তিন কুলে কেউ নেই, যাক্কর

মত টাকা আঁকড়ে ব'সে আছে। এমন লোকের মুখ দেখলে গঙ্গাস্নান করতে হয়। এমনতর লোকের টাকা কেড়ে নেওয়া ত পুণ্যি-কর্ম্ম। আমি যদি রাজা হই, তা হ'লে সব আঁটকুড়ো কিপ্পনের পোতা আর লুকুনো টাকাগুলো এক্ষুনি কেঁড়ে নি। আমি ঠাকুর-দেবতাদের মানাচ্চি, যেন এ রাজ্যের সব কাজ বিদূষকের বুদ্ধিতে হয়।

সভাপণ্ডিত। শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্ম।

ব্রাহ্মণী। তোমার শাস্তরের মুখে আগুন! বিদূষক তোমায় হাটে নিয়ে কাণা কড়ায় বেচে আসতে পারে! এ দিকে বেলা যে হয়ে গেল, বাজারে যেতে হবে না? না বুড়ো আঙ্গুলের ঠেলা দিয়ে দুজনে ভাত খাব?

সভাপণ্ডিত। (উঠিয়া হাত পাতিয়া) পয়সা দাও।

ব্রাহ্মণী। কি আমার সোহাগের মানুষ এলেন গো, হাত পাতলেই হ'ল! আমার বাপ আমায় রী দিয়ে গিয়েছে কি না, তাই তোমায় ব'সে ব'সে খাওয়াব! রাজসভার চাকুরী, সভাপণ্ডিত, শুধু টিকি নাড়াই সার! আমি পয়সা পাব কোথায় যে তুমি হাত পাতছ?

সভাপণ্ডিত। তবে আজ থাক, যখন মাইনে পাব, তখন বাজার হবে। (বসিতে উদ্যত)।

ব্রাহ্মণী। অমনি পুরুষের রাগ হ'ল, ফর্‌কে গেলেন। এই নাও, ধর। ওগো, হাত পাত, এ আমার বাপের বাড়ীর পয়সা নয়, এ তোমার পয়সা, আমি টিপে টুপে রাখি, তাই থাকে।

সভাপণ্ডিত। কি আনতে হবে?

ব্রাহ্মণী। এই এক পয়সার কলমীশাক এন, কলমীশাকের ঝোল করব। দু পয়সার আলু দু পয়সার পটল, ঝালের ঝোল হবে। দু পয়সার না হয় কড়াইয়ের ডাল এন, তুমি খেতে ভাল বাস। মসলা এন তিন পয়সার। আর তুমি ত মাছ খাও না, কিন্তু আমি যে এইস্ত্রী মানুষ, মাছ-ভাত না খেলে তোমার অকল্যাণ হবে। দু পয়সার চুনো-চানা, পাও নিয়ে এস।

সভাপণ্ডিত। আচ্ছা, তবে আমি চললুম।

ব্রাহ্মণী। একটু রসো, তোমার যে আর তর সয় না। এই চারটে পয়সা নাও, এক দুটি দড়ী নিয়ে এস, বেশ ভাল পাকান পাটের দড়ী।

সভাপণ্ডিত। দড়ী কি হবে?

ব্রাহ্মণী। আমি গলায় দেব!

সভাপণ্ডিত। বালাই, অমন কথা মুখে আনতে নেই।

ব্রাহ্মণী। আমার জন্য ওঁর ত বড় ভাবনা। আমি গেলে হাতে হাতে তোমায় কে' সব যোগাবে, আসল সেই ভাবনা। শিকে ছিঁড়ে গিয়েছে, কাপড় মেলিয়ে দেবার দড়ীগাছা প'চে গিয়েচে তাই দড়ী চাই। তোমার অত শত খোঁজে কি দরকার?

সভাপণ্ডিত। এইবার তবে যাই। (ট্যাঁকে হাত দিয়া) আমার নস্যের শামুকটা কি হ'ল?

ব্রাহ্মণী। ঐখানেই কোথায় রেখেছ খুঁজে দেখ। তোমার ত দণ্ডে দণ্ডে সব হারায়, কিছু মনে থাকে না। এত পুঁথি-পাজি-শাস্তর যে কি ক'রে মনে থাকে, তাই ভাবি।

সভাপণ্ডিত। (চারিদিকে খুঁজিয়া) কোথায় গেল, খুঁজে পাচ্চি নে।

ব্রাহ্মণী। তুমি কি কখনো কিছু খুঁজে পাও? হারাবার বেলা তুমি, আর খোঁজের বেলা আমি। (খুঁজিয়া, একখানা পুঁথির নীচে হইতে নস্যের শামুক বাহির করিয়া) এই নাও, এই ত চোকের সামনে রয়েচে।

সভাপণ্ডিত। আমি ত সব খুঁজেছি, কেবল ঐ পুঁথিখানার নীচে দেখি নি। এইবার চললুম। (কয়েক পদ গিয়া ফিরিয়া আসিয়া) আঃ, চসমাটা কোথায় রাখলুম?

ব্রাহ্মণী। চসমার হাত-পা হয়েছিল, সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েচে। যাও, গিয়ে পথে খোঁজ গে। (সভাপণ্ডিতের মুখের দিকে চাহিয়া ব্রাহ্মণী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন) তোমার চসমা কোথায়?

সভাপণ্ডিত। তাই ত খুঁজছি। তুমি হাসবার আর সময় পেলেন না।

ব্রাহ্মণী। কপালখানা! তোমার নাকে চসমা নেই?

সভাপণ্ডিত। (রাগিয়া) তাই যদি থাকবে, তা হ'লে চারিদিকে খুঁজে মরব কেন?

ব্রাহ্মণী। নাকের উপর দেখেছ? যেখানে আঙুলে ব'সে বিধাতা পুরুষ ভবিতব্য লিখে দিয়ে যান?

(সভাপণ্ডিত কপালে হাত দিয়া দেখিলেন, চসমা কপালে রহিয়াছে। তিনি কখন্ অন্যমনস্ক হইয়া নাকের উপর তুলিয়া দিয়াছেন, তাহার পর

মনে নাই। আর কোন কথা না কহিয়া তাঁহার প্রস্থান)।

(প্রতিবাসিনীর প্রবেশ)

প্রতিবাসিনী। পণ্ডিতমশাই বেরিয়ে গেলেন দেখে একবার এলুম। পুকুরপাড়ের চাল্‌তা গাছ থেকে আজ চাল্‌তা পাড়া হয়েছে, তাই দুটো নিয়ে এলুম।

ব্রাহ্মণী। ব’স, ব’স, নেপার মা! তুমি যে আমাদের কত সামিগ্রী দাও, তার আর ঠিক নেই।

প্রতিবাসিনী। ভারি ত জিনিষ বউ ঠাক্‌রুণ, তার আবার কথা! পাড়ায় থাক্‌লে অমন কে না করে?

ব্রাহ্মণী। বলে ভাই সকলে, কিন্তু কর্‌বার বেলা ক জন?

প্রতিবাসিনী। তা মিথ্যে নয়! রথতলায় ঐ যে কায়স্থ-গিন্নী আছেন, উনি কি কম না কি? লোক দেখলে যেন কত ভাল মানুষ, যেন কিছুর মধ্যে নেই। এ দিকে ত এক গলা ঘোমটা, যেন কলা-বউ, কিন্তু তার ভেতর থেকে কুটুস্ কুটুস্ কোরে কামড় দিতে ছাড়েন না। সে দিন কোথাও কিচ্ছু নেই, তোমার নিন্দে জুড়ে দিলে।

ব্রাহ্মণী। আমি কি তার পাকা ধানে মই দিয়েছি?

প্রতিবাসিনী। তা বলে কে, যার যেমন স্বভাব! মাগীর আবার হিংসা কত! বলে, সভা-পণ্ডিতের বউ, অমনি দীন-দুঃখীর মত থাকে, কিন্তু ওর অনেক টাকা।

ব্রাহ্মণী। হ্যাঁ, কলাগাছতলায় আমার বিস্তর টাকা পোঁতা আছে, বলো, রাত্তিরে এসে খুঁড়ে নিয়ে যায়।

প্রতিবাসিনী। চুলোয় যাক্! তোমায় এই একটা কথা জিগ্‌গেস কর্‌তে এসেছি, লোকে বল্‌ছে, রাজার তবিলে টাকা নেই, তা বিদূষক না কি কেমন ক’রে টাকা বের করবে? মন্তর-তন্তর কিছু জানে না কি?

ব্রাহ্মণী। মন্তরে যে সাপ বেরোয় তা দেখেছি, কিন্তু মন্তরে যে টাকা বেরোয়, তা ত শুনি নি!

প্রতিবাসিনী। তবে কেমন ক’রে টাকা আন্‌বে?

ব্রাহ্মণী। তা কি ক’রে বল্‌ব ভাই, তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে।

প্রতিবাসিনী। পণ্ডিতমশাই রোজ রাজসভায় যান কি না, তাই ভাবছিলুম, উনি যদি কিছু জানেন।

ব্রাহ্মণী। উনি ত সব খবরই রাখেন! নিজের ঐ পুঁথি-পাঁজি ছাড়া দুনিয়ার কিছু জানে না।

প্রতিবাসিনী। এখন উঠি, দিদি। ডাল চড়িয়ে এসেছি, আবার না ধ’রে যায়!

ব্রাহ্মণী। এস, ভাই।

[প্রতিবাসিনীর প্রস্থান।

ব্রাহ্মণী। (স্বগত) বিদূষক কেমন ক’রে টাকা আন্‌বে, সেই কথা আমি ওঁকে বল্‌তে গেলুম! আমার ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! আমার ঠ্যাকা পেয়েছে কি না!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ—সায়ংকাল।

(এক দল মাতালের প্রবেশ)

(গান)

হরদম খুস্! হরদম তাজা!
কখনো তোফা পোলাও কোরমা কখনো সাড়ে
আঠারো ভাজা!
দিলটা মোদের খাসা খোলাসা,
তাতে নাইক মেঘ, আর কুয়াসা,
ঠেল্‌লে পরেই খোলা পাবে প্রাণের দরজা!
আমরা মাটীর মানুষ ভাই,
তাই মাটীতে গড়াগড়ি যাই,
তাইতে কি না বোকা হাকিম দেয় আমাদের সাজা!
ধরাখানা যায় গড়গড়িয়ে,
আমরাও চলি টলমলিয়ে,
আমরাই ত আদ্দিকালের টলমল দেশের রাজা!

প্রথম মাতাল। যো খায়া উয়হ পচ্‌তায়া!

দ্বিতীয়। যো নাহি খায়া উয়হ অওর ভি পচ্‌তায়া!

তৃতীয়। আহা কি নাম! কাদম্বরী! কটা সুন্দরীর এমন নাম আছে?

(গান)

সুরলোকের সাধন তুমি তাই ত নাম সুরা,
তোমার মহিমা গাহিত নারদ সেধে তানপুরা!

চতুর্থ। রসো বাবা, বেজায় বে-সুরো হচ্ছে। সুরলোক থেকে সুরা নরলোকে এল কেমন ক'রে? শোন্ তবে—

মোহিনীর হাতে হাঁড়ি, সুরাসুরে কাড়াকাড়ি,
সুন্দরী ত সটান চম্পট!
পিছনে অসুরের পো, বেগে ছুটে আসে বোঁ বোঁ,
পায়ে চটি বাজে চট্ চট্।
মোহিনীও দিল রড়, খোঁপা ক'রে নড়বড়
ভয়ে ধনী ফিরে নাহি চায়,
ধুমসো অসুর ভোঁদা, সেইটে পালের গোদা
তেড়ে গিয়ে ধরিল খোঁপায়;
মোহিনী কাঁদিয়ে সারা, ফিরে দেখে দেবতারা,
মারিল ভোঁদার নাকে ঘুসি,
সুরাভাণ্ড লণ্ডভণ্ড, চল্‌কে পড়ল ধরাখণ্ড,
কর পান যত যার খুসি!

পঞ্চম। ভ্যালা মোর বাপ! সাবাস, বেটা, সাবাস! কবিষু কালিদাসঃ। আমি কালিদাসে পড়েছি, আমার বেশ মনে আছে।

প্রথম। আরে একটা কথা শুনেছিস, শুনে আমার ত নেশা একেবারে চ'টে গিয়েছে?

তৃতীয়। শুলীর আড্ডায় যাস্ নি ত?

প্রথম। দুর শালা! হাটে-ঘাটে সব জায়গায় রটেছে!

দ্বিতীয়। কি রে, কি শুনেছিস্?

প্রথম। রাজার খাজনা খালি, একেবারে ঢন্ ঢন্, একটা কাণা কড়িও নেই।

চতুর্থ। যত বেটা চোরে লুটে খেয়েছে। রাজা ত একটি আস্ত —

প্রথম। চুপ কর্ গাধা! কেউ শুনতে পেলে তোর মদ খাওয়া বেরিয়ে যাবে!

চতুর্থ। আমি কি কাউকে কিছু বলেছি? রাজার টাকা থাক্ না থাক্, আমাদের কি?

প্রথম। যার যা কিছু আছে, কেড়ে নেবে যে! তোর গাঁটে কিছু আছে?

চতুর্থ। যা ছিল তা শুঁড়ী মামা নিয়েছে। চল্ গিয়ে তাকে ধরিয়ে দি।

তৃতীয়। সে যে আমাদের সাক্ষী মেনে বল্‌বে, তার কিছু নেই। জানিস্ নে, শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল?

দ্বিতীয়। তা আমাদের নিয়ে টানাটানি করলে কি হবে? আমাদের পালায় কিছু থাকলে ত!

প্রথম। ঐ যে, যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধ্যে হয়! ঐ কোটাল আস্‌ছে, যেন সাক্ষাৎ যমদূত!

(সানুচরবৃন্দ কোটালের প্রবেশ)

কোটাল। এই যে, এরা কে? বটে, বটে, এরা যে চেনা লোক, অবকারীর আসামী। ধর বেটাদের!

প্রথম মাতাল। হজুর, আমাদের কি কসুর? আমরা ত কিছুই দোষ করি নি!

কোটাল। শালা, পথের মাঝখানে গুলতান কর্‌ছিস্, আর কিছু দোষ করিস্ নি?

দ্বিতীয়। হজুর, আমরা একটি কথাও চেঁচিয়ে কই নি, দোহাই হজুর।

কোটাল। তোরা মাতাল!

তৃতীয়। একটু আধটু খেয়েছি বটে, মিথ্যা কথা বল্‌ব কেন? কিন্তু বে-আন্দাজ খাই-নি, বে-সামালও হই নি।

কোটাল। হারামজাদা, আমার কথার উপর জবাব! লাগা মার বেটাদের, বেসামাল হয় কি না দেখি! বেহাল বেসামাল ক'রে দে!

(অনুচরেরা মাতালদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল)।

মাতালের দল। বাবা রে! মেরে ফেল্‌লে রে!
[বেগে পলায়ন।

কোটাল। ওই বিদূষক বেটাকে যদি এমনি ক'রে ঠ্যাঙ্গাতে পার্‌তাম! উল্টে তার হুকুমে হাজির থাক্‌তে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বিদূষকের গৃহ—মধ্যাহ্ন।

(আপনার মনে মৃদু মৃদু গান গাহিতে গাহিতে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক। ওগো ঘরের ঠাকরুণ, ঘরে আছ? বলি, ও প্রিয়ে, প্রিয়ংবদে, পরিবাদিনি!

প্রিয়ংবদা। (ঘরের বাহিরে আসিয়া) ঘরে নেই ত কি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছি? বাড়ীতে ডাকাত পাড়াচ্চ কেন? আর আমি কার পরিবাদ ক'রে বেড়াই যে পরিবাদিনী হলুম?

বিদূষক। আরে ওটা কিছু নয়, ওটা শুধু কথার মিল, অনুপ্রাসের ঝোঁকের মাথায় মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে।

প্রিয়ংবদা। অমন ক'রে চেঁচালে পাড়ার লোক বল্‌বে কি? আমি কি কালা হয়েছি?

বিদূষক। এমন কথা কার সাধ্যি বলে? তবে কি জান, সাবধানের বিনাশ নেই, আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল, তাতে ত কোন দোষ নেই।

প্রিয়ংবদা। তার মানে এর পর আমি কালা হব।

বিদূষক। তা কি বলা যায়! মনে কর, এর পর যদি আমিই কানে খাট হই, একটু উঁচু শুনি, কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃশ্রবা হই!

প্রিয়ংবদা। তুমি আর জ্বালিও না। রাজার সভায় ভাঁড়ামি কর ব'লে কি ঘরেও তাই করতে হবে?

বিদূষক। অভ্যাসের দোষ!

প্রিয়ংবদা। এমনি কি কু-অভ্যাস? ঘরে আবার দিনরাত্রি রঙ্গরস কি? না তোমার সেই বয়স আছে?

বিদূষক। নিজেকে গাল দিও না। আমি বুড়ো হ'লে তোমার কি হবে?

প্রিয়ংবদা। বুড়ো-বুড়ীর যা হয়ে থাকে! দিনরাত্রি খিটিমিটি, রাত্তির দিন কোঁদল হবে।

বিদূষক। নারদ, নারদ! অমন কথা বলো না। তোমার নাম যেমন, তুমি তেমনি, প্রিয়-বাদিনী, মধু-ভাষিনী, গজেন্দ্রগামিনী, শরচ্চন্দ্র-নিভাননী। তোমার মুখ যে কখনো ভ্রূকুটি-কুটিল হবে, তা আমি কল্পনাও করতে পারি নে।

প্রিয়ংবদা। (হাসিতে হাসিতে) যাও, যাও, পাম। তোমার কথায় কে পারবে? এই যে নতুন কথা শুনছি, এটা কি?

বিদূষক। কথা ত রকম আছে, এক নতুন, আর পুরানো। সব কথা দুইয়ের একটা হতেই হবে।

প্রিয়ংবদা। তুমি না কি মহাপাপ করেছ?

বিদূষক। কি সর্ব্বনাশ। আমি এমন কি মহা-পাতক করেছি, যার জন্য আমার এমন শাস্তি হবে?

প্রিয়ংবদা। শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী হওয়া কি তামাসা কথা?

বিদূষক। তা কেন? যেমন রাজা, তেমনি মন্ত্রী। শনি রাজা, তস্য মন্ত্রী বৃহস্পতি। এমন রাজ্যের মন্ত্রী হ'তে চাই নে।

প্রিয়ংবদা। কালই যেন তোমায় করলে! কিন্তু রাজা না কি তোমার সঙ্গে কি পরামর্শ করছিলেন?

বিদূষক। রাজার যা খুসি, তাই করবেন, নইলে রাজা কিসের? খুসি হ'ল আমার সঙ্গে পরামর্শ করলেন, খুসি হ'ল তোমার সঙ্গে পরামর্শ করলেন।

প্রিয়ংবদা। পোড়া কপাল! আমার সঙ্গে আবার কিসের পরামর্শ?

বিদূষক। এই ধর, কুটনো কোট্‌বার কিংবা বাটনা বাট্‌বার, না হয় আল্‌পনা দেবার। রাজার ত খেয়াল, যা হোক একটা কিছু নিয়ে পরামর্শ কর্‌লেই হ'ল।

প্রিয়ংবদা। তোমার চালাকি রাখ, কেবল কথা চাপা দেবার মতলব। রাজার তবিলে টাকা নেই, আর তুমি টাকা আন্‌বার নতুন ফন্দি বের করেছ, এ কথা সহরময় রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে। রাজ-সভায়—সহরে কথা হয়েছে, কত লোক শুনেছে।

বিদূষক। অবিশ্যি, যা বটে, তা কিছু বটে।

প্রিয়ংবদা। এর আর বটাবটি কি, সভার মাঝখানে কথা, যার ছিল সকলে শুনেছে, এতে আর বানানো কি?

বিদূষক। তা হ'লে ত ফুরুল। আমি কি বলেছিলুম, তাও সকলে শুনেছিল, তাও রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে। তা হ'লে আমাকে আবার জিজ্ঞাসা কেন?

প্রিয়ংবদা। মন বোঝে না ব'লে। তুমি যা বলেছিলে, লোকের মুখে সে কথা কত রকম ডাল-পালা বেরিয়ে আর একরকম হয়ে গিয়েছে। আমাকে সব কথা ঠিক ক'রে বল।

বিদূষক। তা ত পারি নে, এ সব হ'ল গোপ-নীয় কথা, রাজ-কার্য্যের মন্ত্রণা।

প্রিয়ংবদা। তাই সভার মাঝখানে হচ্ছিল আর সহরসুদ্ধ ঢাক পিটে গিয়েছে। কেন আর জ্বালাও, বল না কি কথা হয়েছিল?

বিদূষক। উঁহু, এ সব রহস্য কথা। রাজার অনুমতি না হ'লে বলা যায় না।

প্রিয়ংবদা। ইস, এবার যে সত্যি মন্ত্রীমশাই! মন্ত্রীমশাই, গড় করি। আমার উপর আবার রাজা!

বিদূষক। এবার আর কথা নেই। কি হুকুম?

প্রিয়ংবদা। এখন পথে এস। তা'হলে টাকা নেই, তা রাজা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা না ক'রে তোমায় করলেন কেন?

বিদূষক। মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বৈ কি!

প্রিয়ংবদা। মন্ত্রী কি উত্তর দিলেন?

বিদূষক। মাথা চুলকুলেন।

প্রিয়ংবদা। আর তুমি কি বল্‌লে?

বিদূষক। মুখ চুলকুলুম।

প্রিয়ংবদা। যেমন এখন?

বিদূষক। অবিকল এই রকম।

প্রিয়ংবদা। রাজাকে কি পরামর্শ দিলে?

বিদূষক। বললুম কি জান? এই যে কৃপণের টাকা, সে শুধু যক্ষের মত আগ্‌লে মরে, না দেবতার কাজে লাগে, না মানুষের কাজে আসে। সে গল্প জান ত, এক জন কৃপণের এক তাল সোনা মাটীতে পোতা ছিল, আমার মত কোন সেয়ানা লোক দেখ্‌তে পেয়ে সে রাতারাতি সে সোনা পাচার করে। তার পর এক দিন যখন কৃপণ মাটী খুঁড়ে সোনা দেখ্‌তে না পেয়ে মাথা চাপড়ে মরে, তখন এক জন পথিক তার কথা শুনে তাকে বল্‌লে, এই গর্ত্তে একটা পাথর পুঁতে রাখ না কেন? তোমার পক্ষে দুই সমান, কেন না, কোনটাই তোমার কোন কাজে আস্‌বে না। মনে কর, তোমার সোনা যেমন তেমনি আছে। আমি রাজাকে বললুম যে, আঁটকুড়ো কৃপণের টাকা, যার পিণ্ড দেবার কেউ নেই, রাজারই পাওনা, তা সে তার শিঙ্গে ফুক্‌বার আগেই হোক্ আর পরেই হোক্। এতে ত সকলে রাজি হয়েছে, কেউ কোন আপত্তি করে নি।

প্রিয়ংবদা। আর যার টাকা নেবে, সে কি বল্‌বে?

বিদূষক। সে মাথা চাপ্‌ড়াবে, আর সেই সময় যে গল্পটা তোমাকে বল্‌লুম, সেইটে তাকে শুনিয়ে দেব।

প্রিয়ংবদা। তা তুমি পার, কারুর সর্ব্বনাশ, কারুর পৌষমাস! সাত তাড়াতাড়ি এমন পরামর্শ দেবার জন্য তোমার মাথাব্যথা কেন?

বিদূষক। আমিও ত রাজার নুণ খাই। বুদ্ধিটা আর কারুর না জুগিয়ে না হয় আমার জোগাল। তাতে আর দোষটা কি?

প্রিয়ংবদা। কারুর মনে কষ্ট দেওয়া কি ভাল? এ দিকে রাজারও টাকা নইলে নয়। তা আমি আর ভেবে কি করব, তোমরা পুরুষমানুষ, তোমরা ভাল বোঝ। এখন মুখ-হাত ধুয়ে ব'স, খাবার এনে দি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

—•—

প্রথম দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর।—বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছে, রাণীর বিশ্রামকক্ষে রাজা একাকী বসিয়া।

(পানের ডিবা হস্তে পরিচারিকার প্রবেশ)

রাজা। রাণী কোথায়?

পরিচারিকা। রাণীমা পুজো কর্‌ছেন, এই এলেন ব'লে মহারাজ!

রাজা। আমি যখনি আসি, তখনি ত তিনি পূজায় থাকেন। কখন্ যে তাঁর দেখা পাওয়া যায়, বলা ভার।

[পানের ডিবা রাখিয়া দিয়া পরিচারিকার প্রস্থান।

(সধবা-লক্ষণ ব্যতীত নিরাভরণা, সামান্য বসনপরিহিতা রাণীর প্রবেশ)

রাজা। এই যে চিত্রলেখা! আমি কতক্ষণ তোমার জন্য ব'সে রয়েছি। কোথায় ছিলে তুমি?

রাণী। তুমি ত জান, এ সময় আমি দেবপূজায় থাকি।

রাজা। অবিশ্যি, অবিশ্যি, সে ত নিত্যকর্ম্ম, তবে তোমায় আগেকার মত সব সময় দেখ্‌তে পাইনে, অথচ তোমাকে দেখবার জন্যই অন্তঃপুরে আসি।

রাণী। তুমি ত চিরদিন আমাকে স্নেহ কর।

রাজা। শুধু তাই নয়, আমার হৃদয়ের অতৃপ্তি তুমি না হ'লে কিছুতেই মেটে না। সকলতাতেই মন তোমাকে চায়, তোমার কাছে সব ব'লে যেন শান্তি পাই। আগে তুমি সকল বিষয়ে আমাকে কত পরামর্শ দিতে, এখন তুমি আর

দেখাই দাও না। আমার কি কোন অপরাধ হয়েছে?

রাণী। সে কি কথা, মহারাজ! আমার কাছে তোমার অপরাধ? তুমি স্বামী, তুমি গুরু, তুমি রাজা, আমার ভালবাসা, আমার শ্রদ্ধা, আমার ভক্তি তোমার প্রাপ্য। আমার কাছে তোমার অপরাধ? রাজন্, অমন কথা বল্লে আমি দোষী হই, কেন না, আমার স্পর্দ্ধা প্রকাশ পায়।

রাজা। না হয় নাই বল্লুম। কিন্তু তুমি আমাকে কেবল মহারাজ মহারাজ কর কেন, তাতে আমার মনে লাগে না? আগে ত তুমি এমন কর্‌তে না। তোমার কাছে আবার রাজা কিসের? আমি যদি তোমাকে উঠ্‌তে বস্‌তে কেবল রাণী রাণী করি, তা হ'লে তোমার কি রকম মনে হয়?

রাণী। তুমি যা বলবে, তাই আমার শিরোধার্য্য। তুমি রাজা নিজের ভাগ্যে, পিতৃপিতামহের স্থানীয় ব'লে। আমি রাণী তোমার প্রসাদে, যতক্ষণ চরণে স্থান দাও, ততক্ষণ আমাকে রাণী বল, ভাগ্যবতী বল, সবই আমার শোভা পায়।

রাজা। (রাণীর হাত ধরিয়া) এ সব কেমন কেমন কথা, ঐ যেমন পুঁথিতে লেখা আছে। তবে কি তুমি আমাকে আর আগের মত ভালবাস না?

রাণী। (অপর হস্ত রাজার গলদেশে দিয়া) তুমি স্বামী, তোমাকে ভালবাসি না?

রাজা। এখন বুঝ্‌তে পারছি, বাস্। কিন্তু কই, চিত্রলেখা, তুমি ত আগের মত আমার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাক না, আমি আস্‌তেই হেসে আমার হাত ধ'রে তোমার নিভৃত কক্ষে নিয়ে যাও না, সে রকম কত কি কথা কও না?

রাণী। স্বামিন্, যে বয়সে যা সাজে। এখন কি আমরা কিশোর-কিশোরী, না যুবক-যুবতী?

রাজা। আমরা ত এখনো বার্দ্ধক্যে উপনীত হই নি। আর তোমার যৌবন অতীত হয়েছে, কে বলতে পারে? আমার কথায় প্রত্যয় না হয়, মুকুরে মুখ দেখ।

রাণী। রাজ্যভার গুরুভার, রাজাকে সকল বয়সেই সে ভার বহন কর্‌তে হয়।

রাজা। তা হ'লে এত লোকজন, মন্ত্রী, কর্ম্মচারী আছে কেন?

রাণী। তারা সকলে তোমার আজ্ঞাকারী, তোমার আদেশ পালন কর্‌বে, কিন্তু তাদের হাতে রাজ্যশাসনভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকৃতে পার না।

রাজা। তুমি বরাবর ঐ কথাই বল। সকল কর্ম্মই যদি আমাকে কর্‌তে হবে, তা হ'লে লোকজনের প্রয়োজন কি?

রাণী। আমার কথা তোমার অপ্রিয় মনে হয় বলেই আমি কোন বিষয়ে কোন কথা বলিনে। থাক্, আর এ সকল কথায় কাজ নেই।

রাজা। আমি ত সকল বিষয়েই তোমার পরামর্শ চাই, তুমি আমায় কি কর্‌তে বল?

রাণী। এই যে রাজকোষে অর্থ নেই, এ কথা তোমাকে পূর্ব্বাহ্ণে কেউ জানায় নি কেন? তুমিই বা কেন কোন সংবাদ রাখতে না? রাজকোষ হঠাৎ একেবারে শূন্য হয় না, অল্পে অল্পে হয়। তহবিল যে শূন্য হয়ে আস্‌ছে, এ কথা তোমার অবগত হওয়া কর্ত্তব্য ছিল। তুমি কর্ম্মচারীদের উপর অযথা নির্ভর কর ব'লে তোমাকে আগে কেউ কিছু জানায় নি, তার পর রাজকোষ একেবারে শূন্য। এ কথা ত গোপন করা যায় না। প্রজারা কি মনে কর্‌বে? এত বড় রাজ্য তোমার, এক দিকে এত অর্থসমাগম, আর তোমার ভাণ্ডারে কি না একটি কপর্দ্দকও নেই। রাজ্য কিরূপে চালিত হচ্ছে, এই ত তার প্রমাণ।

রাজা। আমি কালকেই সকলকে শাস্তি দেব। এ সব লোককে কর্ম্মচ্যুত ক'রে অন্য লোক রাখ্‌ব।

রাণী। তা যদি কর, তা হ'লে বড় অন্যায় হবে, এক অন্যায়ের উপর আর একটা অন্যায় হবে।

রাজা। তবে কি করা কর্ত্তব্য?

রাণী। রাজ-কার্য্যে তোমার আরও অধিক যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। রাজা শিথিল ব'লেই কর্ম্মচারীরা শিথিল, নইলে তাদের কি সাধ্য যে, তারা নিজের নিজের কর্ম্মে শৈথিল্য করে? তুমি যদি প্রতিদিন জিজ্ঞাসা কর্‌তে, রাজকোষে কত অর্থ আছে, তা হ'লে কি প্রকৃত কথা গোপন থাকৃত? কর্ম্মচারীরা কে কি বলে, তুমি শুধু শুনে যাও, তাদের কর্ম্মের প্রতি কি দৃষ্টি রাখ? তার পর এই যে অর্থ-সংগ্রহের ব্যবস্থা, সে-ও বিদূষকের পরামর্শ, মন্ত্রীর সে বুদ্ধি হ'ল না। রাজকোষে

যখন অর্থ নেই, তখন কৃপণ হোক, মুক্তহস্ত হোক, সকলকেই অর্থ দিতে হবে, কেউ বাদ যাওয়া উচিত নয়।

রাজা। এ ত রাণী নয়, রাজার মত কথা। যদি আমার বুদ্ধি থাকৃত, তা হ'লে সকল বিষয়ে তোমার বুদ্ধিতে চল্‌তুম, কিন্তু আমি নির্ব্বোধ, তোমার কথা অবহেলা কর্‌তাম।

রাণী। এ কথা বল্‌লে আমাকে লজ্জা দেওয়া হয়। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে ব'লে আমার অল্প বুদ্ধিতে যে রকম বিবেচনা হয়, তাই বল্‌লাম।

রাজা। কাল তা হ'লে আমি আদেশ কর্‌ব যে, সকলকেই রাজকোষে অর্থ দিতে হবে।

রাণী। না, মহারাজ, তা হ'লে অব্যবস্থিত-চিত্তের পরিচয় দেওয়া হবে। যা হবার, তা হয়ে গিয়েছে, আর আদেশ-পরিবর্ত্তন করো না। তা হ'লে প্রজার চিত্ত আরও চঞ্চল হবে। তারা অসন্তুষ্ট হবে।

রাজা। সকল বিষয়েই তোমার বুদ্ধি স্থির, যদি তোমার হাতে এ রাজ্য থাকৃত, তা হ'লে আজ এই দুর্দ্দশা হ'ত না। এখনো তোমার হাতে রাজ্য সমর্পণ ক'রে আমি অবসর গ্রহণ কর্‌তে রাজি আছি।

রাণী। সে কি কথা, মহারাজ! রাজচ্ছত্র তোমার মাথার উপর, রাজদণ্ড তোমার হাতে। এখন অনুমতি দাও, গৃহকার্য্যে যাই।

রাজা। তোমার যেমন অভিরুচি, আমিও মন্ত্রণাগৃহে যাই।

[উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আত্মারামের গৃহ—প্রাতঃকাল।

একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর অত্যন্ত মলিন বস্ত্র পরিয়া আত্মারাম বসিয়া। দরজা গোড়ায় সেই রকম মলিন বস্ত্র পরিয়া তাঁহার স্ত্রী দাঁড়াইয়া। সম্মুখে দাসী।

আত্মারাম। তুই রোজই বলিস্, বাজারে জিনিষের দর আক্রা হয়ে যাচ্ছে। তা হ'লে ত আর বাজার থেকে কিছু কেনা হয় না।

দাসী। কর্ত্তা মশাই, আপনিও ত রোজ বাজারে যাও, জিনিষের দর বেড়ে যাচ্ছে, তা ত দেখতেই পাচ্ছ।

চন্দ্রাবতী। তা হ'লেও তোর ত টেনে টুনে জিনিষ কিন্‌তে হয়।

দাসী। আমি টেনে কিনিনে? তা আমায় যদি এতই অবিশ্বাস, তা হ'লে কর্ত্তা নিজে কেন বাজার করেন না?

চন্দ্রাবতী। তুই রাগ কর্‌ছিস্ কেন বাছা? তোকে ত আর এমন কোন কথা বলা হয় নি!

দাসী। আবার কি বল্‌বে? রোজ রোজ মানুষকে সন্দ কর্‌লে তার মনে দুঃখ হয় না?

আত্মারাম। না না, তোকে কেউ কিছু বলে নি, পয়সা নিয়ে বাজারে যা। হ্যাঁ গা গিন্নি, কত পয়সা দেব?

চন্দ্রাবতী। গণ্ডা চেরেক দাও না, তা হ'লেই হবে।

আত্মারাম। আমরা মোটে দুটি মানুষ, চার আনা পয়সা কি হবে?

চন্দ্রাবতী। ঝিও ত খাবে।

আত্মারাম। আমাদের যা আস্‌বে, তাতেই ওর হবে। ওর জন্য ত আলাদা কিছু আন্‌তে হবে না।

চন্দ্রাবতী। তা যা বোঝ, তাই কর।

আত্মারাম। তুমিও যে আবার রাগ কর্‌ছ। পয়সা কি নষ্ট করবার সামগ্রী?

চন্দ্রাবতী। আমি বুঝি তাই করি?

আত্মারাম। না, না, তা কেন কর্‌তে যাবে? এই নে, ধর্ ঝি। এই তিন পয়সার আলু আর দু পয়সার বেগুন আনিস্। পটলে কাজ নেই, বড় মাগ্‌গি। এক পয়সার ডেঙ্গোর ডাঁটা আর এক পয়সার থোড়। এই হ'ল সাত পয়সা। এক পয়সার কচি আমড়া আর চার পয়সার কুচো চিংড়ী। এই ত ঢের হ'ল, বারো পয়সায় বেশ বাজার হবে। পয়সা যেন জলের মত খরচ হয়ে যাচ্ছে। দেখি দেখি, ঝি তোকে একটা পয়সা বেশী দি নি ত? (আবার গণিয়া) না ঠিক আছে। আমরা গরীব মানুষ, টানাটানি না কর্‌লে চল্‌বে কেন?

দাসী। (পয়সা লইয়া যাইতে যাইতে স্বগত) এমন গরীব এ সহরে আর নেই, কাঙ্গাল ভিখিরীর চেয়েও গরীব, টাকা বুকে ক'রে রাখ, সঙ্গে যাবে কি না। সকালবেলা নাম করলে সে দিন পেটে অন্ন জোটে না।

আত্মারাম। ঝি বাজারে গেল? সকালবেলা আমার ওদিককার ঘরের দরজা ঘট ঘট কচ্ছিল কেন?

চন্দ্রাবতী। না, না, ওর মনে কিছু কু ছিল না। বলছিল, ঘরটায় অনেক দিন ঝাঁট পড়ে নি, একবার ঝাঁট দেব কি? আমি বললুম, এখন থাক, এর পর দিলেই হবে।

আত্মারাম। ও ঘরে ওর যাবার কি দরকার, তুমি ঝাঁট দিলেই হবে।

চন্দ্রাবতী। তুমি বোঝ না, অত আঁটা-আঁটি করলে ওর মনে সন্দ হবে যে, ঘরে বুঝি কিছু লুকোনো আছে। আর ওদের পেটে ত কোন কথা থাকে না, কি জানি কি ব'লে বেড়াবে! আমি দাঁড়িয়ে থাকি, আমার সামনে ঝাঁট দেবে, তাতে আর ভয় কি? আর তোমার সিন্দুকে কি আছে, কি আর কোথাও কি আছে, তা তুমিই জান, আমি ত কখনও চক্ষে দেখি নি।

আত্মারাম। কি আর আমার আছে? আমরা ত আর বড় মানুষ নই যে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা থাকবে। কষ্টে-সৃষ্টে যা দু দশ টাকা জমিয়েছি, সে ত তোমারি থাকবে, তার জন্য তোমার ভাবনা কিসের?

চন্দ্রাবতী। তোমার যা আছে, তুমি নিয়ে জন্ম জন্ম ভোগ কর, আমি যেন তোমায় রেখে যেতে পারি, আমার আর কিছু চাই নে।

আত্মারাম। মরণ-বাঁচন ত আর মানুষের হাত নয়, যার যখন সময় হবে, সে তখন যাবে। তবে আমি যদি তোমার আগে যাই, তা হ'লে তোমায় পথে দাঁড়াতে হবে না।

চন্দ্রাবতী। ও সব ছাই—ছাই কথা কি না বললেই নয়? যাই, আমি গিয়ে রান্না চড়াই গে। বাজার ত এখানে নয়, ঝির ফিরতে অনেক দেরী হবে। এখন যা ঘরে আছে, তাই রাঁধি?

আত্মারাম। তুমি তা হ'লে এখন আর এ দিকে আসবে না?

চন্দ্রাবতী। এখন আর এ দিকে কি করতে আসব? তোমার দরকার পড়ে, তুমি ডেকো।

আত্মারাম। তা ডাকব বই কি।

(চন্দ্রাবতীর রন্ধনশালের দিকে গমন। আত্মারাম আর একটা ঘরে গিয়া এ দিক্ ও দিক্ উঁকি মারিয়া দরজা বন্ধ করিলেন)।

আত্মারাম। এখন আর এ দিকে কেউ আসবে না। বাইরের দরজা ত বন্ধ আছে, ঝি এসে শিকল নাড়িবে। (ধীরে ধীরে একটা সিন্দুক খুলিয়া) গিন্নী জানে, আমার যা কিছু আছে, এই সিন্দুকে আছে, সিন্দুকের নীচে যা পোতা আছে, সে তা জানে না। কাজ কি তাকে ব'লে? মানুষের মন বই ত নয়, কখন কার লোভ হয়, বলা যায় না। (সিন্দুকের থলি-গণনা) এই যে ষোলটা ঠিক আছে! (হাসিয়া) সে দিন গিন্নী দেখে ফেলেছিল, মনে করলে বুঝি সব টাকা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আত্মরাম তেমনি বোকা কি না! উপরে টাকা রেখে তলায় যে সব মোহর রেখেছি, তা কেউ জানে না! নীচেকার টালিগুলো সরিয়ে দেখব? না, এখন থাক, রাত্তির বেলা সব নিশুতি হ'লে তখন দেখব।

চন্দ্রাবতী। (বাহির হইতে দরজা নাড়া দিয়া) সকালবেলা দরজায় খিল দিয়েছ কেন? কালকের মুড়ি ছিল, নিয়ে এসেছি, তুমি খাবে না?

আত্মারাম। (তাড়াতাড়ি সিন্দুক বন্ধ করিয়া দরজা খুলিয়া) না, না, কিছু নয়, একবার এই দরজা বন্ধ ক'রে ঠাকুর দেবতার নাম করছিলুম।

চন্দ্রাবতী। তা জানি, তোমার সিন্দুকের ভিতর ঠাকুরদেবতা আছে। এই সময় যদি ঝি এসে পড়ে?

আত্মারাম। বাইরের দরজা ত বন্ধ আছে?

চন্দ্রাবতী। না, শুধু ভেজানো আছে।

আত্মারাম। এমন কাজও করতে আছে? যদি কেউ এসে যথা-সর্ব্বস্ব নিয়ে যায়?

চন্দ্রাবতী। এ ত আর মগের মুলুক নয়! আমরা দু'জনে বাড়ী রয়েছি কি করতে?

আত্মারাম। আর কখন যেন এ রকম না হয়। গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে এস।

(চন্দ্রাবতী দরজা বন্ধ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় বাজারের ঝুড়ি লইয়া দাসীর প্রবেশ)

চন্দ্রাবতী। কেমন বাজার করলি দেখি?

আত্মারাম। পয়সার হিসেব আমাকে বুঝিয়ে দে।

দাসী। রোস বাবু, ঝুড়ি নামাই, বাজার বার করি। কোন্ দিন না তোমাকে হিসেব দি?

আত্মারাম। না, না, তাই বলছি, তুই রাগ করছিস কেন?

দাসী। (ঝুড়ি নামাইয়া) এই ধর মা! বাজারে কি কোন জিনিষে হাত দেবার জো আছে? সবতাতে যেন আগুন লেগে গিয়েছে।

চন্দ্রাবতী। (ঝুড়ি উল্টাইয়া) তাই ত! এ কি বাজারের ছিরি। এর নাম কি আলু? এত টুকু টুকু মটরের মতন?

দাসী। ঐ আবার চার আনা কোরে সের, একটি আধলা কমে দেবে না। মাগীর মেজাজ কত! বলে, খুসী হয় নাও, নইলে আমার আলুতে হাত দিও না। মর গতরখাগী!

আত্মারাম। এই আলু চার আনা ক'রে সের! কাজ নেই আমার আলু খেয়ে! এ রকম বাজার হ'লে ত দু দিনে আমার ভিটে-মাটী বিকিয়ে যাবে!

চন্দ্রাবতী। হ্যাঁ ঝি, এ কোন্ দেশের বেগুন, তাতে আবার কটা কাণা, পোকায় খেয়েছে। বেছে বেছে কি এই রকম জিনিষ আন্‌তে হয়।

দাসী। ঐ কি পড়তে পায়, তবু কত উট্‌কে পাট্‌কে বেছে বুছে এনেচি। তোমরা ত ঘরে ব'সে সব বল, গিয়ে যদি একবার বাজার দেখ, তা হ'লে বুঝতে পার।

চন্দ্রাবতী। তা ব'লে কি পয়সা দিয়ে অমন জিনিষ কিনতে আছে? তুই একবার বুঝে দেখ দেখি, ও বেগুন কি হবে?

আত্মারাম। ও ত আর পয়সাকে পয়সা জ্ঞান করে না, মনে করে, পয়সা বুঝি খোলামকুচি।

দাসী। কাল থেকে বাপু আমি আর বাজার কর্‌ব না। তিন গণ্ডা ত পয়সা, তার জন্যে কি চোরদায় ধরা পড়েছি।

চন্দ্রাবতী। কথায় কথায় তোর রাগ! ভাল মন্দ জিনিষ দেখলেই বলতে হয়। আর গেরস্তর ত পয়সা লাগে। এই দেখ, ডেঙ্গোর ডাঁটা ত বেশ হয়েচে। কুচো চিংড়ী আর দুটো হ'লে হ'ত, আমরা খেতে তিন জন।

দাসী। ঐ কোনমতে দিতে চায় না, আমি কত সাধাসাধি ক'রে নিয়ে এলুম। দিন দিন যেমন হচ্ছে, এর পর আর লোক খেতে পাবে না। যাই, মাছ বাছি গে।

চন্দ্রাবতী। আমিও এই তরকারিগুলো কুটে নি।

আত্মারাম। এমন ক'রে আমি আর কত দিন পার্‌ব। দু দিন পরে পথে দাঁড়াতে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বাপীতট—সায়াহ্ন।

(এক দল যুবতীর প্রবেশ)

(গান)

ওলো বল্‌ব কত আমার মিন্সের যত গুণ,
শুনিস্ যদি তোরা সবাই হেসেই হবি খুন।
ও তার গুণের নাইক কোন সীমে,
সারা রাত ঘুরে বেড়ায় হিমে হিমে,
আর দিনের বেলা ব'সে ব'সে বাছে লো উকুন!
ও তার গুণের বালাই
নিয়ে ম'রে যেন যাই,
বাপ বল্‌তে শালা বলে,
জ্বলে ওঠে তেলেতে বেগুন!
কুকুর দেখলে করে তাড়া,
ছুটে আসে চাঁড়ালপাড়া,
আর খাবার বেলা পান্তা ভাত তাতেও নেইক নুণ!

প্রথম যুবতী (শরৎশশী)। আচ্ছা ভাই উমাতারা, কি কপাল নিয়েই জন্মেছিলুম!

উমাতারা। দেখে শুনে বাপ-মা বিয়ে দিয়েছিল বটে। হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলে বরং ছিল ভাল। কেমন নিস্তারিণি?

নিস্তারিণী। সে কথা আবার বল্‌তে! এমন দিন যায় না যে, চক্ষের জল না ফেলে দুটো ভাত খাই।

কুমুদিনী। বেছে বেছে আমাদেরি কপালে এমন জুটেছিল?

শরৎশশী। যা বলেছিস্। আরো ত এত মানুষ আছে, দুঃখে সুখে যেমন ক'রে হয় দিন যায়। ভগবান্ কি আমাদেরই অদেষ্টে এত সুখ লিখেছিলেন?

কুমুদিনী। আমার যে উনি, তাঁর ত টিকিটি দেখবার জো নেই। কেবল ভাত খাবার বেলা সুড়সুড়িয়ে এসে হাজির। তা আবার মুখে কড়কড়ে ভাত রোচে না, সব গরম গরম চাই। আজ মোচার ঘণ্ট নেই কেন, কাল মাছের মুড়ো নেই কেন, পরশু অম্বল হয় নি কেন! যেন নবাবের নাতি এলেন কি বড় তরফের জমীদার এলেন। এ সব আসে যে কোত্থেকে, তার খোঁজ নেই, তার ওপর আবার মেজাজ কত! একটা কথা বল্‌লে ফর্‌ফরিয়ে চ'লে যাওয়া হয়। তা

যাবার কি কোন চুলো আছে, যেখানে গিয়ে রাগ কোরে দু দিন থাকবে? আবার সেই কুকুরের মত ল্যাজ গুটিয়ে আসে, তখন আর মুখে রা নেই, যা পায়, তাই সোনা হেন মুখ ক'রে খায়। কিন্তু এমন ক'রে আমি চালাব কত দিন? বাপের বাড়ীর যা দুখানা গায় ছিল, তা ত বাঁধা পড়েছে, কোন্ দিন মাথার ওপর ঘরখানা বিকিয়ে যাবে।

উমাতারা। তোরা ভাই সইতে পারিস্, আমার আর সহ্য হয় না। মানুষের শরীর বই ত নয়। অনেক দিন সহ্য করেছি, আর করি নে। এখন একটা বললে দশ কথা শুনিয়ে দি। সে দিন আচ্ছা ক'রে থুড়ে দিয়েছিলুম। সেই অবধি মিন্সে পালিয়ে বেড়াচ্চে, কিছু না বলতে পেয়ে আমার জিভ মরচে প'ড়ে ভোঁতা হয়ে গিয়েছে।

শরৎশশী। ঢের ঢের বেহায়া দেখিছি, এমন বেহায়া পুরুষমানুষ কোথাও দেখি নি। যদি মাগছেলে খাওয়াবার ক্ষমতা নেই, তা হ'লে বিয়ে করতে গিয়েছিলি কেন? ভাগ্যিস ছেলেপুলে হয় নি, তা হ'লে আমার দশাটা কি হ'ত বল দেখি? এত দিনে কবে বিষ খেয়ে মরতাম।

নিস্তারিণী। এ দিকে ত পেটে ভাত জোটে না, কিন্তু মদটুকু নইলে নয়। তার পয়সা আসে কোত্থেকে? কাল কি হয়েছিল জানিস্? কটাতে মিলে মদ গিলে রাস্তায় বেলেল্লাগিরি করছিল. কোটাল না তাই দেখতে পেয়ে তার লোকদের হুকুম দিলে মারতে। যেই বলা, আর অমনি বেদম ঠেঙ্গিয়ে দিয়েছে। মিন্সে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ীতে এসে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে কাতরা-কাতরি করতে লাগল। পিদ্দীম ধ'রে দেখি, বুকে পিঠে চারিদিকে কালশিরে পড়েছে, মাথায় দিয়েছে এক ঘা বসিয়ে, সেখানটা তালের আঁঠির মত ফুলে উঠেছে। কি করব বল্, আমি আবার চুণ-হলুদ গরম ক'রে লাগিয়ে দি। আজকে সর্ব্বাঙ্গে ফোড়ার ব্যথা, ভয়ে আর বাড়ী থেকে বেরোয় নি। আমি শাসিয়েছি যে, আবার কোন দিন মুখে গন্ধ পেলে কোটালকে ব'লে দেব। আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করলে যে, আর কখন শুঁড়ীর দোকানে ঢুকবে না, সে রাস্তা মাড়াবে না। যেন সে মানুষই নয়।

কুমুদিনী। তুই কি ওর কথা বিশ্বেস করিস্ না কি? দু দিন ভিজে বেরালের মত থাকবে, আবার গায়ের ব্যথা মরলেই যে কে সেই! ও পোড়া বিষ ধরলে আর রক্ষে নেই।

উমাতারা। আমরা সব নিজের জ্বালায় মরি, অন্য কথা মনেই আসে না। আমাদের যেন এই দুঃখের দশা, পোড়া কপাল, কিন্তু রাজার ঘরে যে কাণা কড়া নেই, তার কি হবে বল্ দেখি?

শরৎশশী। হবে আবার কি! দেশের লোক না খেতে পেয়ে মরবে আর রাজাকে কোন্ দিন বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যেতে হবে।

নিস্তারিণী। না লো, না, রাজার রাজ্যি কি অত সহজে যায়? কত ফন্দী হবে, কত পরামর্শ হবে, আবার কোথা থেকে হয় ত টাকা-কড়ি নিয়ে আসবে। এত বড় যার রাজ্যি, তার কি আমাদের মত দশা হয়? কিন্তু রাজার কি আক্কেল! যদি কোন বুদ্ধি থাকে!

কুমুদিনী। তোর ত মুখ ছুটলে আর রক্ষে নেই। যদি কেউ শুনতে পায়?

নিস্তারিণী। পেলেই বা! আমার বয়ে গেল। আড়ালে রাজার মা'কেও ডাইনী বলে।

উমাতারা। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে করিয়ে দিলি। আচ্ছা, ভাই, সহরশুদ্ধ লোকে ত সকলের চর্চ্চা করে, রাণীর কথা ত কেউ বলে না!

শরৎশশী। সত্যি ভাই, এ বড় আশ্চয্যি কথা! রাণী না কি রূপে-গুণে সমান, এ রাজার সত্যি রাজলক্ষ্মী, কিন্তু রাজার বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই ব'লে তিনি আর কিছুতে থাকেন না। সব সময় পুজো-আর্চ্চা নিয়েই থাকেন। রাজরাণী ব'লে এতটুকুও অভিমান নেই, যার ইচ্ছে তাঁর কাছে যেতে পারে।

উমাতারা। চল্ না ভাই, আমরা গিয়ে তাঁকে আমাদের দুঃখের কথা বলি।

শরৎশশী। আমাদের দুঃখু, রাজরাণী তার কি করবে? এ কি দু মুটো চাল দিলে, না দুটো টাকা ঝনাৎ ক'রে ফেলে দিলে, অমনি দুঃখু যাবে? যদি কেউ ঢেলে মেপে দেয়, তা হ'লেও আমাদের দুঃখু যাবে না। যাদের জন্য এমন দশা, তাদের ত ছাড়াতে পারব না। এ যে লল্লাটের লিখন! "আমি যাই বঙ্গে, কপাল যায় মোর সঙ্গে!"

কুমুদিনী। এখানে আর দাঁড়িয়ে কি হবে? অপর লোক দেখলে দু'টো কথা শুনিয়ে যাবে। ঘরেও ত সুখের অধিবধি নেই। তবুও সেই ঘর করতেই হবে। চল্, এখন যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ—মধ্যাহ্ন।

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

প্রথম নাগরিক। দেশটার হবে কি ?

দ্বিতীয়। হবে আবার কি ? যা হবার, তাই হবে।

তৃতীয়। আমি হ'লে ত এমন দেশ ছেড়ে যাই।

চতুর্থ। তা তল্পী-তল্পা বাঁধ্ না, কে তোর পায় ধ'রে সাধাসাধি কর্‌ছে যে, তোকে এখানে থাক্‌তেই হবে ?

তৃতীয়। এ কি তামাসার কথা না কি ?

চতুর্থ। অমনি গরম। তুই কি আমার সম্বন্ধী যে, তোর সঙ্গে তামাসা করব ?

পঞ্চম। আরে থাম্ না; কথাটা কি হচ্ছে শুনি। তোদের যেন আদা-কাঁচকলা, একটা কথা হ'লেই বেধে যাবে।

প্রথম। কথাটা এই যে, দেশে যে এত কাণ্ড হচ্ছে, তার কেউ কিছু বিবেচনা না করলে ত বড় মুস্কিল, শেষ কি সব ছারেখারে যাবে ?

তৃতীয়। তার তুই বা কি কর্‌বি আর আমরাই বা কি কর্‌ব ?

প্রথম। তা কি সব মুখ বুজে চুপ কোরে থাক্‌ব ?

দ্বিতীয়। তা না হয় মুখ হাঁ ক'রে প্রাণপণে চেঁচা। তার পর কোটালের গুঁতো কেমন টের পাবি। এ কি তোদের পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপ পেয়েছিস্ না কি ?

প্রথম। তা এ ত সত্যি আর মগের মুল্লুক নয় যে, মানুষে পথ চল্‌তে কথা কইতে পাবে না।

চতুর্থ। তাই নাই বা হ'ল, কিন্তু এটা রাজপথ ত বটে, রাজপথে রাজার কি রাজার লোকেদের কথা কইবার দরকার কি ?

প্রথম। রাজা আর রাজ্যি যদি গোল্লায় যায়, তা হ'লে বল্‌ব না ?

তৃতীয়। তবে যা মুখে আসে, তাই বল্, আমরা স'রে পড়ি। "চাচা আপন বাঁচা।"

পঞ্চম। আরে, ওকে কি তেমনি বোকা পেলি না কি ? তোর ভয় আছে ওর ভয় নেই ? ধরা ছোঁয়া দেবার মত কোন কথা বল্‌বার পাত্র নয়

প্রথম। পরাণ মণ্ডলকে কি তোরা তেমনি হ্যাকা পেয়েছিস্ ? 'ধরি মাছ না ছুঁই পানী।' তবে যখন বড্ড অন্যায় দেখি, বুকের ভেতর হাঁপিয়ে ওঠে, তখন দু চার কথা না ব'লে থাকা যায় না। কি বলিস্ নিতাই ?

দ্বিতীয়। ও ত একেবারে নির্ঘাত কথা, ওর ওপর কিছু বলবার নেই।

প্রথম। পেটের ভেতর কথা চেপে রেখে গুমুরে গুমুরে থাকলে কি বিপদ কেটে যায় ? যখন দেখছি দেশের বিপদ, রাজ্যির বিপদ, তখন মুখ ফুটে বল্‌তেই হবে। এমন অবস্থায় চুপ ক'রে থাকা মহাপাপ।

দ্বিতীয়। শুনেছিস্, পরাণ মণ্ডল যখন একটা বড় কথা কয়, তখন ঠিক যেন পুঁথি পড়ছে।

চতুর্থ। যা বলেছিস, পরাণের কথা লাখ কথার এক কথা। আমি যদি রাজা হতুম, তা হ'লে ওকে মন্ত্রী করতুম।

তৃতীয়। যেমন রাজা, তেম্নি মন্ত্রী। এবার পাঁজিতে তোদের নাম উঠবে।

পঞ্চম। এত কথা ত হ'ল, কিন্তু আসল কথাটা কি, তা ত এখনো শুনতে পেলুম না।

প্রথম। তাই ত এতক্ষণ ধ'রে বলছি। আর কথাটা কেই বা না জানে ? এ ত আর ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় নয় যে, রেখে ঢেকে বল্‌তে হবে ? তোরা ত সকলেই দেখতে পাচ্ছিস্ যে, দেশের ছেলেগুলো কিচ্ছু করে না, গেরস্ত সংসার দেখে না, দোকান-পসারীর ব্যবসায় মন নেই, পুরুষেরা যে যার আড্ডা মারছে, মাগীদের কোঁদোল ছাড়া আর কোন কাজ নেই, তা ঘরকন্না চুলোয় যাক্ আর সংসারের মুখে আগুনই লাগুক্। দেশের যিনি রাজা, তিনি ত একটি আস্ত হনু—

আর সকলে। ওরে থাম্ থাম্, তোর কি একেবারে কাণ্ডজ্ঞান নেই ?

প্রথম। না হয় কথাটা নাই বল্‌লুম, কিন্তু সকলেই ত মনে মনে বলে। রাজাই যদি রাজার মত হবে, তা হ'লে দেশের এমন দশা হবে কেন, এমন মন্ত্রী আর এমন কোটালই বা এসে জুটবে কেন ?

পঞ্চম। একেই ত বলে মূলে হাবাৎ। তবু ত সকলের মুখে শুন্‌তে পাচ্চি যে, রাণী খুব বুদ্ধিমতী, তাঁর কথায় যদি রাজা চল্‌তেন, তা হ'লে দেশের এমন দুরবস্থা হ'ত না।

তৃতীয়। অথচ রাজার যে কোন বিশেষ দোষ

আছে, তাও নয়। নিজে কোন রকম অন্যায় করেন না, কারুর ওপর অত্যাচার করেন না। ঘটে বুদ্ধি নেই, ঐ যা দোষ। আর পরামর্শ দেবার লোকগুলোও জুটেছে তেমি।

চতুর্থ। মন্ত্রণা দেবার লোক যদি ভাল হয়, তা হ'লে আর ভাবনা কি? লোক বাছাই ক'রে যদি রাজ্যের কাজ তাদের হাতে দেওয়া যায়, তা হ'লেই রাজ্য ঠিক চলে। তাইতে ত রাজার বুদ্ধি বোঝা যায়।

দ্বিতীয়। তা আর বল্‌তে? কেষ্টো যখন মথুরায় গিয়ে রাজা হলেন, তখন কি ব্রজ থেকে রাখাল সঙ্গীদের নিয়ে গিয়ে মন্ত্রী আর কোটাল করেছিলেন?

প্রথম। কার সঙ্গে কার তুলনা? কোথায় মথুরাপতি কেষ্টো স্বয়ং ভগবান্ আর কোথায় এই পোড়া দেশের হবুচন্দ্র রাজা!

চতুর্থ। ওরে, অমন ক'রে মুখ ছুটোস্ নে। শেষে কি সকলে শূলে যাব?

প্রথম। অ্যাম্‌নেও যেতে বসেছি, অমনেও না হয় যাব। সত্যি কথা বল্‌লে যদি শূলে দেয়, তা হ'লে তাই হবে। হক্ কথা বল্‌ব, তা কপালে যাই থাক্।

দ্বিতীয়। বটেই ত, আর ত রোজ রোজ চোখের ওপর এমন দেখতে পারা যায় না।

প্রথম। আজ কি না চুরী হ'ল, তা চোর ধরা পড়বার নাম নেই! কাল খুন হ'ল খুনী, যে কোথায় পিট্টান দিলে, তার কোন সন্ধানই নেই। কোথাও ডাকাতি, কোথাও আত্মহত্যা, কোথাও গেরস্ত-ঘরের ঝি-বউ বেরিয়ে যাচ্ছে, তা যেন কিছুই কোথাও হয় নি। তার ওপর কোটাল গিয়ে অম্লান মুখে রাজসভায় এই সব কথা রাজাকে জানায় আর বলে যে, দেশে দিব্যি শান্তিরক্ষা হচ্ছে। সভার মাঝখানে খোষামুদেগুলো বলে, কোটালকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। আর যিনি মন্ত্রী, তাঁর পেটটি যেমন মোটা, বুদ্ধি তার চেয়েও মোটা, ব'সে ব'সে মাথা নাড়েন যেন, তাঁর মাথার ভিতর বুদ্ধির শিকড়গুলো ঝাঁকানি দিচ্ছে। ও দিকে যে তবিলে কিছু নেই, রাজা আর রাজ্যি দেউলে হবার সামিল হয়েছে, মন্ত্রী মশাই তার কোন খোঁজ রাখেন না। যখন রাজা মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লেন, তখন বুদ্ধি যোগাল কার, না বিদূষকের। সে চিরকাল ভাঁড়ামি করে আর ফষ্টি নষ্টি করে, তার সমান বুদ্ধিমান কে? রূপণেরই টাকা নাও আর যারই টাকা কেড়ে নাও, সে ত লুঠ বই আর কিছু নয়। প্রজারে করে কুলুলো না, এখন প্রজাকে লুটে রাজকোষে টাকা আস্‌বে। এমন রামরাজ্যি কেউ কখনো দেখেছে?

তৃতীয়। ওরে, আর কোন কথায় কাজ নেই, মন্ত্রীর সেই বেঁটে চরটা আস্‌ছে। চল্, আমরা নিজের নিজের পথ দেখি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

—*—

প্রথম দৃশ্য

কোটালের গৃহ—অপরাহ্ণ।

ঘরের রোয়াকে বসিয়া কোটাল-জায়া জগদম্বা চুল বাঁধিতেছেন।

জগদম্বা। ঝি, ও হরের মা, কোথায় তুই?

(নেপথ্যে) এই যে মা ঠাকরুণ, তোমার কাপড়খানা তুলে আসছি।

(হরির মা'র প্রবেশ)

হরির মা। কি বলছ, মা ঠাক্‌রুণ?

জগদম্বা। আমার ত চুল বাঁধা হ'ল। নাপতিনী এখনো এল না? আজ যে আমার কামাবার দিন।

হরির মা। এই এল ব'লে বোধ হয়, আর কোন বাড়ী কামাতে গিয়েছে।

জগদম্বা। আমি কি তার জন্য ব'সে থাকব না কি? অন্য বাড়ী আর এ বাড়ী সমান হ'ল? জান না, এ কার বাড়ী?

হরির মা। তা আর কে জানে না মা? নাপতিনী কি আর ইচ্ছে ক'রে দেরী করছে? পাঁচ বাড়ী খেটে খায়, হয় ত কোথাও একটু বেশী কাজ হয়েছে। তাতে এখন লগনসা কাল, অনেক বিয়ে, হয় ত কোন বাড়ী এয়ো-কামান আছে, তাইতে একটু দেরী হচ্ছে।

জগদম্বা। কেন না, নাপতিনী তোর কে হয় যে, তার জন্য অত ছুতো-নাতা করছিস? আসুক সী, তখন তাকে দেখাব মজা!

হরির মা। নাপতিনী আমার আবার কে হবে? আমি যাই, বিছানা পাতি গে।

[প্রস্থান।

(আলতা চুবড়ী হস্তে নাপিতানীর প্রবেশ)

জগদম্বা। হাঁ লা, নাপতিনী, আমার কি আর কোন কাজকর্ম্ম নেই যে, তোর কখন্ ফুরসৎ হবে, সেই পথ চেয়ে আমি ব'সে থাকব?

নাপিতানী। কি করব মা, আজ বাগচীদের বাড়ী এধোকামান কি না, অনেকগুলি সধবা, তাই দেরী হয়ে গেল।

জগদম্বা। ও সব কোন ছুতো আমি শুনতে চাই নে। এ কি যার তার বাড়ী পেয়েছিস্ যে, আমাকে বসিয়ে রাখবি?

নাপিতানী। আন্য দিন ত তোমার বাড়ী আগে আসি। দৈবাৎ আজ একটু দেরী হ'ল বিয়ে-বাড়ীর জন্য, তা আমাকে মাপ কর। আর কখন এমন হবে না।

জগদম্বা। জানিস্ নে যে, আমার এক কথায় তোর মাথা মুড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে দিয়ে সহর থেকে বের ক'রে দিতে পারে?

নাপিতানী। এত কাল তোমার বাড়ী কাজ কর্‌ছি মা, কখন ত কোন অপরাধ করি নি। এখন এই বুড়ো বয়সে যদি দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও, তা হ'লে না খেতে পেয়ে মর্‌ব। (রোদন)

জগদম্বা। নে, এখন তোর কান্না রাখ্। সন্ধে-বেলা চোখের জল ফেলে বাড়ীর অকল্যাণ করিস্ নে। দেখিস্ যেন নোক কাটতে রক্ত না পড়ে?

নাপিতানী। (ঝামা দিয়া জগদম্বার পা ঘষিতে ঘষিতে) সত্যি ত এখনো আমি অন্ধ হই নি। তোমাদের অন্ন খেয়ে আমরা মানুষ, তাই দূর-ছাই কর্‌লে দুঃখু হয়।

[জগদম্বাকে আলতা পরাইয়া নাপিতানীর প্রস্থান।

(কোটালের প্রবেশ)

জগদম্বা। আজ যে তুমি এমন সময়?

কোটাল। কেন, এমন সময় কি আসতে নেই?

জগদম্বা। তা নয়, তবে এই সময় নগরের সব দেখতে শুনতে হয় ত? বিকেলবেলা আর রাত্তির বেলাই ত তোমার বেশী কাজ।

কোটাল। জগা পোদ্দার আসে নি? সে যে এক ছড়া হার দিয়ে যাবে বলেছিল?

জগদম্বা। কই, কেউ ত আসে নি। এখন ত আগের মত বড় একটা কেউ আসেও না।

কোটাল। কেনই বা আস্‌বে? এত দিন শরীরপাত ক'রে ত পুরস্কারের মধ্যে বিদূষক আমার উপর হ'ল, তার হুকুমে হাজির থাক্‌তে হবে। রাজার এম্নি বিচার বটে!

জগদম্বা। তোমার যদি যোগ্যতা থাকত, তা হ'লে আর এমন হ'ত না। রাজা কি আর না বুঝে সুঝেই বিদূষকের হাতে অত বড় একটা কাজ দিয়েছেন? বিদূষক সং হোক আর ভাঁড় হোক, তার ঘটে বুদ্ধি আছে। তুমি যে ঢেঁকিরাম, রাজার দোষ দিলে কি হবে?

কোটাল। (চীৎকার করিয়া) কে আমার এমন কথা বল্‌তে পারে? এত বড় সহরটা এত কাল শাসন কল্লে কে? সহরে যত বদমায়েস আছে, আমার ভয়ে তটস্থ। হ'ত রাজার মত রাজা, তা হ'লে আমার কদর বুঝত!

জগদম্বা। (কোটালের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া) মেগের কাছে পেগের বড়াই! উনি ত ভারি একটা মস্ত লোক, তাই লোকে ওঁকে ভয় করবে। মনে নেই, একটা বুনো পাহাড়ীর হাতে একটা ভোঁতা ছোরা আর তোমার হাতে খাপখোলা তরওয়াল, তবু সে তাড়া কর্‌তেই তুমি বাপ বাপ ক'রে পালাবার পথ পাওনি? সহর শুদ্ধ ঢিঢি প'ড়ে গিয়েছিল, সকলে বলছিল, এমন বীর ভূভারতে কখনো জন্মায় নি। তুমি আর জিয়াদা কথা কয়ো না, তা হ'লে অনেক শুনতে হবে।

কোটাল (নরম সুর) লোকেরা সব পাজি, অমন কত কি বটায়। বলুক দেখি আমার সামনে কেউ ও রকম কথা?

জগদম্বা। তা জানি গো জানি, তা হ'লে তুমি তোমার ডালকুত্তোগুলো লেলিয়ে দেবে। তাতেই বা তোমার পউরুষটা কি?

কোটাল। এ রকম রোজ রোজ আমার ভাল লাগে না। ও দিকে রাজা ত লোকের মান রাখতে জানে না, আর বাড়ী ঢুকলেই মুখনাড়া। চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে আমি কোথাও চ'লে যাব!

জগদম্বা। তুমি কেন যাবে, আমি কালই মাসীর বাড়ী চ'লে যাব।

(জগদম্বা ফর্‌ফর্ করিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। কোটাল বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজসভা—দিবারম্ভ।

পূর্ণ সভায় রাজা আসীন।

রাজা। কেন মন্ত্রী, এখন রাজকোষে অর্থাভাব নেই ত?

মন্ত্রী। (অভিবাদন পূর্ব্বক) না, মহারাজ, ভগবানের কৃপায় ও মহারাজের প্রতাপে এখন রাজকোষ পূর্ণ।

রাজা। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন। কার বুদ্ধিতে?

মন্ত্রী। তা ত কারও অবিদিত নেই। সকল প্রশংসাই বিদূষকের প্রাপ্য। বিশেষ আত্মারামের গৃহে যে এত লুক্কায়িত অর্থ ছিল, তা আর কেউ জানত না। আমাদের সকলের ত্রুটি আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। মহারাজের যে পদে অভিমত হয়, বিদূষককে উন্নত করতে পারেন।

বিদূষক। দোহাই, মহারাজ, আমি কোন পদের প্রার্থী নই, আর আমার বর্ত্তমান পদ ত্যাগ করতেও প্রস্তুত নই। আমরা সকলেই আপনার আশ্রিত, আপনার ও রাজ্যের কর্ম্ম করা আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য। মন্ত্রী মহাশয়ের অধীনে থেকে আমি যে তাঁর সামান্য কর্ম্ম করতে পেরেছি, এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

রাজা। সাধু, বিদূষক, সাধু!

(অসংযত উষ্ণীষ, শিথিল বেশ ও উদ্‌ভ্রান্ত মূর্ত্তি কোটালের সহসা প্রবেশ)

কোটাল। মহারাজ, সমূহ বিপদ উপস্থিত?

(সভাস্থ সকলে সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন)

রাজা। কি বিপদ? নগরে কোনরূপ উপদ্রব হয়েছে?

কোটাল। মহারাজ, চাঁদ চুরী গিয়েছে!

রাজা। এ কেমন কথা?

কোটাল। আমি সত্য নিবেদন করছি।

মন্ত্রী, অমাত্য প্রভৃতি। আকাশের চাঁদ?

রাজা। আকাশের চাঁদ চুরী গিয়েছে?

কোটাল। না, মহারাজ, ঘরের চাঁদ।

রাজা। বল কি? ঘরের চাঁদ?

কোটাল। আজ্ঞা, হাঁ, মহারাজ, ঘরের চাঁদ।

বিদূষক। সর্ব্বনাশ! আকাশের চাঁদ হ'লে বরং—

মন্ত্রী। ঠিক কথা! আকাশের চাঁদ হ'লে বরং—

সভাসদ। তা হ'লে ত কোন গোলই হ'ত না! আকাশের চাঁদ হ'লে—

রাজা। সে কথাই ত! আকাশের চাঁদ চুরী হ'লে আমরা কি করতে পারি?

কোটাল। মহারাজ, তা ত নয়, এ যে ঘরের চাঁদ!

রাজা। তাই ত! এ যে বিষম সমস্যা! প্রহরীরা কি করছিল?

কোটাল। মহারাজ, প্রহরীরা সকলে নিজের নিজের স্থানে সতর্ক ছিল।

মন্ত্রী। তা হ'লে চুরী হ'ল কেমন কোরে?

বিদূষক। কেমন কোরে আবার? প্রহরীরা ত সর্ব্বদাই সতর্ক থাকে, তবে নিত্য চুরী, ডাকাতি, খুন হয় কেমন কোরে? এত দিনে কোটাল মহাশয়ের ঘুম ভাঙল!

রাজা। আমি একবার অন্তঃপুর থেকে আসছি। আপনারা সভায় না থেকে মন্ত্রণা-গৃহে এ ব্যাপারের তদন্ত করুন।

[রাজার প্রস্থান। আর সকলের মন্ত্রণা-গৃহে গমন।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্ত্রণা-গৃহ।

মন্ত্রী, কোটাল, অমাত্য, সভাসদ, বিদূষক প্রভৃতি।

মন্ত্রী। কোটাল, এ ত বড় বিস্ময়জনক ব্যাপার! চাঁদ চুরী যায়, আমি ত আজ পর্য্যন্ত কখনো শুনি নি!

কোটাল। কেই বা শুনেছে? একটা অভাবনীয় কাণ্ড না হ'লে আমিই বা ছুটে রাজসভায় আসব কেন?

মন্ত্রী। আপনার সঙ্গে খাতাপত্র আছে? নগরের সমস্ত সামগ্রীর একটা তালিকা ত থাকা আবশ্যক।

কোটাল। তা আর নেই? প্রতিহারী, আমার কর্ম্মচারী কাগজপত্র নিয়ে রাজদ্বারে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে ডেকে নিয়ে এস ত!

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

বিদূষক। আত্মারামের গুপ্ত ধনের তালিকা আছে?

কোটাল। মন্ত্রী মশায়, এটা কি বিদ্রূপের সময়?

মন্ত্রী। এখন ও কথা থাক্।

(বড় বড় বাঁধান খাতা লইয়া কোটালের কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

কোটাল। এই দেখুন, আমার সব পাকা কাজ! সব ফর্দ্দ মজুত। দেখ ত হে সমারাম, সমস্ত মালের ফর্দ্দ দেখ ত!

কর্ম্মচারী। এই যে মশায়! (জিহ্বায় অঙ্গুলী দিয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে) অ—অ—অ—অ—

বিদূষক। অ—তে কি দেখছ? অ—তে অজগর না অগাকাণ্ড?

কোটাল। তুমি ত মহা মুর্খ হে! তাই কোন্ আমায় জিগ্‌গেস করলে! চ দেখ না, চাঁদ—চাঁদ চুরী গিয়েছে, জান না?

কর্ম্মচারী। তা জানি বই কি, হুজুর! এই যে চ—১—চ— চরকা, চসমা। চা—চা—চা—চাউল, চাকা, চাচা—এইবার হয়েছে ধর্ম্মাবতার—চাঁদ, চাঁদ, অমাবস্যার চাঁদ, কালাচাঁদ, গোরাচাঁদ নদেরচাঁদ, নষ্ট চাঁদ, পূর্ণিমার চাঁদ, ফটিকচাঁদ, রূপচাঁদ, শ্যামচাঁদ।

কোটাল। আরে, ও সবে কাজ নেই, ঘরের চাঁদ দেখ না!

কর্ম্মচারী। কই হুজুর, তা ত খুঁজে পাচ্ছি নে। ঘরের চাঁদ নেই।

কোটাল। তুমি ত আচ্ছা উল্লুক হে! নেই ত চুরী গেল কোত্থেকে?

কর্ম্মচারী। তা হুজুর, আমি কি জানি? খাতায় ত লেখা নেই।

বিদূষক। এম্নি খাতা বটে!

মন্ত্রী। যাও হে যাও, তোমার পুঁথি-পাঁজি নিয়ে যাও। ওকে চোখ্ রাঙালে আর কি হবে?

[খাতাপত্র লইয়া কর্ম্মচারীর প্রস্থান।

মন্ত্রী। কোটাল মশায়, আমি আপনার কর্ম্মের ব্যবস্থার প্রশংসা করতে পারছি নে। আপনার তালিকাতে ত ঘরের চাঁদ নেই। আপনি সত্বর গিয়ে নগরে ঘরে ঘরে তল্লাস করুন। মহারাজ বোধ হয় মহারাণীর সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছেন। তিনি এলে তাঁকে আমি কি বলব? আপনি শীগ্‌গির এর একটা কিনারা করুন, তা না হ'লে আমাদের সকলের অত্যন্ত দুর্নাম হবে।

কোটাল। মশায়, তা ত আমি বেশ বুঝতে পারছি। এখনি গিয়ে নগরে সব খানাতল্লাসী করছি।

মন্ত্রী। সেই কথা ভাল। আর বিলম্ব করবেন না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজপথ—মধ্যাহ্ন।

কোটাল, অমাত্য, সভাসদ, বিদূষক, প্রহরিগণ, নাগরিকগণ ও রমণীগণ।

কোটাল। সব বাড়ী বাড়ী খানাতল্লাসী হয়েছে?

এক জন প্রহরী। হাঁ হুজুর, কোন বাড়ী ফাঁক যায় নি। কোথায় ত কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। আর বাড়ী বাড়ী স্ত্রীলোকেরা আমাদের এমন নাস্তানাবুদ করেছে যে, আর বলবার কথা নয়।

কোটাল। কি, আমার লোককে অপমান?

প্রহরী। না, না, এমন ঠাট্টা-তামাসা যে, বাড়ী তল্লাস ক'রে আমরা পালাবার পথ পাই নে।

কোটাল। হুঁ, এই ঠিক ঠাট্টার সময় কি না?

সভাসদ। মেয়েমানুষের কথা ছেড়ে দাও।

ভিড়ের মধ্যে কোন রমণী। শুধু তা কেন? মেয়েমানুষগুলোকে একেবারে ছেড়ে দাও না কেন, তা হ'লে তারা ত বাঁচে! এ দিকে আমরা না হ'লে ত এক দণ্ড ঘরও চলে না!

কোটাল। ও সব কথায় কান দিয়ে কাজ নেই। চুরী হ'ল, অথচ তার কোন সন্ধান নেই, এ কি রকম কথা?

বিদূষক। তাই কি খোঁজ হচ্ছে না? কোটাল মশায়, যদি অভয় পাই ত একটা কথা বলি।

কোটাল। তোমার ত মস্কারামি গেলেই আছে। তোমার উপর রাজা সদয়, মন্ত্রী সদয়,

যা ইচ্ছে বল্‌তে পার, যা ইচ্ছে কর্‌তে পার। আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করা কেন?

বিদূষক। বলছিলাম কি যে, ঘরের চাঁদ ত চুরী গেল, কিন্তু কার ঘর থেকে গেল, কে নালিশ করলে তার কোন হিসাব আছে?

কোটাল। তা না হ'লে আর এত বড় কথাটা আমার কাছে আসে? (প্রহরীকে) হাঁরে, কার নালিশ, কার ঘর থেকে চুরী গেল?

প্রহরী। তা ত আমি বল্‌তে পারছি নে, হজুর। রামভজ তেওয়ারী, তুমি জান, থানায় কে খবর দিয়েছিল?

রামভজ। হমকো কেয়া মালুম?

কোটাল। এই যে থানার কর্ম্মচারী! বলি, হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে? কথার জবাব দিতে পার না? কার চুরী গিয়েছে আর কে নালিশ কর্‌লে?

কর্ম্মচারী। আমি কি কোরে জান্‌ব? আমি ত সকালবেলা থানায় ছিলাম না, আপনার জন্য গল্‌দা চিংড়ী আন্‌তে গিয়েছিলাম।

কোটাল। কেউ জানে না, কেউ নালিশ করে নি, তা হ'লে এ কথা আমার কাছে এল কোথা থেকে, আর আমি বা রাজসভায় বল্‌তে গেলাম কেন?

(প্রহরিগণ, কোটালের কর্ম্মচারিগণ ও অনুচরেরা মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল)

বিদূষক। ঐ ত মজা! যখন বলে কাকে কান নিয়ে গেল, তখন কি সত্যি সত্যি কাকে কানটা নিয়ে যায়?

কোটাল। তবে এর মানে কি? কোথাও কিছু হয় নি, অথচ এত বড় একটা গোলমাল? আমার সঙ্গে তামাসা? কার এমন আস্পর্দ্ধা যে, আমার সঙ্গে তামাসা করে?

বিদূষক। তাই বা জানে কে? তা হ'লেই ত সব ধরা প'ড়ে যাবে।

কোটাল। (তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া) আমার সঙ্গে চালাকি? কে এমন মিথ্যা কথা রটিয়েছে। শীগ্‌গির বল, তা না হ'লে আমি বেতপেটা ক'রে সকলের পিঠের চামড়া তুলে দেব।

বিদূষক। কোটাল মশায়, রাগ কর্‌ছ কেন? (রমণীদিগকে দেখাইয়া) দেখছ না চাঁদের হাট? এমন চাঁদ চুরী কর্‌তে কার না ইচ্ছে করে? সেকালেও চাঁদ চুরী হ'ত, তা কি শোন নি? এই যে সুন্দরীরা এঁরাই চাঁদ চুরী কর্‌তেন। বিদ্যাপতি ঠাকুর কি ব'লে গিয়েছেন, জান না?

"অম্বরে বদন ঝপাবহ গোরি।
রাজ সুনইছিঅ চাঁদক চোরি॥
ঘরে ঘরে পহরী গেল অছ জোহি।
অবহী দুখন লাগত তোহি॥
কতএ নুকাএব চাঁদক চোর।
জতহি নুকাওব ততহি উজোর॥"

(রমণীদিগের মুখে কাপড় দিয়া হাস্য)

যবনিকা পতন

সম্পূর্ণ

শ্যামার কাহিনী

ও

অন্যান্য নক্‌সা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

১৯—৫৮

শ্যামার কাহিনী

ময়রা দিদির যেমন কথা!

বোসেদের বাড়ী আমি কর্ম্ম করি—এই অগ্রহায়ণ মাসে দু'বছর হবে। বোসেরা মস্ত বড়-মানুষ, আমার মতন এমন আর চার জন ঝি আছে। আমি বাবুদের কোলের ছেলেটিকে মানুষ করি। গলির মোড়ে ময়রার দোকান, সকালে বিকালে ছেলেদের জন্য জলখাবার কিনে নিয়ে আসি। ময়রা বুড়ো, পায়ে গোদ, ঘরের ভিতর তক্তপোসে ব'সে ব'সে কাসে। ময়রা দিদি যেন পাকা আমটি, পাকা চুলে চ্যাটালো কোরে সিন্দুর পরে, পাড়ার ঝি-চাকরের সঙ্গে তামাসা করে। মিঠাই বেচে বেচে মাগীর মুখখানিও যেন মিষ্ট হয়ে গিয়েছে। আজকে এই খোকাকে কোলে কোরে খাবার আনতে গিয়েছি। ময়রা দিদি আমার হাতে খাবারের ঠোঙা দিয়ে, খোকার হাতে দুটি ছানার মুড়কি দিয়ে বল্লে, "বলি, কথাটা শুনেছিস্?" কথাটা শোনবার তরে ঠোঙাটা রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, "আবার কি কথা? ময়রা দিদির এত কথাও আসে!" ময়রা দিদি বল্লে, "ওই যে গোষ্ঠ এখানে আসে, তারে দেখিছিস্ ত? সে রোজ ঘনিয়ে ঘনিয়ে এখানে আসে, আর কেউ না থাকলেই তোর কথা পাড়ে। তোর রঙ-গড়নের কত সুখ্যাতি করে। বোধ হয়, তোকে বড় মনে ধরেছে।" আমি ত হেসে মরি। বল্লাম, "ময়রা দিদি, মরণ তোমার! তামাসা করবার কি আর লোক পেলে না? আমার এখন তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, আমার কি এখন রঙ্গ-রসের বয়স? লোকে শুনলে বলবে কি!" ময়রা দিদি বল্লে, "নে শ্যামা! তুই আর জ্বালাস্ নে। তোর এখন চুলও পাকে নি, দাঁতও পড়ে নি, ছেলেপুলে হয় নি, তোর আবার কিসের বয়স?" ন গণ্ডা আমার বয়স হ'তে গেল, বলে কিসের বয়স! বল্লাম, "ময়রা দিদি, তোমার মুখে কি ঐ বই অন্ত কথা নেই? ঢের ঢের ঘটকী দেখেছি বাপু, তোমার মত ঘটকী কখন দেখি নি। আর এ পোড়া দেশে কি অন্য কথা নেই?" খোকাকে কোলে কোরে খাবার নিয়ে আমি বাড়ী চ'লে এলাম।

ছি! ছি! কথা শুনে আমি ঘেন্নায় মরি। রাধে! রাধে! এখন কি আমার এমন কথা শুনতে আছে? আমার বাপু অমনতর মন নয়। যা হোক্—তবু ঠাকুর-দেবতায় মন আছে। এত দিন যা' রোজগার করেছি, তীর্থ কোরতে, ব্রাহ্মণ খাওয়াতে, ঠাকুর-দেবতাদের দিতেই সব খরচ হয়ে গিয়েছে। জগন্নাথ-ক্ষেত্র, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন—পোড়া মুখে কি আর বলব, কপালে যা ছিল, হয়েছে। সঙ্গতি নেই যে কাশীবাসী হই, তাই পরের দোরে খেটে খাই। ময়রাণী মাগীর কি আক্কেল! লোক চেনে না, বয়স দেখে না, মানুষের স্বভাব দেখে না, সকলের সঙ্গে ঐ এক তামাসা। তবু যদি মাগীর বয়স থাকত! পোড়া কপাল মাগীর! আর বেছে বেছে মানুষ পেলেন না, ঐ গোষ্ঠ মিনষেরে ওঁর মনে পড়ল। তারে মনে হয়, আর হেসে হেসে আমার নাড়ী ছিঁড়ে যায়। মিনষে কালো, ঢ্যাঙ্গা, হাত-পা ঢ্যাঙ্গা-ঢ্যাঙ্গা, চোখ দুটো কুৎকুতে, ঠিক যেন পাঁজির সংক্রান্তি ঠাকুর। তাঁরে দেখে না ভুললে আর হবে কেন? হাড়ী-বাগদীর ঘরেও মানুষ ওর চেয়ে দেখতে ভাল হয়। আমার কি গলায় একগাছ দড়ী জুটবে না? বুড়ো বুড়ো বলি ব'লে আমি সত্যিই এখন বুড়ো হই নি যে, কেউ আমার দিকে ফিরে চায় না। আমার যদি তেমন মন হ'ত, তা হ'লে—যাক্, ও পাপ কথায় আর কাজ নেই। কিন্তু ময়রা দিদির কি আক্কেলখানা আমি তাই ভাবি। বৃন্দাবন থেকে যখন ফিরে আসি—দূর হোক্ ছাই—সে সব কথায় আর কাজ নেই। তা আমি কি এতই কুৎসিত যে ময়রাণী মাগী এমন কথা আমার বল্লে? মাগীকে আগা-পাস্তলা ঝাঁটা দিয়ে বিছিয়ে দিই ত আমার রাগ যায়।

বাড়ীতে কাজ থাক্ আর না থাক্, দু'দণ্ড কোথাও যাবার যো নেই। "ও শ্যামা, কোথা

গেলি ?" "ও শ্যামা, খোকা কি কর্ছে দেখ।" "মাগী এই ছিল, গেল কোথায় ?" "তুই খোকাকেই না দেখতে পার্বি ত রয়েছিস কি কর্তে ?" দিনরাত চারিদিকে কেবল এই কথা। মা! মা! মা! হাড় কালী হ'ল। মুখের কথাটি খস্লে কারুর যেন আর তর সয় না। বামন ঠাকরুণটি পর্য্যন্ত যেন রাজরাণী, জলবটীটি এগিয়ে নিতে পারেন না। হাঁড়ী ঠেলবেন, তার আবার এত মেজাজ কিসের ? যে দিন দু' কথা শুনিয়ে দি, সে দিন মাগী ভাল কোরে খেতে দেয় না। আর সবাইকে মাছ বিলিয়ে দিয়ে, আমার বেলা বলে—মাছ নেইক, ফুরিয়ে গিয়েছে। বাড়ীর গিন্নীটি ভাল, তাই রক্ষে, তা না হ'লে এত দিনে পালাবার পথ পেতাম না। বউ ঝি সব সমান। উনি কাপড় রং কোর্বেন, শ্যামা রং কিনে নিয়ে আয়। ওঁর কাঁচা তেঁতুল খাবার সাধ হয়েছে, শ্যামা চুপি চুপি কিনে নিয়ে আয়। উনি উড়ের দোকানের তেলে ভাজা বেগুনী খাবেন, শ্যামা খোলা থেকে তপ্ত তপ্ত নিয়ে আয়। কেন, শ্যামা বৈ কি আর বাড়ীতে অন্য মানুষ নেই ? শ্যামার ত আর চারটে হাত নেই, দশটা পা-ও নেই যে, শ্যামা সব একলা কোর্বে। আর শ্যামা বলুক দেখি, একবার পাড়ায় যাই, কি দু'দণ্ড বেড়াতে যাই। অমনি সবাই ঝাঁটা নিয়ে শ্যামাকে তেড়ে আসে। তা কলির এমনি বটে। কত কোরে হাতে পায়ে ধোরে এক এক দিন গঙ্গায় নাইতে যেতে পাই। ময়রা দিদি সেই যে কথাটা বল্লে, তার পর দু' দিন তার সঙ্গে ভাল কোরে কথা কই নি। তা রাগই করি আর যাই করি, হক্ কথা বলব। ময়রাণীর একটা গুণ আছে, শরীরে এতটুকু রাগ নেই। তা ঝগড়াই কর, আর গালাগালিই দাও, ময়রা দিদি রাগতে জানে না! মুখেতে হাসিটুকু লেগেই আছে। আমরা বাপু অমন বরদাস্ত কোর্তে পারি নে। রাগ হ'ল, দুঃখ হ'ল, দু' কথা বল্লাম, তার পর রাগ প'ড়ে গেল। ময়রা দিদির সঙ্গে সেই যে কথা হ'ল, তার ক'দিন পরে আমি এক দিন গঙ্গা নাইতে গিয়েছি। তাও কি সকাল সকাল যাবার যো আছে ? কাজকর্ম্ম সেরে গঙ্গাতীরে যেতে সূর্য্যি মাথার উপর উঠল। নেয়ে ভিজে কাপড়ে আমি বাড়ী আস্ছি,—পথে দেখি, সেই গোষ্ঠ মিন্ষে দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল। মিন্ষে আমায় দেখে হেসে বল্লে, "শ্যামা, এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছ ?" মনে মনে বল্লাম, যাচ্ছি তোমার মুখে আগুন দিতে আর তোমার পিণ্ডি চট্কাতে। কিন্তু রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি একটা লোকের গায়ে প'ড়ে তার সঙ্গে ঝগড়া কোর্ব ? আমার তেমন স্বভাব নয়। তাই আমি কথাটা চিবিয়ে বল্লাম, "এই যে সংক্রান্তি ঠাকুর! দণ্ডবৎ হই। হাতের নড়ীটি কোথায় ফেলে এসেছ ?" মিন্ষে বল্লে, "নড়ীটি হারিয়ে গিয়েছে, তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি। এখন পেয়েছি মনে হচ্ছে।" ব'লে আমার দিকে চেয়ে হাস্লে। পোড়ারমুখোর আস্পদ্ধা দেখ! আমি বল্লাম, "গঙ্গা নাইতে যাচ্চ না কি ?" মিন্ষে বল্লে, "হাঁ, তা মাসের ফলটা শুণে ব'লে যাই।" আমি বল্লাম, "আমায় আর বল্তে হবে না, ময়রা দিদিকে বল গে।" এই ব'লে আমি তাড়াতাড়ি চ'লে এলাম। মিন্ষে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে পিছন ফিরে আমায় দেখতে লাগল। মিন্ষের চোখ দুটো কাণা হয়ে যায় ত আমি বর্ত্তাই।

সেই দিন থেকে মিন্ষে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কোথায় আমার দেখা পাবে, কেবল সেই ফিকিরে থাকে। আমাকে দেখলেই হাসে, আর আমার সঙ্গে কথা কয়। অলপ্পেয়ে, পোড়ারমুখো, ড্যাক্রা মিন্ষে, তার জ্বালায় কি দেশত্যাগী হব না কি ? ময়রার দোকানে যাই, সেখানে মিন্ষে দাঁড়িয়ে থাকে। গঙ্গাস্নান কোর্তে যাব, তা পিছনে পিছনে কুকুরের মত আসে। এক দিন পথে বল্লে, "শ্যামা, তুমি আমার সঙ্গে ভাল কোরে দুটো কথা কও না কেন ? আমি কি এতই বিষ হলাম ? তা পথে যদি কথা কইবার অসুবিধা হয়, তা না হয় তোমাদের বাড়ী যাব এখন।" আর আমার সইল না। রেগে বল্লাম, "তা বাড়ীতে আঁস্তাকুড়ের মুড়ো ঝাঁটা তোমার জন্য তুলে রেখেছি।" মিন্ষে তবু হাসে,—বলে, "তোমার হাতের ঝাঁটাও আমার মিষ্টি লাগে।" ঝাঁটা হাতে থাক্লে দেখতুম—কেমন মিষ্ট লাগে। আমি ত বাপু জ্বালাতন হয়ে উঠেছি। তবু যদি মিন্ষের কোন গুণ থাকত। এক দিন বিকালবেলা আমি ঠোঙ্গায় কোরে জলখাবার নিয়ে আস্ছি, এমন সময় একটা চিলে ছোঁ মেরে ঠোঙ্গাটা আমার হাত থেকে মাটীতে ফেলে দিলে। রাস্তায় জল দিয়েছিল, কাদা হয়েছিল। সব খাবার সেই কাদায় প'ড়ে গেল। পোড়া চিলের মর্বার কি আর ঠাঁই ছিল না ? আমি মাথা চাপড়ে মরি বাবা! যে বাড়ী,

শুধু হাতে ফিরে গেলে আর রক্ষা থাক্‌বে না। যদি বলি,—চিলে খাবার ফেলে দিয়েছে, তা হ'লে বল্‌বে—তা আমরা কি জানি, তুই চিল দিয়ে খাইয়েছিস্, তুই আবার নিয়ে আয়। আমরা কি আবার দু'বার কোরে পয়সা দেব? দণ্ডবৎ এমন বাড়ীর পায়! আমি কেঁদে মরি, এমন সময় পিছন থেকে কে এসে বল্লে, "শ্যামা, কি হয়েচে, কাঁদ্‌চ কেন?" সেই হতভাগা মিন্‌ষে! আ মরণ। আমি কাঁদ্‌চি, আর মিন্সে দাঁড়িয়ে রঙ্গ দেখচে। বল্‌লাম, "এত দিন তোমায় যম ভুলে রয়েচে, তাই কাঁদ্‌চি।" মিন্‌ষে বল্লে "তা সে জন্য কান্না কেন? চিরকাল ত আর ভুলে থাক্‌বে না। কিন্তু এখন যে এই এতগুলো খাবার নষ্ট হ'ল, তার কি হবে?" হবে আর কি, আমার পিণ্ড আর শ্রাদ্ধ হবে! মিন্‌ষে বল্‌লে, "তা কেঁদে আর কি হবে, এই নাও, খাবার যা নষ্ট হ'য়েছে, আবার নিয়ে যাও।" ব'লে ট্যাঁক্ থেকে একটা টাকা বার কোরে আমার হাতে দিলে। "পোড়া দশা! আমি তোর টাকা নেব কেন? আমি এখনও তেমন কাঙ্গাল হই নি।" মিন্‌ষে বল্লে, "অমনি না নাও, ধার ব'লে নাও। যখন পার, শোধ দিও।" এই ব'লে মিন্‌ষে হন্ হন্ কোরে চ'লে গেল। তখন আমি আর কি কোর্‌ব, টাকাটা ভাঙ্গিয়ে, আবার খাবার কিনে নিয়ে আসি। মিন্‌ষের মনে কি আছে, ভগবান জানেন, কিন্তু আগে যেমন তার উপর রাগ হ'ত, তাকে দেখলেই সর্ব্বাঙ্গে বিষ ঢেলে দিত, এখন আর তা হয় না।

কিন্তু সেই দিন থেকে তাকে আর ক দিন দেখতে পাইনে। অবাক্! আবার কি হ'ল! আর তার টাকাটা ফিরে দিতে পারলে বাঁচি। আর দেখ, তাকে গালাগালি দিয়ে কেমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, মুখটাও একটু শুড় শুড় কোরত। গঙ্গার পথেও আর দেখতে পাইনে, ময়রার দোকানেও দেখতে পাইনে। গেল কোথায়? মনটা ক দিন একটু যেন কেমন কেমন করে। এক দিন ঘোর ঘোর সন্ধ্যাবেলা খিড়কীর দরজা খু'লে কানাচে আমি এঁটো-কাঁটা ফেল্‌তে গিয়েছি। দরজার কাছে গলির যেখানটা বড় অন্ধকার, সেখানে—মা গো। তালগাছপানা কালো মতন কে দাঁড়িয়ে রয়েছে! আমি দেখেই আঁউমাঁউ কোরে উঠেছি। "আরে চুপ কর! চুপ কর! আমি।" "আমি কে রে?" "আমি গোষ্ঠ।" তখন আমার ধড়ে প্রাণ আসে। বল্‌লাম, "তবু ভাল। তা ভর সন্ধ্যাবেলা কি মানুষকে এমনি কোরে ভয় দেখাতে আছে?" বল্লে,—"ভয় দেখাতে আসি নি, একটা কথা আছে, তাই বল্‌তে এসেছি।" কথা আবার কি? আমি বল্‌লাম, "সেই টাকাটা? তা তুমি একটু দাঁড়াও, আমি নিয়ে আস্‌ছি।" গোষ্ঠ বল্‌লে, "না, না, সে টাকাটার জন্য কিছু তাড়াতাড়ি নেই। তোমায় বল্‌তে এলাম কি যে, এই অনন্ত দু'গাছা যদি তোমার কাছে রাখ, তা হ'লে বড় উপকার হয়। এখানে আর কেউ এমন নেই, যাকে দিয়ে বিশ্বাস হয়।" "আমি কেন তোমার অনন্ত নিতে গেলাম?" মিন্‌ষে আস্তে আস্তে বল্লে, "আমি ত তোমায় নিতে বল্‌ছি নে, রাখতে বলছি। আমার কাছে এক জন লোক বন্ধক রেখেছিল, সে কোথায় পালিয়ে গিয়েছে। তুমি যদি রাখ ত আমি নিশ্চিন্ত হই। আর যদি তুমি হাতে প'রে থাক, তা হ'লে আরও ভাল হয়, কোন ভয় থাকে না।" তা আমি আর কি বল্‌ব? তার পর মিন্‌ষে আম্‌তা আম্‌তা কোরে মাথা-মুণ্ডু ছাই-পাঁশ কি বকতে লাগল। আমি বল্‌লাম, "ওই আমায় কে ডাক্‌ছে! আমার কি এক দণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়াবার যো আছে? মরব যে, এমন অবকাশ নেই।" ব'লে আমি খিড়কীর দরজা বন্ধ কোরে চ'লে এলাম। তাগা দুগাছও আঁচলে বাঁধা ছিল। রাত্রে যখন শুতে যাই, প্রদীপ নিবুবার আগে তাগা দু'গাছা একবার খুলে দেখলাম। দিব্য মোটা-সোটা ভারি তাগা। হাতে প'রে দেখি, হাতে কি একেবারে ঠিক হ'ল! স্যাক্‌রা দিয়ে আমি যেন বসিয়ে গড়িয়েছি। যদি হাতে টাকা থাক্‌ত, তা হ'লে এ দু'গাছা কিনতাম। আমাদের তিন কুলে কেউ নেই, গতর কবে আছে কবে নেই, অসুখ-বিসুখ আছে, সোনা-দানা একটু তবু থাকলে সময়ে অসময়ে কাজ দেখে। তাগা দু'গাছা প'রে ভাবলাম, সত্য সত্যই কি আমি এত বুড়ো হয়েছি? সাত পাঁচ কত কি ভাবচি, এমন সময় সুমুখের ঘর থেকে ঠান্‌দিদি বল্লে, "হ্যাঁ লা শ্যামা, তোর ঘরে যে এখনও প্রদীপ জ্বলে? তেল কি বড় সস্তা হয়েছে না কি?" বুড়ী হেঁপোরোগী কি না, সমস্ত রাত খক্-খক্ কোরে কাসে, আর দিন-রাত সব কথায় টিক্-টিক্ করে। আমি কিছু না ব'লে প্রদীপ নিবিয়ে শুলাম। তাগা দু'গাছা খুলে আর কোথায় রাখব, হাতেই রইল। সকালে উঠে দালান ঝাঁট দিচ্ছি, আর অমনি বামনী মাগীর

নজর সেই তাগা দু'গাছার উপর পড়েছে! মাগীর কথা শুনলে আমার গা জ্বালা করে। চাল চিবিয়ে চিবিয়ে যখন কথা কয়, ইচ্ছে করে নোড়া দিয়ে মাগীর দু'পাটী দাঁত ভেঙ্গে দিই। মাগী সুর কোরে বল্লে, "তবে না কি শ্যামা, তোর হাতে কিছু নেই? কিছু নেই কিছু নেই কোরে যে কাঁদিস্, তবে এ মোটা মোটা অনন্ত পেলি কোথা? আমরা কৈ ত কিছুই শুনিনি! কেউ তোকে দিয়েছে না কি?" আমিও সুর কোরে বল্লাম, "কবে তোমার গলা জড়িয়ে কেঁদেছিলাম? আমার একটু কিছু হয়েছে, আর তোমার এত চোখ টাটায় কেন? তোমার গলায় মোটা মোটা দানা রয়েছে, কে দিয়েছে, আমি ত জিজ্ঞাসা করতে যাইনি।" বামনী বল্লে, "ঢের ঢের কুঁদুলী দেখেছি বাপু, তোর মত পাড়াকুঁদুলী কখন দেখিনি। জিজ্ঞাসা কর্লাম একটা ভালকথা, তা মাগী গায়ে প'ড়ে ঝগড়া কর্‌চে।" আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল। "মাগী বল্‌বার তুই কে রে? আমি মাগী আর তুই ষোল-বছুরী ছুক্‌রী, না? হাঁড়ির কাঠি নেড়ে মাগীর হাতে ঘাঁটা পড়ল, তাঁর আবার চোপা দেখ! মাগী মাছ খাবার লোভে সধবা সাজে, ও কি কোন কালে সধবা ছিল না কি? তুই না হয় হাঁড়ি ঠেলিস্, আমি না হয় ছেলে মানুষ করি, তার আবার তোর এক ক্ষাল কিসের? তুইও পরের বাড়ী খেটে খাস্, আমিও পরের বাড়ী খেটে খাই, তা তোর কথা শুনব কেন?" মাগীকে যখন খুব শুনিয়ে দিলাম, তখন মাগী ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। কি রে আমার কচি খুকী! মাগী সকল সময় কেঁদে কেটে। সে মাগী যদি থামল ত বাড়ীতে একটা হৈ-চৈ প'ড়ে গেল, যেন ডাকাত পড়েছে। "টাকা দিয়ে গড়ালি?" "কবে গড়ালি?" "কোন স্যাকরার কাছে গড়ালি?" চারি দিক থেকে আমায় চ্যাকাবাঁকা কোরে ধর্‌ল। কেউ যেন কোন পুরুষে কখন দু'গাছা অনন্ত দেখেনি। তা কি শুধু ঝি-চাকর, বাড়ীর বউ, গিন্নী সব সমান। শেষে যখন বল্লাম, আমি কিনিনি, বাঁধা রেখেছি, তখন তাদের হাত এড়াই।

তার পর গোষ্ঠর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। টাকারও কথা পাড়ে না, তাগারও নাম করে না। আমি মিছি মিছি তাকে এত গালাগালি দিতাম। কার্ত্তিকের মত দেখতে নাই হ'ল, পুরুষমানুষ ত আর রূপ নিয়ে ধুয়ে খাবে না। এমন নিরীহ ভালমানুষ কখন দেখিনি। এ কালে মিন্‌ষেদের মত হতভাগাও নয়, ধর্ম্মে কর্ম্মে মন আছে। এক দিন কথায় কথায় বল্লে, "দেখ শ্যামা, তোমায় অনেক দিন থেকে বল্‌ব বল্‌ব মনে কর্‌ছি। এ সহরে থাক্‌তে আমার আর ভাল লাগে না। আমার কাছে কিছু টাকা আছে, দু' জন মানুষের তাতে স্বচ্ছন্দে চ'লে যেতে পারে। আমার ইচ্ছে হয়, বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করি। তা তুমি যদি সঙ্গে চল ত যাই। আমার কাছে খানকতক গহনা আছে, তোমায় দেব, আর টাকা যা, সে ত তোমারই আছে। বৈষ্ণব হ'য়ে চল তোমায় বৈষ্ণবী কোরে নিয়ে যাই।" আমি ভাবলাম, তা কথাটা মন্দ কি! চিরকাল কিছু আর খেটে খেটে খেতে পারব না। এর সঙ্গে গিয়ে যদি বৃন্দাবনবাস করি, তা হ'লে এক মুঠা ভাতের ভাবনা ভাবতে হবে না, আর অনেক পুণ্য না কোর্‌লে কেউ আর বৃন্দাবনে বাস কোর্‌তে পায় না। কৃষ্ণ যা করেন! কপালে যদি থাকে ত হবে। বল্লাম, "তা তুমি যদি নেহাত বল ত যাব। যদি তেমন কপাল নিয়ে এসে থাকি, তা হ'লে বৃন্দাবনে বাস হবে।" গোষ্ঠ বল্লে, "আচ্ছা, তবে দিনকতক যাক। এখানে কিছু কাজ আছে, সেরে নি।" অন্য দিন আবার অন্য কথা জিজ্ঞাসা করে। আমাদের বাড়ীতে কে কোথায় শোয়, কোন্ ঘরে কি থাকে, কর্ত্তা-গিন্নী কোথায় শোয়, কোন্ ঘরে গহনাপত্র থাকে, কড়াকড়ি কোথায় থাকে, সেই সব কথা জিজ্ঞাসা করে। ভাল পাগল! এ সব খবরে তোমার কাজ কি? তা বলে, "এক দিন তোমাদের বাড়ীতে আমায় নিয়ে যাবে না?" আমি কানে হাত দিয়ে বল্লাম, "ও সব কথা আমায় ব'ল না, আমি তেমন মানুষ নই। এক যদি বৃন্দাবন চল ত তোমার সঙ্গে যাই, কিন্তু যত দিন চাক্‌রী কর্‌ছি, তত দিন আমায় কোন কথা ব'ল না। এত দিন চাক্‌রী কর্‌ছি, আমার নামে কখন কোন কথা ওঠে নি, শেষে কি একটা অপবাদ নিয়ে বাড়ী থেকে বেরুব?" মিন্‌ষে হাসতে লাগল, বল্লে, "তোমার মত শক্ত মেয়েমানুষ আমি দেখি নি। তা আমি শীগ্‌গির শীগ্‌গির বৃন্দাবনে যাবার উদ্যোগ করি।" এই রকম কোরে ত কিছু দিন যায়। ময়রা দিদি দেখা হলেই হেসে কুটি-কুটি। বলে, "কেমন শ্যামা, তখন যে বড় রাগ হ'ত, এখন কি বলিস্?" "বল্‌ব আবার কি? কেন, হয়েছে কি?" ময়রা-দিদি বল্লে, "না, হয় নি কিছু, কিন্তু এখন যে বড়

গোষ্ঠকে গালাগাল দিস্ নে?" আ মরি! কথার কিবা ছিরি! মানুষকে কি গালাগালিই দিতে হয় না কি? ময়রা-দিদি বল্লে, "তোর এমন বুদ্ধি হ'ল কবে থেকে? তখন কি গোষ্ঠ তোর পাকা ধানে মই দিয়েছিল?" ময়রা-দিদির সঙ্গে কথায় পারবার যো নেই। গোষ্ঠর সঙ্গে যখন দেখা হয়, প্রায় আমাদের বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করে, আমি কোন্ ঘরে শুই, বৈঠকখানার ঘরগুলো কোন্-মুখো, বাড়ীর ভিতর ঘরগুলো কোন্মুখো, এই সব কথা। আমিও কথায় কথায় তাকে সব বল্-তাম। আমাদের বাড়ীতে আসবার কথা আর বল্ত না। কেবলি বল্ত—বৃন্দাবনে যাবার উদ্যোগ কর্ছি, এখানকার কাজটা হ'লেই যাব। কাজটা কি, আমায় বলে না। কিন্তু কথায় বোধ হয়, টাকা-কড়ির বিষয় কিছু হবে।

আষাঢ় মাস। কৃষ্ণপক্ষ, তায় আবার মেঘ কোরেছে। বাতাস নেই, বড় গুমোট ব'লে আমি দরজা খুলে শুয়ে রয়েছি। ভরারাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছি। অঘোরে ঘুমিয়ে রয়েছি, এমন সময় আমার গায়ে কে হাত দিয়ে ডাক্লে—"শ্যামা!" ছাঁৎ কোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল। গা ডোল হয়ে উঠল। এত রাত্রে কে ডাকে? তিনবার না ডাকলে আমি ত প্রাণ গেলেও উত্তর দেব না! আবার আমার গা নাড়া দিয়ে চুপি চুপি বল্লে, "শ্যামা, ভয় নেই. আমি গোষ্ঠ।" সর্ব্বরক্ষে! আমার মাথা খেয়েছে! ধড়মড় কোরে উঠে বল-লাম, "বেরোও এখনি, তা না হ'লে চেঁচাব।" কি সর্ব্বনাশ! বাড়ীর ভিতর এল কেমন কোরে! ফটক-দরজা বন্ধ. খিড়কীর দুয়ার বন্ধ, এত বড় পাঁচীল ডিঙ্গিয়ে যে আস্তে পারে, সে সব কোরতে পারে! আমার হাত-পা ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপতে লাগল। মিন্ষে বল্ল, "তোমার কোন ভয় নেই। তোমার জাতি, মান, কুল, সব বজায় থাকবে। আমারও একটু মনে ভয় হচ্ছে, পাছে আমি এসেছি, কেউ টের পেয়ে থাকে। তুমি উঠে আমায় খিড়কীর দরজা দেখিয়ে দাও, আমি আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাচ্ছি।" সর্ব্বনাশের কথা! যদি কেউ দেখতে পায়? মিন্ষে বল্ল, "এখনও কেউ উঠে নি, সবাই ঘুমিয়ে আছে। আমি বাড়ীময় হাঁৎড়ে বেড়ালে কারুর ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে।" আমি বললাম, "লোক ডেকে তোমায় ধরিয়ে দিই ত বেশ হয়। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়।" মিন্ষে বল্লে, "অপরাধ?" "চোর ব'লে ধরবে। চোর না হ'লে কারুর বাড়ী এমন সময় চোরের মত আসে?" মিন্ষে ফিক্-ফিক্ কোরে হেসে বল্লে, "তা তোমার মনচোরা ব'লে যদি ধরিয়ে দাও ত আমি ধরা দিতে রাজি আছি।" আমি ভয়ে কেঁপে মরি, আর ওর হ'ল এই রঙ্গের সময়! হাতে যদি তাগা দুগাছা না থাকৃত, তা হ'লে আমি তখনি চোর ব'লে চেঁচিয়ে উঠ্তাম। এখন এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার হ'লে বাঁচি। কি করব, পা টিপে টিপে খিড়কীর দরজায় গেলাম। মিন্ষে আমার পিছনে এল, কিন্তু পায়ের শব্দ একবারও শুন্তে পেলাম না। দরজার কাছে যখন এল, তখন দেখি—মিন্ষের হাতে একটা পুঁটুলি। আমি বল্লাম, "হাতে ও কি?" বল্লে, "একখানা কাপড় হাতে কোরে নিয়ে এসে-ছিলাম। এখনি ভোর হবে, গঙ্গা নাইতে যাই।" আমি বল্লাম, "দেখ, তোমার যদি আবার এমন কুবুদ্ধি ঘটে, তা হ'লে আমি সত্য সত্যই তোমায় ধরিয়ে দেব। তোমার জন্য শেষে কি আমার যে অখ্যাতি না হবার, তাই হবে?" মিন্ষে নাকে কানে হাত দিয়ে বল্লে, "আর কখন এমন কর্ম্ম হবে না, নাকে কানে খত। তোমার মত বৈষ্ণবী আমি কোথাও খুঁজে পাব না। কাল কি পরশু তোমায় নিয়ে বৃন্দাবন চ'লে যাব। তুমি ঠিকঠাক হয়ে থেক। এখন দোর খুলে দাও, আমি যাই।" আমি দোর খুল্লে, সে বেরিয়ে গেলে, আবার বন্ধ কোরে দিলাম। কি ক'রে যে বাড়ীতে এসেছিল, তাড়াতাড়ি আর ভয়েতে জিজ্ঞাসা কোর্তে ভুলে গেলাম। ভয়ে কাঁপ্তে কাঁপ্তে এসে ঘরে দরজা বন্ধ কোরে শুয়ে পড়লাম।

ভোরের বেলা খোকাকে কোলে কোরে ময়রার দোকান থেকে খাবার কিন্তে গেলাম। ফিরে এসে দেখি, বাড়ীতে বিষম ব্যাপার! কর্ত্তার শোবার ঘরে একটা সিন্দুকের ভিতর গহনার বাক্স থাকে। তিনটে না চারটে গহনার বাক্স। গহনার বাক্সগুলি কলের ঘরে চৌবাচ্ছায় ভাঙ্গা প'ড়ে রয়েছে, সিন্দুক খোলা! পাঁচ ছয় হাজার টাকার গহনা চুরি গিয়াছে। বাড়ীতে হুলস্থূল প'ড়ে গেল। থানা কাছে, তখনি দারোগা এল, সদর-দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কারুর বাড়ী থেকে বেরুবার হুকুম নেই। আমরা ঝি-চাকর ভয়ে কেঁদে মরি। এত দিন বাপু খেটে খাচ্ছি, কখন কেউ কোন কথা বল্তে পারে নি, এখন না জানি কপালে কি আছে! দারোগা এসে বৈঠকখানার ঘরে ব'সে সব

ঝি-চাকরদের একে একে ডেকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোরলে। তার পর বাড়ীর ভিতর গিয়ে বাক্সগুলো আর সিন্দুক খুব ভাল কোরে দেখলে। সে বাইরে গেলে, কর্ত্তা গিন্নীকে ডেকে বললেন, "দেখ, যদি ঝিয়েদের কারুর উপর তোমার সন্দেহ হয় ত স্পষ্ট কোরে বল। এ ঘরে চাকরদের আসবার ত যো নেই।" গিন্নী বললেন, "কার মনে কি আছে, ভগবান্ জানেন, কিন্তু আমার ত কারুর উপর সন্দেহ হয় না। মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন, আমি মিথ্যা খামখা কারুর নামে কিছু বলতে পারব না।" শুনে আমার দুটি চক্ষু জলে ভেসে গেল। আহা! এমন মানুষেরও চুরি হয়! দারোগা বাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ কি কথাবার্ত্তা কয়ে চ'লে গেল। খানিকক্ষণ পরে পুলিসের এক জন সাহেবকে সঙ্গে কোরে নিয়ে এল। সাহেব এসে কাউকে কিছু বললে না, বাক্সগুলির আর সিন্দুকের কল ভাল কোরে দেখলে। তার পর পাড়ায় গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ কোরলে। ময়রাণীর সঙ্গেও না কি অনেক কথা কয়েছিল। ফিরে এসে বৈঠকখানায় ব'সে সকলকে একে একে ডেকে জিজ্ঞাসা কোরতে লাগল, শেষে আমার ডাক পড়ল। সাহেব পরিষ্কার বাঙ্গলা কথা কয়, একটা কথাও ঠেকে না। আমাকে জিজ্ঞাসা কোরলে, "শ্যামা, তোমার বয়স কত?" আমরা হলাম বুড়োসুড়ো মানুষ, আমায় আবার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করে কেন? আমি কেঁদে বললাম, "সাহেব, আমি এর কিছুই জানি নে, তা ইচ্ছে হয়, আমায় খুনই কর,—আর ফাঁসীই দাও। চিরকাল খেটে খাই, কেউ কখন আমায় কোন কথা বলে নি।" সাহেব বললে, "এখনও তোমায় কেউ কিছু বলছে না। তোমার উপর কোন সন্দেহ নেই, তুমি ভয় পাও কেন? তোমার কাছে কেবল একটা কথা জানতে চাই। এই যে লোকটার তোমার উপর নজর পড়েছিল, সে কে?" আমি বললাম, "সাহেব, আমি তোমার মা'র বয়সী, আমাকে কি তামাসা করবার জন্য ডেকেছ?" সাহেব বললে, "না, তামাসা নয়! সেই যে কালোপানা ঢ্যাঙ্গাপানা লোকটা সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরত, সে কে?" তখন বুঝলাম, সেই মিনসের কথা। আমি বললাম, "আমি তারে কোন পুরুষে চিনি নে। শুনেছি, তার নাম গোষ্ঠ।" সাহেব বললে, "তার নাকের উপর একটা বড় আঁচিল আছে?" সাহেব মানুষ হয়ে এত খবরও রাখে! আমি বললাম, "আছে।" সাহেব বললে, "সে বাড়ীর সন্ধান তোমায় জিজ্ঞাসা কোরত?" আমি বললাম, "কত কি জিজ্ঞাসা কোরত, তা কি আমার মনে আছে? আমি তাকে বাড়ীর সন্ধান বলতে গেলাম কেন?" সাহেব বললে, "তুমি ইচ্ছে কোরে না বল, কথায় কথায় নিশ্চয় কিছু না কিছু ব'লে থাকবে। আচ্ছা, সে তোমায় কিছু টাকাকড়ি দিয়েছিল?" আমি আবার কেঁদে ফেললাম, "সাহেব, আমি কি এতই টাকার কাঙ্গাল? যে বাড়ীতে আমি চাকরী কোরছি, আমার কিসের দুঃখ?" তাগা দু'গাছার কথা ব'লে আমি কি শেষে চোরদায়ে ধরা পড়ব? আমি আর কিছু বললাম না। সাহেব বললে, "তুমি এখন যাও। তোমাদের কারুর উপর কোন সন্দেহ নেই, তোমরা সব নিশ্চিন্ত হয়ে থাক।" তার দু দিন পরে শুনলাম, পশ্চিমে কোন রেলের গাড়ীতে গোষ্ঠ ধরা পড়েছে, তার কাছে কতক গহনা পাওয়া গিয়েছে। মিনষে নাম ভাঁড়িয়ে বেড়াত, তার আসল নাম গোপাল। দাগী চোর, অনেক জায়গায় চুরি কোরেছে, পুলিসের লোক তাকে ধরবার জন্য অনেক দিন থেকে ফিরচে। শুনে আমার ত আত্মাপুরুষ আর নেই। আর একটু হলেই সিঁদেল চোরের হাতে পড়েছিলাম! কোন্ দিন হয় ত আমার গলা কেটে রেখে যেত! মধুসূদন আমায় রক্ষা কোরেছেন! যেমন সুখের সাধ কোরেছিলাম, তেমনি আমায় নাকের জলে চোখের জলে হ'তে হ'ল। বলে,

"গরু মরে দো গাছায়,
মানুষ মরে দো আশায়।"

আমার তাই হ'ল। যেমন ভেবেছিলাম, পরের চাকরী কোরতে হবে না, সুখে স্বচ্ছন্দে একটা মানুষের সঙ্গে বৃন্দাবনবাস কোরব, তেমনি হাতে হাতে ফল ফলেছে। আমরা যেমন কপাল কোরেছি, আমাদের কি এত সয়? আমি দশ হাত মেপে নাকে খত দেব, আর কখন কারুর কথায় ভুলব না। মোকদ্দমা যখন হ'ল, আমায় সাক্ষী ডাকলে। আমার কপালে এই ছিল, শেষে কি না আদালতে সাহেবের সুমুখে দাঁড়াতে হ'ল! আদালতে যখন গেলাম,—দেখি, চোর মিনষেকে হাতে পায়ে বেড়ী দিয়ে পাহারাওয়ালা ঘিরে রয়েছে। তাকে দেখে আমার গায়ে জ্বর এল। মিনষে আমায় দেখে হেসে বল্লে, "শ্যামা, এ যাত্রা তোমায় বৈষ্ণবী সাজিয়ে বৃন্দাবন নিয়ে যেতে পেলাম না, মনে এই দুঃখ রইল।" কে চেনে মিনষেরে? আমি খোদার

ধ'রে গেলাম। এত লোকের মাঝখানে চোর-ডাকাত মিন্‌ষে নাম ধোরে কথা কয়! আদালতে একটা কাঠের পিঞ্জরার ভিতর আমায় দাঁড় করিয়ে দিলে। আমি কি পাখী না জানোয়ার যে, আমায় খাঁচায় পুর্‌লে? আর একটা পিঁজরার ভিতর চোরকে পুর্‌লে। আমিও কি চোরের সমান হলাম? আমায় চোর দেখিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তুমি একে চেন?" আমরা চোর-ছ্যাচড় নই, কোন পুরুষে একে চিনিনে। আবার জিজ্ঞাসা করে, "একে কখন দেখেছ?" হ্যাঁ, দেখেছি বটে, কিন্তু দেখলেই কি চিন্‌তে হয়? তার পর বলে, "তোমাদের বাড়ীতে একে কখন দেখেছ?" দেখলে কি চুপ কোরে থাক্‌তাম না কি? তখনি ধরিয়ে দিতাম না? আরও যে কত কি জিজ্ঞাসা কোর্‌লে, তা কি আমার মনে আছে? রোজ কমুঠা ভাত খাই, সে কথা যে জিজ্ঞাসা করে নি, এই আমার কত ভাগ্যি! বাইরে বেরিয়ে এসে শুন্‌লাম, মোকদ্দমা হ'য়ে গিয়েছে, মিন্‌ষের পাঁচ বছর মেয়াদ হয়েছে। ফাঁসী হ'লেও আমার একটু দুঃখ হ'ত না। একটু পরেই মিন্‌ষেকে বাইরে নিয়ে এল। যখন আমার কাছ দিয়ে যায়, তখন চুপি চুপি ব'লে গেল, "সব কথা তুমি বল নি, ভালই হয়েছে। তোমায় একটা কথা বলি। তাগা চোরাই মাল, সাবধান!" তার পর তাকে নিয়ে গিয়ে বারান্দায় বসালে। তখন মিন্‌ষে হেসে বল্লে, "শ্যামা, তুমি মনে কিছু দুঃখ কোরো না। আমি খালাস হয়ে এসে নিশ্চয় তোমায় বৈষ্ণবী সাজাব। কিন্তু ততদিনে তোমার দাঁতগুলি যদি সব প'ড়ে যায়, তবেই মুস্কিল।" মিন্‌ষে আমায় বুড়ো বল্‌লে! ঠাকুরের কাছে আমি মানাই, মিন্‌ষে যেন গারদেই মরে, কখন যেন আর বেরুতে না হয়। বাড়ী ফিরে গিয়ে ভাবলাম, তাগা দু'গাছা কি কোরব? ফেলে দিয়েই বা কি হবে? ভেঙ্গে আমি গলার দানা গড়ালাম। দেখ, এ সব কথা মনে হ'লে আমার আর এক তিল বাঁচতে ইচ্ছা করে না। লোকে কত কি বলে, আমি আর মুখ তুলে কারো পানে চাইতে পারি নে। আমার দোষ নাই ব'লে মা ঠাকুরুণ আমায় তাড়িয়ে দেন নি। কিন্তু আর আমি কখন ময়রাণীর দোকানে যাই নে, অন্য দোকান থেকে খাবার কিনি। পুরুষমানুষের দিকে ফিরেও চাইনে। তাদের খুরে দণ্ডবৎ। এখন মা-গঙ্গা আমায় নিলেই বাঁচি।

খেলাঘরে

(সাজানো খেলাঘর।
এগারো বছরের মেয়ে গৌরী।
হাই তুলিয়া আলস্য মেলিয়া)

কা কা, গুড়ুম!

ভোর হ'ল, কাগ ডাক্‌ল, তোপ পড়্‌ল, যাই সব দেখি গে। বউ-ঝিরা বেলা আটটা অবধি ঘুমোবেন, আমার ত আর সে জো নেই। এই কাগ না ডাকতে উঠব আর রাত দুপুর পর্য্যন্ত নিস্তার নেই। একেই বলে সংসারের সুখ!

ও কালো ঝি, হ্যাঁ রে, ক্ষীরোদা এয়েচে? এখনো আসে নি? তা কেন আস্‌বে? ওনার বাসায় নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্চেন! এই যে এসেছে! হ্যাঁ লা ক্ষীরী, তোর কি রকম আক্কেল? কালো ঝি যেন ঝাঁটপাট দিয়েচে, তা ব'লে কি অন্য কাজ নেই? উনুনে আগুন দিতে হবে না? আজকে রামদাসের এগ্‌জামিন, জানিস নে, নটার সময় ভাত খেয়ে তাকে যেতে হবে? ছেলেদের সকলের স্কুলের তাড়া, আর ওঁর যদি বেরুতে এক দণ্ড দেরী হয়, তা হ'লে আর রক্ষে থাক্‌বে না। একে ত রাগী মানুষ, তার উপর বয়স হয়ে দিন দিন আরও রাগী হচ্চেন।

বামুন ঠাকুর, ছেলেদের চা'র জল নামিয়ে দিয়ে আগে ডাল চড়িয়ে দাও। জগন্নেথে বাটিতে আমি সোনা-মুগের ডাল বের কোরে দিয়েচি। কালো ঝি, তোর ঘর ধোয়া হ'ল? মাছের চুবড়ী আর ঝুড়ি নিয়ে এইবারে বাজারে যা। এই দুটো টাকা নে, তাই ব'লে সব যেন বাজারে খরচ কোরে আসিস্ নে। রামদাস আমার কই-মাছ ভালবাসে, বামুন ঠাকুর তপ্ত খোলায় ভেজে দেবে। আর ওঁর জন্যে পুকুরের মাছ চাই, সংসারেও তাই হ'লে হবে। তোদের জন্য দু'পয়সার কুচো চিংড়ী আনিস্। ডাঁটা-পাতা গোচ্চার আনিস্ নে, শুধু ফেলা যায়। বাজারে কচি আমড়া উঠেচে, অম্বলের জন্য দুটো আনিস। আমার ত এমন পোড়া অরুচি হয়েচে, কিছু মুখে রোচে না! পোস্ত চচ্চড়ি হ'লে দুমুঠো ভাত খেতে পারি। এক পয়সার পোস্ত আনিস ত। কি বল্লি? দই? মাগী যেন নেকী, দই আবার কোন্ দিন আসে না যে, জিজ্ঞেস করচিস? দই যেমন আসে, তেমনি আসবে। যা যা, শীগ্‌গির যা! যাবি আর আসবি।

ক্ষীরী, জলখাবার কোথায়? ছেলেমেয়েরা কোথায় গেল? বাবা, বাবা, বাবা, ওদের ডেকে ডেকে আর পারিনে! ও পাঁচকড়ি, ও পুঁটি, চা যে জল হয়ে গেল! খাবার হাতে কোরে আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? তোরা খেলে আমার পেট ভরবে, না? রোদ চড়্‌চড়্‌ কোরচে তোদের ঘুমই ভাঙে না। ঘুম যদি ভাঙল ত মুখ ধোয়া হয় না। তাও যদি হ'ল ত খাবার খোঁজ নেই। আমার কি অন্য কাজ নেই যে, সারাক্ষণ তোদের সাধাসাধি কোরব?

হ্যাঁ বউমা, কাপড় ছাড়া হয়েচে? দেখ দেখি, বাছা, ছেলেদের আমি আর পারি নে। এই খাবার নিয়ে সাধাসাধি, যেন আমার মাথা কিনবে। তুমি একটু জল খাও ত মা, আমি এক-বার ঠাকুর-ঘর থেকে আসি।

ওই যাঃ! পুঁটি, কাগে তোর সন্দেশ নিয়ে গেল! আমার কি দশটা হাত যে, সব দিক্ কোরব? একবার ঠাকুরঘরে এসেছি আর পোড়ামুখো কাগে বাছার মুখের খাবারটুকু নিয়ে গেল! আচ্ছা বউমা, তুমি ত ব'সে ছিলে, কাগ-টাকে কোন্ হুঁস্ ক'রে তাড়িয়ে দিলে? কি বলচ, তুমি পান সাজছিলে, দেখতে পাওনি? সংসারে থাক্‌তে গেলে সকল দিকে নজর রাখতে হয়। ও ঝি, আর একটা সন্দেশ এনে দে। আহা, মুখের খাবার গা! অমন কাগের মুখে নুড়ো জেলে দিতে হয়!

এই যে বাবা রামদাস, বসো, আসন পাতা আছে। ও ঠাকুর, রামদাসকে ভাত দিয়ে যাও, গরম গরম কইমাছ ভাজা দিও। শুনচ কালা, কথা শুন্‌তেই পায় না।

ছেলেরা সব চুপ কোরে ব'সে খা না, অত হাউ-চাউ করচিস কেন? ওই, এইবার উনি আসচেন! এখন যে চুপ করলি সব? আবার চেঁচা না, তখন মজা দেখবি!

(মাথায় কাপড় দিয়া) এই যে আমি বাতাস

করছি। আম-কাঁটালের সময় যেমন মাছি, এখন তেমন নেই, তবু আছে বৈ কি! মাছি ছাড়া দেশ কবে আবার বল! ঝোল মেখে আর দুটি ভাত খাও, তুমি ত ঝোলের বড়ো ভালবাস। পোনামাছের মুড়ো আছে। পাতে রাখবে কার জন্য? বউমার জন্য? তা থাক্। তোমার দিন দিন খাওয়া ক'মে যাচ্ছে। কি বলচ? বয়স হ'লে ক'মে যাওয়া ভাল, কি আর তোমার এমন বয়স হয়েচে? তোমার যত সব ছিষ্টিছাড়া কথা! হ্যাঁ, রামদাস খেয়ে গিয়েছে। সকলে ত বলচে, পাস হবে, আমিও অনেক মানত মেনেছি, তার পর আমাদের বরাত। তুমি বলচ, পাস কোরেই বা কি হবে? তাও সত্যি, তা হ'লে ছেলেরা কি করবে? দিন দিন যে সময় হচ্ছে, দেখে শুনে হাত-পা যেন পেটের ভিতর সেঁধিয়ে যায়। তোমার বেলা হয়ে যাচ্ছে? তাও ত বটে! পাণের ডিপে তোমার পোষাকের কাছে আছে।

বামন ঠাকুর, উনি খেয়ে বেরিয়েছেন, ছেলেরাও বেরিয়েচে, এইবার বউমাকে আর আমাকে দাও। ঝি-চাকরেরা যারা খেতে চায়, তাদেব দাও। ক্ষীরী ত এখন খাবে না, সে ভাতের থালা নিয়ে তার বাসায় যাবে, সেইখানেই তার প্রাণ প'ড়ে আছে। হ্যাঁ রে, সিধু, তুই বা'র-বাড়ীর কাজ করিস ব'লে কি একবার উঁকিও মারতে নেই? বাবুর কাজ করছিলি? ভারি ত তোর কাজ! বাবু যদি বেরুল ত তোর টিকিও দেখবার যো নেই। আজ যেন, খবরদার, খেয়ে বাড়ী ছেড়ে যাসনে, আমি মজুমদারদের বাড়ী যাব। তুই গাড়ী ডাকবি আর আমাদের সঙ্গে যাবি।

ক্ষীরী, তুই বামুন-ঠাকুরের সঙ্গে ক্যার্-ক্যার্ কর্‌চিস কেন? কুঁদুলে নাড়ী কোঁ কোঁ করে। মাগী যদি দু-দণ্ড চুপ ক'রে থাকে! মাছ যেমন কুলুবে, সেই রকম দেবে, তোর ঘরে খাবার লোক আছে ব'লে কি তোকে বেশী ক'রে দেবে? এ ত আর বগ্‌গি-বাড়ী নয় যে, যত খুসী নিবি?

এস ত বউমা, তোমার শ্বশুরের পাতে ব'স। তোমার জন্য মাছের মুড়ো রেখে গিয়েছেন, তোমাকে বড় ভালবাসেন কি না। তুমি কি আমার সঙ্গে কান্তর মা'র বাড়ী যাবে? তা বেশ ত। হ্যাঁ, পুঁটীও যাবে বৈ কি! তার বয়স কত হ'ল? তা বছর চোদ্দ পনর হবে। হ্যাঁ বউমা, ঠিক বলেছ, ওইটে আমাদের বড় খারাপ। ডাক-নাম কিছুতে আর ঘোচে না। এখন যেন ছোট মেয়ে, কিন্তু ছেলের মা হলেও পুঁটীই থাক্‌বে। খোকা যদি হ'ল ত তার আর সে নাম ঘুচবে না। যখন ছেলের বাপ, তখনও খোকা। তুমি ত বল্‌চ, বড় হ'লে ও-রকম কোরে ডাক্‌তে নেই, নাম ধ'রে ডাকতে হয়, কিন্তু সে কথা শোনে কে? পুঁটী ত আজন্মকাল পুঁটীই রইল, কখনো রুই-মিরগেল হ'তে পাবে না! আর যদি খোকা হলেন, তা হ'লে শেষে বাপও খোকা, বেটাও খোকা। এমনি আবার মজা যে, পুঁটীকে যদি তার ভাল নাম ধোরে ডাকো, তা হ'লে সে অপ্রস্তুত হয়।

পাণের বৌটা ক'রে একটু চূণ দাও ত বাছা, চূণ একটু কম হয়েচে। না, দোক্তা আর চাইনে। খেয়ে দেয়ে যে একটু জিরোবো, তারও জো নেই। ঢেঁকির স্বর্গে গিয়েও সোয়াস্তি নেই। বউমা, কাপড় পর গে। তোমার নতুন জরিব কল্কা-দেওয়া খয়েরি রঙের সাড়ী পোরো। পুঁটী, তোর হ'ল? কি মেয়ে মা, কোন কিছুর খোঁজই নেই। এ কি কাপড় পরা হ'ল? এত কাপড় থাকতে ওই পছন্দ? তা বেশ, যা হয়েচে, বেশ হয়েচে। এই-বার সিধুকে গাড়ী ডাক্‌তে বল। গাড়ী নয়, ট্যাক্সি। আচ্ছা বাছা, যা তোমার ইচ্ছে, তাই কর। তোদের আজকাল সব-তাতে তাড়া, ঘোড়ার গাড়ী'ত মন ওঠে না, ভোঁ কোরে মোটোরে না গেলে মনের মত হয় না।

ঘোড়ার গাড়ীতে যেতে ঘণ্টাখানেক লাগে আর এ ট্যাক্সিতে দেখতে দেখতে পথ কেটে যায়। এই হেদো, সিমলে, বার-সিমলে, ঠনঠনে সব চোখ বুলিয়ে যাও, ভাল কোরে দেখবার জো নেই। এই যে গাড়ী এল। ও সিধু, তুই এগিয়ে চ'। বউমা, তুমি আগে নাম। পুঁটী, অত ব্যস্ত হোস নে, হাজার হোক পরের বাড়ী ত, ছটছট করলে ওরা নিন্দে কোরবে।

এই যে কান্তর মা দাঁড়িয়ে। দেখ, ভাই, ক'দিন আস্‌ব আস্‌ব মনে করচি, হয়ে ওঠে নি। আর তুমিও ত একটা মস্ত সংসারের গিন্নী, জানই ত কত রকম ঝঞ্ঝাট, মনে কোরলেই বাড়ী থেকে বেরুন যায় না। হ্যাঁ, বউমা আর পুঁটীকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছি। ওদের ফেলে এলে ওরা মনে দুঃখ কোর্‌ত। ও মা, কান্তকে সে দিন দেখিছি, এরি মধ্যে বেশ ডাগরটি হয়েচে। তা বিয়ের জল পেয়েচে কি না, মাথা চাড়া ত দেবেই। কান্ত, শ্বশুরবাড়ী থেকে কবে এলে? শাশুড়ী কেমন

হয়েচে? মেয়ের লজ্জা দেখ, মাথা হেঁট কোরে রইল। আমার কাছে আবার কিসের লজ্জা? তোমার মাতে আর আমাতে ছেলেবেলা কত খেলা করেচি, আমি কি তোমার মাসী নই?

হ্যাঁ ভাই, পুঁটী বড় হয়েচে বই কি! বিয়ের সম্বন্ধ ক জায়গা থেকে এসেচে, কিন্তু এখনো কোথাও পাকা কথা হয় নি। উনি বল্‌চেন, তাড়াতাড়ি কিসের, এখন ত আর খুব ছোট-বয়সে কেউ মেয়ের বিয়ে দেয় না। সেই জন্যে আমিও আর বেশী কিছু বলিনে। তবে তুমি যা বলছ, তা সত্যি কথা বটে, আইবুড়ো মেয়ে ঘরে থাকলেই ভাবনা হয়। যে ক'দিন আমার ঘরে থাকে। মেয়ে তো পরের ঘরে যাবেই! এই ক্ষান্ত তোমার কাছে রয়েচে, বড় হ'লে কি আর যখন তখন আসবে? তখন নিজের ঘর চিনে নেবে, কালে-ভদ্রে কখন বাপের বাড়ী আসবে।

তোমার সেই যে ঢাকাই কাপড় পছন্দ হয়েছিল, কাপড়উলীকে তোমার ঠিকানা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম! এসেছিল? তুমি ছ'খানা সাড়ী কিনেছিলে? তা বেশ, আর যদি আক্রার কথা বল, তা হ'লে কোন জিনিসটা এখন সস্তা পাওয়া যায়? সব আগুনের দর, কোন জিনিসে হাত দেবার জো নেই। এর পর কি যে হবে, তাই ভেবে সারা হই।

জল-খাবার? না ভাই, আমি বুড়ো মাগী, জলখাবার আবার কি খাব? ছ'বেলা ছুটো ভাত খাই, তাই সব সময় সয় না। বউমা আর পুঁটী ছেলেমানুষ, ওদের দাও। ও কি ও বউ-মা, তুমি আবার খাবার খাবে না কেন? এখানে আবার লজ্জা কিসের? ছেলেবেলা ত হাঁসের মত খাওয়া হবে।

ও ভাই ক্ষান্তর মা, বেলা গেল ভাই, এইবার বাড়ী যাই। বাড়ীতে এক দণ্ড না থাকলে সংসার চলে না। তা ভাই, তুমি ত সব জান, তোমারও ত মস্ত সংসার। কর্ত্তা এসে যদি দেখেন বাড়ী নেই, তা হ'লেই মুখ ভার হবে। ছেলেরা আছে, মেয়েরা আছে, ছ'দণ্ড আমায় দেখতে না পেলে মা মা কোরে বাড়ী মাথায় কোরবে। পুঁটী, সিধুকে বল্, একখানা গাড়ী ডাকতে। কি বল্লে ক্ষান্তর মা, গাড়ীর দরকার নেই, তোমাদের ঘরের মোটার আছে, তাইতে যাব? তা সে-ও বেশ কথা, তা'ই যাব।

তা হ'লে ভাই, আজ আসি, মনে কিছু কোরো না। থাক্ থাক্ ক্ষান্ত, পায়ে হাত দিয়ে আর নমস্কার করতে হবে না। হ্যাঁ মা, আবার আসব বৈ কি! আমরা আসব, তোমরা যাবে, পুঁটী আর বউমা ত সারাক্ষণ তোমার নাম করে।

এই ত বাড়ী এল। হাওয়া-গাড়ী না হাওয়াগাড়ী! চাওয়াই বা কোথায় থাকে! এই যে, ঝিয়েরা কোথায় গেল? আমি বাড়ী নেই আর কারুর কোন ভাবনা নেই। ও কালো ঝি, কোথায় গেলি? হ্যাঁ বাছা, তুই কতকেলে লোক, তোর ত বাসাও নেই, আর সেখানে খাবার মানুষও নেই। রোজকার কাজ কি তোকে রোজ রোজ ব'লে দিতে হবে? কাচা কাপড়গুলো দড়ীতে মেলানো রয়েচে, এখনো তোলা হয় নি কেন? ছেলেদের খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছিলুম, তারা সব খেয়েচে ত? সিধু, তুই দাঁড়িয়ে হাঁ কোরে কি দেখ্‌চিস্? বাইরে গিয়ে কাজকর্ম্ম সব সেরে রাখ, না হ'লে উনি এসে বক্‌বেন। আর সব বকুনী শেষে পড়ে আমার উপর। আমি ত 'ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো' আছি। ছেলে, মেয়ে, বাড়ীর কর্ত্তা যে যেখানে আছেন, সব ঝক্কি আমার ওপর। এর নাম বাড়ীর গিন্নী!

কলের ঘরে কে তোরা, আমাকে কি কাপড় কাচতে দিবি নে? বাড়ীর মেয়েগুলো যেন জলের পোকা, কলতলায় গেলে আর আস্‌বার নাম নেই। আর সাবান মাখবার ঘটাই কি! এ দিকে ত বাচ-বিচার সব ঘুচে যাচ্চে। এড়া কাপড়েই সবতাতে হাত দেবে, সক্ডি ক্ষাতের ছোঁয়া খাবে। কে, বউমা? হ্যাঁ মা, আমার কাপড় কাচা হয়েচে, তুমি এস। কালো ঝি, আমার কাপড়খানা ওপরের বারান্দায় মেলে দে ত। ক্ষীরী যে নোংরা, ওর হাতের কাজে আমার কেমন ঘেন্না করে। পুঁটী, তুই কাপড় ছেড়েচিস্? পেরেক থেকে আমার মালার ঝুলি পেড়ে দে ত! নারায়ণ মধুসূদন! বউমা, সন্ধ্যা দিয়েচ? বেশ করেচ। কালো ঝি, ভাল ক'রে ধুনো দে, আবার এমন মশা হয়েচে যে, আস্ত মানুষকে টেনে নিয়ে যায়, আর সন্ধ্যে হতেই ত কানের গোড়ায় শানাই বাজতে আরম্ভ হবে।

বামুন ঠাকুর, রাত হচ্চে যে, ছেলেদের ভাত দাও। রামদাস, বসো, তোমার রুটী আন্‌চে। ও হরি, স্থাড়া, বুড়ী, ভাত বেড়েচ যে! হুড়োহুড়ি করিস্ নে, ভাল কোরে বোস। বামুন ঠাকুর, হাঁসের ডিমের ডালনা ছেলেদের দাও। পুঁটী,

দুধে-ভাতে চিনি মেখে খা দেখি। দুধ কেউ ছুঁতে চায় না।

বউমা, বামুন ঠাকুর ওর লুচি ওপরে নিয়ে গিয়েচে, তুমি চল, আমি যাচ্চি।

আজ তোমার আপিস থেকে ফিরতে অত দেরী হ'ল কেন? খাটুনি যেন দিন দিন বাড়চে। হ্যাঁ, আজ ক্ষান্তর মা'র বাড়ী গিয়েছিলুম। তারা বেশ মানুষ। হ্যাঁ, তাই ত বটে. আমি পাড়া বয়ে কোঁদোল করতে যাই। সে কথাটি কেউ বলতে পারবে না। বাড়ীতে বকি-ঝকি, যা খুসী করি, পরের চর্চ্চায় থাকিনে। বউমা, নীচে যাও ত, ঘরে কি মিষ্টি আছে. ছেলেদের দাও গে।

বুড়ো-বয়সে তোমার রঙ্গ দেখে বাঁচিনে! বউমার সাক্ষাতে বুঝি ঐ রকম কোরে ঠাট্টা হয়? আমার মুখখানা ছাই হোক আর পাঁশ হোক, ঐ মুখ নিয়েই ত এত দিন ঘর কোরেচ, আর এ মুখনাড়াও নতুন নয়। যাও যাও, আর জ্বালিও না!

এস বউমা, আমরা খেয়ে শুতে যাই। বামুন ঠাকুরের কি এইবার হেঁশেল তোলা হবে না কি? ঝি, রান্নাঘরের শেকল ভাল কোরে টেনে দিস, যেন বেরাল না ঢোকে। পোড়া বেরালের জ্বালায় অস্থির কোরে তুললে।

(গৌরীর মা পিছন থেকে পা টিপে টিপে এসে শেষের কথাগুলি শুনলেন। বললেন, "ও গিন্নি, রান্নাঘরে ত শেকল দেওয়া হ'ল, আর ওদিকে আমি যে ভাঁড়ার ঘর খুলে রেখে এসেছি! বলি, মুখ ধুয়ে খাবার-টাবার খেতে হবে না?"

গৌরী মুখ ফিরিয়ে মাকে দেখে হেসে উঠল; "এই যে- যাই মা।" খেলাঘর গুছিয়ে তুলতে লাগল।)

কার খেলাঘার, মেয়ের না মা'র, না দুজনের?

নিস্তারিণীর রাজনীতি

হ্যাঁ দাদাবাবু, ভাল আছ ত? বউদিদি, কত দিন পরে আবার দেশে এলে! তোমাদের এই ফুটফুটে ছেলেপুলেগুলি যে দেখে, সেই দু দণ্ড দাঁড়িয়ে থাকে। তা বেঁচে থাকুক, চিরজীবী হয়ে সব বেঁচে থাকুক!

তা দাদাবাবু, তোমরা ত কত দেশ দেখলে, কত জায়গায় বেড়ালে, তুমি কত রোজগার করলে, লোকের মুখে তোমার নাম শুনলে কত আহ্লাদ হয়! ছেলেবেলা তোমায় কোলে পিঠে কোরে মানুষ করেচি, এখন তুমি বড়লোক হয়েচ, তবু তোমাদের পুরানো ঝি ব'লে যখন দেশে এস, তখন আমাকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে কত যত্ন আত্তি কর।

দেখ, দাদাবাবু, তোমরা সব খবর রাখ, তুমি কত লেখাপড়া শিখেচ, কোন্ দেশে কি হচ্চে, সব জান। আমরা মুখখু-সুখখু মানুষ, কিছু জানি নে, কিছু বুঝতেও পারিনে। দেশে যে কি হয়েচে, দেখলে শুনলে আক্কেল গুড়ুম হয়। এই দেখ না, পুলিসের ধরপাকড়। পুলিসে চোর-ছ্যাঁচড়, খুনী-ডাকাত ধরে, এই ত জানি। এ আবার কি নতুন কাণ্ড! এই যে সভা বলে, সে ত চিরকাল হয়, গোলদীঘিতে ত ছেলেরা জড় হয়ে বরাবর বক্তিমে করে। তা এখন তাদের পুলিসে ধরে কেন, আর মেজেষ্টের সাহেব তাদের জেলেই বা দেয় কেন? তারা চোর নয়, গাঁটকাটা নয়, দিন-দুপুরে ডাকাতিও করে না। ও মা, তাই কি ধরা ব'লে ধরা! একটা পাহারাওয়ালা, পাঁচশো জন লোক ধ'রে নিয়ে যাচ্চে! কে কাকে ধরে! লাঠি হাতে এক জন পাহারাওয়ালা, তার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে হাসতে হাসতে কাতারে কাতারে লোক ছুটেছে। পথের লোক বলে, আমাদেরও ধ'রে নিয়ে চল। এ কি জেলে যাওয়া না শক্করার মেঠাই-মণ্ডা খেতে ছোটা? জেলে যেতে কোথায় ভয়ে সারা হবে, না, গান গাইতে গাইতে মাঝ-রাস্তা দিয়ে চলেচে? যেন বারোয়ারির দল। কিছু বুঝতে পারিনে দাদাবাবু, কিছু বুঝতে পারিনে।

আর সবাই বলে, মহাত্মা গাঁধীর জয়। পথে ঘাটে যেখানে যাও, কেবল ওই এক বোল। হ্যাঁ দাদাবাবু, মহাত্মা গাঁধীকে তুমি দেখেচ? একবার

তিনি এই গোলদীঘিতে এসেছিলেন। আমি মাধববাবুর বাজার থেকে ছানা কিনে নিয়ে আসচি, আর সব চেঁচাচ্চে, মহাত্মা গাঁধীর জয়! আমি ভাবলুম, যাই, একবার দেখে যাই। বাপ রে, যে ভিড়, কার সাধ্যি তার ভেতর ঠেলে যায়। আমার দেখা হ'ল না। পাপী কি না, মহাত্মা-দর্শন হবে কেন? আচ্ছা, দাদাবাবু, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। শুনেচি, সেকালে না কি মুনি-ঋষিরা মহাত্মা হতেন। এই কলিকালেও কি মহাত্মা হয়? না হলেই বা দেশশুদ্ধ লোক মহাত্মা গাঁধী বল্বে কেন? তিনি না কি ঠিক দেবতার মতন? তাই যদি হবে, তা হ'লে সরকার তাঁকে জেলে দিলে কেন? যে পাপ করে, কুকর্ম্ম করে, সেই জেলে যায়। বরাবর লোকে এই ত জানে। যে মহাত্মা হয়, দেবতা হয়, তাকে কি জেলে দিতে হয়? তোমরা আইন জান, তোমরা বল্তে পার। হাঁ গা, এ কোন্ দেশী আইন যে, মহাত্মা দেবতাকে আর চোর-ডাকাতকে এক জেলে পোরে? সত্যি যুগে না কি বাঘ-ছাগলে এক ঘাটে জল খেত, তাই বুঝি কলিকালে মহাত্মাকে আর চোরকে এক জেলে দিতে হয়? তা এ কলির বিচার, এতে আর সরকারের দোষ কি? যার রাজ্যে বাস করি, তার কি নিন্দে কোরতে আছে? জলে বাস কোরে কি কুমীরের সঙ্গে কোঁদল কর্লে এক দণ্ড চলে?

দাদাবাবু, আমি এলোমেলো আবল্-তাবল্ কত কি বল্‌চি, তাতে তুমি বেজার হচ্চ না ত? এই দেখ, রামচন্দ্র দেবতা ছিলেন, বাপের কথায় তিনি বনে গেলেন। আচ্ছা, সে সময় যদি অযোধ্যায় অন্য রাজা থাক্ত, তা হ'লে কি রামচন্দ্র জেলে যেতেন? কেষ্টো ত সাক্ষাৎ ভগবান্, তা কংস ত তাঁকে মেরে ফেল্‌তে বসেছিল, তাঁর বাপ-মাকে হাতে পায়ে শেকল দিয়ে জেলে পূরে রেখেছিল। তবে দেবতায় আর চোরডাকাতে তফাৎ কি হ'ল? কিছু বুঝতে পারিনে, দাদাবাবু, কিছু বুঝতে পারিনে।

শুধু কি মহাত্মা গাঁধী? ভবানীপুরের কৌঁসিলী সি আর দাশ আর পৈরাগের উকীল পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কি কোর্‌লেন! কে কবে এমনতর কাণ্ড শুনেচে! ভবানীপুরে কতবার তত্ত্ব নিয়ে গিয়েচি, সি আর দাশের বাড়ী দেখেচি, তাঁকে বাড়ী থেকে হাওয়া-গাড়ী কোরে যেতে দেখেছি। এমন রোজগার না কি কখনো কেউ করে নি। মানুষে টাকার জন্যে হাহাকার করে, কত কুকর্ম্ম করে, আর উনি কত টাকার আয় পায়ে ঠেলে ফেলে দিলেন। তবু যদি সাধু, সন্ন্যাসী, বৈরাগী হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন, তা হলেও না হয় লোকে বুঝত যে, উনি উদাসীন হয়ে, সংসারের মায়া কাটিয়ে চ'লে গেলেন। কেন, পাকপাড়ায় লালাবাবু ত অমন ঐশ্বিজ্যি ছেড়ে গোবর্দ্ধন গুহায় গিয়েছিলেন। কিন্তু সি আর দাশ ত বোষ্টম্ হন নি, বনেও যান নি। তাঁকেও জেলে দিয়েচে। শুধু কি তাঁকে? এক বৈ ছেলে নয়, সে-ও জেলে গিয়েছিল। সীতা-সাবিত্রীর মত তাঁর পরিবার বাসন্তী দেবী, তাঁকেও ত পুলিসে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, তবে তাঁর জেল হয় নি। হাঁ দাদাবাবু, এঁরা কি কোরেছিলেন? ওই কি বলে, স্বদেশী না দেশের কাজ কর্‌ছিলেন? তা কোর্‌লে কি অত-বড় রোজগার ছাড়তে হয়, না, জেলে যেতে হয়? এই দেখ দাদাবাবু, আগে ত সব মস্ত মস্ত লোক দেশের জন্যে কত সভা, কত বক্তিমে কোরতেন, কেউ উকীল, কেউ কৌঁসিলী, কেউ খবরের কাগজ লেখেন, কিন্তু তাঁরা ত কেউ রোজগার ছেড়ে দেন নি, কেউ জেলে যান নি! তাঁদের কেমন বাড়ী-ঘর, কত টাকা-কড়ি, গাড়ী-ঘোড়া, হাওয়া-গাড়ী! তবে এখন এমন কেন হ'ল? দাদাবাবু, এর আগের বারে যখন দেশে এসেছিলে, তখন বউদিদির মুখে গল্প শুনেছিলুম যে, তুমি পণ্ডিত মতিলালের বাড়ী খানা খেয়েছিলে, তাঁর সঙ্গে তোমার ভাব আছে। তাঁর মত বড়মানুষী না কি রাজা-রাজড়াও কখনো করে নি। তাঁরও এক ছেলে, সে নাকি বিলেতে খুব সাহেব হয়েছিল। তার পর কি না সব সাহেবিয়ানা গেল, বাপে-বেটায় জেলে গেল! পণ্ডিত মতিলালকে দেখলে লোকে তাঁর পায়ের ধুলো নেয়। পৈরাগে যারা কল্পবাস কোর্‌তে যেত, তাদের মুখে শুনেচি, পণ্ডিত মতিলালের না কি একটা পাড়া জুড়ে বাড়ী, কত রকম যে বড়-মানুষী, তার সীমে নাই। দেখে শুনে মনে হয়, যুগ উল্টেচে, তা নইলে কি কখনো এমন হয়? আমরা ত কিছু বুঝতে পারিনে, তাই তোমায় জিজ্ঞেস কোর্‌চি।

এই যে স্বদেশীর হই-চই পড়েছে, এটা কি দাদাবাবু? দেশ কি আবার নিজের ছাড়া পরের হয় না কি? রাজা যদি অন্য দেশের হয়, তা সে-ও ত দেশটাকে মাথায় কোরে তুলে নিয়ে যেতে পারে

না। নিজের দেশের জিনিস খাও, নিজের দেশের কাপড় পর, তাও কি আবার ঢাক বাজিয়ে সবাইকে বল্‌তে হয় না কি? সব দেশে কি তাই করে না? ছেলেবেলা দিদিমার কাছে শুন্‌তাম, গরীব বড়মানুষ সকলেই দিশী কাপড় পরত—তা মোটা হোক্‌ আর ভাল হোক্‌। আবার তাই হ'লে দোষ কি? বিলাতী কাপড় শস্তা ব'লে কি সবাই কেনে? তা হ'লে বিলেতে আমাদের দিশী কাপড় কেনে না কেন? কেনা-বেচা, খাওয়া-পরা সবতাতে ত আপনীর মুখ দেখা হওয়া চাই। কেমন, দাদাবাবু? যদি বিলেতে এ দেশের কাপড় না পরে, তা হ'লে এ দেশেই বা বিলেতের কাপড় পরবে কেন?

খাওয়াও সেই রকম। যে দেশে যেমন খাওয়া, সে দেশের লোক সেই রকম খাবে, এই ত জানি। সাহেবেরা যা খায়, তা তাদের ভাল, আমরা যা খাই, আমাদের তাই বেশ। তবে বাবু-ভেইয়ারা বিলাতে দু'চার বছর থেকে দেশে ফিরে এসে সাহেব সাজে কেন, আর সাহেবী খানা খায় কেন? ওই যে বামুনদের ছেলে তিনটে পাস কোরে বিলেতে গিয়েছিল, সে ত বিলেতে মোটে তিন বছর ছিল, তার পর ফিরে এসে একেবারে সাহেব, সাহেবের মত খাওয়া-পরা, সাহেবের মত চলা-ফেরা, সব সাহেবী রকম। আর সাহেব যারা তিরিশ বছর এ দেশে থাকে, তারা ত বাঙ্গালী হয়ে যায় না, বাঙ্গালীর মত ধুতি-চাদর পরে না, মাছের ঝোল ভাত খায় না। সাহেব সাজলে কি পউরুষটা বাড়ে? আর সত্যি সত্যি যে সাহেব নয়, সে কি কখনো সাহেব হ'তে পাবে? আবার এই যে বিলেত না গিয়েই সাহেব সাজে, এ কি রকম দাদাবাবু? তুমি ত অনেক টাকা রোজগার কর, তুমি ত সাহেব সাজ না? আমি যাদের বাড়ী কাজ করি, তাদের পাশের বাড়ীতে একঘর ভাড়াটে এসে কিছু দিন ছিল, একেবারে মস্ত সাহেব অথচ বিলেত কখনো চক্ষেও দেখে নি। বাড়ীতে চাকর নাই, খানসামা আছে, ঝি নেই, আয়া আছে। বাপপিতোমো ভূঁয়ে আসন পেতে খেত, এখন এরা টেবিল না হ'লে খেতে পারে না। ঘাগরা-পরা একরত্তি একটা মেয়ে চাকরকে ডাকত, খানসামা, মেম-সাহেব বোলাতা হায়। মেমসাহেব ত মেম-সাহেব, একেবারে শ্যাওড়া গাছের পেত্নী! হ্যাঁ গা বউদিদি, তোমায় যদি কেউ মেম-সাহেব বলে, তা হ'লে কি তোমার ভাল লাগে? এমনতর অনাছিষ্টি ত কোথাও দেখি নি! এক দিকে মহাত্মা গাঁধী, সি আর দাশ আর পণ্ডিত মতিলালকে দেখ, আর এক দিকে এই সাহেব-মেম দেখ। রাম চাটুর্য্যের ছেলে হরি চাটুর্য্যে কি না সাহেব! বাপ ধু'ত প'রে ছাতি মাথায় দিয়ে ঠুক্‌ ঠুক্‌ কোরে আফিসে যেত, বাড়ীতে গামছা কি ঠ্যাঙে-ওঠা কাপড় প'রে থাক্‌ত, আর ছেলে হ্যাট-কোট পরে পা ফাঁক কোরে দাঁড়িয়ে চুরুট ফুঁকচে! বলে কার গুষ্ঠীতে কে জন্মায়। এ কি দত্যি-বংশে পেল্লাদ, না মনিষ্যি-বংশে বাঁদর?

তোমরা হয় ত বল্‌বে, তোদের বাসন-মাজা, ঘর নিকোনো কাজ, তোদের অত সাত-সতেরোর খোঁজে দরকার কি? তা সত্যি দাদাবাবু, কিন্তু এখন আর সে কাল নেই, সে কাল নেই। ঝি, চাকর, মুটে-মজুরের মেজাজ দেখচ ত? পাণ থেকে চুণটি খস্‌বার জো নেই, তুমি ছাড়া তুই বল্‌লেই চক্ষু দুটি যেন জবা-ফুল! আজকাল যে সময় পড়চে, দাদাবাবু, সবাইকে সব কথা ভাবতে হয়। এ যেন দেখতে দেখতে যুগ উল্টে যাচ্ছে, দেশে এমন কোটালে বান্‌ ডেকেচে যে, সব যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এখন মা কালীর ইচ্ছে!

গল্প ও অল্প

হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হিঃ! হিঃ! হিঃ! হিঃ!—হাস্‌তে হাস্‌তে পেটে ব্যথা ধ'রে গেল। আরে না হেসে কি থাকা যায়—হাঃ! হাঃ! হাঃ হাঃ! বাপ, কি ভয়টাই পেয়েছিলুম। এখনও মনে হ'লে গায় কাঁটা দেয়। কথাটা কি! তাই ত বল্‌চি। বল্‌তে গেলেই হাসি পায়। অত ব্যস্ত করিস্ কেন? বোস না, বল্‌চি।

দেখ্ ভাই ছিরে, যখন আমি সহরে চাকরী কোরতে আসি, তখন সব আমায় পাড়াগেঁয়ে ভূত বল্‌ত—বুঝেছিস্, ভূত। ভূতও বুঝি সহুরে আর পাড়াগেঁয়ে হয়? পাড়াগাঁয়ে ছেলেবেলায় কি কর্‌তাম, জানিস্ তো? চৌধুরীদের বাগান থেকে জামরুল পেড়ে খেতুম, শালিক পাখীর বাসা থেকে ছানা পেড়ে আন্‌তুম। একবার সেই ভট্‌চার্য্যি-দের মাচা থেকে লাউ পেড়ে আন্‌তে বাপ! কি মারটাই মেরেছিল। পাড়াগেঁয়ে ভূতের বুঝি এই সব কাজ! আর সহুরে ভূত বুঝি, গন্ধ মেখে, হাতে ফুলের তোড়া নিয়ে, বুকে চাদর এঁটে গড়ের মাঠে বেড়িয়ে বেড়ায়! তখন তখন পাড়াগেঁয়ে ছিলুম বৈ কি! আরে তোর চেয়ার, টেবিল, সোফা, বাহারে বাহারে ছবি, এত শত সাত-সতের পাড়াগেঁয়ে কে জানে?

তখন ভাই, কথায় কথায় নাকাল হতুম। নতুন নতুন কথা শুনতেই দিন যেত। বাবু বল্লে, "ও কেনারাম, ড্রয়িং-রুম থেকে অ্যালবামটা নিয়ে আয় ত!" কি বলে রে বাবা! যদি জিজ্ঞাসা করতে যাই ত তেড়ে খেতে আসে। সেই সাজান ঘরটায় গোটাকতক ছোট ছোট পিঁড়ী ছিল, তার উপর আবার গদি মোড়া—ঠিক যেন শালগ্রামের সিংহাসন। আমি অনেক ঠাউরে তাই একটা নিয়ে এলুম। বাবুর হাসির চোটে ঘর ফেটে গেল। "আনতে বল্লুম অ্যালবাম, নিয়ে এল ফুটষ্টুল! বেটা পাড়াগেঁয়ে ভূত কি না!" বাড়ীর ভিতরে ছেলে-মেয়েরা সারাদিন আমার কথার ছল ধরত আর আমায় ক্ষেপাত; তাদের উপদ্রবে পাড়াগেঁয়ে ভূত সহর ছেড়ে পালায় আর কি! সেই এক কাল গিয়েছে—বুঝ্‌লি ছিরে! কৈ, এখন ত আর কেউ পাড়াগেঁয়ে ভূত বলে না। আজকালকার দিন ভূতও আবার মানুষ হয়। এখন আমি বাবুর খাস চাকর। আমি কাপড় না কুঁচিয়ে দিলে বাবুর এখন পছন্দ হয় না, সখের যত জিনিস, আমি না এনে দিলে এখন আর মনে ধরে না! বাবা, সেই কেনারাম, পাড়া-গেঁয়ে ভূত—হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! গল্পটা কি? আরে তাই ত বল্‌চি—তা অত তাড়াতাড়ি কেন? গল্প বল্‌চি না ত পাঁচালি গাইচি না কি? হাঁ দেখ, ছিরে, অমন ক'রে তাড়া দিলে সব ভুলে যাব, আসল কথাটাই বলা হবে না। তুই ততক্ষণ আর একবার তামুক খা না। হাঁ ভাই, বল্‌ছিলাম কি যে, এখন ত আর পাড়াগেঁয়ে ভূত নই। বাপ, কতই দেখলুম, কতই শিখলুম এই সহরে এসে! এই যে জুতো পায় দিয়ে রয়েচি, বাপ-পিতামহ কি কখন এমন দেখেছিল? বাবুর কাপড় যখন কোঁচাই, তখন কি আমার একখানা কাপড় কোঁচাই নে? বাবু বেড়াতে গেলে, আমি—ঘর আগ্‌লে ব'সে থাকি, কেন? তা আমার কি প্রাণে কোন সাধ যায় না? আমায় কত বিশ্বাস জানিস্? ও সব গন্ধ জিনিস-টিনিস আমার হাতেই থাকে—বুঝেছিস্, তা আমি—সে কি আবার বল্‌তে হবে না কি? মদটা আসটাও বাবুর একটু আধটু চলে—সেও আমার হাতে। এখন আর পাড়া-গেঁয়ে ভূত নেই—এখন নড়তে চড়তে কেনারাম—কেনারাম নইলে আর কিছু হয় না। তা এই যে বাবু পাঁচ শো টাকা মাইনে পান, আর আমি আট টাকার চাকর, বাবুতে আর আমাতে তফাৎ কি? বাবু না হয় লিখতে পড়তে শিখেছে, আমি শিখিনি—এই যা। বাবু কি আমার চেয়ে সেয়ানা? আমি যে তাকে এই এত ঠকাই, সে কি কিছু টের পায়? কি বল্লি, কপাল? তাই হবে।

গল্পটা বলব? এই বলি। আরে, সে বড় মজার—বাপ, এমন ভয় আমি কখন পাই নি। গেল বার পূজার সময়, বুঝেছিস, বাবু বাড়ী যাবে ব'লে অনেক জিনিস কিনেছিল। আমিও দেশে যাব—কিছু কিনেছিলুম। যাবার দু'দিন আগে রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া কোরে, জিনিষপত্র সব দেখে শুনে বাবু ঘুমুলো। ঘরে একটা ছোট্ট আলো এক কোণে

ঢাকা ছিল—প্রায় অন্ধকার, বেশী আলো থাকলে বাবুর ঘুম হয় না। আমি বাবুর পাশের ঘরে শুয়েছি। খানিকক্ষণ আগডুম বাগডুম কত কি ভেবে ঘুমিয়ে পড়লুম।

"সাপ!"

"বাপ!" ব'লে চেঁচিয়ে এক লাফে আমি ঘরের বাইরের বারান্দায়।

বাবু ডাকে, "ওরে কেনারাম, দৌড়ে আয়। আমায় সাপে কামড়েছে! একবার দেখে গিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয়।"

আমি ঘরে ঢুকি আর আমাকেও খাক্! চাকরী কোরতে এসেছি ব'লে ত আর প্রাণ দিতে আসি নি। আমি বললুম, "বাবু, আমি চললুম ডাক্তারের কাছে।"

বাবু বলে, "আরে, না, না, ডাক্তার আস্‌তে ততক্ষণ আমি ম'রে থাকব। শীঘ্র এসে আমার পা বেঁধে দিয়ে তবে ডাক্তার ডাকতে যা।"

আমি বললুম, "বাবু, আপনি তবে বাইরে বেরিয়ে আসুন। ও ঘরে যেতে আমার বড় ভয় কোর্‌চে। আমায় যদি তেড়ে খায়!"

"তবে রে বেটা নেমকহারাম, আমি মরি আর তোর প্রাণের ভয় বড় হ'ল!"

আমি বললুম, "বাবু, আপনার যা হবার, তা ত হয়েচে, আমায় আর কেন মারেন? আপনি বেরিয়ে আসুন না।"

বাবু বললে, "আরে কেনারাম, আমি যদি চলতেই পারব, তা হ'লে আর তোকে ডাকব কেন? আমার সর্ব্বশরীর কেমন কোর্‌চে, মাথা ঘুরুচে, কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। আমি মরি, আর তুই এসে একবার আমায় দেখবি নে? তোর শরীরে কি দয়ামায়া নেই?"

দেখ ভাই ছিরে, তখন আর চুপ কোরে থাকতে পারলুম না। দেশলাই-কাঠি একটা জেলে আলো জাললুম। দরজার একটা হুড়কো ছিল, সেইটে না নিয়ে বাবুর ঘরের দরজাগোড়ায় গেলুম, হুড়কোটা রেখেছি এগিয়ে—যদি কিছু দেখি ত এক ঘা দিয়েই দেব দৌড়। আমায় দেখে বাবু বল্লে, "আয় না, তোর কোন ভয় নেই!" না, তা কি আর আছে! হয় ত ঘরের ভিতর গজ-রাচ্ছে, আমি গেলেই আমায় খেয়ে ফেলবে। সে কথাটা আর না ব'লে প্রাণটা হাতে কোরে আমি বাবুর কাছে গেলুম। বাবু ঘরের কোণে মাটীতে ব'সে আছে, দরদর ক'রে ঘাম পড়চে, চোখ কপালে উঠেচে। আমি দেখে ভাবলুম, আর ডাক্তার ডেকে কি হবে! যার কাল এসেচে, তাকে আর ডাক্তারে কি কোরবে! বাবুর পায়ের বুড় আঙ্গুল দিয়ে রক্ত পড়চে। বাপ্‌ রে, কি সর্ব্বনেশে কামড়টাই কামড়েছে! বাবু কোঁচার কাপড় এঁটে হাঁটুর নীচে বেঁধেচে। আমি চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলুম, "বাবু, সেই নতাটা কোথায়?"

বাবুর সর্ব্বশরীর এলিয়ে পড়েচে। বললে, "ওই খাটের ভিতর ছিল, কি জানি এখন কোথায় আছে?"

আমি দূর থেকে আলোটা তুলে ধ'রে মশারির ভিতর চেয়ে দেখি—ওরে বাবা রে! আমি বাবুকে একেবারে হড়-হড় কোরে টেনে আমার ঘরে নিয়ে এসে দরজা বন্ধ কোরে দিলুম। খাটের ভিতর এতখানি চক্র ধোরে—বাপ্‌ রে, গিয়েছিলুম আর কি!

বাবু বললে, "দেখছিস কি, বাঁধ, বাঁধ, যা কিছু থাকে, তাই দিয়ে প্রাণপণে বাঁধ, যেন বিষটা না উঠে।"

এ দিকে বিষ যে প্রায় মাথায় উঠল, বাবু তার কিছুই টের পায়নি। আমি তার মন বোঝাবার জন্য আলনার দড়ী ছিঁড়ে পায় খুব ক'রে বাঁধলুম। যেখানে যেখানে বাঁধলুম, তার দুই দিকে ফুলে উঠল। তখন বাবু বল্লে, "ওটা কি এখনও খাটে আছে না কি?"

"আছে বৈ কি!"

"তবে একবার ভাল ক'রে দেখ দেখি। যদি জাত সাপ না হয় ত কোন ভয় নেই।"

রাত্রে না কি আর কিছুতে খায়। তবু যদি চক্র আমি না দেখতুম! তা সে কথা বললে বাবু আরও ভয় পাবে ব'লে আমি আলোটা হাতে কোরে একটা জানলা খুলে দেখলুম। সেখান থেকে বেশ দেখা যায়, কোন ভয় নেই। চক্র—কৈ নেই ত! প্রথমবার দেখবার ভুল হয় নি ত? কিন্তু মস্ত একটা বিছানায় প'ড়ে রয়েচে। জানলায় ঠক্‌-ঠক্‌ কোরে শব্দ কোরলুম, তা নড়েও না, চড়েও না। এ আবার কি জাতের, খোলস ছাড়ছে বুঝি, তা হ'লে খাটে উঠবে কেমন করে? গলা খাঁকরানি দি, তবু নড়ে না। হুড়কোটা নিয়ে খাটের বাজুতে বারকতক ঠক্‌-ঠক্‌ করলুম—কিছুতেই কিছু হয় না। তখন আমি বুঝতে পারলুম যে, ওটা ঘায়েল হয়েচে। তবে আর ভয় কি! আর দু'চার ঘা দিলেই হয়ে যাবে।

দেখ্ ভাই ছিরে, এমন আশ্চর্য্য কখন দেখি নি। অত যে ভয়, কোথায় যেন চ'লে গেল। বাবুকে বললুম, "বাবু, আপনি যখন খাট থেকে নামেন, তখন কি ওটার ঘাড়ে পা দিয়েছিলেন?"

"অত কি আমার মনে আছে! কিন্তু আমার পায়ের তলায় যেন কি পড়েছিল।"

আমি বললুম, "তবে ঠিক হয়েছে। আপনার পায়ের তলায় প'ড়ে ওটা জখম হয়েছে।" এই ব'লে আমি বাবুকে তুলে ধ'রে দেখালুম। বাবু বল্লে, "হ্যা রে, ওইটে। রে! তা এখন ত কোন ভয় নেই, নড়তে পারচে না, তুই একবার দেখ্ না, কি ওটা!"

"ভয় আবার কিসের? আমি এখুনি দেখচি." ব'লে আমি দরজা খুলে. হুড়কো হাতে কোরে আস্তে আস্তে মশারির এক কোণ তুলে একেবারে দে দমাদম! সাপের গুষ্টি সেখানে থাকলে তাদের নির্ব্বংশ কোরে ফেলতুম। খাটখানা ভেঙ্গে যায় আর কি! তার পর সে আর নড়বে না, সে ত জানাই কথা। তখন আমি আলোটা কাছে নিয়ে ধ'রে দেখি—ও—হোঃ! হোঃ! হোঃ! হোঃ! হাঃ! হাঃ হাঃ! হাঃ! হিঃ! হিঃ! হিঃ! হিঃ!—ও—

বাবু বল্লে, "বেটা আমার শ্বাস হয়ে এল, আর তুই হেসে বাড়ী মাথায় কোরচিস? আমায় ত সাপে খেয়েচে, আর তুই কি সাপের পাঁচ পা দেখেছিস না কি?"

আমি হাসি চাপতে না পেরে বললুম, "আপনিও দেখুন না এসে।" ব'লে আমি বাবুর হাত ধ'রে জোর কোরে টেনে নিয়ে এলুম বাবু দেখে বল্লে, "সত্যি না কি!"

"সত্যি না ত আমি কি আর ভোজবাজি জানি না কি?"

বাবু বল্লে, "ওরে, বাঁধনগুলো খুলে দে, পা সমস্ত টাটিয়ে উঠেচে যে!"

বাবুর পায় আট দিন ফুলো ছিল, আর দশ দিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত।

বাবু বললে, "দেখ্ কেনারাম, তুই হাস্‌লি হাস্‌লি, অনেক দিনের চাকর, ক্ষতি নেই। আর আমি যে ভয় পেয়েছিলুম! তোর উপর এখন রাগ হচ্ছে না, কিন্তু খবরদার, আর কারুর কাছে যদি গল্প করিস্, টের পেলে তোকে তাড়িয়ে দেব।"

তা ভাই গল্পটা এই। জিনিষটা কি? বল্লে যে বাবু আমায় তাড়িয়ে দেবে! তোকে চুপি চুপি বলব, তুই কাউকে বলবি নি? মাইরি, কাউকে বলবি নি? আচ্ছা, তবে—খবরদার, খবরদার, যদি কাউকে বলিস্। সেটা একটা রেশমের নতুন কোমরবন্ধ, বাবু দেখবার জন্য বার কোরে খাটে তুলে ফেলে রেখেছিল। আউমাউ কোরে লাফিয়ে উঠতে বাবুর পায়ে একটা পেরেক ফুটে গিয়েছিল, তাইতে রক্ত বেরিয়েছিল। দেখ্ ভাই ছিরে, তোরে এই বললুম —চুপি চুপি—কেউ যেন না টের পায়, বুঝেছিস? কি ভয়টাই পেয়েছিলুম, কি মজাটাই হয়েছিল— তোকে তাই চুপি চুপি বললুম—হাঃ! হাঃ! হাঃ! হোঃ! হোঃ! হোঃ! হোঃ! হোঃ!

চুলের কলপ

"যে চুলে কলপ দেয়, সে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, জুয়াচোর, অবিশ্বাসী, নরাধম!"

সভার মাঝখানে বসিয়া কথাটা আমি বলিলাম। বরদাকান্ত বাবু কয়েক জন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমার যাওয়া আসা সর্ব্বদাই ঘটে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একটি নূতন বাবু। আমার কথা শুনিয়া তিনি কটমট করিয়া আমার দিকে চাহিলেন। বরদা বাবু তাঁহাকে কহিলেন, তুমিও যেমন. ভোলানাথের কথায় আবার রাগ কোর্‌চ। ওকে এখানে সকলেই জানে, লোকটা চিরকাল রগচটা, যা মনে আসে, তাই বলে।"

নূতন বাবুটি বলিলেন, "তাই ব'লে কি দশ জনের সম্মুখে ভদ্রলোককে অপমান কোরবে?"

তখন সকলে মিলিয়া অনেক করিয়া বুঝাইয়া বাবুকে ঠাণ্ডা করে।

বাবুটি চুলে কলপ দেন। কেন দেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। বাবুর দ্বিতীয় পক্ষের কি তৃতীয় পক্ষের সংসার, কিংবা নূতন বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু কথাটা বলায় যে কোন দোষ হইয়াছে, আমার তাহাও বোধ হয় নাই।

চুলে কলপ দেওয়ার অর্থ কি? পলিতকেশ কৃষ্ণবর্ণ করা, বয়স গোপন করা, যৌবনাতীতের যৌবনের ভাণ করা। কেন? হয় ত ঘরে বালিকা কিশোরী অথবা যুবতী স্ত্রী আছে, হয় ত যৌবনের সুখলালসা আছে, হয় ত বর্ষীয়ান্ বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করে। যে কারণই থাকুক, কপটতাই তাহার মূল। কেশ শুভ্র হইয়াছে, কিন্তু লোকের কাছে কৃষ্ণকেশ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা করে। বয়স পঞ্চাশের উপর, কিন্তু লোকে যাহাতে মনে করে ত্রিশের উর্দ্ধ নয়, সেই চেষ্টা। যৌবনের উদ্যম নাই, বল নাই, উত্তেজনা নাই, তথাপি যৌবন উত্তীর্ণ হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না। উপস্থিত জরা ত্যাগ করিয়া অতীত যৌবনের জন্য লালায়িত।

দাঁত পড়িয়া গেলে দাঁত বাঁধাইবার কতক কারণ আছে। আহারের সুবিধা হয়, কথাবার্ত্তা কহিতে পারা যায়। কিন্তু চুলে কলপ দিবার প্রয়োজন কিছু নাই, প্রবঞ্চনাই একমাত্র উদ্দেশ্য। চুলে কলপ দিলে কি যম প্রবঞ্চিত হয়, যৌবন কি ফিরিয়া আসে, বয়স কি বসিয়া থাকে? যাহার কেশ শুভ্র হইয়াছে, সে শুভ্র কেশ দেখাইতে লজ্জা পায় কেন? শুভ্র কেশে কি শোভা নাই, সৌন্দর্য্য নাই? যে দেশে প্রাচীন হইলে সকলের পূজ্য হয়, প্রাচীনের কথা সকলে স্বীকার করে, প্রাচীনের সম্মুখে যুবকেরা প্রণত হয়, সে দেশের বার্দ্ধক্যের তরে এক জনেরও লজ্জিত হইবার কথা নয়। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে কি কেহ চুলের কলপ জানিত না ব্যবহার করিত?

যযাতিচরিত হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আর্য্যগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, চিরযৌবন চিরসুখের উপায় নয়। যযাতি বৃদ্ধবয়সে চুলে কলপ দেন নাই, লোলচর্ম্মে অনুলেপন ব্যবহার করেন নাই, কৃত্রিম দন্ত ধারণ করেন নাই। বৃদ্ধবয়সে প্রকৃত যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। সহস্র বৎসর যৌবন ভোগ করিয়া তাঁহার মনে কি প্রীতি জন্মিল? না, পৃথিবীতে যাহা কিছু স্পৃহণীয় ভোগ্য পদার্থ আছে, তাহা সমুদয় উপভোগ করিলেও পরিতৃপ্ত হয় না, আকাঙ্ক্ষা-লালসা নিবৃত্তি হয় না। জরা যৌবনের স্বাভাবিক নিবৃত্তি। যৌবনের অশান্তি অপনীত হইয়া বার্দ্ধক্যের শান্তি. উপনীত হয়। চিত্তের চঞ্চলতা দূর হইয়া স্থিরতা আসে। কালের নিয়ম কি কলপে ফিরিবে?

চুলের কলপের যে সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাকে শূলে দেওয়া উচিত। জগতে মিথ্যা-কপটতা-প্রবঞ্চনা-প্রচারকের মধ্যে সে এক জন প্রধান; যখন জগতে সত্যের সমাদর ছিল, লোকে সরলপ্রকৃতি ছিল, তখন কেহ চুলে কলপ দিত না, যৌবন অতীত হইলে যৌবনের সুখলালসার প্রতি বীতরাগ হইত, বার্দ্ধক্যের গৌরব বুঝিত, শুক্লকেশ হইলে কৃষ্ণকেশ বলিয়া পরিচয় দিতে চাহিত না। এত সব প্রত্নপুরাতত্ত্ববিৎ আছেন, চুলের কলপ কে আবিষ্কার করিল, কেহ বলিতে পারিল না?

যখন সমাজের অবস্থা বড় মন্দ, চারিদিকে কপটতা ও কৃত্রিমতা, তখন চুলে কলপ দিবার প্রথা সমাজে প্রচলিত হইয়া থাকিবে। অকারণে কিছুই হয় না। যে পর্য্যন্ত সমাজ স্বাভাবিক নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত, সে পর্য্যন্ত বয়স বা বার্দ্ধক্য

গোপন করিবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। বাল্যে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনে সংসারাশ্রম, বার্দ্ধক্যে বিষয়বুদ্ধির নিবৃত্তি—ছলনা-প্রবঞ্চনার প্রয়োজন হইত না। ক্রমে জীবন ও সমাজের প্রশস্ততা সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল, নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যের প্রতি আস্থা শিথিল হইতে আরম্ভ হইল, যৌবন অতীত হইতে আরম্ভ হইল, কিন্তু যৌবনের লালসা অতীত হইল না, জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সকলে বিস্মৃত হইল, জীবনের ক্ষুদ্র ভোগসুখলালসা প্রবল হইতে আরম্ভ হইল। বৃদ্ধ ব্যক্তি যুবতী অথবা বালিকা ভার্য্যা গৃহে আনয়ন করিল। ঘরে যুবতী ভার্য্যা, তাহার সাক্ষাতে বৃদ্ধ বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হয়, বাহিরে দশ জনের সাক্ষাতে পলিতকেশ দেখাইতে লজ্জা করে। সাদা চুল কি কালো হয় না? হয় বই কি! চুলের কলপ এককালে গোপনে বিক্রয় হইত, অনেক ব্যয় করিয়া চুলের রং ফিরাইতে হইত। এখন সে কালই নাই। কাগজে কাগজে চুলের কলপের বিজ্ঞাপন, গলিতে গলিতে দোকান। বিক্রেতার লজ্জা নাই, ক্রেতার লজ্জা নাই। যেমন কাপড়-চোপড়, ঔষধপত্র, মদ, গাঁজা প্রকাশ্যে বিক্রয় হইয়া থাকে, চুলের কলপও সেইরূপ প্রকাশ্যে বিক্রয় হয়। টেকো মাথার জন্য পরচুলা, সাদা চুলের জন্য কলপ, মুখের জন্য রং কোন্ দোকানে না পাওয়া যায়? সপ্ততিবর্ষীয় বৃদ্ধের জন্য যদি দশ বৎসরের কন্যা পাওয়া যায়, তাহা হইলে সাদা চুলের জন্য কলপ পাওয়া যাইবে না কেন? অন্য দেশে—যে সকল দেশের দেখা দেখি এ দেশে যৌবনলালসা এত বাড়িয়াছে—সকল প্রকার কু-প্রথাই আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কিছু আছে। বার্দ্ধক্যে কেবল যৌবনের ইন্দ্রিয়প্রবণতা নাই, যৌবনের উৎসাহ, উদ্যম, একাগ্রতা আছে, স্বার্থশূন্য পরিশ্রমের আদর্শ দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের দেশে পাকা চুলে কলপ দিবার প্রথা আছে—আর কি আছে?

সাদা চুল যেমন কালো করিতে পারি, কালো মুখ তেমনি সাদা করিতে পারিলে লাভ হইত। কত সাবান, কত মিল্ক অব রোজ, কত ক্যালিডর মাখিলাম, কিন্তু কালো মুখখানা কখন গোরার মুখের মত হইল না, গোরা বলিয়া কখনো কাহারও মনে ভ্রম জন্মিল না। দেশের গুণে রৌদ্রে পুড়িয়া কেবল কাল হয় নাই, বাস্তবিকই আগুন দিয়া মুখ পোড়াইয়াছি। শক্রর লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া এ মুখ কালো হয় নাই, আত্মগৃহদাহের কলঙ্ক এই মুখে লাগিয়া রহিয়াছে। চুলের কলপ মুখে দিলে বরং আমাদের মানায়, কিন্তু তাহার বিশেষ আবশ্যক নাই। যে কলঙ্ক সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা অনেক দিন ভোগ করিতে পারি। আমাদের জাতীয় প্রাচীনতা কি চুলের কলপে দূর হইয়া যাইবে?

প্রাচীন বলিয়াই যদি আমাদের মনে অহঙ্কার থাকিবে, তাহা হইলে আমরা যৌবনের বুলি বলিব কেন? যৌবনের ভাণ করিব কেন? যৌবনের বেশ ধরিব কেন? শুভ্র কেশ লইয়া, বার্দ্ধক্যের বহুদর্শিতা, বিজ্ঞতা লইয়া, শান্ত প্রসন্ন চিত্তে কালযাপন করিতাম, গতযৌবনের অনুশোচনা করিতাম না। যে দিকে চাহিয়া দেখি, যৌবন নাই, যৌবনের প্রাণশূন্য প্রতিমূর্ত্তি আছে; যৌবনের বল নাই, যৌবনের বিভ্রম আছে; যৌবনের দৃঢ়তা নাই, যৌবনের চাঞ্চল্য আছে; যৌবনের উৎসাহ নাই, যৌবনের লালসা আছে। চুলের কলপ চারিদিকে, সব ঝুঁটা, সব প্রবঞ্চনা, সব মিথ্যাময়।

চলিয়াছে যখন, তখন চলুক। কলপ দিয়া সাদা চুল কালো কর, বাঁধান দাঁত বাহির করিয়া যুবকদিগের মধ্যে বসিয়া হাস, বর্ষীয়সী স্ত্রীর বিয়োগান্তে বালিকার পাণিগ্রহণ কর, পৃথিবীর চক্ষে ভেল্কি লাগাও, যমকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা কর। কিন্তু তাই বলিয়া কি আমি গালি দিব না?

কোঁচার কথা

গদা চাকর যখন আমায় সাজাইতেছিল, তখন আমার মনে মনে বড় রাগ হইতেছিল। একে ত চাকরের হাতে পড়াই অপমানের কথা, কিন্তু যখন একখানা ছেড়া মাদুরের উপর ফেলিয়া, আমার বুকে পা দিয়া, আঙ্গুল দিয়া, গলা টিপিয়া গদা আমার সজ্জা করিতে লাগিল, তখন আমি লজ্জায়, রাগে, দুঃখে, অপমানে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমি কোঁচা, আমি বাবুর অঙ্গের ভূষণ, আমার গায়ে কি না একটা সামান্য ইতর চাকর পা দেয়! আর সে যখন আমায় কুঞ্চন করে, তাহার হাতের তামাকের গন্ধে আমার নাড়ী উথলিয়া উঠে। কি করি, কাপড়খানি ফর্‌সা, ইস্ত্রী করা, আমাকেও ফর্‌সা থাকিতে হয়, কাজেই নাক টিপিয়া কোন রকম করিয়া চুপ করিয়া থাকি।

মনের দুঃখ যায়, যখন বাবুর অঙ্গে উঠি। যখন তাঁর মোটা-সোটা ঘৃত-নবনীতপুষ্ট ভুঁড়িখানি জড়াইয়া, তাঁহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়ি, তখন প্রাণ একটু শীতল হয়। বাবু যখন নানাবিধ গন্ধসামগ্রীতে তাঁর কোমল দেহ সুবাসিত করেন, তখন দুই এক ফোঁটা আমারও গায়ে পড়ে আমি তখন গদার হাতের দগ্ধ গন্ধ ভুলিয়া যাই। বাবু হাতে করিয়া আমাকে একবার ঝাড়িয়া লইলে, আমি আনন্দে বুক ফুলাইয়া আবার তাঁর পদাশ্রিত হই। বাবু নহিলে কোঁচার মর্য্যাদা বুঝিবে কে?

যে আমায় জানে, সেই আমার মর্ম্ম বুঝে। যখন বাবু পথে চলেন, আমি দোদুল্যমান হইয়া কত তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করি। পথে লোক দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমার সুখ্যাতি করে। বলে, "কোঁচার বাহারখানা দেখিয়াছ?" এই যে শান্তপ্রসাদ বাবু, একবারমাত্র বিবাহ করিয়াছেন, বয়স চল্লিশের নীচে, তিনি ইহারই মধ্যে বুড়াইয়া গেলেন কেন, আর রসময় বাবু, তিন সংসার, বয়স ষাটের কাছাকাছি, তিনিই বা এমন রসিক যুবা পুরুষ কেন? কারণ, শান্তপ্রসাদ বাবু মোটা থান ধুতি পরেন, কখন কাপড় কোঁচাইয়া পরেন না এবং রসময় বাবুর সিমলার কালাপেড়ে কাপড় খুব ভাল কোঁচান। কাপড় কোঁচাইবার তাঁহার আলাদা লোক আছে। সে অতি সাধু ব্যক্তি পেয়ার্সের সাবান দিয়া হাত ধুইয়া তবে কাপড় কুঞ্চন করিতে বসে। আমার ইচ্ছা, আমি রসময় বাবুর বাড়ীই থাকি। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের ফলভোগ কেমন করিয়া এড়াই? তাই লক্ষ্মী-সরস্বতীর ন্যায় আমায় বাড়ী বাড়ী ফিরিতে হয়। রসময় বাবুও কোঁচা ছাড়েন না, যৌবনও তাঁহাকে ছাড়ে না।

তোমরা যদি যথার্থ বাবু হও ত বুঝিতে পারিবে যে, আমি কেবল তোমাদের নটবর বেশের শোভা সম্পাদন করি না। আমি না থাকিলে তোমাদের কি হইত? খোট্টাদের মত কি ধড়া বাঁধিয়া বেড়াইতে, না মুসলমানের মত ইজার পরিতে? তাহা হইলে এই ঝুরু ঝুরু বসন্তের বাতাস, এই ভুরু ভুরু কামিনী-ফুলের গন্ধ ত একেবারে মাটী হইত। দেখ, আমি তোমাদের স্বভাবের অনুযায়ী, সর্ব্বদা তোমাদিগের বিঘ্ন-বাধা হইতে রক্ষা করিয়া থাকি। দেখ, এই কোমল বঙ্গদেশে, এই কোমল বাঙ্গালী, কোঁচার অভাবে কত বিপদেই পড়িত। এখন বাবু কোঁচা দোলাইয়া ধীরে ধীরে মরালগমনে চলেন, ভয়—পাছে কোঁচার ফুল খারাপ হইয়া যায়। যদি আমি না থাকিতাম, তাহা হইলে এ ধীরচলন কোথায় থাকিত? হয় ত বাবু বেগে চলিতেন, হয় ত কখন দৌড়িতেন ও দেশসুদ্ধ লোক হাসিত। বাবু যেমন, আমি তেমনই। বাবু শীতাতপকাতর, নিদ্রালস্যপ্রিয় স্বল্পপ্রাণ; আমি পবনের বেগে অস্থির, বলপ্রয়োগে বিনষ্ট এবং আকর্ষণে ধরাশায়ী হই।

স্ত্রী এবং পুরুষে প্রথম বন্ধন আমি। অঞ্চলে এবং কোঁচায় গ্রন্থি পড়িলে, ক্রমশঃ হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন হয়। প্রবাসে প্রস্থানোন্মুখ স্বামীকে নিবারণকালে সুন্দরী কোঁচাই ধারণ করে। সেই কোমল হস্ত যখন আমার অঙ্গ স্পর্শ করে, তখন আমি পুলকে শিহরিয়া উঠি। অদৃষ্টের খেলা দেখ! গদার সেই কঠিন দুর্গন্ধময় হস্তে সৃষ্ট হইয়া সুন্দরীর পদ্ম-হস্তে উঠি।

ধুতি সর্ব্বত্র আছে, কিন্তু বঙ্গদেশ ছাড়া আর কোথাও কোঁচা দেখিয়াছ? পশ্চিমাঞ্চলে,

মহারাষ্ট্র প্রদেশে, মাদ্রাজে ধুতি অনেকেই পরে, কিন্তু কোথাও কোঁচার চলন নাই। বাঙ্গালীর মত বাবু, নিশ্চেষ্ট ও শান্তপ্রকৃতি আর কোথায় আছে ?

আমি ভাবি, কৃষ্ণের ব্রজলীলাকালে আমার সৃষ্টি হইল না কেন ? কৃষ্ণ রসিকচূড়ামণি, কোঁচার বাহার দিতে তাঁহাকে কেহ শিখাইল না কেন ? কদম্বতলে বংশীধ্বনি, বিচিত্র নিকুঞ্জলীলা, ধড়া বাঁধিয়াই সম্পন্ন হইল ! কৃষ্ণের পীতধড়া না হইয়া, দুগ্ধফেননিভ কোঁচা হইল না কেন ? কোঁচা করিয়া কাপড় পরিতে শিখিলে হয় ত কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জ্জুনে সারথ্য-কর্ম্ম করিতে পারিতেন না, কোঁচা জড়াইয়া সর্ব্বদা বিব্রত হইতেন। বাঙ্গালী বাবুর যুদ্ধের বালাই নাই, বেগ অথবা তেজ প্রকাশের প্রয়োজন নাই, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। নহিলে আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি হইত।

আমি বাবুদিগের বিলাস, আলস্য, শৈথিল্যের চিরকামনা করি, কারণ, তাহা হইলে আমি চিরজীবী হইব। তোমরাও সকলে কোঁচার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা কর।

বিভ্রাট

টেক্কা বলে, "আমি একলা করি কি ? ছিল যখন রাজা-রাণী, তখন তাদের উপর টেক্কা দিতুম। এখন ত আর সে বড়াই চল্‌বে না। ছিলুম সকলের সেরা, এখন ত আর কেউ পুঁছবেও না।"

দুরী বল্লে, "টেক্কা মশাই, রাজা-রাণী গেলেন কোথায় ?"

টেক্কা টেকো মাথা চাপড়ে বল্লে, "তাই যদি ছাই জান্‌ব, তা হ'লে আকাশ-পাতাল ভেবে মর্‌ব কেন ? সকালবেলা মুখ হাত ধুয়ে বেড়াতে বেরিয়েচি, ভাবলাম, রাজবাড়ীতে একবার ঢুঁ মেরে যাই। গিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই, দরজা জানালা সব হাট করা খোলা, ডাকাডাকি কোরে কারুর সাড়াশব্দ পাইনে, বাড়ীটা যেন খেতে আস্‌ছে।"

দুরী তার কুৎকুতে চোখ দুটো প্রাণপণে বড় কোরে বল্লে, "এমনতর আজগুবী কথা ত কোথাও শুনি নি! চারিদিকে সেপাই-সান্ত্রী, লোকজন গিস্‌গিস কোরছে, আর এক রাত্রের মধ্যে—ফুঃ, এক ফুঁয়ে সব উড়ে গেল! এ কি ভেল্কি-বাজী না কি, ঝুড়ির ভিতর থেকে ছোকরা উড়িয়ে দেওয়া! তা আপনি কি কাউকে জিজ্ঞাসা করেন নি ?"

"জিজ্ঞাসা আবার করি নি ? চৌরাস্তায় গিয়ে দোকানী পসারী, মুচি-মুদ্দোফরাশ সকলকে জিজ্ঞাসা করলুম, কেউ কিচ্ছু জানে না।" টেক্কা ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল নাড়া দিলে। একলা থাকে কি না, সভ্যতা ভদ্রতা কিছু জানে না।

এমন সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজির তিরী। টেক্কা জিজ্ঞাসা কোর্‌লে, "তিরী, খোঁড়াচ্চ কেন, কি হয়েচে ?"

তিরী বল্লে, "আরে মশাই, রাজা-রাণী নেই, তার আমি কি জানি! সহরশুদ্ধর রাগ আমার উপর। আমি আস্‌চি আপনাকে জিজ্ঞাসা কোর্‌তে, রাজা-রাণী কোথায় গেল, আর রাস্তার লোকে বলে, এই পাজী বেটা তিরীই যত নষ্টের গোড়া। কেউ বলে, তিন শত্রু ত ওই এনেছিল, কেউ বলে, তিন জিনিষটাই খারাপ, তিনটে কাণা কড়ি ভিখারীকেও দেয় না, ওই তিরীটাই ঘরের বিভীষণ, রাজা-রাণীকে ধরিয়ে দিয়েচে। এই যেই বলা, আর ছোঁড়াগুলো সব ঢিল-পাটকেল ছুঁড়্‌তে আরম্ভ করলে। আমি ত চোঁচা দৌড়, একটা ঢিল হাঁটুতে লেগেচে, তাই খোঁড়াচ্চি। রাজা-রাণী না থাক্‌লে কি দেশটা এমনি অরাজক হয় ?"

দেখতে দেখতে চৌকা, পাঞ্জা, ছক্কা, সাত্তা, প্রভৃতি সুড় সুড় কোরে এসে উপস্থিত। সকলের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, কেউ হয় ত ঢোক গিল্‌চে, কারুর চোখ কপালে উঠেছে। রাজা-রাণী কোথায় গেলেন ? চৌকা বলে এক কথা

ত আটা বলে আর এক কথা, নহলা আবার একটা নতুন মত বাহির করে।

টেক্কা বল্‌লে, "সকলে একসঙ্গে কথা কহিলে চল্‌বে কেন? তা হ'লে শুন্‌বে কে? এ একটা সঙীন ব্যাপার, আমাদেরই কখন্ কি হয়, বলা যায় না। এখন হাউকাউ কোরে কি হবে?"

চৌকা বল্‌লে, "সত্য কথা!"

টেক্কা বল্‌লে, "তোমরা যে এত জন রয়েচ, বিবেচনা ক'রে বল দেখি, এই যে কাণ্ডটা হয়েচে, এর মানে কি? রাজা-রাণী কি ছুঁচ যে, সুতো থেকে টুপ্ কোরে পড়ল আর খুঁজে পাবার জো নেই। আর সত্যি ত তাদের রাতারাতি পালক ওঠে নি যে, ভোরবেলা চড়াই পাখীর মত ফুড়ুৎ কোরে উড়ে যাবে?"

তিরী একটু ভারিক্কে রকম ভাবে বল্‌লে, "তা রাজা-রাণী যদি ভোরে উঠে শীকার কোরতে গিয়ে থাকে?"

পাঞ্জা ব'লে উঠ্‌লে, "শীকার কোরতে গিয়েছে না তোমার গুষ্টির পিণ্ড দিতে গিয়েচে! তিন কাণা কি না, তা না হ'লে অমন আঁকাড়া বুদ্ধি হবে কেন? সাধে কি ছোঁড়ারা তোমার ঠ্যাং ভেঙ্গে দিয়েচে! রাজা-রাণী যেন শীকারে গেল, সেই সঙ্গে কি সিপাই-বরকন্দাজ, চাকর-নফর, ভাণ্ডারী বামন, সখী, দাসী সব শীকারে গেল? বুদ্ধির দৌড়খানা দেখ!"

নহলা একটু এগিয়ে এসে বল্‌লে, "তা যেন হলে, কিন্তু রাজা-রাণী যে নেই, তাই বা সাব্যস্ত হ'ল কেমন কোরে? তাঁরা যখন ইচ্ছে, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন, লোকজনও নিয়ে যেতে পারেন।"

পঞ্জা নাক সিঁটকে বললে, "এইবার বুদ্ধি-বাচস্পতি মশাই এলেন। তা হবে না কেন? তিন ত্রিক্কে নয় ত!"

আটা বল্‌লে, "মিছে কথা-কাটকাটিতে কি হবে? কেউ কি ভাল কোরে খোঁজ নিয়েছে, কোন রকম খবর পাওয়া গিয়েছে? সে কথা না কয়ে মেয়েমানুষের মত নেই কোরলে কি হবে?"

দহলা এতক্ষণ এক পাশে চুপ কোরে ব'সে-ছিল। এখন বল্‌লে, "আমি সহরের চারিদিক ঘুরে লাল দরজায় গিয়েছিলাম। সেখানে কতক লোক বল্‌লে, রাত্রে বর্গী এসেছিল। কিন্তু বর্গী এসে সহর লুঠপাট করে নি, মশাল জেলে ঘর-দোর জালিয়ে দেয় নি, আর রাজবাড়ীতেই যদি বর্গী গিয়ে থাকে, তা হ'লে কোন গোলমাল হয় নি, এ কি রকম কথা! সেই জন্য আমি ও কথাটা চট্ কোরে বিশ্বাস করতে পারি নি।"

টেক্কা বল্‌লে, "কই, আমাকে ত কেউ বর্গীর কথা বলে নি।"

২

গোলাম যে গরহাজির, সেটা কেউ লক্ষ্য করে নি। রাজা-রাণী নেই, সেই জন্য সব ভয়-ভাবনায় পড়েচে, অন্য কোন দিকে ততটা খেয়াল ছিল না। আবার এরা সব ফোঁটাওয়ালা, গোলাম পাগড়ীওয়ালা। গোলামকে আস্‌তে দেখে সব বলাবলি করতে লাগল, "এই যে গোলাম আস্‌চে, তা হ'লে রাজা-রাণী কাছেই কোথাও আছে।"

গোলামের পাগড়ী এলোথেলো, মুখ পাঙাশ-বর্ণ, গলায় কাল্‌শিরা পড়েচে। সে আসতেই টেক্কা জিজ্ঞাসা করলে, "রাজা-রাণী কোথায়?"

গোলাম বল্‌লে, "সেই কথা ত আমি জানতে এসেচি।"

"বিলক্ষণ, তুমি থাক রাজবাড়ীতে তুমি সে খবর রাখ না?"

"কাল রাত্রে গিয়েছিলাম নতুন পাড়ায় নিম-ন্ত্রণে। ফিরতে অনেক রাত্রি হ'ল। ফিরে যাবার সময় দেখি, আট-ঘাট বন্ধ, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাহারা। মুখস-পরা সব পেল্লায় পেল্লায় মানুষ, কোন্ দেশের লোক, জানি না। আমি বললুম, আমি যাব রাজবাড়ী, পথে আমাকে আটক কর কেন? যমদূতের মত একটা লোক বল্‌লে, কোথায় তোর রাজবাড়ী আর কোথায় তোর রাজা? এই ব'লে আমায় এমন গলাধাক্কা দিলে যে, আমার গলার হাড় যেন ভেঙ্গে গেল। তার পর পথের ধারে একটা ঘরে আমায় পূরে বাইরে থেকে শিকল দিলে। সকালবেলা আমার চেঁচামেচি শুনে রাস্তার একটা লোক দরজা খুলে দিলে। শুন্‌লুম, রাজবাড়ীতে জনমনুষ্য নেই।"

ফোঁটাওয়ালা ভয়ে জড়সড়, এ ওর মুখের দিকে চাইতে লাগল। টেক্কা বল্‌লে, "কই, এ কথা ত আমাকে কেউ কিছু বলে নি। তারা রাক্ষস নয় ত, হয় ত রাজা-রাণীকে খেয়ে ফেলেচে!"

গোলাম বল্‌লে, "যেমন তুমি এক ফোঁটা, তেমনি তোমার বুদ্ধিও এক ফোঁটা! রাক্ষস হ'লে আমাকে খেত না? তারা যাবার সময় ব'লে

গেল, এ দেশে আর আসবে না, এখানকার কাজ হয়ে গিয়েচে।"

তখন সব হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। টেক্কার কিন্তু ভারি রাগ হয়েছিল, গোলামকে চোখ রাঙ্গিয়ে বল্‌লে, "জান না, আমি টেক্কা ?"

গোলাম বল্‌লে, "জান না, আমি গোলাম, টেক্কা এক কুড়ি ? আর তুমি কি ? যতক্ষণ রাজা-রাণী, ততক্ষণ তুমি টেক্কা, নইলে শুধু ফোকা। তোমার চেয়ে দুরীও বড়।"

টেক্কা থ হয়ে গেল। গোলামের কথা শুনে সকলে ভাবতে লাগল, যদি রাজা-রাণী গেল, তা হ'লে রাজ্য চালাবার কি উপায় ?

৩

রাজা-রাণীই যেন গিয়েছে, তা ব'লে দেশটা ত আর যায় নি। দেশ ত রক্ষা করতে হবে, দেশের কাজ-কর্ম্ম ত চালাতে হবে! রাজা গেলে দেশে অরাজক হয় সত্য, কিন্তু রাজা যদি মোটেই না থাকে, তা হ'লে ত আর একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে, হাত গুটিয়ে চুপটি ক'রে ব'সে থাক্‌লে ত হবে না। রাজ-রাণী ত একেবারে গিয়েছে, আর ফিরবে না। রাজবাড়ীও ভোঁ ভোঁ করচে। লাগায়েৎ রাজা-রাণী থেকে ইস্তক মশাল্‌চী, মেথর পর্য্যন্ত নেই। যদি আবার একটা নতুন রাজা ক'রে রাজবাড়ীতে রাখা যায়, তা হ'লে সেই মুখস আঁটা তালগাছের মত মানুষগুলো আবার রাতারাতি এসে তাকে নিয়ে যাবে, হয় ত রাগ কোরে সহর শুদ্ধ ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবে ফোঁটাওলাদেরও আর কেউ দেখতে পাবে না। না বাপু, রক্ষে কর, রাজা-রাণীতে আর কাজ নেই! চাচা আপন বাঁচা!

ভাবতে ভাবতে হরতন আর রুইতন ত একেবারে ফিকে হয়ে গেল, ইশকাপন আর চিড়িতন ভয়ে কালো হয়ে গেল।

টেক্কা বল্‌লে, "তাই ত ছিলুম আমরা বেশ, কোত্থেকে এ এক বিষম বিভ্রাট এসে উপস্থিত। তা গোড়ার কথা এই যে, রাজা যদি নাই রইল, তা হ'লে প্রধান হবে কে? মাথার উপর ত এক জন থাকা চাই।"

দুরী বেচারি নিতান্ত গরীব কি না, আর সকলের নীচে তার স্থান, তাই সে সকলের খোসামোদ ক'রে বল্‌লে, "প্রধান ত আপনি রয়েছেন। আপনার পায়া রাজার উপর। আপনি ত একা একেশ্বর।"

টেক্কা বুক ফুলিয়ে চারিদিকে চেয়ে বল্‌লে, "তা বটেই ত, আমি ত রাজার উপরে বরাবর টেক্কা দিয়ে এসেছি। প্রধান আমি ছাড়া কে হবে ?"

গোলাম ঠোঁটকাটা, তা না হ'লে গোলাম হবে কেন ? বল্‌লে, "ওগো টেক্কা মশাই, একবার যা বলা হয়েচে, সে কথাটা আবার পাল্টে শুনতে হবে না কি ? তবে শোন—

রাজা-রাণীর পাশে থেকে টেক্কা হ'ল ধন্য,
রাজা-রাণী গেল যদি, টেক্কা তবে শূন্য!"

সকলে বল্‌লে, "বাঃ বাঃ বেশ বলেচ! রাজা-রাণী যদি গেল, তবে টেক্কা বড় হ'ল কিসে? আমরা সবাই ওর চেয়ে বড়। ফোঁটা গুণে দেখ।"

বাহবা পেয়ে গোলামের গুমর বেড়ে গেল। বল্লে, "এখন আমিই ত প্রধান, এখন সব কাজের ভার আমার উপর। তোমরা কেউ উজীর হবে, কেউ খাজাঞ্চি হবে, কেউ সেনাপতি হবে।"

এতক্ষণ ছক্কা একটা কথাও কয় নি। এখন বললে, "তা হ'লে তুমিই রাজা হ'লে। রাজার সিংহাসনে গোলাম বস্‌বে।"

সাতা বললে, "তাও কি কখনও হয় ?"

গোলাম বল্‌লে, "কেন, আমিই ত সব চেয়ে বড়। আমার উপর তুরুপ চলে না।"

পঞ্জা বললে, "হ্যাঁ, সে গ্রাবুতে। আর গোলাম-চোরের বেলা তোমায় পোঁছে কে? গ্রাবুর বেলায় সব নিজেদের বেছে বেছে নেওয়া হয়, আমরা উপুড় হয়ে চিৎ হয়ে প'ড়ে থাকি, আর ওঁরা মজা লুটেন। বিন্‌তি পঞ্চাশ হন্দর সব কাঁড়ি কাঁড়ি ওঁদের ঘরে, আর আমরা সব সাক্ষীগোপাল, হাঁ কোরে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত চেয়ে থাকি।"

চৌকা বলে, "এই ত হ'ল কথা! রাজা-রাণী যখন নেই, তখন গোলাম কোথাকার কে? কাল রাত্রে রাজবাড়ীতে থাক্‌লে ত ওকেও ধ'রে নিয়ে যেত।"

সুযোগ পেয়ে টেক্কা বললে, "ওর কি সে হুঁস আছে? গোলামের আর কত বুদ্ধি হবে বল। আস্পর্দ্ধাখানা একবার দেখ! উনি আমার চেয়ে বড় হ'তে চান!"

দুরী ধামাধরা কি না। বললে, "আস্পর্দ্ধা না আস্পর্দ্ধা! টেক্কা মশাই থাক্‌তে গোলাম হ'ল বড়!"

গোলাম গরম হয়ে বললে, "কি তোমরা টেক্কা টেক্কা করচ। ওর না আছে চাল, না আছে চুলো, না আছে লোক, না আছে জন। ও ছিল

রাজা-রাণীর ন্যাংবোট, জাহাজই যদি ডুবল ত ও কোথা ভেসে যায়, কে তার খোঁজ রাখে!"

পঞ্জা বললে, "অত গরম হয়ো না, গোলাম বাবাজি! কি হয়েছে, তা তুমি মোটেই বুঝতে পার না। তাতে তোমার দোষ দিচ্চি নে, কেন না, বুঝতেই যদি পারবে, তা হ'লে চিরকাল গোলামী করবে কেন? আসল কথাটা কি জান? কাল রাত্রে যে কাণ্ড হয়ে গিয়েছে, তার মানে যুগ উল্টেচে। রাজা, রাণী, গোলাম, টেক্কা ও সব কিছুরই পাট থাকবে না। আবা কাবা পাগড়ী পেশোয়াজ প'রে ময়ূরের মত প্যাখম ছড়িয়ে ঘুরে বেড়ান আর চলবে না। তোমরা দু'জন এখন নিজের নিজের পথ দেখ।"

সকলে বললে, "বেশ বলেচ, এর উপর আর কথা নেই!"

আসরে আমল পেয়ে পঞ্জা বলতে লাগল, "এত দিন তোমরা আমাদের বাদ দিয়েছিলে, যা ইচ্ছে, তাই কোরতে। এখন থেকে তোমরা বাদ পড়বে, টেক্কা কিংবা গোলাম কাউকে আমরা চাইনে। গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়লী আর চলবে না। রাজা-রাজড়ার চেয়েও বড় পঞ্চায়েত, পাঁচে যা বলবে, তাই হবে। এখন আবার সেই দিন এসেছে। সব ক্ষমতা পাঁচের হাতে হবে।"

দহলা বললে, "রসো ঠাকুর, একটু বুঝে সুঝে বল। এ ত আর ছেলের হাতে মোয়া নয় যে, কাকের মত খপ্ ক'রে হাত থেকে কেড়ে নেবে। পাঁচের কথা চলবে, না দশের কথা?"

টেক্কা ও গোলাম হালে পানি পায় না। তবু গোলাম চুপ ক'রে থাকবার পাত্র নয়। বললে "তা হ'লে প্রধান হবে কে, পঞ্জা না দহলা?"

টেক্কা বললে, "কেউও কারুর কথা শুনবে না। যার যা খুসী বললেই হ'ল।"

আটা আর থাকতে না পেরে বললে, "তবে তুমি বুঝি আর কারুর খুসীতে কথা কইছিলে?"

তিরী। কেমন, টেক্কা মশায়, তুমি ত একা এক শো, এখন কথাটার জবাব দাও।

পঞ্জা বললে, "ওদের কথা ছেড়ে দাও, ওরা কোণঠেসা হয়েছি, যা ইচ্ছে বলুক গে। আমি যে প্রধান হব, এমন কথা আমি বলি নি, মনেও করি নি। পাঁচ জনে যা করবে, তাই হবে। অবশ্য, পাঁচ জনের মধ্যে আমিও এক জন কিন্তু আমি একা কোন ক্ষমতা চাইনে। পাঁচের সমান কে আছে? পঞ্চকন্যা, পঞ্চপাণ্ডব। 'মহাভারত ত পাঁচ পাণ্ডবকে নিয়ে।"

এ কথায় অনেকে পঞ্জার দিকে ঝুকল। ছক্কার একটু আত্মপ্রসাদ হ'ল। "সেই জন্য ত পঞ্জা ছক্কা বলে। যার দিকে পঞ্জা ছক্কা পড়ে, তারই জিত। আর বোম ছক্কা হ'লে ত কথাই নেই।"

সাতা বললে, "আমি নিজের কথা বলতে চাইনে, কিন্তু রঙের বেলা আমি হাতে এলে ত আমার বদলে সব পাওয়া যায়। এখন কি আমাকে বাদ দেবে?"

দহলা। আমার কথা কি চাপা পড়ল না কি? যেখানে ইচ্ছে হয় গিয়ে জিজ্ঞাসা কর, লোকে পাঁচের কথা শোনে, না দশের কথা শোনে?

দুই পক্ষে অনেক কথা, অনেক তর্ক হ'ল, কিন্তু কিছু মীমাংসা হ'ল না। অনেক বেলা হয়ে গেল ব'লে সে দিনকার মত সভা স্থগিত রইল।

সম্পূর্ণ